জঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

"বনফুল"



রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো : কলিকাতা-৪

মূল্য চার টাকা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫০

পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৫১, অগ্রহায়ণ ১৩৫২, পৌষ ১৩৫৪

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—২০. ১২. ৪৭

সহযাত্রী সুহৃৎ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করকমলেষু



াগলপুর
৪. ৪৩

জঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

১

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডে অসম্ভব রকম ভিড়। সেই ভিড় ঠেলিয়া শঙ্কর হাওড়া স্টেশনে চলিয়াছে। দ্রুতবেগেই চলিয়াছে। পাশের দোকানে একটা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তাহার গতি-বেগকে আরও একটু বাড়াইয়া দিল। ট্রেনের বেশি সময় নাই। হস্টেলের ঘড়িটা নিশ্চয় স্লো ছিল। ফুলের তোড়াটা ভাল করিয়া কাগজ দিয়া ঢাকিয়া আবার সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চারিদিকে যা ভিড়—ধাক্কা লাগিয়া তোড়াটা নষ্ট হইয়া না যায়!

নিউ মার্কেট হইতে ফুল কিনিতে গিয়া তাহার দেরিও হইয়া গেল, পকেটের সমস্ত পয়সাও শেষ হইয়া গেল। ট্রামের পয়সা পর্যন্ত নাই, হাঁটিয়া যাইতে হইতেছে। অথচ আজিকার দিনে সে উৎপলের সহিত শুধু-হাতে দেখা করিতে পারে না তো! বাহিরের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জনতার মত তাহার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। একদিন এই উৎপলই তাহার জীবনে সব ছিল। তাহার কৈশোর-জীবনটা উৎপলময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি ভালই বাসিত তাহাকে! এই জনতার মধ্যে পথ চলিতে চলিতেও অকস্মাৎ তাহার মনে সেই বিগত জীবনের একটি স্মৃতি আসিয়া

দীর্ঘ দশ বৎসরেও তাহা মলিন হয় নাই। কত কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ছবিটুকু শঙ্করের অন্তরে অকারণে এখনও সজীব হইয়া আছে। একদিন দুপুরে টিফিনের সময় উৎপল স্কুলের পিছন দিককার বারান্দায় বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া পেয়ারা খাইতেছিল এবং এক ফালি রোদ আসিয়া তাহার লাল ডোরা-কাটা জামায় পড়িয়া সর্বাঙ্গে একটা আলো-ছায়ার রহস্য সৃজন করিয়াছিল—এই ছবিটুকু শঙ্করের মনে কেমন করিয়া যেন এখনও অমলিন রহিয়াছে। আর একদিনের কথাও মনে আছে। সেদিন উৎপলের জন্মতিথি-উৎসব। তাহার কপালে ও গালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। উৎপলের বোন শৈল আসিয়া শঙ্করের পরামর্শ চাহিল—দাদার জন্মদিনে নূতন রকম কি উপহার দেওয়া যায়!

এই গ্যান্‌ঢঅ—গ্যান্‌ঢঅ—

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

ফিরিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভন্‌টুর গলা বলিয়া মনে হইল। ভন্‌টুই নিশ্চয়। কারণ 'গ্যান্‌ঢ' শব্দটির এবং এই জাতীয় আরও নানা বিচিত্র শব্দের সৃষ্টিকর্তা ভন্‌টুই। নিজের মনের ভাবকে স্বরচিত নানারূপ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা ভন্‌টুর একটা বিশেষত্ব। অভিধান-বহির্ভূত এই সকল শব্দের সৃষ্টিকর্তা বলিয়াই শঙ্কর ভন্‌টুর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।

শঙ্কর এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার চলিতে শুরু করিবে, এমন সময় আবার ডাক আসিল—

চাম গ্যান্‌ঢঅ—

শঙ্কর আবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, হ্যারিসন রোডের একটি অতি সংকীর্ণ গলির অন্ধকারে ভন্‌টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গোলগাল মুখটিতে একমুখ হাসি, বাঁ হাতে বাইসিক্‌ল, ডান হাতে

ছোট একটা প্যাকেট—নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি-গোছের কিন্তু আগাইয়া যাইতেই ভন্‌টু তাহাকে বলিল, বাইকটা একবার ধর্‌ তো। এই প্যাকেটটা বাঁধি পেছন দিকে।

বিস্মিত শঙ্কর বাইকটা ধরিয়া বলিল, তুই এখানে হঠাৎ ?

দাড়ি কিনতে এসেছিলাম।

ভন্‌টুর চোখ দুইটিতে হাসি উপচাইয়া পড়িল।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, দাড়ি ?

দাড়ি। চরম লদ্‌কালদ্‌কি !

এই এক পুঁটুলি দাড়ি !

জটাও আছে। জটিল লদ্‌কালদ্‌কি !

শঙ্কর বলিল, তুই আজকাল কলেজে যাস না কেন ? থিয়েটারে ঢুকেছিস নাকি ?

ভন্‌টু কিছু না বলিয়া নিপুণভাবে প্যাকেটটি বাইকের পিছন দিকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইবার পূর্বেই শঙ্কর বলিল, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নে ভাই। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। উৎপল বিলেত যাচ্ছে আজ, জানিস না ?

তাই নাকি ? লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছিস বুঝি তুই ? যা, আমার আজ আর সময় নেই। আটটার মধ্যে দাড়ি না পৌঁছলে প্যানৃথার আমাকে খেয়ে ফেলবে।

প্যানৃথার কে ?

ছোটবাবু।

ছোটবাবু কে ?

আরে গাড়োল, আমি যে আপিসে চাকরি করছি, সেই আপিসের ছোটবাবু। হুয়া চোয়াল, হুয়া লাল চোখ, চাম লদ্‌ ! থিয়েটারে ভারি ঝোঁক। প্যানৃথার রসিক আছে। যাক, চললাম ভাই আমি।

...কে ব'লে দিস, বিলেত যাচ্ছে যাক—দকুচে না যায়। চললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

শঙ্করের বিস্ময় কাটে নাই।

সে বলিল, তুই চাকরিতে ঢুকেছিস নাকি? কিছু জানি না তো! পড়াশোনা ছেড়ে দিলি?

আসছে বছর আবার শুরু করা যাবে।

ভন্টু বাইকে চড়িয়া জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভন্টুদের অবস্থা সচ্ছল নয়। হয়তো দারিদ্র্যের জন্যই বেচারার পড়াটা হইল না। ভন্টুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। বেঁটে মোটা আড়ময়লা-বুক-খোলা-জামা-পরা হাস্যমুখ ভন্টুকে সে যেদিন প্রথম ক্লাসে দেখিয়াছিল, সেদিন তাহাকে ভারি অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, ভারি নোংরা ছেলেটা। এখনও ভন্টু তেমনই নোংরা আছে। কিন্তু আর তো তাহাকে তেমন খারাপ লাগে না। শঙ্কর ভন্টুর অন্য পরিচয় পাইয়াছে। তাহাদের বাড়িতেও সে গিয়াছে কয়েকবার।

হাওড়ার পুলের উপর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্করের মনে পড়িতে লাগিল, উৎপলের কথা নয়, ভন্টুর কথা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, ভন্টুর বাবা তাহাকে একদিন যাইতে বলিয়াছিলেন। নানারকম গোলমালে তাহার যাওয়া হয় নাই। বেলেঘাটাতে এক অতি এঁদো গলির মধ্যে ভন্টুর বাসা। যাওয়াই মুশকিল। শঙ্কর ভাল করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত যে, ভন্টুর ওখানে না যাওয়ার কারণ ভন্টুর বাসার দূরত্ব নহে; অন্য কারণ রহিয়াছে। উৎপলের বিবাহের

পর হইতেই শঙ্কর ভন্টুর ওখানে যাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়া... উৎপলের বিবাহ হইয়াছে প্রায় মাস দুই হইল। উৎপলের শ্বশুর বড়লোক এবং শ্বশুরের অর্থে উৎপল বিলাত চলিয়াছে। শঙ্কর কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছে এসব কারণে নয়—শঙ্করের মাতিবার কারণ উৎপলের স্ত্রী সুরমা। সুশ্রী, তন্বী, যুবতী, সুশিক্ষিতা। কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে সুরুচিসঙ্গত শোভন সৌষ্ঠব। সকল বিষয়েই বেশ কেমন একটা যেন সহজ অনাড়ম্বর কমনীয়তা আছে। এমন মেয়ে শঙ্কর ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

সে পাড়াগাঁয়ে মানুষ। মফস্বলের স্কুলে পড়িয়াছে। আই. এস-সি., বি. এস-সি.-টাও মফস্বলের কলেজেই কাটিয়াছে।

সুরমার মত মেয়ের সংস্পর্শে সে জীবনে কখনও আসে নাই। তাহার মোহগ্রস্ত মন তাই উৎপলের বিলাত যাওয়াটাকে উপলক্ষ্য করিয়া সুরমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই ঘুরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু সে নিজে এ বিষয়ে সজ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল অনেক পরে।

হাওড়া স্টেশনে শঙ্কর যখন পৌঁছিল, তখন ট্রেন ছাড়িতে আর বেশি বিলম্ব নাই। মাত্র দশ মিনিট বুঝি বাকি ছিল। শঙ্কর দূর হইতেই দেখিতে পাইল, উৎপল একদল নর-নারী পরিবৃত হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর কাছাকাছি আসিতেই উৎপলও তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিয়া উঠিল, এই যে শঙ্কু, তুইও এসে পড়েছিস তা হ'লে! আমি ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হ'ল না। ওহো, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে। 'স্লিপিং' স্যুটটা বাক্সের ভেতরেই থেকে গেছে। সুরমা, বার ক'রে ফেল না—ওই বড় স্যুটকেসটায় আছে, এখুনি তো দরকার হবে।"

সুরমা একটু ইতস্তত করিয়া গাড়ির কামরার মধ্যে গেল। ঠিক এই সময়টাতে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ইচ্ছা ছিল না তাহার।

শঙ্কর কাগজের আবরণ খুলিয়া ফুলগুলি বাহির করিল বড় বড় লাল গোলাপ। দেখিলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উৎপল বিস্মিত স্বরে বলিল, এ কার জন্যে এনেছিস তুই? আমার জন্যে? উঃ, এত সেণ্টিমেণ্টাল তুই! ফুল না এনে ভাল একটা সিগারেট-কেস আনতিস যদি, কাজে লাগত। ফুল তো একটু পরে শুকিয়ে যাবে। সুরমা অবশ্য খুব খুশি হবে। সুরমা, শঙ্কর কি কাণ্ড করেছে দেখ।

সুরমা নামিয়া আসিয়া স্মিত মুখে ফুলগুলি লইল।

উৎপল বলিল, বিছানার এক ধারেই রাখ এখন। পরে ঠিক ক'রে নিলেই হবে। সুরমাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে বম্বে পর্যন্ত।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ভালই তো।

ছদ্ম-গাম্ভীর্যভরে উৎপল কহিল, তুমি কবি মানুষ, তুমি তো বলবেই। বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ কিন্তু বলেছেন অন্য কথা—পথি নারী বিবর্জিতা—

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নারীর বেলায় শাস্ত্রটা মানা সুবিধের স্বীকার করি। তবে বিলেত যাবার মুখে শাস্ত্র-আলোচনা ঠিক মানাচ্ছে না। থাম্ তুই।

গাড়ির ভিতর ফুলগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে সুরমা শঙ্করের কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল। এই কথায় তাহার মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল। সে গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শঙ্করবাবু। সত্যিই গোলাপগুলো লাভ্লি। আপনার রসবোধকে প্রশংসা না ক'রে পারলাম না।

শঙ্কর উত্তরে শুধু হাসিল।

উৎপলবাবু, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? বিলেত যাচ্ছেন, এসব আদব-কায়দাগুলো শিখুন।

উৎপল গাড়ির কামরায় ঢুকিয়া টিফিন-কেরিয়ারটা লইয়া কি যেন

করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া নামিয়া আসিল। যিনি কথাগুলি বলিলেন, তিনি একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে। পরিপাটীরূপে সুসজ্জিতা। কোথায় কি পরিলে এবং না-পরিলে তাঁহাকে মানাইবে এ জ্ঞান যে তাঁহার আছে, তাহা একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন তরুণী ছিলেন। তাঁহাদের বয়স আরও কম। একজনের বয়স বছর কুড়ি এবং আর একজনের বছর আঠারো।

উৎপল নামিয়া আসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দেব বইকি। আমি বিলেত চললাম, আপনাদের ফাই-ফরমাশ খাটবার মত একজন কাউকে দিয়ে যেতে হবে তো। এইবার আসুন, আদব-কায়দামত আপনাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন শঙ্করসেবক রায়। আর ইনি হচ্ছেন মিসেস মিত্র—প্রফেসার বিশ্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রী, আমাদের ইউনিভার্সাল মিষ্টিদিদি। আর ওই যে উনি—যিনি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসছেন, উনি হচ্ছেন মিষ্টিদিদির মাসতুতো বোন, ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস রায়; ওঁর স্বামী দিল্লীতে চাকরি করেন; ডাক-নাম ওঁর সোনাদিদি। আর ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি হলেন মিস মিত্র—বেথুনে বি. এ. পড়ছেন; ওঁর ডাকনাম হচ্ছে রিনি। আর আপনারা সবাই শুনে রাখুন, আমার এই বন্ধুটি একটি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে দল পাকাতে ওস্তাদ, সব দলেই পাণ্ডাগিরি করা চাই। তা ছাড়া, পরোপকারী এবং সর্বোপরি কবি।

শেষের কথাটা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

উৎপল তাহার পর দণ্ডায়মান পুরুষ দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিল, আর এই দুটি হচ্ছেন আমার বড় কুটুম্ব। এ দুজনকে তুই দেখিস নি শঙ্কু। এঁরা দুজনেই আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। বিয়ের সময়ও

-সতে পারেন নি এঁরা—এত এঁদের পড়ায় মন। ইনি হচ্ছেন অশোক, আর উনি হচ্ছেন প্রবীর। দুজনেই এঞ্জিনীয়ারিং পড়েন রুড়কিতে।

শঙ্কর সকলকেই নমস্কার করিল।

শঙ্কর এবং উৎপল একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছিল। তাহার পর কিন্তু উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়।

উৎপল কলিকাতায় চলিয়া আসে—শঙ্কর মফস্বলের কলেজে যায়। সেইজন্য উৎপলের কলিকাতাবাসী পরিচিতদের সহিত শঙ্করের পরিচয় ছিল না। এতগুলি অপরিচিতা তরুণীর মধ্যে শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা।

মিষ্টিদিদি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুমিষ্ট হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপানার কবিতার বই কোন বেরিয়েছে নাকি?

না, কোন কবিতাই ছাপা হয় নি আমার।

ইহা শুনিয়া সোনাদিদি আগ্রহের সুরে বলিলেন, নিয়ে আসবেন আপনার কবিতা একদিন আমাদের বাড়িতে। এত ভাল লাগে আমার কবিতা! বিশেষ যে কবিতা ছাপা হয় নি। আসবেন একদিন। দিদি, ওঁকে চায়ে আসতে বল না একদিন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কবিতার নাম যেই শুনেছে, অমনই সোনার মন উসখুস করছে। আসবেন আপনি শঙ্করবাবু একদিন। তা না হ'লে জ্বালিয়ে মারবে ও আমাকে।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, যাব একদিন। ঠিকানাটা কি আপনাদের?

মিষ্টিদিদি ঠিকানা বলিলেন।

শঙ্কর উৎপলকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী কাউকে দেখছি না যে?

বাবা মা বর্ধমানে দেখা করবেন, আর সুরমার বাবা মা উঠবেন

আসানসোল থেকে। শ্বশুর মশায়কেও এইবার কাজে জয়েন করতে হবে তো।

উৎপলের শ্বশুর বম্বেতে চাকুরি করিতেন।

ঢং ঢং করিয়া ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইল।

উৎপল ও সুরমা গিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

উৎপল বলিল, তুইও একটা বিয়ে ক'রে চ'লে আয় বিলেতে, বুঝলি শঙ্কর?

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নীচু করিয়া বলিল, শোন্, রিনি মেয়েটিকে কেমন লাগছে তোর? বিয়ে কর্ না ওঁকে। প্রফেসার মিত্র বলছিলেন যে, ভাল পাত্র পেলে বিলেত পাঠাবেন।

চুপ কর্ তুই।

গার্ডের হুইস্‌ল বাজিল।

ট্রেন চলিতে শুরু করিল।

সুরমা হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া শঙ্করকে বলিল, চিঠি লিখবেন আমায় বম্বেতে। মিষ্টিদির কাছে ঠিকানা আছে। লিখবেন তো?

শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

ট্রেনের গতি-বেগ বাড়িল। উৎপল জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া যথারীতি রুমাল নাড়িতে লাগিল।

যতক্ষণ রুমাল দেখা গেল, সকলেই সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশ রুমালও অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিষ্টিদিদি তখন শঙ্করকে বলিলেন, এইবার আমরাও যাই, চলুন। আপনি থাকেন কোথায়?

হস্টেলে। হস্টেলের ঠিকানা সে দিল।

চলুন না নাবিয়ে দিয়ে যাই আপনাকে। গাড়ি আছে আমাদের সঙ্গে।

ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখন হস্টেলে ফিরব না। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।

যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়িতে। ভুলবেন-না।

যাব।

মিষ্টিদিদিরা চলিয়া গেলেন।

উৎপলের শ্যালক দুইটিও তাহাদের গাড়িতে উঠিল।

সকলে চলিয়া গেলে শঙ্কর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত মনটা যেন ফাঁকা হইয়া গেল। মনে হইল, ভন্টুর বাড়ি যাই। ভন্টু হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া চাকুরিতে ঢুকিল কেন? ভন্টুর বউদিদির মুখখানা একবার মনে পড়িল। এত রাত্রে ভন্টুর বাড়ি হাঁটিয়া যাওয়াই মুশকিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যে পরিচিত টিকিট-কালেক্টারবাবুটির অনুগ্রহে শঙ্কর বিনা মাশুলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াছিল, তিনি আসিয়া বলিলেন, এইবার আপনি বাইরে যান সার্। আর একখানা ট্রেন ইন করবে এক্ষুনি। আমার ডিউটিও ওভার হ'ল।

শঙ্কর বাহিরে চলিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়াই তাহার চোখে পড়িল, কিছু দূরে কতকগুলি লোক কি একটা বস্তুকে ঘিরিয়া কোলাহল করিতেছে। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য শঙ্করও আগাইয়া গেল। গিয়া দেখিল, একটি রমণী মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এবং সেই মূর্ছিতা রমণীর মাথা কোলে করিয়া লইয়া আর এক নারী বিলাপ করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কৌতূহলী জনতা দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। দুই মিনিটের মধ্যে কয়েকটা মতামত শঙ্করের কানে গেল।

একজন বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিতেছিলেন, মৃগী রোগ, বড় সঙিন ব্যায়রাম মশাই। ভালর মধ্যে এই—ছোঁয়াচে নয়।

একটি পাতলা লম্বা-গোছের ভদ্রলোক তাঁহার অপেক্ষাও পাতলা

ও লম্বা একটি ভদ্রলোকের কানে কানে ঘাড় উঁচু করিয়া বলিতেছিলেন, টেনেছে—জোর টেনেছে—বুঝলে খুড়ো, দেখেই বুঝেছি আমি।

খুড়া কিছু না বলিয়া জিহ্বার প্রান্তটুকু তির্যকভাবে বাহির করিয়া বাম চক্ষুটি ছোট করিলেন। তাহা দেখিয়া পুলকিত ভাইপো খুড়ার পৃষ্ঠদেশে একটি চপেটাঘাত করিয়া সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া ফেলিলেন। মোটা-গোছের বৃদ্ধ একটি ভদ্রলোকও মূর্ছিতা নারীটির সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন দেখা গেল, তাঁহার থিয়োরি কিন্তু অন্য রকম। তিনি বলিতেছেন, তারকেশ্বরে ধন্না দেওয়া কি সোজা ব্যাপার! সমস্ত দিনের কঠোর উপবাস!

শঙ্কর দেখিল, মেয়েটির যাহাই হইয়া থাকুক, অবিলম্বে উহাকে জনতার চাপ হইতে উদ্ধার না করিলে দমবন্ধ হইয়াই মারা যাইবে।

সে সোজা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল ও বলিষ্ঠ দুই বাহু দ্বারা অজ্ঞান মেয়েটিকে তুলিয়া লইয়া অপর মহিলাটিকে বলিল, আসুন, এঁকে কলের কাছে নিয়ে যাই। মাথায় মুখে জল দেওয়া দরকার আগে। শঙ্করের সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সকলে মনে করিল, শঙ্কর বোধ হয় ইহাদের নিজেদের লোক। সুতরাং জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

কলের কাছে লইয়া গিয়া চোখে মুখে জল দেওয়াতে মেয়েটির জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে সে অসম্বৃত বেশবাস ঠিক করিয়া লজ্জিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। শঙ্কর দেখিল, মেয়েটি অল্পবয়সী—সতরো-আঠারোর বেশি হইবে না। অপর মহিলাটি বয়স্থা। তিনি বলিলেন, বেঁচে থাক তুমি বাবা। মেয়েটির ফিটের ব্যায়রাম আছে। তুমি না থাকলে কি যে বিপদ হ'ত আজ আমার!

শঙ্কর বলিল, আপনারা কোথা যাবেন?

আমরা কলকাতাতেই যাব বাবা।

আপনাদের একটি গাড়ি ক'রে দিই তা হ'লে?

তাই দাও।

শঙ্কর তাহাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া দিল। বয়স্থা মেয়েটি শঙ্করকে আর এক দফা আশীর্বাদ করিয়া শেষে বলিল, তুমি একদিন যেও আমাদের ওখানে বাবা। যাবে?

কোন্‌খানে থাকেন আপনারা?

কেরানীবাগানে। ১৯ নম্বর কেরানীবাগান। যেও একদিন, কেমন?

যাব।

তরুণীটি চকিতে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কে ইহারা? ওই যুবতী নারীটির শরীরের ভার কি লঘু! জীবনে ইতিপূর্বে সে আর কোনদিন কোন যুবতী নারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে নাই। কত অক্লেশে সে মেয়েটিকে দুই হাতের উপর তুলিয়া কলের কাছে লইয়া আসিল! তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না তো! ওই যে অপরা মহিলাটি ছিলেন, তিনিও তো কোন আপত্তির কারণ দেখিলেন না ইহাতে! মহিলাটি মেয়েটির কে হন? মেয়েটি কি বিবাহিতা?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কর আবার হাওড়ার পুল পার হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃত কন্দরবাসী কাহার যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিসের যেন বিসর্পিত সঞ্চরণ সে সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি!

হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, ভন্টু তাহার অপেক্ষায় কমন-রুমে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, ঘোর জালে প'ড়ে ফের এসেছি ভাই।

কি হ'ল ?

ভীম জাল।

মানে ?

মানে, মেজকাকা ফিরে এসেছে।

ভন্টুর মেজকাকা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, তাই নাকি ?

একেবারে থলথলে কাণ্ড! মেজকাকার চেহারা যদি দেখিস এখন! ইয়া লদ্‌লদে ভুঁড়ি, মুখময় দাড়ি গোঁফ, গেরুয়া লুঙ্গি—জমজমাট ব্যাপার!

শঙ্কর বলিল, তাই নাকি ?

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, ভালই তো হয়েছে, মেজকাকা ফিরে এসেছেন। ভীম জাল বলছিস কেন ?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, মেজকাকা চাকরিটা যদি পায়, তবেই না ভাল ? সেইজন্যেই তো তোর কাছে এসেছি ভাই। তুই যদি একটু বোস সায়েবকে অনুরোধ করিস, ঠিক হয়ে যাবে। চাকরি না হ'লেই ভীম জাল। আমার পক্ষে একা ম্যানেজ করা শক্ত। তার ওপর শুনছি, মেজকাকা আজকাল খাঁটি গব্যঘৃত ছাড়া ব্যবহারই করেন না অন্য কিছু। গুরুর আদেশ নেই।

শঙ্কর শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, তুই পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকলি কেন হঠাৎ ? তোকে তখন জিজ্ঞেসই করা হয় নি। বিষ্ণুবাবু কেমন আছেন আজকাল ?

দাদাকে নিয়েই তো মুশকিল। দাদার আবার জ্বর শুরু হয়েছে। ডাক্তার বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে। সেই জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে চাকরি নিতে হ'ল। পেয়েও গেলাম একটা। কি

করি বল্? দাদার হাফ পে-তে ছুটি। সংসার তো চালাতে হবে। তার ওপর মেজকাকা এসে হাজির হয়েছেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, তিনি পদ্মাসনে ব'সে প্রাণায়াম করছেন। গভীর গাড্ডায় প'ড়ে গেছি ভাই। তুই উদ্ধার না করলে আর উপায় নেই। বোস সায়েবকে তুই যদি একটু বলিস, ঠিক মেজকাকার চাকরিটা হয়ে যাবে। যাবি এখন? এই সময় বোস সায়েব বাড়িতে থাকে।

এখুনি?

দেরি ক'রে লাভ কি?

এখন ভাই রাত হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে বোধ হয়। এখন এত রাত্রে হস্টেল থেকে চ'লে যাওয়া ঠিক নয়। এই মাসেই আরও দুবার আমি রাত্রে ছুটি নিয়েছি। কাল যাওয়া যাবে।

আচ্ছা।

ভন্টু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

সে যেন আশা করিয়া আসিয়াছিল, শঙ্কর এখনই তাহার সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাইবে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

হঠাৎ ভন্টু বলিল, গোটা চারেক পয়সা দিতে পারিস?

শঙ্করের পকেটে যাহা কিছু ছিল, ফুল কিনিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। বলিল, কাছে তো নেই ভাই।

ওপর থেকে নিয়ে আয়।

কি করবি পয়সা নিয়ে?

কিছু খাব। সেই বেলা নটায় দুটি ভাত খেয়ে আপিসে বেরিয়েছিলাম। তার পর থেকে গ্লাস তিনেক জল ছাড়া আর কিছু খাই নি।

পেটে এ রকম আগুন জ্বলছে যে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকলেই হয়। যা, চট ক'রে নিয়ে আয় চারটে পয়সা।

শঙ্কর উপরে গিয়া ভন্টুকে পয়সা আনিয়া দিল।

ভন্টু চলিয়া গেল।

শঙ্করও উপরে যাইতেছিল, এমন সময় একটি চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এখানে থাকেন ?

হ্যাঁ, আমিই। কি চাই ?

চিঠি আছে।

কই, দেখি! আমার নামে ?

চাকর একখানি পত্র তাহার হস্তে দিল। খামের উপর অপরিচিত নারীহস্তে লেখা।

চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

নমস্কার। কাল বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাড়িতে ছোটখাটো একটা টী-পার্টি আছে। আপনাকে আসতেই হবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম। কাল সমস্ত দিন হয়তো আপনি কলেজে থাকবেন, কোথায় আপনাকে খবর দেব, তাই এখুনি জানিয়ে দিলাম। আসতে ভুলবেন না কিন্তু। সোনা বলেছে, আপনার কবিতার খাতাও যেন আনেন। খাতা আনুন আর নাই আনুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয় আসবেন।

মিষ্টিদিদি

শঙ্করের সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আচ্ছা, যাব।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কমন-রুমটায় শঙ্কর খানিকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন সে যে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা সে নিজেও বলিতে পারিত না। সে কি ভন্‌টুর কথাই ভাবিতেছিল? মিষ্টিদিদির কথা? আজ সকালে বাবার পত্র পাইয়াছিল, তাহার মায়ের পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার উন্মাদিনী মায়ের কথাই সে কি ভাবিতেছিল? হাওড়া স্টেশনের সেই মূর্ছিতা যুবতীর কথা? না, কিছুই তো নয়। জ্ঞাতসারে সে কিছুই ভাবিতেছিল না। তাহার চমক ভাঙিল, যখন টং টং করিয়া নয়টা বাজিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

২

ভন্‌টুর বউদিদি বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন।

রান্নাঘর-সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা, এইমাত্র ধোওয়া হইয়াছে। জল এখনও শুকায় নাই। সেই ভিজা বারান্দার উপরেই একখানি পিঁড়ির উপর বসিয়া বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। নিকটেই তাঁহার নবমবর্ষীয়া কন্যা বসিয়া আলুর খোসাগুলি জড়ো করিতেছিল। সেগুলির একটি তরকারি হইবে। খোসা-চচ্চড়ি ভন্‌টুর প্রিয় খাদ্য। রোজ তাহা হওয়া চাইই।

বারান্দা হইতে পা বাড়াইলেই যে ভূমিখণ্ড পদস্পর্শ করে, তাহাকেই উঠান বলিতে হয়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ওই স্থানটুকুতে দাঁড়াইলেই মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। এই সঙ্কীর্ণ-পরিসর প্রাঙ্গণে তিনটি বালক, তাহার মধ্যে দুইটি একেবারে শিশু, খেলা করিতেছিল। আর একটি বছব এগারোর বালক হাঁটু গাড়িয়া দুই কান ধরিয়া সম্মুখস্থ মোড়ায় রক্ষিত উপক্রমণিকা হইতে শব্দরূপ মুখস্থ করিতেছিল।

তাহার পড়া হয় নাই বলিয়া ভন্‌টু তাহাকে শাস্তি দিয়াছে। বউদিদিকে দেখিয়া বোঝা দুষ্কর যে, তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী। তাঁহার মুখখানি এত কচি যে, আবার তাঁহার বিবাহ দিয়া আনা যায়। বউদিদিকে সুন্দরী হয়তো কেহ বলিবে না, কারণ তাঁহার রঙ কালো। এত কালো যে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও হাস্যকর হইবে। কিন্তু রঙে কি আসে যায়? বউদিদির হাসিমাখা গোলগাল ঢলঢলে মুখখানিতে, ডাগর চোখ দুইটিতে, তাম্বূলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুইটিতে যে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিবে। যাহাকে করিবে না, তাহার রূপ দেখিবার চোখ নাই। বউদিদি কুটনা কুটিতে কুটিতে কন্যা ফন্‌তিকে আদেশ করিলেন, ফন্‌তি, আমার জন্যে একখিলি পান সেজে নিয়ে আয় তো আগে। দোক্তাও আনিস একটু।

ফন্‌তি চলিয়া গেল।

পানের রঙে বউদিদির ঠোঁট দুইটি সর্বদা টুকটুক করিতেছে। একবেলা না খাইয়া বরং বউদিদির চলিতে পারে, পান না হইলে তাঁহার একদণ্ড চলা মুশকিল। ওইটুকুই তাঁহার জীবনের একমাত্র শখ, যাহা তিনি বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। জীবনের কত শখই তো পূর্ণ হয় নাই, আর হইবে না বোধ হয়। পানের সরঞ্জামকে কেন্দ্র করিয়া তাই তাঁহার নানারূপ আয়োজন। নানারকম টুকিটাকি জিনিসে তাঁহার পানের বাটাটি পরিপূর্ণ। ভাজা মসলা, কমলালেবুর শুকনা খোলা, চুয়া-সুগন্ধি দোক্তা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মৌরি, রকমারি পানের মসলা, নিখুঁত চুন, ভিজা ন্যাকড়ায় জড়ানো পান, মিহি করিয়া কাটা সুপারি, ভাল খয়ের—অতি নিপুণভাবে তিনি পানের বাটাটিতে গুছাইয়া রখিয়াছেন। এই পিতলের বাটাটি কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই শঙ্কর-ঠাকুরপোর উপরে বউদিদি এত প্রসন্ন। ভন্‌টু-ঠাকুরপোর এই বন্ধুটি বেশ মানুষ।

ভন্টুর ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল।

এই, তোর পড়া হ'ল? নিয়ে আয় দেখি।

খানিকক্ষণ পরেই সপাসপ বেতের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বালক-কণ্ঠের আর্তনাদ। মার এবং আর্তনাদ সমান বেগেই খানিকক্ষণ চলিল। তাহার পর আবার সমস্ত চুপচাপ। বালক আবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া শুরু করিল, নরঃ, নরৌ, নরাঃ—

বউদিদি অবিচলিতভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতেছিলেন। পুত্রের এতাদৃশ নির্যাতনে তাঁহার কোন বিকারই লক্ষিত হইল না। এসব তাঁহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে দরাজ-কণ্ঠে আদেশ আসিল, বউমা, চায়ের জল চড়াও, আটটা বাজল।

তাহার পরই একটি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। দীর্ঘাকৃতি ঈষৎ-কুব্জ দেহ, গৌর বর্ণ, গোঁফ দাড়ি কামানো, শুকচঞ্চু নাসা, চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পুরু লেন্সের চশমা পরা, হস্তে একখানি খবরের কাগজ—'বঙ্গবাসী'। তিনি আসিয়া দাঁড়াইতেই বউদিদি উঠিয়া তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপিচুপি বলিলেন, ডালটা নাবিয়েই চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি। বেশি দেরি নেই আর।

বৃদ্ধ বলিলেন, আচ্ছা।

সুরটা যেন অপ্রসন্ন।

বৃদ্ধ ভন্টুর পিতা। কানে কম শোনেন। বহুকাল হইতে বিপত্নীক। চায়ের দেরি আছে শুনিয়া তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং তামাক সাজিতে বসিলেন। ভোর তিনটায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন হইতে শুরু করিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চা এবং তামাক লইয়া থাকেন। অবসরমত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পাঠ করেন। বৃদ্ধ চলিয়া

গেলে ভন্টু আসিয়া দর্শন দিল। কৌতুকপূর্ণ চক্ষু দুইটি বউদিদির মুখের উপর স্থাপন করিয়া সে প্রশ্ন করিল, বাকু কি বলছিলেন—বৃদ্ধ বাকু?

ভন্টুর ভাষায় বাকু মানে বাবা।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, বাকুর আর কি অন্য কথা আছে এখন? আটটা বেজে গেছে, চা চাই।

ভন্টু গা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

বউদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, তুমি থামো ঠাকুরপো, এখুনি হয়তো এসে পড়বেন।

ভন্টু ও বউদিদি সমবয়সী। বউদিদি যখন বধূরূপে এ বাটিতে আসিয়া প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স এগারো। ভন্টুরও বয়স তখন এগারো। তখন হইতেই দুইজনে এক সংসারে একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে। ছেলেবেলায় দুইজনে মারামারি পর্যন্ত করিয়াছে। এখনও কথায় কথায় ইহাদের মনান্তর ও ভাব হয়। বাড়ির গুরুজন-স্থানীয় সকলের সম্বন্ধে ইহারা নিভৃতে যেসব আলোচনা করে, তাহা শুনিলে বিস্ময় হয়। মনে হয়, গুরুজনদের প্রতি বুঝি এতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা ইহাদের নাই। শ্রদ্ধার কথা বলিতে পারি না, কারণ শ্রদ্ধা জিনিসটা গুরুজনদেরও অর্জন করিতে হয়, কিন্তু ভালবাসায় ইহারা কাহারও অপেক্ষা কম নয়। বৃদ্ধ বাকুর সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য ইহারা বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিতে প্রস্তুত, করিতেছেও। বৃদ্ধ বাকুও বউমাকে ছাড়িয়া কখনও কোথাও থাকেন নাই, থাকিতে পারেনও না।

বউদিদি বলিলেন, বাকুর তামাক ফুরিয়েছে, এনো আজ।

এই তো পরশু তামাক এনেছি।

কি জানি. বাবাজী আসার পর থেকে বাবা ভয়ানক ঘন ঘন তামাক

খাচ্ছেন।—বলিয়া বউদিদি ফিক করিয়া হাসিয়া মুখে কাপড় দিলেন। বাবাজী মানে ভন্‌টুর মেজকাকা।

ভন্‌টু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া বলিল, এই নাও, আমার আজ আপিস থেকে ফিরতে দেরি হবে। শণ্টুকে দিয়ে তামাকটা আনিয়ে নিও ওই মোড়ের দোকানটা থেকে। বাবাজীর জন্যে ঘিও আনিও কিছু। গাওয়া ঘির সঙ্গে অন্য ঘিও একটু মিশিয়ে চালাও না।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, কাল চালিয়েছিলাম একটু।

আর এই নাও এক্‌স্‌ট্রা দু আনা। একটু ভাল মাছ আনিয়ে শণ্টুকে খেতে দিও। রাগের মাথায় বড্ড মেরেছি ছেলেটাকে। কাল ঘি খেয়ে কি বললে বাবাজী? ধরতে পারে নি?

বউদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, পারে নি আবার! বললেন, মানুষের অধর্মাচরণের চোটে গাইগুলো পর্যন্ত বিগড়ে গেছে। গাওয়া ঘিয়ে আর সেরকম গন্ধও নেই।

বাবাজী একেবারে চাম চামাটু! ফিরবে কখন বাবাজী?

গুরু-ভাইদের কাছে গেছেন, শিগগির কি আর ফিরবেন?

রান্নার কত দেরি?

ডালটা নাবিয়েই তরকারিটা চড়িয়ে দিচ্ছি। ভাত হয়ে গেছে। খোসা-চচ্চড়ি ওবেলা খেও, কেমন্?

আচ্ছা।

দুয়ারে কড়া নড়িল।

পিওন চিঠি দিয়া গেল।

ভন্‌টু চিঠিখানি পড়িয়া বলিয়া উঠিল, লুদুর, লুদুর—

বউদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি?

লুদুর, লুদুর—

রান্নাঘর হইতে একটা পোড়া-গন্ধ ছাড়িল।

বউদিদি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই যাঃ, ডালটা বুঝি পুড়ল! ফন্‌তি পোড়ারমুখীকে সেই যে একটা পান সাজতে বলেছি, যুগযুগান্ত কাটাচ্ছে মুখপুড়ী তাই নিয়ে!

তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

ভন্‌টু বলিল, ফন্‌তিকে তো কান ধ'রে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি। পায়ে পা ঠেকে গেছল, পেন্নাম করে নি।

বউদিদি কোন উত্তর দিলেন না।

ভন্‌টু পত্রখানি পুনরায় পড়িতে লাগিল।

বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে ভন্‌টু প্রশ্ন করিল, ডাল গন?

'গন' কেন হবে? ফেনটা উথলে উনুনে পড়েছিল। ওটা কার চিঠি?

মোমবাতি আবার বিয়ে করেছে। এক পুলিস-অফিসারের মেয়েকে বিয়ে ক'রে সি. আই. ডি. হয়েছে। লুদুর, লুদুর—

বউদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, আবার বিয়ে করলে মৃন্ময়-ঠাকুরপো?

ভন্‌টু গম্ভীরভাবে বলিল, এ বউটাও পালাবে।

বউদিদি বলিলেন, আচ্ছা, বউটার কোন খবরই পাওয়া গেল না, নয়? মৃন্ময়-ঠাকুরপো কিন্তু খুব ভালবাসত তাকে, যাই বল তোমরা।

লুদুর, লুদুর—

ভন্‌টু ভঙ্গীভরে শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

ভালবাসত না?

নিশ্চয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, বউ পালাবার এক বছর না যেতে যেতেই আবার বিয়ে করলে।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, পুরুষরা সব পারে। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই।

লুত্থর, লুত্থর—

সত্যি, ভারি আশ্চর্য লাগছে কিন্তু—

হাসিয়া বউদিদি আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ভন্‌টু হাঁকিল, এই ফন্‌তি, পান দিয়ে যা মাকে।

ফন্‌তি পান লইয়া আসিল।

বাকু আবার একবার তাগাদা দিলেন, বউমা, ডাল নামল তোমার?

বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বাকুকে বলিতে গেলেন যে, চায়ের জল চড়ানো হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহার চোখে মুখে হাসি।

ভন্‌টু একটি ময়লা লুঙ্গি পরিয়া তেল মাখিতে বসিল।

৩

শঙ্কর এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

সান্ধ্য চা-খাওয়ানো ব্যাপারটা যে এতদূর কবিত্বময় করা সম্ভব, সদ্য-মফস্বল-আগত শঙ্করের তাহা ধারণাতীত ছিল।

কি পরিপাটী আয়োজন!

গৃহসংলগ্ন উদ্যান-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট কয়েকটি টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে সুদৃশ্য আস্তরণ। তাহার উপর একটি ফুলদানি, প্রত্যেকটিতে দেশী-বিদেশী নানারকম ফুল। ইহা ছাড়া প্রতি টেবিলে সিগার, সিগারেট, ছাই ফেলিবার পাত্র ও ছোট ছোট কাচের জলপূর্ণ বাটি। বাটিগুলির পাশে পাট-করা পরিষ্কার ছোট ছোট তোয়ালে। প্রত্যেক টেবিলে দুইটি করিয়া বেতের চেয়ার। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন এই মার্জিতরুচি পরিবারটির উপর সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

শঙ্কর একটু আগেই গিয়াছিল, তখনও অন্যান্য অতিথিবর্গ আসিয়া

পৌঁছান নাই। এমন কি, প্রফেসার মিত্র তখনও পর্যন্ত কলেজ হইতে ফিরেন নাই। শঙ্কর গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উদ্যানে সজ্জিত টেবিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে সলজ্জকণ্ঠে কে বলিল, এই যে আপনি এসে গেছেন—আসুন, নমস্কার।

শঙ্কর পিছন ফিরিয়া দেখিল—রিনি।

একটা ট্রেতে অনেকগুলি খালি পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পিছনে একজন বেয়ারা, তাহার হাতে একটি ট্রে এবং তাহাতেও পেয়ালা, দুধ রাখিবার পাত্র, চিনির পাত্র, ছাঁকনি প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম। শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া আগাইয়া গেল এবং রিনির হাত হইতে ট্রেটা লইবার জন্য হাত বাড়াইল—দিন, আমাকে দিন।

রিনি মৃদু হাসিয়া লজ্জায় মুখটি একটু নত করিল, ট্রে কিন্তু শঙ্করের হাতে দিল না। তাড়াতাড়ি নিজেই গিয়া তাহা একটি টেবিলের উপর রাখিল এবং বেয়ারাটার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুই এগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখ্ ততক্ষণ। দেখিস, আবার যেন ভাঙিস না কিছু। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আসুন।

শঙ্কর রিনির পিছন পিছন চলিল।

একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কাউকে দেখছি না!

বউদি, সোনাদি সব ওপরে। দাদা এখনও ফেরেন নি কলেজ থেকে।

ইহার পর আর কি বলিবে, শঙ্কর ভাবিয়া পাইল না। নীরবে রিনির দোদুল্যমান বেণীভঙ্গিমা দেখিতে দেখিতে তাহার পিছন পিছন আসিয়া সে ড্রয়িং-রুমে ঢুকিল। বেণী-দোলানো রিনি আর স্টেশনে-দেখা রিনি দুইজনে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রসাধনের সামান্য ইতরবিশেষে মানুষটাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। অতি সাধারণ একটা আটপৌরে রঙিন শাড়ি, কাঁধের কাছে সাধারণ রকম এমব্রয়ডারি করা একটা ব্লাউস, হাতে

দুইগাছি করিয়া পাতলা সোনার চুড়ি, কানে দুল, পায়ে স্যাণ্ডাল, মাথায় দোদুল্যমান বেণী। এই অতি সাধারণ বেশেই রিনিকে অত্যন্ত অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ড্রয়িং-রূমে ঢুকিয়া রিনি বলিল, আপনি বসুন। আমি এগুলো ফেলে দিই ততক্ষণ।

কি ফেলে দেবেন?

এই যে—

শঙ্কর দেখিল, একটা ভাঙা পোর্সিলেনের বাসনের টুকরা চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।

রিনি বলিল, বেয়ারাটার হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেল টী-পটটা।

রিনি টেবিল হইতে একটা খবরের কাগজ লইয়া টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল। শঙ্করও হেঁট হইয়া কুড়াইতে শুরু করিল।

রিনি বলিল, আপনি বসুন না।

সেটা ভাল দেখায় না।

রিনি কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রতিবাদ করিল না। দুইজনেই কুড়াইতে লাগিল।

কুড়ানো শেষ হইলে রিনি টুকরাগুলি খবরের কাগজটাতে মুড়িয়া বলিল, আপনি তা হ'লে বসুন একটু। আমি বউদিদিদের খবর দিই।

রিনি চলিয়া গেল।

শঙ্কর একা বসিয়া বসিয়া ড্রয়িং-রূমের আসবাবপত্রাদি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুন্দর দামী 'সেটি', মেঝেতে কার্পেট পাতা। সামনের দেওয়ালে একটি ছোট, কিন্তু দামী আয়না। সেই দেওয়ালেই দুইখানি বড় বড় অয়েল্‌পেণ্টিং ছবি, দুইখানিই নারীমূর্তি, এলিজাবেথান যুগের পোশাক-পরিহিতা স্বাস্থ্যবতী তরুণী দুইটি। চোখের নীলিমা ও গালের লালিত্য মুগ্ধ করে। অপর একটি দেওয়ালে বিরাট একখানা দেওয়াল-

জোড়া ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য—সেকালের যুদ্ধক্ষেত্র। নানাভাবে উত্তেজিত অশ্ব ও অশ্বারোহীর দল একটা নিষ্ঠুর সংঘর্ষকে যেন মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। ভিতর হইতেই দেখা যাইতেছে, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট হ্যাট-র‍্যাক এবং তাহার সঙ্গেই ছড়ি রাখিবার র‍্যাক। ঘরের এক কোণে ছোট একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর কালো পাথরের নটরাজ, আর এক কোণে অনুরূপ টেবিলের উপর একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি—পাথরের নয়, পিতলের। আয়নার দুই পাশে ছোট ছোট দুইটি কাঠের সুদৃশ্য ব্র্যাকেট। ব্র্যাকেটের উপর উন্মুক্তবক্ষা বঙ্কিমতনু প্রস্তরময়ী দুইটি রমণী। অজন্তা-শিল্পের নিদর্শন। দেওয়ালে একটি বড় ঘড়ি। পাশের ঘরেই টেবিলের উপর ফোন দেখা যাইতেছে। হঠাৎ ঝনঝন করিয়া ফোনটা বাজিয়া উঠিল। কাছে-পিঠে বোধ হয় কেহ ছিল না, অন্ততঃ ফোনের ডাকে কেহ সাড়া দিল না। একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে উঠিয়া গিয়া ধরিল।

হ্যালো, কে আপনি?

আমি? আমি অপূর্ব। আপনি কে?

আমাকে চিনবেন না, চা খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছি, আমার নাম শঙ্কর।

ও, আমারও যাওয়ার কথা, কিন্তু আই অ্যাম সো সরি, মিস রিনি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু আই কান্‌ট হেল্‌প। এইটে জানাবার জন্যেই ফোন করছি।

আচ্ছা, ওঁরা কেউ এখন নীচেয় নেই, এলে আমি ব'লে দেব।

শঙ্কর রিসিভারটা রাখিয়া দিল।

কে এই অপূর্ববাবু? মেয়েমানুষের মত গলার স্বর!

তাহার একা ড্রয়িং-রুমে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আদি সাজানো প্রায় শেষ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে বিনীতভাবে বলিল, বসুন, হুজুর। দিদিকে ডেকে দিই।

না, ডেকে দেবার দরকার নেই। বাগানটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখি, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বেয়ারা ভিতরে চলিয়া গেল।

শঙ্কর এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নানাজাতীয় মরশুমী ফুলের বাহার দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে গেট দিয়া আবার সদর-রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ তাহার মনে কৈশোরের একটা স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। শৈলদের বাড়িতেও ঠিক এমনই একটা গেট ছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রতি অপরাহ্ণে শৈল গেটে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়িতেছে, একদিন শৈলকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কার জন্যে তুই রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস শৈল? আমার জন্যে নাকি?

ভারি ব'য়ে গেছে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার। দাদাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

শৈলর দুইটি দাদা পঙ্কজ ও উৎপল শঙ্করের সহপাঠী ছিল। পঙ্কজ বেচারা মারা গিয়াছে। শৈলও কি বাঁচিয়া আছে? সেই দুরন্ত বালকস্বভাব শৈল, কোথায় আজ সে? সে স্বচ্ছন্দে পেয়ারাগাছে চড়িত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়িত, প্রাচীর ডিঙাইয়া মিত্তিরদের বাগান হইতে ফলসা চুরি করিয়া আনিত, কথায় কথায় খামচাইয়া কামড়াইয়া খেলার সাথীদের অস্থির করিয়া তুলিত—সেই শৈলও তো আর বাঁচিয়া নাই। সেও মরিয়াছে। যে তরুণী আজ বোস সাহেবের পত্নী, সে অন্য লোক, অতিশয় নকল. একটা আনন্দকে সে যেন জোর করিয়া চোখে মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। শঙ্করের কবি-মন এই গেটটাকে

উপলক্ষ্য করিয়া বিগত কৈশোর-জীবনের স্মৃতি-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। অতীতকালে যে প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে করিয়াছে, সেই প্রশ্নটাই আবার তাহার মনে জাগিল—শৈল কি তাহাকে ভালবাসিত? কই, কোনদিন তো তাহাকে বলে নাই! কিন্তু সে তাহার কবিতার খাতাখানা চুরি করিয়াছিল। কেন? যখন তখন লুকাইয়া সে তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া হাজির হইত। কেন? সে বহুবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোন উত্তর পায় নাই; একটা না একটা ছুতা করিয়া শৈল প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শঙ্কর কি তাহাকে ভালবাসিত? বাসিত বইকি। কমলারঙের শাড়িটি পরিয়া শৈল যেদিন শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, শঙ্করের সে রাত্রে ঘুম হয় নাই। ইহা কি ভালবাসার লক্ষণ নয়? কিন্তু শঙ্করও তো শৈলকে কোনদিন কিছু বলে নাই! বরং শৈল শ্বশুরবাড়ি যাইবার আগে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার জন্যে মন-কেমন করবে শঙ্করদা? ছদ্ম বিদ্রূপের সুরে সে উত্তর দিয়াছিল, ঘুম হবে না আমার। সত্যই তো ঘুম হয় নাই। অনর্থক বিদ্রূপ করিতে গেল কেন তবে? মনখানি মেলিয়া ধরিলে ক্ষতি কি ছিল? কিশোরকালের প্রথম প্রেম এমন ভাবে নষ্ট হইয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর নাই। পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে ইহাও একটি।...শৈলকে ভুলিতেও দেরি হয় নাই তো! খল্‌সি আসিয়াছিল। শৈলর দূরসম্পর্কের বোন খল্‌সি। শৈল চলিয়া গেলে খল্‌সিই হইয়াছিল তাহার সঙ্গিনী। সেই একদিন অন্ধকার রাত্রে পিছন দিকের বারান্দার সিঁড়ির ধারে দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া বসিয়া থাকা—অপূর্ব অনুভূতি! তাহার পর আর একদিন রাত্রে, সেদিনও ঘন গাঢ় অন্ধকার; শঙ্কর শ্মশানে বসিয়া ছিল—সম্মুখে খল্‌সির চিতা। খল্‌সিও থাকে নাই। শঙ্করের আনন্দ-অনুসন্ধিৎসু অমৃত-পিপাসী কবি-মন সুধার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আজও মিলিল

না। জ্যোৎস্না-স্নাত সাগরে, পর্বতে প্রান্তরে তাহার মুগ্ধ মন মাতিয়া উঠে—জ্যোৎস্না কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না, চাঁদ ডুবিয়া যায়। নববর্ষার মেঘোদয়ে তাহার মনের ময়ূর পেখম মেলে, কিন্তু মেঘ কতক্ষণ থাকে? বৃষ্টি নামে, মেঘ মিলাইয়া যায়। সব আসে, কিন্তু থাকে না।

চাই কমলালেবু, ভাল কমলালেবু—

শঙ্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

সে অকারণে কমলালেবুওয়ালাকে ডাকিয়া কমলালেবু কিনিতে লাগিল। সুন্দর বড় বড় কমলালেবু। তাহার পকেটে ও হাতে যতগুলা আঁটিল, সে কিনিয়া লইল। তাহার পর গেট দিয়া সে আবার ভিতরে গেল। সহসা তাহার মনে হইল, এমনভাবে চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই, কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া দ্বিতলের একটা খোলা জানালা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল অসম্বৃতবসনা একটি নারীমূর্তি, তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জানালা হইতে সরিয়া গেলেন, প্রসাধন করিতেছিলেন বোধ হয়। শঙ্কর চোখ নামাইয়া লইল, ছি ছি, সে উপরের দিকে তাকাইতে গেল কেন? কি মনে করিলেন উনি? দেখিতে পাইয়াছেন কি? সে দ্রুতপদে আসিয়া ড্রয়িং-রূমে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আশ্চর্য লোক আপনি শঙ্করবাবু! এত আগে এলেনই বা কেন, আর এলেন যদি, বেরিয়েই বা গেলেন কেন?

শঙ্কর বলিল, এত আগে মানে? আমি এসেছি সাড়ে চারটের সময়।

সাড়ে তিনটের সময়।

শঙ্কর নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, তাই তো! সাড়ে তিনটাকে তাহার সাড়ে চারিটা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। একটু অপ্রস্তুতভাবে সে

বলিল, আরে, সাড়ে তিনটেকে আমি সাড়ে চারটে ভেবে উর্ধ্বশ্বাসে এসে হাজির হয়েছি !

তাতে আর কি হয়েছে ? ভালই তো, আসুন না, একটু গল্প করা যাক।

সোনাদিদির মুখে একটা চাপা হাসি চিকমিক করিতেছিল।

কমলালেবু কোথায় পেলেন ?

কিনলাম রাস্তায়।

কিনলেন ? খিদে পেয়েছে বুঝি আপনার ? কলেজ থেকে সোজা এসেছেন বুঝি ?

শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রত হইল। মুখে কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। বলিল, কেমন সুন্দর দেখতে বলুন তো ! দেখলে কি খাওয়ার কথাই মনে হয় ? আমার তো কমলালেবু খাওয়ার চেয়ে হাতে ক'রে ব'সে থাকতেই বেশি ভাল লাগে।

সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

আমাকে একটা দিন, খাই।

শঙ্কর তাঁহাকে একটা কমলালেবু দিল এবং প্রশ্ন করিল, মিষ্টিদিদি কোথায়, তাঁকে দেখছি না !

তিনি এইমাত্র স্নান ক'রে এলেন, আসছেন এখুনি।

চকিতে শঙ্করের উন্মুক্ত বাতায়নের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সোনাদিদি লেবুটি ছাড়াইয়া শঙ্করের হাতে কয়েকটি কোয়া দিয়া বলিলেন, নিন, খেয়ে দেখুন।

আপনি খান আগে।

মিষ্টি আসিয়া প্রবেশ করিল। কাপড়-জামা বদলাইয়া বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। কমলালেবু দেখিয়া সে কৌতূহল প্রকাশ

করিল না। সোনাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে টেবিলগুলো ঠিক সাজানো হয়েছে তো? দেখেছ তুমি সোনাদি?

আমি বাইরে যাই নি, তুই দেখ্ গিয়ে।

শঙ্কর বলিল, অপূর্ববাবু ফোন করেছিলেন, তিনি আসতে পারবেন না।

এই বার্তায় রিনির মুখখানি সলজ্জ হইয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সোনাদিদি কমলালেবুর কোয়াগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কখন ফোন করেছিলেন অপূর্ববাবু?

এই একটু আগে। আপনারা কেউ নীচে ছিলেন না তখন।

ও। যাক, বাঁচা গেল। নিন, খান দুটো কোয়া।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, আপনি খান আগে।

আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো আপনি!

মিষ্টিদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মিষ্টিদিদি আসিতেই সোনাদিদি অনুযোগমিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, শঙ্করবাবুর কথা শুনেছ মিষ্টিদি? কমলালেবু নাকি ওঁর হাতে ক'রে ধ'রে থাকতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না।

মিষ্টিদিদির আগমনে শঙ্কর মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, খোলা জানালার কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। মিষ্টিদিদির দিকে তাহার চাহিতেও সঙ্কোচ হইতেছিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ঠিকই তো বলেছেন উনি। কবির মত কথাই বলেছেন।

সোনাদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আপনার কবিতা এনেছেন? কই, দেখি!

না, আজ আনি নি, আর একদিন আনব এখন। কলেজ থেকে সোজা চ'লে এসেছি কিনা।

অভিমান-ভরা সুরে সোনাদিদি বলিলেন, কাল অত ক'রে বললাম আপনাকে!

মিষ্টিদিদি ফোড়ন দিলেন, কবির মন অত সহজে পাওয়া যায় না সোনা।

এই স্বল্পপরিচিতা নারী দুইটির প্রগল্‌ভতা শঙ্করের ভাল লাগিতেছিল না, আবার ভাল লাগিতেওছিল। তাহার ভদ্র মন এই ধরনের কথাবার্তায় সঙ্কুচিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরবাসী বন্য বর্বরটা ইহা উপভোগ করিতেছিল। শঙ্কর ভাবিতেছিল, কেমন মানুষ ইহারা?

মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, না? বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?

শঙ্কর একটু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আপনাদের ফুলগুলো।

এবার ডালিয়াগুলো তেমন ভাল হয় নি।

শঙ্কর এবার মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণ সে সঙ্কোচে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে নাই। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই ভদ্রমহিলা প্রসাধনশিল্পে নিপুণা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখাটি কি সুন্দর মানাইয়াছে! পীতাভ জরিপাড় শাড়িটি পরিবার কি অপূর্ব ভঙ্গী, সর্বাঙ্গে তাঁহা যেন আবেশভরে স্বপ্ন দেখিতেছে। শঙ্করের কবি-মন প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

মিষ্টিদিদি বলিতে লাগিলেন, ডালিয়াগুলো তেমন সুবিধে হয় নি যদিও, পিটুনিয়াগুলো কিন্তু খু—ব ভাল হয়েছে। দেখেছেন আপনি ওই দিকের কোণটাতে?

শঙ্কর সত্য কথা বলিল।

বিলিতী ফুল একটাও চিনি না আমি।

তাই নাকি? আসুন, এক্ষুনি চিনিয়ে দিচ্ছি আমি। চলুন যাই, আয় সোনা।

সোনাদিদি কিন্তু অভিমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা যাও, শঙ্করবাবু আমার একটা কথাও যখন রাখলেন না, তখন আমার স'রে থাকাই ভাল।

মিষ্টিদিদি অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত দুইটি উলটাইয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, নিন, সামলান এখন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল, সে কি! কোন্ কথা রাখলাম না আপনার?

সোনাদিদি নীরব।

আচ্ছা, দিন, নেবু খাচ্ছি। আপনিও তো আমার কথা রাখলেন না। একটা কোয়া যদি আগে খেতেন, কি এমন ক্ষতি হ'ত তাতে?

শঙ্কর হাসিয়া সোনাদিদির হাত হইতে কয়েকটি কোয়া লইয়া মুখে পুরিল। সোনাদিদি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অর্ধ নিমীলিত নয়নে মৃদু হাস্যসহকারে তিনি বলিলেন, আমার জন্যেও রাখুন দু-একটা। সব খেয়ে ফেলছেন যে!

এই যে, নিন না। চলুন, বাগানখানা এইবার দেখা যাক। মিষ্টিদিদি, আপনিও নিন।

তিনজনে লেবু খাইতে খাইতে ড্রয়িং-রুম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে রিনি চায়ের টেবিলগুলি সাজাইতেছিল।

মিষ্টিদিদি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা রে বাবা, রিনির মত খুঁতে মেয়ে আর যদি দুটি দেখেছি আমি! সেই আড়াইটে

থেকে মেয়ে লেগেছেন চায়ের টেবিল সাজাতে, এখনও পর্যন্ত পছন্দমত সাজানো হ'ল না!

হয়ে গেছে আমার।

এই বলিয়া রিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রিনি চলিয়া গেলে সোনাদিদি মৃদুস্বরে বলিলেন, আহা, বেচারীর এত যত্ন সাজ সব পণ্ড হ'ল। অপূর্ববাবু আজ আসবেন না, ফোন করেছেন।—বলিয়া তিনি একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ছদ্ম বিস্ময়ে মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেচারী!

শঙ্কর এ বিষয়ে মনে মনে কৌতূহলী হইলেও মুখে কিছু বলিল না। তিনজনে মিলিয়া বাগানের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শঙ্কর মরসুমী ফুল সম্বন্ধে যতটা না হউক, মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করিল। 'সুইট-পি'র বর্ণ-বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, রোপণ ও লালন করিবার প্রণালী ও কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে মিষ্টিদিদি বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রফেসার মিত্রের মোটর গেটে প্রবেশ করিল। শঙ্কর একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কোন প্রকার চঞ্চলতা দেখা দিল না। তিনি সুইট-পির সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যেন স্বামীর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সচেতন হওয়াটা অতিথির সম্মুখে অশোভন। অবিচল ভাবটা বেশিক্ষণ কিন্তু টিকিল না। সোনাদিদি টিকিতে দিলেন না। সোনাদিদি বিস্মিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওমা, অপূর্ববাবু যে এসেছেন দেখছি!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি?

সকলে তখন মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রফেসার মিত্র ব্যতীত মোটর হইতে আরও তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন—একজন অপূর্ববাবু এবং অপর দুইজন অবাঙালী। অবাঙালী দুইজন প্রফেসার মিত্রের প্রাক্তন বন্ধু, বিলাতে

অবস্থানকালে ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। একজন মাদ্রাজী—মিস্টার পিলে এবং অপরজন পাঞ্জাবী—সর্দার প্রতাপ সিং। দুইজনেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং দুইজনেই ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের সম্বর্ধনা-কল্পে এই টী-পার্টির আয়োজন। মিষ্টিদিদি সস্মিতমুখে ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কথায় বার্তায় বোধ হইল, ইতিপূর্বেই ইঁহাদের আলাপ-পরিচয় ছিল। কারণ পাগড়ি-মণ্ডিত শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত প্রতাপ সিং মিষ্টিদিদির সহিত কি একটা রসিকতা করিয়া দরাজ গলায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিস্টার পিলে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারও হাস্যদীপ্ত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি এই আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া যখন ব্যস্ত, সোনাদিদি তখন অপূর্ববাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে কি যেন বলিতে লাগিলেন।

প্রফেসার মিত্র আসিয়াই বন্ধুদ্বয়কে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর সুইট-পির বেডগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বোধ করি এই সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি সে মিষ্টিদিদির নিকট এইমাত্র শুনিয়াছিল, সেইগুলিই রোমন্থন করিতে লাগিল।

বেশিক্ষণ অবশ্য নয়। একটু পরেই সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আসুন শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই ফোন করেছিলেন।

পরিচয় হইল।

শঙ্কর দেখিল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সত্যই একটি দেখিবার মত বস্তু। খর্বকায় ক্ষুদ্র মানুষটি, কিন্তু সাজসজ্জা ছোট মাপের নয়। পায়ে জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি, গায়ে মিহি ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। সমস্ত মুখখানি একেবারে যেন চুনকাম-করা। স্নো এবং পাউডারে

কিন্তু তাঁহার বহুক্ষৌরীকৃত গণ্ডদেশের কর্কশতা ঢাকিতে পারে নাই। মুখখানি গোল, নাকটি খাঁদা-খাঁদা, নাকের নিম্নে সামান্য একটু গোঁফ। চক্ষু দুইটিতে বুদ্ধির জ্যোতি আছে, দৃষ্টি কিন্তু লাজুক। অপূর্ববাবু কাহারও মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারেন না।

সোনাদিদি অপূর্ববাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন।

শঙ্কর শুনিল যে, অপূর্ববাবু লোকটি বিদ্বান, সাহিত্যরসিক, মার্জিত-রুচি ও প্রগতিবাদী; সরকারী আপিসে চাকুরি করেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া অপূর্ববাবু চুপ করিয়া রহিলেন, বলিবার মত কথা তাঁহার যোগাইল না। চোখ দুইটি নীচু করিয়া সস্মিতমুখে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনারা দুজনে আলাপ করুন ততক্ষণ, আমি রিনিকে ডেকে নিয়ে আসি। সোনাদিদি চলিয়া গেলেন। ইহাদের আলাপ কিন্তু তেমন জমিল না। শঙ্কর মামুলী ভদ্রতাসূচক দুই-চারিটি কথা বলিল, এবং অপূর্ববাবু 'হাঁ' 'না' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই বিব্রত হইতে লাগিলেন। অপরিচিত লোকের কাছে অপূর্ববাবু বড়ই অস্বস্তিবোধ করেন। তাঁহার সর্বদাই মনে হয়, হয়তো এমন কিছু অনবধানতাবশত বলিয়া ফেলিবেন, যাহা অসঙ্গত; সুতরাং অপরিচিত লোকের সম্মুখে তিনি সাধারণত চুপ করিয়াই থাকেন।

শঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, আপনার কতদিন আলাপ এঁদের সঙ্গে?

বছর দুই হবে।

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই কেন জানি না, অপূর্ববাবু বলিলেন, মিস মিত্রকে পড়াতাম আমি।

ও

শঙ্কর সহসা চুপ করিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল—ঠিক

কি যে মনে হইতে লাগিল, তাহা ঠিক বর্ণনীয় নয়। কিন্তু একটা পোকা একটা মর্মর-প্রতিমার গা বাহিয়া উঠিতেছে দেখিলে একটা শিল্পীর যে ধরনের ক্ষোভ উপস্থিত হয়, শঙ্করের তাহাই হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর আকস্মিকভাবে অপূর্ববাবুকে আবার একটি প্রশ্ন করিল, প্রশ্নটির অসৌজন্যে মনে মনে সঙ্কুচিত হইলেও প্রশ্নটি না করিয়া সে পারিল না।

তখন আপনি ফোন করলেন যে, আসতে পারবেন না, আবার এসে পড়লেন যে?

প্রশ্ন শুনিয়া অপূর্ববাবু নারীসুলভ লজ্জায় শির অবনত করিলেন এবং পরে অতি কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, বড়বাবু ছুটি দিতে চান নি প্রথমে, শেষটা অনেক বলা-কওয়ার পর ছুটি দিতে যখন রাজি হলেন, তখন দেখি, আর আসবার সময়ও নেই, শেষে—

শঙ্কর বলিল, আপনি এলেন তো প্রফেসার মিত্রের সঙ্গে দেখলাম—

অকারণে লজ্জিত অপূর্ববাবু বলিলেন, হ্যাঁ, উনি গাড়ি নিয়ে ভাগ্যিস আমার মেসে গিয়েছিলেন, তাই আসতে পারলাম।

কোথায় থাকেন আপনি?

নেবুতলায় একটা মেসে।

প্রফেসার মিত্র কাপড় বদলাইয়া বাহিরে আসিলেন। প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রিনি ও সোনাদিদিও আসিলেন। মিষ্টিদিদি সর্দার প্রতাপ সিং ও মিস্টার পিলেকে লইয়া হাস্যপরিহাসে মশগুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রফেসার মিত্র কাছে আসিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইতেই তাঁহার শঙ্করের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। তিনি অভিভাবকী সুরে শঙ্করকে ডাকিয়া বলিলেন, আসুন না শঙ্করবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

সুইট-পিগুলো দেখছিলাম আর একবার অপূর্ববাবুর সঙ্গেও আলাপ হ'ল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের সঙ্গে সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রফেসার মিত্রকে শঙ্কর ইতিপূর্বে দেখে নাই, নাম শুনিয়াছিল। ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে ভদ্রলোকের নাম আছে। দেখিলেই লোকটিকে ভাল লাগে, সদা-হাস্যমুখ, উপরের দন্তপাঁতি সর্বদাই বিকশিত হইয়া আছে। শঙ্করের সহিত পরিচয় হইতেই তিনি উচ্ছ্বাসভরে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিলেন, ভারি খুশি হলাম তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে। উৎপলের বন্ধু তুমি, উৎপল আমাদের বাড়ির ছেলেদের মত ছিল। সেদিন আমি একটা মিটিঙে আটকে পড়লাম, তাই উৎপলকে 'সি-অফ' করতে আর যেতে পারলাম না। ব'স ব'স।

এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল। সে মোটরে আরও কয়েকজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনজন আধুনিক মহিলা ও তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন পুরুষমানুষ।

শঙ্কর ও সোনাদিদি একটি টেবিলে বসিয়া ছিলেন। ঠিক তাহার পাশের টেবিলেই ছিলেন রিনি ও অপূর্ববাবু। অপর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় মোটরে সমাগতা একটি মহিলা ও তৎসঙ্গে আগত ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে একজন। এই ভদ্রলোক সোনাদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, একটা খুব ভাল ফিল্‌ম হচ্ছে, দেখেছেন? Man, Woman, Marriage?

সোনাদিদি বলিলেন, কাগজে দেখেছি বটে, পরদায় দেখা হয় নি।

দেখে আসুন। তা হ'লে, ওয়াণ্ডারফুল প্রোডাকশান। আজই লাস্ট ডে।

সোনাদিদি হতাশভাবে বলিলেন, তা হ'লে আর হয় না। পার্টি শেষ হতেই তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সেকেণ্ড শোতে যেতে পারেন।

দেখি।

সোনাদিদি চুপ করিয়া গেলেন। কোথাও যাওয়া না-যাওয়ার মালিক তিনি নহেন। মিষ্টিদিদি যদি না যান, তাহা হইলে তাঁহারও যাওয়া হইবে না।

একটু পরে সোনাদিদি শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি দেখেছেন ফিল্‌মটা ?

না।

যান, দেখে আস্থন।

হস্টেলে রাত্রিবেলা তো ছুটি পাব না।

একটু দুষ্টামি-ভরা হাসি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ওহো, আপনি যে ভাল ছেলে, সে কথা মনে ছিল না।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, মনে থাকা উচিত ছিল।

সোনাদিদি পাশের টেবিলে রিনিকে বলিলেন, প্রকাশবাবু বলছেন, খুব ভাল একটা ফিল্‌ম হচ্ছে, যাবি ?

তোমরা যাও তো যাব।

অপূর্ববাবু যাবেন ?—সোনাদিদি প্রশ্ন করিলেন।

মিহি গলায় অপূর্ববাবু বলিলেন, খুবই স্থখী হতাম যেতে পারলে। কিন্তু আমার টুইশনি আছে, মিস বেলাকে পড়াতে যেতে হবে।

শঙ্কর চকিতে একবার রিনির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

সোনাদিদি বলিলেন, মিস বেলা ? মানে, বেলা মল্লিক ? সে তো

দু-দুবার ম্যাট্রিক ফেল ক'রে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল শুনলাম। আবার পড়া শুরু করেছে নাকি ?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া নিতান্ত লাজুককণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, আমি গান শেখাই তাঁকে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রিনির দিকে চাহিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ও।

ইহার উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে অপূর্ববাবু কি একটা বলিলেন, কিন্তু চতুর্থ টেবিলে উপবিষ্ট আনন্দিত সর্দার প্রতাপ সিংহের অট্টহাস্যে তাহা আর শোনা গেল না। চতুর্থ টেবিলে প্রতাপ সিং ও মিষ্টিদিদি বসিয়া আলাপ-আপ্যায়ন সহকারে চা-পান করিতেছিলেন।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, অস্তগামী সূর্যের রক্ত-কিরণরেখা মিষ্টিদিদির জরির আঁচলাটায় পড়িয়া জলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

পাশের টেবিলের প্রকাশবাবু সোনাদিদিকে বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না তো এঁকে এর আগে আপনাদের বাড়িতে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।

সোনাদিদি আলাপ করাইয়া দিলেন।

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, এই সুসজ্জিত ফ্যাশান-দুরস্ত অধিবেশনে প্রকাশ-বাবু লোকটি একটু বেমানান-গোছের সাদাসিধা। গলাবন্ধ গরমের কোট গায়ে এবং তদুপরি একটি মোটা-গোছের খদ্দরের আধময়লা চাদর। দাড়িটা পর্যন্ত যেন দুই দিন কামানো হয় নাই।

সোনাদিদি পরিচয়সূত্রে বলিলেন, প্রকাশবাবু হচ্ছেন আমাদের অগতির গতি, কোন বিপদে প'ড়ে প্রকাশবাবুর শরণাপন্ন হ'লে—বাস্, নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া জানেন, উনি একজন খুব ভাল হোমিওপ্যাথ।

প্রকাশবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি তো এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন; আমার ওপর এত বেশি মনোযোগ দিলে ওঁদের অপমান করা হবে যে!

প্রকাশবাবুর টেবিলে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ব্যাচিলার মানুষকে একটু জ্বালাতন ক'রে মিসেস রায় আনন্দ পান, তার থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না।

বেশ, তা হ'লে করুন।

প্রকাশবাবু সস্মিতমুখে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কর হেদুয়ার ধারে একটা বেঞ্চে একা বসিয়া ছিল। প্রফেসার মিত্রের বাড়ি হইতে সে হস্টেলে ফিরে নাই। আজিকার দিনে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাহার মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের সংসর্গে তাহার বৈকালটা কাটিল, তাহারা যেন অন্য জগতের প্রাণী—স্বপ্ন-জগতের। কথাবার্তা ব্যবহার কেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ষ্ট সজীব সুন্দর। সুরমা এই জগতের লোক। ইহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া সে মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করিল। স্টেশনে উৎপল সেদিন যাহা বলিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহা তো একেবারেই অসম্ভব। কল্পনা করাও বাতুলতা। রিনির মত মার্জিতরুচি যুবতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে কেন? কিন্তু ওই অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে তো রিনি সহ্য করিতেছে! এই কথা মনে হওয়ায় শঙ্কর সোজা হইয়া বসিল। রিনিকে সে নিজে বিবাহ করিতে পারুক আর না পারুক, অপূর্বকৃষ্ণের হাত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করিবে।

কে রে, শঙ্কর, এখানে একা কি করছিস? আজ কলেজ থেকে তুই হস্টেলে পর্যন্ত ফিরিস নি, ব্যাপার কি বল্ তো?

শঙ্করের রুম-মেট কানাই।

শঙ্কর বলিল, একটা নেমন্তন্ন ছিল।

চল্, এবার যাওয়া যাক, আটটা তো বাজে।

চল্‌।

দুইজনে গল্প করিতে করিতে হেদুয়া হইতে বাহির হইল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সহসা কানাই বলিল, ওহো, তোর তিরিশটা টাকা এসেছে আজ মনি-অর্ডারে। সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট তোকে দিতে এসেছিলেন, তোকে না পেয়ে আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, তোকে দিয়ে দিতে। সঙ্গেই আছে আমার, এই নে।

কানাই পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তিনটি নোট ও একটি কুপন শঙ্করের হাতে দিল। শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে তাহা পকেটে পুরিল।

ট্রাম আসিল।

উভয়েই চড়িয়া বসিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে বলিল, আমার একটু দরকার আছে, তুই যা, আমি আসছি একটু পরে।

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

ট্রাম চলিয়া গেল।

৪

এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর তাহাতে চড়িয়া বসিয়া প্রফেসার মিত্রের বাড়ির ঠিকানা বলিয়া দিল এবং জোরে চালাইতে বলিল। গলা বাড়াইয়া রাস্তার একটা ঘড়িতে দেখিল, আটটা বাজিয়া দশ-মিনিট। বেশি সময় তো নাই!

ড্রাইভারকে সে আবার বলিল, জোর্‌সে হাঁকাও।

প্রফেসার মিত্রের বাড়ি পৌঁছিয়া শঙ্কর সোজা ড্রয়িং-রুমের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই সোনাদিদির সঙ্গে দেখা! মোটর থামিবার

শব্দে তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এ কি, শঙ্করবাবু, আবার ফিরলেন যে? আমি ভাবলাম, জামাই-বাবু বুঝি ফিরে এলেন স্টেশন থেকে।

প্রফেসার মিত্র বাড়িতে নেই নাকি?

না, তিনি বন্ধুদের স্টেশনে তুলে দিতে গেছেন। আপনি এলেন যে আবার?

শঙ্কর বলিল, চলুন, ফিল্‌মটা দেখে আসি।

সোনাদিদির মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন এমনই কিছু একটা তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন। মুখে কিন্তু সে কথা বলিলেন না। একটু ফিক করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, এই না তখন বললেন, হস্টেলের ছুটি পাওয়া যাবে না?

শঙ্কর কিছু না বলিয়া হাসিমুখে শুধু চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনি একটু বসুন তা হ'লে, ওদের খবর দিই আমি।

সোনাদিদি ভিতরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর নিকটস্থ সোফাটায় বসিয়া পড়িল। তাহার রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল।

ম্যান, উওম্যান, ম্যারেজ।

অদ্ভুত ছবি!

আদিম অসভ্য মানব-মানবী হইতে শুরু করিয়া মানব-সভ্যতার প্রতি স্তরে নর-নারীর প্রেমলীলা নানা বর্ণে অপূর্ব শিল্পসম্পদে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। এক পাশে রিনি, এক পাশে সোনাদিদি। রিনির পাশে মিষ্টিদিদি বসিয়া ছিলেন। রিনির হাত মিষ্টিদিদির হাতের মধ্যে ছিল। ছবি দেখিতে দেখিতে

অজ্ঞাতসারে রিনির হাতখানা মিষ্টিদিদি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন, এত জোরে—যেন নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চান। রিনি কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

সলজ্জ রিনি কোন উত্তর দিল না।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ও কিছু নয়।

ছবি চলিতে লাগিল। রোমের দৃশ্য। সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় রোম তাহার অতুল ঐশ্বর্য দুই হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ছড়াইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না। বিলাস-সজ্জার প্রধান উপকরণ নারী নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, লাবণ্যময়ী জ্বলন্ত-যৌবনা রূপসীর দল সবল-পেশী বলিষ্ঠ-দেহ পুরুষদের দৃপ্ত মহিমার নিকট নিজেদের বিলাইয়া দিয়া হাসিকান্নার ক্ষিপ্র স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ ক্রীতদাসী, কেহ সম্রাজ্ঞী। শঙ্কর অনুভব করিল, তাহার দক্ষিণ জানুটায় কিসের যেন চাপ লাগিতেছে। যদিও সে বুঝিতেছিল ইহা কিসের চাপ, তথাপি সে ভাল করিয়া একবার দেখিল, হ্যাঁ, সোনাদিদির জানুটাই এদিকে একটু বেশি সরিয়া আসিয়াছে যেন। সোনাদিদি একেবারে আত্মহারা হইয়া ছবি দেখিতেছেন। শঙ্কর একটু সরিয়া বসিল, সরিয়া বসিতে গিয়া আবার রিনির গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। রিনি সলজ্জভাবে একটু সরিয়া বসিল। ছবি চলিতে লাগিল।

ইণ্টারভ্যাল।

চতুর্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর দেখিল, মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটি চকচক করিতেছে; সোনাদিদি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন; রিনি সাধারণতই একটু স্থিরস্বভাব, ছবি দেখিয়া সে আরও গম্ভীর হইয়া

গিয়াছে। শঙ্কর নিজেও কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল। সোনাদিদির বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, একটু চা খেলে হ'ত। রিনি খাবি?

রিনি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাহিরে যাইতে যাইতে শঙ্করের হঠাৎ চোখে পড়িল যে, প্রথম শ্রেণীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গৈরিকধারী ভন্টুর মেজকাকাও বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, চেহারার বেশ পরিবর্তন হইয়াছে। শঙ্করকেও মেজকাকা দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া চায়ের ফরমাশ দিতে দিতে আচম্বিতে মনে পড়িল, তাহার যে আজ ভন্টুর সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাওয়ার কথা মেজকাকার চাকুরির জন্য। হাতঘড়িটা দেখিল, দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনও ভন্টু নিশ্চয় তাহার জন্য হস্টেলে বসিয়া নাই। এতরাত্রে হস্টেলে ফিরিয়াই বা সে কি জবাবদিহি করিবে? কানাইটা কি ভাবিবে, কে জানে! তাহাদের ব্লকের মনিটার রামকিশোরবাবু লোকটিও ভরসা করিবার মত নহেন। যে স্বপ্নলোকে সে বিচরণ করিতেছিল, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাহা চুরমার হইয়া গেল। কবিতার যে দুইটি লাইন মনের নিভৃত কোণে গুঞ্জন তুলিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।...একটি ট্রেতে তিন পেয়ালা চা লইয়া একটি খানসামা এ[illegible] পরেই মিষ্টিদিদির সম্মুখীন হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আসিল, তাহার হস্তে একটি প্রকাণ্ড ঠোঙায় ডালমুট।

ইণ্টারভ্যাল শেষ হইল।

আবার ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। শঙ্করের কিন্তু মনের সুর কাটিয়া গিয়াছিল। এই যৌবনমত্ত নর-নারীদের নর্তন-কুর্দন আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার মনে হইতেছিল, ভন্টু হয়তো আপিস হইতে ফিরিয়া তাহার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

ভন্‌টুর বউদিদির মুখখানিও তাহার মনে পড়িল, দারিদ্র্য-নিপীড়িতা—মুখের হাসিটি কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। সোনাদিদিকে চুপিচুপি বলিল, আমি বাইরে থেকে এখুনি আসছি, আপনারা দেখুন।

সে বাহিরে আসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, বিশ্বাসযোগ্য চেনা-শোনা কাহাকেও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই তিনটি নারীকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া সে ভন্‌টুর খোঁজে বাহির হইবে।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, অপূর্ববাবু বারান্দার এক ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞসা করিল, আপনিও ছবি দেখতে এসেছেন দেখছি!

অপূর্ববাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, এইমাত্র এলাম আমি। টুইশনি থেকে ছুটি পেতেই বড্ড দেরি হয়ে গেল, তার ওপর ওঁদের ওখানে গিয়ে দেখি, ওঁরা সব চ'লে এসেছেন এখানে, রাস্তায় ট্রামটাও এমন আটকে গেল—ভাবছি, এখন টিকেট কিনে আর ঢোকাটা কি ঠিক হবে?

শঙ্কর বলিল, না, এখন আর ঢুকে কি হবে? ছবি তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

শঙ্কর আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অপূর্ববাবুকে দেখিয়া সে মুহূর্ত মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল যে, ভন্‌টুর খোঁজে যাওয়াটা এখন বৃথা। অপূর্ববাবু অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবুর অনেক খোশামোদ করিয়া চায়ের নিমন্ত্রণটা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু মিস বেলার নিকট হইতে ছাড়া পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল। তা ছাড়া ট্রামটা···

সিনেমা শেষ হইল প্রায় রাত্রি বারোটায়।

ট্যাক্সি করিয়া শঙ্কর যখন মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি ও রিনিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, তখন প্রফেসার মিত্র ফিরিয়াছেন। রিনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, দাদা এখনও লাইব্রেরিতে রয়েছেন, আলো জ্বলছে।

শঙ্করের মনে একটু শঙ্কা ছিল, হয়তো প্রফেসার মিত্র রাগ করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ ভাবে সকলে মিলিয়া সিনেমায় যাওয়াটা শঙ্করের নিজের কাছেই একটু খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু শঙ্করের শঙ্কা শীঘ্রই অপসারিত হইল। মোটরের শব্দে প্রফেসার মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং নাক হইতে চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন, ও, শঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমরা গিয়েছিলে! আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, অপূর্ব বুঝি এই হুজুক তুলেছে। কিন্তু তোমরা চ'লে যাওয়ার একটু পরেই অপূর্বও এসে হাজির, তখন বেয়ারাটা বললে যে, তোমরা শঙ্করবাবুর সঙ্গে গেছ।—বলিয়া তিনি মোটা বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বিকশিত দন্তপাঁতিকে আরও বিকশিত করিয়া বলিলেন, কেমন ছবিটা?

সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, ছবিখানি সুন্দর।

প্রফেসার মিত্র তখন শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি এখন কোথায় ফিরবে?

হস্টেলে।

শঙ্কর তাহার হস্টেলের নামটাও বলিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখন ওঁকে উদ্ধার কর, উনি হস্টেল থেকে ছুটি না নিয়েই চ'লে এসেছেন।

মিত্র মহাশয়ের চোখে ক্ষণিকের জন্য একটা কৌতুকদীপ্তি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। ভালমানুষের মত হাসিয়া তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ফোনে ব'লে দেব আমি।

রিনি উপরে চলিয়া গেল।

প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা সব শুয়ে পড় গিয়ে। আমার শুতে আজও রাত হবে; শেলির উপরে ক্রিটিসিজ্‌মের এ বইখানা ভারি চমৎকার লিখেছে, শেষ না ক'রে শোব না।

মুচকি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, দেখবেন, কালকের মত আবার ঈজি-চেয়ারে শুয়েই ঘুমিয়ে থাকবেন না যেন।

প্রফেসার মিত্রের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসছেন কবে?

আসব একদিন।

শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায়-জনহীন রাজপথ দিয়া শঙ্কর একাকী হাঁটিয়া চলিয়াছে। কলিকাতা নগরী নিদ্রাচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে ইলেক্‌ট্রিক-বাতিগুলি শূন্য পথটিকে আলোকিত করিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছে। সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দ্বিতল-কক্ষে সহসা একটা নীল আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাচের জানালা দিয়া অস্পষ্ট দেখা গেল, সেই নীলালোকিত আবেষ্টনীতে দুইটি মূর্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার পিচ-ঢালা রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হইতেছে। আর একটু গেলেই যেন জটিল জটাজূটধারী বটবৃক্ষের দেখা পাওয়া যাইবে, এবং তাহার শাখায় রূপকথার বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য কোন অপরূপ বার্তা লইয়া বসিয়া আছে।

টুং টুং টুং টুং—

একটা রিক্‌শাওয়ালা মন্থরগতিতে বাম দিকের গলিটা হইতে বাহির হইল। শঙ্কর রূপকথার রাজ্য হইতে সহসা আমহার্স্ট স্ট্রীটের ফুটপাথে নামিয়া আসিল।

৫

ঝামাপুকুরের একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ছোট বাড়ি। সেই বাড়ির বাহিরের ঘরে একটি চৌকির উপর বসিয়া গভীর মনোনিবেশ-সহকারে এক ব্যক্তি কোষ্ঠী বিচার করিতেছিলেন। বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সম্মুখেই বোতলের মুখে গোঁজা একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি। ঘরটির মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। চৌকিটির কাছে একটি শ্রীহীন কাঠের টেবিল এবং ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারি। আলমারির কবাট দুইটি খোলা রহিয়াছে। আলমারিতে বই ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই। বইও নানারকম। অধিকাংশ অবশ্য পুরাতন পঞ্জিকা, কিন্তু অন্য নানাপ্রকার পুস্তকেরও অভাব নাই। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শেক্সপীয়ারের একখানা নাটক, প্যারাডাইস লস্ট, ক্যাল্‌কুলাস, অ্যাস্ট্রনমি, ঘোড়দৌড় বিষয়ক দুই-চারখানি পুস্তক, ছবির অ্যাল্‌বাম প্রভৃতি নানাজাতীয় বহি অগোছালোভাবে আলমারিটিতে ঠাসা রহিয়াছে। আলমারির ঠিক নীচেই মেঝের উপরও দুই-একখানা বই পড়িয়া আছে। মেঝের উপর অসংখ্য সিগারেট ও বিড়ির টুকরা ছড়ানো। টেবিলের উপর খানকয়েক বিলাতী মাসিকপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং রহিয়াছে এক বোতল মদ ও তাহার পার্শে কাচের একটি গ্লাস। গ্লাসটিও ফাটা। তক্তাপোশটি নিতান্ত ছোট নয়—বেশ প্রশস্ত। তক্তাপোশের উপর কোষ্ঠী-বিচারক ব্যতীত আর একজন ছিল। সে ওপাশে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; এত ঘুমাইতেছিল যে, তাহার নাক ডাকিতেছিল।

বেশ জোরেই ডাকিতেছিল, কিন্তু এই নাসিকাগর্জন সত্ত্বেও কোষ্ঠী-বিচারক নিবিষ্ট মনে আপন কার্য করিয়া যাইতেছিলেন।

কোষ্ঠী-বিচারকের নাম করালীচরণ বক্সি। ভদ্রলোকের চেহারা এমন যে, দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশ, শীর্ণ লম্বা দেহ। একটি চক্ষু কানা, অপরটি একটু বেশি-রকম প্রদীপ্ত, যেন দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। চিবুকটা সূচালো এবং বক্রভাবে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তাহা সূক্ষ্মাগ্র সুবৃহৎ নাসাটার অনুকরণ করিতেছে। মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট। বসন্তরোগেই একটি চক্ষু তাঁহার গিয়াছে। সমস্ত মুখে কোন রোম নাই। শ্মশ্রু গুম্ফ তো নাইই, ভ্রূরও অভাব। অত্যধিক সুরাপানের ফলে ঠোঁট দুইটি হাজিয়া গিয়াছে। করালীচরণ বক্সিকে সকলেই ভয় পায়, কিন্তু অনেকেই তাঁহার কাছে আসে ; তাহার কারণ, মন দিয়া গণনা করিলে তাঁহার গণনা নাকি একেবারে নির্ভুল। জ্যোতিষশাস্ত্রে এতবড় গুণী লোক সচরাচর নাকি দেখা যায় না।

পাশের বাড়ির একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাইয়া বক্সি মহাশয় সিগারেটটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গিয়া টেবিল হইতে মদের বোতল তুলিয়া লইয়া গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন এবং নির্জলাই সেটুক পান করিয়া ফেলিলেন। বিকৃত মুখটা র‍্যাপার দিয়া মুছিতে মুছিতেই তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন এবং নিপুণভাবে সেটি ধরাইয়া স্বস্থানে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। একটি পুরাতন পঞ্জিকা খোলা অবস্থাতেই কাছে পড়িয়া ছিল। সেটি হইতে একটি খাতায় তিনি নানারূপ অঙ্ক টুকিতে শুরু করিলেন। টুকিতে টুকিতে তাঁহার চোখে বিচিত্র এক কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ কোষ্ঠীখানি আরও খানিকটা প্রসারিত করিয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন তিনি

দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্রায়িত চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত হইলেই করালীচরণের চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, অধরোষ্ঠ দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ কোষ্ঠীখানির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর নীরব হাস্যে করালীচরণের মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ কোষ্ঠীখানির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আবার তিনি উঠিলেন, বোতলটা হইতে আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা অবশিষ্ট আছে। তাহার পর হঠাৎ তিনি ডাকিলেন, ভন্টুবাবু, উঠুন, কত ঘুমুবেন?

চেরা বাজখাঁই আওয়াজ।

ভন্টুর নাসিকাগর্জন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। পায়ের পাতাটা মৃদু মৃদু নাচাইতে নাচাইতে ভন্টু বলিল, না, আমি ঘুমুই নি তো।

কর্কশকণ্ঠে হাস্য করিয়া করালীচরণ বলিলেন, কি করা হচ্ছিল তা হ'লে এতক্ষণ? বাই নারায়ণ, এর নাম যদি ঘুম না হয়, তা হ'লে—

ভন্টু উঠিয়া হাই তুলিয়া বলিল, থিঙ্ক্ করছিলাম।

করালীচরণ এই কথায় অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল, শুষ্ক শক্ত কাষ্ঠখণ্ডে কে যেন করাত চালাইতেছে।

ভন্টু বলিল, লদ্‌কালদ্‌কি রাখুন, কুষ্ঠির কি হ'ল?

দুটো কুষ্ঠিই দেখেছি।

দাদারটা কি রকম দেখলেন?

ভালই, কোন ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন। আপনার এই বন্ধুর কুষ্ঠি কিন্তু ভয়ানক—বাই নারায়ণ।

শঙ্করের? কেন?

উত্তরে করালীচরণ চিবুকটি একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিলেন এবং একমাত্র চক্ষুটির তীব্র দৃষ্টি ভন্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এর বেশি এখন আর কিছু বলব না।

ভন্টু আর একবার হাই তুলিয়া বলিল, কি দেখলেন?

করালীচরণ নীরবে হাসিতেই লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। ভন্টু হাসিমুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ করালীচরণ উঠিয়া টেবিল হইতে মদের বোতলটা তুলিয়া লইলেন এবং বোতলে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বিকৃত মুখে বলিলেন, শেষ হয়ে গেল। পকেটও আজ একদম খালি। কিছু দেবেন নাকি ভন্টুবাবু?

ভন্টু দ্বিরুক্তি না করিয়া বুক-পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া করালীচরণের হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল, আমার যথাসর্বস্ব দিচ্ছি। কালকের বাজার করবার জন্যে কিছু রেখে বাকি সবটা আপনি নিয়ে নিন।

করালীচরণ সাগ্রহে ব্যাগটি খুলিয়া মোমবাতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যাগটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া ধরিলেন। একটি সিকি ও দুইটি পয়সা বাহির হইল।

করালীচরণ ভন্টুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কত চাই আপনার বাজারের জন্যে?

যা দেবেন।

দু আনায় হবে?

হবে।

যান, তা হ'লে এই সিকিটা ভাঙিয়ে দু আনার সিগারেট আনুন, আর বাকি দু আনা আপনি নিয়ে নিন

কোন্ সিগারেট আনব?

যা খুশি।

করালীচরণ প্যাকেট হইতে শেষ সিগারেটটি বাহির করিয়া ভন্‌টুর দিকে পিছন ফিরিয়া সেটি ধরাইতে লাগিলেন। সেই সুযোগে ভন্‌টু পিছন হইতে নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া করালীচরণকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। করালীচরণ সিগারেট ধরানো শেষ করিয়া বাকি পয়সা দুইটিও ভন্‌টুর হাতে দিয়া বলিলেন, এ দুটোও নিয়ে যান, একটা ছোট পাঁউরুটি কিনে আনবেন।

দিন।

ভন্‌টু বাহির হইয়া গেল।

ভন্‌টু চলিয়া গেলে করালীচরণ বাম হস্তে জ্বলন্ত সিগারেটটি ধরিয়া নিজের দক্ষিণ করতলটি নির্বাপিতপ্রায় মোমবাতিটির আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সহসা তাঁহার নজরে পড়িল, মোমবাতিটি আর বেশিক্ষণ টিকিবে না। আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দু-একটা মোমবাতি আনতে বললে ঠিক হ'ত। যাই নারায়ণ, হাতে একদম কিছু নেই আজ।

নির্বাণোন্মুখ শিখাটি কাঁপিতে লাগিল। একচক্ষু মেলিয়া করালীচরণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ক্যাঁচ করিয়া একটা মোটর বাহিরে থামিল।

করালীবাবু বাড়ি আছেন ?

আছি।

করালীচরণ বাহিরে গেলেন। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। মোটরের ভিতর একজন মোটা-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পাশে আর একজন যিনি ছিলেন, করালীবাবু আসিতেই তিনি নামিয়া আসিলেন এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন,

আপনার নামই কি করালীচরণ বক্‌সি? রেস সম্বন্ধে আপনিই কি গণনা করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শাল্‌কের পরেশবাবুকে কি আপনিই গণনা ক'রে দিয়েছিলেন? তাঁর কাছে আপনার নাম শুনে আমরা এসেছি।

কি দরকার?

গোনাতে চাই।

করালীচরণ একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, আমার কাছে গোনাতে হ'লে পঞ্চাশ টাকা লাগে। আপনাদের নির্ধারিত ব'লে দেব, রেস খেলে জিতবেন কি না।

মোটরে উপবিষ্ট স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এবার নামিয়া আসিলেন। ভদ্রলোক স্থূলকায় হইলেও অল্পবয়স্ক, মুখখানি নিতান্ত কচি। কচি মুখটিতেই বিজ্ঞতার ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, আপনার দক্ষিণা নিশ্চয়ই দেব। তবে আমরা হলাম মধ্যবিত্ত লোক, ঠকতেও চাই না, ঠকাতেও চাই না।

করালীচরণ তাঁহার এক চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন, যেন কোন মহারাজা কোন গরিব প্রজার নিবেদন শুনিতেছেন।

আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকি, তবে কাউকে পীড়ন করতে আমি চাই না। যা সাধ্যে কুলোয় দেবেন, দর-কষাকষি করা আমার স্বভাব না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন, এবং বলিলেন, এই আমার প্রথম কাজ আপনার সঙ্গে, যদি পরস্পর প'টে যায়, টাকার জন্যে আটকাবে না।

আচ্ছা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নোট দুইটি লইয়া তাঁহার ছিন্ন জামার পকেটে রাখিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, কাল সকালে আসবেন তা হ'লে, আজ এত রাত্রে হবে না।

নোট দুইটি এভাবে করালীচরণের পকেটে অগ্রিম চলিয়া গেল দেখিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মনে মনে বোধ হয় একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাজটা আজ রাত্রেই মিটে গেলে ভাল হ'ত না?

করালীচরণ উত্তর দিলেন, আজ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নোট দুইখানি ফেরত দিয়া বলিলেন, কালও আর আসবার দরকার নেই আপনার। আপনার কাজ আমি করব না। আমার ওপর যখন বিশ্বাসই নেই, তখন আমার কাছে আসাই আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে। বাই নারায়ণ, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না।

সে কি কথা—সে কি কথা!

ত্রস্ত হইয়া উভয় ভদ্রলোকই আগাইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোক নোট দুইটি করালীচরণের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, রাগ করবেন না করালীবাবু, টাকাটা রাখুন। বেশ, কাল সকালেই হবে। কখন আসব, বলুন?

করালীচরণ বক্সি কখনও কাউকে কথা দেয় নি আজ পর্যন্ত। কাল সকালে দশটার ভেতর আসবেন, যদি বাড়িতে থাকি এবং মেজাজ ঠিক থাকে, দেখা হবে।

স্থূলকায় ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আড়াল হইতে চোখের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, আচ্ছা, বেশ বেশ, তাই হবে। কাল সকালেই আসব এখন। আচ্ছা, চলি তবে, নমস্কার।

তাই আসবেন, নমস্কার।

মোটরকার চলিয়া গেল। মোটরখানার দিকে তাকাইয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, শ্‌শালা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভন্টু আসিয়া পড়িল। পাউরুটিটা করালীবাবুর হাতে দিয়া ভন্টু বলিল, দু আনায় হাতী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

করালীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ভন্টুর হস্তে নোট দুইখানি দিয়া বলিলেন, এই নিন। হাতী ফেরত দিয়ে আসুন। এক টিন নাইন নাইন নাইন আর এক বোতল হুইস্কি চট ক'রে এনে দিয়ে যান। আপনার পয়সাটাও ফেরত নিয়ে নেবেন, নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম ব'লেই আপনার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, বাই নারায়ণ।

ভন্টু চট করিয়া হেঁট হইয়া করালীচরণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। করালীচরণ একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, আঃ, কি যে করেন আপনি রোজ!

ভন্টু হাত জোড় করিয়া কহিল, এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না দাদা।

করালীচরণ বলিলেন, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়াটা সত্যিই আমার উচিত নয়। আমার বসন্তরোগে আপনি যে সেবাটা করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। নৈহাটি স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা না হ'লে ম'রেই যেতাম আমি, বাই নারায়ণ। সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

ভন্টু আবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

করালীচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, যান, দেরি হয়ে গেছে চিৎপুর অঞ্চলে না গেলে মাল পাবেন না।

ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা পেলেন কোথা থেকে হঠাৎ?

করালীচরণের প্রদীপ্ত চক্ষুটি টর্চের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এসেছিল তু শালা।

ভন্টু আবার বাইকে চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িল।

ভন্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শুকনা পাঁউরুটিটা কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে রুটিটা শেষ হইয়া গেল। জল খাইবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া করালীচরণ দেখিলেন যে, মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। এবারও ভন্টুকে মোমবাতি আনিতে বলা হইল না—বাই নারায়ণ!

স্বল্পালোকিত গলিটির মধ্যে তৃষ্ণার্ত করালীচরণ একা একা প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। করালীচরণের পৃথিবীতে আপনার জন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই জীর্ণ বাড়িখানা। বিধবা মা কাশীতে ছিলেন, সেদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মা-ই বহুকষ্টে করালীচরণকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার কথা করালীচরণের মনেও পড়ে না। বাল্যকাল হইতে যতদূর মনে পড়ে, সবই মা। করালী একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কিন্তু এ কথা আজ কেহ জানে না। করালীচরণও ইহা কাহাকেও বলেন না। আধুনিক পরিচিত-মহলে করালীচরণ বকৃসি বুদ্ধিমান জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত। কেহ বলে, লোকটা পাগল; কেহ বলে, পণ্ডিত; কেহ বলে, শয়তান।

ভন্টু সেদিন রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বউদিদি জাগিয়া ছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উঃ, কত রাত তুমি করলে ঠাকুরপো?

ঘোর কেতুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বাইকটা একটু ধর তো।

ভন্টু বাইকটা দুই হাতে ধরিয়া বউদিদির সাহায্যে সেটা বারান্দার উপর তুলিয়া ফেলিল।

তোমার দাদার কুষ্ঠিটা নিয়ে গিয়েছিলে নাকি জ্যোতিষীর কাছে?

হ্যাঁ, কেতুশ্রেষ্ঠ করালীই তো ডোবালে আজ। বিরাট কৈতুকী অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম।

বউদিদির কোলের ছেলেটা ঘরের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। বউদিদি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন ও ছেলেটাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বললেন দেখে, কোনও ভয় নেই তো?

না।

বউদিদি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না তো? লুকিও না, লক্ষ্মীটি।

ইহার উত্তরে নেপথ্য হইতে ভন্টু ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া বউদিদিকে ভ্যাংচাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোনও উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভন্টু মুখটা বিকৃত করিয়া রাখিয়া বলিল, বাইরে এস।

বউদিদি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

লদ্‌কালদ্‌কি রেখে এখন খেতে দাও।

খাবার তো ঢাকা রয়েছে ওই সামনেই, দেখতে পাচ্ছ না?

আর একটা থালায় কার খাবার?

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, আমিও এখনও খাই নি

ভন্টু আর একবার মুখবিকৃতি করিয়া ভ্যাংচাইল।

আহা, মুখ করা হচ্ছে দেখ না!

ভন্‌টু হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। বউদিদি বাতিটা একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যোতিষীর নাম করালীচরণ! কি অদ্ভুত নাম গো!

সেই কানা করালী।

ও, সেই যাকে তুমি নৈহাটি স্টেশন থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে? খুব ভাল জ্যোতিষী?

অসাধারণ—চাম লদ্‌।

উভয়ে খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে বউদিদি হঠাৎ বলিলেন, ওহো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, শঙ্কর-ঠাকুরপো এসেছিল, রাত বারোটার পর।

ভন্‌টু বলিল, চোর কোথাকার! সমস্ত সন্ধ্যেটা আমার মাটি ক'রে দিয়ে রাত বারোটার পর আসা হয়েছে! কিছু ব'লে গেছে নাকি?

একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

কোথায় চিঠি?

বউদিদি এঁটো হাতেই উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি পত্র আনিয়া ভন্‌টুর হাতে দিলেন। ক্ষুদ্র পত্র।—

> ভাই ভন্‌টু, সন্ধ্যের সময় এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম। কাল সকালে উঠেই বোস সায়েবের ওখানে যাব। তুই বিকেলে আসিস।
>
> —শঙ্কর

ভন্‌টু পুনরায় বলিল, চোর কোথাকার!

কিছুক্ষণ পরে ভন্‌টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজীর খবর কি?

বাবাজী আজ সিনেমা দেখতে গেছে, কে কে সব ডাকতে এসেছিল যেন, কোথায় নেমন্তন্ন আছে; ব'লে গেছে, সকালে ফিরবে।

পাশের ঘরে খুটখুট করিয়া আওয়াজ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

দেশলাই-কাঠি জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল। বাবু উঠিয়া তামাক সাজিতেছেন। একটু পরেই দরাজ গলায় কাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বড়বউমা, উঠেছ নাকি? চা চড়াও তা হ'লে।

বউদিদি হাস্য-দীপ্ত চক্ষে ভন্টুর পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি স্টোভটা ধরিয়ে দিয়ে শোও ঠাকুরপো। আমি ও ভাল ধরাতে পারি না, বড্ড তেল উঠে পড়ে। তোমাকে ব'লে ব'লে হেরে গেছি, কিছুতেই তুমি ওটা সারিয়ে আনলে না।

ভন্টু উত্তরে কিছু না বলিয়া বউদিদির পাত হইতে মাছের একটা কাঁটা তুলিয়া লইয়া চিবাইতে লাগিল।

বাঃ, ওটা আমি চিবোব ব'লে আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছি, বেশ তো তুমি!

ভন্টু বলিল, খুজবুজ।

৬

সেদিন সকালে শঙ্কর যখন বোস সাহেবের বাড়ি গেল, তখন সবে সাতটা বাজিয়াছে।

বোস সাহেব লোকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—তিনি রেলে চাকুরি করেন, শঙ্করের বাল্যসখী শৈলর স্বামী এবং সাহেবী-ভাবাপন্ন। সাহেবিয়ানার নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব সারবান মতামত আছে এবং সেই মতামতগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। বোস সাহেব বাড়িতেও সাহেবী পোশাক পরিধান করিয়া থাকেন, আহারাদিও সাহেবী কেতায় টেবিল-চেয়ার-প্লেট-কাঁটা-চামচ-সহযোগে সম্পন্ন হয়। তাঁহার খাস বাবুর্চি তাঁহার জন্য বাহিরে পৃথকভাবে সাহেবী খানা প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার আহারাদি বাহিরের

ঘরেই নিষ্পন্ন হয়। বোস সাহেবের অন্দর-মহলের সহিত সম্পর্ক কম। তাঁহার নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি তিনি বাহিরের ঘরে বিভিন্ন আলমারিতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন। স্নান করিবার সময় সাবান বা জামা পরিবার সময় বোতামের জন্য হাঁকাহাঁকি করিয়া তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা পছন্দ করেন না। এ সকল বিষয়ে তিনি স্বাবলম্বী ও স্বাধীন।

শঙ্কর গিয়া শুনিল, তিনি প্রাতরাশে বসিয়াছেন। বাহিরে দণ্ডায়মান চাপরাসীর মারফৎ নিজের আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করিতেই বোস সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বোস সাহেবের ধপধপে ফরসা রঙ। শক্ত কফ-কলারওয়ালা ঘোর নীল রঙের শার্টটি তাঁহাকে মানাইয়াছিল ভাল। কোলের উপর একটি সাদা ন্যাপ্‌কিন প্রসারিত, খাবার পড়িয়া পরিচ্ছদ যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, এই যে, এত সকালে কি মনে ক'রে? বসুন, বসুন।

তাঁহার প্রত্যেক কথাটি প্রয়োজন মাফিক ওজন করা। এত কৃত্রিমতাপূর্ণ যে, মনে হয়, যেন প্রত্যেক কথাটি কহিবার পূর্বে সেগুলির মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছেন। পুনরায় স্মিতমুখে বলিলেন, বসুন না ওই সামনের চেয়ারটাতে।

আসন গ্রহণ করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে।

অর্থাৎ?

পাঁউরুটির একখানা টোস্ট বাঁ হাতে ধরিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে বোস সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অর্থাৎ ভন্টুর মেজকাকার জন্যে এসেছি। পারেন তো তাঁর চাকরিটা আবার ক'রে দিন। বেচারীদের বড় কষ্ট। ভন্টুকে সংসারের জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে।

এই বলিয়া শঙ্কর ভন্‌টুদের দুর্দশা, ভন্‌টুর দাদার অসুখ প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনা করিয়া বোস সাহেবের করুণা উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইল। ভন্‌টুর মেজকাকার কথা শুনিয়া বোস সাহেব চা-পাউরুটি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, এক্‌স্‌কিউজ মি, হি ইজ এ হোপ্‌লেস চ্যাপ।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

তাহার পর বোস সাহেব বলিলেন, নিন, এক কাপ চা খান।—বলিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে একটি পেয়ালা বাহির করিলেন এবং টী-পট হইতে চা ঢালিয়া শঙ্করকে দিলেন।

আর কিছু খাবেন? টোস্ট্‌, কি বিস্কুট? ডিম খাবেন?

না।

শঙ্কর নীরবে চা-পান করিতে লাগিল।

একটি হাফ-বয়েল্ড্‌ ডিম নিপুণভাবে ভাঙিতে ভাঙিতে বোস সাহেব বলিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, পার্‌সোনালি স্পিকিং, ভন্‌টুর মেজকাকার মত লোকের ওপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। আই উড লাইক টু কিক আউট সাচ ফেলোজ ফ্রম মাই অফিস। আই অ্যাম স্পিকিং ফ্র্যাঙ্ক্‌লি, এক্‌স্‌কিউজ মি।—বলিয়া তিনি সাহেবী কায়দায় স্কন্ধযুগলকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইলেন।

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল।

বোস সাহেব আবার বলিলেন, আপনাকে আমি যতদূর জানি, তাতে ওরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের ওপর সিম্‌প্যাথি হওয়ার কথা তো নয় আপনার!

শঙ্কর চায়ে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিল এবং বলিল, সত্যিকার সিম্‌প্যাথি হতভাগাদেরই ওপর হওয়া উচিত।

বাধা দিয়া বোস সাহেব বলিলেন, এ তো হতভাগ্য টাইপ নয়, এ একটা 'রোগ'।

বিশেষ তফাত তো চোখে পড়ছে না।—বলিয়া শঙ্কর একটু মিনতির কণ্ঠেই বলিল, আমার নিজের বড্ড কষ্ট হয় ভন্টুটার জন্যে। ওদের বাড়ির সব অবস্থা জানি কিনা আমি, ওর দাদা হাফ-পে-তে ছুটি নিয়ে চলে গেছেন—সংসার চলা দায়। আপনি যদি ভন্টুর মেজকাকার চাকরিটা ক'রে দেন, তা হ'লে ভন্টুর লেখাপড়াটা হয়।

এই বলিয়া সে নীরব হইল। যদিও পরের জন্য, তথাপি ইহা লইয়া আর বেশি অনুরোধ করিতে শঙ্করের কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাহার কেমন যেন সহসা মনে হইল, নিজের উচ্চ-পদের সুযোগ লইয়া বোস সাহেব যেন তাহাকে একটু কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মনে হইবামাত্র শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। বোস সাহেব বলিলেন, এখন দেবার মত কোন চাকরিও আমার হাতে নেই।

শঙ্কর নীরবেই রহিল। তাহার পর সহসা বলিল, আমার যা বলবার তা তো বললাম, এখন আপনার যদি কিছু করবার থাকে করুন।

বোস সাহেব আর এক পেয়ালা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, কিছুদিন পরে একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ক'রে কতকগুলি লোক নেওয়ার কথা আছে। ভন্টুর মেজকাকাকে বলুন না তাতেই অ্যাপ্লাই করতে। আই মে সিলেক্ট্ হিম, লেট হিম্ টেক এ চান্স্।

আচ্ছা, বলব তাই। ধন্যবাদ। চলি তা হ'লে। নমস্কার।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। দ্বারের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বাচ্চা-গোছের একটা চাকর ভিতর দিক হইতে আসিয়া বলিল, মাঈজী একবার ডাকছেন আপনাকে ভেতরে।

এখন আমার সময় নেই, পরে আসব।

অকারণে রাগ করিয়া শঙ্কর প্রস্থান করিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রতীক্ষমানা শৈল চাকরের মুখে এই বার্তা শুনিয়া সামান্য একটু জ্রকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ও, আচ্ছা।

৭

নির্দিষ্ট সময়ে ভন্টু আসিয়া হাজির হইল।

তাহার সহিত দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, পাতলা, ছিপছিপে আর একটি ভদ্রলোকও ছিলেন। শঙ্কর ইঁহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই। দেখিবা-মাত্র কিন্তু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রশান্ত উন্নত ললাট, ধপধপে ফরসা রঙ। মাথার চুলগুলা পর্যন্ত ঈষৎ কটা। দেখিলেই মনে হয়, যেন একটা শিখা। ভন্টু পরিচয় করাইয়া দিল।

ইনি হচ্ছেন ক্যান্‌ড্‌ল অর্থাৎ মোমবাতি। আর ইনি হচ্ছেন চাম লদ্, চাম গ্যান্‌টঅ বলতে পার।

শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, মোমবাতি ?

আগন্তুক ভদ্রলোক মৃদুহাস্যসহকারে বলিল, ভন্টুর কথা ছেড়ে দিন, মোমবাতি আমার নাম নয়, আমার নাম মৃন্ময়—মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়।

ভন্টু অকারণে মুখবিকৃতি করিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

শঙ্কর বলিল, অমন ক'রে তাকাচ্ছিস কেন ? গাধা কোথাকার !

ভন্টুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পর মৃন্ময়কে বলিল, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমার এখানে দেরি হবে এখন একটু। না হয় ব'স্, একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক।

মৃন্ময় হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, না, আমায় যেতে হবে, এমনিই দেরি হয়ে গেছে দেখছি।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি যাই তা হ'লে। পরে আলাপ হবে। আপনার নামটা নিশ্চয়ই চাম লদ্ নয়—

ভন্‌টু পুনরায় মুখবিকৃতি করিল।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, না, আমার নাম শঙ্করসেবক রায়।

আচ্ছা, নমস্কার।

মোমবাতি চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের! যেন জ্বলছে।

ওইজন্যেই তো ওর নাম আমরা দিয়েছি মোমবাতি। সাংঘাতিক চাম গ্যান্‌ঢঅ—

এমন সময় হস্টেলের চাকরটা কিছু জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর বলিল, তুই আপিস থেকে আসছিস তো? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব? নে, খা।

ভন্‌টু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া শঙ্করের পায়ের ধুলা লইয়া ফেলিল। শঙ্কর পা-টা সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, চা খাবি, না, কোকো?

ভন্‌টু সোৎসাহে বলিল, দুইই খাব।

চাকরটা খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শঙ্কর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, দু কাপ চা আর এক কাপ কোকো দিয়ে যা চট ক'রে।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

ভন্‌টু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

সিঙাড়ায় একটা কামড় দিয়া ভন্‌টু বলিল, বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্‌ল করলি, বল্‌ সব। বোস সায়েবের ওখানে গিয়েছিলি? হ'ল কিছু?

পরে বলব এখন, অনেক কথা আছে।

মার্সে?

শঙ্কর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় 'শঙ্করদা, আপনিই বলুন তো, ট্র্যাজেডি বড়, না কমেডি বড়' বলিয়া একটি

ছোকরা চটি ফটফট করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন। উভয়েরই হস্তে চায়ের পেয়ালা।

হস্টেলে শঙ্করের একটি দল আছে। যুবকদ্বয় সেই দলভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একজন ভন্টুকে দেখিয়া বলিল, এই যে ভন্টুদা, আপনাকে আজকাল কলেজে তো দেখি না!

সিঙাড়া চিবাইতে চিবাইতে ভন্টু উত্তরে শুধু একটু হাসিল।

শঙ্কর বলিল, হঠাৎ এখন ট্র্যাজেডি-কমেডির কথা কেন?

একজন যুবক বলিল, কুমুদবাবু নীচের ঘরে খুব লেক্‌চার ঝাড়ছেন যে, কমেডিই হ'ল শ্রেষ্ঠ জিনিস।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, তাই নাকি?

যুবকটি বলিল, ওঃ, নীচে মহা আস্ফালন লাগিয়েছেন কুমুদবাবু। তিনি বলছেন, ট্র্যাজেডি হচ্ছে নগ্ন সত্য। সাহিত্যে নগ্ন সত্যের স্থান নীচে। সাহিত্যে আমরা চাই আনন্দ—কমেডিই নির্মল আনন্দ দিতে পারে। ট্র্যাজেডি তা পারে না।

শঙ্কর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, কে বললে, পারে না? তবে ট্র্যাজেডির মধ্যে আনন্দ পেতে হ'লে মনটাও সেই রকম হওয়া দরকার। উঁচুদরের রসিক না হ'লে ট্র্যাজেডির রসাস্বাদন করতে পারে না।

আসুন না আপনি একবার নীচে।

ভন্টু, তুই একটু ব'স্—আমি আসছি এক্ষুনি।

শঙ্কর চলিয়া গেল। ভন্টু সাহিত্যরসের ধার ধারে না। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল। ভৃত্য যথাসময়ে চা ও কোকো আনিল। শঙ্কর কুমুদবাবুর ঘরে গিয়াছেন শুনিয়া তাহার চা-টা সেখানেই সে লইয়া গেল।

• • •

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। আসিয়া দেখিল,

ভন্টু অকাতরে ঘুমাইতেছে। জুতাসুদ্ধ পা চেয়ারের হাতলের উপর তুলিয়া দিয়া, গুটানো বিছানা-স্তূপের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া ভন্টু নিদ্রিত। দক্ষিণ বাহু দিয়া মুদিত চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও ভন্টু ঘুমাইতেছে।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা! আপিসের সারাদিন-ব্যাপী হাড়ভাঙা খাটুনিতে বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত ক্লান্ত না হইলে এমন ভাবে কেহ ঘুমাইতে পারে না।

এই ভন্টু, ওঠ্ ওঠ্! ঘুমুচ্ছিস কেন এই অসময়ে?

ভন্টু জুতাসুদ্ধ পা দুইটা মৃদু মৃদু নাচাইতে লাগিল। তাহার পর চোখ হইতে হাতটা সরাইয়া বলিল, ক্ষেপেছিস? ঘুমোব কেন? থিঙ্ক্ করছিলাম।

চল্, বেরনো যাক।

চল্। বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্ল করলি?

চল্, রাস্তায় সব বলছি।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

৮

কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

ভন্টুর মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী খোল বাজাইতেছিলেন। মুদিত নেত্র: তন্ময়, বিহ্বল ভাব। পরিধানে গৈরিক আলখাল্লা, মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন। কীর্তন জমিয়াছিল বাবাজীরই এক বন্ধুর বাড়িতে। তিনি বড়লোক এবং ভন্টুর মেজকাকাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পুরাকালে অর্থাৎ যখন তাঁহার রক্তের তেজ ছিল, তখন এই বাড়িতে এই হলেই বহুবার বাইনাচ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন তাঁহার ধর্মে মতি হইয়াছে এবং ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত প্রকারে

সঙ্গীত-উৎসব করা সঙ্গত, তাহাই তিনি ইদানীং করিতেছেন। অর্থাৎ আসলে ভদ্রলোক সঙ্গীত-অনুরাগী। গীতবাদ্যে পারদর্শিতার জন্যই সম্ভবত তিনি ভন্‌টুর মেজকাকাকে স্নেহ করেন। যাই হোক, কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কীর্তনীয়া পুরুষ হইলেও সুদর্শন ও সুকণ্ঠ। গৌর ললাটে চন্দনের তিলক, গলায় বেলফুলের শুভ্র মালা, পরিধানে পট্টবস্ত্র—ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। সুরসমারোহে সকলেই সম্মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে কীর্তনীয়ার মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন। হলের মধ্যে ভীষণ ভিড়। ভন্‌টু ও শঙ্কর হলের বাহিরে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কীর্তনের সুরে শঙ্করও কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার এক ধারে স্বল্প অন্ধকারে একটি বেঞ্চি পাতা আছে দেখিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে গিয়া তাহারই উপর উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া ভন্‌টু মৃদু হাস্য করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, তুইও ব'সে পড়লি যে রে!

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্‌টু কোন জবাব না পাইয়া হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া পুনরায় বলিল, কি রে, তুইও মদ্‌কে গেলি নাকি?

চুপ কর্, কথা বলিস না।

ভন্‌টু কপাল কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি তা হ'লে ততক্ষণ পেছনের চাকাটায় একটু পাম্প্ ক'রে নিই। এইখানে কার একটা বাইকে পাম্প্ রয়েছে দেখছি, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, কি বলিস?

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

ভন্‌টু গিয়া অসঙ্কোচে নিকটে দেওয়ালে ঠেসানো অপর একটি বাইকের পাম্প্‌টি খুলিয়া লইল ও একটি থামের গায়ে নিজের বাইকটিকে দাঁড় করাইয়া উবু হইয়া বসিয়া পাম্প্ করিতে লাগিয়া গেল।

সেই স্বল্লান্ধকারে বেঞ্চির উপর বসিয়া বসিয়াই শঙ্কর কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন অশ্রুর বিরাট সাগর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। তরঙ্গসমাকুল ফেনিল সমুদ্র, তাহাতে যেন কোটি কোটি রক্তকমল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর কমলগুলি! এক-একটি দল যেন আগুনের শিখা; ফেনিল নীল জলে গাঢ় রক্তবর্ণ অগ্নিকমলদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মদির গন্ধে ও নিরুদ্ধ উত্তাপে বিশাল সমুদ্র উদ্বেলিত।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্র মিলাইয়া গেল।···দিগন্তপ্রসারী জনহীন প্রান্তর। মৃদু জ্যোৎস্নায় গভীর রাত্রি স্বপ্নাতুর। প্রান্তরে কে যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে সে? চেনা যায় না। প্রান্তরও অদৃশ্য হইল।···চতুর্দিক অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটা গলি দেখা যাইতেছে—সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রহরীপরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গলিটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে! সহসা অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গলিটা কাঁদিতেছে। তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে অন্ধকার গুমরিয়া উঠিতেছে, নক্ষত্রকুল স্পন্দিত হইতেছে। কীর্তনীয়া আবেগভরে গাহিয়া চলিয়াছে—"পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত"।

ভন্টুর কণ্ঠস্বরে শঙ্করের স্বপ্নভঙ্গ হইল।

পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে, হু-হু শব্দে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। টায়ারটাই জখম হয়েছে, বুঝলি?

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, তাই নাকি, তা হ'লে উপায়?

প্রোটোটাইপের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওরিজিনাল সম্ভবত এখন বাড়ি গেছে। এই ফাঁকে প্রোটোটাইপকে তিলিয়ে যদি কিছু হয়! চল্, তাই করা যাক। কেত্তনের এখন ঢের দেরি, বাবাজীর নাগাল পাওয়া শক্ত।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রোটোটাইপ কে?

আয় না তুই।

শঙ্করের মন তখনও স্বপ্নের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি—কিংবা হয়তো সেইজন্যই বিনা বাক্যব্যয়ে সে ভন্টুর অনুসরণ করিল। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই লইয়া অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে নীরবে অনেকটা যন্ত্রচালিতবৎ ভন্টুর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল এবং এই চলমান অবস্থাতেও তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার শরীর যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে, সে যেন বাতাসে ভর করিয়া চলিয়াছে কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সহসা ভন্টুর কনুইয়ের আঘাতে তাহাকে আবার কঠিন মাটিতে নামিয়া পড়িতে হইল।

তাহারা একটা গলিতে ঢুকিয়াছিল।

ভন্টু বলিল, দেখ্ দেখ্, ওরিজিনাল ব'সে আছে। মাটি করলে, দাঁড়া এইখানে একটু।

শঙ্কর ভন্টুর তর্জনীনির্দিষ্ট স্থানটায় দেখিল, একটা সাইকেলের দোকান রহিয়াছে এবং দোকানের সম্মুখভাগে এক কোণে চেয়ারে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভদ্রলোকের পরিধানে একটি টাইট-ফিটিং গলাবন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার এবং খাকি হাফপ্যাণ্ট। পায়ে আজানু কপিশবর্ণের গরম মোজা এবং মস্তকে কান-ঢাকা কালো টুপি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূম্রপান করিতেছিলেন। ভন্টু চুপিচুপি বলিল, ইনিই হচ্ছেন ওরিজিনাল মিস্টার ফাইভ।

মিস্টার ফাইভ? সাহেব নাকি?

বেনে। থাম্, একটু বসা যাক এখানে কোথাও, ওরিজিনাল বাড়ি না গেলে সুবিধে হবে না। প্রোটোটাইপ এলেই ওরিজিনাল খসবে—আসবার সময় হয়ে গেছে অলরেডি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

ভন্টু পুনরায় বলিল, প্রোটোটাইপ আসে নি ব'লে ওরিজিনাল রেগে টঙ হয়ে ব'সে তামাক খাচ্ছে। কি রকম নাক দিয়ে ভরভর ক'রে ধোঁয়া ছাড়ছে, দেখ্ দেখ্—

শঙ্কর দেখিল।

ভন্টু আবার বলিল, দেরি আছে দেখছি, প্রোটোটাইপ ডুব মেরেছে আজ। একটু বসতে হবে এখানে কোথাও।

নিকটেই একটি চায়ের দোকান ছিল। ভন্টু বাইকটা ঠেলিয়া লইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল। শঙ্করও পিছনে পিছনে গেল। চায়ের দোকানে খরিদ্দার কেহ ছিল না। যিনি দোকানের মালিক, তিনি এক কোণে চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া অপর একজন ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ব্যক্তির সহিত তন্ময় হইয়া পাশা খেলিতেছিলেন। দুইজনের মধ্যে একটি অয়েলক্লথ-পাতা টেবিল প্রসারিত। ভন্টু রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল, তাহার পর বলিল, আসতে পারি দাদা?

কোনও উত্তর আসিল না।

ভন্টু তখন বাইকের ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

কচে বারো।—বলিয়া ভদ্রলোক ভন্টুর দিকে তাকাইলেন। তাকাইবামাত্র ভন্টু সহাস্যমুখে আবার বলিল, আসতে পারি দাদা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আসুন—কি চান আপনারা?

এই যে আসি, এসে বলছি।

ভন্টু বাইকটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিল এবং শঙ্করকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিল, চল্, একটু বসা যাক।

ভন্টু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে ভদ্রলোকের পদধূলি লইয়া

মাথায় দিল। ভদ্রলোক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

করেন কি, করেন কি মশায় আপনি?

ভন্টু হাত দুইটি জোড় করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, অগ্রজ আপনি—

বসুন বসুন, কি চান আপনারা?

একটু বসতে চাই শুধু দাদা, চা কিন্তু খাব না, পয়সা নেই। একজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ, যদি বসতে দেন একটু দয়া ক'রে—

ছ-তিন নয়।

ওয়েস্ট্‌কোট-পরা ভদ্রলোকটি দান ফেলিলেন এবং চকিতে এই আগন্তুকদ্বয়কে একনজর দেখিয়া লইয়া আবার পাশার ছকে মন দিলেন।

বেশ তো, বসুন না ওধারের বেঞ্চিটায়।

শঙ্কর বলিল, চা-ই দিন আমাদের, কাছে পয়সা আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, খান না চা, পয়সার জন্যে কিছু আসছে যাচ্ছে না। এই চায়ের জন্যেই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, পয়সার দিকে দেখলে আজ এমন অবস্থা হ'ত না আমার, কি ব'ল মাস্টের?

ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ভদ্রলোক এতদুত্তরে কেবল বলিলেন, হ্যাঃ।

ওরে কেলো, চা দিয়ে যা। তুমি খাবে নাকি আর এক কাপ মাস্টের?

মাস্টার দক্ষিণ তর্জনীটি দক্ষিণ কর্ণে ঢুকাইয়া মুখবিকৃতি করিয়া সজোরে বেশ খানিকক্ষণ কর্ণ-কণ্ডূয়ন করিয়া লইলেন। তারপর ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, দাও, আর একবার ইস্‌টিম ক'রে নেওয়াই যাক।

ভন্টু ও শঙ্কর একটু দূরে একটি বেঞ্চিতে উপবেশন করিয়াছিল।

ভন্টু এমন স্থানটিতে বসিয়া ছিল, যেখান হইতে ওরিজিনালকে বেশ দেখা যায়।

দোকানের মালিক আবার হাঁকিলেন, ওরে কেলো, তিন কাপ চা দিয়ে যা—আচ্ছা, চার কাপই আন্, আমিও খাই আর এক কাপ, কি বল মাস্টের ?

মাস্টার নীরবে সম্মুখের দন্তগুলি বিকশিত করিলেন।

এই চায়ের জন্যেই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, বুঝলেন, চা-কে আমি খেয়েছি, চা-ও আমাকে খেয়েছে।

ভন্টু এই কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া তাহার পর বলিল, এ আর নতুন কথা কি শোনালেন দাদা ? ভাল লোকের দুর্দশা চিরকালই। মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘ'টে আসছে। হাতটা একবার দেখাবেন দয়া ক'রে ?

হাত দেখতে জানেন নাকি আপনি ?

যৎসামান্য।

তবে আপনি তো গুণী লোক মশায়।

পাশা ফেলিয়া দোকানের মালিক করতল প্রসারিত করিয়া ভন্টুর নিকট আসিয়া বসিলেন। ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত মাস্টার জমাটি খেলাটা এইভাবে পণ্ড হইয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, তুমি আবার নতুন হুজুগে মাতলে দেখছি! আশ্চর্য লোক বটে তুমি !

কেহ ইহার কোন উত্তর দিল না। ভন্টু ভদ্রলোকের দক্ষিণ করতলটি লইয়া তাহাতে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিল। কেলো নামক ভৃত্যটি ভিতরের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া চা দিয়া গেল।

সকলেই নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। ভন্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোক বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা ধরিয়া মাঝে মাঝে চুমুক

দিতে দিতে করকোষ্ঠী ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত মাস্টার ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া অল্প সময়েই চাটুকু নিঃশেষ করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি মরিচা-ধরা কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি অতি নিপুণতার সহিত ধরাইয়া বেশ জুত করিয়া বসিলেন এবং মুখের এমন একটা ভাব করিয়া ভন্টু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে, যেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুইজন শিশুর ছেলেমানুষী কাণ্ডকারখানা নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতেছেন এবং উপভোগও করিতেছেন।

কীর্তন শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনটা কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে চা খাইতে খাইতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভন্টু অবশেষে দোকানের মালিক ভদ্রলোকের করতলটি ছাড়িয়া দিল এবং বামহস্তধৃত পেয়ালা হইতে বাকি চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

কি দেখলেন মশায় ?

ভন্টু কোন উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একটি অত্যন্ত মলিন রুমাল বাহির করিয়া নির্বিকারচিত্তে মুখটি মুছিল এবং তাহার পর বলিল, যা দেখলাম, তাতে আপনার পায়ের ধুলো আর একবার নিতে হবে। এর বেশি আর কিছু বলব না এখন।—বলিয়া সে সত্য-সত্যই আর একবার চট করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলেন।

আহা, কি যে করেন আপনি খালি খালি! কি দেখলেন তাই বলুন ?

কিছু বলব না দাদা, খালি পায়ের ধুলো নেব। শঙ্কর, পায়ের ধুলো নে এঁর—সঙিন ব্যাপার !

শঙ্কর মৃদু হাসিল। দোকানের মালিক ভদ্রলোক ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা লোক তো আপনি মশায়!

ভন্টু স্মিতমুখে বলিল, কিছু বলতে হবে না, হদিস পেয়ে গেছি দাদা আপনার। এখন মাঝে মাঝে এসে জ্বালাতন করব আপনাকে। আজ সময় কম।

ভন্টু দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মৃদুস্বরে শঙ্করকে বলিল, প্রোটোটাইপ এসে গেছে, ওঠ্।

শঙ্কর চায়ের দাম বাহির করিয়া দিতে গেলে দোকানী ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, মাপ করবেন, আপনাদের চা তো আমি বিক্রি করি নি। মনে রাখবেন অধীনকে, তা হ'লেই যথেষ্ট।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, হাত দেখেই সে বুঝেছি।

ভন্টু ও শঙ্কর দোকান হইতে নামিয়া পড়িল। ভন্টু স্মিতমুখে ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ভদ্রলোকের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনাকে আর একদিন এসে চাঙ্গাব দাদা, আজ সময় বড় কম।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

শঙ্কর ও ভন্টু বাইকের দোকানের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভন্টু বলিল, থাম্।

বাইকের দোকানের সন্নিহিত একটি স্বল্পান্ধকার স্থানে উভয়ে থামিল। শঙ্কর দেখিল, একটি যুবক দোকানে আসিয়াছে এবং ভন্টু যাহাকে ওরিজিনাল নামে অভিহিত করিয়াছিল, তিনি যুবকটিকে উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

সমস্ত বিকেলটা পার ক'রে দিয়ে এলে, অথচ একটি পয়সা আদায় হয় নি! কি রকম? তাগাদায় বেরিয়েছিলে, না আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিলে? পাশের বাড়ি এক গাইয়ে মেয়ে জুটেছে, সে তো

তোমার মাথাটি খেলে দেখছি! মৃগেনবাবুর ওখানে কি বললে? আজ তো তার দেবার কথা।

যুবক অপ্রতিভ হইয়া আড়চোখে চাহিতে চাহিতে উত্তর দিল, বাড়ি ছিলেন না।

বাড়িতে জনপ্রাণী কেউ ছিল না?

কেউ সাড়া তো দিলে না, অনেকক্ষণ কড়া নাড়ানাড়ি করলাম।

ভূতের কাছে মাম্‌দোবাজি! দাও, বিলটা আমাকে দাও, ফেরবার মুখে দেখি যদি ধরতে পারি। স্পষ্ট কথাটি হচ্ছে, কোন কাজেরই তুমি নও বাবা, বি. এ. পাস করলে কি হবে? ফিনফিনে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছ কেন এই শীতে? সোয়েটার কোথা? ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার একটা অসুখ বাধাও, কিছু টাকা লম্বা হয়ে যাক আমার। সোয়েটার কোথা?

এখানেই আছে।

গায়ে দাও দয়া ক'রে সোয়েটারটি। আর এই নাও, এই টুপিটাও পর, বেশ ক'রে কান-টান ঢেকে-ঢুকে ব'স। দশটার আগে দোকান বন্ধ ক'রো না যেন।—বলিয়া ওরিজিনাল মঙ্কি-ক্যাপটি খুলিয়া ফেলিলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি বলিল, ঘোর জালে পড়েছে প্রোটোটাইপ। দেখ্‌ দেখ্‌, মিস্টার ফাইভকে দেখ্‌ এইবার।

শঙ্কর দেখিল, টুপি খুলিয়া ফেলাতে ওরিজিনালের অনাবৃত মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। মুখখানির বিশেষত্ব আছে। দেখিতে ঠিক বাংলা পাঁচের মত। কিছু গোঁফদাড়িও আছে। শঙ্কর ইহাও লক্ষ্য করিল যে, যুবকটির মুখও ওরিজিনালের অনুরূপ, কেবল গোঁফদাড়ি নাই।

ভন্টু চুপিচুপি আবার বলিল, মিলিয়ে দেখ্, ওরিজিনাল আর প্রোটোটাইপ পাশাপাশি রয়েছে—দেখ্, দেখ্, ভাল ক'রে দেখ্ না রাস্কেল।

ভন্টু শঙ্করকে একটা খোঁচা মারিল।

ওরিজিনাল বলিতেছেন শোনা গেল, দাও, আমার সাইকেলটা দাও, মৃগেনবাবুর বিলটাও দাও, দেখি যদি ব্যাটার নাগাল পাই।

প্রোটোটাইপ একটি সেকেলে ধরনের বাইক বাহির করিল, এবং তদুপরি আরোহণ করিতে করিতে ওরিজিনাল পুনর্বার প্রোটোটাইপকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন।

তোমার একে কোফো ধাত, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন, সোয়েটার আর টুপিটা প'রে ফেল। যাই, দেখি মৃগেনবাবুকে যদি ধরতে পারি।

ওরিজিনাল চলিয়া গেলে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, প্রোটোটাইপ ওরিজিনালের কে হয়?

ছেলে। আয়, এইবার যাওয়া যাক—কোস্ট্ ইজ ক্লিয়ার।

উভয়ে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বাইকের দোকানের সম্মুখবর্তী হইল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র প্রোটোটাইপ নমস্কার করিল এবং হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, সেদিন আপনি কোথায় চ'লে গেলেন ভন্টুবাবু? আমি রাশিচক্রের ছকটা টুকে নিয়ে এসে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত আপনার অপেক্ষায় ব'সে ছিলাম। কোথায় গেলেন বলুন তো, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ভন্টু হাস্যস্নিগ্ধ মুখে কেবল তাহার দিকে একবার চাহিয়া বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিল।

প্রোটোটাইপ আবার বলিল, কোথা গেলেন সেদিন বলুন দেখি, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

সব বলছি। ওই টিনের চেয়ারটা নাবান তো আগে।—বলিয়া ভন্টু দোকানের অভ্যন্তরস্থ একটি টিনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হ্যাঁ, এই যে।

প্রোটোটাইপ নানাভাবে-জখম নানাবিধ বাইকের জঙ্গলের ভিতর হইতে টিনের চেয়ারটি বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিল। ভন্টু সেটি ফুটপাথে পাতিয়া দিয়া শঙ্করকে বলিল, ব'স্ তুই। শঙ্কর বসিল। দোকানের ভিতরে এক কোণে একটা ময়লা চট পাতা ছিল, ভন্টু তাহাতেই গিয়া বেশ জমায়েত হইয়া বসিল এবং তাহার বুক-খোলা জামার ভিতরের পকেট হইতে একটি ছোট নোট-বুক বাহির করিয়া বলিল, কই, দেখি রাশিচক্রটা।

প্রোটোটাইপ কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া একটি টিনের বাক্স খুলিল এবং এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিল। উহাতেই রাশিচক্র টোকা ছিল। ভন্টু কাগজখানি লইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেটির দিকে তাকাইয়া রহিল এবং তৎপরে তাহা নোট-বুকে টুকিয়া লইয়া বলিল, জটিল ব্যাপার দেখছি। এ বক্সি মশায়ের কাছে না গেলে হবে না। আমি বক্সি মশায়ের কাছে যাব ভাবছিলাম আজই, কিন্তু বাইকের পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে। রাম দক্‌চান দক্‌চেছে।

বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি আপনার, ভয় কি! কি হ'ল বাইকের?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাকে ঠ্যাঙালেও আজ পয়সা বেরুবে না।

প্রোটোটাইপ আহত আত্মমর্যাদার সুরে বলিল, আপনার সঙ্গে কি আমার খদ্দের-দোকানী সম্পর্ক? কেবল দেখবেন; বাবা না জানতে পারেন—বাস্। জানেন তো সবই।

ভন্টু কিছু না বলিয়া সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া প্রোটোটাইপের দিকে চাহিয়া রহিল।

দাঁড়ান, সোয়েটারটা প'রে নিই আগে। তারপর আপনার বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি এক্ষুনি। ওরে মটরা, বাইকটা তোল্ তো।

আঁড়ময়লা ফতুয়া ও লুঙ্গি পরা একটি ছোকরা বিড়ি টানিতে টানিতে পিছনের একটি ঘর হইতে বাহির হইল এবং ভন্টুর প্রতি একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এসব মেরামতি-কাজ সকালের দিকে আনলেই সুবিধে হয় বাবু, বুঝলেন? মিসিনারির কাজ—

ভন্টু কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

প্রোটোটাইপ ধমক দিয়া উঠিল।

তুই বাজে কথা ছেড়ে যা বলছি কর্ দিকিন—তোল্ বাইকটা।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়া মটরা সেটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অস্ফুটস্বরে গজর-গজর করিতে করিতে বাইকটা তুলিয়া ফেলিল। প্রোটোটাইপ বাইকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, চল্ না, ততক্ষণ আমরা মেজকাকার ব্যাপারটা সেরে আসি। কীর্তন শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

ভন্টু প্রোটোটাইপের দিকে মিটিমিটি চাহিয়া বলিল, লক্ষ্মণবাবু রাজি হ'লেই যেতে পারি, উনিই এখন মালিক।

লক্ষ্মণবাবু অর্থাৎ প্রোটোটাইপ এই কথায় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, কি যে বলেন আপনি ভন্টুবাবু! কোথা যাবেন এখন আবার, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ইহাতে ভন্টু এমন একটা মুখভাব করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, যেন মেজকাকার সহিত দেখা করাটা শঙ্করেরই প্রয়োজন এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে।

শঙ্কর লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি, বাইকটা ততক্ষণ সারা হোক। আয় ভন্টু।

ভন্টু করজোড়ে লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, অনুমতি দিচ্ছেন তো? এ ছোকরা কিছুতে ছাড়বে না।

সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিভ হইয়া লক্ষ্মণবাবু বলিল, মানে? নিশ্চয়। তবে সেদিনকার মতন আবার করবেন না যেন, আসা চাই।

বাইক জামিন রইল।

একবার তো বাইক ফেলে পালিয়েছিলেন। বাবার কাছে নানারকম মিথ্যে কথা ব'লে শেষটা নিস্তার পাই সেদিন।

না, ঠিক আসব।

ভন্টু ও শঙ্কর মেজকাকার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভন্টু অযাচিতভাবেই ওরিজিনাল ও প্রোটোটাইপের কাহিনী শঙ্করকে শুনাইতে লাগিল। ওরিজিনালের নাম দশরথ। দশরথের দুই পুত্র—রাম ও লক্ষ্মণ। রাম মারা গিয়াছে, নিউমোনিয়া হইয়াছিল। স্ত্রীও বহু আগে মারা গিয়াছেন। লক্ষ্মণই এখন ওরিজিনালের সবে-ধন নীলমণি। ওরিজিনাল টাকার কুম্ভীর। বাইকের দোকান আছে, মহাজনী কারবার আছে, কলিকাতায় দুইখানা বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু নগদ টাকাও আছে। তথাপি ওরিজিনালের এক পয়সা বাপ-মা। এদিকে প্রোটোটাইপ অন্যপ্রকৃতির। কৃপণ তো নয়ই—রসিক। পাশের বাড়ির একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস থাকায় গোপনে মেয়েটির কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়াছে। মেয়েটির সহিত যদি প্রোটোটাইপের কোষ্ঠীর মিল হয়, তাহা হইলে প্রণয়-ব্যাপারে নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইবে এবং ওরিজিনালের নিকট কাহারও মারফৎ প্রস্তাবটা করিবে। ওরিজিনালও কোষ্ঠী-পাগল লোক। সুতরাং

কোষ্ঠীর মিল সর্বাগ্রে দরকার। কোষ্ঠীর মিল না হইলেই সর্বনাশ। তখন যে প্রোটোটাইপ কি করিবে, তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত।

গলিটা হইতে বাহির হইয়া শুনিতে পাইল, কীর্তন চলিতেছে। একটু কাছাকাছি হইতেই শঙ্কর শুনিতে পাইল—রসভরে দুঁহুঁ তনু থরথর কাঁপই—। আর একটু কাছে যাইতেই তাহারা দেখিতে পাইল, ভন্টুর মেজকাকা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, অপর আর একজন খোল ধরিয়াছেন।

ভন্টু কাছে গিয়া বলিল, মেজকাকা, শঙ্কর এসেছে।

শঙ্কর? কই, এই যে, এস এস এস।

মেজকাকা শঙ্করকে দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে বসবে নাকি তোমরা? বসিয়ে দেব?

শঙ্কর বলিল, না থাক্। আমাকে আবার এখুনি হস্টেলে ফিরতে হবে। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে চলুন একটু গল্প করা যাক্, অনেক ঘুরে এলেন আপনি।

বেশ বেশ বেশ—চল, তাই চল। ওদিককার ঘরটায় যাওয়া যাক, চল তা হ'লে।

শঙ্কর ও ভন্টুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পিছনের দিকে একটা ঘরে গেলেন। ঘরের ভিতর একটি প্রকাণ্ড চৌকিতে ফরসা চাদর বিছানো ছিল। তিনজনেই গিয়া তাহাতেই বসিলেন। ভন্টু কপাটটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

মেজকাকা সহাস্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ভন্টুও হাসিমুখে বলিল, আসুন, নিরিবিলিতে একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক। শঙ্কর এসেছে—

মেজকাকা শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, ভন্টুটা চিরকালই একরকম রইল। ওর শিশুত্ব আর ঘুচল না, কি বল?

শঙ্কর বলিল, কিন্তু ও হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে, এটা তো ঠিক নয়।

না না না, পড়তে হবে ওকে। আমরা অর্থাভাবে পড়তে পাই নি; ভন্টুকে কিন্তু পড়তে হবে, সেটি হবে না।—বলিয়া মেজকাকা চক্ষু বুজিয়া কি যেন প্রণিধান করিতে লাগিলেন। 'অর্থাভাবে পড়তে পাই নি' কথাটা অবশ্য সত্য নয়—মেজকাকা খেয়ালবশত পড়াশুনা ছাড়িয়াছিলেন। সে যাই হোক, খানিক চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর পুনরায় মেজকাকা চাহিলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর বলেন, অশিক্ষিত পুরুষ এবং বিধবা নারী সমান দুর্ভাগা। দুজনেরই জীবনের সম্ভাবনা ছিল অনেক, কিন্তু হ'ল না কিছুই। এ যেন প্রদীপে তেল-সলতে সবই রয়েছে, কেবল শিখাটি কেউ জ্বালিয়ে দিলে না। নাঃ, ওসব কাজের কথা নয়, ভন্টুকে পড়তে হবে। ভন্টু, কালই তুমি কলেজে ভরতি হয়ে যাও।

ভন্টু সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রুধির?

ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন? সে দায়িত্ব আমাদের। কি বল শঙ্কর?

শঙ্কর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

তাহার পর বলিল, আপনি কি তা হ'লে আবার চাকরি নেবেন?

দেখি, তাই বোধ হয় নিতে হবে শেষ পর্যন্ত। কর্মের বন্ধন ইচ্ছে করলেই তো আর ছিন্ন করা যায় না। বিষ্টুর অসুখ হয়েই মুশকিল হয়ে পড়েছে। অসুখ হবে না? ব্রহ্মচর্যই হ'ল স্বাস্থ্যের ভিত্তি। বউমাই অন্তঃসারশূন্য ক'রে ফেললেন বিষ্টুকে।—বলিয়া মেজকাকা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ও ভন্টু

নীরব হইয়া রহিল। ভন্‌টু পিছনের দিকে বসিয়া ছিল, সে একবার ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া মেজকাকাকে ভ্যাঙাইল।

কিছুক্ষণ পরে মেজকাকা চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, নাঃ, ভন্‌টুর জন্যেই আমাকে শেষকালে চাকরি নিতে হবে। ওর পড়া বন্ধ হতে দিতে পারি না আমি। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন ও দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিল, আমি আজ বোস সায়েবের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আপনার চাকরির কথা উঠল, বোস সায়েব বললেন, কিছুদিন পরে কয়েকজনকে নেওয়া হবে। কিন্তু তার জন্যে একটা কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে হবে। সে কি সুবিধে হবে আপনার?

ভন্‌টু সহাস্যে বলিল, শুনলেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা? ও আপনাকে পরীক্ষার ভয় দেখাতে চায়।

মেজকাকা কিছু না বলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, পরীক্ষার জন্যে ভাবি না, পরীক্ষা অনেক দিয়েছি, আরও দিতে হবে। সমস্ত জীবনটাই পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরের হাতে। না, আমি পরীক্ষার জন্যে ভাবছি না, আমি ভাবছি ঠাকুরের কথা। চাকরি যদি নিতে হয়, তা হ'লে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। তিনি এখন অনুমতি দেবেন কি না সেইটে হ'ল সমস্যা। এমনিই তো তাঁর বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি—থাকবার কথা আমার কাশীতে।

শঙ্কর বলিল, চিঠি লিখুন না একটা তাঁকে, কোথায় আছেন তিনি আজকাল?

ভন্‌টু বলিল, শুনছেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা? ঠাকুরকে চিঠি লিখে অনুমতি নিতে বলছে! ষাঁড়ের গোবর কি গাছে ফলে! ঠাকুর

কি আপিসের বড়বাবু নাকি যে, করেস্‌পণ্ডেন্স্‌ করলে জবাব পাওয়া যাবে! কি সুড়োল গাড়োল রে তুই!

মেজকাকা একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিলেন, আহা, সে শঙ্কর জানবে কি ক'রে?

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না ভাই, চিঠিপত্র লিখলে কাজ হবে না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, কোথায় পাবেন কাগজ দোয়াত কলম—তাঁর কাছে নিজেই যেতে হবে। কিন্তু তাঁকে ধরাই শক্ত। চল না, সবাই মিলে যাই একদিন—আলাপও হয়ে যাবে। ভন্টুও ঠাকুরকে দেখে নি এখনও। ভন্টুকে দেখলে আর ভন্টুর কথা শুনলে ঠিক অনুমতি দেবেন উনি।

ভন্টু বলিল, আসছে শনিবার চলুন তা হ'লে, সোমবারও ছুটি আছে। কোথায় আছেন তিনি?

মেজকাকা উত্তর দিলেন, ভাগলপুরে।

ভন্টু বলিল, শঙ্কর, যাবি? চল্‌ না, ঘুরে আসি।

এমন সময় হঠাৎ কে বাহির হইতে কপাটে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। কপাট খুলিয়া দিতেই একজন ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিয়া মেজকাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একবার আসুন তো, মৃন্ময়বাবু মূর্ছা গেছেন হঠাৎ কীর্তন শুনতে শুনতে।

ভন্টু বলিয়া উঠিল, কে, মোমবাতি? সে কি কেত্তন শুনছিল নাকি এখানে ব'সে?

মেজকাকা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ, সে তো সন্ধ্যে থেকেই এসে বসেছে।

সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভন্টু দেখিল, মোমবাতিই মূর্ছা গিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দৃঢ়নিবদ্ধ অধর দুইটিও মাঝে মাঝে কাঁপিতেছে। চক্ষু দুইটি মুদিত।

মেজকাকা বলিলেন, ও কিছু নয়, ভাব লেগেছে, মুখে চোখে জল দিলেই এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তাহাই করা হইতে লাগিল।

একটু পরে শঙ্কর বলিল, আমাকে এইবার ফিরতে হবে, আটটা বেজে গেছে।

প্রোটোটাইপের ওখানে যাবি না?

না ভাই, আজ আর সময় নেই।

আমাকে কিন্তু যেতে হবে, তার আগে মোমবাতিটার একটা হিল্লে করতে হবে আবার। রাস্‌কেল্‌টার কাণ্ড দেখেছিস, আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে কেত্তন শুনছিল! চল্‌, তোকে একটু এগিয়ে দিই।

পথে বাহির হইয়া ভন্টু আবার বলিল, বাবাজীকে আর ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়া নয়, দেখা হ'লেই আবার ডুব মারবে। ক্ষেপেছিস তুই! অনুমতি-টনুমতি বাজে ওজর।

শঙ্কর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিল, আমি চলি ভাই এখন।

আচ্ছা, যা।

যদিও হস্টেলে ফিরিবার সময় হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল যে, এখন তাহার হস্টেলে ফেরা চলিবে না। তাহাকে একবার শৈলর সহিত দেখা করিতেই হইবে। সকালে অমন করিয়া চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। সে দ্রুতবেগে বোস সাহেবের বাড়ির দিকে চলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর বোস সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই অসময়েও সে গিয়া শৈলকে প্রথমেই এক কাপ চা করিতে ফরমাশ করিবে। দোকানের

চা-টা তেমন সুবিধার হয় নাই। তাহা ছাড়া শৈলকে খুশি করিবার সহজ উপায়ই হইতেছে এই—তাহাকে নানা ফরমাশে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা। শৈল গনগন করিবে, উপদেশ দিবে, নানা অসুবিধার উল্লেখ করিবে; কিন্তু চা-টুকু শেষ পর্যন্ত করিয়া দিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিবে। ইহাই তাহার স্বভাব। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, শুধু চা নয়, শৈলকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া কিছু খাবারও খাইতে হইবে। ছেলেবেলার কথা তাহার মনে পড়িল। মিত্তির-বাড়ির উঠানে একটা পেয়ারাগাছ ছিল। মিত্তির-বাড়িতে শৈলর যতটা অবাধ গতিবিধি ছিল, অপর কাহারও ততটা ছিল না। শৈলর মধ্যস্থতায় অনেকেই সেই পেয়ারা ভক্ষণ করিত। শৈলকে মিত্তির-বাড়ির পেয়ারা আনিয়া দিতে বলিলে সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত বটে, কিন্তু মনে মনে খুশি হইত এবং নানা কৌশলে পেয়ারা চুরি করিয়া আনিয়া দিত। শৈলর সেই স্বভাব আজও বদলায় নাই। তাহাকে গিয়াই চা ও মোহনভোগের ফরমাশ করিতে হইবে।

হঠাৎ একটা মোটর-হর্নের চীৎকারে শঙ্কর সচকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, বোস সাহেবেরই মোটর। মোটরখানা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, বোস সাহেব নিজেই ড্রাইভ করিতেছেন, পাশে সুসজ্জিতা শৈল বসিয়া আছে। শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হস্টেলে ফিরিয়া শঙ্কর তিনখানি পত্র পাইল।

একখানি বাবার—মায়ের পাগলামি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। একখানি মিষ্টিদিদির—আবার নিমন্ত্রণ। আর একখানি সুরমা বম্বে হইতে লিখিয়াছে—রহস্যময় পত্র।

৯

শিয়ালদহ অঞ্চলে গলির মধ্যে ছোট একটি বাসা। সেই বাসার ক্ষুদ্র একটি ঘরে মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় ওরফে মোমবাতি নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পত্র লিখিতেছিল। ঘরটিতে আসবাবপত্রের মধ্যে ছোট একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি দেওয়াল-ঘড়ি, একখানি চেয়ার এবং কাছেই একটি রিভল্‌ভিং বুক-শেল্‌ফ রহিয়াছে। টেবিলের উপর একটি ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলো। আলোর ডোমটি গাঢ় রক্তবর্ণ, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড রক্তজবা বাঁকা বৃন্তের উপর বিদ্যুতান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। রঙিন চিঠির কাগজে গভীর মনোনিবেশ-সহকারে মৃন্ময় যে পত্রখানি লিখিতেছিল, তাহা এই—

প্রিয়তমাসু,

কাল নানা গোলমালের মধ্যে ছিলাম বলিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করিও না। কাল এক জায়গায় কীর্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিতে শুনিতে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত আমি মূর্ছা যাই। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন বিরহ-কাহিনীর মধ্যে আমি তোমারই গভীর বেদনা অনুভব করিতে-ছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, যেন কীর্তনীয়ার কণ্ঠে রাধার জবানিতে তোমারই অন্তরের আকুলতা তুমি নিবেদন করিতেছ। সে নিবেদন এত করুণ, এত মর্মস্পর্শী যে, আমি নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি নাই, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, ভন্টু আমাকে শুশ্রূষা করিতেছে। সে-ই আমাকে গভীর রাত্রে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেইজন্য কাল আর আমি তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কীর্তন শুনিবার পর হইতে অহরহ তুমি আমার মন জুড়িয়া বসিয়া আছ। তোমার অশ্রুছলছল

ডাগর চক্ষু দুইটি আমার মনের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় তুমি? বিশ্বাস কর, আমি তন্নতন্ন করিয়া তোমাকে খুঁজিয়াছি। এখনও খুঁজিতেছি এবং চিরকাল খুঁজিব।' তোমাকে খোঁজাই আমার জীবনের ব্রত। সেইজন্যই পুলিস-অফিসারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকুরি লইয়াছি—তোমাকে খুঁজিয়া আমি বাহির করিবই। ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য, পুলিসে চাকুরি করা অথবা পুনরায় বিবাহ করা উপলক্ষ্য মাত্র। এই কথাটি আমি প্রতিদিন লিখি, আজও আবার লিখিলাম। কারণ ইহাই আমার জীবনের মন্ত্র। মন্ত্রকে জাগ্রত রাখিতে হইলে প্রতিদিন তাহা জপ করিতে হয়। হাসিকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি তাহা সত্য, কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমাদের দেশে আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষে এ ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পুলিসে চাকুরি লইলে ভাল করিয়া তোমার সন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু পুলিস-অফিসারের জামাই হওয়া ছাড়া এ লাইনে ঢুকিবার অন্য কোন প্রকার উপায় বা যোগ্যতা আমার ছিল না। হাসি নির্দোষ তাহা জানি, কিন্তু উপায় নাই। দেবীপূজায় চিরকাল নিরীহ জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে—ইহা সনাতন নিয়ম। ইহা পরিবর্তন করিবার সাধ্য আমার ছিল না। হাসিকে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্তরে স্থান দিতে পারি নাই। কারণ সেখানে তুমি বিরাজ করিতেছ। এক মুহূর্তের জন্যও আমার অন্তর তুমি ত্যাগ কর নাই। হাসিকে স্থান দিব কোথায়? পাশের ঘরেই সে আমার অপেক্ষায় শুইয়া আছে। একটু পরেই আমি তাহার পাশে গিয়া শয়ন করিব। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ঘুচিবে না। আমার

এবং হাসির মধ্যে তুমি তোমার সমস্ত সত্তা লইয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমাকে অতিক্রম করে, এমন সাধ্য হাসির নাই।

কিন্তু তুমি কোথায় আছ? এস, আমার স্বপের মধ্যে আজ। রোজই তো তোমায় স্বপ্নে দেখা দিতে বলি, কই, আস না তো? আমার জাগ্রতলোকের প্রতি মুহূর্তটি তুমি অধিকার করিয়া থাক, স্বপ্নলোকে তোমায় তেমনভাবে পাই না কেন? ঘুমের ঘোরে তোমাকে যেন হারাইয়া ফেলি। তাই মনে হয়, জাগিয়া বসিয়া থাকি। জাগিয়া বসিয়া তোমার কথা চিন্তা করি। আমার মনের আকুলতা লিখিয়া বোঝানো অসম্ভব। তবু রোজ লিখি, না লিখিয়া পারি না। আজ স্বপ্নে নিশ্চয় দেখা দিও। তোমার জন্য তৃষিত হইয়া আছি। কবে তুমি আসিবে? ইতি—

তোমারই

মৃন্ময়

পত্রখানি শেষ হইলে মৃন্ময় একটি রঙিন খাম বাহির করিয়া পত্রখানি তাহার মধ্যে পুরিল এবং সেটি সীল করিয়া তাহার উপর লিখিল—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী। তাহার পর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চন্দনকাঠের বাক্স বাহির করিল এবং সেই বাক্সের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া দিল। বাক্সে অনুরূপ আরও অনেক পত্র ছিল। চন্দনের বাক্সটি দেরাজে পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার ঘড়িটার পানে চহিল ও তৎপরে টেবিল-ল্যাম্পটি নিবাইয়া দিয়া ধীরপদসঞ্চারে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাসি ঘুমাইতেছে। নিরীহ কিশোরী-মূর্তি। বয়স বড় জোর চৌদ্দ কি পনরো। পরনে একখানি রাঙা ডুরে-শাড়ি।

সুডোল হাতে সোনার চুড়ি। পাড়-বসানো গোলাপী রঙের একখানি র‍্যাপার গায়ের উপর পড়িয়া আছে। নির্নিমেষ নেত্রে মৃন্ময় কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিল, হাসি, ওঠ, চল, এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

হাসি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ও চক্ষু দুইটি কচলাইতে কচলাইতে বলিল, ওই দেখ, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছি! তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া বলিল, চল, নেচি কেটেই রেখেছি, সেকে দিতে আর কতক্ষণ যাবে? গরম গরম সেকে দিইগে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে, নয়? কি করছিলে এতক্ষণ ব'সে?

মৃন্ময় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, আপিসের কাজকর্ম করছিলাম।

হাসি হাসিয়া বলিল, আর আমি শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছিলুম! সত্যি, ভারি স্বার্থপর আমরা, তোমরা মুখে রক্ত উঠিয়ে রোজগার ক'রে আনবে আর আমরা দিব্যি মজা ক'রে তা খরচ করব। তুমি বেচারী ও-ঘরে খেটে মরছ, আর আমি কেমন আরাম ক'রে ঘুমুচ্ছি! মুখে আগুন আমাদের!

ম্লান হাসি হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, উপায় কি?

হাসি গা ভাঙিয়া সহাস্যমুখে বলিল, সত্যি, আমারও না ঘুমিয়ে উপায় নেই। বাপ-মা বাংলা লেখাপড়াটা পর্যন্ত শেখায় নি যে, বই-টই প'ড়ে সময় কাটাই। নিজের বাপ-মা-ই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় বড়, আমার এ তো পাতানো বাপ-মা।—বলিয়া হাসি কাপড়টাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল, উঃ, শীত করছে। র‍্যাপার জড়িয়ে রান্না-বান্না করা যে কি মুশকিল, তোমাকে তো ব'লে ব'লে হার মানলাম, সোয়েটার একটা তুমি কিনে দিলে না। চল, উনুন-ধারে যাই, বড্ড শীত করছে।

রোজই ভুলে যাই, কাল কিনে আনব ঠিক।

নিজের বাপ-মা থাকলে শীতের তত্ত্ব করত, পাতানো বাপ-মা কিনা, তাই ওসব বাজে খরচের দিকে যেতে চায় না।

হাসি বড় পুলিস-অফিসারের কন্যা বটে, কিন্তু পালিতা কন্যা। আসলে ভদ্রলোক হাসির দূরসম্পর্কের পিসামহাশয়। অসহায়া পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকাটিকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং চাকুরির প্রলোভন দেখাইয়া মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

মৃন্ময়ের পূর্বপত্নী যে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু হাসিকে সে কথা ঘুণাক্ষরে জানান নাই। মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, চিনু খেয়েছ?

কোন্ সকালে খেয়ে নিয়েছে ঠাকুরপো, নটা বাজতে না বাজতেই। কলেজে সমস্ত দিন থাকে, ছেলেমানুষ তো, খিদে পেয়ে যায়। চল, উনুনও বোধ হয় এতক্ষণ নিবে ধুস হয়েছে।

মৃন্ময়ের ভাই চিন্ময় মফস্বল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিয়া এই বছর কলেজে ভরতি হইয়াছে। উপরের ঘরখানায় সে থাকে। সেইটিই তাহার পড়িবার ও শুইবার ঘর।

হাসি ও মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সামান্য একফালি উঠানের পরই রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢুকিয়াই হাসি বলিল, যা ভেবেছি তাই, এতক্ষণ কি আর আঁচ থাকে? আঁচের আর অপরাধ কি? স্টোভটা জ্বালি, থাম।

হাসি স্টোভ বাহির করিয়া জ্বালিতে বসিল এবং স্পিরিট ঢালিতে ঢালিতে বলিল, স্টোভে আবার রুটি ভাল হয় না।

মৃন্ময় নিকটস্থ একটি বালতি হইতে জল লইয়া হাত-মুখ ধুইতে লাগিল, এ মন্তব্যের কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিল। তাহার পর হাসি জ্বলন্ত স্পিরিটের দিকে চাহিয়া মৃন্ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, হ্যাঁ গা, একটা কথা রাখবে আমার?

কি কথা ?

পরেশবাবুদের বাড়ি এমন সুন্দর সুন্দর বেরালছানা হয়েছে ! তুমি যদি বল—নিয়ে আসি একটা চেয়ে।

বেশ তো। এনো।

একটা ধপধপে সাদা বাচ্চা—এমন মিষ্টি দেখতে যে কি বলব !

তাই নাকি ?

স্টোভটায় পাম্প্ করিতে করিতে মহা উৎসাহে হাসি বলিল, দেখবে ? নিয়ে আসব এখন ? এই তো পাশের বাড়ি, ওরা ঠিক জেগে আছে এখনও।

এখন থাক্, কাল এনো।

মায়ের ল্যাজে ছোট্ট ছোট্ট থাবা মেরে মেরে এমন সুন্দর খেলা করছিল আজ দুপুরে, সে যদি দেখতে ! কি দুষ্টু দুষ্টু চোখ !

হঠাৎ দুয়ারে কড়া নড়িল। এত রাত্রে কে আবার আসিল ?

কে ?

মৃন্ময় বাহির হইয়া গেল। কপাট খুলিতেই বড় বড় চুল-গোঁফ-দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক সহাস্যমুখে বলিলেন, মৃন্ময় নাকি, ভাল আছ তো সব ?

কে মুকুজ্জেমশাই, আসুন আসুন—এত রাত্রে কোথা থেকে ?

মুশকিলে প'ড়ে এসেছি, চল ভেতরে, সব বলছি।

মৃন্ময়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

হাসি একমুখ হাসি লইয়া বলিল, ওমা, আপনি !

তাড়াতাড়ি আসিয়া সে মুকুজ্জেমশাইয়ের পদধূলি লইল। তাহার দেখাদেখি মৃন্ময়ও প্রণাম করিল। মুকুজ্জেমশাই উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া হাস্যস্নিগ্ধমুখে হাসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভাল আছিস তো পাগলি ?

ভুলেও তো খোঁজ নেন না একবার। আজ যে কি ভাগ্যি এলেন?

হাসি-অভিমানভরে ঠোঁট দুইটি ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই একটু হাসিয়া বলিলেন, স্বামীর কাছে আছিস—এখন আর খোঁজ নেবার দরকার নেই তো।

দরকার না থাকলে বুঝি আসতে নেই?

মুকুজ্জেমশাই সস্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। মুকুজ্জেমশাইকে দেখিলেই আপনার জন বলিয়া মনে হয়। যদিও মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, মাথায় তৈলবিহীন চুল—কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ হাস্য-শ্রী তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলকে ও আয়ত রক্তাভ চক্ষু দুইটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিবামাত্রই ভিতরকার স্নেহময় মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না।

হাসি বলিল, কোথায় এসে উঠেছেন আপনি? আজ আপনাকে ছাড়ছি না, এখানে খেয়ে যেতে হবে।

মৃন্ময়ও বলিল, আপনি কলকাতায় কবে এসেছেন? কিচ্ছু জানি না তো!

হাসি বলিল, ওঁর ওইরকমই কাণ্ড।

মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছি তিন-চার দিন হ'ল। শিরীষের ছেলের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলাম। ছেলেটি এই কিছুক্ষণ হ'ল মারা গেছে। শিরীষ বেচারা পড়েছে মুশকিলে। তাকে তো এখানে এখনও বিশেষ কেউ চেনে না, সে এই অল্প কদিন হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। সৎকার করবার লোক জুটছে না, তাই আমাকে বেরুতে হ'ল। তোমাদের দু ভায়ের মধ্যে একজনকে যেতে হয়। একজন বাড়িতে থাক, পাগলিটা আবার না হ'লে ভয় পাবে। চিনি তো ওকে, ভয়ানক ভীতু।—বলিয়া মুকুজ্জেমশাই হাসির দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

হাসি এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতেছিল। হঠাৎ ভীতু অপবাদে মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল এবং বলিল, এক্ষুনি যেতে হবে? তা হ'লে রুটি কটা তাড়াতাড়ি তৈরি ক'রে দিই।

তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি বুঝি এখনও?

ঠাকুরপোর খাওয়া হয়ে গেছে, উনি এতক্ষণ কাজ করছিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চিনুই চলুক, একজন হ'লেই হবে, তিনজন পেয়েছি, তা ছাড়া আমি আছি, পাড়া থেকেও দু-একজন হয়তো জুটতে পারে।

মৃন্ময় বলিল, আপনি যাবেন? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় আপনার?

মৃন্ময়ের চিন্তার কারণ ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের অঙ্গে একটি সুতির বোম্বাই চাদর ভিন্ন আর কোন আবরণ ছিল না, খালি পা। চিরকালই তাঁহার এই বেশ। মৃন্ময়ের কথা শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার? আমার কিচ্ছু হবে না।

হাসি পাকা গিন্নীর মত পুনরায় মন্তব্য করিল, উঁর ওইরকমই কাণ্ড।

মৃন্ময় বলিল, তার চেয়ে বরং আপনি হাসিকে আগলান, ঠিকানাটা ব'লে দিন, আমি আর চিনু যাই।

না না, সেটা ঠিক হয় না। চিনুকে ডাক তুমি, আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

অগত্যা চিনুকে ডাকিতে হইল। ডাকাডাকিতে চিনু উপরের ঘর হইতে নামিয়া আসিল। সদ্যঘুমভাঙা চোখে মিটিমিটি মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিবামাত্র সহাস্যমুখে আসিয়া পদধূলি লইল। এই বাড়িতে হাসি ছাড়া চিনুও মুকুজ্জেমশাইয়ের অতিশয় প্রিয়। চিন্ময়ের চেহারা মৃন্ময়ের অনুরূপ, কেবল তাহার বয়স কম ও মাথার

চুল কটা নয়—কালো। সমস্ত শুনিয়া চিন্ময় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের সাহচর্যে এই শীতের রাত্রে মড়া পোড়াইতে যাইতে হইবে! সে যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া নিজের র‍্যাপারখানা লইয়া আসিল।

চিন্ময়কে লইয়া মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে হাসি মৃন্ময়কে বলিল, ওগো, তুমি আর একটু স'রে এস, আমার ভারি ভয় করছে।

মৃন্ময় চোখ তুলিয়া একটু হাসিল।

না, তুমি স'রে এস, লক্ষ্মীটি, মড়ার কথা শুনলে আমার বড্ড ভয় করে।

আর একটু হাসিয়া মৃন্ময় হাসির নিকটে গিয়া বসিল। হাসি রুটি সেকিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

১০

নির্জন দ্বিপ্রহর।

নিজের শয়নকক্ষে ঘন নীলরঙের একটি সুন্দর আলোয়ানে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি গদি-আঁটা আরাম-চেয়ারে বসিয়া মিষ্টিদিদি একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বাড়িতে কেহ নাই। সোনা তাহার এক বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে। মিষ্টিদিদি তন্ময়চিত্তে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছিলেন, গ্রাস করিতেছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিছনের জানালা দিয়া একফালি রোদ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ও বাম গণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। বাম কর্ণের সোনার দুলটা রৌদ্রকিরণে চকমক করিতেছে। মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটিও চকমক করিতেছে, অধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, ভ্রূযুগল

আকুঞ্চিত। উপন্যাসে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল, যাহা মুখরোচক এবং উত্তেজনাপূর্ণ। মিষ্টিদিদির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মিষ্টিদিদি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাতায়ন-পথে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, ছাদের ওধারে আলিসার উপর একজোড়া পারাবত আসিয়া বসিয়াছে। পুরুষ পারাবতটি গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্‌বকম-ধ্বনিতে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাহার স্ফীয়মান কণ্ঠদেশে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া ময়ূরকণ্ঠের শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রতি গ্রীবাভঙ্গীতে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মিষ্টিদিদি আবার পুস্তকে মন দিলেন।

এমন সময় নীচে ফোন বাজিয়া উঠিল। 'বয়' আসিয়া খবর দিল যে, সাহেব তাঁহাকে ফোনে ডাকিতেছেন। মিষ্টিদিদি নামিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন। মিত্র সাহেব ফোনে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ফিরিতে অনেক রাত হইবে। বৈকালেও তিনি আসিতে পারিবেন না, কলেজে একটা মীটিং আছে এবং তৎপরে তাঁহাকে এক বন্ধুর বাড়িতে ডিনার খাইতে যাইতে হইবে। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন, পারাবত-দম্পতি উড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘরের কোণে তেপায়ায় রক্ষিত ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটি সবল নগ্ন পুরুষ একটা বিকটকায় অজগরকে বিধ্বস্ত করিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত পেশী শক্তির উন্মাদনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদি কিছুক্ষণ প্রতিমূর্তিটির পানে তাকাইয়া উঠিয়া বিছানায় গেলেন ও সবলে পাশ-বালিশটাকে আঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

১১

শঙ্কর, সুরমার পত্রখানি আবার পড়িতেছিল। এখানি সুরমার দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া আর একখানি পত্র লিখিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত এ রকম হয় না। কিন্তু অসাধারণ ব্যাপারও পৃথিবীতে অসম্ভব নহে। সুরমাও সাধারণ শ্রেণীভুক্তা নহে। সুতরাং সুরমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন একটু-আধটু খটকাজনক ঘটনা ঘটিবেই। সাহিত্য-প্রীতিরূপ দুষ্টবায়ু যাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে, তাঁহার চালচলন আচার-ব্যবহার সাধারণ আইন-কানুন মানিয়া চলিবে না, ইহাই স্বাভাবিক—তা তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন।

শঙ্করের দ্বিপ্রহরে দুই পিরিয়ড ছুটি আছে, কলেজ-স্কোয়ারের নির্জন কোণটুকুও ভারি সুন্দর লাগিতেছে। সুরমার পত্রখানি ইতিপূর্বে সে বহুবার পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। সুরমা যাহা লিখিয়াছে, তাহার অর্থবোধ করা খুব কঠিন নহে। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছে, পত্রখানিতে অর্থাতীত এমন কিছু আছে, যাহা একবার দুইবার পড়িয়াই নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায় না, বারম্বার পড়িতে হয়। এক স্থানে সুরমা লিখিয়াছে—

"আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত অল্প, অথচ আপনার চিঠি না পেয়ে এত খারাপ লাগছে! এর থেকে কি প্রমাণ হয় বলুন তো? হয়তো কিছুই প্রমাণ হয় না, কিংবা হয়তো এর থেকেই কোন নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ্ বড় কিছু একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারেন। সে যাই হোক, এ কথা কিন্তু অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, আপনার চিঠি না পেয়ে ভারি খারাপ লাগছে। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবশ্য তত ঘনিষ্ঠ নয় যে, অভিমানে আবদার করা চলে, তাই আপনাকে শুধু

অনুরোধ করছি, চিঠির উত্তর দেবেন এবার নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ অবশ্য স্বল্প। কিন্তু স্বল্প পরিচয়েই আপনার বিশিষ্ট রূপটি দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে যেন। আজকালকার দিনে বেশ তাজা জীবন্ত মানুষ কমই চোখে পড়ে। জীবন্ত মানুষ মানে—বাঘ ভালুকের মত বন্য পশু নয়, জীবন্ত মানুষ মানে—যে মানুষ সভ্যতার অতিবর্ষণে গলিত হয়ে যায় নি, সভ্যতার রসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশংসা করছি ব'লে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠবেন না। আপনার সম্বন্ধে সত্যি যা মনে হয়েছে, তাই লিখলাম। আপনাকে আর একটা কথা বলব? রাখবেন কথাটা? আপনার যে কবিতাগুলো দেখিয়েছিলেন, সেগুলো ছাপিয়ে ফেলুন। সত্যিই ওগুলো ছাপাবার যোগ্য। আমাকে দিন বরং, আমি ছাপিয়ে দিই। এমন সুন্দর ক'রে ছাপিয়ে দেব, দেখবেন তখন। আর নতুন কিছু লিখেছেন নাকি? লিখলে আমাকে পাঠাতে হবে কিন্তু। আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মনে আছে তো? কবিতা লিখে আগে আমাকে দেখাতে হবে। আমাকে প্রথমে দেখিয়ে তবে অপরকে দেখাতে পারবেন। আমি হতে চাই আপনার কবিতার প্রথম পাঠিকা। কাল এখানে সমুদ্রের ধারে ব'সে ব'সে আপনার "কলকল্লোল" কবিতাটার লাইনগুলো মনে পড়ছিল। কবিতাটা টুকে পাঠিয়ে দেবেন? সত্যি বলছি, ভারি সুন্দর কবিতাটি।"

এই কথাগুলি বারম্বার পড়িয়াও শঙ্করের তৃপ্তি হইতেছিল না। কয়েকবার পড়িয়া শঙ্কর পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিল ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গতকল্য যে চিঠিখানা সে সুরমাকে লিখিয়াছে, তাহাতে ও কথাটা সে না লিখিলেই পারিত। নানা কাজের ভিড়ে সুরমার কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেইজন্য পত্র দিতে পারে নাই, এই সত্যভাষণটুকু সে না করিলেই পারিত।

আর তা ছাড়া সত্যিই তো সে বিস্মৃত হয় নাই। সে সুরমাকে পত্র লেখে নাই সঙ্কোচভরে, পাছে কেহ কিছু মনে করে। সহজ সত্য কথাটা লিখিলেই চুকিয়া যাইত। অনর্থক একজন ভদ্রমহিলার মনে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কি করিয়া পরবর্তী পত্রে এই গ্লানিটুকু মুছিয়া ফেলা যায়, সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল, ওধারের গেট দিয়া রিনি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আর একটি তরুণী। তাহারা কাছাকাছি আসিতেই শঙ্কর নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, কোথায় চলেছেন?

রিনি সলজ্জ হাসিয়া উত্তর দিল, পুরনো বইয়ের দোকানগুলো ঘুরব একটু।

চলুন, আমিও যাই, আমারও বই কেনার দরকার আছে কয়েকটা।

ইহা শুনিয়া অপর মহিলাটি বলিলেন, তবে আমাকে এইবার ছুটি দে রিনি, সঙ্গী তো একজন পেয়েই গেলি, তা ছাড়া অপূর্ববাবুও তো আসবেনই—বোধ হয় এসেছেন এতক্ষণ।

রিণি তথাপি বলিল, না, তবু তুমি চল বেলাদি।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যে তাহাকে নমস্কার করিল এবং বলিল, আপনার নাম শুনেছিলাম অপূর্ববাবুর কাছে, আজ দেখাটা হয়ে গেল।

বেলাদিদি একবার চকিতে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্করকে প্রতি-নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, আপনার পরিচয়টি দিন তা হ'লে।

রিনি বলিল, উনি শঙ্করবাবু, সেই যে মিষ্টিদিদি সেদিন তোমায় বলছিলেন। উৎপলবাবুর বন্ধু উনি।

ও, আপনিই শঙ্করবাবু? বেলাদিদি স্মিতমুখে শঙ্করের পানে চাহিলেন ও দন্ত দ্বারা অধরোষ্ঠ ঈষৎ দংশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, আপনি নাকি খুব বড় কবি? অপূর্ববাবু বলছিলেন।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, লিখি বটে মাঝে মাঝে, তবে সে এমন কিছু নয়।

তিনজনে গল্প করিতে করিতে কলেজ স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর আবার রিনিকে প্রশ্ন করিল, পুরনো বইয়ের দোকানে কি বই কিনবেন আপনি?

বেলাদিদি অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বঙ্কিম চাহনিতে রিনির পানে একবার চাহিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

রিনি সঙ্কুচিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, কিছু ঠিক করি নি এখনও। পুরনো বই আমার খুব ভাল লাগে। নতুন বই কেনার চেয়ে পুরনো বই কিনতে আমার বেশি ইচ্ছে করে।

বেলাদিদি এই উক্তিতে সহাস্য ওষ্ঠভঙ্গী করিলেন ও বলিলেন, সবাই কবি।

শঙ্কর বলিল, আপনিও নন কি?

আমি?—বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে প্রশ্ন করিলেন।

নিশ্চয়। কবি না হ'লে ব্লাউজের রঙের সঙ্গে শাড়ির রঙের এমন সামঞ্জস্য করতে পারতেন? অমন সুন্দর নাগরা জোড়া, অমন সুন্দর দুল দুটি পছন্দ করা আপনার পক্ষে সম্ভবই হ'ত না—যদি আপনি কবি না হতেন। কবি সবাই—কেউ কবিতা লেখে, কেউ লেখে না।

মোটেই না—ওসব বাজে কথা।

বেলাদিদি হাসিতে হাসিতে সজোরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

বেলাদিদি আবার অধর দংশন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, আপনি শুধু কবিই নন দেখছি, আরও অনেক গুণ আছে আপনার।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নিশ্চয়। আমি নির্গুণ ব্রহ্ম নই—এ কথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটি ছদ্ম কোপে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

তাঁহারা কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বেলাদিদি ও শঙ্করই এতক্ষণ কথাবার্তা বলিতেছিল। রিনি চুপ করিয়া ছিল, সে এবার কথা কহিল, অপূর্ববাবু এসেছেন দেখছি—ভোলেন নি।

ভুলবে? বলিস কি?—বলিয়া বেলাদিদি চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

শঙ্কর তাঁহার সে চাহনি দেখিতে পাইল না, কারণ সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপূর্ববাবুকেই দেখিতেছিল। দিবালোকে লোকটাকে আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। নাকের কাছে খানিকটা পাউডার লাগিয়া রহিয়াছে, লম্বা কোঁচাটা খর্বাকৃতির সহিত মোটেই খাপ খায় নাই, পাঞ্জাবিটাও হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাবির রঙও অদ্ভুত। এ রকম অদ্ভুত পাঞ্জাবি পরে নাকি পুরুষমানুষে! আশ্চর্য মেয়েলী রুচি লোকটার! লাজুক চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিনয়-নম্র মিহি কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনি এলেন কোথা থেকে?

প্রতিনমস্কার করিয়া শঙ্কর বলিল, কলেজে পড়ি, সুতরাং কলেজ স্ট্রীটে আমার আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া তো শক্ত নয়; কিন্তু আপনি তো ক্লাইভ স্ট্রীটের লোক, আপনাকেই কলেজ স্ট্রীটে দেখে আমার আশ্চর্য লাগছে।

অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, তা বটে, মিস মিত্রের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌মেণ্টটা ছিল, তাই, মানে, ঘণ্টাখানেক ছুটি নিয়ে—আমাদের বড়বাবুরও আবার, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু কথা আর শেষ করিতে পারিলেন না, নতচক্ষু হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি এসেন্স-সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে চকিত দৃষ্টিতে একবার বেলাদিদির পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনিও এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আপনাকেও এ সময় এ স্থানে দেখব প্রত্যাশা করি নি।

অপ্রত্যাশিত জিনিস তো অহরহই ঘটবে—কি বলেন শঙ্করবাবু?

বেলাদিদি শঙ্করের দিকে চাহিতেই শঙ্কর বলিল, নিশ্চয়।

মোড়ের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তা হ'লে চলুন, বইগুলো দেখা যাক। আসুন।

একটা দোকানে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর শেলির কাব্যগ্রন্থাবলী এক খণ্ড রিনির পছন্দ হইল—বেশ সুন্দর দামী সংস্করণ। অপূর্ববাবু তাহার দাম দিলেন ও পুস্তকটি হস্তে লইয়া তিনি বলিলেন, পরশু ঠিক সময়ে নিয়ে যাব আমি। কিছু লিখে দিতে চাই—অর্থাৎ—। বলিয়া একটু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেলেন।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বেলাদিদির পানে চাহিতেই তিনি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, পরশু রিনির জন্মদিন। অপূর্ববাবু রিনিকে একটা উপহার দেবেন। সাধারণত লোকে নিজেই কিনে নিয়ে যায় ওসব জিনিস, কিন্তু অপূর্ববাবুর সব বিষয়েই একটু বিশেষত্ব আছে তো—উনি রিনিকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে তবে কিনবেন। —বলিয়া বেলাদিদি তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধর দংশন করিয়া অপূর্ববাবুর প্রতি একটা ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ওমা, ঠিক এই এডিশনের একটা কীট্‌স্‌ও রয়েছে যে!

রিনি একটা বুক-শেল্‌ফের কোণ হইতে কীট্‌স্‌কে টানিয়া বাহির করিল। শুধু বাহির করিল নয়, লুব্ধভাবে তাহার পাতাগুলি উল্টাইতে

লাগিল। অপূর্ববাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া গম্ভীরভাবে বেলাদিদি বলিলেন, ওটাও নেওয়া উচিত। ওটাও কিনে নিন অপূর্ববাবু।

বেশ তো, বেশ তো।

অপূর্ববাবু কিন্তু মনে মনে ঘামিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে আর পয়সা ছিল না।

এটাও নিই তা হ'লে?—ঘাড় ফিরাইয়া রিনি স্মিতহাস্যে অপূর্ববাবুকে প্রশ্ন করিল।

বেশ তো, বেশ তো। আমি নিয়ে যাব ওটা পাঁচটার পর এসে, মানে, এখন আমার কাছে দামটা ঠিক নেই—মানে, দশ টাকার নোট আনতে ভুলে একটা পাঁচ টাকার নোট—মানে, তাড়াতাড়িতে—

অপূর্ববাবু অকারণে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া সেই দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। শঙ্করের কাছে টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা দশ টাকার নোট বাহির করিল ও অপূর্ববাবুকে বলিল, এই যে, নিন না, আমার কাছে আছে।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটিতে দুষ্টামির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রিনি একটু কুণ্ঠিত সলজ্জ কণ্ঠে বলিলেন, থাক্, আর দরকার নেই তা হ'লে।

আমার দরকার আছে।

শঙ্কর বইখানি কিনিয়া লইল। অপূর্ববাবুর মুখ-চোখের ভাব এমন করুণ হইয়া উঠিল, যেন কেহ তাঁহার গালে চড় মারিয়া তাঁহার মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইয়াছে।

বেলাদিদি হাসিয়া বলিলেন, এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুকেই ওটা কিনতে দেওয়া উচিত আপনার।

হ্যাঁ, অপূর্ববাবুর জন্তেই তো কিনলাম ওটা। এখন টাকা নেই ওঁর

কাছে—বইটা যদি বিক্রি হয়ে যায় আবার! এই নিন।—শঙ্কর বইখানি অপূর্ববাবুকেই দিল।

ধন্যবাদ, দামটা আপনাকে নিতে হবে কিন্তু।

বেশ, দেবেন।

শঙ্কর নূতন পুস্তকের খোঁজে একটা শেল্‌ফের পিছনের দিকে গেল। দেখিল যে, পিছনের দিকে একই সংস্করণের বায়রন ও বার্ন্‌সও রহিয়াছে। সে দুইটিও সে কিনিয়া লইল। তাহার পর একটু ভাবিয়া পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া অপর সকলের অগোচরে বহি দুইখানিতে কি যেন লিখিল। তাহার পর বই দুইটি বগল-দাবা করিয়া সে বলিল, এইবার যাওয়া যাক তা হ'লে? মিস্ মিত্র কি কলেজে যাবেন নাকি?

হ্যাঁ।

আর আপনি?—বেলাদিদিকে সে প্রশ্ন করিল।

আমিও ওই দিকেই যাব। অপূর্ববাবু তো আপিসে যাবেন?

হ্যাঁ, আমাকে আপিসে ফিরতে হবে।

চারিজনে বাহির হইয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অপূর্ববাবুর ট্রাম আসিতে তিনি সবিনয় নমস্কারাদি শেষ করিয়া ট্রাম ধরিয়া আপিসে চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, চলুন না, হাঁটাই যাক একটু।

তিনজনে হাঁটিতে শুরু করিল।

বেলাদিদি বলিলেন, আপনি কি বই কিনলেন, দেখি।

দেখাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

অনুরোধটা সামান্যও বলতে পারেন, অসামান্যও বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম আলাপ, আজই আপনাকে একটা

কিছু উপহার দেওয়া স্পর্ধার মত দেখাবে, কিন্তু আজকের এই প্রথম আলাপটাকে স্মরণীয় ক'রে রাখতে ইচ্ছে করছে। রাগ করবেন ?

না, রাগ করব কেন ?

তা হ'লে এইটে নিন।

বায়রনের কাব্য-গ্রন্থাবলীটি শঙ্কর তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিল।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া মলাটটি খুলিয়া পড়িলেন, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—**Please accept Byron—Shankar.** তাহার পর চক্ষু তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, **I accept. Thanks.**

তারপর রিনির হাতে বার্ন্‌স্‌খানি দিয়া শঙ্কর বলিল, আপনার জন্মদিনের নেমন্তন্ন আমিও পেয়েছি মিস মিত্র। যাব ঠিক, কিন্তু একটা উপহার বগলে ক'রে যেতে আমার লজ্জা করবে। ও জিনিসটা ভারি ভাল্‌গার ঠেকে আমার কাছে ; তাই ব্যাপারটা এখনই সেরে দিলাম। আপনি যে এত কবিতা ভালবাসেন, তা তো জানা ছিল না আমার। আমার ধারণা ছিল, সোনাদিদিই বুঝি কবিতা-পাগল।

এই শুনিয়া বেলাদিদি বলিলেন, সোনাদি কবি দেখলে কবিতা-পাগল হন, শিল্পী দেখলে ছবি-পাগল হন, বৈজ্ঞানিক দেখলে বিজ্ঞান-পাগল হন।

রিনি কিছু বলিল না। লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বেলাদিদি রিনির হাত হইতে বার্ন্‌স্‌খানি লইয়া বলিলেন, দেখি, তোর বইটাতে কি কবিত্ব করলেন উনি।

তার আগে, দাঁড়ান, আমি যাই।—বলিয়া শঙ্কর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

বেলাদি খুলিয়া দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—**It Burns —Shankar.**

রিনিও দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, মাটির সহিত মিলাইয়া যাইতে।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ধাবমান ট্রামটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

১২

করালীচরণ বক্সি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া কোষ্ঠী-গণনা করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রসারিত একটি কাগজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বসিয়া ছিলেন। কাগজটিতে রাশিচক্রের ছক টোকা। তাহার পাশেই শালপাতার ঠোঙায় কিছু তেলে-ভাজা ফুলুরি পড়িয়া রহিয়াছে। বক্সি মহাশয়ের কিন্তু ফুলুরির দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রাশিচক্রটির দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি। বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনেকটা পূর্ববৎ—মদের বোতল এবং ফাটা গেলাস ঠিকই আছে, বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতিও জ্বলিতেছে, আলমারির কপাট দুইটি তেমনই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে আলমারির অধিকাংশ বইই তক্তাপোশের উপর স্তূপীকৃত। ঘরটাতে পুরাতন পুস্তকের গন্ধে ধূলার গন্ধে, সিগারেটের গন্ধে ও মদের গন্ধে একটা গন্ধ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। নূতন আসবাবের মধ্যে একটা নূতন সচিত্র ক্যালেণ্ডার টেবিলের সম্মুখে ঝুলিতেছে। ছবিটি সুন্দর। একটি নয়-দশ বৎসরের সুন্দরী বালিকা কয়েকটি ধপধপে সাদা খরগোশকে কপিপাতা খাওয়াইতেছে। এমন সুন্দর ছবিখানি, কিন্তু সুন্দরভাবে টাঙানো নাই, বাঁকাভাবে কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। একটি সুদীর্ঘ টান মারিয়া বক্সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন এবং একটি পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা হইতে কি সব টুকিয়া লইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বক্সি মহাশয় যে ঘরটিতে বসিয়া ছিলেন, সেই ঘর

হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। দ্বারটি আলমারির পাশে কোণের দিকে বলিয়া সহসা চোখে পড়ে না। সেই দ্বারপ্রান্তে স্বল্পালোকে একটি ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল।

করালীচরণ কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়াই বলিলেন, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

ছায়ামূর্তি ইহার কোন উত্তর দিল না, বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র। অগ্রসর হইয়া আসাতে তাহার গায়ে আলো পড়িল। আলোকপাত হইলে দেখা গেল, মোস্তাক লোকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু উলঙ্গ। গায়ে বহুরকম তালি দেওয়া শতছিন্ন একটি কোট রহিয়াছে, আর কিছু নাই। মুখময় গোঁফ-দাড়ি, ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত। একটু ঝুঁকিয়া সে হস্তস্থিত একটি অর্ধদগ্ধ বিড়িকে লক্ষ্য করিয়াই আপন মনে কি যেন বকিয়া চলিয়াছিল।

বাহ নারায়ণ, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

করালীচরণের এক চক্ষু মোস্তাকের মুখে নিবদ্ধ হইবামাত্র মোস্তাক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল ও তৎক্ষণাৎ মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইয়া স্যালিউট করিল। তাহার পর বিড়িটি দেখাইয়া বলিল, জুত পাচ্ছি না।

করালীচরণ বলিলেন, জুত পাবে কি ক'রে, ও যে নিবে গেছে। স'রে এস, ধরিয়ে দিই।

মোস্তাক আবার মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল এবং বিড়িটা মুখে দিয়া মুণ্ডটা আগাইয়া আনিল। বিড়িটি গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে দেখিয়া বক্সি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ও ধরাতে গেলে গোঁফ-দাড়িতে আগুন লেগে যাবে। ওটা ফেলে দাও,

এই নাও, একটা সিগারেট নাও। মোস্তাক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল।

বাই নারায়ণ, দাও তা হ'লে। ভোগালে দেখছি!

বিড়িটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই-কাঠিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াও বক্সি মহাশয় যখন দেখিলেন, সেটি ধরিতেছে না, তখন তিনি মোস্তাককে বলিলেন, দেখছ তো?

মোস্তাক অত্যন্ত কৌতূহলভরে দেখিতেছিল।

বলিল, খাসা আগুন।

আগুন তো খাসা, বিড়ি ধরছে কই?

মোস্তাকও সঙ্গে সঙ্গে একমত হইয়া কহিল, জুত হচ্ছে না।

মোস্তাকের হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বক্সি মহাশয় তখন এঁটো বিড়িটাই মুখে লইয়া টান দিয়া ধরাইয়া দিলেন ও বলিলেন, এই নাও, এইবার শোওগে যাও। কম্বলটা কোথায়?

মোস্তাক জ্বলন্ত বিড়িটা লইয়া স্যালিউট করিয়া আলমারির পাশের সেই দরজাটা দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কম্বল সম্বন্ধে কোনরূপ উত্তর দিল না।

বাই নারায়ণ!

বক্সি মহাশয় আবার একটি সিগারেট ধরাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কোষ্ঠী-গণনায় মনোনিবেশ করিলেন। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা তিনি রাশিচক্রসমন্বিত কাগজখানা হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

তাহার পর সিগারেটটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন। মদ্যপান করিতে করিতে সহসা করালীচরণ নিজের দক্ষিণ হস্তটি আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর

যেন তাঁহার হস্তরেখাগুলির উপর সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠিল। চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল।

আসতে পারি দাদা?

করালীচরণ চমকাইয়া উঠিলেন, প্রসারিত হাতটা উল্টাইয়া এমনভাবে বন্ধ দ্বারের দিকে চাহিলেন, যেন দ্বারে কোন শত্রু হানা দিয়াছে। এক নিশ্বাসে মদটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কে?

আমি গ্যান্‌ঢঅ খুজ্‌বুজ্‌।

ও, ভন্টুবাবু, আপনি? আসুন আসুন।

বক্সি মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভন্টুর সহিত প্রোটোটাইপও আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আসিয়াই ভক্তিভরে বক্সি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। ভন্টুর আগে হইতেই শেখানো ছিল।

বক্সি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, ইনি কে?

ভন্টু বলিল, ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মণবাবু, সেই যাঁর ছক সেদিন—

বুঝেছি। বসুন আপনারা।

বক্সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন ও বোতল হইতে পুনরায় গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু অতিশয় ভয়ে ভয়ে এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে উপবেশন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন কোন রহস্যময় মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভন্টুও লক্ষ্মণবাবুর পাশে বসিয়া চোখ টিপিয়া কি যেন একটা ইশারা করিল, ভাবটা—লক্ষ্মণবাবু যেন ব্যস্ত হইয়া কোন কথা এখন না বলে। এ ইশারার প্রয়োজন ছিল না, কারণ লক্ষ্মণবাবু এমনিই নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।

করালীচরণ নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতিটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। ভন্টু একবার সশব্দে গলা-খাকারি দিল। এই শব্দে বক্সি মহাশয় ভন্টুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, সর্দি হয়েছে নাকি? এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছেনও তো!

ভন্টু বলিল, লক্ষ্মণবাবু নাছোড়; তা ছাড়া আপনার এখানে আসার কোন উপলক্ষ্যই তো আমি ছাড়ি না, জানেন।

করালীচরণ [illegible]টুকু নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ওঁদের দুজনেরই রাশিচক্র মিলিয়ে দেখলাম, মিল হয় নি—অসম্ভব।

লক্ষ্মণবাবুর মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভন্টু বলিল, গভীর গাড্ডায় ফেললেন দেখছি।

করালীচরণ আর একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, গাড্ডা আবার কি? মনের মিল যখন হয়েছে, তখন সেইটেই আসল মিল। লাগান আপনি, কুষ্ঠির মিল নাই বা হ'ল।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বক্সি মহাশয় হাসিতে লাগিলেন।

লাগিয়ে দিন।

ভন্টু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, পারবেন?

লক্ষ্মণবাবু বিমর্ষভাবে একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না।

ভন্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, গম্ভীর গাড্ডা, বুঝেছি।

করালীচরণ আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, আলো কিন্তু আর বেশিক্ষণ টিকবে না। ভন্টুবাবু, ওই বইগুলোর ওদিকে আর একটা মোমবাতি আছে, দেখুন তো, এটা তো গেল।

ভন্টু মোমবাতির সন্ধান করিতে করিতে বলিল, এত বই সব জড় করেছেন কেন?

নানারকমে বেয়ে-চেয়ে দেখছিলাম—কুষ্ঠি দুখানা যদি মেলাতে পারি, দেখলাম—ও অসম্ভব।

ভন্টু মোমবাতি লইয়া নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিতে ধরাইয়া সেটি

যথাস্থানে স্থাপন করিল। লক্ষ্মণবাবু নীরবে বসিয়া ছিল। তাহার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে চাহিয়া করালীচরণ বলিলেন, দেখুন, জ্যোতিষ চর্চা করি বটে, কিন্তু এটা আমি আপনাকে বলছি, মনের মিলই হ'ল শ্রেষ্ঠ মিল। সেদিকে যদি আপনার কোন গলদ না থাকে, লাগিয়ে দিন দুর্গা ব'লে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। লক্ষ্মণবাবু উঠিয়া পড়িল।

অনেক রাত হয়ে গেল, এবার আমি উঠি। ভন্টুবাবু, আপনি যদি বসতে চান তো বসুন, আমার জানেন তো—

ভন্টু বলিল, হ্যাঁ, আপনি যান, কাল আপনার ওখানে যাব। আপনি দক্‌চে যাবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বক্‌সি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া লক্ষ্মণবাবু বিদায় হইল।

লক্ষ্মণবাবু চলিয়া গেলে ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম বুঝলেন?

বোঝাবুঝি আর কি আছে এতে? ও মেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ জ্যোতিষ-মতে অসিদ্ধ। তা ছাড়া ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে—মানে, একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসতে হবে ওকে। শুধু আসতে হবে নয়, অনেক দুঃখভোগও করতে হবে। একাধিক পুরুষের সংস্রবে এলে তাকে দুঃখভোগ করতে হবে বইকি।

ভন্টু একটু ঝুঁকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভীমজাল তা হ'লে বলুন। প্রোটোটাইপ অতি নিরীহ লোক। মেয়েটি দেখতে ভাল, গান-টান গায় শুনেছি, লেখাপড়াও কিছু জানে। গোবেচারী প্রোটোটাইপ একেবারে লদ্‌কে গেছে।

করালীচরণ কর্কশকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন, শুক্রের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

ভন্টু বলিল, এ যে সঙিন শুক্র দেখছি! বেচারী প্রোটোটাইপের মুণ্ডুটি একেবারে হাড়কাঠে গলিয়ে দিয়েছে।

করালীচরণ শালপাতার ঠোঙা হইতে একটা ফুলুরি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বিয়ের কথাবার্তা কি অগ্রসর হয়েছে ?

পাগল! বাঘ ওরিজিনাল ব'সে আছে—খুন ক'রে ফেলবে তা হ'লে। ছোকরা গোপনে গোপনে প্রেমে পড়েছে। ওর নিজের কুষ্ঠিতে খুব বিশ্বাস, মেয়েটিরও নাকি খুব বিশ্বাস। মেয়েটিই নাকি নিজের কুষ্ঠির ছক প্রোটোটাইপকে দিয়েছে। বলেছে যে, কুষ্ঠির মিল যদি হয়, তা হ'লে সে তার দাদাকে বলবে, যেন ওরিজিনালের কাছে কথাটা পাড়েন।

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, প্রণয়-ব্যাপারে এমন হিসেব ক'রে চলার কথা আগে কখনও শুনি নি।

ভন্টু বলিল, প্রোটোটাইপের কাণ্ডকারখানাই ফ্রগিশ।

করালীচরণ সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর আবার একটা ফুলুরি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, শ পাঁচেক টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করতে পারি বলুন তো ?

কেন, এত টাকার কি দরকার এখন ?

দ্রাবিড় যাব।

দ্রাবিড় ?

হ্যাঁ।

কেন ?

শুনেছি, দ্রাবিড়ে একজন জ্যোতিষী আছেন, তিনি হস্তরেখা থেকে জন্ম-সময় নির্ণয় করতে পারেন। তাঁর কাছে গিয়ে এ বিদ্যেটা আমি আয়ত্ত করতে চাই। যেমন ক'রে হোক—

হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন ?

বাই নারায়ণ, খেয়াল বলছেন একে! দুনিয়ার লোকের কুষ্ঠি গুনছি, ভবিষ্যৎ বলছি, অথচ নিজের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার

নিজের জন্ম-সময়, এমন কি, জন্ম-তারিখটা পর্যন্ত আমার জানা নেই। হস্তরেখা থেকে যদি জন্ম-সময়ের নির্ণয় করতে পারি, তা হ'লে নিজের কুষ্ঠিটা একবার দেখি ভাল ক'রে।

আর একটি ফুলুরি তিনি মুখের মধ্যে দিলেন।

ভন্‌টু নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আপনি নিজে যা রোজকার করেন, তার থেকেই তো অনায়াসে পাঁচ শো টাকা জ'মে যেতে পারে, অবশ্য যদি একটু বুঝে-সুঝে খরচপত্র করেন।

করালীচরণ ভন্‌টুর দুইটি হাত ধরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, দিন না আপনি জমিয়ে। আমার যা কিছু উপার্জন সব আমি আপনার হাতে দেব, আপনি যা আমাকে খরচের জন্যে দেবেন, তাইতেই আমি চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার কাছে টাকা থাকলে আমি খরচ না ক'রে পারব না। নেবেন ভার?

এক চক্ষু ভন্‌টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ একদৃষ্টে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

ভন্‌টু কহিল, এ আর অসম্ভব কি? আপনি যা দেবেন, একটা পাস-বুক ক'রে পোস্ট-আপিসে রেখে দিলেই চুকে যায়।

কিন্তু আপনার নামে। আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, বাই নারায়ণ!

ভন্‌টু হাসিয়া বলিল, বেশ তো, এ আর বেশি কথা কি?

তা হ'লে আসুন, আজ থেকেই শুরু করুন।

করালীচরণ একটা পাঁজির ভিতর হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন ও বলিলেন, এই এখন আমার যথাসর্বস্ব। কিছু মাংস আর সিগারেট কিনে দিয়ে বাকিটা আপনি নিয়ে যান।

বেশ, কাল নিয়ে যাব এসে।

না না না—এখুনি নিয়ে যান আপনি, নিয়ে পালান।

করালীচরণের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বেশ, দিন।

ভন্‌টু নোট দুইটি লইয়া পকেটে পুরিল।

আলমারির কোণের দ্বারপ্রান্তে আবার সেই ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল ও বিড়বিড় করিয়া বকিতে শুরু করিল।

ভন্‌টু চমকাইয়া উঠিল।

আর কেউ ঘরে আছে নাকি?

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, ও মোস্তাক।

মোস্তাক! মোস্তাক কে?

ও আমার একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে আসে। মোস্তাক, এদিকে এস।

মোস্তাক অগ্রসর হইয়া আসিল ও আসিয়াই মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। এই উলঙ্গ মূর্তি দেখিয়া ভন্‌টু তো বিস্ময়ে নির্বাক।

বক্‌সি মহাশয় বলিলেন, উঠে এলে কেন মোস্তাক, বিড়ি আবার নিবে গেছে নাকি?

জুত হচ্ছে না।

দাও, আবার ধরিয়ে দিই। কই বিড়ি।

মোস্তাক কিছুক্ষণ বক্‌সি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, হোথা চ'লে গেছে।

তা হ'লে একটা সিগারেট নাও।

সিগারেট খাইতে মোস্তাকের ঘোর আপত্তি, সে ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। তাহার পর বলিল, ছবি দেখতে এলাম।

ছবি? ও, তুমি একটা ছবি এনেছ বটে—ভুলেই গেছি। এই নাও, দেখ।

বক্‌সি মহাশয় উঠিয়া ক্যালেণ্ডারের ছবিখানি পাড়িয়া তাহার হাতে দিলেন। মোস্তাক টেবিলের উপর ছবিখানি প্রসারিত করিয়া তাহার উপর ঝু কিয়া পড়িল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে শিশুসুলভ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া মোস্তাক বালিকাটির মুখের উপর ময়লা আঙুলটা রাখিয়া বলিল, এ কে?

ও খুকী।

এগুলো কি?

খরগোশ।

এগুলো কি?

কপিপাতা, খরগোশরা খাচ্ছে।

খুকী—খরগোশ—খাচ্ছে—সব 'খ'।

মোস্তাক এমন একটা মুখভাব করিয়া করালীচরণের দিকে তাকাইল, যেন সে ছবির মধ্যে 'খ'-এর প্রাধান্য আবিষ্কার করিয়া একটা মস্ত কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

করালীচরণ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বাঃ, ঠিক বলেছ। যাও, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—যাও। ছবিটা নিয়েই যাও।

সুন্দর ছবিখানা মুড়িয়া মোস্তাক সেটাকে বগল-দাবা করিল, আবার স্যালিউট করিল এবং ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদুর গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্যালিউট করিয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

বাই নারায়ণ, কি কেন?

খুকী আর খরগোশ একসঙ্গে কেন?

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, প্র্যাক্‌টিস করছে। খুকী যখন বড় হবে, খরগোশগুলোও বড় হবে। বড় হ'লে খরগোশগুলোর চেহারা কিন্তু

মানুষের মত হয়ে যাবে। মানুষ-খরগোশকে যাতে তখন ভাল ক'রে পোষ মানাতে পারে, তারই রিহার্স্যাল দিচ্ছে আর কি!

এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্যালিউট করিয়া মোস্তাক চলিয়া গেল। করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ও!

ভন্টু বলিল, এ কে বক্সি মশায়?

বললাম তো, আমার একজন বন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম, এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিল ও, তারপর মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে চ'লে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি, কলকাতার রাস্তায় এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলাম, পাগল হয়ে যাওয়াতে ওর চাকরি যায়। আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় আছেন, আছেন কি না, ভগবান জানেন। আমি রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে আসি, মাঝে মাঝে নিজেও আসে ও। আজ বিকেলে হঠাৎ ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানা নিয়ে এসে হাজির। বদ্ধ পাগল।

বক্সি মহাশয় আবার খানিকটা মদ গ্লাসে ঢালিলেন ও বোতলটা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, রাত হয়ে গেলে মাল পাবেন না, আমার এদিকে ফুরিয়েছে।

ভন্টু পশ্চাৎ হইতে ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও তৎপরে সশ্রদ্ধকণ্ঠে বলিল, এই যে যাই।

ভন্টু বাহির হইয়া বাইকে সওয়ার হইল।

লক্ষ্মণবাবু বাইকটি নিখুঁতভাবে সারাইয়া দিয়াছিল।

১৩

শঙ্কর একমনে আপনার ঘরে বসিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছিল। এত একাগ্রচিত্তে সে তাহার নিজের পাঠ্য-পুস্তকও কোনদিন পাঠ করে নাই। সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, মডার্ন ইয়োরোপ তাহার পাঠ্যতালিকা-

অন্তর্ভুক্ত নহে। আগামী কল্য ফিজিক্স্ প্র্যাকটিকাল ক্লাস আরম্ভ হইবে, অধ্যাপক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনাও করিয়া আসিতে বলিয়াছেন। শঙ্করের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নাই। মডার্ন ইয়োরোপের এই বইখানা সম্ভব হইলে আজ রাত্রের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে। জ্ঞানপিপাসা নয়, রিনিকে তাক লাগাইয়া দিতে হইবে। রিনিকে দেখাইতে হইবে যে, অপূর্বকৃষ্ণ পালিতই যে কেবল ইতিহাসে কৃতবিদ্য তাহা নয়, শঙ্করও ইতিহাসের কিছু কিছু জানে—যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র। গতকল্য রিনির জন্মতিথি-উৎসবে সে গিয়াছিল। মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, রিনির পড়াশোনায় সাহায্য করিতে পারে এমন একটি ভাল ছেলে যদি শঙ্কর যোগাড় করিয়া দেয়, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। প্রফেসার মিত্র নিজের পড়াশোনা লইয়া এত তন্ময় থাকেন যে, এসব দিকে—বস্তুত সংসারের কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আর কারও সঙ্গে তো আমার তেমন আলাপ নেই, আমাকে দিয়ে যদি চলে, বলুন।

আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত মিষ্টিদিদি বলিয়াছিলেন, ও মা, তা হ'লে তো সবচেয়ে ভাল হয়। পারবেন আপনি?

পারতে পারি।

সোনাদিদি সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে ও একবার মিষ্টিদিদির দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, একেই বলে ভাল ছেলে। সায়েন্স্ কোর্সের স্টুডেণ্ট্ আর্ট কোর্সের মেয়েকে পড়াবার ভার নিতে চায়! উঃ, আপনাদের মাথার ভেতরটাতে কি আছে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি বলছি।

উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছিল, চেষ্টা করলে সব জিনিসই সবাই করতে পারে। আপনি কিংবা মিষ্টিদিদি যদি চেষ্টা করেন, মিস মিত্রকে

নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। মিষ্টিদিদি তো পারেনই, বি. এ. পাস করেছেন উনি।

মিষ্টিদিদি হাস্যতরল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, রক্ষে করুন, আবার ওই সব! ওসব আপনাদের মত ভাল ছেলেদেরই পোষায়। সেদিন রিনি কি একটা সামান্য জিনিস জিজ্ঞেস করেছিল রোমান হিস্ট্রির, কিছুতে মনে এল না ছাই! ভাগ্যে অপূর্ববাবু ছিলেন, তিনি শেষকালে আমায় উদ্ধার করেন।

অপূর্ববাবু আসেন নাকি রোজ?

এ প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উত্তরে সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন। মিষ্টিদিদিও রহস্যময় হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, অপূর্ববাবু আসেন প্রায়ই। তাঁকে বললে তিনি অবশ্য রিনিকে পড়াতে রাজি হয়ে যাবেন, কিন্তু সেটা তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়। তিনি বেলাকে সন্ধ্যেবেলা গান শেখান, আরও এক জায়গায় কোথায় পড়ান নাকি।

গম্ভীর মুখ করিয়া সোনাদিদি বলিয়াছিলেন, না, সেটা ঠিক হয় না।

শঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে, সে রিনিকে পড়াইবে। সেই দিনই রিনিদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া শঙ্কর প্রফেসার গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সাহিত্যরসিক বলিয়া প্রফেসার গুপ্ত শঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শঙ্করের লেখা 'ট্র্যাজেডি ও কমেডি' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি নিজেই আসিয়া প্রবন্ধের লেখক শঙ্করসেবক রায়ের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই আলাপের পর হইতে শঙ্করও দুই-একবার তাঁহার বাসায় গিয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া সুখ হয়। লোকটি মার্জিতরুচি ও বিদ্বান। শুধু বিলাত নয়, ইয়োরোপের অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে প্রায়

পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু আলাপ করিলে মনে হয়, ঠিক যেন সমবয়সী। শঙ্করের সহিত বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর রিনিদের বাড়ি হইতে সোজা প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়া ইতিহাসের এই বইখানি আউট-বুক হিসাবে পড়িবে বলিয়া চাহিয়া আনিয়াছে এবং তাহাই এখন তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। বি. এ. কোর্সের ইতিহাসের বইগুলি তাহাকে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া ফেলিতে হইবে। ইংরেজীটা তাহার মোটামুটি জানাই আছে। সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে বেশি পরিশ্রম করিতে হইবে না। সংস্কৃতে সে খুব ভাল ছেলে ছিল। ফিলজফি? ফিলজফিতে রিনিকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে না। যদিই বা হয়, তাহা আয়ত্ত করাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অবনতমুখী রিনি বসিয়া রহিয়াছে। সেই লাজনম্রা, স্বল্পভাষিণী, শ্রীমণ্ডিতা তন্বীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তন্ময় শঙ্কর পড়িয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের কঠিন নাম ও তারিখগুলা সঙ্গীতের মত মনে হইতেছে।

হঠাৎ শঙ্করের তপোভঙ্গ হইল।

নীচে কে তাহাকে ডাকিতেছে।

চাকরটা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল যে, ভন্টুবাবু তাহার সহিত দেখা করিতে চান, নীচে কমন-রুমে বসিয়া আছেন।

শঙ্কর নামিয়া গেল। কমন-রুমে আর কেহ ছিল না, ভন্টু একাই বসিয়া ছিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি রে, এমন সময় হঠাৎ?

ভীমজাল এবং গভীর .গাড্ডা টু দি পাওয়ার থ্রী। মেজকাকা আবার সরেছে, বউদিদির খুব জ্বর, ট্যাক গড়ের মাঠ"।

শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শঙ্করের বিপন্ন মুখচ্ছবি

খিয়া ওষ্ঠ-বিকৃতি করিয়া ভন্‌টু বলিল, অমন ক'রে চেয়ে আছিস কেন
ঢ়োল? যা হবার হবে। এক কাপ চা খাওয়া তো আগে।

শঙ্কর চাকরকে ডাকিয়া দোকান হইতে চা আনাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে ভন্‌টু বলিল, কানা করালীর কাছে যাবি?

কানা করালী কে?

সেই জ্যোতিষী, সেই যে তোর কুষ্ঠি দেখেছিল একদিন, এত ভুলিস
!

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।

চল্‌ না, যাই সেখানে। তোর কুষ্ঠিটা গোনাবি বলেছিলি তো
কদিন।

শঙ্করের তখন যাহা মনের অবস্থা, তাহাতে নিজের ভবিষ্যতের
ন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাকে হিস্ট্রির পড়া করিতে
বে। সুতরাং সে বলিল, এখন যাওয়া অসম্ভব।

ভন্‌টু চাটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, আজ কন্‌সেশন ডে ছিল, সস্তায়
'ত। আজ বুধবার তো?

কন্‌সেশন ডে মানে?

মানে বুধবার দিন তার হাফ ফী। অন্য দিন দশ টাকা নেয়, আজ
াচ টাকা।

তাই নাকি? বেশ তো, পাঁচটা টাকা দিচ্ছি তোকে, তুই গুনিয়ে
য়ে আয়—সব ঠিক ঠিক ব'লে দেবে তো?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভন্‌টু বলিল, ব'লে দেবে মানে? এ রকম
র্ভুল গণনা আর কোথাও পাবি না। করালী একেবারে চাম ল—দ।

তুই তা হ'লে গুনিয়ে নিয়ে আয়, আমি টাকা দিচ্ছি তোকে।

শঙ্কর উপরে চলিয়া গেল ও পাঁচটা টাকা আনিয়া ভন্‌টুকে দিল।
াকা আনিল অবশ্য সে ধার করিয়া। তাহার নিজের কাছে কিছুই

ছিল না। রিনির জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনখানা দামী বই কিনিয়া তাহা
যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ হইয়াছে। টাকা দিয়া সে ভন্টুকে বলি
নটা তো বাজে; এত রাত্রে তুই বাড়ি না গিয়ে জ্যোতিষীর ওখা
যাবি? বউদির জ্বর বলছিলি!

ভন্টু টাকা কয়টি ভিতর দিককার পকেটে রাখিতে রাখিতে বলি
জ্বর তো বটেই—আমি আর বাড়ি ব'সে থেকে তার কি করব?
করবার তা তো ক'রেই এসেছি। করালীর সঙ্গে একটু লদ্‌কালদ্‌
ক'রে আবার ফিরব এখুনি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, মেজকাকা সরেছে কবে?

কাল সন্ধ্যে থেকে না-পাত্তা।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ভন্টু বলিল, একটা দেশলাই আন্ দেখি, বাইকের আলো
জ্বালতে হবে।

শঙ্কর পাশের ঘর হইতে দিয়াশলাই আনিয়া দিল ও ভন্টু
আগাইয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিল। ভন্টুর বাইক
গেটের কাছেই ঠেসানো ছিল। ভন্টু পকেট হইতে একটি
মোমবাতি ও একটি কাগজের ঠোঙা বাহির করিল, তাহার পর বাতি
জ্বালাইয়া ঠোঙার ভিতর স্থাপন করিয়া শঙ্করকে বলিল, ধর্ দিকি, আ
বাইকে চড়ি, তারপর আমার হাতে দিস।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, তোর ল্যাম্প্ কি হ'ল?

ভন্টু হাস্যদীপ্ত চক্ষে উত্তর দিল, খুজ্‌বুজ্।

খুজ্‌বুজ্ মানে?

মানে—বিক্রমপুর, এবং তস্য মানে—বেচে ফেলেছি। সং
চালাতে হবে তো!

ভন্‌টু বাইকে সওয়ার হইল।

ভন্‌টুকে বিদায় দিয়া শঙ্কর আবার আসিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রি অনেক।

হস্টেলের সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেই ;জের নিজের ঘরে খিল দিয়াছে। ষোল নম্বর ঘরের রামকিশোরবাবু ম খটখট করিতে করিতে বাথ-রূমের দিকে চলিয়াছেন। শঙ্কর ;জের ঘরে বসিয়া বসিয়া তাঁহার গলার-সাঁকি-বাহির-করা মূর্তি কল্পনা- ;ত্রে দেখিতেছিল। হাতকাটা ফতুয়া পরা, কানে পইতা জড়ানো। নকিশোরবাবু তিনবার বি. এ. ফেল করিয়া চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত তেছেন। রামকিশোরবাবুর খড়মের শব্দ পাইয়া শঙ্কর বুঝিল, এখনই লো নিবিয়া যাইবে। কারণ আলো নিবিবার ঠিক দশ মিনিট পূর্বে নকিশোরবাবু খড়ম পরিয়া বাথ-রূম অভিমুখে যান ও ফিরিয়া আসিয়া ম্না হইতে জল ঢালিয়া সশব্দে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করেন— । তাঁহার বাঁধা নিয়ম। রামকিশোরবাবু ফিরিয়া আসিলেন ও ধিমত হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলেন। তখন র ধীরে ধীরে নিজের ঘর হইতে বাহির হইল ও এদিক ওদিক চাহিতে কপাটে তালা লাগাইতে লাগিল। ভন্‌টুর সহিত হইবার পর কিছুক্ষণ সে ইতিহাস পাঠ করিয়াছিল এবং পুস্তকটার য় এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়াও ফেলিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ আর সে ;তে পারিল না। যে কারণে সে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়া- ঠিক সেই কারণেই তাহাকে এখন ইতিহাস পড়া স্থগিত রাখিতে । সে আশা করিয়াছিল, ভন্‌টু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া গণনার াফল তাহাকে জানাইয়া যাইবে। কিন্তু ভন্‌টু তো কই আসিল না! ারোটা প্রায় বাজে। ভন্‌টু তাহার সম্বন্ধে কি তথ্য আবিষ্কার করিল

জানিবার জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল; ইতিহাস পড়ায়: বসিতেছিল না। এতক্ষণ সে রামকিশোরবাবুর শয়নের প্রতীক্ষায় ছিঃ রামকিশোরবাবু এই ব্লকের প্রবীণতম ছাত্র এবং 'মনিটার'। অ: যোগাড়যন্ত্র করিয়া শঙ্কর একটি সিংগ্‌ল-সীটেড রুম লইয়াছে, সুত: বাহিরে যাইতে হইলে তালা লাগাইয়া যাইতে হইবে। এ সময় শঙ্ক: ঘরে তালা লাগানো থাকিলে তাহা রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি এড়াইবে ন এসকল বিষয়ে রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি এবং তাঁহার এই শ্যেনদৃ উপর নির্ভর করিয়া নব-বিবাহিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় (জনশ্র তিনি রামকিশোরবাবুর সহপাঠী ছিলেন) যখন তখন কলিকা: শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার সুবিধা পান এবং রামকিশোরব রিপোর্টকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রামকিশোরকে করিয়া চলিতে হয়।

ঘরে তালা লাগাইতে লাগাইতেই আলো নিবিয়া গেল। অন্ধক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। নীচে গি দারোয়ানকে চুপিচুপি কি বলিল। দারোয়ান প্রথমটা একটু আপ করিয়া অবশেষে শঙ্করের পীড়াপীড়িতে রাজি হইল এবং গেট খুলি দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে, শঙ্করবাবুর কথা অম করিতে পারে না বলিয়া এই অন্যায় কার্যটি সে করিতেছে, কিন্তু 'বাত' প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার 'নোক্‌রি' থাকিবে না। শঙ্ক তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভর্ন্তুর সহিত আজ রা: তাহার দেখা করিতেই হইবে। হাতে পয়সা ছিল না, সুতরাং হাঁটিয় সে চলিল। একা অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে শঙ্কর কখন যে এক গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। যদি অন্যমনস্কভাবে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু ভুল গলিতে সে ঢোকে নাই। গলিটা দিয়া গেলেই সোজা সে বেলেঘাটার মোড়ে গিয়া হাজির হই:

পারিবে। অন্যমনস্কভাবে সে চলিতেছিল, সজ্ঞানভাবে পথের সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তাহার সমস্ত অন্তর একাগ্রভাবে যাহার দিকে উন্মুখ হইয়া ছিল, সে রিনি। লজ্জিতা রিনি, কুণ্ঠিতা রিনি, স্বল্পভাষিণী রিনি, কাব্যানুরাগিণী রিনি, আয়তনয়না রিনি, ঈষৎ-হাস্য-স্নিগ্ধা রিনি, বিরক্ত রিনি, বিপন্ন রিনি—রিনির নানা মূর্তি তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। আনাগোনার আর বিরাম নাই। অপলকদৃষ্টিতে শঙ্কর রিনির সঞ্চরমান নানা মূর্তির দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার দেখারও আর বিরাম নাই, সে আর কিছু দেখিতেছে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে রিনিকেই দেখিতেছে, ভাবিতেছে, মনে মনে স্পর্শ করিতেছে। তাহারই জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন, তাহারই জন্য সমস্ত সত্তা উন্মুখ, তাহারই জন্য সে টাকা ধার করিয়া ভন্টুকে দিয়াছে এবং তাহার মনের গোপন বাসনাটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কোষ্ঠীগণনায় কিছুমাত্র আভাসিত হইয়াছে কি না, তাহাই অবিলম্বে জানিবার জন্য এত রাত্রে হাঁটিয়া সে চলিয়াছে। অথচ এই কয়েক দিন পূর্বেও সে রিনির কথা একবার ভাবে নাই। দেখা হইলে সহজ শিষ্টতাসঙ্গত আলাপ-পরিচয় করিয়াছে, নমস্কারের পরিবর্তে প্রতিনমস্কার করিয়াছে। সহসা এ কি হইয়া গেল? অকারণে সহসা যেমন আকাশের একটা কালো মেঘ সূর্যকিরণ-রঞ্জিত হইয়া মহিমময় হইয়া উঠে, বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহসা যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ডের গরিমায় শিখায়িত হইয়া উঠে, শঙ্কর তেমনই সহসা রিনির প্রেমে পড়িয়া আশা-আশঙ্কার তীব্র-মধুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া পথ চলিতেছিল।

সহসা তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

একটা খামের চিঠি সজোরে আসিয়া তাহার গালে লাগিল। রঙিন খামের চিঠি। গলির স্বল্পালোকে সে পড়িয়া দেখিল, উপরে লেখা রহিয়াছে—স্বর্ণলতা দেবী। ঘাড় ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল

একটি খোলা জানালা। জানালার ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেদিনকার সেই লোকটি অর্থাৎ ভন্টু যাহাকে মোমবাতি বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিল, সে এবং একটি কিশোরী কথাবার্তা বলিতেছে। টেবিলে রক্তজবার মত একটা আলো। শঙ্কর সবিস্ময়ে পত্রখানা লইয়া ভাবিতেছিল, কি করা উচিত, পত্রখানা সে মৃন্ময়বাবুকে দিয়া যাইবে কি না! ওই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথেই যে পত্রখানা আসিয়াছিল, তাহাতে শঙ্করের সন্দেহ ছিল না। কে এই স্বর্ণলতা!

হঠাৎ শঙ্করের কানে গেল, সেই কিশোরীটি বলিতেছে, ওটা কি ফেলে দিলে?

মৃন্ময় বলিল, ও একখানা বাজে কাগজ। তোমার রান্না হয়ে গেছে?

ওমা, রান্না তো ভারি! সব শেষ হয়ে গেছে কখন। তোমার রুটির নেচিগুলো করা আছে, এখনও বেলা সেকা হয় নি। ঠাকুরপো কখন খেয়ে নিয়েছে।

শঙ্করের মনে হইল, মৃন্ময় একটু যেন রূঢ়স্বরেই প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ ঘরে এলে কেন?

ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, একটা মজার জিনিস দেখাতে এলুম, চুপিচুপি এস এ ঘরে। বেড়াল-ছানাটা গোল হয়ে ফুলে তোমার বিছানার একধারে কেমন চোখটি বুজে ব'সে আছে, বেচারীর শীত করছে বোধ হয়। তোমার মলিদার গলাবন্ধটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ছুষ্টু ছুষ্টু মুখটি বেরিয়ে আছে খালি। দেখবে এস না, কেমন মজার দেখতে হয়েছে!

শঙ্কর আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পত্রখানি পকেটে পুরিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল। নিজের তাগিদ ছিলই, তাহা

ছাড়া এমনভাবে লুকাইয়া আড়ি-পাতাটা তাহার ভদ্র অন্তঃকরণে ভাল লাগিতেছিল না। পরে চিঠিখানা মৃন্ময়বাবুকে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ভন্টুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতা শহর ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রিক্‌শার টুং টুং শব্দ, দুই-একটা ইতস্তত-অপেক্ষমান ফেটিন-গাড়ির গাড়োয়ানের আহ্বান অথবা ধাবমান মোটরের আকস্মিক আবির্ভাব ছাড়া চতুর্দিক ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটা পানের দোকানে কদাচিৎ দুই-একজন পুরুষ অথবা নারী দেখা যাইতেছে। কোন বৃহৎ অট্টালিকার গাড়িবারান্দার নীচের আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। এই শীতে রাস্তার ফুটপাথের উপর ঘুমন্ত দরিদ্র নর-নারী স্থানে স্থানে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় নানা জিনিস দেখিতে দেখিতে শঙ্কর অবশেষে ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল, গভীর নীরবতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন। ওদিককার একটা ঘরে যেন একটি আলো জ্বলিতেছে।

ভন্টু, ভন্টু!—শঙ্কর ডাকিতে লাগিল।

অনেক ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শন্টু—ভন্টুর ভাইপো—মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি শঙ্কর। ভন্টু কোথায়?

কাকাবাবু এখনও বাড়ি ফেরেন নি।

ইহার পর শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শন্টুই আবার বলিল, এখুনি ফিরবেন বোধ হয়। আপনি একটু বসবেন?

বেশ, চল।

বসিবার মত বাহিরে কোন পৃথক ঘর ছিল না। শঙ্করকে একেবারে-

অন্তঃপুরেই যাইতে হইল। গিয়াই তাহার বউদিদির সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি শঙ্করের সাড়া পাইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন। জ্বর হওয়াতে মুখখানি থমথম করিতেছে। কিন্তু তাঁহার ঢলঢলে কালো মুখখানি শঙ্করকে দেখিয়া হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মেঘলা দিনে যেন সহসা এক ঝলক রৌদ্র দেখা দিল। তাম্বুলরঞ্জিত শুষ্ক অধর দুইটি সহসা যেন সজীবতা প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর দেখিল, বউদিদির কালো ডাগর চক্ষু দুইটি জ্বরের উত্তাপে আরও যেন আবেশময় হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া গায়ের ছিন্ন র‍্যাপারটি সর্বাঙ্গে জড়াইতে জড়াইতে বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, দেখছ কি শঙ্কর-ঠাকুরপো ? এত রাত্রে হঠাৎ এলে যে ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শঙ্কর বলিল, জ্বর হয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ।

ভন্টু এখনও ফেরে নি ?

ওষুধ আনছি ব'লে সেই যে সন্ধ্যে থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি। চেনই তো তাকে, একবার কোথাও বসলে আর ওঠবার নামটি করবে না।

শঙ্কর মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ভন্টু তো তাহারই জন্য জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়াছে। কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, আপনার ওষুধ-বিষুদের কোন ব্যবস্থা না ক'রেই বেরিয়েছে সে ? আশ্চর্য তো !

বউদিদি বলিলেন, সন্ধ্যের সময় পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল। একটু হাসিয়া বলিলেন, খুব ভাব করেছে তাঁর সঙ্গে। তিনিই এসে একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দিয়েছেন, তাই আনতেই তো বেরুল। কোথাও আটকে গেছে বোধ হয়। কিংবা, কি জানি—

বউদিদির মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়াপাত হইল।

মা, খিদে পেয়েছে।

শন্টুর ভাই নন্টু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। দিগম্বর মূর্তি, বয়স বছর পাঁচেক হইবে। সে শঙ্করকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এই স্বল্পপরিচিত লোকটির সমক্ষে ক্ষুধার জন্য মাকে বিব্রত করা যে অশোভন হইবে, তাহা সে যেন অনুভব করিল। মায়ের পাশটিতে দাঁড়াইয়া বাঁ হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে আড়চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে সে চাহিতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, তুমি একটু ব'স শঙ্কর-ঠাকুরপো, আমি এটাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। চল্, খাবি চল্।

শিশুকে লইয়া বউদিদি ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন।

শঙ্কর শুনিতে পাইল, শিশু বলিতেছে, সাবু খাব না।

লক্ষ্মী সোনা আমার, কাল সকালে কেমন বেগুনভাজা দিয়ে ভাত ক'রে দেব, কেমন? এখন এইটুকু খেয়ে শুয়ে পড় তো ধন, নন্টুবাবু ভারি লক্ষ্মীছেলে, খেয়ে ফেলো তো বাবা চোঁ-চোঁ ক'রে।

এত মিনতি সত্ত্বেও কিন্তু সাবু খাইতে সে সহসা রাজি হইল না। বায়না করিতে লাগিল। বউদিদিরও ধৈর্য অসীম, অনেক কষ্টে তাহাকে ভুলাইয়া সাবুটুকু খাওয়াইলেন ও বিছানায় শোয়াইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে শঙ্করের সহিত গল্প করিতে বসিবেন, এমন সময় ফন্তি উঠিয়া আসিল ও মায়ের কানে ফিসফিস করিয়া বলিল যে, তাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। শঙ্করকাকার সম্মুখে ক্ষুধার কথাটা চেঁচাইয়া বলিতে তাহার লজ্জা হইল। হাজার হোক, সে একটু বড় হইয়াছে তো।

বউদিদি বলিলেন, ওই যে কড়াতে ঢাকা দেওয়া আছে, একটু চেলে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়্ না মা, আমি শঙ্করকাকার সঙ্গে একটু কথা বলি।

ফন্তি ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল, একটু দুধ মিশিয়ে নেব মা?

দুধ আবার কেন ফন্তু, একটুখানি দুধ আছে, বাবা আবার এখুনি হয়তো চা চাইবেন।

ভিতর হইতে আর কোন উত্তর আসিল না।

শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না—এদের সবারই জ্বর নাকি, সব সাবু খেতে দিচ্ছেন যে?

বউদিদির মুখে যেন মেঘ নামিয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। সহাস্যমুখে তিনি বলিলেন, জ্বর না হ'লেও গা-ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে সবগুলোরই; তা ছাড়া নিজে জ্বরে মরছি, এদের জন্যে আর ভাতের হাঙ্গাম করি নি রাত্তিরে। বাবাকে অবশ্য খানকতক লুচি ক'রে দিয়েছি সন্ধ্যেবেলা। আমাদের জন্যে আর কিছু করি নি এবেলা। —বলিয়া বউদিদি হাসিয়া গায়ের কাপড়টা আর একটু জড়াইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিলেন।

শীত করছে বউদি? আমার গায়ের কাপড়টা নেবেন?

না না, থাক্, এতেই আমার বেশ গরম হচ্ছে।

পাশের ঘরে খুটখাট করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, বাবা উঠেছেন।

পর-মুহূর্তেই দরাজকণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, বউমা, ভন্টু এসেছে নাকি?

বউদিদি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। একটু পরেই সে শুনিতে পাইল, বৃদ্ধ বলিতেছেন, কে, শঙ্কর এসেছে নাকি? এত রাত্তিরে হঠাৎ? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো? জিজ্ঞেস কর সেটা। এখানেই ডেকে আন না, এই শীতে বাইরে কেন?

বউদিদি বাহিরে আসিয়া ডাকিতেই শঙ্কর ভিতরে গেল। গিয়া

দেখিল, ভন্টুর বাবা কলিকায় ফুঁ দিতেছেন। গায়ে একটি দামী সাদা সোয়েটার। কলিকার আগুনের আভায় তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, এস এস, এত রাত্তিরে কি মনে ক'রে? বাইরেই বা ব'সে কেন, যা ঠাণ্ডাটা পড়েছে!

ভন্টুর কাছে দরকার ছিল একটু।—বলিয়া শঙ্কর নিকটস্থ টুলটিতে বসিল। বউদিদি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শঙ্করের উক্তি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। ভন্টুর বাবা কালা। খুব চীৎকার করিয়া কথা না বলিলে তিনি শুনিতেই পান না। কানের খুব কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলে অবশ্য শুনিতে পান। সাধারণত ভন্টুর বউদিদিই সকলের কথা তাঁহাকে এইভাবে শুনাইয়া থাকেন।

শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, ভন্টু এখনও ফেরে নি বুঝি? কটা বাজে?—এই বলিয়া বৃদ্ধ বালিশের নীচে হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন ও দেওয়ালের ব্র্যাকেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, রাত তো খুব বেশি হয় নি, দশটা বাজে মোটে, এইবার ফেরবার সময় হয়েছে ভন্টুর।

শঙ্কর বিস্মিত হইল। সে-ই তো হস্টেল হইতে বাহির হইয়াছে এগারোটার পর। সে বলিতে যাইতেছিল যে, ঘড়িটা বোধ হয় স্লো আছে—, বউদিদি চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন।

বৃদ্ধ কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ তো? না এসে থাক তো বউমা খানকয়েক লুচি ভেজে দিক।

আমি খেয়ে এসেছি।

বউদিদির মারফৎ এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, চা একটু

হোক তা হ'লে, চায়ের তো আর সময়-অসময় নেই, কি বল বউমা? আমাকেও একটু দিও।

পুরু লেন্সের চশমায় আলো বিকীরণ করিয়া তিনি বউমার দিকে চাহিতেই বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, দিচ্ছি ক'রে।

বউদিদি একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, ইহাদের সংসারে নানাবিধ অভাব সত্ত্বেও বৃদ্ধের কোনরূপ অসচ্ছলতা নাই। তাঁহার পরিষ্কার বিছানাপত্র, নেটের ফরসা মশারি, সারি সারি কলিকা, দামী গড়গড়া, দামী চটিজুতা, আলনায় পরিষ্কার কাপড়-জামা, চকচকে গাড়ুর উপর পাট-করা লাল গামছাখানি—দেখিয়া মনে হয়, যেন কোন ধনী বৃদ্ধ দুই-চারি দিনের জন্য আসিয়া এই দরিদ্র পরিবারে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার ঘরের বাহিরেই যে দৈন্য নানা মূর্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছে, তাহার লেশমাত্র আভাসটুকুও এ ঘরের মধ্যে নাই।

বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া শঙ্করকে বলিলেন, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, নানা দিক থেকে চিঠিপত্র লিখে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে আমাকে।—বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া আবার তাম্রকূটে মন দিলেন। একটু পরেই আবার চোখ খুলিয়া বলিলেন, ভন্টুর বিয়ের কথা গো। তোমরা দেখে শুনে একটা ঠিক ক'রে ফেল। বয়সও তো হয়েছে। আজকালই সব ধেড়ে ধেড়ে ছেলের বিয়ে হয়, আমাদের কালে— বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া পুনরায় বলিলেন, আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ষোল বছর আর ভন্টুর গর্ভধারিণীর বয়স তখন আট কি নয়। আমার পিতার বিবাহ হয় আরও সকাল সকাল—বারো বছর বয়সে। পুনরায় তামাকে মন দিলেন।

বাহিরে ভন্টুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বউদি, বউদি! শন্টু!

শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য দাঁড়াইতেই ভন্টুর বাবা চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, যাচ্ছ কোথা, ব'স। এইখানেই বউমা চা আনবে এখন।

শঙ্কর বলিল, ভন্টু এসেছে।

অ্যাঁ, কি বললে?

শঙ্কর তখন তাঁহার কাছে গিয়া একটু চীৎকার করিয়াই তাহার কথার পুনরুক্তি করিল এবং বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াই শুনিতে পাইল, বউদিদি বলিতেছেন, ছি ছি, এত রাত্তির করে মানুষে! তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়ল, উনুনের আঁচ গেল। শঙ্কর-ঠাকুরপো এসেছে, ব'সে আছে বাবার ঘরে। এই যে—

শঙ্কর ও ভন্টু মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইল ও নিমেষের জন্য নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। নিমেষের জন্য।

তাহার পর ভন্টু বলিল, কি রে, তুই হঠাৎ?

জানতে এলাম।

জানতে এলি? আচ্ছা উন্মাদ তো তুই! আয়, বাইকটা ধ'রে তুলি দুজনে।

বউদিদি বলিলেন, তা হ'লে তোমরা এস তাড়াতাড়ি, চায়ের জল হয়ে গেছে।

শঙ্কর বলিল, স্টোভের আওয়াজ পেলাম না, চায়ের জল করলেন কি ক'রে?

বউদিদি বলিলেন, উনুনে আঁচ ছিল।

বউদিদি এই বলিয়া ভন্টুর দিকে চাহিলেন। ভন্টু ও বউদিদির

ভাবানয় একটা দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। শঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, ব্যাপার কি ?

ওসব মেয়েলী ব্যাপারে তোর ঢোকবার দরকার কি ? আয়, বাইকটা তুলি।

শঙ্কর ও ভন্‌টু বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া শঙ্কর দেখিল, বাইকটি বারান্দার নীচে ঠেসানো রহিয়াছে। অন্ধকারেই শঙ্কর দেখিতে পাইল যে, বাইকের পশ্চাতে ও সম্মুখে নানারূপ জিনিস বাঁধা ও ঝুলানো রহিয়াছে।

থাম্‌, মোমবাতিটা জ্বালি।

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই শঙ্করের চোখে পড়িল, সেই কাগজের ঠোঙাটা বারান্দায় নামানো রহিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র মোমবাতিটি বাহির করিতে করিতে ভন্‌টু বলিল, উঃ, রাস্তায় এতগুলো জিনিস নিয়ে যেন সার্কাস করতে করতে এসেছি !

জিনিসপত্র সমেত বাইকটা দুইজনে ধরিয়া উপরে তুলিয়া ফেলিল। তাহার পর ভন্‌টু বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে নিম্নকণ্ঠে শঙ্করকে বলিল, সব হদিস পেয়েছি তোর।

কি হদিস ?

পরে সব বলব। এখানে সেসব কথা বলার সুবিধে হবে না।

দুই পেয়ালা চা লইয়া বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন ও ভন্‌টুর কথার শেষার্ধ শুনিয়া বলিলেন, কি সুবিধে হবে না ? নাও, চা নাও। কি সুবিধে হবে না ?

ভন্‌টু গম্ভীর মুখে বলিল, শঙ্করের সব ক্রিমিনাল অ্যাফেয়ার, ঢুকো না ওতে।

বউদিদি হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন ও আর এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভন্টু প্রশ্ন করিল, আবার কার চা ?

বাবার।

চা লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

ভন্টু মুখ স্থচালো করিয়া তাহার স্থূল শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

শঙ্করের চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। ভন্টু তাহার কি হদিস পাইয়া আসিয়াছে, না শোনা পর্যন্ত তাহার আর স্বস্তি ছিল না। ভন্টুকে সে বলিল, চল্, বাইরে যাই।

থাম্, জিনিসপত্রগুলো বিড্‌ডিকারের জিম্মায় দিয়ে দিই আগে। বিড্‌ডিকার মানে বউদিদি। চা দিয়া বউদিদি বাহির হইয়া আসিলেন। ভন্টু উঠিয়া বাইক হইতে খুলিয়া খুলিয়া জিনিসগুলি তাঁহাকে দিতে লাগিল। ভন্টু জিনিস আনিয়াছিল কম নয়—চাল, ডাল, মসলা, শিশিতে করিয়া তেল, কিছু কমলালেবু, এক শিশি ঔষধ ও সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি টুকিটাকি নানারকম জিনিস। সব নামাইয়া দিয়া ভন্টু বলিল, তুমি এবার শুয়ে পড় বউদিদি। এই নাও, তোমার জন্যে কমলালেবু এনেছি, শুয়ে শুয়ে ধ্বংস করগে যাও। চারটি ভাতে-ভাত আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, ও বাহাদুরি আর ক'রে কাজ নেই। হাত-পা পুড়িয়ে সেবারের মত শেষে এক কাণ্ড ক'রে ব'স আর কি!

ভন্টু মুখ-বিকৃতি করিয়া তাঁহাকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বউদিদি হাসিতে হাসিতে জিনিসপত্র তুলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, বউদি, আপনার জ্বর এখন কত ?

আছে বোধ হয় একটু—সামান্যই হবে।

ভন্টু ভিতরে গিয়া একটা থার্মোমিটার লইয়া আসিয়া বলিল, এটা বাগিয়েছি আজ ধীরেনবাবুর কাছে। লাগাও তো দেখি।

বউদিদি প্রথমে রাজি হইলেন না; অনেক বলা-কহার পর হইলেন। থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখা গেল, জ্বর ১০২ ডিগ্রী। শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া গেল। এত জ্বর লইয়াও বেশ স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে রহিয়াছেন তো! বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

ভন্টু গম্ভীরভাবে বলিল, কেন ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারে ঢুকছিস? চল্, বাইরে যাই। বিড্‌ডিকার is as obstinate as a mule.

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, পাগল হয়েছ তোমরা! অত জ্বর আমার নেই, ও থার্মোমিটার তোমাদের ভুল। ভাঙা থার্মোমিটার ব'লেই ধীরেন ডাক্তার দিয়ে দিয়েছে।

এতদুত্তরে ভন্টু মুখ বিকৃত করিয়া একবার তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও শঙ্করকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ভয়ানক শীত। শঙ্কর প্রথমেই প্রশ্ন করিল, কি হ'ল কুষ্ঠির?

অনেক প্যাঁচ তোর: করালী বললে, একদিনে হবে না।

প্যাঁচ? কি প্যাঁচ?

সঙিন প্যাঁচ এবং রঙিন প্যাচ। এর বেশি করালী আর কিছু বললে না। সব খুলে বলবে বলেছে আর একদিন। তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সেদিন।

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর কিছু বললে না?

না। উঃ, কি শীত রে! চল্, ভেতরে চল্।

আসিতে আসিতে শঙ্কর বলিল, কোনও খবর পেলি মেজকাকার?

কিচ্ছু না। ঘড়েল বাবাজী কোন খবর রেখে যায় নি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, করালী লোকটা রিলায়েব্‌ল তো?

ভন্টু দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বিস্তার করিয়া সংক্ষেপে বলিল, গোদা চাষ।

ভন্টু গমনোদ্যত হইলে শঙ্কর বলিল, দাঁড়া, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুই এত রাত্রে বাজার ক'রে নিয়ে এলি মানে? ছেলেগুলো সব সাবু খাচ্ছে—

ভন্টু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিয়া বলিল, নো মানি। দাদা টাকার অভাবে প'ড়ে পুরী থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তাঁকে টি. এম. ও. করতে গিয়ে অন্ত-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ-গোছ হয়ে দাঁড়াল। কি করব বল্? উপায় কি? অনেক কষ্টে ধারধোর ক'রে যোগাড় করলাম কিছু টাকা। সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, মায় চাল পর্যন্ত। চল্, ভেতরে চল্, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।

ভিতরে আসিতেই বউদিদি ভন্টুকে বলিলেন, আর একটু হ'লেই শঙ্কর-ঠাকুরপো সব মাটি করেছিল। বাকুর ঘড়ি যে তুমি যাবার সময় দম দেবার নাম ক'রে দু ঘণ্টা স্লো ক'রে দিয়েছিলে, আর একটু হ'লেই সব ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

ভন্টু বলিল, সর্বনাশ! বাকুর ঘড়ি দরকারমত স্লো-ফাস্ট আমরা হরদম করছি। খবরদার, ও বিষয়ে কক্ষনও কিছু বলিস না। বরং এমন ভাব করবি যে, ওইটেই বেস্ট ঘড়ি ইন ক্যাল্‌কাটা।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

ভন্টু বলিতে লাগিল, মেজকাকা যে মরেছে, তাই বাকু জানে না এখনও। বাকু জানে, মেজকাকা প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করছে, সেইজন্যেই বাইরে যেতে হয়েছে। খবরদার, বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলিস নি যেন কোনদিন।

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, আমি এবার যাই ভাই, রাত হয়েছে। এতটা আবার হাঁটতে হবে তো!

থেকে যা না আজ রাত্তিরে, লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক।

না, তা হয় না। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসেছি তো, ফিরে না

গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। যা রামকিশোরবাবু আছে, সেই তোর বক।

ভন্টু বলিল, ও, মিস্টার ক্রেন?

হ্যাঁ।

তা হ'লে যা। কাল আবার দেখা করবি।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। যাই তা হ'লে বউদি।

এস।

হ্যারিসন রোড দিয়া শঙ্কর একা হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

নানারূপ এলোমেলো চিন্তার আলোছায়ায় সমস্ত মনখানা তাহার বিচিত্র। মৃন্ময় ও তাহার চিঠির কথাটা সে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ কি, এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! কে এই স্বর্ণলতা! হঠাৎ পিছন দিক হইতে একখানা মোটরকার আসিয়া তাহার পাশে থামিল।

শঙ্করবাবু যে, এখানে কি করছেন এত রাত্রে?

শঙ্কর চমকাইয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটস্থ করিল। ফিরিয়া দেখিল, অচিনবাবু। সেদিন প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে রিনির জন্মতিথি-উৎসবের দিন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অচিনবাবু মোটরকারের দালাল। দালালি করার মত সঙ্গতি আছে, দক্ষতাও আছে। শ্যামবর্ণ নাতিস্থূল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। ভাসা-ভাসা চোখে দামী সোনার চশমা। কালো রঙে সোনার চশমা মানাইয়াছিল ভাল। মোটরখানিও দামী।

এখানে কি করছেন?

একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, ফিরছি।

আসুন তা হ'লে, লিফ্‌ট দিয়ে দিই।

চলুন।

মৃন্ময়ের বাড়িতে ফিরিয়া তাহার জানালা গলাইয়া পত্রটি তাহার বাহিরের ঘরটিতে ফেলিয়া দিয়া যাইবে—এই উদীয়মান ইচ্ছাটি আর পূর্ণ হইল না। শঙ্কর অচিনবাবুর গাড়িতে চাপিয়া বসিল। গাড়িতে উঠিয়াই একটা তীব্র এসেন্সের গন্ধ সে পাইল। হাসিয়া বলিল, খুব গন্ধের ছড়াছড়ি দেখছি আপনার গাড়িতে!

গাড়িটা স্টার্ট করিয়া খুব গম্ভীরভাবে অচিনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, এইমাত্র একজন সুরভিত প্রাণীকে নাবিয়ে দিয়ে এলাম।

জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কে তিনি?

জিজ্ঞেস আপনি অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু উত্তর দেওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই।

স্টিয়ারিং ধরিয়া গম্ভীর মুখে অচিনবাবু সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দ্রুত নিঃশব্দ বেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, আর প্রয়োজনও নেই, উত্তর পেয়ে গেছি।

অচিনবাবু তথাপি নীরব।

শঙ্করের মনে হইল, যেন তাঁহার চোখের কোণে একটা অতি চাপা মৃদুহাস্য উঁকি দিতেছে। মুখ কিন্তু গম্ভীর। একটা রিক্‌শাওয়ালা গলি হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে বাহির হইল। তাহাকে পাশ কাটাইয়া অচিনবাবু আপন মনেই যেন বলিলেন, মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী। এইটেই বোধ হয় মানুষের বিশেষত্ব।

শঙ্কর কিছু বলিল না। একটু পরেই গাড়ি আসিয়া শঙ্করের হস্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর নামিয়া পড়িল। অচিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবেন না যেন শঙ্করবাবু

যাঁর গন্ধ এতক্ষণ উপভোগ করতে করতে এলেন, তিনি নারী নন—পুরুষ।

এটা তা হ'লে কার?

শঙ্কর একটা সোনার মাথার কাঁটা অচিনবাবুর হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, গাড়ির সীটে ছিল।

অচিনবাবুর গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না।

ও, ওটা আর একজনের, দিন। অনেক ধন্যবাদ। চলি তবে—গুড নাইট।

মোটর চলিয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

১৪

মুকুজ্জেমশাই যখন মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আসন্ন অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্রালোকে ক্ষুদ্র গলিটি তন্দ্রাতুর। চারিদিকে কোন জীবনের লক্ষণ নাই। একেবারে যে নাই তাহা নহে, একটা ডাস্ট্‌বিনের উপর উঠিয়া একটা লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুর লুব্ধ আগ্রহে কি যেন খাইতেছে, কিছু দূরে একটা গলিতে ঢং ঢং শব্দ করিয়া একটা বাসনবিক্রেতা বাসন ফেরি করিতেছে। ইহা ছাড়া চতুর্দিকে আর বিশেষ কোন চাঞ্চল্য নাই। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া ডাকিতেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল এবং তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটির সহিত অনেকেই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার আসল পরিচয় কেহই বোধ হয় জানে না। পরিচিত-মহলে তিনি মুকুজ্জেমশাই নামেই খ্যাত, নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া থাকেন—ভবতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহার বেশি নিজের আর কোন পরিচয় তিনি কাহাকেও দেন না। তাঁহার সম্বন্ধে কেহ বেশি কৌতূহল

প্রকাশ করিলে বলেন, পৃথিবীর অনেক জিনিসই তো জান না, এটাও না হয় না জানলে! বলেন আর হাসেন। তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন মুখের হাসিতে অসামান্য একটি মাধুর্য আছে। আয়ত আরক্ত চক্ষু দুইটি সরল স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে সর্বদাই যেন ঝলমল করিতেছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের নিজের কাজ বলিয়া কিছু নাই, কারণ তাঁহার নিজস্ব সাংসারিক কোন বন্ধনই নাই। কিন্তু মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই বিব্রত ও ব্যস্ত, নানা কাজের চাপে তিনি নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পান না। পরের জন্য চাকরি যোগাড় করা, কে আপিসের টাকা ভাঙিয়া জেলে গিয়াছে, তাহার সংসারের তত্ত্বাবধান করা ও জেল হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার নানাপ্রকার তদ্বির করা, কোথায় কোন্ রোগী আছে তাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, ভিড়ের দিনে অল্প পয়সার মধ্যে থিয়েটারের জন্য টিকিট সংগ্রহ করা ইত্যাদি বহু বিচিত্র কর্মভারে মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই নিপীড়িত। আজ তিনি কলিকাতায় আছেন, কাল রাজমহলে এবং তৎপরদিন দিনাজপুরে চলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন শিরীষবাবুর পুত্রের অসুখের সম্পর্কে। পুত্রটি তো মারা গিয়াছে, এখন কন্যাটির বিবাহ-ব্যাপারে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। মৃন্ময়ের সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের আলাপ বেশি দিনের নয়। হাসির বাবার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং হাসির স্বামী হিসাবেই তিনি মৃন্ময়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। যে বড় পুলিস-অফিসারটি হাসিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনিও মুকুজ্জেমশাইয়ের একজন ভক্ত এবং মুকুজ্জে-মশাইয়ের সুপারিশেই তিনি একদা হাসির ভার লইয়াছিলেন। সুতরাং মৃন্ময়ের অপেক্ষা হাসিই মুকুযেজ্জশাইয়ের বেশি আত্মীয়। মুকুজ্জে-মশাই বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিলেন, হাসি ছাড়া বাড়িতে কেহ নাই। হাসি মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া বলিল, আপনি এলেন তবু বাঁচলুম।

এরা সব কোথা ?

ঠাকুরপো এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি। আর জানেন, উনি আজ দুদিন বাড়ি নেই! কি বিচ্ছিরি বলুন তো ?

কোথা গেছে মৃন্ময় ?

কি জানি! আপিসের কাজে কোথায় গেছে।

সি. আই. ডি.-র কর্মে মৃন্ময়কে প্রায়ই বাহিরে যাইতে হয়। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কবে ফিরবে কিছু ব'লে গেছে ?

ঠোঁট ও হাত উল্টাইয়া হাসি বলিল, কিছু না। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে পর্যন্ত যায় নি। আপিস থেকে বাইরে বাইরে চ'লে গেছে। একটা কন্‌স্টেব্‌লের হাতে ঠাকুরপোকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে গেছে যে, ফিরতে দু-চার দিন দেরি হতে পারে, আমরা যেন না ভাবি। দেখুন একবার আক্কেল!

মুকুজ্জেমশাই সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কি করবে বেচারী, ও চাকরিই হ'ল ওই রকম।

মুখে আগুন অমন চাকরির।—এই বলিয়া হাসি একটি কম্বল আনিয়া বিছাইয়া দিল।

কম্বলে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কই, তোর বেরাল-ছানাটা কোথায় ?

হাসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

কাল সকালে সেটা ম'রে গেছে।

ম'রে গেছে! আহা! কি ক'রে ?

ঠাকুরপোর জন্মে। সদর-দরজাটি কখন খুলে রেখেছিল, আর ও অমনই সুট ক'রে কখন বেরিয়ে গেছে রাস্তায়। বাস্, ওদের বাড়ির কুকুরটা এসে খ্যাঁক ক'রে কামড়ে দিলে।

তখ্‌খুনি ম'রে গেল ?

না, বেঁচেছিল খানিকক্ষণ।

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আহা!

ঠাকুরপোটা এমন পাষণ্ড—কি বললে শুনবেন? বললে, বাঁচা গেছে, আপদ গেছে।

ইহার উত্তরে মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না দেখিয়া অধিকতর উষ্মাভরে হাসি বলিল, আপনি আস্কারা দিয়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে আরও বাড়িয়ে তুলেছেন।

ইহার উত্তরেও মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। বিড়ালের শোকে হাসি খুব বেশি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে নাই, তাহার কারণ সে পর-মুহূর্তেই বলিল, আচ্ছা, আপনার চুলের দশা কি হয়েছে?

উত্তরে মুকুজ্জেমশাই হাস্যদীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

হাসি আবার বলিল, আঁচড়ে দেব?

দে।

হাসি ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় চিরুনি আনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের কেশ-সংস্কারে লাগিয়া গেল। মুকুজ্জেমশাইয়ের কেশ-সংস্কার খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একমাথা বড় বড় তৈলবিহীন রুক্ষ চুল আয়ত্তে আনা শক্ত। হাসি মরিয়া হইয়া চিরুনি চালাইতে লাগিল। মুকুজ্জেমশাই ধৈর্যসহকারে চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে হাসির হুঁশ হইল।

লাগছে আপনার?

পাগল, একটুও না।

এক কাজ করি বরং, আগে একটু তেল দিয়ে নিই, বেশ ভাল তেল আছে আমার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসি পুনরায় ঘরের ভিতর গেল এবং তৈল লইয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করিলেন না। তৈল-সহযোগে ক্রমাগত আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া হাসি যখন মুকুজ্জেমশাইয়ের চুলের শ্রী অনেকটা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তখন চিন্ময় কলেজ হইতে ফিরিল। ঢুকিতে ঢুকিতেই সে বলিল, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে বউদি, শিগগির খাবার দাও।

তাহার পর মুকুজ্জেমশাইকে দেখিতে পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও পর-মুহূর্তে প্রণাম করিয়া বলিল, কতক্ষণ এসেছেন আপনি?

হাসি বলিল, মাথা যেন কাগের বাসা হয়েছিল, তবু অনেকটা পরিষ্কার হ'ল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, এইবার ছাড়্, চিনুর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে কয়েকটা। চিনু, আমার কাজের কতদূর হ'ল? আঃ, ছাড়্ আমাকে পাগলী।

দাঁড়ান না, সিঁথেটা ঠিক ক'রে দিই।

চিনু বলিল, লিস্ট্ আমি তৈরি করেছি, অনেক হয়েছে।

কই, দেখি।

থামুন, বইগুলো রেখে আসি আগে।

চিনু বই রাখিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রসাধন শেষ করিয়া বলিল, কেমন হ'ল বলুন দেখি? মাথাটা বেশ ঝরঝরে লাগছে না?

খুব।

যাই, ঠাকুরপোকে খাবার দিইগে। আপনি কিছু খাবেন?

না। আমাকে খেতে দেখেছিস কখনও বিকেলে?

হাসি চিনুর জলখাবার আনিতে রান্নাঘরের দিকে গেল।

চিনু আসিয়া বলিল, সবসুদ্ধ পনরোজন ছেলের নাম যোগাড় করেছি, দেখুন।

একটি ছোট খাতায় অনেকগুলি নাম টোকা ছিল। খাতাখানি সে মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে দিয়া বলিল, যার যতটা পরিচয় পেয়েছি সব টুকে নিয়েছি, ঠিকানাও আছে ওতে অনেকের।

চিনুর কার্যনিপুণতায় মুকুজ্জেমশাই খুশি হইলেন। বলিলেন, বাঃ!

চিনু বলিল, এদের মধ্যে শঙ্করসেবক রায় ব'লে ছেলেটি খুব ভাল। কলেজে ভাল ছেলে ব'লে খুব নাম। বাড়ির অবস্থাও ভাল শুনেছি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, ঠিকানাটা টোকা আছে তো? কই?

হস্টেলে থাকে, এই যে ঠিকানা।

মুকুজ্জেমশাই ঠিকানাটা দেখিয়া লইলেন ও তাহার পর খাতাটা চিনুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এটা এখন থাক্ তোমার কাছে। মেডিকেল কলেজ আর ল কলেজের দুজন ছেলেকেও দিয়েছি দুখানা খাতা। একদিন সব মিলিয়ে দেখি, তারপর বেরুনো যাবে। এখন তুমি চট ক'রে খেয়ে নাও, এক দান বাঘ-বকরি খেলা যাক, এস। সেদিন তুমি হারিয়ে দিয়েছিলে আমায়, তার শোধ না তুলে ছাড়ছি না।

চিনু হাসিয়া বলিল, আজও জিততে দেব না।

হাসি খাবার লইয়া আসিয়াছিল।

সে বলিল, সাবধানে খেলবেন দাদামশাই, ভয়ানক চোর ও। মরা বকরিগুলো চুরি ক'রে ঢুকিয়ে দেয়।

চিনু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, মিথ্যুক কোথাকার! নিজে খেলতে পারেন না, আবার আমার নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে।

মুকুজ্জেমশাই হাসিতে লাগিলেন।

বলিলেন, আমার কাছে সেসব চালাকি চলবে না। নাও, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

চিনু কোনক্রমে পরোটা কয়খানা গলাধঃকরণ করিয়া মুকুজ্জে-মশাইয়ের সহিত খেলিতে বসিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া, চিনু কখন কি ভাবে চুরি করে, তাহা ধরিয়া ফেলিবার জন্য ওত পাতিয়া রহিল।

১৫

মিস বেলা মল্লিক দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটিকে চাপিয়া ভ্রূভঙ্গী-সহকারে একখানি পত্র পড়িতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের এই আধুনিকতম সমস্যাটির সমাধান করিবেন। এই জাতীয় সমস্যা তাঁহার জীবনে নূতন অথবা আকস্মিক নহে। রূপ এবং যৌবন থাকিলে স্ত্রীলোকমাত্রেরই জীবনে এরূপ সমস্যার আবির্ভাব স্বাভাবিক। বেলা মল্লিক ইহাতে কোনরূপ অভিনবত্ব অনুভব করিতে-ছিলেন না, তিনি ভাবিতেছিলেন, কি উপায়ে সমস্যাটির সুচারু সমাধান করিয়া ফেলা যায়। তাঁহার মনোভাব অনেকটা দাবা-খেলোয়াড়ের মনোভাবের অনুরূপ। এরূপ প্রেমিক তাঁহার জীবনে একাধিকবার আসিয়াছে এবং প্রতিবারেই তিনি সু-কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সম্ভবপর হইয়াছে, কারণ নিজে তিনি কখনও কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। নিজের রূপ গুণ ও যৎসামান্য কাল্‌চারের প্রভাবে তিনি বহু পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার মনোযোগ কেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি দুইটি প্রণয়ী আলোকলুব্ধ পতঙ্গের মত অহরহ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ইহাদের একজনের সম্বন্ধে বেলা দেবী

নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁহার ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়াছে। এই দ্বিতীয় লোকটির উচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন একটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গী রহিয়াছে, যাহা উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ঠিক নারীদেহ-লুব্ধ পুরুষের লালসাময় প্রলাপ নহে—এ আকুলতার মধ্যে মর্মস্পর্শী আন্তরিকতা রহিয়াছে : ঠিক সুরটি যেন বাজিতেছে। প্রথমোক্ত প্রণয়ীটির মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব আছে তাহা নয়, কিন্তু সে আন্তরিকতা মনকে নাড়া দেয় না।' নারীর মনকে নাড়া দিবার ক্ষমতা অপূর্ববাবুর নাই। শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ পালিত নারী-স্তাবক, নারী-সঙ্গ-লিপ্সু। নারীর বন্ধু হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার হয়তো আছে, কিন্তু প্রেমিক হইবার মত বলিষ্ঠতা তাঁহার নাই। প্রলুব্ধ ভ্রমরের মত প্রতি কুসুমের দ্বারে দ্বারে তিনি গুঞ্জন করিতেই পটু, আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। চাটুকার ভ্রমরকে দিয়া কুসুম তাহার নানা অভীষ্ট সিদ্ধ করাইয়া লয়, কিন্তু কখনও ভ্রমরের কণ্ঠলগ্ন হয় না। কুসুম উপভোগ্য হয় সেই বলিষ্ঠ নিষ্ঠুরের, যে তাহাকে নির্মম হস্তে বৃন্ত-চ্যুত করে, নির্দয় সূচিকা-আঘাতে মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথে। ইহা হয়তো বর্বরতা, কিন্তু এই বর্বরতার জন্যই বহু নারী-হৃদয় সমুৎসুক। অতি-সভ্য, অতি-শৌখিন, অতি-মৃদু, অতি-নমনীয় পুরুষ নারীর কাম্য নহে—অন্তত বেলার নহে। সুতরাং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ দুর্ভাবনা ছিল না। তিনি গান শিখাইবার অছিলায় যে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেই আসেন, তাহা বেলা দেবী জানেন এবং সহ্য করেন। সহ্য করিবার হেতু আছে। এত সস্তায় এরূপ গানের শিক্ষক পাওয়া শক্ত। অপূর্ববাবুর নিজের গলা যদিও খুব ভাল নয়, কিন্তু তিনি আধুনিক ও ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যই অভিজ্ঞ। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ভাল। তা ছাড়া, আবেগের আতিশয্যে নানা রকম উপহারও তিনি আনিয়া দিতেছেন। সেদিন একটা ভাল এস্রাজ তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন,

নানা স্থান হইতে গানের স্বরলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন। বেলা মল্লিকের মত সঙ্গতি-বিহীনার পক্ষে এসব অবহেলা করিবার নয়। সঙ্গীতবিদ্যায় বেলার অনুরাগ আছে, গলাও ভাল। এই সুযোগে, অর্থাৎ অপূর্বকৃষ্ণের দুর্বলতার সুযোগে যদি এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি কি? মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় অপূর্বকৃষ্ণবাবুর মত একজন শিক্ষক পাওয়া সহজ নয়। মাত্র সঙ্গসুখ দান করিয়া এত অল্প বেতনে যদি অপূর্ববাবুর মত লোক পাওয়া যায়, বেলা তাহাতে আপত্তি করিবেন কেন? অপূর্ববাবুর সম্বন্ধে সামান্যতম মোহও বেলার মনে নাই। অপূর্ববাবুর মোহের সুযোগ লইয়া তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন মাত্র এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহাকে একটা বেতন দিতেছেন। কারণ, এটা তিনি বেশ জানেন যে, বেতন না দিলেও অপূর্ববাবু তাঁহাকে গান শিখাইতে আসিবেন। তথাপি বেলা দেবী তাঁহাকে বেতন দেন এইজন্য যে, কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও তাঁহাকে যেন অপূর্ববাবুর কাছে বাঁধা পড়িতে না হয়, ইচ্ছা করিলে যে কোন দিনই যেন সম্পর্কটা চুকাইয়া দেওয়া চলে। সুতরাং অপূর্ববাবুকে লইয়া বেলার দুর্ভাবনা নাই।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে এত সহজে এড়ানো যাইবে না। এড়ানো শক্ত প্রথমত এই কারণে যে, সে প্রতিবেশী, সদা-সর্বদা তাহার সহিত দেখা হইতেছে। দ্বিতীয়ত, সে স্বজাতি পালটি ঘর, সামাজিক-ভাবেও তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে এবং সে চাহিতেছেও তাহাই। কিছুদিন পূর্বে সে বেলার দাদা প্রিয়বাবুর নিকট খোলাখুলি-ভাবেই এই প্রস্তাব করিয়াছিল। বেলার দাদাই বেলার একমাত্র অভিভাবক ও আত্মীয়। এই প্রস্তাবে তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। এই বাজারে বোনটার যদি এমন একটা সদ্গতি হইয়া যায়, মন্দ কি? বেলা কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি নহেন এবং সে কথা দাদাকে স্পষ্টভাবে

জানাইয়া দিয়াছেন। ভগ্নীর বয়স হইয়াছে, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, তাহার নিজের একটা মতামত হইয়াছে। প্রিয় মল্লিক সোজাসুজি ভগ্নীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাঁকা পথ ধরিলেন। বেলাকে একদিন বলিলেন, আলাপ ক'রে দেখ্ না একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে। খাসা লোক, অবস্থাও বেশ সচ্ছল, আমার তো বেশ লাগল লোকটিকে।

সুতরাং বেলার সহিত লক্ষ্মণবাবুর একদিন আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল, এবং তাহার পর হইতে লক্ষ্মণবাবু সুযোগ পাইলেই আসিয়া হাজির হইতেছে। এতদিন দূর হইতেই বেলাকে দেখিয়া ও বেলার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিল, এখন প্রিয়বাবু সে দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভাবটা—যদি বেলার ছেলেটিকে ভাল লাগিয়া যায়। প্রিয়বাবু লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক—ব্যাচিলার মানুষ, এক শত টাকা বেতনের চাকুরি করেন। ভগ্নীটিকে লইয়া বিপন্ন হইয়া আছেন। ভগ্নীটি স্কন্ধ হইতে নামিলে তিনি এই আয়ে আরও একটু আরামে থাকিতে পারেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, ভগ্নী কিছুতেই নামিতে চায় না। প্রিয়বাবু যত পাত্র আনিয়া জুটাইতেছেন, একটা-না-একটা অজুহাতে সে তাহাদের নাকচ করিয়া দিতেছে। মেয়েটা প্রেমেও পড়ে না! ওই গানের মাস্টারটা হন্যে কুকুরের মত রোজ যাওয়া-আসা করিতেছে, একবার 'তু' করিয়া ডাকিলেই পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু সে তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। যে আশায় প্রিয়বাবু মাসে মাসে নগদ পাঁচ টাকা করিয়া খরচ করিতে রাজি হইয়াছিলেন, সে আশায় বহুকাল পূর্বেই ছাই পড়িয়াছে। এখন টাকাটা অনর্থক খরচ হইতেছে বুঝিয়াও প্রিয়বাবু তাহা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। বেলাকে তিনি ভয় করেন।

দেখা যাক, ঐ ছোকরা যদি কিছু ক'রে উঠতে পারে—এই মনোভাব

লইয়া তিনি লক্ষ্মণবাবুকে আনিয়া একদিন বেলার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছেন।

বেলার মনোজগতে কোন বিপ্লব হয় নাই।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বেলা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে লইয়া মুশকিলে পড়িতে হইবে। ছেলেটির বয়স কম বলিয়াই অতিশয় ভাবপ্রবণ, কাছে আসিয়া আলাপ করিতে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। এই বিপদ হইতে কি কৌশলে ভদ্রভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বেলার মাথায় একদিন একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। কোষ্ঠীখানাকে কাজে লাগানো যাক। বেলা লক্ষ্মণবাবুকে বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস, বিবাহ-ব্যাপারে লক্ষ্মণবাবু যদি সত্যই অগ্রসর হইতে চান, তাহা হইলে উভয়ের কোষ্ঠী দুইটা সর্বাগ্রে মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন। নিজের কোষ্ঠীর সম্বন্ধে বেলা দেবীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কোষ্ঠীখানি এমন যে, কোন জ্যোতিষীই সজ্ঞানে সেটিকে ভাল বলিতে পারিবেন না। বেলার বাবা যখন বাঁচিয়া ছিলেন এবং বেলার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন এই কোষ্ঠীই বিবাহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বেলার বাবা ঠিক করিয়াছিলেন যে, এবার কেহ কোষ্ঠী চাহিলে একটা মিথ্যা কোষ্ঠী দিতে হইবে। সে প্রয়োজন অবশ্য আর হয় নাই। কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান, এবং বেলা নিজেই নিজের বিবাহের কর্ত্রী হইয়া পড়েন। মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। বেলার দাদা প্রিয়বাবু লোকচক্ষে যদিও বেলার অভিভাবক, কিন্তু বেলার ব্যক্তিগত সকল ব্যাপারে বেলার মতই গ্রাহ্য, এবং সে মত এতই সুস্পষ্ট যে, প্রিয়বাবু ভগ্নীর বিবাহের আশা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। তিনি বেশ দেখিতে পাইতেছেন যে, বেলার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা থাকিলে এতদিন কোন্

কালে বিবাহ হইয়া যাইত। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই বিগলিত হইয়া পড়িতে হইবে—এ মনোভাব বেলার তো নাইই, বরং উল্টা। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলে তিনি যেন আরও কঠিন হইয়া পড়েন। প্রিয়বাবু ভগ্নীর অদ্ভুত মনোবৃত্তির কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লক্ষ্মণবাবুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বেলা দেবী নিজের সাংঘাতিক কোষ্ঠীখানি কাজে লাগাইয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে লক্ষ্মণবাবু তাঁহার কোষ্ঠীখানি লইয়া গিয়াছেন। আজ অকস্মাৎ এই পত্রখানি আসিয়াছে—

বেলা,

এ কয়দিন আমি ক্রমাগত চিন্তা করিয়াছি। কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাই নাই। অবশেষে তোমার কাছেই আসিয়াছি, তুমিই ইহার শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দাও। তুমি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু বিধাতার এমনই নির্বন্ধ যে, কুষ্ঠি দুইটির কিছুতেই মিল হইতেছে না। আমি দুইজন জ্যোতিষীকে দেখাইয়াছি। দুইজনেই এ বিষয়ে একমত। একজন জ্যোতিষী কিন্তু বলিলেন যে, মনের মিলই শ্রেষ্ঠ মিল। আমার মন তাঁহার কথায় সায় দিয়াছে। জানি না, তোমার মনের কথা কি! তোমাকে বিবাহ করিলে সত্যই যদি কোন বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে ভয় নাই। তোমার জন্য সমস্ত বিপদ বরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি এবং আজীবন থাকিব। যদি অনুমতি দাও, আবার তোমার নিকট যাইব। আমার মনের ভিতর যে কি হইতেছে, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। দোকানের ঠিকানায় উত্তর দিও। ইতি—

লক্ষ্মণ

বেলা কিছুক্ষণ পত্রখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে উত্তর লিখিতে শুরু করিলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর—

লক্ষ্মণবাবু,

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। একদিন সময় করিয়া নিশ্চয় আসিবেন। আসিবেন না কেন? কুষ্ঠির বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভয় হয়। দেখি, দাদা কি বলেন। নমস্কার। ইতি—

শ্রীবেলা মল্লিক

পত্রখানা খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া বেলা দেবী টেবিলের উপর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্য-বেগে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

১৬

কলিকাতার বাহিরে একটি রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসিয়া মৃন্ময় তাহার ডায়েরি লিখিতেছিল। সি. আই. ডি.-তে কিছুকাল কাজ করিয়া এবং তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়া (কিছুটা শ্বশুর মহাশয়ের তদ্বিরের ফলেও) মৃন্ময় সম্প্রতি আই. বি.-তে ঢুকিয়াছে। আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছোকরার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলিকাতার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। উপরওয়ালার নির্দেশমত সে ছেলেটির গতিবিধির ইতিহাস, নাম-ধাম, এমন কি একটি ফোটোগ্রাফ পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে। এমন তো সে কিছুই এ ছোকরার মধ্যে দেখিতে পাইল না যাহা ভীতিকর, বরং ছোকরাকে দেখিলে অতিশয় নিরীহ বলিয়াই মনে হয়। ইহার উপর কর্তাদের এত নজর কেন? যে জন্যই হউক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা অথবা অবসর মৃন্ময়ের নাই। সে মনিবের হুকুম তামিল করিয়াছে, ওইখানেই তাহার কর্তব্যের শেষ হইয়াছে। কর্তব্যের

জের টানিয়া আনিয়া ব্যক্তিগত নিভৃত জীবনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা, মৃন্ময়ের স্বভাব নয়। সুতরাং ডায়েরি ও রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া সে তাহার চাকুরিজীবনের উপর তখনকার মত যবনিকা টানিয়া দিল এবং আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া চক্ষু বুজিল।

একটু পরেই তাহার মনে স্বর্ণলতার ছবি ফুটিয়া উঠিল। সোনার মত গায়ের রঙ, লতার মত তন্বী—সত্যই সে স্বর্ণলতা ছিল। সহসা কোথায় চলিয়া গেল? এমন করিয়া চলিয়া যাইবার হেতুই বা কি, মৃন্ময় আজও তাহা বুঝিতে পারে নাই। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—

স্বর্ণলতা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছিল এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর তাহার সহিত মৃন্ময়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সামান্য একটি অস্থায়ী চাকুরি পাইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে লইয়া কলিকাতা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। মৃন্ময়ের সামান্য আয়ে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন চলিলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না। স্বর্ণলতার মনে নানারূপ শখ। মৃন্ময়ের স্বল্প আয়ে সেসব শখ মিটিত না। একদিন স্বর্ণলতা মৃন্ময়কে বলিল যে, দুইজনে মিলিয়া উপার্জন করিলে কেমন হয়—সে-ও চাকুরি করিবে। একটি কাগজে নাকি সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে যে, একটি বালিকাকে পড়াইবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন-পাস একজন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। সকালে এক ঘণ্টা ও বিকেলে এক ঘণ্টা বাড়িতে গিয়া পড়াইয়া আসিতে হইবে, বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি অতদূরে গিয়ে রোজ পড়িয়ে আসতে পারবে?

কেন পারব না? নিশ্চয় পারব।

ইহার দুই দিন পরে মৃন্ময় একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখে,

স্বর্ণলতা নাই। পাড়ায় খোঁজ করিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যে ঠিকানা হইতে শিক্ষয়িত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে গিয়া খোঁজ করিল, সেখানেও স্বর্ণলতা যায় নাই। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বর্ণলতা নামে কোন শিক্ষয়িত্রী আসেন নাই। দুই দিন পরে খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িতে কেহ নাই। বাড়ি খালি পড়িয়া আছে—'টু লেট' ঝুলিতেছে। স্বর্ণলতার বাপের বাড়িতে খবর দিতে তাঁহারা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, স্বর্ণ সেখানেও যায় নাই তো! কোথায় গেল সে? পুলিসে খবর দেওয়া হইল, হাসপাতালগুলিতে সন্ধান লওয়া হইল—কোন খবরই পাওয়া গেল না। এমন ভাবে চলিয়া যাইবার অর্থ কি? অস্থায়ী চাকুরির মেয়াদও ফুরাইয়া আসিল—চাকুরি-বিহীন উদ্‌ভ্রান্ত মৃন্ময় সম্ভব অসম্ভব নানা স্থানে স্বর্ণলতার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আজও ফিরিতেছে।

আরাম-কেদারায় শুইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রশ্ন বহুবার সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সেই প্রশ্নটি আবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা কি তাহার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে? সে কি তাহাকে ভালবাসিত না? নিশ্চয় বাসিত। তবে সে এমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন? তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। তাহাতে কোন কলুষ নাই। তবে চলিয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর মৃন্ময় আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মৃন্ময় স্বর্ণলতার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল কি? মাত্র এক বৎসর তো বিবাহ হইয়াছিল। সহসা তাহার মনে হইল, সে হয়তো স্বর্ণলতাকে মোটেই চিনিতে পারে নাই। তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মুখখানি আঁকা রহিয়াছে, তাহাতে অদ্ভুত মৃদুহাসি! ওই সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসিটুকুর কোন সদর্থই তো

মৃন্ময় আজ পর্যন্ত করিতে পারিল না। উহা কি ব্যঙ্গের হাসি? অনুরাগের হাসি? অর্থহীন হাসি? মৃন্ময় ঠিক বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা মৃন্ময় নিঃসংশয়ে জানে যে, সে নিজে স্বর্ণলতাকে আজও ভালবাসে এবং একদিন না একদিন সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

ক্লিক!

শব্দটা শুনিয়া মৃন্ময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল। শ্যামবর্ণ নাতি-স্থূল সুদর্শন একটি ভদ্রলোক আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃন্ময়কে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া একটি ছোট ক্যামেরা তিনি পকেটের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিলেন। মৃন্ময় ব্যাপারটা ভাল বুঝিল না। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কতদূর যাবেন আপনি?

কলকাতা।

ও।

মোটরের দালাল অচিনবাবু আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই একটি কুলী-সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। কুলীর মাথা হইতে একটি সুটকেস ও হোল্ড্-অল নামাইয়া লইতে লইতে পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটু অসুবিধে করলাম আপনার, মাপ করবেন। বেশ একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, না?

না, আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আপনি এলেন কোথা থেকে? এখন তো কোন ট্রেন নেই।

আমি মোটরে এলাম। আমিও কলকাতা যাব।

তাই নাকি? তা হ'লে তো ভালই হ'ল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অচিনবাবুর ড্রাইভার আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

অচিনবাবু তাহাকে বলিলেন, তুমি ফিরে যাও, রাজাসাহেবকে ব'লে

দিও, আমার কাজ হয়ে গেছে। কলকাতায় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।

সেলাম করিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

অচিনবাবু ওয়েটিং-রুমের দ্বিতীয় ঈজি-চেয়ারটি দখল করিলেন। চক্ষু হইতে চশমাটি খুলিয়া রুমাল দিয়া চশমার কাচ দুইটি পরিপাটীরূপে পরিষ্কার করিয়া চশমাটি পুনরায় পরিধান করিলেন। তাহার পর হোল্ড্-অলের ভিতর হইতে একটি খবরের কাগজ বাহির করিয়া নিশ্চিন্ত-চিত্তে তাহা পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন।

মৃন্ময় নির্বাক হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া রহিল। লোকটি কে? কাহার ফোটো তুলিল? মৃন্ময়ের? কেন?—এই জাতীয় নানা প্রশ্ন মৃন্ময়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। অচিনবাবু কিন্তু আর মৃন্ময়ের প্রতি মনোযোগ দিলেন না। তিনি প্রকাণ্ড খবরের কাগজখানা মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৃন্ময় তাঁহার মুখটাও আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মৃন্ময়ের কৌতূহল ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, দুই-একটি কুলী ছাড়া প্ল্যাটফর্মে আর কেহ নাই। তখন ধীরে ধীরে সে স্টেশনের বাহিরে গিয়া পিছন দিক হইতে ওয়েটিং-রুমের বাহির দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা দিয়া সে দেখিল, অচিনবাবুর মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মুখে হাসি নাই, চক্ষু দুইটি হইতে কিন্তু হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। মৃন্ময়ের কাছেও ছোট একটি ক্যামেরা ছিল। তাহার ডিটেকটিভ মন এ সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিল না। ক্ষিপ্রতার সহিত পকেট হইতে ক্যামেরাটি বাহির করিয়া অচিনবাবুর একখানা ফোটো সে তুলিয়া লইল।

অচিনবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না।

১৭

শৈল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

শঙ্করকে আজ সে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু কই, শঙ্কর এখনও পর্যন্ত আসিল না তো? ভুলিয়া গেল নাকি? না, শৈলর নিমন্ত্রণ শঙ্কর ভুলিয়া যাইবে—এ কথা শৈলর মন মানিতে প্রস্তুত নয়। যদি সে না আসিতে পারে, তাহা হইলে অন্য কোন কারণ ঘটিয়াছে। শৈল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল—পৌনে আটটা বাজিয়াছে। রাত তো বেশি হয় নাই, অথচ শৈলর মনে হইতেছে, সে যেন যুগযুগান্ত বসিয়া রহিয়াছে। শঙ্করদার এত দেরি করিবারই বা কারণ কি? আজ একটু বকিয়া দিতে হইবে, এত আড্ডা দেওয়া ভাল নয়। চিরকাল শঙ্করদার এই স্বভাব, একপাল ছেলে জুটাইয়া দঙ্গল পাকানো।...আজ উনি বাড়ি নাই, কোথায় দুই দণ্ড বসিয়া গল্পসল্প করা যাইবে, তা নয়, কোথায় আড্ডা দিয়া বেড়াইতেছে! রাত-দুপুরে হয়তো হুড়মুড় করিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া খাইয়া চলিয়া যাইবে। আক্কেলকে বলিহারি যাই—খাওয়ার নিমন্ত্রণ শুধু যেন খাওয়ার জন্যই!...সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ শৈল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দ্বারের পানে চাহিল। শঙ্কর আসিল না, আসিল বাড়ির ঝি-টা।

সে বলিল, বেয়ারা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিতেছে, আম-সন্দেশ পাওয়া গেল না, এ তল্লাটের সব দোকান সে খুঁজিয়াছে।

শৈল আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, তাকে বল, যেখান থেকে পারে খুঁজে নিয়ে আসুক। এ তল্লাটে না পাওয়া যায়, অন্য তল্লাটে গেলেই হ'ত; তল্লাটের তো অভাব নেই কলকাতা শহরে! গাড়িটা নিয়েই যেতে বল না হয়। শঙ্করদা আম-সন্দেশ খেতে ভালবাসে।

ঝি চলিয়া গেল, শৈল আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শঙ্করদা কি

এখনও কবিতা লেখে? স্কুলে যখন পড়িত, তখন ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দিনরাত কবিতা লিখিত। ইহার জন্য জ্যেঠামশাইয়ের কাছে বকুনিও কি কম খাইয়াছে! শৈলকে ডাকিয়া কত কবিতাই যে শুনাইত লুকাইয়া লুকাইয়া! এই তো সেদিনের কথা—দেখিতে দেখিতে কয়েকটা বছর চলিয়া গিয়াছে মনেই হয় না। অত শক্ত শক্ত কথাওয়ালা কবিতা শৈল বুঝিতেই পারিত না, কথার মানে বুঝিত না বটে, কিন্তু আসল অর্থটা তাহার কাছে মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। সে কথা স্বীকার করিতেও এখন লজ্জা করে। ছি ছি, যত সব ছেলেমানুষি! কিন্তু—

শঙ্কর আসিয়া পড়িল।

কি রে শৈল, ব্যাপার কি, হঠাৎ নেমন্তন্ন?

কেন, নেমন্তন্ন করতে নেই নাকি? ভুলেও তো খোঁজ নাও না একবার, বাধ্য হয়ে নেমন্তন্ন করতে হ'ল।

শঙ্কর খাটের উপর বসিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলিল, তা বেশ করেছিস।

বেশ করেছি মানে?

আচ্ছা, বেশ করিস নি। শঙ্কর হাসি ঢাকিতে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

রাগিও না আমায় বলছি শঙ্করদা, নিজে আসবে না একবারও ভুলে, নেমন্তন্ন করেছি ব'লে আবার খোঁটা দেওয়া হচ্ছে!

আলুর চপ করেছিস?

ভারি ব'য়ে গেছে আমার, সমস্ত সন্ধ্যেটা বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে এখন এসে রাত নটার সময় আলুর চপের ফরমাশ হচ্ছে!

সত্যি করিস নি?

করেছি গো, করেছি। আচ্ছা পেটুক লোক বাপু তুমি, এসে থেকে আর কোন কথা নেই, কেবল খাওয়ার কথা!

বোস সায়েব কোথা? ক্লাবে বুঝি?

না, তিনি এখানে নেই, দিল্লী গেছেন।

দিল্লী? হঠাৎ দিল্লী কেন? লাড্ডুর চেষ্টায়?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, লাড্ডুর চেষ্টাতেই বটে, কে এক সায়েব আছে নাকি সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেই সায়েব যদি ইচ্ছে করে, ওঁকে নাকি আরও একটা ভাল পোস্ট্ দিতে পারে।

শঙ্কর বলিল, ভালই তো।

ভাল, না, ছাই! চাকরির তদ্বির করতে করতেই নাকাল, বিয়ে হয়ে থেকে তো দেখছি, কেবল ছুটোছুটি আর ছুটোছুটি।

শঙ্কর কিছু বলিল না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে লাগিল। শঙ্করের মুখে সিগারেট দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে শৈল বলিল, এ কি শঙ্করদা, তুমি সিগারেট ধরেছ নাকি?

ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যমুখে শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, বেশ সুন্দর লাগে। খাবি? খেয়ে দেখ্ না একটা; বেশ লাগবে।

আস্পর্ধা তোমার তো কম নয়!

শঙ্কর হাসিতে লাগিল।

ক্ষণপরেই কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া শৈল বলিল, সিগারেট খাওয়া ভারি খারাপ শুনেছি, ওতে নাকি বুক খারাপ হয়ে যায়?

আমার বুক কি অত অপলকা ভেবেছিস যে, সিগারেটের ধোঁয়ায় খারাপ হয়ে যাবে? ছেলেবেলায় কত এক্সারসাইজ করতাম, মনে নেই, তোদের বাড়ির পেছন দিকের সেই মাঠটায়?

বাহাদুরি আর করতে হবে না, কখন যে কার কি হয় বলা যায় কিছু? মেজদার কথা মনে নেই? কত গায়ে জোর ছিল তার, দুদিনের জ্বরেই সব শেষ হয়ে গেল।

উৎপলের ভাই পঙ্কজের কথা শঙ্করের মনে পড়িল। মৃত পঙ্কজের স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উভয়ের মনে ছায়াপাত করিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, আচ্ছা, দাদার কোন চিঠি-পত্তর পাও তুমি শঙ্করদা? আমাকে সেই যা গিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিল, আর লেখে নি।

উৎপলের চিঠি শঙ্করও অনেকদিন পায় নাই।

বলিল, কই, আমাকেও তো লেখে না বড় একটা।

শৈল মুচকি হাসিয়া বলিল, বউদিকে খুব লিখছে নিশ্চয়।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ওই ভয়েই তো বিয়ে করব না। তোরা সব রাক্ষসী—

তবু তো রাক্ষসীদের মায়া এড়াতে পার না।

মানে?

আজকাল আর আস না কেন, বল তো?

পড়াশোনা নিয়ে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়।

পড়াশোনা নিয়ে? ডাহা মিছে কথাটা আর ব'লো না তুমি। এত মিছে কথাও বলতে পার!

মিছে কথা মানে?

আমি সব জানি গো, সব জানি। তোমার সোনাদিদির সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে।

তুই আবার পার্টিতে যাস নাকি? লায়েক হয়ে উঠেছিস তা হ'লে বল্।

শৈল হাসিল। বলিল, সত্যি, ভাল্ লাগে না আমার ওসব পার্টি-ফার্টিতে যেতে। কেবল ওঁর জেদে প'ড়ে যেতে হয়।

কোথায় চায়ের পার্টি ছিল, কিসের জন্যে পার্টি?

উনিই পার্টি দিয়েছিলেন একটা ওঁদের ক্লাবে। সোনাদিদির স্বামীও তো রেলেতে চাকরি করেন দিল্লীতে, সেইজন্যে সোনাদিকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন উনি।

সোনাদিদির সঙ্গে আলাপ ছিল নাকি তোর?

ছিল বইকি, দাদার সঙ্গে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আমিও যে গেছি দু-এক বার। মিষ্টিদিদি রিনি সবাইকে চিনি আমি।

শৈল শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া বলিল, রিনি মেয়েটি বেশ, নয় শঙ্করদা?

শঙ্কর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল।

গম্ভীরভাবেই বলিল, ও রকম মেয়ে আমি আর দেখি নি।

শৈল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, যাই, আমি একবার দেখি কতদূর কি হ'ল, তুমি একটু ব'স।

অনাবশ্যক দ্রুতবেগে শৈল বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শৈলর কথা নয়, রিনির কথা। আজ তাহার সহিত ক্লাউড্‌স কবিতাটা পড়িবার কথা ছিল। শৈলর নিমন্ত্রণের ধাক্কায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। বাজে নিমন্ত্রণ ও লৌকিকতা রক্ষা করিতে গিয়া জীবনের কত পরম লগ্ন যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা তো কেহ বোঝে না। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে লোকে অভিমান করে। বিশেষত শৈলর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা তো অসম্ভব। অথচ আজ সুন্দর সন্ধ্যাটা কতকগুলা দুষ্পাচ্য আহার গলাধঃকরণে কাটিয়া যাইবে, ভাবিতেও দুঃখ হয়। রিনি বেচারী আমার অপেক্ষায় হয়তো বসিয়া থাকিবে। তাহাকে খবর দিয়া আসিবার সময়ও ছিল না।

শৈল ফিরিয়া আসিল।

ক্ষিদে পেয়েছে শঙ্করদা? রান্না তৈরি।

মোটেই না।

তা হ'লে এস, একটু গল্প করা যাক। জান শঙ্করদা, মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা ওরা কেটে ফেলেছে।

শঙ্কর অন্যমনস্ক ছিল।

কোন্ ফলসাগাছটা ?

মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা, এর মধ্যে ভুলে গেলে সব ? কি ভাবছ তুমি ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, না, কিছু না। বুঝেছি, কেটে ফেলেছে গাছটা ! ভারি অন্যায় তো ; কে কাটলে, চণ্ডী বুঝি ? তা না হ'লে অমন বুদ্ধি আর কার হবে ?

শঙ্কর আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সহসা শৈল বলিল, আমি কেমন সোয়েটার বুনতে শিখেছি, দেখবে শঙ্করদা ?

কই, দেখি।

শৈল একটি অর্ধসমাপ্ত সোয়েটার বাহির করিয়া পরম আগ্রহে শঙ্করকে দেখাইতে লাগিল।

এই নীল রঙটার সঙ্গে কি রঙ মানাবে, বল তো ?

কোনও লাইট রঙ। কমলা কিংবা সাদা—সাদাই দে না, বেশ হবে দেখতে।

শঙ্কর আহারাদি শেষ করিয়া চলিয়া গেল। শৈল একা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নূতন কৃতিত্ব সোয়েটার বোনা, টিলের দোরমা কিছুই যেন শঙ্করদাকে তেমন মুগ্ধ করিতে পারিল না। ...অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শৈল সহসা উঠিয়া পড়িল এবং স্বামীকে অকারণে পত্র লিখিতে বসিল। কালই লিখিয়াছে, আজ আর লিখিবার দরকার ছিল না। বার বার একটা কথাই নানাভাবে

লিখিল, আমার একা একা একটুও ভাল লাগিতেছে না, তুমি শীঘ্র চলিয়া এস। দেরি করিও না—একা ভারি ভয় করে আমার।

১৮

শঙ্কর হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার অপেক্ষায় একটি মোটা খাম মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে, কপাট খুলিতেই চোখে পড়িল। কলেজ হইতে শঙ্কর হস্টেলে ফিরিতে পারে নাই, প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়াছিল। বয়সের এবং বিদ্যার অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রফেসার গুপ্তের সহিত শঙ্করের হৃদ্যতা জন্মিতেছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে কোথায় একটা মিল ছিল, হয়তো তাহা সাহিত্য-প্রীতি, হয়তো সৌন্দর্যলিপ্সা—ঠিক বলা শক্ত। উভয়ের মন কিন্তু বয়স এবং বিদ্যার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। রিনির অধ্যাপনা করিবার জন্য অধ্যাপক গুপ্তের সাহায্য লওয়া শঙ্করের প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রায়ই কলেজ হইতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসায় গিয়া হাজির হয়। আজও সে সেখানে গিয়াছিল এবং সেইখানেই তাহার সহসা মনে পড়িয়া যায় যে, শৈলর ওখানে তাহার নিমন্ত্রণ আছে।

শঙ্কর খামখানা তুলিয়া দেখিল, সুরমার চিঠি। সুরমা ছোট চিঠি লেখে না—দীর্ঘ পত্র। শঙ্কর কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাল করিয়া বিছানায় বসিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলে এ পত্রের অমর্যাদা করা হইবে।

সুরমা লিখিতেছে—

শঙ্করবাবু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, কিন্তু আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত আবহাওয়া মনের মধ্যে ছিল না ব'লে উত্তর দিতে দেরি হ'ল। এখনও যে আবহাওয়াটা খুব মনোরম হয়ে উঠেছে তা

নয়, ঝঞ্ঝা-বিদ্যুতের উৎপাতটা কমেছে মাত্র। মনের যে সাম্য থাকলে সুন্দর চিঠি লেখা যায়, তা এখন আমার নেই। তবু আপনাকে চিঠি লিখছি এইজন্যে যে, চিঠির উত্তর না পেলে আপনি হয়তো অকারণে অনেক কিছু ভেবে বসবেন। অকারণে একটা কিছু ভেবে বসা আপনাদের স্বভাব, মাঝে মাঝে মনে হয়, ওইটেই আপনাদের বিশেষত্ব। আপনারা ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু ক'রে বসেন—অগ্র পশ্চাৎ না ভেবেই। আপনাকে চিঠি লেখার দ্বিতীয় কারণ, চিঠি লেখার অজুহাতে আপনাকে সামনে বসিয়ে (অবশ্য কল্পনায়) কলমের মুখে খানিকটা বকবক করব, মনের ভার তাতে হয়তো অনেকটা কমবে। এত লোক থাকতে এবং এত স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও আপনাকেই হঠাৎ কেন এসব কথা বলতে যাচ্ছি, তা ঠিক বুঝতে পারছি না; হয়তো আপনি আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে, কিংবা হয়তো আর কিছু— ঠিক জানি না। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যা অঘটন মনে হয়, যার আকস্মিকতা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাঁধা ফরম্যুলার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু ঘটনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। যা প্রত্যক্ষ তা অবশ্য-স্বীকার্য, হেতুটা পরে আবিষ্কার করতে হয়।

যাক, যে কথাটা অতি প্রবলভাবে এখন মনে জাগছে এবং যার তাড়ায় আজ কাগজ কলম নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে এই আবোল-তাবোল প্রলাপগুলো লিপিবদ্ধ করছি, সেইটেই ব'লে ফেলা যাক। সেটা হচ্ছে এই, কথাটা অতি পুরাতন—আমরা নারীরা বড় অসহায়। বিধাতা কিন্তু অসহায় ক'রে আমাদের পৃথিবীতে পাঠান নি, তিনি এমন সব অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দিয়েছেন, যা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পৃথিবীর বড় বড় বীরপুরুষরাও কাবু হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ সভ্যশ্রেণীর নারীদের মুশকিল হয়েছে এই যে, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা মানুষ-মনিবদের মুখ চেয়ে আছি।

তাঁদের হুকুম এবং সমর্থন না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তাঁরা ব'লে দেবেন, কোন্‌খানে কখন এবং কতক্ষণ আমরা রণ-কৌশল দেখাতে পাব। কেউ কেউ হয়তো আজীবন সে অনুমতি পায় না। শুধু পায় না তাই নয়, বেচারীকে সমস্ত বাণ তূণে পূরে রেখে আজীবন অহিংসার গুণ গাইতে হয়। আর যেসব সৌভাগ্যশালিনী কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে ত্যাগ করবার অনুমতি পেলেন, তাঁরাও যে সব সময়ে চরিতার্থ হয়ে গেলেন তা মনে করবেন না। প্রায়ই দেখা যায়, যে লোকটিকে সম্মোহিত করবার সামাজিক সমর্থন পাওয়া গেল, তিনি এ সম্মানের অনুপযুক্ত। অর্থাৎ হয় তিনি ইতিপূর্বেই আর কারোর দ্বারা জখম হয়েছেন, নয় তিনি এতই নিরীহ অথবা এতই হীন যে, অস্ত্রশস্ত্রের কোন প্রয়োজনই হয় না তাঁর জন্মে। এদের ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র হয় নিরর্থক, না হয় অপমানিত। বিধাতা যাকে বিজয়িনী হবার সাজসরঞ্জাম দিয়ে সৃষ্টি করলেন, মানুষ-বিধাতার পাকে-চক্রে তার সমস্ত কলা-কৌশল এমন একটা পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছল যে, তার জন্মে সে সর্বদাই শঙ্কিত। সত্যিই আমাদের বড় মুশকিল। ইচ্ছে করলেই আমরা আমাদের আয়ুধ সম্বরণ ক'রে রাখতে পারি না, কখন যে তা কাকে গিয়ে অতর্কিতে আঘাত ক'রে বসে, তা অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না। আহত ব্যক্তি কখনও আত্মপ্রকাশ করেন, কখনও করেন না। যখন করেন, তখন দেখা যায়, সামাজিক বিধি-নিয়ম অনুসারে লজ্জা পাবারই কারণ ঘটেছে, অহঙ্কৃত হবার নয়। সুতরাং জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য বিধাতা যে বশীকরণবিদ্যা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেটাকে নিয়ে আমাদের আশঙ্কা-অস্বস্তির সীমা নেই। বস্তুত এই বশীকরণশক্তি যার মধ্যে যত প্রকট, সমাজে সে তত নিন্দিত, বিশেষ ক'রে মেয়ে-মহলে। অথচ ভেবে দেখুন, সে বেচারীর দোষ কি? তার মাধুর্য সে অবলুপ্ত করবে

কি ক'রে? ফুল রূপ-রস-গন্ধের ঐশ্বর্যে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এই তো স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু তার সুষমার জন্য তাকেই লজ্জিত করে যে অদ্ভুত বিধানের জবরদস্তি, আমরা তারই চাপে আজ ম্রিয়মাণ। কি করব বলুন, যে সমাজে বাস করি, সে সমাজের নিয়ম মেনে না চললেও শান্তি নেই, মেনে চলতেই হয় এবং নিয়মানুবর্তিতার দিকে সভ্য মহিলাদের একটু বেশি রকম প্রবণতাও আছে। এই প্রবণতার কথা চিন্তা করলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। মেয়েদের নিয়মনিষ্ঠা সমাজকে অর্থাৎ পুরুষকে খুশি করবার জন্যে ছাড়া আর কি? হায় রে, যার বিজয়িনী হওয়ার কথা, সেই হয়েছে আজ চাটুকার। আর সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার—সে যে চাটুকার, তা বোঝে না, জানে না, বুঝিয়ে দিলে রাগ করে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু কারা জানেন? মেয়েরাই। সম্ভবত হিংসার তাড়নায় একজন আর একজনের শত্রুতা করে। পুরুষেরা মেয়েদের এই হিংসা-প্রবৃত্তিটাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতির মোহিনী অস্ত্রগুলোকে মেয়েরা যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার না করে, সে তার ব্যবস্থা করেছে; এবং সে ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, তা দেখবার ভার পড়েছে মেয়েদের ওপর। মা, দিদি, পিসী, জেঠীর দলই পাহারার কাজে সবচেয়ে দক্ষ।

আজ অকস্মাৎ আপনাকে এত কথা লেখবার কি কারণ ঘটল, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ সবিস্ময়ে সে কথা ভাবছেন। কারণ একটা আছে বইকি। কিছুদিন পরে আপনিও হয়তো তা জানতে পারবেন। আমি বলতে পারলাম না। সেসব কথা বলতে আমার আত্মসম্মানে বাধে, যে কোন মেয়েরই বাধে, সেজন্যে সেগুলো আমার কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। সুতরাং ও প্রসঙ্গের ওপর আপাতত যবনিকাপাত করা যাক।

আপনার খবর কি, বলুন। মিষ্টিদিদির কাছ থেকে একখানা চিঠি

পেয়েছি। তিনি তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। শুনলাম, রিনির পড়াশুনার তদারক ক'রে অত্যন্ত যশস্বী হয়ে উঠেছেন। নিজেরও তদারক করবেন একটু। কবিতা লেখা একেবারে বন্ধ ক'রে দিলেন নাকি? ওদেশের সব কাগজ এদেশে এসে পৌঁছোয় না। কোনও কাগজে যদি আপনার লেখা বেরোয়, সেটা আমার পাওয়া চাই কিন্তু। বোম্বেতে চাকচিক্যশালী ব্যক্তি আছেন অনেক, কিন্তু তাঁদের চাকচিক্য প্রায়ই লক্ষ্মীর প্রসাদে। ভারতীর বীণার খবর বড় একটা মেলে না। মনের দিক থেকে একরকম নিঃসঙ্গ কারাবাস চলছে। মাঝে মাঝে এই নিস্তব্ধতা যদি ভঙ্গ করেন, কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বন্ধুর কোন চিঠি পেয়েছেন কি? অনেকক্ষণ বকবক ক'রে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি হয়তো নষ্ট করলাম, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বকবক শুরু করেছিলাম, তা সফল হ'ল না দেখছি। মনের মেঘ একটুও কাটল না। সময় ক'রে উত্তর দেবেন তো? সময় যদি কম থাকে, ছোট উত্তর হ'লেও চলবে, কিন্তু একেবারে যেন নিরুত্তর হবেন না। ইতি—সুরমা

পত্র পাঠ শেষ করিয়া শঙ্কর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে ধীরে ধীরে সুরমার মুখখানি সজীব হইয়া দেখা দিল, হাওড়া স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সুরমা বলিতেছে, চিঠি লিখবেন, ভুলবেন না কিন্তু। দুয়ারে টোকা পড়িতেই শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল, কপাট খুলিয়া দেখিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ একটি টেলিগ্রাম হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহারই টেলিগ্রাম, শঙ্কর খুলিয়া পড়িল, মায়ের অসুখ খুব বাড়িয়াছে, বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিয়াছেন।

১৯

গঙ্গার তীরে নির্জন বালুচরে একটি ছোট খড়ের ঘর। সেই ঘরের মধ্যে ইটের উনানে একটি ছোট মালসা চাপাইয়া ভন্টুর মেজকাকা

ভাত রাঁধিতেছিলেন। ঘুঁটেগুলা সম্ভবত ভিজা ছিল, উনুন ভাল ধরিতেছিল না। সুতরাং যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া ভন্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী কয়েকটি সবল ফুৎকার চুল্লিমধ্যে প্রেরণ করিলেন। আশানুরূপ ফল ফলিল না। শিখার পরিবর্তে ধূমই প্রবলতর বেগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আরক্ত সজল চক্ষু দুইটি মার্জনা করিতে করিতে মুক্তানন্দ অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বস্তুত বাহির না হইয়া উপায় ছিল না, সমস্ত ঘরটি ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে ঈষৎ-স্থূল ভক্ত-গোছের একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভন্টুর মেজকাকা বাহিরে আসিতেই তিনি সবিনয়ে বলিলেন, স্বামীজী, কেন এমন ক'রে কষ্ট পাচ্ছেন? আমাদের বাসায় ভাল বামুন দিয়ে আপনার রান্নার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি আমি। এখানে এই তেপান্তরের মাঠে থাকবার দরকার কি আপনার?

অজ্ঞ বালকের নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন করিয়া হাসেন, ভন্টুর মেজকাকা সেই জাতীয় একটি হাসি হাসিলেন। ঈষৎ-স্থূল ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আপনার কিছু হবে না তা জানি, কষ্ট আমাদেরই হয়। তা ছাড়া—। কথা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না। ভন্টুর মেজকাকা হাত তুলিয়া এবং মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব। ওসব অনুরোধ করবেন না। সন্ন্যাসীব্রত যখন গ্রহণ করেছি, তখন তার নিয়ম পালন করতে হবে, যতই দুরূহ হোক সে নিয়ম। তা ছাড়া, আপনারা যতটা দুরূহ ব'লে মনে করেন, তত দুরূহ এ নয়, এতে আনন্দও আছে যথেষ্ট।

একশো বার।

অপ্রস্তুত মুখে ভদ্রলোক পুনরায় চুপ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী দেখিলে সর্বেশ্বরবাবু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা

তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং ক্ষণপরে তিনি পুনরায় কথা কহিলেন, এতে আপনার অগৌরব কিছু নেই, আমাদেরই অগৌরব।

একটু কৃপা-নরম কণ্ঠে মুক্তানন্দ বলিলেন, আপনি তো বড় নাছোড়-বান্দা লোক দেখছি। বেশ, কি করতে হবে, বলুন? ভদ্রলোক যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, আপনি সজ্জন ভদ্রলোক, আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি, তবে নিয়ম ভাঙতে পারব না।

আমাদের ওখানে চলুন, স্বপাকেরই সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আলোচাল ঘি তরিতরকারি সমস্তই আনিয়ে রেখেছি। এখান থেকে কি বাজার কম দূর, কত কষ্ট হচ্ছে আপনার!

আমাদের আবার কষ্ট!

একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া ভন্টুর মেজকাকা অবশেষে বলিলেন, দেখুন, যাচ্ছি বটে আপনার কথায়, কিন্তু ঝামেলা জোটাবেন না যেন। আমি একা নির্জনে থাকতে ভালবাসি, সেইজন্যেই এই নিরালা জায়গাটি বেছে নিয়েছিলাম।

না না, কোন গোলমাল হবে না আপনার। আমার কোয়ার্টার এখন একদম খালি, পরিবার-টরিবার সব দেশে।

বেশ, চলুন তা হ'লে।

মুক্তানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মালসাটা উনানের উপর উল্টাইয়া দিলেন ও পুঁটুলি লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। জাহাজঘাটের বড়বাবু সর্বেশ্বর চক্রবর্তী এই সাফল্যে উল্লসিত হইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

সর্বেশ্বরবাবুর সন্ন্যাসী-বাই আছে। গেরুয়াধারীর সন্ধান পাইলে তাহার সেবা না করিয়া তিনি ছাড়েন না। ইহা তাঁহার বাতিক-বিশেষ। অনেক লোকের অনেক রকম বাতিক থাকে—কেহ মদ খায়,

কেহ জুয়া খেলে, কেহ টিকিট সংগ্রহ করে, সর্বেশ্বরবাবু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া থাকেন। বহুপ্রকার সন্ন্যাসীর সেবা তিনি করিয়াছেন, বদরাগী, মৌনী, উর্ধ্ববাহু, উলঙ্গ, অঘোরপন্থী। সর্বেশ্বরবাবুর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়। সর্বেশ্বরবাবুর বাছবিচার নাই, সন্ন্যাসী হইলেই হইল। সব সন্ন্যাসী সেবা লইতে রাজিও হন না। কিন্তু অনিচ্ছুক সন্ন্যাসীদের উপরই সর্বেশ্বরবাবুর বিশেষ করিয়া ঝোঁক। কথিত আছে, একবার এক ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিম্‌টা-পেটা পর্যন্ত করিয়াছিল, তথাপি সর্বেশ্বরবাবু তাঁহাকে ছাড়েন নাই, সেবা করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। অথচ সর্বেশ্বরবাবু কখনও কোনও সন্ন্যাসীর নিকট কোন জিনিস প্রার্থনা করেন না, কাহাকেও হাতটা পর্যন্ত দেখান নাই। সন্ন্যাসীর খবর পাইলেই অনিবার্য টানে সর্বেশ্বরবাবু সেখানে যান, সাধ্যমত তাঁহার সেবা করেন, সুবিধা হইলে বাড়িতেও টানিয়া আনেন। ভন্টুর মেজকাকা দিন তিনেক পূর্বে ওই খড়ের ঘরটিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, খবর পাইবামাত্র সর্বেশ্বরবাবু আসিয়া হাজির হইয়াছেন। নিকটেই যে জাহাজঘাট আছে, সেই ঘাটেরই তিনি বড়বাবু। যেখানে ভন্টুর মেজকাকা ছিলেন, সেখানে কিছুকাল পূর্বেই একটা মেলা হইয়া গিয়াছিল; এবং যে ঘরটাতে তিনি ছিলেন, সে ঘরটা মেলারই যাত্রীদের জন্য নির্মিত একটা ভাল চালা। অল্প দূরেই জাহাজঘাট, সুতরাং মুক্তানন্দের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সর্বেশ্বরবাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। মুক্তানন্দ সর্বেশ্বরবাবুর পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন।

ভন্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর আসল নাম উমেশচন্দ্র। ইনি ভন্টুর বাবার বৈমাত্রেয় ভাই। বাল্যকাল হইতে উমেশের সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি অনাস্থা দেখা গিয়াছিল। লেখাপড়ার দিকে মন তো ছিলই না, অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারেও কোন আগ্রহ প্রকাশ পাইত না। ছেলেবেলায় নদীর ধারে, মাঠে অথবা বন-বাদাড়ে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোটা তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান বিলাস ছিল। আর কিছু নয়, একা একা টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। এই বেড়াইয়া বেড়ানোর নেশাতেই বোধ হয় এককালে তিনি এক যাত্রাদলের সঙ্গে ভিড়িয়া যান এবং কিছুকাল তাহাদের সঙ্গে কাটান। সেই সময়ে গান-বাজনাটা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার দলের জীবনও তাঁহার বেশিদিন ভাল লাগে নাই, তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসেন এবং মনোযোগ দিয়া আবার লেখাপড়া শুরু করেন। সেই মনোযোগের যুগেই তিনি এন্‌ট্রান্সটা পাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আরও হয়তো অগ্রসর হইতেন, যদি না তাঁহার ছোট ভাই রমেশ অকস্মাৎ বিসূচিকায় মারা যাইত। রমেশ মারা যাওয়ায় উমেশের জীবনে সহসা যেন ছন্দপতন ঘটিয়া গেল। উমেশ অনুভব করিলেন, সংসারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন; সংসারের সাধারণ পথে স্বচ্ছন্দে তিনি চলিতে পারিবেন না। অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু অসাধারণ পথও তিনি সহজে খুঁজিয়া পাইলেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধারণ পথেই তাঁহাকে আরও কিছুকাল চলিতে হইল। একটা চাকরি জুটিল, বড়দার ছোট ছেলে ভন্টুটা ক্রমশ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। বড়দার বড় ছেলে বিষ্ণুচরণের সাতিশয় সঙ্কীর্ণ সাংসারিকতার জন্য তাঁহাকে উমেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষত বিবাহ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুচরণ যখন কয়েকটি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, তখন উমেশ আর তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যেই তাহাকে 'ঘুণ' 'কীট' প্রভৃতি নানা আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচরণ ও উমেশ সমবয়সী ছিলেন। এইভাবেই চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন ঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পরিচয় হইলে উমেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, ভগবান ইঁহাকেই তাঁহার পারের কাণ্ডারী করিয়া পাঠাইয়াছেন।

উমেশ আকুল অন্তরে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন। এই ঠাকুর নামক ব্যক্তিটি যদি সাধারণ শিষ্যলোলুপ ব্যবসায়ী গুরু হইতেন, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান সহজে হইয়া যাইত, তিনি উমেশকে যথারীতি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সম্ভবত সত্যসত্যই সংসার-বিরাগী বলিয়া তাহা পারিলেন না। অতিশয় সহজভাবে উমেশকে বলিলেন, আমি তো কিছুই জানি না, তোমাকে কি বলব?

ইহাতে উন্টা ফল হইল। উমেশের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল।

না, আপনাকে রাস্তা ব'লে দিতেই হবে, কিছু ভাল লাগছে না আমার।

কি ভাল লাগছে না?

সংসার।

বেশ তো, সংসার ত্যাগ কর।

সে তো এখুনি করতে পারি, তারপর কি করব?

কি করতে চাও?

ভগবানের নাম করতে চাই।

বেশ তো, তাই কর না, বাধা কিসের?

আপনি উপদেশ দিন।

ভগবানের অনেক নাম আছে, যেটা তোমার পছন্দ হয় বেছে নিয়ে তাই জপ কর কোন নির্জন স্থানে ব'সে। উপদেশ আর কি দেব?

আপনি একটা দিন আমাকে।

মন্তর? মন্তর নিয়ে কি হবে? তুমি কি মনে কর, সংস্কৃত ভাষায় না বললে ভগবান তোমার কথা বুঝতে পারবেন না? যিনি কীটের ভাষা বোঝেন, তিনি তোমারও ভাষা বুঝবেন।

সহসা উমেশ ঠাকুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

আহা, ও কি কর? পা ছাড়। কি মুশকিল! কি চাও তুমি?

মুক্তি চাই, আনন্দ চাই—

উমেশ হু-হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বেশ, মুক্তানন্দ নাম তোমার দেওয়া গেল, তুমি পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে ভগবানের নাম কর গিয়ে, মুক্তি আনন্দ সব পাবে।

কি কি বিধিনিয়ম পালন করতে হবে ব'লে দিন তা হ'লে।

চক্ষুজল মুছিয়া উমেশ উন্মুখ হইয়া বসিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন, কিছু একটা না বলিলে নিস্তার নাই। অপরের মুখনিঃসৃত একটা উপদেশের ভেলা না পাইলে এ লোকটি নিছক নিজের জোরে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে না। উমেশের অসহায় মুখচ্ছবি তাঁহাকে বিচলিত করিল। একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, মাছ-মাংসের প্রতি কি তোমার খুব বেশি লোভ আছে?

আজ্ঞে না, মোটেই নেই।

তা হ'লে নিরামিষ আহারই কর—স্বপাক।

ঘি দুধ?

ঘি দুধ খাবে বইকি, কিন্তু গব্য। গেরুয়াও পর, সুবিধে হবে।

কোথা যাব ব'লে দিন।

ঠাকুরের হাসি পাইতেছিল। তথাপি কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, কাশী যাও, সেখানে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ কর।

আবার কবে আপনার দর্শন পাব?

আমি কোথায় কখন থাকি তার তো ঠিক নেই, আপাতত আমি ভাগলপুর যাচ্ছি।

ঠিকানাটা আমাকে দিন।

একটু ইতস্তত করিয়া একটা ঠিকানা অবশেষে তিনি দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। উমেশও চাকরি পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে

আত্মগোপন করিয়া মুক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাশীবাসের পর উমেশের ভবঘুরে মন আবার উসখুস করিতে লাগিল। কেবলমাত্র বিশ্বেশ্বরের নাম জপ করিয়া তিনি কেমন যেন তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, ঠাকুরের নিকট নূতন একটা কিছু প্রেরণা লাভ করিবার আশায় তিনি ভাগলপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, ঠাকুর যশোহরে গিয়াছেন, কিছুদিন পরে আবার ফিরিবেন। ভাগলপুরেই ফিরিবার কথা আছে। ভাগলপুরের গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মুক্তানন্দ সহসা স্থির করিলেন, একবার কলিকাতাটা ঘুরিয়া আসা যাক, ভন্টুটা কেমন আছে কে জানে, অনেকদিন তাহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। কলিকাতায় আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইল। মুক্তানন্দের জীবনের এই অংশটুকুর পরিচয় আপনারা ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। মুক্তানন্দ দেখিলেন যে, সংসারের ব্যাপার যেরূপ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে হয় তাঁহাকে রীতিমত সংসারী হইতে হইবে, না হয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। চলিয়া যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করিলেন এবং চুপিচুপি একদিন সরিয়া পড়িলেন। পুনরায় ভাগলপুরে আসিয়া শুনিলেন, ঠাকুর আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না, আবার যদি জড়াইয়া পড়েন? ঠাকুরের কাছে গিয়াই বা কি হইবে? তিনি যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা তো করা হয় নাই, কাশীতে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম একমনে জপ করিতে পারিলাম কই? কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করা যে অসম্ভব! ঠাকুর অবশ্য যে কোন নির্জন স্থানে বসিয়া নামজপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মুক্তানন্দ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ছিলেন। সহসা দেখিলেন, একটা মাল-বোঝাই নৌকা ছাড়িতেছে। মুক্তানন্দ দাঁড়াইয়া মাঝিকে ডাকিলেন। মাঝি আসিতে

তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তাহারা যদি তাঁহাকে কোন গ্রামের কাছে নদীতীরে একটু নির্জন জায়গায় নামাইয়া দেয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। এখনও এদেশে গৈরিক বসনের সম্মান আছে, ইহারই জোরে প্রায় নিঃসম্বল মুক্তানন্দ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মাঝিরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল এবং কিছুদূর গিয়া একটি জাহাজঘাটের নিকট বালুচরে নামাইয়া দিল। চরটি নির্জন।

কিন্তু কিছুদূরেই জাহাজঘাট ছিল এবং জাহাজঘাটে সর্বেশ্বরবাবু ছিলেন, সুতরাং মুক্তানন্দকে বেশিদিন নির্জনতা উপভোগ করিতে হইল না।

এই অবসরে ঠাকুরেরও একটু পরিচয় দেওয়া যাক। ঠাকুর আমাদের পূর্বপরিচিত মুকুজ্জেমশাই। মুকুজ্জেমশাইয়ের বন্ধনহীন চলা-ফেরা, সহজ সহৃদয় ব্যবহার, থান-কাপড়, খালি পা, একমাথা বড় চুল, একমুখ দাড়ি, শিক্ষিতজনসুলভ কথাবার্তা, পরোপকার-প্রবৃত্তি—সমস্তটা মিলিয়া এমন একটা অসাধারণ যোগাযোগ, যাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনিবার্যভাবে কতকগুলি ভক্ত জুটিয়া যায়। এই ভক্তের দল মুকুজ্জে-মশাইকে 'ঠাকুর' আখ্যা দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু এই ভক্তদের বড় ভয় করেন এবং যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই তিনি যা-হোক একটা ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়া নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখেন। নানাস্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের গতি-বিধি, সুতরাং একটি ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমশ গজাইয়া উঠিয়াছে এবং বহমান নদীস্রোতে খড়-কুটার মতই সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই ইহাদের লইয়া নানা কৌতুক বিদ্রূপ করেন, ভর্ৎসনা করেন; কিন্তু ইহারা নাছোড়বান্দা। মুকুজ্জেমশাইয়ের ভর্ৎসনা যত তীব্র হয়, ইহাদের ভক্তিও তত প্রগাঢ় হইয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, ইহাদের সহিত অভিনয়

না করিয়া উপায় নাই। ইহারা সত্য মানুষটাকে চায় না, একটা ছদ্ম কল্পমূর্তি পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং অভিনয় করিতে হয়। এই-জাতীয় কোন ভক্তের সহিত দেখা হইলে (যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাহাতে দেখা না হয়) তিনি ঠাকুরোচিত গুরু-গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলে তাহাকে যা-হোক একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দেন। কাহাকেও বলেন—তেল মাখিও না, কাহাকেও বলেন—নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া এস, কাহাকেও কিছুদিন নির্বাক থাকিতে আদেশ করেন। তাহারাও যথাসাধ্য আদেশ পালন করে। ভক্তদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন সদুপায় তিনি ভাবিয়া পান নাই। মুকুজ্জেমশাইয়ের আসল কর্মক্ষেত্র নানা-দুঃখপীড়িত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়, এবং সেখানেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা।

সর্বেশ্বরবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া মুক্তানন্দ ভোজ্য দ্রব্যগুলি পরিদর্শন করিলেন। সর্বেশ্বরবাবু আহারের ভাল যোগাড়ই করিয়াছিলেন। আলো চাল, মুগের ডাল, আলু, পটল, দুগ্ধ, ঘি।

ওটা গাওয়া ঘি তো?

আজ্ঞে না, ভঁয়সা, তবে খুব উৎকৃষ্ট জিনিস।

হাজার উৎকৃষ্ট হোক, ভঁয়সা চলবে না।

যে আজ্ঞে।

গব্য ঘৃত পাওয়া যাবে না এখানে?

পাওয়া শক্ত, আচ্ছা, দেখছি তবু চেষ্টা ক'রে।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্বেশ্বরবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই এক বালতি জল, একটি ঘটি এবং গামছা স্বহস্তে বহিয়া আনিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, আপনি ততক্ষণ হাত-পাটা ধুয়ে ফেলুন। আমি ঘিয়ের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।

সর্বেশ্বরবাবু চলিয়া গেলেন এবং মুক্তানন্দ হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

২০

করালীচরণ বক্‌সি তন্ময় হইয়া একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বামহস্তে জ্বলন্ত সিগারেট নিঃশব্দে পুড়িতেছিল। সিগারেটের ভস্মীভূত খানিকটা অংশ পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ঝাড়া হয় নাই—করালীচরণের ঝাড়িবার অবসর ছিল না। একাগ্রচিত্তে তিনি বর্জাইস অক্ষরে ছাপা উপন্যাসখানি গ্রাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছিল, একমাত্র চক্ষুটিও কখনও নিষ্প্রভ কখনও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেই সিগারেটের লম্বা পোড়া ছাইটা পুস্তকের উপর পড়িয়া গেল। করালীচরণ বিরক্তভাবে সিগারেটটার দিকে চাহিলেন এবং তাহাতে গোটা দুই লম্বা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ফুঁ দিয়া ছাইগুলি পুস্তকের পাতা হইতে পরিষ্কার করিতে গিয়া কিন্তু মুশকিলে পড়িয়া গেলেন, ফুৎকারে মোমবাতিটা নিবিয়া গেল।

বাই নারায়ণ!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিতে গিয়া একটা কাগজের তাড়া তাঁহার হাতে ঠেকিল। ভনুটু যে ঠিকুজি-কোষ্ঠীগুলা সকালে দিয়া গিয়াছে, সেইগুলাই সম্ভবত তেমনই পড়িয়া আছে, খুলিয়া পর্যন্ত দেখা হয় নাই। দেশলাইটা গেল কোথা? বসিয়া বসিয়াই হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, পাওয়া গেল না। বিরক্ত করালীচরণ অতিশয় অপ্রসন্নচিত্তে শেষে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মোড়ের ওই পানওয়ালীটার শরণাপন্ন হইতে হইবে শেষকালে—যদি অবশ্য

তাহার দোকান এত রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে। কাজল-পরা, মাথায়-ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো প্রৌঢ়া পানওয়ালীটাকে দেখিলে করালীচরণের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে, অথচ এই পানওয়ালীটিই ছোটখাটো আপদে বিপদে তাঁহাকে সর্বদা উদ্ধার করে। ধারে সিগারেট দেশলাই তো সে ক্রমাগত দিয়া চলিয়াছে। ভন্টুর হাতে টাকাকড়ি। আগের মত যখন তখন যেমন তেমন ভাবে খরচ করিবার উপায় নাই। ওই পানওয়ালীটির কৃপায় তবু মাঝে মাঝে ফাঁকি দিয়া খানিকটা খরচ করিয়া ফেলিবার সুবিধা আছে। ধারে জিনিস দেয় এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহা শোধ করিতে হয়। করালীচরণ অন্ধকারেই পথ খুঁজিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, পান-ওয়ালী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি মুশকিল! সামান্য একটা দিয়াশলাইয়ের অভাবে পড়া হইবে না—সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে? নির্লোম ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া তিনি গলির প্রান্তস্থিত পান-ওয়ালীর বন্ধ দোকানের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। ভন্টুর বাইসিক্‌লের ঘণ্টা শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই ভন্টু আসিয়া সহাস্যমুখে বাইক হইতে অবতরণ করিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে যে?

আরে, আমি তো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, মিস মার্‌গারেট কার্নিস ধ'রে শূন্যে ঝুলছে।

মিস্ মার্‌গারেট!

দেশলাই আছে কি না আগে বলুন।

আছে। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক্, আমার বাইকে লাইট নেই দেখে এক চাম চক্ষু তাড়া করেছিল এখুনি, পালিয়ে এসেছি আমি, এখানে আবার না এসে পড়ে ব্যাটা! চলুন, ভেতরে ঢুকে পড়া যাক।

চক্ষু মানে—পুলিস ? আপনি একদিন একটা কেলেঙ্কারি না ক'রে ছাড়বেন না দেখছি। লাইট কিনে ফেলুন না একটা।

উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভন্টু বাইকটাকেও টানিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া লইল। পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া মোমবাতিটি জ্বালিয়া দিল। বলিল, এ যে নিতান্ত স্খলিশ গুটকু দেখছি।

সত্যই মোমবাতিটি অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল, বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হয় না।

মোমবাতি জ্বলিতেই করালীচরণ পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন, ভন্টুর কথা শুনিয়া বলিলেন, দেখুন তো, ওদিকের তাকটায় আর একটা মোমবাতি আছে বোধ হয়।

আলমারির পাশেই যে ছোট তাকটি তিনি দেখাইলেন, সেটিতে কতকগুলি ধূলিধূসর পুস্তক হেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভন্টু সেগুলি সরাইয়া দেখিতে লাগিল, করালীচরণ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়িতে লাগিলেন। বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব।

ওরে বাপ রে—চাম গ্যান্‌ঢঅ—

ভন্টু সহসা চীৎকার করিয়া পিছাইয়া আসিল।

করালীচরণ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, কি, হ'ল কি ?

ভীষণ টিকটিকি একটা—গোদা চাম—দেখুন দেখুন।

সত্যই বেশ বড় একটা টিকটিকি দেওয়ালের উপর উঠিয়া আসিয়াছিল। করালীচরণ বলিলেন, কেন বিরক্ত করছেন ওকে ? ও অনেকদিন থেকে আছে আমার কাছে। আলোর কাছে এসে পোকামাকড় ধ'রে-ট'রে খায়, থাকে ওই বইগুলোর পেছনে, ছেড়ে দিন, বিরক্ত করবেন না ওকে।

করালীচরণ পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। ভন্‌টু মুখবিকৃতি করিয়া তাঁহাকে পিছন হইতে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বেশ খানিকক্ষণ ভ্যাংচাইয়া অবশেষে ভন্‌টু সহজকণ্ঠে বলিল, কই, এখানে মোমবাতি তো নেই!

পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া করালীচরণ বলিলেন, মোমবাতি যোগাড় করুন তা হ'লে একটা, এটা তো গেল।

ক পাতা বাকি আছে আপনার আর?

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠাটি উল্টাইয়া দেখিয়া করালীচরণ বলিলেন, বেশি নেই, আর পাতা কুড়ি আছে। তাহার পর ভন্‌টুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, অদ্ভুত বই, বাই নারায়ণ! শেষ করতে হবে এখুনি, যান, আপনি মোমবাতি নিয়ে আসুন। কথা বলবেন না, যান, সময় নষ্ট হচ্ছে আমার।

হ্রস্বায়মান মোমবাতিটির দিকে চকিতে চাহিয়া করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার পড়িতে শুরু করিলেন। ভন্‌টু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিকৃতমুখে খানিকক্ষণ করালীচরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে দুইটি আঙুলের মত সরু সরু মোমবাতি বাহির করিল, একটি লাল, আর একটি সবুজ।

দেখুন তো, এতে হবে?

করালীচরণ কোন উত্তর দিলেন না, গল্পে আবার তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

ভন্‌টু পুনরায় বলিল, দেখুন না, এতে হবে কি না!

বিরক্ত করালীচরণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আঃ, কি গোলমাল করছেন বার বার! ও মোমবাতি পেলেন কোথা থেকে? ভয়ঙ্কর সরু যে, কোথা থেকে পেলেন বলুন তো?

আমার কাছেই ছিল, বাইকে বাতি নেই, কাগজের ঠোঙার ভেতর এইগুলো জ্বেলেই চালাতে হচ্ছে আজকাল।

করালীচরণ ভন্টুর শেষের কথাগুলি শুনিলেন কি না সন্দেহ, কারণ আবার তিনি পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। ভন্টু স্মিতহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অবশ্য পড়া বন্ধ করিয়া নূতন একটি মোমবাতি ধরাইবার প্রয়োজন হইল।

ভন্টু বলিল, আপনি এইটে জ্বালিয়ে পড়তে থাকুন, আমি আর একটা জ্বালিয়ে ততক্ষণ চট ক'রে কিছু বড় মোমবাতি কিনে আনি, ঘোর জালে ফেললেন দেখছি আজকে।

করালীচরণ কোন উত্তর না দিয়া পড়িতে লাগিলেন। ভন্টু বাইক লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভন্টু যখন ফিরিল, তখন করালীচরণের উপন্যাস শেষ হইয়াছে। ভন্টু দেখিল, তিনি নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ভন্টু আসিতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। সেই স্বল্পালোকেই ভন্টু লক্ষ্য করিল, তাঁহার চক্ষুটি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অক্ষিকোটরের মধ্যে একখণ্ড অঙ্গার যেন জ্বলিতেছে। ভন্টু কেমন যেন ভয় পাইয়া গেল।

মোমবাতি এনেছেন?

এনেছি।

একটু থামিয়া ভন্টু বলিল, আচ্ছা, আপনি রোজ মোমবাতি জ্বালান কেন বলুন তো? একটা লণ্ঠন কিনলে অনেক সস্তায় হয়।

সস্তা? হ্যাঁ, তা বোধ হয় হয়।

করালীচরণ আর কিছু বলিলেন না, নির্বাণোন্মুখ কম্পিত শিখাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু মোমবাতির প্যাকেট হইতে একটি মোমবাতি তাড়াতাড়ি ধরাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল।

কেমন স্থন্দর দেখুন তো!

নূতন শিখাটির পানে করালীচরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বলিলেন, আপনি আরব্য উপন্যাস পড়েছেন ভন্টুবাবু?

পড়েছি।

তাতে গোড়াতেই আছে, শাহরিয়ার নামে এক স্থলতান রোজ একটা মেয়েকে বিয়ে করত, আর রোজ তাকে মেরে ফেলত। মনে আছে?

মনে আছে বইকি।

আমার যদি ক্ষমতা থাকত, আমিও তাই করতাম। সে ক্ষমতা নেই, তাই তার বদলে রোজ নতুন নতুন মোমবাতি জ্বালাই। একটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা জ্বালাই, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা। সারাজীবন ক্রমাগত মোমবাতি জ্বালিয়ে যাব একটার পর একটা, একটার পর একটা—

লণ্ঠন জ্বালালে একটু সস্তায় হয় তাই বলছিলাম।

লণ্ঠন! পুরনো কালিঝুলি-মাখা একটা লণ্ঠন সামনে জ্বালিয়ে আজীবন কাটিয়ে দেব সস্তায় হবে ব'লে? বলেন কি আপনি?

করালীচরণের কথাবার্তা ভন্টুর ঠিক বোধগম্য হইতেছিল না। সে মোমবাতি-প্রসঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ মনে করিল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যে কুষ্ঠি দুটো দিয়ে গিয়েছিলাম দেখেছেন? টাকা দিয়ে দিয়েছে তারা।

কই টাকা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

ভন্টু পকেট হইতে কুড়িটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, সব নেবেন নাকি? পাস-বুকে জমা করতে হবে না?

আজ থাক্, সমস্ত দিন মদ খেতে পাই নি। আপনি কাল যেটুকু দিয়ে গেলেন, সকালেই শেষ হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে তাই ও-বইটা নিয়ে বসতে হ'ল।

কি বই ওটা?

ডিটেক্‌টিভ আর পর্নোগ্রাফি কম্‌বাইণ্ড্। চমৎকার নেশা হয়, ওয়াণ্ডারফুল!

ভন্‌টু আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, দশটা টাকা আমাকে দিন, আপনার কাছে থাকলেই তো খরচ হয়ে যাবে।

না, আজ থাক্।

করালীচরণ টাকাগুলি তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন, যেন ভন্‌টু ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর অকস্মাৎ ভন্‌টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার পাঁচ শো টাকার আর বাকি কত? কত জমল?

এরকমভাবে খরচ করলে আর জমবে কি ক'রে? সেদিনও তো আপনি পঁচিশটা টাকা নিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আমাদের প্রোটোটাইপ গ্রহশান্তির জন্যে কিছু খরচ করতে চায়, কত পড়বে বলুন তো?

টাকা পঁচিশেক।

তাই ব'লে দেব তা হ'লে। হবে কিছু?

কিছু হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনি তা হ'লে আজ যান ভন্‌টুবাবু, কাল আমি কুষ্ঠি দুটো ঠিক ক'রে রাখব।

আচ্ছা।

ভন্‌টু বাহিরে আসিয়া বাইকের উপর সওয়ার হইল।

ভল্টু চলিয়া গেল। করালীচরণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা আলোটা ফুঁ দিয়া নিবাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ হনহন করিয়া হাঁটিবার পর অবশেষে তিনি যে পল্লীতে উপনীত হইলেন, তাহা বেশ্যা-পল্লী। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, স্বল্পালোকিত গলিটিতে বিশেষ কেহ ছিল না। একটা খোলার ঘরের সামনে একটিমাত্র রূপোপজীবিনী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। করালীচরণ সোজা গিয়া তাহারই সম্মুখীন হইলেন।

মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

করালীচরণ স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর দ্রুতবেগে আবার চলিতে শুরু করিলেন। দোতলার একটা ঘর হইতে গান বাজনা হাসির হর্‌রা সহসা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিল, এক চক্ষু তুলিয়া করালীচরণ একবার আলোকিত জানালাটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিলেন। উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে খানিকক্ষণ হাঁটিয়া করালীচরণ অবশেষে একটা হোটেলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সহসা অনুভব করিলেন, অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

খানিকটা মাংস আর রুটি দিন তো।

কতখানি মাংস, ক পীস রুটি?

প্রচুর দিন, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে।

এক প্লেট মাংস আর চার পীস রুটি দিই?

দিন। মদ আছে?

আনিয়ে দিতে পারি।

হুইস্কি আনিয়ে দিন এক বোতল।

টাকা লইয়া একজন হুইস্কি আনিতে চলিয়া গেল এবং একটি বালক-ভৃত্য মাংস ও রুটি আনিয়া করালীচরণের সম্মুখে ধরিতেই করালীচরণ

গপগপ করিয়া গিলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সেই পানওয়ালীটিকে মনে পড়িল। সেই কাজল-পরা, মাথায়-ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো নীলাম্বরী-কাপড়-পরা বুড়ীটা—ছুঁড়ী সাজিয়া লোক ভুলাইতে চায়! অসহ্য! ভাবিলেও গায়ে জ্বর আসে। জ্বর আসুক, কিন্তু ওই বোধ হয় একমাত্র নারী, যে করালীচরণকে একটু মমতার চক্ষে দেখে। বাকি সবাই তো তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কেহই তো তাহাকে আমল দিতে চায় না, টাকা দিতে চাহিলেও প্রত্যাখ্যান করে—এমন কি বেশ্যারাও!

বাই নারায়ণ!

হিংস্র বুভুক্ষু শ্বাপদের ন্যায় করালীচরণ মাংসের হাড়গুলা কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

ভন্টু সেদিন অত রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, দত্ত মহাশয় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের মুদীর দোকান আছে এবং সেই দোকান ভন্টুদের সংসারে ধারে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া থাকে। অনেকগুলি টাকা বাকি পড়িয়াছে। ভন্টু আজ নিশ্চয়ই কিছু দিবে বলিয়াছিল, সেই আশায় দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন।

দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া ভন্টু করজোড়ে বলিল, বড় লজ্জিত হলাম দাদা, বিশ্বাস করুন, কিছুতেই যোগাড় করতে পারলাম না। আজ এক জায়গা থেকে নির্ঘাত পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সব হোন্‌ডল-মোন্‌ডল হয়ে গেল।

দত্ত মহাশয় নীরবে সমস্ত শুনিলেন এবং নীরবে উঠিয়া গেলেন।

বউদিদি মুখ বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, দত্ত কি বললে?

চুপসে গেল।

ওর টাকাটা কাল যেমন ক'রে হোক দিয়ে দাও বাপু তুমি। না হয় আমার বালাটা কোথাও বাঁধা দাও।

গভীর গাড্ডা মিস্টার বিড্‌ডিকার, দুটো 'ড' নয়, পাঁচ-সাতটা 'ড'। বালাটাকে দব্‌চে আর লাভ কি? চল, খেতে দেবে চল—ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে, আগে গিলি, তারপর অন্য কথা।

রান্না তো হয়ে গেছে, এস না।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

২১

শঙ্কর বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, মায়ের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁহার পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে একটা ঘরে জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বাধ্য হইয়াই বাঁধিতে হইয়াছে, কারণ তিনি এমন সব কাণ্ড করিতেছিলেন যে, বাঁধিয়া রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। শঙ্কর দেখিল, তাহার বাবার মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। শুনিল, মা নাকি উন্মত্ত অবস্থায় একটা বাসন ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল, বন্দী-অবস্থাতেও মা বিড়বিড় করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন।

মা!

কোন সাড়া নাই, উন্মাদিনী অস্ফুটভাবে ক্রমাগত কি বলিতেছে!

মা, ও মা! দেখ, আমি এসেছি।

শঙ্কর হেঁট হইয়া পদধূলি লইল।

দূর হ, দূর হ, দূর হ—যত সব পাপ আপদ বালাই—দূর হয়ে যা সব—

শঙ্করের বাবা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, শঙ্কু, চ'লে আয় তুই, ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে ডাক্তারে মানা করেছে। ওতে পাগলামি বাড়ে শুধু। বেরিয়ে আয়।

শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল। তাহার অমন মা এই হইয়া গিয়াছে!

কোন্ ডাক্তার দেখছে ?

কোন ডাক্তার বাকি নেই, এ অঞ্চলে সবাই দেখেছে, এমন কি সিভিল সার্জন পর্যন্ত।

কি বলছেন তাঁরা ?

বলবেন আর কি ? কেউ বলছেন ডব্লিউ. সি. রায়, কেউ দিচ্ছেন ব্রোমাইড, কেউ বা আর কোন ঘুমের ওষুধ। ওই টেম্পরারি কিছু ফল হয়, তারপর যে-কে সেই। কবরেজিও করেছি—কিচ্ছু হয় নি।

শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বাবা বলিলেন, চল, বাইরে চল—আরও কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বাহিরের ঘরে আসিয়া শঙ্করের বাবা একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং আর একটি চেয়ার দেখাইয়া শঙ্করকে বলিলেন, ব'স্ তুই, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ভেবে আর কি হবে বল্, সবই অদৃষ্ট।

শঙ্কর নীরবে উপবেশন করিল।

শঙ্করের পিতা অম্বিকাচরণ রিটায়ার্ড ডেপুটি, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, গম্ভীর রাশভারী লোক। দেখিলেই সম্ভ্রম হয়, মনে হয়, এ লোকটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলিবে না। কোথাও বসিলে পা দোলানো তাঁহার স্বভাব, কিন্তু তাহাও এমন গম্ভীর চালে করিয়া থাকেন যে, ছন্দপতন হয় না, হাকিমী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বেশ মানাইয়া যায়।

চেয়ারে বসিয়া তিনি গম্ভীরভাবে পা দোলাইতে লাগিলেন। শঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে অম্বিকাবাবু একটা মোটা সিগার বাহির করিয়া সেটা ধরাইলেন। কিছুক্ষণ নীরবেই ধূমপান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, কেমন পড়াশোনা হচ্ছে ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অম্বিকাচরণই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

বলিলেন, তোমাকে টেলিগ্রাম ক'রে আনলাম এইজন্তে যে, তুমি যদি পার, কলকাতায় একটা বাসা ঠিক কর গিয়ে। নিয়ে যাবার মত অবস্থা হ'লে কলকাতাতেই নিয়ে যাই ওকে, সেখানে নানারকম স্পেশালিস্ট্‌ আছেন, দেখা যাক একবার চেষ্টা ক'রে।

চুরুটে দুই-একটা টান দিয়া পুনরায় বলিলেন, আক্ষেপ থাকে কেন?

শঙ্করের বলিবার কিছু ছিল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চুরুটের ছাইটা সন্তর্পণে ঝাড়িয়া অম্বিকাবাবু বলিলেন, আরও একটা কথা বলবার আছে তোমাকে। নানা জায়গা থেকে তোমার বিয়ের প্রস্তাব আসছে, আমি তাড়াতাড়ি তোমার বিয়েটাও দিয়ে দিতে চাই। কারণ, আমার ব্লাডপ্রেসারের যা অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না। তা ছাড়া বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন দেরি করার কোন মানে হয় না। আরও একটা কথা আছে, দু-একজন ডাক্তার বলেছেন যে, বউয়ের মুখ দেখে ওঁর পাগলামি খানিকটা কমবে, অন্তত সম্ভাবনা আছে।

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, এই অবস্থায় এখন বিয়ে!

ডাক্তারদের মতে অবস্থা পরিবর্তনের জন্তেই বিয়ের দরকার।

অম্বিকাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারে আরও একটি টান দিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, তা ছাড়া, বেশি বয়সে বিয়ে করার আমি পক্ষপাতীও নই।

শঙ্করের মনে রিনির মুখখানি ভাসিয়া উঠিল, মনে হইল, তাহার সচকিত নয়ন দুইটি যেন ক্ষণিকের জন্য তাহার পানে চাহিয়া আবার আনমিত হইল।

শঙ্কর বলিল, এখন আমি বিয়ে করতে পারব না।

অম্বিকাবাবুর ভ্রূ আরও একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি চোখ তুলিয়া পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাদের

কালে বাপ-মারা বিয়ে দেওয়ার সময় ছেলেদের মত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। আজকাল আমরা ছেলেদের সে সম্মানটা দিয়েছি; এটাও প্রত্যাশা করি যে, ছেলেরাও আমাদের সম্মান রাখবে।

শঙ্কর বলিল, এতে সম্মানের কোন প্রশ্নই উঠছে না।

উঠছে বইকি। আমি তোমাকে আদেশ না ক'রে অনুরোধ করলাম, সে অনুরোধ তুমি যদি না রাখ, তা হ'লে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বইকি।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এত বড় একটা দায়িত্ব নেবার আগে আমি একটু ভেবে দেখতে চাই। সময় দিন আমাকে কিছু।

আবার রিনির মুখখানা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারটাতে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন।

ভেবে দেখতে চাও, দেখ। দায়িত্বের কথা নিয়ে আস্ফালন করাটা আজকাল তোমাদের একটা ফ্যাশান হয়েছে বটে, আসলে কিন্তু ওটা অন্তঃসারশূন্য ডেঁপোমি। বিয়ে করার দায়িত্ব যে কতখানি, আর সে ভার বহন করবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না, এটা ভাল ক'রে ভেবে দেখবার বয়স অথবা অভিজ্ঞতা তোমার হয় নি।

যখন হবে, তখনই বিয়ে করব।

যখন হবে তখন বিয়ে করাটা নিরর্থক—It is no good marrying at fortyfive or fifty. তার আগে অভিজ্ঞতা হয় না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অম্বিকাবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আসলে আজকালকার ছেলেরা অতিশয় স্বার্থপর। তাদের মতলবটা, হালকা মেঘের মত গায়ে ফুঁ দিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব, যা রোজগার

করব নিজের সুখের জন্যেই সেটা খরচ করব, স্ত্রীপরিবারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাব না। তারা ভুলে যায় কিংবা ভুলে থাকতে চায় যে, যে সমাজ তাদের মানুষ করেছে, সেই সমাজের প্রতিও তাদের একটা কর্তব্য আছে। সামান্য কুলী-মজুরও রোজগার ক'রে তাদের স্ত্রীপরিবার পালন করছে। দুঃখ-ভোগ করছে তা স্বীকার করি, কিন্তু দুঃখ-ভোগ করাটাও যে একটা ট্রেনিং, একটা প্রয়োজনীয় জিনিস, ষ্টিমুলাস ফর স্ট্রাগ্‌ল—তোমরা আজকাল সেটা এড়িয়ে চলতে চাও।

কুলী-মজুরদের মত জীবন-যাপন করাটা কি বাঞ্ছনীয়?

তা তো আমি বলছি না। আমি বলছি, দুঃখের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রাম কর, ভীরুর মত পালিয়ে যাওয়াতে কোন বাহাদুরি নেই। লড়াই কর—লড়াই ক'রে জেতো। হারলেও লজ্জা নেই। কিন্তু যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা কোন কালেই গৌরবের নয়। আজকাল তোমরা তাই করছ।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

অম্বিকাচরণ চোখ বুজিয়া সিগারে টান দিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, ভেবে দেখতে চাও, ভেবে দেখ। তুমি আমার এক-মাত্র ছেলে। আমার শরীর ভাল নয়, তোমার মায়ের অবস্থা তো দেখছই—বাড়িতে কোন দ্বিতীয় স্ত্রীলোকও নেই যে, আমাদের দেখাশোনা করে। শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পরই তোমার মায়ের পাগলামি শুরু হয়েছে, তোমার বিয়ে হ'লে হয়তো সেরেও যেতে পারে—কিছু বলা যায় না। সমস্ত জিনিসটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, টেক টাইম, দেয়ার ইজ নো হারি। আচ্ছা, যাও এখন। কয়েকখানা চিঠি লিখতে হবে আমাকে।

শঙ্কর উঠিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

বাড়ির ভিতরে গিয়াই সে শুনিতে পাইল, মা চীৎকার করিতেছেন, শশাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশাঙ্ক এসেছে। দেখতে পাচ্ছিস না তোরা, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি সব?

শশাঙ্ক শঙ্করের ছোট ভাই, কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে।

শঙ্কর একা রাত্রে বিছানায় শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। পিতার কথাগুলি যুক্তিহীন নয়, কিন্তু রিনি? রিনিকে যে সে ভালবাসিয়াছে! যদিও মুখে সে রিনিকে কিছু বলে নাই, কিন্তু রিনি কি বোঝে না? একটুও না? অসম্ভব। তাহার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার একটু আভাসও কি রিনি পায় না? তাহার মনে সামান্যতম স্পন্দনও কি জাগে নাই? নিশ্চয়ই জাগিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর তাহা জানিবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করা তো অসম্ভব। অথচ—

…হঠাৎ দারুণ একটা চীৎকারে শঙ্করের চিন্তাস্রোত ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পাগলিনী চীৎকার করিতেছেন। সে চীৎকার এত করুণ, এত তীব্র, এত মর্মস্পর্শী যে, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া বিছানায় খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, চতুর্দিকের অন্ধকার যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে, নানারূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। অদ্ভুত সব মূর্তি!…সহসা চীৎকারটা থামিয়া গেল; চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সহসা দালানের ঘড়িটার শব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, দূরে চৌকিদার হাঁকিয়া গেল। শঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সে যেন এ বাড়ির কেহ নহে, কোন আগন্তুক যেন হঠাৎ আসিয়া এক রাত্রির জন্য আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, কাল সকালেই উঠিয়া চলিয়া যাইবে। পাশ-বালিশটা জড়াইয়া ঘুমাইবার জন্য সে ভাল করিয়া শুইল, কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। মুদিত নয়নের সম্মুখে রিনি আনত নয়নে সারারাত বসিয়া রহিল।

২২

দ্রুতগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় বোস সাহেব বসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, কষ্ট হইবার কথা নয়, তথাপি বোস সাহেবের মুখখানি অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। তিনি দিল্লী হইতে ফিরিতেছিলেন, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছিলেন। যে সাহেবটিকে তোয়াজ করিতে তিনি গিয়াছিলেন, নানারূপ তোয়াজ সত্ত্বেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। এমন একটিও আশাপ্রদ কথা সাহেবের মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই, যাহার উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করা যায়; অথচ তাঁহার ধারণা ছিল, ক্যামেরন সাহেব···

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বোস সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

মিস্টার এল. কে. বোস (ললিতকুমার বোস) বাঙালী-সমাজের আদর্শ পুরুষ। বরাবর ভাল করিয়া পরীক্ষা পাস করিয়াছেন, সুপারিশ এবং বিদ্যার জোরে ভাল চাকুরি যোগাড় করিয়াছেন, চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কলা-কৌশল শিখিয়াছেন, মোটা রকম পণ লইয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিয়াছেন, ইহার মধ্যে কলিকাতা শহরে খানিকটা জমি কিনিয়া ফেলিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন দুই-একজনের চাকরি করিয়া দিয়াছেন, করেন নাই কি? সুতরাং পরিচিত-মহলে নিদারুণ সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও বোস সাহেবের নামে সকলের মনে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই জাগে। গোপনে গোপনে দুই-চারিজন বোস সাহেবের সাহেবিয়ানা লইয়া যে টিটকারি দেন না তাহা নয়, কিন্তু টিটকারিতে বোস সাহেবের কিছু আসে যায় না। সেজন্যও বটে এবং সাহেবিয়ানাটা তাঁহার চাকরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ এই বিশ্বাসের ফলেও বটে, অধিকাংশ লোকই তাঁহার সাহেবিয়ানা লইয়া আর মাথা ঘামায় না। বোস সাহেব একজন বড় অফিসার, এই মহিমার জ্যোতিতেই সকলের চোখ ধাঁধিয়া আছে। তাঁহার চারিত্রিক নানা দোষও তাই মহিমান্বিত

হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই বোস সাহেব উদ্যমশীল ব্যক্তি, নিত্য নব উপায়ে চাকুরির উন্নতি করিয়া চলিয়াছেন, শাসন-যন্ত্রের কোন্ চাকাটিতে কখন কোন্ তৈল নিষেক করিলে সুফল ফলিবে, ইহা আবিষ্কার করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, এবং তাহাতে তিনি খানিকটা সফলকাম হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শৈলকে তিনি সুখী করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন, তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না, তিনি নিজেও না। শৈলকে তিনি মিসেস এল. কে. বোসের মর্যাদা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নয় কি? ইহার অধিক আর কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, জীবনে তাঁহাকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, বিবাহিত স্ত্রীকে লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করিবার অবসরই বা কোথায়?

একটা ছোট স্টেশনে এক মিনিট থামিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন পুনরায় চলিতে শুরু করিল। অনেক দূরে তাহাকে যাইতে হইবে, অনেক স্টেশন পার হইতে হইবে, ছোট স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার তাহারও অবসর নাই।

এক্সপ্রেস ছুটিতে লাগিল।

২৩

মিস বেলা মল্লিক তন্ময় হইয়া সঙ্গীতচর্চা করিতেছিলেন। গাহিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই পুরাতন গানখানা—মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো। এই পুরাতন গানটাই বেলা মল্লিকের কণ্ঠে নূতন লালিত্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পাশের বাড়িতে মুগ্ধ লক্ষ্মণবাবু খবরের কাগজটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহা শুনিতেছিল। তাহার তন্ময় নিস্পন্দ ভাবটা বেলাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া গিয়াছে, সেদিন বেলা একটি পত্রযোগে

স্পষ্টভাবেই লক্ষ্মণবাবুকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোষ্ঠীর অমিল সত্ত্বেও বিবাহ দিবার মত দৃঢ় মনোভাব তাঁহার দাদার অর্থাৎ প্রিয়বাবুর নাই, তাঁহার নিজেরও এ সম্বন্ধে কুসংস্কার আছে, সুতরাং বিবাহ হওয়া অসম্ভব। লক্ষ্মণবাবু যেন অনুগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাব আর না উত্থাপিত করেন, কারণ তাহা এ ক্ষেত্রে অকারণ ক্ষোভেরই সৃষ্টি করিবে। প্রিয়বাবুও বেলার জেদে পড়িয়া এবং নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণবাবুকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কুষ্ঠির যখন মিল হচ্ছে না, তখন আর উপায় কি? কিন্তু মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন, আহা, এমন পাত্রটা ফসকাইয়া গেল! বেলাটা যে দিন দিন কি হইতেছে, বুঝিবার উপায় নাই!

গানটা খানিকক্ষণ গাহিয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অঙ্গভঙ্গী-সহকারে গা ভাঙিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর এস্রাজখানা পাড়িয়া বাজাইতে লাগিলেন। ওই গানখানাই বাজাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু আর বাতায়নে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গেল।

বেলা বাজাইতেছেন, এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য বেচারীকে অনেকটা দূর হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁহাকে চাকরি ছাড়া ইন্সিওরেন্সের দালালিও করিতে হয়। একটি শিকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান সফল হয় নাই, ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সহসা সঙ্গীতনিরতা বেলাকে দেখিয়া তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, আমি খাটিয়া খাটিয়া গায়ের রক্ত জল করিয়া ফেলিলাম, আর এ দিব্যি বসিয়া এস্রাজ বাজাইতেছে! বিবাহ করিবার নাম নাই, পাত্র আনিলে কোন না কোন ছুতায় সেটাকে তাড়াইয়া দিতেছে। মেয়েমানুষ বলিয়া মাথা কিনিয়াছে একেবারে!

প্রিয়নাথ মল্লিকের সহসা ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সম্প্রতি ভগ্নীর চালচলন ভাবগতিক এমন একটা বেপরোয়া মূর্তি ধারণ করিয়াছে যে, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, তোর মতলবটা কি, বল্ দেখি খুলে?

ভ্রূভঙ্গীসহকারে বেলা উত্তর দিলেন, কিসের মতলব?

কিসের আবার, বিয়ে-থা করবি, না, না?

সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন তিনি।

বেলা ছড়টা পাশে রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার জন্যে তোমার অত মাথাব্যথা কেন? তুমি নিজে বিয়ে কর না, যদি ইচ্ছে হয়। কর না, বেশ আমার একটি সঙ্গী হোক।

প্রিয় মল্লিক ব্যঙ্গতিক্ত একটা হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি বিয়ে করব! এই কলকাতা শহরে একটা অবিবাহিত বোন ঘাড়ে নিয়ে একশো টাকা মাইনেয় বিয়ে করা চলে? বললেই হ'ল, বিয়ে কর!

গ্রীবা বাঁকাইয়া অধর দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ঘাড়ে ক'রে মানে? আমিই কি তোমার বিয়ের পথে বাধা নাকি?

তাঁহার চক্ষু দুইটি সহসা জ্বলিয়া উঠিল।

প্রিয়নাথও একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন, বলিলেন, সে কথা কি এখনও বুঝতে পার নি? আর কিছু না হোক, তোমার বুদ্ধির উপর আমার কিঞ্চিৎ আস্থা ছিল।

বেলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, বেশ, তুমি পাত্রী দেখ, আমি তোমার ঘাড় থেকে এখুনি নেবে যাচ্ছি। এ কথাটা আগে বললে আগেই ব্যবস্থা করতাম, মিছিমিছি তোমার সময় নষ্ট হ'ল এতদিন।—এস্রাজটা কোল হইতে নামাইয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কোন কথা না বলিয়া সম্মুখের আলনাটা হইতে নিজের কাপড়-জামা প্রভৃতি টানিয়া নামাইয়া পাট করিতে শুরু করিয়া দিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, এর মানে ?

বেলা কোন উত্তর দিলেন না। একটির পর একটি কাপড় পাট করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এর মানে কি ?

তথাপি বেলা নিরুত্তর।

একটু বিব্রতকণ্ঠে প্রিয়নাথ আবার বলিলেন, হঠাৎ কাপড় গোছাবার মানে কি, আমি জানতে চাই।

বেলা ঘাড় ফিরাইয়া নির্বিকারভাবে বলিলেন, কাপড়গুলো কি তা হ'লে রেখেই যাব ? তুমি এগুলো কিনে দিয়েছ অবশ্য, ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পার।

ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পারি !

বিহ্বল প্রিয়নাথ যন্ত্রচালিতবৎ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

পার বইকি। বেশ, নেব না এগুলো, রইল।

দ্রুতপদে বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হাতে লইলেন শুধু ছোট হাতব্যাগটা। স্তম্ভিত প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর উঠিয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, মেয়েটা সত্য সত্যই গেল কোথা ! কিছু দেখা গেল না। তখন তিনিও রাস্তায় বাহির হইলেন। দেখিলেন, দূরে দ্রুতপদে বেলা চলিয়াছেন। ঘাড় ফিরাইয়া প্রিয়নাথকে দেখিয়া ডান দিকের গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রিয়নাথ কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণবাবু বাহির হইয়া আসিল এবং সস্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে, এমন ক'রে ? আসল কথাটা প্রিয়নাথ বলিতে পারিলেন না। কেমন যেন বাধিয়া গেল। বলিলেন, দেখছি, যদি রিক্‌শা-টিক্‌শা একটা পাওয়া যায়।

কোথাও বেরুবেন নাকি ?

মনে করছি তো।

প্রিয়বাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণবাবুও এদিক ওদিক চাহিয়া অকারণে সামনের বাড়ির ভদ্রলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল; আপনার ছেলেটি কেমন আছে আজ?

লক্ষ্মণবাবুর কোন উৎকণ্ঠা ছিল না, এমনিই জিজ্ঞাসা করিল। সামনের বাড়ির ভদ্রলোক জানালার ধারে বসিয়া কামাইতেছিলেন, আবছা-গোছের একটা উত্তর দিলেন, চলছে।

উপরের বাতায়ন হইতে বেলাকে বাহির হইয়া যাইতে লক্ষ্মণবাবু দেখিয়াছিল, সুতরাং শীঘ্র আর সঙ্গীতের সম্ভাবনা নাই। সে বাইকটি বাহির করিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ দ্রুতপদে হাঁটিয়া বেলাকে অবশেষে গতিবেগ মন্থর করিতে হইল। শিয়ালদহের জনবহুল মোড়টাতে দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইবার কি করা যায়? এক রিনিদের বাড়ি ছাড়া চেনাশোনা আর কোন স্থান তো কলিকাতা শহরে নাই! কিন্তু রিনিদের বাড়ি যাইতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল, সেখানে গিয়া কি বলিবেন? তাহা ছাড়া, তাঁহার দাদা নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া খোঁজ করিবেন এবং অবশেষে একটা নাটকীয় ব্যাপার করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। এরূপ অপমানের পর আর তিনি দাদার আশ্রয়ে কিছুতেই ফিরিয়া যাইবেন না, তাহাতে অদৃষ্টে যত কষ্টই থাক্। কিন্তু অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার। রোদও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। শিয়ালদহের বড় ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে বারোটা বাজিয়াছে, ক্ষুধারও একটু উদ্রেক হইয়াছে। সহসা বেলার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। দেখাই যাক না ভদ্রলোককে একটু পরীক্ষা করিয়া! হাতব্যাগটা খুলিয়া দেখিলেন,

আনা তিনেক পয়সা রহিয়াছে। উহাতেই হইবে। একটু আগাইয়া গিয়া বড়-গোছের একটা দোকানে বেলা উঠিলেন এবং স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, দয়া ক'রে আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে দেবেন কি?

নিশ্চয়, এই যে আসুন।

দোকানদার ভদ্রলোক ভদ্রতার আতিশয্যে টুলটা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ফোনটা আগাইয়া দিলেন। নিকটেই ডাইরেক্টরিখানা ছিল, বেলা অপূর্ববাবুর আপিসের ফোন-নম্বরটা বাহির করিয়া অপূর্ববাবুকে ফোন করিলেন। বলিলেন, তিনি বড় বিপদে পড়িয়া শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। অপূর্ববাবুকে বিশেষ প্রয়োজন, তিনি যদি অবিলম্বে একবার আসিতে পারেন বড় ভাল হয়, না আসিলে বড় মুশকিলে পড়িতে হইবে।

অপূর্ব বলিলেন, খুব চেষ্টা করছি আমি যেতে, ছুটি পেলে নিশ্চয়ই যাচ্ছি।

ছুটি নিন যেমন ক'রে হোক।

দেখি।

ফোনটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বেলা দেবী ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে দুই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু দোকানী ভদ্রলোক কিছুতেই তাহা লইতে রাজি হইলেন না। বেলা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অপূর্ববাবুর প্রতীক্ষায় ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে শিয়ালদহের মোড়ে আসিতে একটু সময় লাগে, বেলা অলসভাবে দাঁড়াইয়া প্রাচীরগাত্রের এবং ল্যাম্প-পোস্টের উপর যে বিজ্ঞাপনগুলি ছিল, তাহাই পড়িতে লাগিলেন। হরেকরকমের নানাবিধ বিজ্ঞাপন, অধিকাংশই বাড়িভাড়া-সংক্রান্ত। দেখিতে দেখিতে একটি বিজ্ঞাপন সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

একটি ছোট মেয়েকে গান শিখাইবার জন্য ও পড়াইবার জন্য একটি শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। দুই বেলা পড়াইতে হইবে, বেতন যোগ্যতা অনুসারে। আবেদনকারিণী যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। বেলা অধর দংশন করিয়া খানিকক্ষণ বিজ্ঞাপনটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর রাস্তা পার হইয়া সেই ফোনওয়ালা দোকানে গিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, আপনাকে আর একবার বিরক্ত করতে এলাম। এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল যদি দেন—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ কাগজ-পেন্সিল দিলেন। বেলা কাগজে ঠিকানাটি টুকিয়া লইয়া হাতব্যাগে সেটি রাখিয়া দিলেন এবং পুনরায় ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া ট্রাম-লাইনের ধারে গিয়া অপূর্ববাবুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই অপূর্ববাবু আসিয়া পড়িলেন। ট্রাম হইতে নামিয়া কোঁচাটি ঝাড়িয়া পাঞ্জাবির পকেটে পুরিতে পুরিতে মিহি গলায় মৃদু হাসিয়া অথচ একটু চিন্তিতকণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

ব্যাপার গুরুতর।

তার মানে?

তার মানে, দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, রাস্তায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি, আপনি এখন একটা ব্যবস্থা করুন আমার।

অপরূপ গ্রীবাভঙ্গীসহকারে অধর দংশন করিয়া বেলা অপূর্ববাবুর পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ববাবু ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। আপিসে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ এ কি কাণ্ড!

দাদা তাড়িয়ে দিয়েছেন? বলেন কি?

বলছি তো, কেন তাড়িয়ে দিয়েছেন, কি বৃত্তান্ত পরে শুনবেন, এখন আমার একটা দাঁড়াবার জায়গা ঠিক করুন তো আগে। আপনি যে মেসে থাকেন, সেখানে সুবিধে হতে পারে কিছু? প্রস্তাবটার অসমীচীনতায় বেলা নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পুনরায় বলিলেন, বলুন না, সেখানে আমার জায়গা হতে পারে কি না।

অপূর্ববাবু পকেট হইতে সুগন্ধি রুমালখানা বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটা মুছিয়া ফেলিলেন ও আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমার মেসে? মানে, সেটা একটু দৃষ্টিকটু হবে না? মানে, অন্য কিছু নয়, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু আবার ঘামিতে লাগিলেন।

বেলা পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, আমার সম্বলের মধ্যে মাত্র তিন আনা রয়েছে এই ব্যাগে। তা না হ'লে আপাতত একটা হোটেলে উঠলেও চলত, কিন্তু—

অপূর্ববাবু পুনরায় মুখটা মুছিয়া বলিলেন, মাসের শেষ কিনা, আমারও হাত একদম খালি, মানে—

কুটিল হাসি হাসিয়া বেলা বলিলেন, তা ছাড়া, সেদিন রিনিকে অমন দামী দুখানা বই কিনে দিতে হ'ল তো। শঙ্করবাবুকে সে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি?

না, এখনও দেওয়া হয় নি, দেখাই হয় না ভদ্রলোকের সঙ্গে।

এমন সময় অভাবিত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

রোক্‌কে—রোক্‌কে—

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

বিস্মিত বেলা বলিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেকদিন বাঁচবেন আপনি, এইমাত্র আপনার নাম হচ্ছিল! হঠাৎ এখানে কোথা থেকে?

বাড়ি গিয়েছিলাম, এইমাত্র নাবলাম ট্রেন থেকে। হস্টেলে ফিরছিলাম, আপনাদের দেখে নেবে পড়লাম। অপূর্ববাবুকে একটু যেন বিব্রত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি?

অপূর্ববাবু বারম্বার ঘাড় ও মুখ মুছিতে লাগিলেন।

বেলা অপাঙ্গে সেদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিব্রতই করেছি ওঁকে একটু। আপনিও শুনুন তা হ'লে ব্যাপারটা, এবং যদি ইচ্ছে করেন, বিব্রত হোন।

বেলা দেবী সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা পুনরায় বিবৃত করিলেন।

শঙ্কর বলিল, তার জন্যে আর ভাবনা কি? এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি ডাকলেন যে?

চলুন আমার হস্টেলে। সেখানে একটা কমন-রুম আছে তো। সেখানেই না হয় বসবেন খানিকক্ষণ, তারপর খাওয়া-দাওয়া ক'রে যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেই হবে। ওর জন্যে আর ভাবনা কি, চলুন।

সেখানে কি ব'লে আমার পরিচয় দেবেন?

বোন।

না, বোন আমি হতে চাই না কারও। একজনের বোন হয়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, পরিচয় যা হোক একটা দিলেই হবে, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন উঠুন।

বেলাকে লইয়া শঙ্কর ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

বেলা অপূর্ববাবুকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, অনর্থক কষ্ট দিলাম আপনাকে, কিছু মনে করবেন না।

না না, কিছু না—

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

অপ্রস্তুত মুখে সেই দিকে চাহিয়া অপূর্ববাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২৪

প্রফেসার গুপ্ত কালিদাসের কাব্যে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য চর্চা করা তাঁহার জীবনের প্রথমতম বিলাস। যদিও তাঁহার পরিধানে রিম্‌লেস চশমা, হস্তে বিলাতী সিগারেট, অঙ্গে মুসলমানী ঢিলা পাঞ্জাবি ও পায়জামা, কিন্তু মনে মনে তিনি উজ্জয়িনীবাসিনী মালবিকা-নিপুণিকা-চতুরিকার প্রণয়ী। তাঁহার কুশন-দেওয়া রিভল্‌ভিং চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি নগাধিরাজ হিমালয়ের গভীর গাম্ভীর্যের মধ্যে অথবা অলকাপুরীর মায়াময় স্বপ্নলোকে তন্ময়চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন। ছন্দে গাঁথিয়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা যদিও তিনি অদ্যাপি লেখেন নাই, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, ইহা সত্য কথা। তাঁহার নিজের জীবনটাতেই নানা কবিতার উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কোন দিন ছন্দোবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইল না। ছাত্রস্থানীয় শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের কারণও এই কবিত্বপ্রীতি। শঙ্করের কবিতা যদিও ছাপা হয় নাই, কিন্তু তাহা অপরূপ। তাহার মধ্যে তিনি উদীয়মান কবি-প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সুখ হয়, তাহার মনের সংস্পর্শে আসিলে নিজের মনের সুর বিচিত্র লীলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। বয়স এবং সম্পর্কের অনৈক্য সত্ত্বেও তাই শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে।

প্রফেসার গুপ্ত তন্ময়চিত্তে শকুন্তলায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি বিলাত হইতে আসিয়াছে, পরিচিত হস্তাক্ষর। প্রফেসার গুপ্তের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। ইভার চিঠি। সেই ইভা, যাহাকে ঘিরিয়া একদিন কত স্বপ্নই না পরিগ্রহ করিয়াছিল! সে স্বপ্নগুলি আজ কোথায়? লণ্ডনবাসিনী বিপণি-পরিচারিকা ইভার মনেও কি এখনও

তাহারা সজীব হইয়া আছে? হয়তো নাই। না থাকুক, কিন্তু একদিন এই ইভাই তাঁহার প্রবাস-জীবন অনন্ত মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল, তাহা সত্য কথা। একদিন ইহা জীবন্ত সত্য ছিল বলিয়াই আজও পত্রধারার নির্জীব অভিনয় চালাইতে হইতেছে। ইভাও তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই, তিনিও ইভার ধ্যানে মগ্ন নহেন, চিঠি লেখাটা এখনও তবু চলিতেছে। অতীত জীবনের সেই পরম রমণীয় ভঙ্গুর স্বপ্নটি যদিও আজ ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তো তাহা একদিন ছিল! ইভার ছবিটা মনে ভাসিয়া উঠিল। তাহার নীল চক্ষু দুইটিতে, সোনালী অলকে, রক্তিম অধরে, পীবর বক্ষে এখনও কি সেই মাদকতা আছে? চক্ষু মুদিত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিমীলিত নয়নে তিনি ইভাকেই দেখিতে লাগিলেন—যে ইভা তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়াও প্রত্যাখ্যান করে নাই যে ইভা সর্বস্ব দিয়াও তাঁহাকে একটু খুশি করিতে পারিলে বর্তিয়া যাইত, সে ইভা কি এখনও বাঁচিয়া আছে? প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; মনে হইল, তিনি যেন কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়াছেন, অদূরে আশ্রমবাসিনী বল্কলবসনা শকুন্তলা দুষ্মন্তের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এ কি, শকুন্তলার মুখখানা ঠিক যেন ইভার মত! এ যে একেবারে অবিকল ইভা!

খুট করিয়া একটা শব্দ হইল, স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

প্রফেসার গুপ্ত তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে মাথা তুলিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, অধর দংশন করিয়া একটি তন্বী যুবতী অপরূপ গ্রীবা-ভঙ্গী করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—পাশে শঙ্কর দাঁড়াইয়া।

শঙ্কর বলিল, এই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলেন নাকি?

না, ঘুমুই নি ঠিক, একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। ব'স ব'স। ইনি কে? আসুন, বসুন।

প্রফেসার গুপ্ত সম্ভ্রমভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেলাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

যথাবিধি নমস্কারান্তে সকলে যখন আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন শঙ্কর বলিল, আপনি মান্তুর জন্যে একজন গানের মাস্টার খুঁজছিলেন, ইচ্ছে করলে এঁকে রাখতে পারেন। গান-বাজনায় খুব ভাল ইনি।

বেশ তো।

শঙ্কর সংক্ষেপে বেলার পরিচয় দিয়া এবং তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ জানাইয়া বলিল, অতিশয় স্বাধীনপ্রকৃতির মহিলা ইনি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না, নিজে রোজগার ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন—এই এঁর প্রতিজ্ঞা।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিলেন, এ তো খুব ভাল কথা। দেশের যা অবস্থা, তাতে মেয়েদের আত্মপ্রত্যয় জাগা খুবই উচিত! খালি গানই শেখান আপনি? পড়াতে পারবেন?

বেলা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, না। খালি গানই শেখাই। পড়াশোনা আমার বেশিদূর নয়, ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম, পাস করতে পারি নি। প্রাইভেটে বাড়িতে প'ড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, হ'ল না।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, ম্যাট্রিকটা পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার, একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যায়।

পড়াশোনায় কোনদিনই বেশি মন নেই আমার। গান-বাজনাই বেশি ভাল লাগে, সেইটেই ভাল ক'রে শিখেছি।

সহসা বেলা লক্ষ্য করিলেন, প্রফেসার গুপ্ত অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

বেলা দৃষ্টি নত করিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দাদার সঙ্গে

ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছি, এখন আপনারা একটু সাহায্য না করলে মুশকিলে পড়ব।

সাহায্য নিশ্চয়ই করব। মাইনে কত চান আপনি?

মাইনে যা হয় দেবেন, আপনার মেয়েকে বেশ ভাল ক'রে গান-বাজনা শিখিয়ে দেব আমি। আমার খাওয়া-পরা-থাকার খরচটা চ'লে গেলেই হ'ল।

বেলা দেবী আবার চক্ষু দুইটি আনত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত কিছু না বলিয়া বেলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, কি ভাবছেন?

একটু হাসিয়া গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ভাবব আবার কি?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রফেসার গুপ্ত পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আপনি এখন কোথায় আছেন?

শঙ্করই উত্তর দিল, মহৎ আশ্রমে।

হোটেলে থাকা কি বেশিদিন সুবিধে হবে?

বেলা বলিলেন, সে তো অসম্ভব। ঠিক করেছি, কোথাও একটা রুম নিয়ে ইক্‌মিকে রেঁধে খাব। কিন্তু তার আগে রোজগারের একটা ঠিকঠাক করতে হবে, সেই অনুপাতেই সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো! আরও দু-একটা টিউশনি যোগাড় করতে হবে। ক'রে দেবেন তো শঙ্করবাবু?

দেখব চেষ্টা ক'রে নিশ্চয়।—বলিয়া শঙ্কর শকুন্তলাটা টানিয়া লইয়া পাতা উলটাইতে লাগিল। সকলেই মিনিটখানেক নীরব হইয়া রহিলেন।

তাহার পর বেলা বলিলেন, আপনার মেয়ে কোথা, ডাকুন না, আলাপ করি একটু।

তারা এখন এখানে কেউ নেই, মামার বাড়ি গেছে। এই কলকাতাতেই অবশ্য মামার বাড়ি, কালই বোধ হয় আসবে তারা।

আপনার মেয়ের বয়স কত ?

বছর বারো হবে।

আগে গান শিখেছিল কারও কাছে ?

তেমন কিছু নয়, এমনিই শুনে শুনে যা দু-একটা শিখেছে। তবে গলাটা মিষ্টি, স্থর-বোধও আছে ব'লে মনে হয়, তা ছাড়া বিয়ের বাজারেও গানটা দরকারে লাগবে।

প্রফেসার গুপ্ত একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলেন, গোড়াতেই কিন্তু মাইনের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়া ভাল। আমি টাকা কুড়ির বেশি এখন দিতে পারব না। তবে একটা কাজ আমি করতে পারি; আপাতত আপনার থাকবার ব্যবস্থা একটা আমি ক'রে দিতে পারি। আমার এক বন্ধুর একটা ছোট বাড়ি আমার চার্জে আছে, ভাড়াটে এখনও পর্যন্ত জোটে নি। ভাড়াটে যতদিন না জুটছে, ততদিন সেটাতে আপনি পুট-আপ করতে পারেন।

বেলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িটার ভাড়া কত ?

ভাড়া পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। বাড়িটা ভাল।

কোন্ পাড়ায় বাড়িটা ?

বাগবাজারে।

বেশ তো, যতদিন ভাড়াটে না জোটে, আমি না হয় থাকি; অত না পারি, কিছু ভাড়া দেব। আরও গোটা দুই টিউশনি যদি যোগাড় করতে পারি, আমিই না হয় থেকে যাব। কি বলেন শঙ্করবাবু ?

হ্যাঁ।

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল। সে শকুন্তলায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তা হ'লে কালই চ'লে আসুন সে বাড়িটাতে, মিছিমিছি হোটেলে আর পয়সা দিয়ে লাভ কি? দাঁড়ান, চাবিটা এনে দিই আপনাকে।

প্রফেসার গুপ্ত উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চা আনতে বলি, কি বলেন?

শঙ্কর বলিল, বলুন।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলে শঙ্কর শকুন্তলাটা মুড়িয়া রাখিয়া দিল এবং বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

হাসলেন যে?

এমনিই।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, প্রায় তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখছি! আমার বিদায় নেওয়ার সময় আসন্ন হয়ে এল ভেবে দুঃখ হচ্ছে। হাসিটা ছদ্মবেশ মাত্র।

দেখুন, কবিত্বশক্তি ভগবান যতটুকু দিয়েছেন, সবটুকু আমার ওপর নিঃশেষ ক'রে ফেলবেন না। রিনি বেচারীও তো আশা ক'রে ব'সে আছে!

রিনি! রিনির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সম্বন্ধ নেই ব'লেই সম্বন্ধ গভীর। সব জানি আমি, বৃথা লুকোচ্ছেন কেন?

অধর দংশন করিয়া বেলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু বলিল না, কেবল ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাবটা ফুটাইতে চেষ্টা করিল।

প্রফেসার গুপ্ত চাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, এই নিন। আসুন, এইবার একটু গল্প করা যাক।

বেলা বলিলেন, আপনি পড়াশোনা করছিলেন, আপনাকে হয়তো বিরক্ত করছি।

না না, কিছু না। এসে তো দেখলেন, ঘুমুচ্ছিলাম। আসুন, একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মত বিদ্যে আমার নেই, শঙ্করবাবু হয়তো পারবেন।

বেলা দেবী হাসিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, আড্ডা দেওয়ার মধ্যে পাণ্ডিত্যের স্থান কোথায় তা তো বুঝি না। তা ছাড়া— আচ্ছা থাক, এত অল্প পরিচয়ে সে কথাটা বলা ঠিক হবে না।

কি কথা?

থাক্, সে পরে বলব কোনদিন, অবশ্য সে দিন যদি আসে।

প্রফেসার গুপ্ত বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু রহস্যময় হাসি হাসিলেন। তাহার পর অন্য কথা পাড়িলেন।

আপনি ম্যাট্রিকটা পাস ক'রে ফেলুন।

কি আর লাভ হবে তাতে?

চাকরি। আপনার পড়বার আমি সুবিধে ক'রে দিতে পারি। ম্যাট্রিকুলেশনটা অন্তত পাস করা থাকলে অনেক রকম স্কোপ পাওয়া যায়, কি বল শঙ্কর?

শঙ্কর পুনরায় শকুন্তলাটা উলটাইতেছিল।

মুখ না তুলিয়াই বলিল, নিশ্চয়।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, পাস ক'রে ফেলুন ম্যাট্রিকটা, ম্যাট্রিক পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার? প্রাইভেটেই দিন আবার।

বেলা কিছু না বলিয়া প্রফেসার গুপ্তের মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিলেন। ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল এবং বেলা নিজেই উঠিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা প্রস্তুত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত চা-পরিবেশনকারিণী বেলার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনাদের এই মূর্তিই কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে আমার।

ঘাড় ফিরাইয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোন্ মূর্তি?

অন্নপূর্ণা-মূর্তি।

শঙ্কর বলিল, আমার চায়ে একটু বেশি চিনি দেবেন, একটু বেশি মিষ্টি খাই আমি।

বেলা বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আজ সকালে বলছিলেন, আপনি খুব ঝালেরও ভক্ত। মাংসে ঝাল না হ'লে ভাল লাগে না।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

তিন চামচ দিয়েছি, আর দেব?

না, ওতেই হবে।

সকলে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে চা পান করিতে লাগিলেন।

২৫

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। কই, আজও তো মৃন্ময় আসিল না? কোথায় গেল সে? তিন দিন তাহার কোন খবর নাই। জানালার ধারে জনবিরল গলিটার পানে চাহিয়া হাসি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আজ মৃন্ময় নিশ্চয় আসিবে, সে বড় আশা করিয়াছিল। রাত বারোটা বাজিয়া গেল। শুনিতে ভুল হয় নাই তো? সে উঠিয়া গিয়া ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল, না, ঠিক বারোটাই বাজিয়াছে। আজও কি তাহা হইলে আসিবে না? শুষ্কমুখে হাসি পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল। বড় ভয় করে তাহার। তিন-চার দিন হইতে ডান চোখের পাতাটা এমন নাচিতেছে! তিন দিন

পূর্বে 'এখনই আসিতেছি' বলিয়া মৃন্ময় সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নাই। এই তিন দিন হাসি খায় নাই, ঘুমায় নাই, কেবল ঘর আর বাহির করিয়াছে। ঘরের এই জানালাটার ধারে সে সন্ধ্যা হইতে আসিয়া বসিয়াছে; দেখিতে দেখিতে বারোটা বাজিয়া গেল। ঠাকুরপোও তো এখনও পর্যন্ত ফিরিল না! ভন্টুবাবুর বাড়ি কতদূর? অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সহসা হাসির দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, টপটপ করিয়া কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা কপোল বাহিয়া আঙুলের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহার কপালে ভগবান এত দুঃখ লিখিয়াছেন কেন? কি দোষ করিয়াছে সে? অতি শৈশবেই বাপ মা ভাই তাহাকে ফেলিয়া একে একে মরিয়া গেল। সে মরিল না কেন? মরে নাই বোধ হয় মেয়েমানুষ বলিয়া। অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া অসীম দুঃখ সহ্য করিতে হইবে যে! মুকুজ্জেমশাইয়ের উপর সহসা হাসির রাগ হইল, কেন তিনি তাহাকে লইয়া গিয়া দূর-সম্পর্কের বড়লোক পিসামহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিলেন, কেন তাহাকে অনাহারে মরিয়া যাইতে দিলেন না? সে মরিয়া গেলে কাহার কি ক্ষতি হইত? কাহারও না। এমন তো কত লোক রোজ মরিয়া যাইতেছে। সকলকে কি মুকুজ্জেমশাই বাঁচাইতে যাইতেছেন? তাহাকে বাঁচাইতে গেলেন কেন? ছেলেবেলায় সব শেষ হইয়া গেলেই তো ভাল হইত। এখন যে মৃন্ময়কে ছাড়িয়া মরিতেও ইচ্ছা করে না। মরা দূরের কথা, তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতেও কষ্ট হয়। অথচ কপালগুণে এমন একটা চাকরি জুটিয়াছে যে, দিনরাত বাহিরে না থাকিলে উপায় নাই। 'এবারও কি চাকরির কাজেই বাহিরে গিয়াছে? প্রতিবারেই তো যাইবার আগে বলিয়া যায়; তা ছাড়া, এখনই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া গিয়াছে যে! হঠাৎ কোন জরুরি দরকারে যদি বাহিরে যাইতেই হয়, বাড়িতে আসিয়া সেটা বলিয়া

যাইবারও কি অবসর ছিল না? না, আপিসের কাজ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে।

হাসি অন্ধকারে একা একা বসিয়া অকূলপাথার ভাবিতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার তাহার মনে হইল, মৃন্ময় তাহাকে ভালবাসে তো? তাহাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে তো? তাহার মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়, মনে হয়, কেমন যেন কোথায় কিসের একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে, সেটা যে কি, তাহা হাসি ধরিতে পারে না। ধরিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করে। আর কাহাকেও কি মৃন্ময় ভালবাসে? কাহাকে? কেমন দেখিতে সে মেয়েটি? সহসা হাসির মনে হইল, ছি ছি, সে এ কি করিতেছে? স্বামীর সম্বন্ধে এসব কথা চিন্তা করাও পাপ। তিনি ভাল হোন, মন্দ হোন, সে সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহাকে পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, ইহাই কি আমার মত অভাগিনীর পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমিই কি আমার স্বামীর যোগ্য? অমন সুন্দর সুপুরুষ বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহধর্মিণী হইবার মত কি যোগ্যতা আছে আমার?

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রু-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখের পাতা উপচাইয়া গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সে মুছিবার চেষ্টা করিল না। পাথরের মূর্তির মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সঙ্কীর্ণ গলিটা রাত্রে একেবারে নির্জন। কোথাও কাহারও সাড়া নাই, সকলেই ঘুমাইতেছে। সহসা পদশব্দ শোনা গেল। ওই যে, চিন্ময় আর ভন্টুবাবুর গলার স্বর শোনা যাইতেছে। আরও কে যেন একজন সঙ্গে রহিয়াছে, গলার স্বরটা হাসির ঠিক চেনা নয়।

ভন্টু, চিন্ময় এবং শঙ্কর বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

হাসি যে এত রাত্রে বৈঠকখানায় আসিয়া রাস্তার ধারে জানালায় বসিয়া থাকিতে পারে, চিন্ময় তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কোনরূপ সাবধানতার প্রয়োজন সে অনুভব করিল না। অসঙ্কোচেই ভন্টুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভন্টুদা, বউদিকে কি বলবেন, এখনই ঠিক ক'রে নিন। দাদা যে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছেন, এ কথা তো বউদিকে বলা চলবে না।

হাসি রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

ভন্টু বলিল, সে আমি সামলে নেব।

কি বলবেন ?

শঙ্কর, বল্ না কি করা যায়, তুই তো মিথ্যে কথার গুরুমশাই একটি।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, সত্যি কথাটা বললে ক্ষতি কি ?

ভন্টু মুখটি সূচালো করিয়া কয়েক সেকেণ্ড শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিল এবং মুখটি সূচালো করিয়া রাখিয়াই উচ্চারণ করিল, সত্যি কথা !

তাহার পর সহজভাবে বলিল, বাপের টাকায় মজাসে হস্টেলে আছিস—সত্যি-মিথ্যের হদিস তুই কি বুঝবি ?

চিন্ময় বলিল, না শঙ্করবাবু, সত্যি কথা বললে বউদি ভয়ানক কান্নাকাটি করবেন, এমনিই না খেয়ে আছেন কদিন থেকে।

ভন্টু বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেসব ঠিক ক'রে দিচ্ছি আমি। ওর কথা শুনছিস কেন তুই ? কড়া নাড়্, বারোটা বাজে, ফিরতে হবে তো আবার।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, সত্যি-ফত্যি ভুলে যা— দারকে টোক গিলে যা। রাস্তায় চলতে গেলে যেমন গায়ে ধুলো লাগবেই, সংসার করতে গেলে তেমনই ক্রমাগত মিথ্যে বলতে হবে। মিথ্যের হরির লুট দিতে দিতে যেতে পারলে আরও ভাল হয়।

হাসি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ওঁর কি হয়েছে বল না ঠাকুরপো? হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছেন উনি? আমার কাছে লুকিয়ো না কিছু, লক্ষীটি, শিগগির বল, কি হয়েছে?

হাসির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। অপরিচিত শঙ্কর এবং স্বল্প-পরিচিত ভন্টুকে দেখিয়া সহজ অবস্থায় সে হয়তো ঘোমটা দিত, এখন কিছুই করিল না।

বলা বাহুল্য, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময় বলিল, চল, ভেতরে চল, সব বলছি।

না, আগে বল তুমি।

সে অনেক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি বলা যায়? ভেতরে চল, বলছি সব।

সকলে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

চিন্ময় শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, শঙ্করবাবু, আপনি একটু বাইরের ঘরটায় বসুন, আমরা আসছি এখনি। আসুন ভন্টুদা।

ভন্টু, চিন্ময় ও হাসি ভিতরে চলিয়া গেল। শঙ্কর বাহিরের ঘরের চেয়ারটায় বসিয়া রহিল। সে বেলাকে মহৎ আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া হস্টেলে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে পথে ভন্টুর সহিত দেখা। ভন্টুর সহিত চিন্ময়ও ছিল। ভন্টুর মুখেই শঙ্কর শুনিল যে, গত তিন দিন যাবৎ মোমবাতির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর এখন জানা গিয়াছে যে, ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সি তাহাকে নাকি চাপা দিয়াছে। ভন্টুর আগ্রহাতিশয্যে সে হস্টেল হইতে ছুটি লইয়া সেই হইতে ইহাদের সঙ্গে ঘুরিতেছে। রিনির কাছে যাইবার কথা ছিল;

যাওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া আর একটা কর্তব্যও এখনও পর্যন্ত অসমাপ্ত রহিয়াছে। বাবা একটা বাড়ি ভাড়া করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার এখনও কিছু করা হয় নাই। বেলা এবং ভন্টুর পাল্লায় পড়িয়া সমস্ত সন্ধ্যেটাই তাহার মাটি হইয়া গিয়াছে। অথচ ইহাদের সঙ্গ এত লোভনীয় যে, জোর করিয়া চলিয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না। যাই হোক, কাল সকালে উঠিয়াই প্রথমে রিনির ওখানে যাইতে হইবে এবং যেমন করিয়া হোক একটা বাড়ির সন্ধান করিতে হইবে। সহসা তাহার মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। ভন্টু ও চিন্ময়ের সঙ্গে সেও হাসপাতালে গিয়াছিল। অচেতন মৃন্ময় চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিল, প্রশান্ত মুখখানায় কেমন যেন একটা আত্মসমাহিত ভাব। সেদিন রাত্রের সেই চিঠিখানার কথাও মনে পড়িল। চিঠিটা এখনও তাহার কাছে আছে। সেদিন রাত্রে ঘরে এই মেয়েটিই তো ছিল। স্বর্ণলতা তাহা হইলে কে?

ভীম জাল!

ভন্টু আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

ভীম জাল টু দি পাওয়ার এন।

মানে?

মানে, খুজবুজ হাসপাতালে যেতে চাইছে।

খুজবুজ কে?

মোমবাতির বউ। বলছে, আমি শুধু একটিবার নিজের চোখে দেখতে চাই তাকে। ভয়ানক উইপিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর বলিল, এত রাত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? সেখানে ঢুকতে দেবে কি?

আমাদের পাড়ার ধীরেন ডাক্তার চেষ্টা করলে করতে পারে ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলে সে সব করতে পারে, কারণ রিয়েলি সে চাম লদ্। চল্ যাই।

কোথায় ?

ধীরেন ডাক্তারের কাছে।

আমাকে আবার টানছিস কেন ভাই ?

উত্তরে ভন্‌টু শুধু মুখ-বিকৃতি করিল।

প্রভাত হইবার আর বেশি বিলম্ব নাই।

শঙ্কর একা দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছিল। সে ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে ফিরিতেছিল। হাসিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং অসময়ে রোগীর কাছে যাইবার অনুমতি সংগ্রহের জন্য কম বেগ পাইতে হয় নাই। অনেক বলা-কহার পরে তবে অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। হাসি গিয়া মৃন্ময়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছে, এবং এখনও সেখান হইতে নড়ানো যাইতেছে না। এখন হাসি যাহাতে সেখানে থাকিতে পায়, নিরুপায় ভন্‌টু অগত্যা নানাভাবে সেই তদ্বির করিতেছে।

ভন্‌টুর সঙ্গে চিন্ময়ও আছে। শঙ্কর কিন্তু আর সেখানে থাকিতে পারিল না। বেদনাতুর হাসির অশ্রু-ছলছল মুখখানি শঙ্করকে কেমন যেন উন্মনা করিয়া দিল। শঙ্কর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপিচুপি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ হাঁটিবার পর সে যখন রিনিদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোরের মৃদু আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। রাস্তা হইতে বাড়িটা দেখা যায়, শঙ্কর বাড়িটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গেটের নিকট গিয়া দেখিল, গেট ভিতর হইতে তালা-বন্ধ। শঙ্কর বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এভাবে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা যে অশোভন, সে চেতনাও তখন তাহার ছিল না। সে অপলকদৃষ্টিতে বাড়িটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা দ্বিতলের একটি বাতায়ন খুলিয়া গেল এবং শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে রিনি দাঁড়াইয়া আছে।

কেহ কোন কথা বলিল না। নির্নিমেষ শঙ্কর ও নিস্পন্দ রিনির মধ্যে তালাবদ্ধ লোহার গেটটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৬

রাস্তাটি খুব বড় নহে, গলি বলিলেই চলে, বাড়িটি কিন্তু প্রকাণ্ড। রাত্রি গভীর হইয়াছে। একটি প্রকাণ্ড দামী মোটরকার নিঃশব্দে আসিয়া বাড়িটার সম্মুখে থামিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। গাড়িতে আর কেহ ছিল না। গাড়ি হইতে নামিয়া অচিনবাবু একবার ভাল করিয়া চতুর্দিকে দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন তিনি ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড বাড়িটার বন্ধ দরজার উপরে চারিটি টোকা দিলেন। টোকা দিবার মধ্যেও একটু কায়দা ছিল। প্রথম দুইটি টোকা ঘন ঘন এবং শেষ দুইটি বেশ দেরি করিয়া করিয়া। দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল, কিন্তু নিষ্কাশিত-অসি বিরাটকায় এক পাঠান আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। অচিনবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটি টাকা, একটি আধুলি, একটি সিকি এবং একটি দুয়ানি তাহার হস্তে দিলেন। পাঠান পকেট হইতে একটি টর্চ বাহির করিয়া মুদ্রাগুলি উলটাইয়া প্রত্যেকটির সাল দেখিতে লাগিল। তাহার পর মুদ্রাগুলি ফেরত দিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া একটি ইলেক্‌ট্রিক বেল টিপিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির আলোটা জ্বলিয়া উঠিল এবং অচিনবাবু নিঃশব্দপদসঞ্চারে উপরে উঠিয়া গেলেন। উপরে যে ঘরে গিয়া তিনি হাজির হইলেন, সেই ঘরের একটি কোণে বিস্তৃত ফরাশের উপর সর্বাঙ্গে দামী শাল জড়াইয়া একটি বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। অচিনবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার কাজ

হয়ে গেছে, তিনখানা কারের অর্ডার দিয়েছেন মালিক। একখানা নিজের জন্যে, একখানা জামাইবাবুর, আর একখানা যাবে স্টেটের ম্যানেজারের ওখানে। তারপর সে ছোকরার খবর কি ?

এখনও মরে নি, হাসপাতালে রয়েছে, এ যাত্রা বেঁচে গেল বোধ হয়।

ড্রাইভারটা কিন্তু ধরা পড়েছে শুনলাম ?

হ্যাঁ, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃদ্ধ বলিলেন, এ ঠিক সেই ছোকরাই তো, মৃন্ময় না কি নাম বলছিলেন ? ভুলে অন্য কোন লোককে আবার চাপা দিলে না তো ?

অচিনবাবু বলিলেন, না না, আমি নিজে তার ফোটো তুলে নিয়েছি, নিজে সেই ড্রাইভারকে ফোটো দিয়েছি, তা ছাড়া মৃন্ময়বাবুকে দেখিয়েও দিয়েছি একদিন। ভুল হয় নি।

একটু থামিয়া অচিনবাবু বলিলেন, ড্রাইভারটাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে। আপনারই কথামত তাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, টাকা দিয়ে যা করা সম্ভব, তা আমরা করব তাকে বাঁচাবার জন্যে।

নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে ঢালা হুকুম আছে কর্তার। উকিল-টুকিল ব্যবস্থা ক'রে দিন। ফাইন হয়, দেব আমরা। জেল হয়, তার পরিবারের ভরণপোষণের খরচা ছাড়াও কম্‌পেন্‌সেশন দেব। ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই। কত টাকা চাই, বলুন না ?

শ পাঁচেক এখনই দরকার।

ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন ও দেওয়ালে পোঁতা একটা লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া অচিনবাবুর হস্তে দিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, নতুন মাল কবে দিচ্ছেন ? কর্তা যে ক্ষেপে উঠেছেন একেবারে !

অচিনবাবু বলিলেন, শিক্ষয়িত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন তো দিয়েছি একটা সুবিধেমত পেলে হাজির ক'রে দেব।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যা হয় করুন একটা।

সর্বদাই চেষ্টায় আছি। আচ্ছা, এবার চলি আমি, ব্যবস্থা করতে হবে অনেক।

আসুন তা হ'লে।

অচিনবাবু উঠিয়া পড়িলেন ও যথাবিহিত নমস্কারান্তে নামিয়া আসিলেন। বাহির হইবার সময় কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। মোটরে চড়িয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া মিনিটখানেক কি যেন ভাবিলেন। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটিতে অতি মৃদু চাপা একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মোটরে স্টার্ট দিয়া নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অচিনবাবু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উঠিয়া গিয়া দেওয়ালে লাগানো একটি বোতাম টিপিলেন। প্রকাণ্ড বাড়িটার দ্বিতলের সুদূর এক্প্রা অংশে ইলেক্‌ট্রিক বেল ঝনৎকার দিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ গাঁট্টাগোঁট্টা-গোছের একটা লোক আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, নিয়ে আয় এবার।

লোকটি চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আরও দুইজন লোকের সাহায্যে একটি অজ্ঞান যুবতীর দেহ বহন করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ফরাশের উপর শোয়াইয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

কতক্ষণ বাদে এর জ্ঞান হবে, ডাক্তার বলেছে কিছু?

গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটি উত্তর দিল, ঘণ্টা দুই বাদে।

কিছু খাওয়ানো হয়েছে?

গ্লুকোজ না কি একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন, বলেছেন, আজ রাত্রে আর খাওয়াবার দরকার নেই কিছু।

আচ্ছা, যা তোরা, এখন কর্তার পছন্দ হ'লে হয়! ভ্যালা এক

চাকরি হয়েছে আমার! তোরা সব বাড়ি চ'লে যা, ওই পাঠানটাকেও বাড়ি যেতে বল্। কর্তা আজ আসবেন।

আচ্ছা হুজুর।

ভৃত্য তিনজন বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাদের পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, একটু পরে আর শোনা গেল না। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শালখানা অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল, কুব্জ দেহটাকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে পাশবিক ক্ষুধা মূর্তি পরিগ্রহ করিল, লুব্ধ চাহনি অচেতন মেয়েটির সর্বাঙ্গ যেন লেহন করিয়া ফিরিতে লাগিল, নিশ্বাসের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ নাই, সকলে চলিয়া গিয়াছে। বাহিরের কপাটটা বন্ধ করিয়া চকিত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। না, কেহ কোথাও নাই। ত্বরিতপদে আবার তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন। মেয়েটি এখনও অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। একবার সেদিকে চাহিয়া আলমারি হইতে কয়েকটা বড়ি বাহির করিয়া কি একটা আরক সহযোগে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শাল মুড়ি দিয়া বসিলেন এবং অপলকদৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

পূর্বপুরুষ বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন; টাকা দিয়া যাহা সম্ভব সব হইতেছে, এবং দেখা যাইতেছে, সবই বোধ হয় সম্ভব। এমন কি সুনামটি পর্যন্ত বজায় আছে। চাকরবাকর পর্যন্ত জানে যে, কোন অজ্ঞাত লম্পটের জন্য এইসব আয়োজন, এই বৃদ্ধ তাহাদেরই মত

বেতনভুক একজন ভৃত্য মাত্র। বৃদ্ধ যে নিজেই কর্তা, এ কথা বৃদ্ধ ছাড়া আর কেহ জানে না।

নির্নিমেষ নয়নে বৃদ্ধ সংজ্ঞাহীন নারী-দেহটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শিকারলুব্ধ বৃদ্ধ অজগরের লোলুপতা মূর্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

২৭

রাত্রি গভীর হইয়াছে।

ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমাইতেছে, নিশাচর ভন্টুও এই কিছুক্ষণ আগে আসিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছে এবং দালানে শুইয়া নাক ডাকাইতেছে। বাকু এখনও উঠেন নাই, যদিও উঠিবার আর বেশি দেরিও নাই। ভন্টুর বউদিদি ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন, আস্তে আস্তে নিজের তোরঙ্গটির নিকট গেলেন এবং অতি সন্তর্পণে তোরঙ্গের চাবি খুলিলেন। তাহার পর তোরঙ্গের ভিতর হইতে কতকগুলি রঙিন চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। মার্জিত-রুচি কোন লোকের চোখে কাগজগুলি হয়তো তেমন সুদৃশ্য বলিয়া মনে হইবে না, বউদিদির নিকট উহাই কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। স্বামী যাইবার সময় কিনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কাগজ বাহির করিয়া বউদিদি ইতস্তত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শন্টুটা দোয়াত কলম যে কোথায় ফেলে, তাহার ঠিক নাই। ঠাকুরপোর কাছে এত মার খায়, তবু ছেলেটার স্বভাব বদলাইল না। ঘরের কোণে কমানো বাতিটি আস্তে উস্কাইয়া দিয়া সেটি হাতে করিয়া লইয়া বউদিদি সন্তর্পণে ঘরের তাকগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে দোয়াত কলম তাকেই ছিল, মিলিয়া গেল। বউদিদি প্রসন্নমুখে ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরটি বিছাইয়া তাহার উপর বসিলেন এবং আলোটি কাছে সরাইয়া আনিয়া অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে

প্রবাসী স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কলমের নিবটা ভাল নয়, কাগজ অতি সাধারণ, দোয়াতে কালি জলবৎ। বউদিদির চিঠির ভাষাও উচ্চাঙ্গের নহে। বানান-ভুল অজস্র হইতেছে। তথাপি কিন্তু এই নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে চুরি করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখার মধ্যে যে মাধুর্য, যে মহিমা, স্পন্দিত বিরহের যে আকৃতি বউদিদির গোলগাল কালো মুখমণ্ডলকে মণ্ডিত করিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নহে। স্বল্পালোকিত ঘরে ছিন্ন মাদুরের উপর উপুড় হইয়া বউদিদি দীর্ঘ একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। পত্র লেখা শেষ করিয়া পত্রখানি আর একবার পড়িলেন, পুনশ্চ দিয়া আবার খানিকটা কি লিখিলেন, অবশেষে খামের মধ্যে পত্রটি পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া সেটি বিছানার নীচে রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর প্রাচীর-বিলম্বিত জগদ্ধাত্রীর ছবিটির নিকট গিয়া গলায় আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

২৮

শঙ্কর সকালে উঠিয়াই একখানি পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। উৎপল বিলাতে নাকি কোন এক মেমসাহেবের প্রেমে পড়িয়াছে! পত্রখানি লিখিতেছেন উৎপলের একজন আত্মীয়। পত্রখানির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে অবশ্য শঙ্করের দেরি হইল না। কারণ যদিও পত্রখানির ভাষায় আত্মীয়-সুলভ চিন্তা ও ক্ষোভই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভাষার অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত খোঁচাটি অপ্রত্যক্ষ রহিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা হৃদয়গ্রাহী নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাবটি এই—ভাবি যে উহার শ্বশুর উহাকে বাহাদুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছিল, এইবার মজাটা বুঝুক! শঙ্কর ভাবিয়া দেখিল, গিয়া অবধি উৎপলও তাহাকে বিশেষ

কোন চিঠিপত্র লেখে নাই। বিলাতে পৌঁছিয়াই সে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয়-কাহিনী কিছু ছিল না, ছিল ভ্রমণ-কাহিনী। তাহার পর যে দুই-একখানা পত্র সে লিখিয়াছে, তাহা নিতান্তই নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য, দুই-চারি ছত্রের মামুলী চিঠি। শঙ্কর নিজে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে হয়তো উৎপলের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হইত; কিন্তু উৎপলের বিলাত যাওয়ার পর হইতে তাহার নিজেরই মানসিক জগতে যে বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহাতে বাহিরের কোন কিছুতে বিচলিত হইবার তাহার উপায় ছিল না। মায়ের এতবড় শোচনীয় অসুখও তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে যাহা করিতেছিল, কর্তব্যের অনুরোধেই করিতেছিল, প্রাণের তাগিদে নহে। সহসা সুরমার কথা তাহার মনে পড়িল, সুরমার পূর্বপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রলাপের কিছু অর্থও তাহার যেন বোধগম্য হইল। উৎপলের আত্মীয়ের পত্রখানি ডেস্কের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া শঙ্কর কলেজের পড়া করিতে বসিল। অনেকদিন বই ছোঁওয়া হয় নাই। রিনির বই পড়িতেই সে এতদিন ব্যস্ত ছিল, নিজের পড়া কিছুই হয় নাই। ক্লাসে বসিয়াও অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। অধ্যাপকের বক্তৃতা কানে প্রবেশ করে, কিন্তু মনে প্রবেশ করে না। ক্লাসে ভাল করিয়া মন দিয়া শুনিলে বাড়িতে পড়িবার ততটা দরকার হয় না, কিন্তু বিশেষ করিয়া ক্লাসেই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। ক্লাসের জনতার মধ্যেই সে সেই নির্জনতা পায়, যাহা তাহার পক্ষে এখন একান্তভাবে প্রয়োজন। ক্লাসের বাহিরে ভন্টু আছে, বেলা আছে, শৈল আছে, আরও কত অগণ্য প্রাণী আছে, যাহাদের সংস্পর্শে না আসিলে চলে না, যাহাদের সংস্পর্শ অবাঞ্ছনীয়ও নয়, কিন্তু যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে ধ্যান ভাঙিয়া যায়, মনের প্রত্যক্ষলোক হইতে লজ্জিতা রিনি সরিয়া যায়। ক্লাসের এক কোণে বসিয়া মনের মধ্যে সে যে একাকীত্ব অনুভব করে, রিনিকে মনে মনে

যেমন একান্তভাবে পায়, এমন আর কোথাও সম্ভব হয় না। ক্লাসে তাই তাহার পড়া হয় না। অথচ এই মোটা মোটা বইগুলা পড়িতে হইবে তো!

শঙ্কর বাহিরে গিয়া চাকরকে আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিল এবং ঘটা করিয়া ফিজিক্সের একখানা বহি লইয়া পড়িতে বসিল। নিশ্চিন্ত হইয়া দুই-চারি দিন এইবার পড়িতে হইবে। বাবা একখানা বাড়ি দেখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সে দেখিয়াছে, বাবাকে চিঠিও লিখিয়া দিয়াছে। তাঁহার আসিবার পূর্বে পড়াটাও কিছুদূর আগাইয়া রাখিতে হইবে, কারণ তাঁহারা আসিলে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। রিনি তো আছেই। কিন্তু হায় রে, বই খুলিয়া পড়িতে বসিলেই যদি পড়া হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না! শঙ্কর খোলা বইটার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল বটে, কিন্তু এক বর্ণও তাহার মাথার ভিতর ঢুকিল না। চাকরে চা দিয়া গেল, চা পান করিয়াও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বরং কিছুক্ষণ পরে সে সহসা স্থির করিয়া ফেলিল যে, এমনভাবে বসিয়া শুধু সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র, আর কিছুই হইতেছে না। ইহার অপেক্ষা বরং রিনির কাছে যাওয়াই ভাল। তাহার মনে একটা কথা কয়েকদিন হইতে জাগিতেছে, সোনাদিদি-মিষ্টিদিদিকে আসল কথাটা খুলিয়া বলিলে ক্ষতি কি? এই মহিলা দুই-জনের সহিত তরল হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া তাহার এমন একটা অন্তরঙ্গতা হইয়াছে যে, ইঁহাদিগকে যেন মনের গোপন কথাটি বলা যায়। তবু কিন্তু সঙ্কোচ হয়। মনে হয়, ভাষায় প্রকাশ করিলেই যেন ইহার পবিত্রতা, ইহার মাধুর্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আর তো চাপিয়া রাখা যায় না! এমনভাবে লুকাইয়া কতদিন আর থাকা সম্ভব! তাহা ছাড়া মনের ভাব এমন করিয়া গোপন করিয়া ওখানে প্রত্যহ যাতায়াত করা শুধু যে কষ্টকর তাহা নয়, ভণ্ডামিও। তাহার তো কোন অসৎ

উদ্দেশ্য নাই, সে রিনিকে বিবাহ করিতে চায়। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া পত্নীত্বে বরণ করিতে চায়। ইহাতে অগৌরবের বা অসম্মানের কিছুই নাই। প্রফেসার মিত্রকে সে কিন্তু নিজে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিবে না। রিনিকে কিছু বলা আরও অসম্ভব। সোনাদিদি অথবা মিষ্টিদিদিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাঁহারা ইহাতে যদি আপত্তিকর কিছু না দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারাই প্রফেসার মিত্রকে বলিবেন এবং রিনির মনোভাব জানিয়া লইবেন। রিনির মনোভাব শঙ্করের জানাই আছে। মুখে কেহ কাহাকেও কোনদিন কিছু বলে নাই সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার মনের নিগূঢ় বার্তাটি নিগূঢ় উপায়েই সে যেন জানিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, এসব বিষয়ে অন্তর্যামী মনের কখনও ভুল হয় না। শঙ্করের বাবা সনাতনপন্থী লোক, তিনি হয়তো এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারেন। শঙ্কর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে, তিনি যদি না বোঝেন, তাঁহার অমতেই বিবাহ করিবে সে। আজকাল কুল-গোত্র-গণ-কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহের দিন চলিয়া গিয়াছে। পাত্রী হিসাবে রিনি— শঙ্কর আর ভাবিতে চাহিল না। পাত্রী হিসাবে রিনি অযোগ্য কি সুযোগ্য—এ আলোচনা মনে মনে করিতেও শঙ্করের বাধিল। তাহার মনে হইল, পাত্রীর বাজারে রিনিকে দাঁড় করাইয়া অন্যান্য পাত্রীর সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিলে রিনিকে অপমান করা হইবে। তাহাকে এমনভাবে মনে মনে খাটো করিবারই বা তাহার কি অধিকার আছে? জামা জুতা পরিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল বটে, কিন্তু পথে আসিয়া তাহার গতিবেগ পুনরায় মন্থর হইয়া আসিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। এখনই গিয়া এমনভাবে বলাটা কি ঠিক হইবে? প্রথমে কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যাইবে, তাহাই তো

পরম সমস্যা। এই সব ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, একটা রাস্তার মোড়ে একটা পাগলকে ঘিরিয়া বেশ ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। পাগল আমাদের পূর্বপরিচিত মোস্তাক। শঙ্কর ইহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই, সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। অঙ্গে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, চক্ষু দুইটি লাল। নূতনত্বের মধ্যে খবরের কাগজের একটা শিরস্ত্রাণ বানাইয়া মাথায় পরিয়াছে এবং যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে, মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিতেছে। একবার দুইবার নয়, 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন' করিতে করিতে ক্রমাগত সেলাম করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া শঙ্করও কিছুক্ষণ মোস্তাকের পাগলামি উপভোগ করিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এই উন্মাদটার সেলাম-প্রবণতায় তাহার কবি-মনে অদ্ভুত একটা রূপকের আভাস জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই উন্মাদটা যেন সমস্ত বাঙালী জাতির প্রতীক, কারণে অকারণে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে সেলাম করিয়া চলিয়াছে। বেশিক্ষণ ভাল লাগিল না, আবার সে চলিতে শুরু করিল।

ও শঙ্করবাবু!

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, অপূর্ববাবু, আরও কে একজন তাঁহার সহিত রহিয়াছেন, অপর দিকের ফুটপাথ হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন। শঙ্কর থামিতেই তাঁহারা রাস্তাটা পার হইয়া শঙ্কর যে ফুটপাথে ছিল, তাহাতেই আসিয়া হাজির হইলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি আমরা।

বিনীতকণ্ঠে আনতচক্ষে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া অপূর্ববাবু শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। শঙ্কর দেখিল, অপূর্ববাবু ঠিক তেমনই আছেন। সেই কোঁচানো কাপড়, গিলে-করা পাঞ্জাবি, মুখে

স্নো-পাউডার। সেই নম্রনত লীলায়িত হাবভাব। অপর ভদ্রলোকটিকে শঙ্কর আগে দেখে নাই। ভদ্রলোকটির চেহারা কেমন যেন শুষ্ক, রুক্ষ, উদ্‌ভ্রান্ত। দেখিলে মনে হয়, যেন রাত্রে ঘুম হয় নাই।

আমাকে খুঁজছেন? কেন বলুন তো?

মানে, ইনি হচ্ছেন বেলার দাদা, মিছিমিছি একটা রাগারাগি ক'রে সামান্য জিনিস নিয়ে হঠাৎ এমন একটা—মানে মিটে গেলেই—অনর্থক একটা, বুঝতেই পারছেন—

অপূর্ববাবু কোন কথাই সম্পূর্ণভাবে শেষ করিতে পারেন না। কিছুদূর বলিয়া চুপ করিয়া যান, এবং এমন একটা ভাব করেন, যেন এত অধিক বাক্যব্যয় করিয়া তিনি অত্যন্ত একটা অন্যায় কার্য করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ উপায় নাই।

প্রিয়বাবু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, বেলা কোথায় আছে, জানেন আপনি?

শঙ্কর বলিল, এখন তো ঠিক জানি না। আমাদের কলেজের এক প্রফেসারের মেয়েকে গান শেখাবার ভার নিয়েছেন তিনি। সেই প্রফেসারের বন্ধুর একটা খালি বাড়ি আছে, তাতেই উঠে গেছেন পরশু-দিন। ঠিকানাটা পরে এনে দিতে পারব আমি, এখন তো জানি না।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার প্রফেসারের ঠিকানাটা দিন না, আমরাই খুঁজে নিচ্ছি গিয়ে, আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?

বেশ।

প্রফেসার গুপ্তের ঠিকানাটা শঙ্কর বলিয়া দিল। উভয়েই শঙ্করকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। অপূর্ববাবুর উচ্ছ্বাসটা কিছু যেন অধিক বলিয়াই বোধ হইল; অসম্পূর্ণ বাক্যাবলী অসংলগ্নভাবে খানিকক্ষণ বলিয়া বিনীত নমস্কারান্তে অপূর্ববাবু বিদায় লইলেন। প্রিয়বাবুও সঙ্গে গেলেন। শঙ্কর পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সে যখন অবশেষে প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে সোনাদিদি ও মিষ্টিদিদি রহিয়াছেন। শঙ্করকে তাঁহারা এ সময়ে প্রত্যাশা করেন নাই, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সোনাদিদি কোথায় যেন বাহির হইতেছিলেন, শঙ্কর আসাতে যাওয়া স্থগিত করিলেন ও সবিস্ময়ে বলিলেন, এমন সময়ে যে, মানে এমন অসময়ে যে? এ কি অঘটন!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ছুটি আছে বোধ হয়, নয়? বসুন।

শঙ্কর বলিল, না, ছুটি নয়, এমনই এলাম।

সোনাদিদি কিছু না বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। শঙ্কর উপবেশন করিয়া বলিল, একটু চা খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। কিন্তু এই অসময়ে চা কেন, ব্যাপার কি বলুন তো আজ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ব্যাপার কিছু নয়, এমনই কিছু ভাল লাগছে না ব'লে এলাম এখানে। শরীরটাও ভাল নেই।

ডক্টর সেন বলছিলেন, কলকাতাতেও নাকি ম্যালেরিয়া হচ্ছে আজকাল, কুইনিন খাবেন?—বলিয়া সোনাদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি, ডক্টর সেন বলছিলেন সেদিন।

কুইনিন খাবার দরকার নেই, আপনি কথা ব'লে যান, তা হ'লেই কাজ হবে, কি বলুন মিষ্টিদি?

উভয়েই এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সোনাদিদির পানে কোপকটাক্ষে চাহিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, কেমন, জব্দ হয়েছিস তো এবার? থামুন, চায়ের কথাটা ব'লে দিই। এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। সোনাদিদি হাসিভরা চক্ষু দুইটি

শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া পুনরায় বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো সত্যি ক'রে ?

শঙ্কর বলিয়া ফেলিল, থাকতে পারলাম না।

থাকতে পারলেন না ? তার মানে ?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার না-থাকতে-পারার প্রতিকার কি এ বাড়িতে আছে নাকি ?

তা কি আপনি জানেন না ?

শঙ্কর গম্ভীরমুখে বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনার অজ্ঞাতসারে একটা কাজ ক'রে ফেলেছি কিন্তু। রাগ করবেন না তো ?

কাজটা কি ?

আপনার সেই কবিতাটা একটা কাগজে দিয়ে দিয়েছি। সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁকে দেখালুম, তিনি এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেলেন।

কোন্ কাগজে ?

তা এখন বলছি না, বেরুলে দেখবেন।

কোন্ কবিতাটা দিয়েছেন ? আমি তো অনেকগুলো কবিতা দিয়েছিলাম আপনাকে।

সেই যে, যার গোড়ার লাইনটা হচ্ছে—'রসনা নীরব মম চিত্ত মম নিত্যমুখরিত'—

ও।

শঙ্কর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িল। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রসাধনের একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া আসিয়াছেন দেখা গেল।

শঙ্করকে গম্ভীর দেখিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, সোনা বুঝি আবার ঝগড়া করেছে আপনার সঙ্গে ?

না।

শঙ্কর সস্মিত দৃষ্টি মিষ্টিদিদির দিকে ফিরাইল।

চায়ের কতদূর ?

ব'লে দিয়েছি, এখুনি আসছে।

বলিতে বলিতেই চা আসিয়া পড়িল। সোনাদিদি উঠিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অলিখিত আইন অনুসারে সোনাদিদিই এসব কার্য সাধারণত করিয়া থাকেন।

সহসা শঙ্কর গাঢ়স্বরে বলিল, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আজ একটা বলব ব'লে এসেছি। আমার একটা শুধু অনুরোধ, হাসি-ঠাট্টা ক'রে জিনিসটাকে হালকা ক'রে ফেলবেন না। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

চা ঢালিতে ঢালিতে সোনাদিদি চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন এবং একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, সে কি, আপনার কাছে যেটা এত সিরিয়াস ব্যাপার, তা আমরা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেব! ছি ছি, এতটা খেলো লোক ভাবেন আপনি আমাদের!

শঙ্কর গাঢস্বরেই বলিল, খেলো লোক ভাবলে আসতাম না আপনাদের কাছে। আপনারা খেলো লোক নন ব'লেই অসঙ্কোচে এত বড় একটা কথা বলতে এসেছি।

সোনাদিদি নীরবেই এক কাপ চা শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিলেন। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিতেই মিষ্টিদিদি বলিলেন, দে, আমিও খাই একটু—আচ্ছা, একটু কড়া হোক, পাতলা চা আমি খেতে পারি না বাপু।

সোনাদিদি নিজের জন্য এক কাপ ছাঁকিয়া লইলেন।

শঙ্কর নীরবে ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগিল।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কথাটা কি, শুনিই না?

শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, রিনিকে আমি ভালবেসেছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সোনাদিদি সহসা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল এবং শরীরের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদবেগে বহিতেছিল।

মিষ্টিদিদি উঠিয়া নিজের জন্য এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, এ তো খুব আনন্দের কথা। আপনাকে আমরা নিজের আত্মীয়রূপে পাব, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে? কিন্তু সকলের চেয়ে আগে রিনির মত নেওয়াটা দরকার নয় কি?

রিনির অমত হবে না।

জিজ্ঞেস করেছিলেন?

না, আমি জানি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, তবু ফর্মালি জিজ্ঞেস করাটা একবার দরকার।

সে আপনি করবেন। প্রফেসার মিত্রকেও আপনি বলবেন—আমি পারব না, আমরা ভারি লজ্জা করবে। আমার বাবা হয়তো আপত্তি করতে পারেন, যদি করেন, তাঁর মতের বিরুদ্ধেই আমি বিয়ে করব।

সেটা কি ঠিক হবে?

বাবা হয়তো আপত্তি না-ও করতে পারেন। যাই হোক, সে আমি বুঝব।

শঙ্কর বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

এবার উঠি আমি, ক্লাস আছে। আসব কাল।

শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া আচমকা বাহির হইয়া পড়িল। বারান্দায় দেখিল, অতিশয় গম্ভীর মুখে সোনাদিদি একপ্রান্তে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত মুখ বিবর্ণ। শঙ্করের পদশব্দ শুনিয়া একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, এক নিমিষের জন্য তাঁহার চক্ষু দুইটি শঙ্করের উপর নিবদ্ধ হইল। তাহার পর ত্বরিতপদে তিনি পাশের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িলেন। শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শঙ্কর কলেজে যায় নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন হস্টেলে ফিরিল, তখন দেখিল, মিষ্টিদিদির চাকর একটি চিঠি লইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চাকরের উপর আদেশ ছিল— শঙ্করবাবু ছাড়া অপর কাহাকেও যেন চিঠি দেওয়া না হয়। শঙ্কর তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

আপনি এত তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন যে, একটা দরকারী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেলাম না। একটা গুজব রটেছে যে, বেলা মল্লিক নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আপনার আশ্রয়ে কোথায় আছে। বেলার দাদা বেলাকে খুঁজতে এসেছিলেন, অপূর্ব্ববাবু বললেন, বেলা আপনার আশ্রয়ে আছে। রিনিও কথাটা শুনেছে। আসলে ব্যাপারটা কি, পত্রবাহক মারফৎ জানাবেন। কারণ এ বিষয়ে সবিশেষ না জানলে— বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা। আশা করি, এটা সিরিয়াস কিছু নয়। সব কথা খুলে লিখবেন। ইতি—

মিষ্টিদিদি

বেলার সম্বন্ধে যাহা সত্য কথা, তাহাই শঙ্কর সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইয়া দিল এবং লিখিল যে, তিনি প্রফেসার মিত্র ও রিনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফলাফল যেন তাহাকে পত্রযোগেই অনুগ্রহ করিয়া জানান। তৎপূর্বে সে ওখানে যাইবে না, অর্থাৎ যাইতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির চাকর চলিয়া যাইবার পর হস্টেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, বোস সাহেবের বাড়ি হইতে মাঈজী এই জিনিস ও চিঠি দিয়াছেন। শঙ্কর খুলিয়া দেখিল শৈলর চিঠি।—

শঙ্করদা,

তোমার জন্যে চুপিচুপি একটা সোয়েটার বুনেছি। তুমি যেমন বলেছিলে—নীল রঙের সঙ্গে সাদা রঙই দিয়েছি। বুনতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, শীত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গায়ে ঠিক হয়েছে কি না জানিও। তুমি একদিন এস না সময় ক'রে। একবারও তো এদিকে মাড়াও না। কেমন আছ? ইতি—

শৈল

শঙ্কর প্যাকেট খুলিয়া সোয়েটারটা বাহির করিল। বেশ বুনিয়াছে তো! গায়ে দিয়ে দেখিল, ঠিক ফিট করে নাই। বগলের কাছটা আঁট, গলাটা ঢিলা। তবু কিছুক্ষণ শঙ্কর সেটা পরিয়া রহিল। সহসা তাহার মনে একখানি মুখ ভাসিয়া আসিল—একমাথা কোঁকড়ানো চুল, দুষ্টামি-ভরা হাসি-হাসি মুখখানি। সেই কতকাল আগেকার কিশোরী শৈল!

২৯

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আপিস হইতে ফিরিয়া ভন্টু যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। অনেক কষ্টে অনেক রকম ফিকির-ধান্দা করিয়া কোনক্রমে সে সংসারটিকে চালাইতেছে, তাহার উপর যদি এই সব কাণ্ড ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে তো সে

নাচার। নানারূপ ফন্দি করিয়া সে কিছু টাকা যোগাড় করিয়াছিল এবং সমস্ত মাসের চাল ডাল নুন তেল মসলা প্রভৃতি কিনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ বাসায় ফিরিয়া সে শুনিতেছে, শন্টু ফন্তি নাকি ভাঁড়ার-ঘরে লুকাচুরি খেলিতে গিয়া সমস্ত তেলের ভাঁড়টি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। লুকাচুরি খেলিতে গিয়া! ভন্টুর সমস্ত মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল।

বউদিদিকে প্রশ্ন করিল, তুমি ওদের ভাঁড়ার-ঘরে যেতে দিয়েছিলে কেন?

বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। বঁটি হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিলেন, আমি কি করব? আমার কথা শোনে নাকি ওরা কেউ? তুমি বাড়ি থেকে যেই বেরুবে, আর অমনই সমস্ত বাড়ি মাথায় ক'রে দাপাদাপি করবে ওরা। আমি কি করব, বল?

ভন্টু কিছু না বলিয়া শন্টু ও ফন্তিকে একটা ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া ঘরে খিল দিল। তাহার পর আলমারির মাথা হইতে বেতটা পাড়িয়া মার শুরু করিল। চোরের শাস্তি! দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের মত ভন্টু বেত চালাইতে লাগিল। তাহার যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। শন্টু ও ফন্তির আর্ত হাহাকারে সমস্ত বাসাটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাকি শিশুগুলি ভয়ে শুষ্কমুখে নীরবে এক কোণে বসিয়া কাঁপিতেছিল, কারণ তাহারাও অপরাধী, তাহারাও লুকাচুরি খেলিয়াছিল। বউদিদি নীরবে নির্বিকারভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতে লাগিলেন। বাকু কানে কিছুই শুনিতে পান না, সুতরাং তিনিও নির্বিকারভাবে তাম্রকূট-চর্চায় মগ্ন রহিলেন। ভন্টু আজ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। মারিতে মারিতে বেতটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল, তবু তাহার রাগ কমিতেছে না। কতক্ষণ এভাবে চলিত বলা যায় না, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। দরজা খোলাই ছিল। শঙ্কর সন্ধ্যা

পর্যন্ত মিষ্টিদিদির নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রাস্তায় ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ভন্‌টুকে লইয়া সেই জ্যোতিষীর বাড়ি গেলে হয়। ধার করিয়া কিছু টাকা যোগাড় করিয়া তাই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কুষ্ঠির ছক তো ভন্‌টুর কাছেই আছে। কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়াই এই নিদারুণ কোলাহল শুনিয়া সে দ্বারের নিকটেই থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড!

শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি উঠিয়া পড়িলেন, প্রতিকারের যেন একটা উপায় দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি শঙ্করের কাছে গিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিলেন, ঠাকুরপো বড্ড রেগে গেছে, তুমি যদি পার একটু সামলাও ওকে। আমি বললে কিছু হবে না, বরং উলটে আরও রেগে যাবে। সেইজন্যে আমি কখনও কিছু বলি না।

শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি পুনরায় বলিলেন, তুমি একটু ডাক ওকে শঙ্কর-ঠাকুরপো, অনেকক্ষণ ধ'রে বড্ড মারছে, আহা, ম'রে গেল ওরা!

বউদিদির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল—ভন্‌টু, এই ভন্‌টু, কপাট খোল্—করছিস কি তুই?

শঙ্করের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভন্‌টুর যেন চৈতন্য হইল, সে বেতটা ফেলিয়া দিয়া কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, চল্, বাইরে চল্। থাম্, টিন্‌চার আইওডিনটা লাগিয়ে দিয়ে আসি আগে।

কিসে টিন্‌চার আইওডিন লাগাবি?

কেটে গেছে, ওই নিয়ে পরে আবার আমাকেই ভুগতে হবে।

ভন্‌টু টিন্‌চার আইওডিন লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

চল্, বাইরে চল্।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বল্ তো? হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভন্টু উত্তর দিল, শরীরে রক্তমাংস আছে ব'লে।

রক্তমাংস আছে ব'লে তুই খুন করবি?

ভন্টু উত্তর দিল না। অন্ধকার গলিটা উভয়ে নীরবেই পার হইল। বড় রাস্তায় পড়িয়া শঙ্কর দেখিল, ভন্টু দুই হাতে চোখ কচলাইতেছে এবং চোখ দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতেছে।

কি হ'ল?

পোকা না কি একটা পড়েছে মনে হচ্ছে।

রাস্তার একটা কলে তখনও জল ছিল এবং কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছিল। ভন্টু সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল। পকেট হইতে মলিন রুমালটি বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া সে বলিল, পয়সা আছে সঙ্গে?

আছে কিছু, কেন বল্ দেখি?

সহাস্যে ভন্টু বলিল, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চল্, একটা চায়ের দোকানে ঢোকা যাক।

চল্।

কাছে-পিঠে মনোমত চায়ের দোকান পাওয়া গেল না। উভয়ে পুনরায় হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ভন্টু বলিল, উঃ, পেটের ভেতর যেন একটা শেয়াল ঢুকেছে, নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে!

শঙ্কর কিছু বলিল না। সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় ভন্টুকে লইয়া জ্যোতিষীর বাড়ি যাওয়া ঠিক হইবে কি না! রিনির কথাটা এখন ভন্টুকে বলা কি উচিত? তা ছাড়া— শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত

হইল। একটা ভাল চায়ের দোকান চোখে পড়িতেই ভন্টু বলিল, চল্, জেকলিশ অ্যাফেয়ারে ঢোকা যাক।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, তোর কানা করালীর ঠিকানাটা কি রে ?

কেন ?

যাব সেখানে, একটু প্রাইভেট দরকার আছে।

চল্, আমিও যাচ্ছি।

আমাকে একা যেতে দে আজ, পরে সব বলব তোকে।

মটন চপটা বাগাইতে বাগাইতে ভন্টু সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল।

পরে সব বলব তোকে, আজ আমাকে একা যেতে দে ভাই।

ভন্টু চপে একটা কামড় বসাইয়াছিল, উত্তর দিল না। মাংসটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, দেখিস, গাড্ডায় পড়িস না যেন, করালী সোজা লোক নয়।

শঙ্কর বলিল, সে আমি ঠিক ক'রে নেব তাকে। আমার ছকটা কোথা ?

আমার পকেটেই ডায়েরিতে টোকা আছে। আগে তুই খেয়ে নে না, সব দিচ্ছি আমি।

উভয়ে আহার করিতে লাগিল।

৩০

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া করালীচরণ তাড়াতাড়ি বাক্সটি লুকাইয়া ফেলিলেন ও হাতের আয়নাটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া বলিলেন, কে ?

আমি শঙ্কর, কপাটটা খুলুন একবার।

বাহ্ নারায়ণ!

অস্ফুটস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া করালীচরণ উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন।

কি চান আপনি?

ভন্টুর উপদেশ অনুযায়ী শঙ্কর হেঁট হইয়া প্রণাম করিল ও বলিল, কুষ্ঠি গণনা করাতে এসেছি।

এখন হবে না।

ভন্টুর কাছ থেকে আসছি আমি। ভন্টু এই টাকা দশটা আর ছকটা দিতে বললে আপনাকে।

ভন্টুবাবু পাঠিয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অসময়ে যত বখেড়া ভন্টুবাবুর!

সহসা করালীচরণের চক্ষুটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আমি কি ভন্টুবাবুর চাকর? টাকা দশটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কি আমার মাথাটা কিনে ফেলবেন ভেবেছেন নাকি?

ভন্টুর নির্দেশ অনুযায়ী শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল ও সবিস্ময়ে এই একচক্ষু জ্যোতিষীর কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতি জ্বলিতেছে, কাছে আর একটা মদের বোতল, ফাটা একটা গ্লাস, চতুর্দিকে এলোমেলো স্তূপীকৃত একগাদা বই।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছকটা দেখিতেছিলেন।

কার কুষ্ঠি এটা?

আমার।

বেশ, কাল আসবেন।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বড় উদ্বেগের মধ্যে আছি, একটা কথা যদি শুধু ব'লে দিতেন, তা হ'লে বড় উপকার হ'ত আমার।

ঘোড়াটা কি বাইরে বেঁধে রেখে এসেছেন? বাই নারায়ণ! এসব কি তাড়াতাড়ির জিনিস? কি জানতে চান আপনি? একসঙ্গে হবে।

আমার বিয়ের ব্যাপারটা জানতে চাই খালি, কবে হবে আর কি রকম স্ত্রী হবে?

বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চক্ষুটিতে বিদ্রূপ-করুণা-মিশ্রিত অদ্ভুত একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর একবার ছকটার পানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ঘুরে আসুন তা হ'লে।

কতক্ষণ পরে আসব?

ঘণ্টা দুই পরে। এখন কটা বেজেছে?

আটটা।

দশটা নাগাদ আসবেন। দশটার বেশি দেরি করবেন না যেন, দশটার পর আমি বেরিয়ে যাব।

আচ্ছা।

নমস্কার করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ খানিকটা মদ্যপান করিয়া মুখবিকৃতিসহকারে স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এসব কান্ট্রি-ফান্ট্রি কি আমার পোষায়! ভন্টুবাবুর ধাপ্পায় প'ড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

মুখটা মুছিয়া খানিকক্ষণ তিনি মোমবাতির শিখাটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেই লুকানো ছোট বাক্সটি বাহির করিয়া আগ্রহভরে সেটি খুলিয়া চ্যাপ্টা সাদা-গোছের কি একটা বাহির করিয়া অতিশয় কৌতূহলভরে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া টেবিলের উপর হইতে উপুড়-করা আয়নাটা তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে সেই চ্যাপ্টা বস্তুটি চক্ষুহীন অক্ষিকোটরের ভিতর বসাইয়া দিয়া বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দর্পণের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাথরের চোখ। নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছে না তো! স্পন্দিতবক্ষে করালীচরণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আয়নাটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং করিয়া শব্দ হইল—সাড়ে আটটা বাজিল বোধ হয়। করালীচরণ চক্ষুটি খুলিয়া রাখিয়া শঙ্করের ছকে মনোনিবেশ করিলেন।

শঙ্কর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তর যদিও একই চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে যদিও রিনির কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু পরিপূর্ণ নদীস্রোতে ভাসিয়া-আসা একটা ফুল যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নদীকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া ছোট ফুলটাকেই আমরা যেমন লক্ষ্য করি, আজিকার সন্ধ্যায় ভন্টুর বাড়ির ব্যাপারটাও তেমনই শঙ্করের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। বউদিদির আর্ত অসহায় মুখচ্ছবিটা কিছুতেই সে ভুলিতে পারিতেছিল না। এখনও যেন তাহার কানে বউদিদির করুণ কথাগুলি বাজিতেছে, আহা, ম'রে গেল ওরা! ভন্টুটা সময়ে সময়ে এমন নিষ্ঠুরও হইতে পারে! অথচ সে বেচারারই বা দোষ কি? এমন অবস্থায় কাহার না রাগ হয়? কত দিক সামলাইবে সে? সমস্ত মাসের খরচ এক ভাঁড় তেল পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে রাগ হয় বইকি। এই তো সে এখনই আবার হন্যে কুকুরের মত টাকা ধার করিতে ছুটিল—দাদাকে টাকা পাঠাইতে হইবে, বাবাকে বালাপোশ করাইয়া দিতে হইবে। বাকুর জামা আছে, র‍্যাপার আছে, সোয়েটার আছে, কান-কাটা টুপি আছে, তথাপি বালাপোশ দরকার। শীতটা ফুরাইয়া যাইবার পূর্বেই বালাপোশটা করাইয়া দেওয়া চাই, তাহা না হইলে বউদিদিরই মুশকিল, বাক্যবাণ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইবে। অথচ ভন্টুর কতই বা আয়? ধার করিয়া চলিতেছে। সেই চায়ের দোকানের ভদ্রলোকের সহিত

আলাপ জমাইয়াছে, উদ্দেশ্য যদি কিছু সেখান হইতে হস্তগত করিতে পারে।...সহসা শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। মনিব্যাগটা খুলিয়া দেখিল, গোটা দশেক টাকা এখনও আছে। এক মাসে কত তেল খরচ হয়? কিছুই তো জানে না সে। পৃথিবী হইতে কোন্ নক্ষত্রের দূরত্ব কত 'লাইট ইয়ার', তাহা সে হয়তো নির্ভুল বলিতে পারিবে; কিন্তু একটা সাধারণ সংসারে মাসে কত চাল ডাল নুন তেল লাগে, এ সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। কিছুদূর হাঁটিয়া সে একটা মুদীর দোকান পাইল। সেখানে গিয়া উপবিষ্ট দোকানদারটিকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, সের পাঁচেক সরষের তেলে একটা সংসারের এক মাস চলা উচিত, কি বলেন?

মুদী যুক্তিযুক্ত উত্তরই দিল, সে সংসার বুঝে, রাবণের সংসারে পাঁচ সের তেলে কি হবে?

রাবণের সংসার নয়, ছোটখাটো সাধারণ সংসার, দু-তিনজন বড় লোক, চার-পাঁচটি ছেলেপিলে। পাঁচ সেরে হবে না?

ভেসে যাবে।

দিন তা হ'লে পাঁচ সের তেল আমাকে। আর একটা পাত্রও আপনাকেই দিতে হবে, একটা টিন-ফিন হ'লেই ভাল হয়।

দিচ্ছি সব ঠিক ক'রে, বসুন আপনি। ওরে, মোড়াটা এগিয়ে দে আর মহেশের দোকান থেকে পাঁচসেরী একটা টিন আন্‌গে চট ক'রে।

দোকানের বালক-ভৃত্যটি মোড়া আগাইয়া দিয়া টিন আনিতে চলিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই টিন আনিয়া হাজির করিল।

মুদী টিনটি ওজন করিয়া তাহার পর তেল মাপিতে বসিল।

ভাল তেল তো? একটু ভাল দেখে দেবেন দয়া ক'রে।

মুদী ওজন-দাঁড়ির পাল্লার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সহ উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল জিনিস দেব বইকি। খাঁটি ঘানির তে

নসীরামের দোকানে চালাকিটি চলবার জো নেই। খেয়ে অপছন্দ হয়, নগদ মূল্য ফেরত দিয়ে দেব।

ওজন সমাপ্ত করিয়া পাঁচ সেরের উপরে আরও এক পলা ফাউ দিয়া টিনের মুখটি মুদী বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল এবং শঙ্করের প্রদত্ত মূল্য বেশ করিয়া বাজাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া কাঠের বাক্সের ছিদ্রমুখে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

শঙ্কর মুদীর কার্যতৎপরতায় খুশি হইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামই কি নসীরাম?

আজ্ঞে না, আমার ঠাকুরের নাম নসীরাম, অধীনের নাম কেবলরাম।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে, নমস্কার।

কেবলরাম সবিনয়ে প্রতি-নমস্কার করিল।

তেলের টিন লইয়া শঙ্কর একটি রিক্‌শা করিল। রাস্তায় একটা ঘড়িতে দেখিল, পৌনে নয়টা বাজিয়াছে। রিক্‌শা এবং ট্রামের সহায়তায় সে অনায়াসে ভন্টুদের বাড়িতে তেলটা দিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ভন্টু এখন বাড়িতে নাই সে জানে, সুতরাং বেশি দেরি হইবে না।

ভন্টুর বাড়ির সামনে রিক্‌শা হইতে নামিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিন্তু এত দূর যখন আসিয়াছে, ফেরা যায় না, কড়া নাড়িতে হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট খুলিয়া গেল।

আচ্ছা ঠাকুরপো, আপিস থেকে এসে না খেয়েই—

বউদিদি শঙ্করকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

বন্ধুটি কোথায়?

সে এক জায়গায় গেছে, এই তেলটা কিনে দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে বললে। এই নিন।

তেলের টিনটা সে নামাইয়া দিল।

পৌঁছে দিতে বললে?

হ্যাঁ।

বউদিদির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। একটু থামিয়া বলিলেন, আপিস থেকে এসে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত মুখে দেয় নি। আমাকে এমন শাস্তি দেওয়া কেন?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভেতরে এস।

না, এখন আর বসব না, দরকারী কাজ আছে একটু আমার।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না। বউদিদির মুখের দিকেও আর চাহিতে পারিল না। মুখটা ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িল। রাস্তা হইতে সে শুনিতে পাইল, বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিতেছেন, বউমা, চায়ের জল চড়াও।

করালীচরণের গলিতে শঙ্কর আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন পৌনে দশটা। শীতকালের রাত্রি। গলিটা নির্জন হইয়া পড়িয়াছে গলির মোড়ের পানের দোকানটা এখনও কেবল খোলা আছে। শঙ্ক কপাটে আঘাত করিতেই করালীচরণ বলিলেন, ভেতরে আসুন, কপা খোলা আছে।

কপাট ঠেলিয়া শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। এক চক্ষুর দৃ শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনা বিয়ের এখন ঢের দেরি। বছর দেড়েকের আগে তো হতেই পারে ন

শঙ্করের পায়ের তলার মাটি সহসা যেন সরিয়া গেল। তথাপি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং স্থিরকণ্ঠেই পুনরায় প্রশ্ন করিল, আমা স্ত্রী কি রকম হবে একটা আইডিয়া দিতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। শ্যামবর্ণা, নাতিদীর্ঘাঙ্গী—

লেখাপড়া কিছু জানবে কি ?

বাই নারায়ণ, ওটা তো দেখি নি! দেখি, দাঁড়ান। বসুন আপনি।

করালী আবার ঝুঁকিয়া পুঁথিপত্র উল্টাইতে লাগিলেন। শঙ্কর চৌকির এক পাশে বসিল। কয়েক মিনিট পরে করালীচরণ বলিলেন, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। তবে মেয়েটি লক্ষ্মী হবে।

লেখাপড়া কিচ্ছু জানবে না ?

কই, সে রকম তো মনে হচ্ছে না কিছু।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। লোকটার সম্বন্ধে তাহার ধারণাই সহসা বদলাইয়া গেল। মনে মনে 'বোগাস' কথাটা উচ্চারণ করিয়া মুখে সে বলিল, আচ্ছা, উঠি এখন তবে আমি—নমস্কার।

দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, ছোকরার বউ পছন্দ হ'ল না। বাই নারায়ণ! জোটেও ভন্টুবাবুর কাছে সব!

করালীচরণ উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে একটি রমণীমূর্তি আসিয়া দর্শন দিল। কালো কুচকুচে রঙ, বয়স কত তাহা বলা অসম্ভব, গালের হাড় উঁচু হইয়া রহিয়াছে, খোঁপায় ফুল গোঁজা, চোখে কাজল, দাঁতে মিশি। মোড়ের সেই পানওয়ালী।

হাসিয়া বলিল, ও গণকঠাকুর, হারিয়েছে তোমার কিছু ?

করালীচরণ রোষদীপ্ত চক্ষে নারীটির পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ফের আসিয়াছে!

ফের তুই এসেছিস এখানে ? মানা ক'রে দিয়েছি না তোকে ?

বাবা রে বাবা! এক চোখেই যেন আগুন ছুটছে! এসেছি কি

নিজের গরজে নাকি ? দশ টাকার নোটটা তখন সিগারেট কিনতে গিয়ে ফেলে এসেছিলে আমার দোকানে, তাই দিতেই এসেছি। ভালর কাল নেই। এই নাও।

করালীচরণের চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিল।

দূর হ তুই—চাই না নোট—দূর হ তুই।

পানওয়ালী নোটটা মেঝের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, খুব রাগ করিয়াই যাইতেছে, কিন্তু পিছু ফিরিয়া হঠাৎ একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

করালীচরণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩১

সার্পেণ্টাইন লেনের একটি বাড়ির বাহিরের ঘরে ভন্টু ও নিবারণবাবু বসিয়া ছিলেন। নিবারণবাবু লোকটির সহিত ইতিপূর্বে আমাদের যৎসামান্য পরিচয় হইয়াছে। নিবারণবাবু সেই চায়ের দোকানের মালিক, যে চায়ের দোকানে কিছুদিন পূর্বে ভন্টু ও শঙ্কর প্রোটোটাইপের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, এবং যিনি ওয়েস্ট-কোট-পরিহিত মাস্টারের সঙ্গে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে উঠিয়া আসিয়া ভন্টুর দ্বারা করকোষ্ঠী বিচার করাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই নিবারণবাবুর সহিত ভন্টুর পরিচয়, এবং মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে যাতায়াত করিয়া ভন্টু সেই পরিচয়টিকে দৃঢ়তর করিয়াছে। নিবারণবাবু ভন্টুর নানা গুণে মুগ্ধ। ভন্টুও নিবারণবাবুর মধ্যে একটি সহৃদয় মানুষ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। নানারূপ ধান্দা-ফিকির করিয়া ভন্টুকে যে শুধু সংসার চালাইতে হয় তাহা নহে, অসুস্থ অগ্রজকে টাকা পাঠাইতে হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে নানাজাতীয় লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। কখন কাহার নিকট হইতে

কোন্ উপকার পাওয়া যায় কে বলিতে পারে? নিবারণবাবু লোকটি কেবল সহৃদয় তাহাই নয়, শাঁসালোও। সুতরাং তাঁহার বারম্বার পদধূলি লইয়া, করকোষ্ঠী বিচার করিয়া, তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়া (ভন্টু আজকাল হোমিওপ্যাথি লইয়া নাড়াচাড়া করে) এবং ছোটখাটো নানা ব্যাপারে তাঁহার উপকার করিয়া ভন্টু নিবারণবাবুর অন্তরঙ্গ হইয়াছে।

নিবারণবাবু লোকটি পুরাকালে আসাম-অঞ্চলে চা-বাগানে কাজ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও নির্ঝঞ্ঝাট নন, দুইটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, গৃহিণীটি সর্বদাই অসুস্থ। এতদ্ব্যতীত মাস্টার নামক ব্যক্তিটি পূর্বপরিচয়ের সুযোগ লইয়া কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্কন্ধারূঢ় হইয়াছেন। আসামের চা-বাগানে যখন ছিলেন, তখনই এই মাস্টারের সহিত তাঁহার আলাপ। চমৎকার পাশা খেলিতে পারেন, চমৎকার চা বানাইতে পারেন, চমৎকার তবলা বাজাইতে পারেন এবং চমৎকার মাংস রাঁধিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চতুর্বিধ গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও মাস্টার বিশেষ কিছু রোজগার করিতে পারেন না। একটা অবশ্য সুবিধা আছে, তিন কুলে তাঁহার কেহ নাই। একটা পেট, কোন রকমে চলিয়া যাইবার কথা; কিন্তু কালের গতিক এমনই হইয়াছে যে, তাহা চলাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে পূর্ব-পরিচিত নিবারণবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটায় সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবু গুণী মাস্টারকে তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। গৃহিণীর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। গৃহিণীকে বলিতে হইয়াছে যে, চায়ের দোকানে কাজ এত বেশি যে, ম্যানেজার-জাতীয় একজন লোক না রাখিলে চলিতেছে না। খাওয়া পরা এবং মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় এমন একজন ভাল পরিচিত লোক যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে

হাতছাড়া করা উচিত নয়। সস্তায় এমন একটা লোকের কর্মপটুতার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নিবারণ-গৃহিণী আপত্তি করেন নাই। মাস্টারের অবসর-বিনোদনের জন্য চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবুকে তাঁহার সহিত বসিয়া পাশা খেলিতে হয় এবং তবলা বাজাইবার সুযোগ দিবার জন্য সেতার বাজাইতে হয়। নিবারণবাবু আসাম-অঞ্চলে যখন ছিলেন, তখন তাঁহার একটু-আধটু সেতার বাজানোর শখ ছিল; কিন্তু বহুকাল চর্চা নাই, হাত আর তেমন চলে না। কিন্তু মাস্টারের প্ররোচনায় পড়িয়া আবার তাঁহাকে সাধনা করিতে হইতেছে, অর্থাৎ চায়ের দোকানে চা যত না বিক্রয় হউক, পাশা-খেলা এবং সেতার-তবলা পুরাদমে চলিয়া থাকে।

এখনও মাস্টার দোকান হইতে ফেরেন নাই। ভন্টু এই খানিকক্ষণ হইল আসিয়াছে। ভন্টুর সাহচর্য নিবারণবাবুর অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, চা হবে নাকি ভন্টুবাবু?

ভন্টু বলিল, কেন ফর নাথিং কথা ব'লে সময় নষ্ট করছেন?

ফর নাথিং মানে?

নিবারণবাবুর চক্ষু দুইটি প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। এতদিন আলাপের পরও তিনি ভন্টুবাবু লোকটির কথাবার্তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

চা তো না খাইয়ে ছাড়বেন না জানি, অনর্থক কচলা-কচলি ক'রে লাভ কি? আপনাকে চিনি না!

ভন্টু চট করিয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

আহা-হা, কি যে করেন আপনি! এই অভ্যেসটা আপনার ভারি খারাপ, যাই বলুন, ওতে অপরাধ হয়।

অপরাধ কিসের? আমরা এক জাত, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ—

তা হোক, তবু ঠিক নয় এটা। আপনাকে বলাও বৃথা।

ভন্‌টু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, চা আনতে বলুন।

দার্জি, দার্জি, ওরে দার্জি!

কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া নিবারণবাবু উঠিয়া গেলেন। নিবারণবাবুর কন্যা দুইটির নাম একটু অদ্ভুত। বড়টির নাম দার্জিলিং, ছোটটির নাম আসাম। ভৌগোলিক কোন কারণে নয়, দুই প্রকার চায়ের নাম অনুসারেই তিনি কন্যা দুইটির এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, নাম দুইটি ডাকনাম। দার্জিলিঙের ভাল নাম শ্যামলী, আসামের ভাল নাম যমুনা। দুইজনেরই রঙ চায়ের পাতার মত কালো, হয়তো চা-ব্যবসায়ী নিবারণবাবু সেইজন্যই তাহাদের চায়ের নামে নামকরণ করিয়াছেন। দৈবক্রমে উভয়ের নামের সঙ্গে চরিত্রও ভারি খাপ খাইয়া গিয়াছে। দার্জিলিং-চায়ে যেমন গন্ধ বেশি লিকার কম, নিবারণবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও সেইরূপ—একটু ভাবময়ী, কাজকর্মে তেমন পটু নয়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে আর্টিস্টিক। আসাম ঠিক ইহার উল্টা, ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, বাড়ির কাহারও সঙ্গে তাহার ভাব নাই—কোন্দল করাই তাহার স্বভাব, কিন্তু খাটিতে পারে অসম্ভব—রান্নাঘরের সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী।…নাঃ, এ মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, হরদম সেলাই!—বলিতে বলিতে নিবারণবাবু ফিরিয়া আসিলেন। একটা বিরক্তির ভাব চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন, ছাড়ুন হাল ছেড়ে দিয়েছি মেয়েটার।

ভন্‌টু সব বুঝিতেছিল, তথাপি প্রশ্ন করিল, কার?

কার আবার, দার্জির। গিয়ে দেখি, লণ্ঠনের আলোয় ঝুঁকে প'ড়ে একটা কাপড়ের ওপর রেশমী সুতো দিয়ে ফুল তোলা হচ্ছে। টেবিল-ক্লথ হচ্ছে। নিজেদেরই ক্লথ জোটে না, টেবিল-ক্লথ! আর টেবিলই

কোথা যে, টেবিল-ক্লথ পাতবি ! ঝঞ্ঝাট বুঝুন, কাল বলবে—টেবিল চাই, ক্লথ পাতব।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, জুতে দিন।

আরে মশাই, জুতে দিতে কি আমি অরাজি ? কিন্তু পাত্র কই ? এক-একটা খুঁজে-পেতে আনি, জলখাবার খায়, স'রে পড়ে। এই আমরাও তো বিয়ে করেছিলাম মশাই, রঙ নিয়ে তো মাথা ঘামাই নি। আজকাল সবাই চায় গোলাপী রঙ, ভুলে যায় এটা বাংলা দেশ, বসোরা নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, বাবাও আমার বেছে বেছে এমন একটি রক্ষে-কালীর বাচ্চার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, বংশটাই কালো হয়ে গেল। মুক্তোকেশী বেগুনের গাছে আপেল ফলবে কি ক'রে, বলুন ?

ভন্টু স্মিতমুখে বসিয়া রহিল। এসব কথায় সায় দেওয়াও বিপদ, প্রতিবাদ করাও বিপদ। আসল কথাটা অর্থাৎ টাকার কথাটা সে কখন কি ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। এতদিন নিবারণবাবুর সহিত আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভন্টু তাঁহার নিকট টাকার কথা কোনদিন উত্থাপন করে নাই। অথচ উত্থাপন না করিলেও আর চলিতেছে না। কিছু টাকা অবিলম্বে চাইই। ধার-করা ব্যাপারে প্রথম সঙ্কোচটা কাটাইয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে পরে আর কোন গোলমাল হয় না। শুভ-অশুভ যাহা হোক, একটা মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু নিবারণবাবুর এই ক্ষোভের মুখে কথাটা পাড়িতে তাঁহার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। হঠাৎ একবার 'না' বলিয়া ফেলিলে সেটাকে "হাঁ' করিতে আবার বেশ কিছুদিন হয়তো সময় লাগিয়া যাইবে, হয়তো হইবেই না। ভন্টু চুপ করিয়াই রহিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনার ছোট মেয়েকে চুলকনির যে একটা ওষুধ দিয়েছিলাম—

অদ্ভুত ফল হয়েছে মশাই, একেবারে সেরে গেছে। আমাকেও এক ডোজ দেবেন তো, আঙুলের গলিগুলোতে আমারও হয়েছে।—বলিয়া তিনি চুলকাইতে লাগিলেন।

আচ্ছা, কাল আনব।

মাস্টার আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ভন্টুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ভ্রূযুগল নাচাইলেন, ভাবটা, এই যে, আসিয়াছেন দেখিতেছি!

নিবারণবাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি চ'লে আসার পর খদ্দের-টদ্দের এসেছিল দু-একটা?

খদ্দের!

এমন একটা বিস্ময়সূচক ভঙ্গীতে মাস্টার কথাটি উচ্চারণ করিলেন যে, যেন নিবারণবাবু অতিশয় অসম্ভব একটি প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। মাস্টারের দৃষ্টি দেখিয়া নিবারণবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, মানে, আসেও তো মাঝে মাঝে—

রাত্তির নটার পর কার দায় পড়েছে ওই গলিতে চা খেতে আসবে! একদিনও তো দেখি নি।

নিবারণবাবু প্রত্যুত্তরে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু এমন একটা মুখভাব করিয়া ভন্টুর দিকে চাহিলেন যে, বোঝা গেল, তিনি কথা-কাটাকাটি করিয়া কথা বাড়াইতে চাহেন না বটে, কিন্তু নয়টার পর কখনও তাঁহার দোকানে খরিদ্দার আসে না, এ উক্তি তিনি মানিয়া লইতেও প্রস্তুত নহেন। ভন্টু একটু হাসিল মাত্র। মাস্টার বসিলেন। এমন সময় দার্জি দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল। দার্জিসিংহের রঙ মায়ের মত, মুখশ্রী বাবার মত। বয়স বছর ষোলো-সতেরো। অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে চায়ের পেয়ালা ভন্টু ও নিবারণবাবুর হস্তে দিয়া সে চকিতে একবার মাস্টারের পানে চাহিয়া দেখিল। মাস্টার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন, বলিলেন, আমি আর খাব না এখন, চার পেয়ালা হয়ে গেছে।

দার্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

নিবারণবাবু পেয়ালায় এক চুমুক দিয়াই বলিলেন, কাণ্ডটা দেখেছেন!

ভন্টু তখনও চুমুক দেয় নাই, বলিল, কি, লাইট হয়েছে বুঝি?

খেয়ে দেখুন না মশাই, লাইট তো হয়েইছে, চিনি পর্যন্ত দেয় নি! ওরে আসুমি, আসুমি!

আসাম আসিয়া দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল।

চিনি নিয়ে আয় তো একটু। দার্জি চায়ে চিনি দেয় নি।

আসাম একটু পরেই চিনির টিন ও একটি চামচ লইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং হাসি চাপিতে চাপিতে উভয়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইয়া দিয়া গেল। আসামের বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, বেশ চালাক চটপটে মেয়ে, রঙ কালো হইলেও দার্জির মত অতটা কুশ্রী নয়।

চা পান করিতে করিতে নিবারণবাবু বলিলেন, ভন্টুবাবু, আপনি তো পাঁচ জায়গায় ঘোরেন, একটু খোঁজখবর রাখবেন, মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে একটু ঝাড়া-হাত-পা হওয়া যায়।

ভন্টু বলিল, বাজার বড় খারাপ। কি বলেন মাস্টারবাবু?

মাস্টার বলিলেন, হ্যাঃ।

চা পান শেষ করিয়া ভন্টু উঠিয়া পড়িল। ভাবিয়া দেখিল, টাকার কথাটা এখন পাড়িলে ঠিক সুবিধাজনক হইবে না, অথচ প্রয়োজন কালই। কাল একবার আসিতে হইবে। উপায় কি?

এইবার উঠি আমি।

এরই মধ্যে উঠবেন?

হ্যাঁ, কাজ আছে, আবার আসব কাল।

ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

ভন্টু চলিয়া গেলে মাস্টার খুব রহস্যময় একটি উক্তি করিলেন।

দাঁও মাফিক খুব একটা দামী কারবার করেছি আজ।

চায়ের সেই এজেন্টটা এসেছিল নাকি ? আমি তাকে পাঁচ আনা পাউণ্ডের বেশি দর দিতে রাজি নই, তুমি আবার বেফাঁস কিছু বল নি তো ?

আরে না না। তুমি যে ধাঁ ক'রে একেবারে অন্য লাইনেই চ'লে গেলে !

অন্য লাইনে মানে ? ঠিক লাইনেই আছি। ওই ডাস্ট চায়ের পাঁচ আনার বেশি দর দেওয়া যায় ?

কি মুশকিল, কথাটা শোনই শেষ পর্যন্ত। আমি বলছি গতের কথা, তুমি একেবারে চায়ের এজেন্ট এনে ফেললে !

গৎ ? কিসের গৎ ?

কি আশ্চর্য, আকাশ থেকে পড়লে যে একেবারে ! বলি নি তোমাকে পরশুদিন যে, হোসেন মিঞা সেতারার খুব ভাল একটা গতের খাতার সন্ধান পেয়েছি একজনের কাছে ? অনেক পৈরবী ক'রে তিলোককামোদটা টুকে এনেছি আজ। দেখে এলাম, ইয়া মোটা খাতা—বহু গৎ আছে। দাঁড়াও না, সব হাতাব ক্রমশ। চা-টা খাইয়ে লোকটাকে খুব তোয়াজ করেছি আজ ; একটু যেন ভিজেছে মনে হচ্ছে।

এতবড় একটা সুসংবাদ শুনিয়াও কিন্তু নিবারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন না। নীরবে পকেট হইতে বিড়ির কৌটাটি বাহির করিয়া নীরবেই একটি বিড়ি ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিলেন। গতের খাতার মালিক সেই রোগা লম্বা লোকটিকে তিনি দেখিয়াছেন এবং মাস্টারের সঙ্গে ভাব জমাইয়া সে যে দোকানে মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় চা খাইয়া যাইতেছে, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। চা যাক, দুই-এক পেয়ালা চায়ে বিশেষ আসিয়া যাইবে না, কিন্তু কাল হইতে উক্ত তিলোককামোদ গৎ তাঁহার উপর ভর করিবে, ইহাই ভাবিয়া নিবারণবাবু একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। 'পিলু'টাকে লইয়াই তো নাজেহাল হইতে হইয়াছে'।

এ বয়সে কি আর ওসব পোষায়! অথচ মাস্টার লোকটা নাছোড়বান্দা, তবলা তিনি বাজাইবেনই; এবং মুশকিল এই যে, তবলা যন্ত্রটা একা একা বাজানো যায় না।

সঙ্গত করিবার জন্য নিবারণবাবুকে সেতার বাজাইতে হয়।

এককালে অবশ্য খুবই শখ ছিল, কিন্তু এখন আর ওসব পোষায় না। নিতান্ত মাস্টারের খাতিরেই তিনি রাজি হইয়াছেন। শরণাগত আশ্রিত লোককে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না, লোকটা গুণীও বটে। অথচ—

কাল থেকে গৎখানায় হাত দিয়ে ফেল, দু-তিন দিনে রপ্ত ক'রে ফেলা চাই।

বিড়িতে একটা টান দিয়া বিমর্ষ নিবারণ বলিলেন, দেখি।

সঙ্গীত-বিষয়ক আলোচনা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলিত, কিন্তু অকস্মাৎ ভন্টুর পুনরাবির্ভাবে তাহা আর ঘটিল না। ভন্টু প্রবেশ করিয়া বলিল, দাদা, ঘোর জালে প'ড়ে এসেছি।

কি হ'ল?

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি, মনিব্যাগ গ্যাণ্ডিফায়েড।

গ্যাণ্ডিফায়েড! মানে? পকেট-মারা গেছে নাকি?

স্টোন ডেড।

এখানে ফেলে-টেলে যান নি তো?

দেখুন।

সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই খোঁজা হইল, মনিব্যাগ পাওয়া গেল না।

ভন্টু বলিল, ওতেই আমার যথাসর্বস্ব ছিল দাদা। গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দিন, কাল থেকে তা না হ'লে ফাস্টিং আপিস খুলতে হবে। দয়া করুন দাদা।

ভন্টু নিবারণের পদধূলি লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

আহা, টাকা আপনাকে দিচ্ছি, অমন করছেন কেন? বসুন।

ভন্টু উপবেশন করিল।

৩২

শিরীষবাবুর বাসায় বসিয়া মুকুজ্জেমশাই পত্র লিখিতেছিলেন। শিরীষবাবুর কন্যা অমিয়া আসিয়া হাজির হইল। অমিয়ার বয়স বারো বছরের বেশি নয়, বোধ হয় কমই হইবে। অথচ ইহারই বিবাহের জন্য শিরীষবাবুর আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ইহারই জন্য পাত্র-সংগ্রহ-কার্যে মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন যাবৎ নিযুক্ত আছেন, এ কথা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। এখনও মুকুজ্জেমশাই সেই কার্যেই ব্যাপৃত আছেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাবের বিশেষত্ব—যখন যাহাতে লাগেন, তাহার চরম করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য সহজ কঠিন সরল জটিল যত প্রকার উপায় মাথায় আসে সবগুলিই করিয়া দেখেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছিলেন। কলিকাতার এবং মফস্বলের যাবতীয় কলেজ হইতে অবিবাহিত কায়স্থ যুবকগণের নাম-ধাম-পরিচয় সংগ্রহ করিয়া ও তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। ফলে, নানারকম চিঠিপত্র কোষ্ঠী জমিয়া এবং সেগুলি নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত হইয়া নানা রঙের ফাইল স্ফীত করিতেছিল। অর্থাৎ মুকুজ্জেমশাই ছোটখাটো একটি আপিস খুলিয়া বসিয়াছিলেন। এই ধরনের কার্যেই তিনি আনন্দ পান এবং কার্যটি যতই দুঃসাধ্য ও জটিল হয়, ততই যেন তাঁহার উৎসাহ বাড়িতে থাকে। মধ্যবিত্ত বহু গৃহস্থের বহু কঠিন সমস্যার সমাধান মুকুজ্জেমশাই বহুবার নিঃস্বার্থভাবে করিয়াছেন। করিয়া আনন্দ পান, এইটুকুই বোধ হয় তাঁহার স্বার্থ।

এই সংক্রান্ত ছয়খানি চিঠি লেখা তিনি সকাল হইতে বসিয়া শেষ করিয়াছেন, সপ্তম চিঠিখানি লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে অমিয়া আসিয়া বলিল, মা বললে, আপনি হাত পা ধুয়ে আহ্নিক ক'রে নিন, আর ব'সে চিঠি লিখতে হবে না।

মুকুজ্জেমশাই লিখিতে লিখিতে একটু হাসিলেন।

এত চিঠি রোজ রোজ কোথায় লেখেন আপনি? এত লিখতেও পারেন!

মুকুজ্জেমশাই হাস্যস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, এই যে হয়ে গেল। এখন আর লিখব না, এইটে শেষ ক'রে নিই। আবার তিনি পত্ররচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অমিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে নিকটস্থ একটি চেয়ারে বসিল। উজ্জ্বল শ্যাম মেয়েটির বর্ণ, স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে নাক মুখ চোখে তেমন বিশেষ কোন সৌন্দর্য নাই, কিন্তু সমগ্রভাবে মেয়েটির মুখশ্রীতে সুন্দর একটি লাবণ্য আছে। অতিশয় সরল পবিত্র অনাড়ম্বর অন্তরের প্রতিচ্ছবি সমস্ত মুখখানিতে প্রতিফলিত হইয়া এমন একটি কোমল কমনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠে।

অমিয়া আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এত চিঠি আপনি রোজ রোজ কাকে লেখেন দাদামশাই?

তোর শ্বশুর-ভাশুরকে।

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ নয়—সত্যি তাই।

আমার তো বিয়েই হয় নি এখনও, শ্বশুর-ভাশুর পাবেন কোথা?

আছে এক জায়গায়।

কোথায়?

তা এখন বলব কেন?

মুকুজ্জেমশাই চিঠিখানি খামে পুরিতে পুরিতে খুব রহস্যময়ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। একটি প্রশ্ন অনেকদিন হইতেই অমিয়ার অন্তর আলোড়িত করিতেছিল, নিজে সে ইহার সমাধান করিতে পারে নাই, অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। দাদামশাইকে

শিরীষবাবু বলিলেন, দশটা বেজে গেছে, আপনি আর দেরি করবেন না, সুশীল ব'সে আছে।

এই যে উঠি।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া অমিয়ার সহিত বাড়ির ভিতরে গেলেন। অনেক কাজ এখনও বাকি। স্নান করিবেন, আহ্নিক করিবেন, স্বপাক ভাতে-ভাত দুইটি ফুটাইয়া লইবেন, আহারাদি করিয়া মৃন্ময়ের একবার খবর লইবেন। যদিও খবর পাইয়াছেন যে, মৃন্ময় সুস্থ আছে, তথাপি একবার যাইতে হইবে, তাহা না হইলে পাগলীটা অনর্থ বাধাইবে।

শিরীষবাবু ক্যালেণ্ডারের শিব ও প্রাচীর-বিলম্বিত অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছবিকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারও আপিসের দেরি হইয়া গিয়াছে।

৩৩

এত রূঢ় আঘাত প্রিয়বাবু জীবনে আর কখনও পান নাই। বেলা যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। কি একটা সামান্য কথা হইতে কি হইয়া দাঁড়াইল! প্রথম যেদিন বেলা চলিয়া গেলেন, প্রিয়বাবু আশা করিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরেই রাগটা কমিলে তিনি ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যা হইয়া গেল, বেলা ফিরিলেন না। কি করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বেলার গানের মাস্টার অপূর্ববাবু আসিয়া হাজির হইলেন। অদ্ভুত লোক এই অপূর্ববাবু! বেলাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন। মিনমিন করিয়া কথাবার্তা কন, ভদ্রলোকের মধ্যে কিছুমাত্র যদি পদার্থ আছে! ইঁহাকেই তিনি এ যাবৎ মাসে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকা গনিয়া দিয়াছেন, অথচ এই সামান্য উপকারটি ভদ্রলোক করিতে পারিলেন না। বেলা এখন

তাঁহাকে ফোন করিয়া ডাকিলেন এবং সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তখন উনি কি হিসাবে তাঁহাকে অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্করের সহিত যাইতে দিলেন, তাহা প্রিয়বাবু ভাবিয়া পাইলেন না। রাগ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গিয়াছে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না! লোকটি কেবল ছিমছাম পোশাক পরিয়া 'অনুগ্রহ ক'রে' 'আশা করি' 'যদি কিছু মনে না করেন' প্রভৃতি কতকগুলি মোলায়েম অর্থহীন বুলি অসংলগ্নভাবে আওড়াইতেই পারেন, আর কোন কর্মের নন। নিরীহ অপূর্ববাবুর প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় প্রিয়বাবুর সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, ভদ্রলোকের পাউডার-মাখা মুখে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাঁহাকে ইচ্ছাটি সম্বরণ করিতে হইল। কারণ, এই জাতীয় উত্তেজনাজনিত আকস্মিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া জীবনে তিনি বহুবার বিপন্ন হইয়াছেন। একবার একটা সাহেবকে মারিয়া চাকুরি গিয়াছিল; বেলাও যে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহাও এই হঠকারিতার জন্য। দ্বিতীয়ত, অপূর্ববাবুকে চটাইলে বেলার নাগাল পাওয়া শক্ত হইবে। অপূর্ববাবু শঙ্করবাবুকে চেনেন। তাই অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি অপূর্ববাবুর সাহায্যে বেলার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কে এই শঙ্করবাবু? বেলার সহিত তাহার পরিচয় কবে হইতে এবং কি সূত্রে—প্রিয়বাবু কিছুই জানেন না। অপূর্ববাবুও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রিয়বাবু যদি বেলাকে ভাল করিয়া না চিনিতেন, তাহা হইলে এই অজ্ঞাত শঙ্করবাবুর সহিত তাঁহাকে জড়াইয়া একটা সস্তাগোছের নাটকীয় পরিকল্পনা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু বেলাকে তিনি ভাল করিয়াই চেনেন। তাঁহার অসীম অহঙ্কার এবং পুরুষ-জাতির প্রতি অসীম অবজ্ঞার কথা প্রিয়বাবুর অপেক্ষা বেশি আর কে জানে! সুলভ উচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খাইবার মত প্রকৃতি বেলার নয়।

হালকা ফুলটির মত তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবেন, কিন্তু সহজে ডুবিবেন না। ডুবিলে এতদিন ডুবিয়া যাইতেন। তরঙ্গও অনেক আসিয়াছিল এবং উচ্ছ্বাসেরও অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বেলাকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেলার এই পদ্মপত্রজাতীয় অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য প্রিয়বাবু মুখে অনেক চটাচটি করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি এইজন্যই বেলাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং ভয়ও করেন। বেলার দুর্দমনীয় স্বভাব প্রিয়বাবুর অনেক উৎকণ্ঠার ও নানারূপ অসুবিধার কারণ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সেই দুর্দমনীয় ব্যক্তিটি যখন তাঁহার সমস্ত একগুঁয়েমি লইয়া সহসা সরিয়া গেলেন, তখন প্রিয়বাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বেলাবিহীন তাঁহার জীবন মস্তবড় একটা নিরর্থক শূন্যতা। বেলা ব্যতীত অপর কেহই সে শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারে না। সেদিন রাগের মাথায় তিনি বলিয়াছিলেন বটে যে, বেলার জন্যই তিনি বিবাহ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু কথাটা যে কত বড় মিথ্যা, তাহা এখন তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন। বস্তুত বিবাহ করিবার কোন কল্পনাই তাঁহার মাথায় নাই। প্রিয়বাবু বর্তমান যুগের সুবিধাবাদী সেই যুবকগোষ্ঠীর একজন, যাহারা নানা অজুহাতে নিজেরা বিবাহ করে না, কিন্তু যাহারা নিজেদের ভগ্নীদের বিবাহ দিবার জন্য সর্বদাই সমুৎসুক—অর্থাৎ নিজেরাই শুধু যে কোন দায়িত্ব লইতে চাহে না তাহা নয়, নিজেদের বিবাহযোগ্যা ভগিনী অথবা অন্য কোন পোষ্যার দায়িত্বভারও ভদ্রভাবে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। বর্তমান সমাজের শিথিল বিধি-ব্যবস্থার কল্যাণে অবিবাহিত থাকিলেও ইহাদের চলিয়া যায় এবং বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়সাধ্য বিলাসপ্রবণতার স্রোতে কোনক্রমে ভাসিয়া থাকিবার মত সামান্য কিছু হয়তো ইহারা উপার্জন করে, কিন্তু সে উপার্জন সপরিবারে বিলাসের স্রোতে ভাসিবার মত সুপ্রচুর

নহে। বিলাস বর্জন করিয়া জীবনের বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিতে ইহারা অনিচ্ছুক। যতটা সম্ভব হালকাভাবে এবং ভালভাবে ভাসিয়া থাকিতে পারাটাই ইহাদের লক্ষ্য; ঝামেলা জুটাইয়া নিজেদের ভারাক্রান্ত করিতে ইহারা চাহে না, পারেও না। সুতরাং প্রিয়বাবুর বিবাহ করিবার কোনরূপ কল্পনাই ছিল না। সেদিন শুধু রাগের মাথায় আর কোন যুক্তি না পাইয়া এই মিথ্যা কথাটাকে তিনি জোর গলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য এখন মনে মনে তাঁহার অনুতাপের অন্ত নাই। বেলা চলিয়া যাওয়াতে আর একটা কথাও তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন ধরিয়া বেলাকে স্কন্ধ হইতে নামাইবার বহুপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন যে, সে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন প্রথা-অনুযায়ী। আজ বেলার অনুপস্থিতিতে তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন যে, বেলাকে ছাড়িয়া তিনি একদণ্ড থাকিতে পারিবেন না। সে মুখরা দুর্বিনীতা বোনটিকে তাঁহার চাই, সে তাঁহার জীবনের যে অংশটি জুড়িয়া বসিয়া ছিল, সেখানে আর কাহাকেও বসানো চলিবে না। যে তীক্ষ্ণ দন্তটি সুযোগ পাইলেই কুট করিয়া জিহ্বাকে কামড়াইয়া দিত, সেই তীক্ষ্ণ দন্তটির অন্তর্ধানে জিহ্বা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সেই শূন্য স্থানটায় বারম্বার ডগাটুকু বাড়াইয়া আকুল হইয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

সেদিন শঙ্করবাবু লোকটিকে তো তেমন খারাপ বলিয়া মনে হইল না। রাস্তায় অবশ্য দুই মিনিটের জন্য দেখা, কিন্তু ওই দুই মিনিটেই তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে। ভদ্রলোকের চোখে মুখে কি যেন একটা ব্যঞ্জনা আছে, যাহা আকৃষ্ট করে। শঙ্করবাবুর নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া প্রফেসার গুপ্তের নিকটও প্রিয়বাবু গিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তের আচার-ব্যবহারেও নিছক ভদ্রতা

ছাড়া আর কোন কিছু পান নাই। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহাকে বাগবাজারের বাসার ঠিকানা তো দিলেনই, আশ্বাসও দিলেন যে, তিনি মিস মল্লিককে বুঝাইয়া বলিবেন যেন তিনি এই সামান্য কলহটা মিটাইয়া ফেলেন। প্রফেসার গুপ্তের নিকট হইতে প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংবাদ পাইয়া কিন্তু আতঙ্কিত হইলেন। প্রথম, বেলা আরও দুইটি টিউশনি যোগাড় করিয়াছেন, বর্তমানে তাঁহার মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা; এবং দ্বিতীয়, তিনি একটি বলিষ্ঠ ভোজপুরী দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই দারোয়ানকে অতিক্রম না করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করা যাইবে না। দারোয়ান-প্রসঙ্গে প্রফেসার গুপ্ত যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই।—দারোয়ানটি বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ। খুব বিশ্বাসী। এককালে মিলিটারিতে ছিল, এখন পেন্‌শন পাইতেছে। প্রফেসার গুপ্ত তাহাকে কিছুদিন পূর্বে রাখিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তই বেলাকে দারোয়ানটি যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। দারোয়ান বেলাকে 'বেটী' সম্বোধন করিয়াছে এবং নামমাত্র বেতন লইয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। যোগাযোগ অতি সুন্দর হইয়াছে। জনার্দন সিংহের বয়স ষাটের কাছাকাছি। একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেটিও কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে। দেশে ফিরিবার আর তাহার ইচ্ছা ছিল না। বাকি জিন্দ্‌গীটা সে কলিকাতা শহরেই 'বিতাইয়া' দিতে অর্থাৎ অতিবাহিত করিতে চায়। সে পেন্‌শন যাহা পায় তাহাতে তাহার খাওয়া-পরাটা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু বাড়িভাড়া করিতে গেলে সঙ্কুলান হয় না। প্রফেসার গুপ্তের ওখানে সে আনন্দেই ছিল, কিন্তু মুখরা মাঈজীর অত্যাচারে সে টিকিতে পারে নাই। কোথাও মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই পাইলেই তাহার চলে, সামান্য কিছু বেতন পাইলে আরও ভাল, কিন্তু স-সম্মানে সে থাকিতে চায়। 'ছোটা বাত' বলিয়া কেহ তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিলে সে সহ্য

করিতে পারিবে না। সুতরাং বেলার সহিত তাহার বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। অতবড় বাসাটায় বেলার পক্ষে একা থাকা শক্ত এবং জনার্দনের পক্ষেও এমন একটা বাসা পাওয়া শক্ত। জনার্দন বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, স্নেহশীল। বেলাকে সে প্রকৃতই বেটীর ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সমস্ত শুনিয়া প্রিয়বাবুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, ভোজপুরী জনার্দন হয়তো তাঁহাকে ভিতরে যাইতেই দিবে না। অবশ্য জনার্দন না থাকিলেও যে প্রিয়বাবু নিঃশঙ্কচিত্তে যাইতে পারিতেন তাহা নয়, কিন্তু জনার্দন্ থাকাতে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। বাড়িটার আশেপাশে আনাচে-কানাচে প্রিয়বাবু দুই-একদিন সঙ্গোপনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার মত সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, অপূর্ববাবুকে দূত করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিতে হইবে। বেলার জিনিসপত্র এস্রাজ সেতার কাপড়-চোপড় অপূর্ববাবুর মারফৎ বেলার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বেলার মনোভাবটা প্রথমে বুঝিতে হইবে। তাহার পর দেখা যাইবে। অপূর্ববাবুকে বেলা নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন না।

রবিবার সকালে গাড়ির মাথায় জিনিসপত্র লইয়া অপূর্ববাবু বেলা দেবীর বাসার দরজায় আসিয়া নামিলেন। দরজা খোলা ছিল, ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় জনার্দন সিং বাহির হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, জেরাসে ঠহর যাইয়ে বাবুসাহেব।

জনার্দন সিংহের বিশাল বলিষ্ঠ শরীর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অপূর্ববাবু একটু ভড়কাইয়া গেলেন। মুখখানা সত্যই যেন সিংহের মত। মোচার মত কাঁচাপাকা একজোড়া গোঁফ মহিষের শিঙের মত যেন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। বলিষ্ঠ চোয়াল, মাংসল নাক এবং তীক্ষ্ণচক্ষুসম্পন্ন জনার্দন সিং কিন্তু যথোচিত বিনয়সহকারেই প্রশ্ন করিল।

কেয়া মাংতে হেঁ আপ্ হুজুর ?

থতমত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, মিস মল্লিকের জিনিসপত্রগুলো এনেছি। মাঈজী কাঁহা ?

মাঈজী অন্দরমে হেঁ। আপ জেরিসে ঠহর যাইয়ে, হাম তুরন্ত্ খবর দে দেতে হেঁ। হুজুরকা নাম ?

অপূর্ববাবু।

অপূরববাবু।

জনার্দন ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক পরেই বেলা দেবী নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন।

ও, আপনি এসেছেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। গাড়ির মাথায় ওসব কি ?

গলা-খাঁকারি দিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, আপনারই জিনিসপত্রগুলো, অর্থাৎ প্রিয়বাবুর সিচুয়েশনটা একটু, আমাকে তাই রিকোয়েস্ট্ করলেন—

অপূর্ববাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেটি মুখের সামনে ধরিয়া বার দুই কাসিলেন।

বেলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। চক্ষু পুনরায় হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলেন, আচ্ছা বেশ, নামাতে বলুন তা হ'লে ওগুলো।

জনার্দন সিং নিকটেই ছিল, বলিল, আপ লোক ভিতর যাইয়ে, হাম কুল্ বন্দোবস্ত্ কর্ দেতে হেঁ।

অপূর্ববাবু ও বেলা ভিতরে গেলেন।

অপূর্ববাবু দেখিলেন, ইহারই মধ্যে একখানি ঘর বেশ সুন্দরভাবে বেলা দেবী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পাশের একটি ঘরে ইক্‌মিকে রান্না হইতেছে। বেলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কোনরকমে মাথা

গোঁজবার একটা জায়গা যোগাড় করেছি। আমার সবচেয়ে দুঃখ ঐইটে যে, আপনাকে ছাড়তে হ'ল। আমার আর একটা টিউশনি যোগাড় হ'লেই আবার আপনাকে খবর দেব আমি। আরও শিখতে চাই।

অপূর্ববাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

টাকার কথা পেড়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না, মানে, আপনার যদি দরকার হয়, এমনিই এসে আমি— মানে, সন্ধ্যাবেলাটা ফ্রীও আছি আজকাল—

সন্ধ্যাবেলা আমি যে ফ্রী নেই। তা ছাড়া বিনা পয়সায় আপনাকে আমি খাটাব কেন, বাঃ!

না না, তার জন্যে কি হয়েছে? পয়সাটাকেই সব সময়ে প্রমিনেন্স্ দেওয়াটা—অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু গলা-খাঁকারি দিয়া নীরব হইলেন।

চা খাবেন এক কাপ?

বেশ তো, যদি আপনার অসুবিধে না হয়।

না, অসুবিধে আবার কিসের?

বেলা নূতন প্রাইমাস স্টোভটি জ্বালিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে, বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে লাগিল এবং উপরের দাঁত কয়টি অধরকে দংশন করিতে লাগিল। অপূর্ববাবু নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। নিতান্ত নীরবতার মধ্যেই চা-প্রস্তুত-পর্ব শেষ হইল। চা পান করিতে করিতে অপূর্ববাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলাকে বিনা পয়সায় পড়াইলেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না—এই কথাটি ঠিক কি ভাবে বলিলে বেলার পক্ষে কন্‌ভিন্‌সিং হইবে, অর্থাৎ—

আপনি যাবার সময় একখানা চিঠি নিয়ে যাবেন, দাদাকে দেব। আপনি চা খান ততক্ষণ, আমি লিখে নিয়ে আসি ওঘর থেকে।

বেলা দেবী পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নিজের ছোট কিন্তু সুন্দর করিয়া সাজানো টেবিলটির উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর লিখিলেন—

দাদা,

অপূর্ববাবুর কাছে তোমাকে খাটো করবার ইচ্ছে হ'ল না ব'লেই জিনিসগুলো ফেরত দিলাম না। কিন্তু ওগুলো আমি ব্যবহার করতে পারব না, ওসব প'ড়ে থাকবে। নূতন বউদিদির যদি গান-বাজনার শখ থাকে, এস্রাজ আর সেতারটা কাজে লাগতে পারে হয়তো। আমি ভদ্রভাবে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা পেয়েছি, আমার জন্যে অনর্থক ভেবে তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমার একটা পেট চ'লে যাবেই। ইতি—

প্রণতা বেলা

খামে মুড়িয়া পত্রখানি অপূর্ববাবুর হাতে আনিয়া দিতেই একটু ইতস্তত করিয়া রুমাল দিয়া বারকয়েক ঘাড় মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বসিয়া থাকিবার আর তো কোন সঙ্গত অজুহাত নাই!

মিস মল্লিক, গানের জন্যে আমাকে যদি আপনার দরকার হয়, তা হ'লে আন্‌হেজিটেটিংলি, মানে—

আচ্ছা, দরকার হ'লে খবর দেব।

নমস্কার করিয়া অপূর্ববাবু বাহির হইয়া পড়িলেন।

একটু পরেই প্রফেসার গুপ্তের মোটরখানা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসার গুপ্ত জনার্দন সিংয়ের পুরাতন মনিব। সুতরাং সে সেলাম করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। প্রফেসার গুপ্ত মোটর হইতে নামিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, মাঈজীকে একটু খবর দাও।

জনার্দন ভিতরে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপ্ জেরাসে ঠহর যাইয়ে হুজুর, মাঈজী আস্নান কর্ রহি হয়।

প্রফেসার গুপ্ত বাহিরের ঘরটিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বেলার এখানে এখন আসিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই আকর্ষণ বেশি। প্রয়োজনীয় কত জিনিসই তো করিবার আছে, কিন্তু করা হয় নাই। বেলার সহিত দেখা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, দেখা করাটাই প্রয়োজন। বাড়িতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত খিটখিটে প্রৌঢ়া গৃহিণীর নানারূপ গঞ্জনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলাইয়া বেড়ানোটাই প্রফেসার গুপ্তের স্বভাব। তিনি পারতপক্ষে বাড়িতে থাকেন না। খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিস লইয়া কচকচি তাঁহার ভালই লাগে না। সুযোগ পাইলেই মোটরখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সম্প্রতি বেলার বাসাটি তাঁহার আড্ডা দিবার স্থান হইয়াছে। বেলা মেয়েটিকে এখনও কিন্তু তিনি বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেয়েটি কেমন যেন একটু রহস্যময়। কেমন যেন একটা স্বচ্ছ অথচ দুর্ভেদ্য আবরণের অন্তরালে বাস করেন। তাঁহার লীলা-চঞ্চল সজীবতা, উচ্ছল যৌবন-ভঙ্গিমা, পরিহাস-মধুর কথাবার্তা মনকে উতলা করিয়া তোলে, কিন্তু হাত বাড়াইলেই কোথায় যেন ঠেকিয়া যায়। ব্যবধানটা ঠিক যেন কাচের প্রাচীর, স্বচ্ছ অথচ শক্ত। সব দেখা যায়, কিন্তু অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সেইজন্যই বোধ হয় মনকে আরও লোলুপ করিয়া তোলে। প্রফেসার গুপ্ত এখনও ঠিক লোলুপ হইয়া উঠেন নাই, কিন্তু মনে মনে অতিশয় ঔৎসুক্যভরে তিনি এই তরুণীটিকে লক্ষ্য করিতেছেন। বেলার শুধু যে তারুণ্য আছে তাহা নয়, বৈশিষ্ট্যও আছে।

স্নান সমাপন করিয়া বেলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আপনি এমন সময় হঠাৎ যে আজ?

প্রফেসার গুপ্ত কয়েক সেকেণ্ড কোন উত্তরই দিলেন না, চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন।

হঠাৎ? আজকের আসাটাকে 'হঠাৎ' ব'লে মনে হ'ল যে হঠাৎ?

এমন সময় আর কোনদিন আসেন না তো?

আজ রবিবার, ছুটি আছে। নিছক গল্প করতেই শুধু আসি নি, কাজের কথাও আছে। অচিনবাবু ব'লে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনি কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ ক'রে দিন।

কথাবার্তা বিশেষ চালাই নি, একটা শুধু দরখাস্ত করেছি।

ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না, খবর পেলাম, লোকটা সুবিধের নয়।

তাই নাকি?

প্রশ্ন করিয়া বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমাকে এখুনি এক জায়গায় বেরোতে হবে।

বেশ, ও-বেলা আসা যাবে, আমারও একটা কাজ আছে গড়পারের দিকে, সেরে ফেলি সেটা। আপনি কোন্ দিকে যাবেন? ওই দিকে হয় তো, আসুন, আপনাকে একটা লিফ্‌ট দিয়ে যাই।

না, ওদিকে নয়, আমি যাব ভবানীপুরের দিকে। আপনি যান।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলেন।

বেলা কোথাও গেলেন না, কারণ তাঁহার কোথাও যাইবার প্রয়োজন ছিল না।

৩৪

প্রোটোটাইপ ওরফে লক্ষ্মণবাবু অত্যন্ত উন্মনা হইয়া গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার জীবনের প্রথম প্রেম যে স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা সহসা বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বেলা শুধু যে

তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ প্রিয়বাবুকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয়। ভদ্রলোক কেমন যেন এক রকম হইয়া গিয়াছেন। বেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন অর্থহীনভাবে চাহিয়া থাকেন এবং শেষে অসম্ভব রকম একটা উত্তর দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। লক্ষ্মণবাবু দুইবার প্রশ্ন করিয়া দুই রকম উত্তর পাইয়াছে। প্রিয়বাবু প্রথমবার বলিয়াছিলেন যে, বেলা মামার বাড়ি গিয়াছেন, দুই-চারি দিন পরেই ফিরিয়া আসিবেন। দুই-চারি দিন পরে বেলা যখন আসিলেন না, তখন লক্ষ্মণবাবু অতিশয় সঙ্কোচভরে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছে, তাহা মর্মান্তিক। অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে প্রিয়বাবু বলিয়াছিলেন, আপনাদের পাঁচজনের জন্যেই তো সে চ'লে গেল। সে ঠিক করেছে, চাকরি ক'রে স্বাধীনভাবে থাকবে।

আমাদের জন্যে ?

প্রিয়বাবু কোন উত্তর না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু সেই হইতে কথাটা চিন্তা করিতেছে। তাহার নিজের মনেও ক্রমশ সন্দেহটা দৃঢ়তর হইতেছে। বেলা হয়তো উত্ত্যক্ত হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। এ কথা তো সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না যে, বেলাকে একবার দেখিবার জন্য, তাঁহার গান শুনিবার জন্য সে নানা ছুতায় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইত। কোন অজুহাতে বেলার সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। হয়তো তাহার এই মনোযোগ বেলার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; হয়তো তাহার এই কাঙালপনার জন্য বেলা মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করিতেন। লুব্ধ ভিখারীকে এড়াইবার জন্য লোকে যেমন সরিয়া যায়, বেলাও হয়তো তেমনই তাহার পথ হইতে সরিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আলোকিত চৌরঙ্গীর বিচিত্র সৌন্দর্য, দ্রুতগামী অসংখ্য মোটর, নানা বেশে সজ্জিত চঞ্চল জনতা, সমস্ত যেন তাহার নিকট নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। মনের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার মানদণ্ডটি সহসা যেন বিকল হইয়া গিয়াছে। মনে পড়িল, সেবার যখন অনার্স পাইল না, তখনও মনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। সে পড়াশোনায় অবহেলা করে নাই, দিনরাত্রি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিল, অথচ অনার্স পাইল না। কোন আশাই তো জীবনে তাহার পূর্ণ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এম. এ.টা ভাল করিয়া পাস করিয়া অন্তত একটা ফার্স্ট-ক্লাস অর্জন করিয়া অনার্স না পাওয়ার ক্ষোভটা দূর করিতে হইবে। কিন্তু বাবা তাহাতে বাদ সাধিলেন। বলিলেন, আর পড়াশোনা করিয়া কাজ নাই, দোকান দেখ গিয়া। পিতার অবাধ্য হইবার মত শিক্ষা অথবা যোগ্যতা লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। পিতার আদেশ মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই রূঢ় আঘাতটা কম বেদনাদায়ক হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর এম. এ. হইয়া কোন কলেজের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিবার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা ভাঙা সাইকেলের দোকানের ময়লা চটের উপর বসিয়া ফাটা টিউব-টায়ার মেরামত করিতে লাগিয়া যাওয়া লক্ষ্মণবাবুর পক্ষে মোটেই রুচিকর হয় নাই। কিন্তু বিপত্নীক পিতার মনে কষ্ট দিবার সাধ্য লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়াছেন, দাদাও সেদিন মারা গেলেন, বাবার মনে একটুও শান্তি নাই। দোকান দেখিবার মত মনের অবস্থা নয়। তাঁহাকে এ অবস্থায় সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়াই লক্ষ্মণবাবু দোকানে বসিতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু কই, দোকানে বসিয়াও সে বাবাকে সুখী করিতে পারিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না! বাবা রোজই তাহাকে অকর্মণ্য বলিয়া গালাগালি দেন, উপহাস করেন। শেষে নিজেই পুনরায় দোকানে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সামান্য একটা সাইকেলের দোকানের ভার লইবার মত যোগ্যতাও তাহার নাই? সত্যই নাই। অনর্গল মিথ্যা সে বলিতে পারে না, অথচ সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইলে যে চরিত্রবল থাকা প্রয়োজন, তাহারও অভাব। সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য নিজের আদর্শ খর্ব করিয়াছে। কিন্তু পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। জীবনের জন্মলগ্নে বসিয়া কোন্ দুষ্টগ্রহ যে জীবনটাকে ছারখার করিয়া দিতেছে, তাহা জানিয়াও তো লাভ নাই। বক্‌শি মহাশয়কে দিয়া গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইয়া কি লাভ হইয়াছে? কিছু যে হইবে না, তাহা অবশ্য বক্‌শি মহাশয় বলিয়াছিলেন। বক্‌শি মহাশয়ের কথাগুলা লক্ষ্মণবাবুর মনে পড়িতে লাগিল—কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করলেই যদি রুষ্টগ্রহ তুষ্ট হ'ত, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভবপর হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। আপনারাও নাছোড়, আমরাও টাকার দরকার—তাই এইসব প্রহসনের অভিনয় করতে হয়।

অদ্ভুত লোক ওই বক্‌শি। স্বস্ত্যয়ন করিয়া কিছু তো হয় নাই। সহসা মৃতা জননীর মুখখানা লক্ষ্মণবাবুর মনে পড়িল। তিনি সর্বদাই যেন সঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। ব্রত, উপবাস, আচার, নিয়ম করিয়া তিনি আজীবন শঙ্কিতচিত্তে সকলের মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা যে আবার বিবাহ করিয়া মায়ের স্মৃতিকে লাঞ্ছিত করেন নাই, এইজন্যই সে পিতার প্রতি এতকাল শ্রদ্ধাবান ছিল এবং তাহার গৌরবহীন আদর্শচ্যুত জীবনে পিতার পত্নী-নিষ্ঠাই একমাত্র জিনিস ছিল যাহা গৌরব করিবার মত। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণবাবু নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছে, প্রতি সন্ধ্যায় পিতা তাহাকে বসাইয়া যেখানে যান, তাহা ভদ্রপল্লী নহে। সেখানে তাঁহার একজন রক্ষিতা আছে। লক্ষ্মণবাবুর জীবনে গৌরব

করিবার মত আর কিছু রহিল না। সমস্ত জীবনটা একটা ভাঙা সাইকেলের দোকানে ময়লা চটের উপর বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার সাধ্বী মাতাকে প্রত্যহ এতবার অপমান করিতেছে, তাহারই খোশামোদ করিয়া, তাহারই সঞ্চিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে নিজেকে ধন্য মনে করিতে হইবে। তাহার পর হয়তো কালক্রমে এক অপরিচিতা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া বেলার স্মৃতি সুগোপনে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার সহিত আজীবন প্রেমের ভান করিতে হইবে। দিব্যচক্ষে লক্ষ্মণবাবু তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের এই সম্ভাব্য আলেখ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। চৌরঙ্গীর প্রতি সৌধশীর্ষে নানাবর্ণের আলো জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—আবার জ্বলিতেছে। সম্মুখের পিচ-ঢালা চকচকে রাস্তা দিয়া বিচিত্র আকারের কত মোটর আসিতেছে, যাইতেছে। জনতার স্রোত নির্বিকার সমারোহে বহিয়া চলিয়াছে।

নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্মণবাবু মানবনির্মিত পথের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের দিকে চাহিল না। চাহিলে দেখিতে পাইত, অন্ধকার মহাশূন্য ; কেবল অন্ধকারই নহে, সেখানে জ্যোতিষ্কও আছে।

৩৫

প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাসের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর শঙ্কর যখন হস্টেলে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন। কিন্তু সমস্ত অবসাদ মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল—যখন সে দেখিল, মিষ্টিদিদির বালক-ভৃত্যটি তাহার জন্য একটি পত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লইয়া সে খুলিতে গিয়া থামিয়া গেল। যদি দুঃসংবাদ থাকে ? যদি মিষ্টিদিদি লিখিয়া থাকেন যে, বিবাহ হওয়া অসম্ভব ? তখন সে কি করিবে ? আর যাহাই করুক, প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আর যাওয়া

চলিবে না। রিনির সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতে হইবে। এই নিদারুণ পরিণতির কথা মনে হওয়া মাত্র শঙ্করের চতুর্দিকে অন্ধকার নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, কেন সে মিষ্টিদিদিকে এসব কথা বলিতে গেল? যেমন চলিতেছিল, আরও কিছুকাল তেমনই ভাবেই না হয় চলিত। আরও কিছুকাল রিনির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহার মনের কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া তাহার পর কথাটা প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত জিনিসটাকে এমনভাবে আবিল করিয়া তোলা ঠিক হয় নাই। পত্রখানা হাতে করিয়া শঙ্কর স্পন্দিতবক্ষে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাও অসম্ভব। পত্রটি খুলিতে হইল।—

শঙ্করবাবু,

সুসংবাদ আছে। আমাদের দিক থেকে কোন আপত্তি উঠবে না। আপনি আপনার দিকটা সামলান। অনেক কথা আছে, যা চিঠিতে লেখা ঠিক নয়। আপনি যদি আসেন আজ একবার, বড় ভাল হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা। সোনা দিল্লীতে তার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। আপনি সেদিন সেই দুপুরে এসেছিলেন, তার পরদিনই সন্ধ্যের ট্রেনে সোনা চ'লে গেল। অনেক অনুরোধ করলাম, কিছুতেই থাকল না। কি যে তার হ'ল, জানি না। আপনি আজ সন্ধ্যের সময় নিশ্চয় আসবেন। আমি ঘটকালি করছি, আমার কিছু মজুরি চাই, অমনই ছাড়ছি না। আসবেন নিশ্চয়ই। —মিষ্টিদি

একবার নয়, বার বার শঙ্কর পত্রখানি পড়িল। নিজের উত্তেজনার আতিশয্যে সোনাদিদির অকস্মাৎ দিল্লী চলিয়া যাওয়ার কোন বিশেষ অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। বরং তাহার মনে হইল, বিবাহের সময় সোনাদিদিকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর সে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি গিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি ছাড়া

বাড়িতে আর কেহ নাই। মিষ্টিদিদিও আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন না, তিনি স্নান করিতেছিলেন। সেই বালক-ভৃত্যটি আসিয়া তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল এবং বলিল যে, মাঈজী এখনই আসিতেছেন, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহার নজরে পড়িল—টেবিলের উপর কি একখানা বই রহিয়াছে। বইখানা টানিয়া লইয়া দেখিল, জেম্‌স জয়েসের 'ইউলিসিস'। বইটার নাম শুনিয়াছিল, পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। পিছনে এক জায়গায় পেজ মার্ক দেওয়া ছিল, সেখানে তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল; এবং কখন যে সে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীর স্রোতে তলাইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি সামনে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ফিকে সবুজ রঙের অদ্ভুত পাতলা একটা শাড়ি তাঁহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শঙ্কর চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়াছে!

মিষ্টিদিদিই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

খুব চটছেন তো একা ব'সে ব'সে? কি বই ওখানা, দেখি? ও, 'ইউলিসিস'! যা-তা সব গাঁজাখুরি গল্প। অমন আবার নাকি হয়? কেন যে বইখানার অত নাম, আপনারাই বলতে পারবেন। আপনারা সাহিত্যিক মানুষ।

একটু হাসি গোপন করিয়া মিষ্টিদিদি সম্মুখের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন ও শঙ্করের হাত হইতে বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রশ্ন করিলেন, পড়েছেন বইটা?

না।

নিয়ে যান তা হ'লে। অনেক খবর পাবেন। এইবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এসব খবর জানাও দরকার এখন আপনার।

শঙ্কর একটু হাসিল।

মিষ্টিদিদি তাহা দেখিয়া ছদ্ম-কোপ-কটাক্ষে হাস্য-বর্ষণ করিয়া বলিলেন, হাসছেন যে বড়? অনেক কিছু শিখতে হবে এবার। নারী নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিস, আর তাকে বিয়ে ক'রে সুখী করা আর এক জিনিস।—বলিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে বইখানি মুড়িয়া সেটি শঙ্করের হাতে তুলিয়া দিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিই বলুন না, মেয়েরা কিসে সুখী হয়? অত বড় বই পড়বার দরকার কি? আপনি তো পড়েছেন বইখানা, নিজের অভিজ্ঞতাও আছে কিছু—

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এসব ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খেলে কিছু হয় না। নিজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও টেবিলের উপর সেগুলি রাখিল। সে-ই চা ছাঁকিতে যাইতেছিল; মিষ্টিদিদি বলিলেন, আমিই ছাঁকছি, তুই নীচেয় যা, সায়েব হয়তো এখুনি আসবেন।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রফেসার মিত্র আসবেন কখন? কোথা গেছেন তিনি?

একটু বিরক্তকণ্ঠে মিষ্টিদিদি বলিলেন, কলেজ, মীটিং, ডিনার, লেক্‌চার, শেলি, শেক্সপীয়ার—এই সব নিয়েই আছেন উনি, আর কারও দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই ওঁর। একটা মানুষের চেয়ে বইয়ের আলমারিটা ওঁর কাছে বেশি দরকারী।

মিষ্টিদিদি চা ছাঁকিতে লাগিলেন।

রিনি কোথা?

শঙ্কর অবশেষে মরিয়া হইয়া প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল। এতক্ষণ সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল।

রিনি? আপনি আসবেন শুনেই সে পালিয়েছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, যা লাজুক মেয়ে, দেখবেন, ওর লজ্জা ভাঙাতেই এক যুগ কাটবে আপনার।

ইহার উত্তরেও শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শঙ্করকে এক কাপ চা ও এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি জোলা পড়েছেন?

না।

মোপাসাঁ?

না।

কি পড়েছেন তা হ'লে?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

মিষ্টিদিদি নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভারতচন্দ্র?

না, এখনও পড়ি নি।

মিষ্টিদিদি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, নিতান্ত শিশু আপনি। ফীডিং-বট্‌লে দুধ খাবার অবস্থা পার হয় নি এখনও আপনার। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'ঘরে বাইরে' পড়েছেন তো?

পড়েছি।

কেমন লেগেছে?

অতি চমৎকার।

বিমলার ওপর রাগ হয় নি তো আপনার?

না।

'নষ্টনীড়ে'র বউদিদির ওপরেও তো চটেন নি!

চটব কেন? কি যে বলেন আপনি!

মিষ্টিদিদি আর কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে চা-টুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর তখনও চা পান করে নাই, খাবারগুলি খাইতেছিল। মিষ্টি-দিদি বলিলেন, চা খান, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরও খাবার আনতে বলি? প্যাটিগুলো কেমন হয়েছে? আরও আসুক দুখানা, কি বলেন?

আসুক।

মিষ্টিদিদি ঘণ্টা বাজাইলেন ও বলিলেন, গরম চাও একটু আনতে বলি, এ চা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয়।

হাত দিয়া শঙ্করের কাপের উত্তাপ অনুভব করিয়া মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, এ তো একেবারে হিম।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল ও আদেশ লইয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর শেষ প্যাটিখানিতে কামড় দিয়া বলিল, সুন্দর হয়েছে প্যাটিগুলো।

মাথা নাড়িয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আসলে আপনার খিদে পেয়েছে খুব।

খিদে পাবে না? সেই কখন কলেজ থেকে ফিরে মাত্র খানছয়েক লুচি খেয়েছি।

বুঝেছি, আপনার খিদে একটু বেশি। চেহারা দেখলেই তা মনে হয়।

চেহারা দেখে খিদে বোঝা যায়? আপনি ফিজিওনমিও চর্চা করেন নাকি?

তা একটু একটু করি বইকি। আপনার পুরু পুরু ঠোঁট দুটো দেখলেই মনে হয়, ভয়ানক লোভী আপনি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বেয়ারা আরও প্যাটি ও গরম চা দিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, এ প্যাটি কি আপনার বাবুর্চি তৈরি করেছে? চমৎকার করেছে কিন্তু।

আমি করেছি, সোনার কাছে শিখেছিলাম।

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি, সোনাদি হঠাৎ চ'লে গেলেন কেন বলুন তো?

মিষ্টিদিদি ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, কি ক'রে বলব বলুন? আপনিও সেদিন দুপুরে চ'লে গেলেন, সোনাও বাক্স গোছাতে বসল, পরদিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চ'লে গেল। এত ক'রে থাকতে বললুম, কিছুতেই রইল না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, স্বামীকে ছেড়ে আছেও তো অনেকদিন, দোষও দেওয়া যায় না বেচারাকে।

মিষ্টিদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। শঙ্কর প্যাটি ও চা লইয়া ব্যস্ত ছিল, হাসিটুকু দেখিতে পাইল না। হঠাৎ মিষ্টিদিদি বলিলেন, মোপাসাঁর Une Vie পড়েন নি, না?

না।

পড়ুন তা হ'লে। পড়া উচিত আপনার, আমার প্রাইভেট লাইব্রেরিতে আছে বইখানা, দাঁড়ান দিচ্ছি, এই ঘরেই আছে।

ঘরের কোণে একটা আলমারি ছিল, তাহার কপাটগুলাও কাঠের, কাচ নাই। মিষ্টিদিদি উঠিয়া সেই আলমারিটা খুলিয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। শঙ্কর দেখিল, আলমারিতে এক-আধখানা নয়, বহু পুস্তক রহিয়াছে। বই দেখিলেই শঙ্কর কেমন যেন প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। পড়ুক আর নাই পড়ুক, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। সে চা-টুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া মিষ্টিদিদির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টিদিদির পাতলা ফিকা সবুজ শাড়িটার উপর ইলেক্‌ট্রিক

আলো পড়িয়া শঙ্করের মনে কেমন যেন একটা অপরূপ মোহ সৃজন করিতেছিল। মিষ্টিদিদি হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছিলেন।

এই নীচের তাকেই কোথায় যে রেখেছি, মনেও থাকে না ছাই।

শঙ্কর উপরের তাক হইতে মোটা চামড়া-দিয়া-বাঁধানো একখানা বই লইয়া খুলিয়া দেখিতে গেল বইখানা কি, খুলিয়াই কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্য গতিহীন হইয়া আবার উন্মাদবেগে বহিতে লাগিল। বই নয়, ফোটো-অ্যাল্‌বাম। এসব কি ফোটো? শঙ্করের সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। মিষ্টিদিদি আর একটু হেঁট হইয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় শঙ্কর অ্যাল্‌বামটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মিষ্টিদিদি দেখিয়া ফেলেন নাই তো? কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া হোক, ফোটোগুলি আর একবার দেখিতে হইবে। মিষ্টিদিদির পানে সে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি তেমনই হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছেন। ফিকা সবুজ পাতলা শাড়িটার উপর প্রখর বৈদ্যুতিক আলো পড়িয়াছে। স্পন্দিতবক্ষে শঙ্কর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

না, এ ঘরে নেই দেখছি। দাঁড়ান, নীচে আছে বোধ হয়, দেখে আসি। একটুখানি বসুন আপনি, বেশি দেরি হবে না আমার।

মধুর হাসিয়া মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। আলমারি খোলাই রহিল। সন্তর্পণে শঙ্কর চোরের মত উঠিয়া গিয়া অ্যাল্‌বামটি বাহির করিয়া ফোটোগুলি দেখিতে লাগিল, রোগী যেমন করিয়া আচার চুরি করিয়া খায়।

...হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ। শঙ্কর তাড়াতাড়ি অ্যাল্‌বামটি যথাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মিষ্টিদিদি নয়, রিনি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে

দাঁড়াইল। শঙ্করকে দেখিয়া একটু সলজ্জ অথচ গম্ভীর হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি সে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টিদিদিও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রিনি এসেছে, দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে? কি লজ্জা মেয়ের, কিছুতে ওপরে আসবে না।

শঙ্কর বলিল, বইটা পেলেন?

না, বইটা নীচেতেও তো নেই। এই আলমারিটাতেই তো যেন রেখেছিলাম। দাঁড়ান, দেখি আর একবার। ওদিককার ওই সুইচটা টিপে দিন তো, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভাল।

শঙ্কর অবশ্য আলোর অভাব অনুভব করিতেছিল না, তবু আরও একটা আলো জ্বালিয়া দিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় বইখানা খুঁজিতে লাগিলেন। হয়তো আলোর অভাবেই এতক্ষণ বইখানা পাওয়া যাইতেছিল না, এইবার পাওয়া গেল।

মিষ্টিদিদি বইখানা শঙ্করের হাতে দিয়া বলিলেন, আর কাউকে দেবেন না কিন্তু। বইখানা একজন আমাকে উপহার দিয়েছিল। অনেক দাম ওর।

শঙ্কর বইটা খুলিয়া দেখিল, টকটকে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে, To sweet Ye from sweet O, নীচে প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার একটা তারিখ।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, বেচারী মারা গেছে। ওরই সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

তাই নাকি?

বইখানা পকেট পুরিয়া শঙ্কর বলিল, যত্ন ক'রে পড়ব। এখন উঠি।

এর মধ্যেই উঠবেন কি? রিনির সঙ্গে একটু গল্প করুন। কোনও কথাই হ'ল না যে!

না, অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল আসব। আজ থাক্‌।

বিয়ের কথা লিখেছিলেন বাড়িতে ?

না, এখনও লিখি নি, লিখব এবার। ওর জন্যে কিছু ভাববেন না।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার মাথার মধ্যে, মনের মধ্যে, সমস্ত শরীরের মধ্যে যাহা হইতেছিল তাহা শুধু যে অবর্ণনীয় তাহা নহে, অভূতপূর্ব। এমন উন্মাদনা তাহার জীবনে আর কখনও হয় নাই।

নেশায় টলিতে টলিতে সে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

৩৬

যদিও মৃন্ময় হাসপাতাল হইতে ভাল হইয়া বাড়িতে আসিয়াছে, তবু হাসির মনে স্বস্তি নাই। হাঁটিতে গেলে এখনও হাঁটুতে খচখচ করিয়া যখন একটু বেদনা লাগিতেছে, তখন আরও কিছুদিন বিছানায় শুইয়া থাকিয়া একেবারে সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়া উঠা-হাঁটা করিলেই তো ভাল হয়। কিন্তু মৃন্ময় কিছুতে তাহার কথা শুনিবে কি! ওই পা লইয়াই বিশ্ব জয় করিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিবেশী পরেশবাবুর বাড়িতে একটি ছেলে ডাক্তারি পাস করিয়াছে। পরেশবাবুর পিসীকে ধরিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া একটি মালিশের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন হাসি লিখাইয়া লইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, এই মালিশটি দিন-কয়েক ঘষিয়া ঘষিয়া লাগাইয়া দিলেই ওই সামান্য ব্যথাটুকু সারিয়া যাইবে। হাসি আজ তিন দিন ধরিয়া মালিশ আনাইয়া রাখিয়াছে, মৃন্ময়ের কিন্তু ফুরসৎ হইতেছে না। রোজই একটা না একটা কোন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

আজ হাসি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছে, যেমন করিয়া হউক মালিশ করিবেই। 'রাত্রে শুইবার সময় মালিশ করিয়া দিলে চলে, কিন্তু

মৃন্ময় তাহাতে কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, বিছানা নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রাণের চেয়ে বিছানা বড় হইল! অদ্ভুত লোক! অথচ দিনের বেলায় নানা কাজের ছুতায় কিছুতেই করিতে দিবে না। এমন কাজ-পাগল মানুষ হাসি আর কখনও দেখে নাই। আজ বৈকালে খাকী হাফপ্যাণ্ট-হাফশার্ট-পরা কে একটা মিনসে আসিয়াছিল, তাহার সহিত গল্প করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাহার পর তাহারই সহিত আবার বাহির হইয়া গিয়াছে। কখন যে ফিরিবে, তাহার ঠিক নাই। মাথামুড় খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে হাসির। তিন দিন ধরিয়া ওষুধটা পড়িয়া আছে, পড়িয়া পড়িয়া শেষটা হয়তো খারাপ হইয়া যাইবে। ঝাঁজ চলিয়া গেলে কখনও ফল হয়?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। চিন্ময় নিজের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

পাগলী কই রে?

যান, আমি আপনার সঙ্গে কথা কইব না। আপনি আপনার অমিয়াকে নিয়ে থাকুন গিয়ে।—বলিয়া হাসি উঠিয়া একখানা আসন পাতিয়া দিল।

হাসি চাপিতে চাপিতে আসনে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চ'লে যেতে বলছিস, আবার আসন পেতে দিলি যে?

ইহার উত্তর না দিয়া হাসি ঘসঘস করিয়া বেগুন কুটিতে লাগিল।

একটু পরে বলিল, ভারি ওঁর এক অমিয়া হয়েছেন, সেই ছুতোয় আর এদিকে মাড়ানোই হয় না! একেবারে সেইখানে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন! আমরা যেন কেউ নই!

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তোর তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, কেমন সুখে

আছিস। অমিয়া বেচারীর বিয়েটা দিয়ে দিই, থাম্। তোর তো দুঃখু নেই আর।

বিয়ে আর দিতে হবে না কারুর। বিয়ে দিয়ে ভারি স্বর্গে তুলেছেন আমাকে! এক অন্যমনস্ক দামাল দুরন্ত লোক, কখন কি যে ক'রে বসে তার ঠিক নেই; তাকে সামলাতে সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার যোগাড় হয়েছে আমার।

মুকুজ্জেমশাই কিছু না বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

হাসছেন যে বড়? থামুন, আপনার অমিয়ার সঙ্গে দেখা ক'রে একদিন ব'লে দিয়ে আসছি, সে যেন কিছুতে না বিয়ে করে। এমন পাপের ভোগ আর নেই।

হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন, কি হয়েছে তাই বল্ না?

না, ক্ষেপবে না! তিন দিন ধ'রে মালিশের ওষুধ নিয়ে ব'সে আছি, ফুরসৎই হচ্ছে না বাবুর; তারপর হাঁটু ফুলে পেকে একাকার হয়ে উঠুক, আবার তাই নিয়ে ভুগি আমি কিছুদিন।

কিসের মালিশ?

আপনি আজ যেতে পাবেন না, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে তবু। আজ মালিশ না করলে ও-ওষুধে আর ফলই হবে না! ওষুধ বেশি বাসী হয়ে গেলে কি আর ফল হয়?

আরে পাগলী, কিসের ওষুধ তাই বল্ না।

মালিশ, মালিশ। সে হাঁটুর ব্যথা এখনও সারে নি, তাই নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। মালিশের ওষুধ আনিয়ে রেখেছি সেই কবে, আজ পর্যন্ত লাগাতে পারলাম না। আজ আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, একটু বসুন, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে।

আমাকে যে এখুনি উঠতে হবে রে!

লক্ষ্মীটি, একটুখানি বসুন, এক্ষুনি এসে পড়বে ও। তামাক খাবেন? আপনার জন্যে হুঁকো কলকে তামাক টিকে সব আনিয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনারই দেখা নেই, তামাক খাবে কে? ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, নেবে এস না একবার।

চিন্ময় নামিয়া আসিল ও মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া পুলকিত হইল। আপনি কখন এলেন?

মুকুজ্জেমশাই তাহার দিকে চাহিয়া প্রথমে একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, এই এখুনি।

হাসি চিন্ময়কে বলিল, তুমি ওঁকে নিয়ে ওপরের ঘরটায় ব'স গিয়ে, আমি তামাক সেজে নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি। উনি এসেই পালাই পালাই করছেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কেন? বেশ তো ব'সে আছি।

না, এখানে বসতে হবে না, যা ঠাণ্ডা, ভিজে সপসপ করছে। আপনি ওপরেই গিয়ে বসুন।

মুকুজ্জেমশাই পুনরায় বলিলেন, তোর তরকারি কোটা হয়ে গেল?

ভারি তো তরকারি কোটা! হাতে কোন কাজ ছিল না ব'লে কাল সকালকার জন্যে কুটে রাখছিলুম।

চিন্ময় বলিল, চলুন ওপরে।

মুকুজ্জেমশাইকে উঠিতে হইল।

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হাসি উপরে আসিয়া দেখিল, বাঘ-বকরির ছক পাতিয়া মুকুজ্জেমশাই চিন্ময়ের সহিত খেলিতে বসিয়াছেন। হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, দেখুন, জল ঠিক হয়েছে কি না। তাহার পর বক্রকটাক্ষে চিন্ময়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখন বুঝি পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না, আমি খেলতে চাইলেই যত ক্ষতি হয়?

বাঃ, রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমার সঙ্গে বাঘ-বকরি খেললে আমার ক্লাসের টাস্ক্ কে ক'রে দেবে? আর ভারি তো খেলতে জানেন, খেলতে বসলেই তো হেরে যান!

তোমার মত চুরি করতে পারি না ব'লেই হেরে যাই। মিথ্যুক কোথাকার, ক্লাসের টাস্ক্, না হাতী। ক্লাসে তোমাদের গীতা পড়া হয়, না আনন্দমঠ পড়া হয়? জানেন দাদামশাই, লুকিয়ে লুকিয়ে খালি যা-তা বই পড়বে ব'সে।

মুকুজ্জেমশাই হুঁকার জল ঠিক করিয়া এবং হুঁকার উপর কলিকাটি স্থাপন করিয়া চক্ষু বুজিয়া ধীরে ধীরে টান দিতেছিলেন, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত এবং মুখে মৃদু হাসি। আরও দুই-একবার টানিয়া চিন্ময়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, বাড়িতে আবার অত পড়া কেন? বাঘ-বকরি খেলাই তো ভাল। এস, এবার শুরু করা যাক, তুমি বাঘ হবে, না বকরি?

চিন্ময় বলিল, আসুন, টস করা যাক।

হাসি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বলিল, টস! টস আবার কি?

একটা পয়সা দাও না তুমি, আচ্ছা থাক্, আমার কাছেই আছে একটা পয়সা।

চিন্ময় উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা পয়সা বাহির করিল এবং যথারীতি টস করিল। চিন্ময় বাঘ হইল এবং মুকুজ্জেমশাই বকরি হইলেন। হাসি নীরবে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার বলিল, জোচ্চুরির নতুন একটা ফন্দি শিখেছে দেখছি। বকরি হ'লে ও কিছুতে পারে না, খালি হেরে যায়, কেমন চালাকি ক'রে বাঘ হয়ে গেল, দেখলেন?

মুকুজ্জেমশাই যেন বুঝিতে পারিয়াও কিছু বলিতেছেন না এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া হাসির দিকে চাহিয়া বলিলেন, সব চালাকি বার করছি, দেখ্ না।

এতে আবার জোচ্চুরি কোথা দেখলে তুমি ?

চিন্ময় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চিন্ময়ের অকৃত্রিম হাসির তোড়ে হাসি বেচারা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু মুখে সে হটিবার পাত্রী নয়। বলিল, তোমাকে চিনি না আমি যেন!

খেলা চলিতে লাগিল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

মৃন্ময় যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, চিন্ময়ও আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, হাসি কেবল একা জাগিয়া বসিয়া আছে। মৃন্ময় ভিতরে ঢুকিতেই হাসি কিছু না বলিয়া কেবল তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।

মৃন্ময় বলিল, কি, হ'ল কি ?

হবে আর কি, রোজ যেমন হয়, খাও-দাও শুয়ে পড়, মালিশটা পচুক।

দরকার কি মালিশের ? ব্যথা তো ক'মে গেছে, প্রায় নেই বললেই হয়।

তবু একেবারে সারে নি তো ? চল, আগে মালিশ ক'রে দিই, তারপর খাবে। খুব খিদে পায় নি তো ?

খিদে ? না, খিদে খুব পায় নি। কিন্তু এখনও আমার একটু কাজ বাকি আছে, কদিন থেকে করাই হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি সেরে নিই সেটা। এক্ষুনি আসছি আমি।

মৃন্ময় বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল এবং ঘরে খিল দিয়া স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বাঁকা বৃন্তের উপর রক্তজবার মত বৈদ্যুতিক টেবিল-ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে মৃন্ময়

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন চিঠি লিখিতে পারে নাই বলিয়া সে যেন স্বর্ণলতার কাছে অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই চিঠি লেখায় বাদ পড়িয়া যাইতেছে। কই, আগে তো এমন হইত না! একটু ইতস্তত করিয়া সে লিখিতে শুরু করিল—

প্রিয়তমাসু,

আমার অপরাধ অমার্জনীয় তাহা জানি, কিন্তু আমি তোমাকেও জানি, সেইজন্য আমার ভয় নাই। একটা কথা আজ তোমাকে বলিতে চাই। এ কথা আমার সহকর্মী মিস্টার মজুমদার ছাড়া আর কেহ জানে না। হাসিকেও জানাই নাই। হাসি নিতান্ত ছেলেমানুষ, শুনিলে হয়তো কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে এবং বলিবে, পুলিসের চাকরি ছাড়িয়া দাও। কিন্তু তোমার জন্যই পুলিসে চাকরি লইয়াছি এবং তোমাকে যতদিন না খুঁজিয়া পাইতেছি, ততদিন এ চাকরি আমি ছাড়িব না। ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। প্রাণ তো যাইতেই বসিয়াছিল, সেই কথাই আজ তোমায় বলিব। কয়েক-দিন পূর্বে আমি মোটর-চাপা পড়িয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছি। আমি অন্যমনস্ক লোক বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যমনস্কতার জন্য আমি চাপা পড়ি নাই। যে লোকটা আমাকে চাপা দিয়াছিল, সে যেন পিছু পিছু ছুটিয়া তাড়া করিয়া আমাকে চাপা দিয়া গেল। আমি বেশ বুঝিয়াছি, লোকটা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে চাপা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে একবার এক ওয়েটিং-রুমে একটা লোক লুকাইয়া আমার ফোটো লইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া আমিও গোপনে তাহার ফোটো লই। সেই ফোটোর সাহায্যে মিস্টার মজুমদার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, লোকটার নাম অচিনবাবু, মোটরের দালালি করে। লোকটার কি উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না। পুলিসে চাকরি করা বিপজ্জনক, কিন্তু তোমার জন্য আমি সমস্ত বিপদই

বরণ করিব। একটা সুসংবাদও আছে। কর্তৃপক্ষ আমার শরীররক্ষী-হিসাবে দুইজন সশস্ত্র লোক দিয়াছেন এবং আমাকে মোটরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, খরচ তাঁহারাই দিবেন। একটা বড় বম্ব্-কেসের অনুসন্ধানের ভারও আমার উপর পড়িয়াছে। যদি ইহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারি, কাজে উন্নতি হইবে। তখন তোমাকে খোঁজার আরও সুবিধা হইবে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, তোমাকে হয়তো আর খুঁজিয়া পাইব না। হয়তো তুমি আর বাঁচিয়া নাই, কিংবা হয়তো বাঁচিয়া থাকিলেও আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি আমাকে খুঁজিতেছ কি? নানারকম অসম্ভব কথা মনে হয়। আমার এ দুর্বলতার জন্য আমাকে মাপ করিও। আমার যতদিন শক্তি আছে, ততদিন তোমাকে খুঁজিব এবং যতদিন পাগল না হইয়া যাই, তোমার আশায় থাকিব···

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া লিখিয়া চলিল।

হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছিল।

৩৭

শৈল আপন মনে বসিয়া আলপনা দিতেছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার উপবাস করিয়া সে লক্ষ্মীপূজা করে, তাহারই আয়োজন চলিতেছিল। ঠাকুর-দেবতার প্রতি শৈলর খুব যে একটা ভক্তি আছে তাহা নয়, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই, শৈল লক্ষ্মীপূজা করে সময় কাটাইবার জন্য। সোয়েটার বোনা, লক্ষ্মীপূজা করা, আচার জেলি প্রস্তুত করা, কার্পেটে ফুল তোলা, এমন কি ঝিয়ের মেয়ের ফ্রক বানাইয়া দেওয়া—সমস্তই শৈল করে তাহার সত্যকার কিছু করিবার নাই বলিয়া। একা একা বসিয়া থাকিলে অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করে, এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও সমস্ত জীবন-

কেমন যেন দৈন্যনিপীড়িত ব্যর্থতা বলিয়া মনে হয়। কিছুই করিবার নাই। স্বামী নিজে এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ যে, তাঁহার জন্য কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই; এমন কি তাঁহার জামায় বোতাম লাগাইবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না। তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় যাহা-কিছু সমস্তই বাহিরের ঘরে থাকে, তাঁহার অপিসের চাপরাসী সে সমস্ত তত্ত্বাবধান করে; এবং তাঁহার খাস-চাকরটি এমন ভাল যে, শৈলর কোন কিছু করিবার, এমন কি দেখিবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না। মিস্টার বোস হাবজা-গোবজা শাকচচ্চড়ি সুক্তো-ডালনা পছন্দ করেন না, সাহেবী খানাই তাঁহার পছন্দ। বেশি মসলা পেঁয়াজ দেওয়া মাংস অথবা তরকারি তিনি বরদাস্তই করিতে পারেন না। একটু ঝাল বেশি হইলেই মেজাজ এবং অর্শ বিগড়াইয়া যায়। সাহেবদের মত রোস্ট-স্টু প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার্যই তাঁহার খাদ্য। তরিতরকারিও শুধু সিদ্ধ করিয়া খান এবং এসব জিনিস তাঁহার বাবুর্চিই ভালমত করিতে পারে। একেবারে মসলা না দিয়া রান্না করিতে শৈল ঠিক কেমন যেন পারে না। বাবুর্চিরা টুকিটাকি কি সব জিনিস দিয়া মাংসের রঙ গন্ধ করে, তাহা শৈলর জানা নাই। শৈল যে ইচ্ছা করিলে এসব শিখতে পারে না তাহা নয়, বরং সে শিখিবার চেষ্টাও একদা করিয়াছিল, কিন্তু সামান্য একটু ত্রুটি হইলেই বোস সাহেব এমন টিটকারি দিতেন যে, রাগ করিয়া শৈল শেষকালে বাবুর্চির হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছে। শুধু টিটকারির জন্যই নয়, বাবুর্চি রাখাটা বোস সাহেবের স্টাইলের পক্ষেই অপরিহার্য। মিসেস বোস রান্নাঘরে উবু হইয়া বসিয়া রান্না করিতেছে, ইহা মিস্টার বোসের পক্ষে সম্মান-হানিকর। সুতরাং বাহিরের জন্য বাবুর্চি এবং অন্দরের জন্য রাঁধুনী রাখিতেই হইয়াছে। একজন পদস্থ অফিসারের পক্ষে যাহা অশোভন, তাহা কি করা চলে? গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে শৈলর প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগিত। স্বামীকে

রান্না করিয়া খাওয়াইতে পারিবে না, এ আবার কি রকম ব্যবস্থা? কিন্তু ক্রমশ এই সাহেবিয়ানা তাহার সহিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সবই সহিয়া যায়। এখন ক্বচিৎ-কদাচিৎ দুই-একটা শৌখিন খাবার, তাহাও জ্যাম জেলি প্যাটি কাটলেট-জাতীয় বিজাতীয় খাবার, সে প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং বোস সাহেব তাহা একটু চাখিয়া প্রশংসা করিলে সে খুশি হয়। মাঝে মাঝে রান্না করিবার অর্থাৎ দিশী ধরনের রান্না করিবার শখ হইলে শঙ্করদাকে সে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু শঙ্করদারও আজকাল দেখা পাওয়া মুশকিল। কখন সে যে কোথায় থাকে, বলা যায় না।... শৈলর সময় কাটে কি করিয়া? যে পাড়ায় তাহারা থাকে, তাহাও বাঙালীপাড়া নহে যে, পরনিন্দা পরচর্চা করিয়া খানিকটা সময় কাটিবে। আশেপাশে সকলেই অফিসার শ্রেণীর, সকলেই কেতা-দুরস্ত। পরনিন্দা পরচর্চা তাহারা যে করে না তাহা নহে, কেতা-দুরস্তভাবে করে। শৈল তাহা ঠিক পারে না। যখন তখন যাহার তাহার বাড়িতে যাওয়াই যায় না। তা ছাড়া অধিকাংশই অ-বাঙালী। হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, না হয় মাদ্রাজী, না হয় মারহাট্টা। ইংরেজীতে কথা না বলিতে পারিলে আলাপ করাই চলে না। এই সব অসুবিধার জন্য শৈল পারতপক্ষে ইহাদের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সময় কাটে কি করিয়া? বৃহস্পতিবারটা অন্তত লক্ষ্মীপূজার কল্যাণে ভালভাবেই কাটিয়া যায়। কিন্তু অন্য দিনগুলি যেন আর কাটিতেই চায় না। বোস সাহেব সমস্ত দিন আপিসে থাকেন, সন্ধ্যায় আসিয়াই ক্লাবে চলিয়া যান। যেদিন ক্লাবে যান না, সেদিন হয় কোন পার্টি বা কোন বন্ধুর বাড়িতে ডিনার থাকে। শৈলর কেমন যেন মনে হয়, এই ক্লাব-পার্টি-ডিনার প্রভৃতিও চাকরির একটা অঙ্গ। ভালভাবে চাকরি বজায় রাখিতে হইলে ক্লাব-পার্টি-ডিনারে যোগ না দিলে চলে না। বড় বড় সাহেব-সুবো সেখানে আসে। অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন

তাহাদের স্বামীদের সঙ্গে পার্টিতে যায়, টেনিস খেলে, তাস খেলে, কিন্তু শৈল ঠিক ওসব পারে না। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরূপ। তাহার স্বামীর সঙ্গে অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন স্বচ্ছন্দে হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব করে, সে তেমন পারে না। সে যে ইংরেজী বলিতে পারে না বলিয়াই পারে না তাহা নহে, ইংরেজী বলিতে পারিলেও সে পারিত না। যখন তখন অমন হাসি, অমন বিস্ময়, অমন ওজন-করা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু এইবার সে ঠিক করিয়াছে, ইংরেজী শিখিবে। বোস সাহেবের তাহাতে শুধু যে অমত নাই তাহা নয়, পূর্ণ উৎসাহ আছে। শৈল ঠিক করিয়াছে, শুধু ইংরেজী নয়, গান-বাজনাও কিছু শিখিতে হইবে। কিছু একটা না করিলে সময় যে কাটে না! বোস সাহেব বলিতেছেন, শৈল ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতে পারিলে চাকরির নাকি সুবিধা হয়। উপরওয়ালা সাহেবদের সহিত শৈল যদি সহজভাবে আলাপ-টালাপ করিতে পারে, উন্নতির শিখরে উঠিবার ধাপগুলা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা নাকি সহজ হইবে। কি করিয়া হইবে, তাহা শৈলর বুদ্ধির অতীত। কিন্তু অপর দুই-একজন প্রতিবেশী অফিসারের উন্নতি নাকি তাহাদের পত্নীদের সাবলীল স্বচ্ছন্দতার জন্যই এত তাড়াতাড়ি হইয়াছে। ইহা সত্য, মিথ্যা অথবা সম্ভবপর কি না তাহা শৈল জানে না, কিন্তু ইহাই গুজব। কোন অফিসারের কার্যনিপুণতার সহিত যদি একটু আপ-টু-ডেট ধরনের চটুলা পত্নী যুক্তা থাকে, তাহা হইলে উপরওয়ালাদের ওপিনিয়ন নাকি তাড়াতাড়ি ভাল হয়, উন্নতির জন্য বেশি নাকি বেগ পাইতে হয় না। অর্থাৎ দাঁড়ী-মাঝি একটা নৌকাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে নিশ্চয়ই সক্ষম, কিন্তু একখানা নিখুঁত পাল থাকিলে অনুকূল হাওয়ার মুখে আরও সুবিধা হয়। শৈল ইংরেজী শিখিতে রাজি হইয়াছে বটে, কিন্তু সে বোস সাহেবকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে যে, সাহেব-সুবোর সঙ্গে

মিশিতে-টিশিতে সে পারিবে না। সে ইংরেজী শিখিতে চায় এবং বিশেষ করিয়া এস্রাজ বাজাইতে শিখিতে চায় নিজের সময় কাটাইবার জন্য। সময়কে লইয়াই যত সমস্যা। দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘতর সন্ধ্যা আর কাটিতে চায় না। আরও একটা কাজ সে করিয়াছে, অবশ্য খুব লুকাইয়া। ঝিয়ের মারফৎ সন্তানকামনায় একটি মাদুলি সে গোপনে সংগ্রহ করিয়াছে। বোস সাহেব ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। এত ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবার ইচ্ছাও একটা কারণ। যিনি মাদুলি দিয়াছেন, তিনি লক্ষ্মীপূজাও করিতে বলিয়াছেন। আজ বৃহস্পতিবার, শৈল উপবাস করিয়া লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিতেছে। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল যে, মিস মল্লিক বাহিরের ঘরে আসিয়াছেন, সাহেব তাঁহাকে সেলাম দিতে বলিলেন। শৈল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, বাইরের ঘরে আর কেউ আছে?

না।

এই আলপনাটুকু দিয়ে যাচ্ছি আমি। বলুগে যা, আমার হাত জোড়া।

বেয়ারা চলিয়া গেল। শৈল খানিকক্ষণ আলপনা দিল। কিন্তু তাহার নারীপ্রকৃতি এই শিক্ষিতা এবং গীতবিদ্যা-পারদর্শিনী মহিলাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আলপনা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে উঠিয়া পড়িল এবং হাত ধুইতে লাগিল। কিন্তু ড্রইং-রুমে তাহাকে যাইতে হইল না, বোস সাহেবই মিস মল্লিককে সঙ্গে করিয়া ভিতরে আসিয়া হাজির হইলেন এবং ইংরেজী কেতায় পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনারা তা হ'লে আলাপ করুন, আমায় কতকগুলো ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে, আমি একটু আপিস-ঘরে যাই। এক্স্‌কিউজ মি মিস মল্লিক!

বোস সাহেব সহাস্যে 'নড' করিয়া চলিয়া গেলেন। বেলা তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া সবিস্ময়ে শৈলর পানে চাহিয়া

রহিলেন। এত উগ্র সাহেবের পট্টবস্ত্রপরিহিতা পত্নী! আলপনা দিতেছে!

শৈল হাসিমুখে বলিল, চলুন, আমরা ওপরে যাই।

চলুন।

উভয়ে উপরে চলিয়া গেল।

৩৮

সেদিন হইতে শঙ্কর আর মিষ্টিদিদির কাছে যায় নাই। ঔদাসীন্য ইহার কারণ নয়, বরং ঠিক উল্টা, আগ্রহাতিশয্যের অতি-প্রবণতার প্রতিক্রিয়া। ধাবমান তুরঙ্গ ছুটিতে ছুটিতে সহসা সম্মুখে অতলস্পর্শী অলঙ্ঘনীয় গহ্বর দেখিয়া যেমন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, বিহ্বল শঙ্করও তেমনই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। অগ্রসর হওয়া নিরাপদ মনে হইতেছিল না, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা এবং মোহ তাহাকে প্রলুব্ধও করিতেছিল। এতদিন রিনিই তাহার অন্তরদেশ আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মানস-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অপরূপ সুর সৃষ্টি করিতেছিল, প্রতি মুহূর্তে রিনিকে ঘিরিয়াই নানা বিচিত্র স্বপ্ন তাহার কল্পলোককে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল, মিষ্টিদিদি তাহার মনোজগতে কোন বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই। মিষ্টিদিদি এতদিন নিতান্তই বাহিরের পরিজন ছিলেন এবং রিনির জন্যই শঙ্কর মিষ্টিদিদির সঙ্গ কামনা করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন মুখে না বলিলেও হাব-ভাবে আকারে-ইঙ্গিতে মিষ্টিদিদি যেন নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইয়াছে। মিষ্টিদিদির এই স্বরূপ এতই ভয়ঙ্কর ও মনোরম, এতই অপ্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক, এতই প্রচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট, এতই লোভনীয় ও অনুচিত যে, শঙ্কর দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। এত দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে যে, এ কয়দিন সে কিছুই করিতে পারে নাই। দৈনন্দিন

কর্তব্যকর্ম করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা যন্ত্রচালিতবৎ। ক্লাসে যাইতেছে, লেক্‌চার শুনিতেছে, প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাস করিতেছে, পরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তাও বলিতেছে, কিন্তু আসলে মনে মনে সে এই অতলস্পর্শী গহ্বরটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করা ছাড়া আর কিছুই করিতেছে না।

বাড়িতেও চিঠি লিখে নাই। বাড়ি হইতে বাবার পত্র পাইয়াছে যে, এখন মাকে কলিকাতায় লইয়া আসা সম্ভবপর হইবে না। এ পত্র পাইয়া সে নিশ্চিন্তই হইয়াছে। নিজের মায়ের এই নিদারুণ অসুখেও সে উদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছে না ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইতেছে, নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। চিন্তিত হইবার ভান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে ভাবিয়াছে, তাহাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। অর্থাৎ কোন কিছু করিবার মত মানসিক সক্রিয়তা তাহার নাই। তাহার সম্মোহিত মন একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনার ঘূর্ণিপাকে যেন তলাইয়া গিয়াছে, সহজভাবে কোন কিছু করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। রিনিকে দেখিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও সে রিনিদের বাড়ি আর যায় নাই। শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে যায় নাই তাহা নহে, মনে মনে প্রলুব্ধ হইয়াছে তো! মনের কাছে কিছুই তো অগোচর নাই! নিজের মনের এই দুর্বলতায় নিজের কাছেই সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে বলিয়াই রিনির নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। নিজের সঙ্কোচ তো আছেই, তাহার উপর মাঝে মাঝে ইহাও তাহার মনে হইতেছে যে, হয়তো তাহার চোখে মুখে ব্যবহারে রিনি তাহার অপরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাইবে, হয়তো ভাবিবে— কি ভাবিবে তাহা আর শঙ্কর ভাবিতে চাহে না, জোর করিয়া অন্য কিছু ভাবিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে জবরদস্তি চলে না। রিনির

বিস্মিত ব্যথিত নির্বাক মুখচ্ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠে। মনে হয়, রিনি যেন তাহার কলুষিত সত্তার পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, কিছু বলিতেছে না। তাহার চোখের দিকে আর সে তাকাইতে পারে না। কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। রিনি তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে, ইহা চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসহ্য। কল্পনার আকাশ-কুসুমে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা, সামান্যতম গ্লানিও স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই ছিল আদর্শ। সেই আদর্শকে সহসা মলিন দেখিয়া শঙ্কর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ রবিবার। সমস্ত দিন কিছু করিবার নাই। গত কয়েকদিন ক্লাস প্রভৃতি লইয়া সময়টা একরূপ কাটিয়া গিয়াছে, আজ এই অস্বস্তিকর অবকাশ তাহাকে পীড়ন করিতেছে।

আশ্চর্য মানুষের মন! একই মন তাহাকে কত রকম পরামর্শই না দিতেছে! কত পরস্পর-বিরোধী যুক্তি একসঙ্গে এক নিশ্বাসে বলিতেছে ও খণ্ডন করিতেছে। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন আগে সে একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তাহাতে দ্বিধাগ্রস্ত নায়কের সম্মুখে সুমতি-কুমতির তর্ক শ্রবণ করিয়া ভাবিয়াছিল, এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড! যাহা কর্তব্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহা যে কোন সুস্থ ব্যক্তি অবিচলিতচিত্তে করিবে। শুধু যে উচিত বলিয়াই করিবে তাহা নয়, করিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া করিবে। সুস্থ সবল ব্যক্তির মনে সুমতিরই স্থান আছে, কুমতির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। নিজেকেও এতদিন সুস্থ সবল বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ সে নিজের মনের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু সুমতি কুমতি নয়, বহু প্রকার মতি আসিয়া ভিড় করিয়াছে এবং সকলের যুক্তিই সে সমান আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার কার্যের সমর্থক একটা যুক্তিই কিন্তু ক্রমশ মনের

মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। বৈজ্ঞানিক মন লইয়া সে ভাবিতেছিল, পুরুষত্বের জন্য লজ্জিত হইবার কি আছে? যে লোলুপ কামনা তাহার মনের মধ্যে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রেরণা যোগাইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কতক্ষণ মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে? সমাজ সংস্কার সমস্তই কৃত্রিম। কৃত্রিমতাব জবরদস্তিতে অকৃত্রিম পৌরুষকে, বলিষ্ঠ যৌবনের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই।

আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল। মিষ্টিদিদিকে সে যাহা ভাবিতেছে, তিনি তাহা নাও হইতে পারেন। জোলা মোপাসাঁ পড়িলেই যে খারাপ হইতে হইবে অথবা কতকগুলি ছবি গোপনে রাখিলেই যে নিঃসন্দেহে তাহা দুশ্চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া লইতে হইবে, এমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। নিছক আর্ট-প্রীতির বশেই এসব করা অসম্ভব নহে। অকারণে হয়তো সে···। তাহার মনের মধ্যে একটা লুব্ধ পশু, একটা ক্ষুব্ধ ঋষি এবং একটা আর্ত প্রেমিক পাশাপাশি বসিয়া তিন রকম চিন্তা করিতে লাগিল। প্রেমিক চিন্তা করিতেছিল না, ধ্যান করিতেছিল, প্রার্থনা করিতেছিল—এ সমস্তই একটা দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া যাক। নির্মল মনের মধ্যে রিনির হাস্যস্নিগ্ধ সলজ্জ মুখখানি সগৌরবে আবার বিরাজ করিতে থাকুক।

সহসা বাহিরে পদশব্দ হইল।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদির বালক-ভৃত্যটি পত্র লইয়া আসিয়াছে। সেলাম করিয়া জানাইল, মাঈজী জবাব চাহিয়াছেন।

শঙ্কর খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

এর মধ্যেই যে পুরোদস্তুর জামাই হয়ে উঠলেন দেখছি, নেমন্তন্ন না করলে আর আসাই হয় না! রিনি বেচারা কয়েকদিন থেকে মনমরা

হয়ে আছে, আমার কথা আর নাই বললাম। উনি কাল এক বন্ধুর সঙ্গে গিরিডি গেলেন এই উইক-এণ্ডটা কাটিয়ে আসতে। ভারি একা লাগছে আমাদের। আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন নিশ্চয়ই। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবেন। আপনাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁকে ফোন ক'রে আজও রাত্তিরের মত ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছি। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। কটা নাগাদ আসবেন, এর মারফৎ জানাবেন। প্রস্তুত থাকব।—ইতি

মিষ্টিদিদি

চাকরের হাতেই জবাব দিতে হইল, বেশিক্ষণ গবেষণা করিবার অবসর মিলিল না। লিখিয়া দিল, সন্ধ্যা সাতটায় যাইবে। ব্যাপারটার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় মনের ভার লাঘব হইয়া গেল। টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে অপটুভাবে শিস দিতে লাগিল।

৩৯

ওরিজিনাল অর্থাৎ দশরথ সাইকেলের দোকানে বসিয়া ছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বেশবাস আগের মতই—টাইট-ফিটিং গলা-বন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার, খাকী হাফপ্যাণ্ট, পায়ে আজানু কপিশবর্ণের মোজা, মাথায় কান-ঢাকা কালো রঙের টুপি। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত তিনি চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূমপান করিতেছিলেন।

ভন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভন্টুরও সেই সাবেক মূর্তি। মালকোঁচা-মারা, গায়ে বুকখোলা জামা এবং পার্শ্বে সাইকেল। ভন্টু যথাবিধি নমস্কার করিয়া (ওরিজিনালের পায়ের ধূলা লইবার ইচ্ছা এবং সাহস ভন্টুর কোনদিন হয় নাই) বিনীত ভদ্রভাবে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

ওরিজিনাল কোন উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভন্টু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের চোখ দুইটি লাল, হঠাৎ দেখিয়া মনে হয়, চোখ উঠিয়াছে। হয়তো বরাবরই তাঁহার চক্ষুর বর্ণ এইরূপ, কারণ ভন্টু ইতিপূর্বে এত কাছে আসিয়া তাঁহার চক্ষু লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় নাই। ওরিজিনালকে চিরকালই সে দূরে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্মণবাবুর সহিতই তাহার কারবার এবং তাহা এ যাবৎ ওরিজিনালের অগোচরেই হইয়াছে। গত তিন-চার দিন হইতে সে কিন্তু লক্ষ্মণবাবুর পাত্তা পাইতেছে না। নিবারণবাবুর চায়ের দোকানে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ভন্টু দেখিয়াছে, লক্ষ্মণবাবু সন্ধ্যার সময় আসে না। লক্ষ্মণবাবুর বাড়িটাও ঠিক কোন্‌খানে, তাহা ভন্টুর জানা নাই। সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত আলাপ হইয়াছিল এবং প্রয়োজন হইলে এই সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত দেখা হইত। গত দুই দিন হইতে কিন্তু প্রোটোটাইপের দেখা নাই। হয়তো তাহার দোকানের ডিউটির সময় বদলাইয়াছে, হয়তো আজকাল সে সন্ধ্যায় না আসিয়া দুপুরে আসিতেছে। ব্যাপারটা ঠিক জানিয়া লওয়া দরকার, কারণ সাইকেলটি পুনরায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে প্রোটোটাইপের হদিস না পাইলে হাঁটিয়া আপিস যাইতে হইবে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাই আজ ভন্টুকে ওরিজিনালের সম্মুখবর্তী হইতে হইয়াছে।

ওরিজিনাল কোন উত্তর দিলেন না। রক্তচক্ষু মেলিয়া ভন্টুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল এবং পুনরায় সবিনয়ে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

আমি কি লক্ষ্মণবাবু?

এ প্রশ্নের জন্য ভন্টু প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর সে অবিলম্বে দিল, আজ্ঞে না।

তা হ'লে আমার কাছে ঘুরঘুর করছেন কেন?

লক্ষ্মণবাবু কখন দোকানে আসেন, তাই জানতে চাইছিলাম।

তিনি দোকানে আর আসেন না, আসবেনও না।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে তা হ'লে?

দেখা হবে না।

ওরিজিনাল আবার তাঁহার গড়গড়ায় মন দিলেন।

ভন্টু বুঝিল, এখন সুবিধা হইবে না, ভদ্রলোক চরম তিরিক্ষি হইয়া রহিয়াছেন। সে সাইকেলটি ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ওরিজিনাল বলিলেন, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে বসুন ওইখানে।

ওরিজিনাল বাম হস্ত দিয়া তাঁহার গোঁফদাড়িটা একবার চুমরাইয়া লইলেন এবং নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে দোকানের সম্মুখে ফুটপাথের উপর যে টিনের চেয়ারটি ছিল, সেইটি দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন, ওইটে একটু এদিকে টেনে এনে বসুন। সাইকেল সারাবেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এখন নয়, পয়সা সঙ্গে নেই। কত পড়বে, সেইটে লক্ষ্মণবাবুর কাছে জেনে নিতে এসেছিলাম।

আমি ব'লে দিচ্ছি। যে সাইকেলের দোকানে লক্ষ্মণবাবু নেই, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

নীরব থাকাই ভন্টু সমীচীন মনে করিল।

ওরিজিনাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, বলুন আপনি, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চলছে বইকি।

ওরিজিনাল তাঁহার রক্তচক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গড়গড়ায় সুদীর্ঘ একটি টান দিলেন এবং আদেশ করিলেন, মটরা, সাইকেলটা তুলে দেখ্, কি কি করতে হবে আর কত পড়বে! আপনি বসুন, চেয়ারটা আর একটু টেনে আসুন এদিকে।

পিছনের ঘর হইতে লুঙ্গি-পরা মটরা বাহির হইয়া আসিয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সাইকেলটি পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ওরিজিনালের ধমকে নিরস্ত হইল। ওরিজিনাল দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, সাইকেলটা দোকানের ওপর তুলতে কি কষ্ট বোধ হচ্ছে বাবুর? গতরে কি আগুন লেগেছে হুজুরের?

মটরা অবিলম্বে সাইকেলটা দোকানের উপর তুলিয়া ফেলিল এবং কাঠের আলনার মত জিনিসটার উপর চাপাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ভন্টু বলিল, সামনের চাকার টায়ার-টিউব দুটোই নষ্ট হয়েছে, পেছনের চাকার অ্যাকৃসেলের নাটটাও বদলাতে হবে। এখন থাক্, পয়সা সঙ্গে আনি নি—

বেশ তো, কাল পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবেন, কটার সময় চাই কাল?

কাল সকালবেলা পেলেই ভাল হয়।

বেশ, সকালেই পাবেন, তৈরি থাকবে।

মটরা বলিল, নতুন টায়ার ফুরিয়েছে।

চৌধুরীর ওখান থেকে নিয়ে এস গিয়ে। যাও, এখুনি যাও, কাল সকালেই ওঁর চাই।

সিলিপ দেবেন?

এক ডজন টায়ারের অর্ডার আমার দেওয়াই আছে, গেলেই পাবে তুমি, পা চালিয়ে যাও।

মটরা চলিয়া গেল।

ওরিজিনাল গড়গড়ায় মন দিলেন। ভন্টুও উঠিবে কি না ভাবিতেছিল, এমন সময় ওরিজিনাল তাহাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন।

পৃথিবীতে ক রকম লোক আছে জানেন?

মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রো প্রভৃতি কয়েক রকম শ্রেণীবিভাগের কথা ভন্টু পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সব তাহার মনে ছিল না। নিজের বিস্মরণশক্তির পরিচয় দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে সাধারণভাবে বলিল, অনেকরকম।

অনেকরকম নয়; দুরকম, জুয়াচোর আর খাঁটি।

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া ওরিজিনালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওরিজিনাল বলিয়া চলিলেন, জুয়াচোরের সংখ্যাই অধিক। খাঁটির সংখ্যা অল্প। অল্প কয়েকটি খাঁটি লোকে একদল জুয়াচোরের পাল্লায় প'ড়ে অহরহই কষ্ট পাচ্ছে, এইটেই হ'ল সার কথা।

এই সার কথা শুনিবার জন্য ভন্টু প্রস্তুত ছিল না, আগ্রহান্বিতও ছিল না। কিন্তু ওরিজিনালকে কথায়-বার্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে হয়তো সুবিধা হইতে পারে, এই ভাবিয়া সে তাহার প্রিয় বচনটির পুনরুক্তি করিল। এই জাতীয় লোকের কাছে এই বচনটি আওড়াইয়া ভন্টু প্রায়ই সুফল পাইয়াছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে, মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘ'টে আসছে।

ওরিজিনালও মহাভারত হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়া বলিলেন, গোটা মহাভারতে মাত্র দুটি খাঁটি লোকের দেখা পাবেন, দুর্যোধন আর ভীম। বাকি সব জুয়াচোর।

ভন্টু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, উঠিয়া ওরিজিনালের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

ও কি?

পায়ের ধুলো নিলাম আপনার, এমন ভাল কথা একটা শোনালেন!

ওরিজিনাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করিলেন যে, ভন্টু ব্যঙ্গ করিল কি না! কিন্তু ভন্টু সুদক্ষ অভিনেতা, সমস্ত মুখচ্ছবিতে এমন একটা গদগদ শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া তুলিল যে, শেষ পর্যন্ত ওরিজিনাল মনে মনে পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া ভন্টু বলিল, ওর জন্যে কিছু মনে করবেন না, আপনি লক্ষ্মণবাবুর বাবা, আপনার পায়ের ধুলো নিলে দোষ আর এমন কি আছে? লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু।

ওরিজিনাল মুখ ফিরাইয়া গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, আপনার বন্ধুটি একটি প্রকাণ্ড জুয়াচোর ছিলেন।

কে, লক্ষ্মণবাবু?

হ্যাঁ, লক্ষ্মণবাবু।

মানে?

মানে, আমি তাদেরই জুয়াচোর বলি, যাদের মনে মুখে এক নয়, যারা ভাবে একরকম, করে আর একরকম। গাঁটকাটাদের আমি জুয়াচোর বলি না, তারা খাঁটি লোক।

জুয়াচোরের এবম্বিধ সংজ্ঞা ভন্টু এই প্রথম শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ওরিজিনালের আর একবার পদধূলি সে লয়, কিন্তু ওরিজিনালের কথাবার্তায় এমন একটা আন্তরিকতা ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, তাহাকে অপদস্থ করিতে ভন্টুর ইচ্ছা হইল না। ওরিজিনাল গড়গড়ায় আবার একটি টান দিয়া বলিলেন দেখুন, আমি নেশাসক্ত। রীতিমত

মাইনে দিয়ে একজন রক্ষিতাকে আমি রেখেছি, তার কারণ স্ত্রী-বিয়োগের পর দেখলাম, ওসব সংযম-টংযম আমার দ্বারা পোষাবে না, বিয়ে করাও পোষাবে না, তাই আইনত যেটা অন্য উপায় আছে, সেইটেই আমি নিলাম। পেটে খিদে মুখে লাজ—এ রকম ভণ্ডামির কোন মানে আমি বুঝি না। এতে কি যে এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাও আমার মাথাতে আসে না। তুইও একটা রাখলে পারতিস, যার তার আনাচে কানাচে অমন ছুংছুং ক'রে না বেড়িয়ে পছন্দমত একটা মেয়েমানুষ রাখলেই পারতিস। টাকার তো অভাব ছিল না, ন্যায্য খরচে আমি আপত্তিও করি নি কোনদিন।

ওরিজিনাল পুনরায় গড়গড়ায় কয়েকটা টান দিলেন।

ভন্টু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। ওরিজিনালের এই স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য সে কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ ওরিজিনাল বলিয়া উঠিলেন, জুয়াচোর, পাজি, নচ্ছার এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, এত বড় একটা দাগা দিতে লজ্জা করল না ওর? উনি আবার লেখাপড়া শিখেছিলেন, কচু শিখেছিলেন! গ্র্যাজুয়েট! ঝাড়ু মারি আমি অমন গ্র্যাজুয়েটের মাথায়।

ভন্টু ভাবিল, প্রোটোটাইপ নিশ্চয় কিছু টাকা মারিয়া সরিয়াছে। কি ভাবে কি ঘটিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সহসা ভন্টু লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং তিনি নিষ্পলকভাবে সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া আছেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ভন্টু বলিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

ওরিজিনাল হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

খাঁটি লোকের কথা জুয়াচোরেরা বুঝতে পারে না, আপনি বুঝবেন

কি ক'রে ? আপনি তো লক্ষ্মণেরই বন্ধু ! আমার এই পোশাক দেখে আপনারা হাসেন, কিন্তু আমার শীত করে ব'লে এই পোশাক আমি পরি। লোকের মন রাখবার জন্যে আপনার মত বুক-খোলা জামা প'রে শীতে কেঁপে মরি না। আপনাদের মত মর‍্যাল সেজে ভদ্দর-লোকের বাড়ির জানলার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি না, সোজা বেশ্যাবাড়ি যাই। আমি খিদের সময় চাই খাবার, চা নয়। চটলে লাথি মারি, ভালবাসলে জড়িয়ে ধরি। ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় পছন্দ করি না। আমার কথা আপনারা বুঝবেন না। কোনও জুয়াচোরই কোন খাঁটি লোকের কথা বোঝে নি, বুঝতে পারবে না, পারবে না, পারবে না।

ওরিজিনাল প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ভন্টু ভয় পাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ওরিজিনালের হাত দুইটি ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, আপনি অমন করছেন কেন, কি হয়েছে খুলে বলুন না, লক্ষ্মণবাবু কি করেছেন ?

রাস্‌কেল আত্মহত্যা করেছে, ভেবেছে, আমাকে দমিয়ে দেবে। কিন্তু দমবার ছেলে আমি নই।

ওরিজিনাল দুই হাত দিয়া চক্ষু দুইটি কচলাইতে লাগিলেন।

নির্বাক ভন্টু দাঁড়াইয়া রহিল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

৪০

শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

এত দ্রুতবেগে যে, মনে হইতেছিল, কেহ তাহাকে তাড়া করিয়াছে, ছুটিয়া পলাইতেছে। যে পথে সে চলিতেছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত জনবিরল, যান-বাহনের তেমন ভিড় নাই, থাকিলে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ শঙ্কর পথ দেখিয়া চলিতেছিল না।

আত্মরক্ষার জন্য, যে অদৃশ্য শত্রুটা তাহাকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য ঠিক নাই, গন্তব্যপথ অনির্দিষ্ট, কোথাও পলাইয়া লুকাইতে পারিলেই সে যেন বাঁচে। কিন্তু ইহাও সে বুঝিতেছে, কোথাও পলাইবার তাহার উপায় নাই, কোথাও লুকাইয়া সে নিস্তার পাইবে না, কারণ শত্রু নিজের মধ্যেই রহিয়াছে; যে বৃশ্চিকটা তাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার বাসা তাহার হৃদয়-বিবরেই, অন্য কোথাও নহে। কিন্তু ছি ছি, কি লজ্জা, কি লজ্জা, কি অপরিসীম লজ্জা—রিনি দেখিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মহিমার ছদ্ম মুখোশটা খুলিয়া যে মুহূর্তে ক্লিষ্ট কদর্য পশুটা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই রিনি তাহার স্থূল রূপটা দেখিয়া ফেলিয়াছে। উত্তেজনার আধিক্যে ওদিককার জানালাটা বন্ধ করা হয় নাই।

এতদিনকার সাধের প্রাসাদ নিমেষের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসিয়া সব যেন ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, কোন কিছুর উপর নির্ভর করিবার আর যেন সাহস নাই। এতদিনকার সমস্ত নীতি, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত যুক্তি, সমস্ত শক্তি অপ্রত্যাশিত প্লাবনে কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে; যে ভিত্তির উপর মন এতকাল পরম নির্ভরতার সহিত দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা সেই ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে; যাহাকে ভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, তাহা বিরাটকায় অন্ধ একটা সরীসৃপের কুণ্ডলীকৃত ক্লেদাচ্ছন্ন দেহ—নড়িয়া-চড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অকস্মাৎ জীবনের সমস্ত পটভূমিকাই যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল যে রিনিকে পত্নী কল্পনা করিয়া সে এতদিন, এই কিছুক্ষণ পূর্বে পর্যন্ত স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে নীত হইয়াছিল; সেই রিনিকে সে আর জীবনে মুখ দেখাইতে পারিবে না। যে মিষ্টিদিদি এই খানিকক্ষণ আগে পর্য

তাহার অত্যন্ত আপন জন ছিলেন, তাঁহাকে সে জীবনে ক্ষমা করিতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির একারই দোষ? তাহার নিজের লোভ ছিল না? ছিল বইকি। কিন্তু মিষ্টিদিদি না থাকিলে তাহা এমন কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিত না। স্ফুলিঙ্গ হয়তো ছিল, মিষ্টিদিদি তাহাকে দাবানলে পরিণত করিয়াছেন; ওই ক্ষুধিতা রমণীটির আকস্মিক কামনার ঝটিকায় লেলিহান শিখা আকাশ-বিসর্পী হইয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদির প্রতি নিদারুণ ঘৃণায় তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবু সে মিষ্টিদিদিকে ভুলিতে পারিতেছিল না। দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে পারিপার্শ্বিকের-সম্বন্ধে-অচেতন মন মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিল। সেই দৃশ্যটি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না, সেই—

সহসা শঙ্কর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কোথায় চলিয়াছে সে? মনে হইতেছে, যেন এ রাস্তায় সে আর কখনও আসে নাই। কোন্ গলি এ? গলিটা হইতে বাহির হইয়া সে সারকুলার রোডে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই দেখিল সমাধিক্ষেত্র, যে সমাধিক্ষেত্রে কবি মধুসূদন সমাহিত রহিয়াছেন। সে অন্যমনস্কভাবে ভন্টুর বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিল, বেলেঘাটার মোড় ছাড়াইয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তাটা পার হইয়া সে সমাধিক্ষেত্রের পাশে আসিয়া একবার দাঁড়াইল, একবার ইচ্ছা হইল, সমাধিক্ষেত্রের ভিতর ঢুকিয়া মধুসূদনের সমাধির পাশে খানিকক্ষণ বসে। কবি মধুসূদনের জীবনে নানা দুঃখ নানা মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছিল, হয়তো জীবনের পরপারে গিয়া তিনি সান্ত্বনা পাইয়াছেন, হয়তো সে সান্ত্বনার ক্ষীণতম আভাস অন্ধকারে মৌন সমাধির ধারে একা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে পাওয়া যাইবে। শঙ্কর আর একটু গেল, গিয়া দেখিল, গেট বন্ধ। গেটের সামনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সে নিজেও জানে না। চেতনা হইলে হঠাৎ সে

দেখিল, ওদিকের ফুটপাথে চলমান একটি নারীমূর্তির পানে সে আগ্রহে চাহিয়া আছে। আঁটসাঁট-পোশাক-পরা একটি মেমসাহেব ওদিকের ফুটপাথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরগুহাবাসী নারীদেহ-লুব্ধ পশুটা তাহারই চোখ দিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নারীমূর্তি চলিয়া গেল, শঙ্কর সহসা স্থির করিল, ভন্টুর বাড়ি সে আর যাইবে না। তাহার কলুষিত মন লইয়া সে এখন বউদিদির সম্মুখীন হইতে পারিবে না। ভন্টুর সম্মুখেই বা সে দাঁড়াইবে কি করিয়া? অন্যমনস্ক উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর আবার হনহন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা রাস্তা নানা গলি অতিক্রম করিয়া শঙ্কর আবার সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, একটা ল্যাম্প-পোস্টের ধারে একফালি সরু বারান্দার উপর রঙিন-কাপড়-পরা কয়েকটি মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আবার একজন কোমরে হাত দিয়া সিগারেট খাইতেছে। দৃশ্যটা শঙ্করের কেমন দৃষ্টিকটু লাগিল, সে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মেয়েটির পানে চাহিল। শঙ্করকে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া মেয়েগুলিও তাহার পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। যে মেয়েটি সিগারেট খাইতেছিল, সে আরও একটু কায়দা করিয়া মুখ তুলিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল, একটি মেয়ে বঙ্কিম ভঙ্গীতে অল্প একটু অন্ধকারে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, সে রাস্তায় নামিয়া আসিল এবং শঙ্করের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া সঙ্গিনীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর একজন সঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিল, আমার খোঁপাটা একটু ঠিক ক'রে দে তো, বার বার এলিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গিনী খোঁপা ঠিক করিয়া দিল।

মেয়েটি আবার শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চাহিল ও আবার একটু সিল। শঙ্কর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শঙ্করকে এমন বিমূঢ়ভাবে ড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই চটুলা মেয়েটিই প্রশ্ন করিল, আপনি াউকে খুঁজছেন?

শঙ্কর আগাইয়া গেল এবং মেয়েটির মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া লিল, আপনি কি ১৮ নম্বর কেরানীবাগানে থাকেন?

'আপনি' শুনিয়া মেয়েটি গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার পর আবার চাখ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

শঙ্কর কিছু বলিতে পারিল না; তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন াহার তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নিদারুণ তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

শঙ্কর সহসা বলিয়া ফেলিল, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে ারেন?

খুব পারি, আসুন।

মেয়েটির পিছন পিছন শঙ্কর অগ্রসর হইল।

বাকি মেয়েগুলির মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, মুক্তোটার কপাল াল। আমাদের আর কতক্ষণ ভোগান্তি আছে, কে জানে বাপু!

আর একজন একটু হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, ওলো মুক্তো, শুধু জল িস নি, একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিস বাবুকে।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মুক্তো প্রশ্ন করিল, আমার ঠিকানা াপনি জানলেন কি ক'রে?

আপনারাই দিয়েছিলেন।

কবে?

কিছুদিন আগে হাওড়া স্টেশনে। আমাকে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন ুরেছিলেন, ভুলে গেছেন?

মুক্তো হাসিয়া বলিল, ভুলে গেছি।

আপনি হাওড়া স্টেশনে মূর্ছা যান, আমি আপনার মুখে জল দি মূর্ছা ভাঙাই। আপনার সঙ্গে আরও যেন কে ছিলেন একজন।

মুক্তো মন দিয়া কথাগুলি শুনিল; তাহার পর ভঙ্গীভরে স্কন্ধযুগ ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইয়া বলিল, মনে নেই।

অতবড় একটা ঘটনা ভুলে গেছেন? বেশিদিনের তো কথা নয়।

মুক্তোর সমস্ত মনে ছিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না। জিজ্ঞা করিল, শুধু জল খাবেন? খাবার-টাবার—

না, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

ঘরেই কুঁজায় জল ছিল, মুক্তো কাচের গ্লাসে ঢালিয়া দিল এবং শঙ্ক তাহা ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

কতক্ষণ বসবেন?

কতক্ষণ আর, এই খানিকক্ষণ, মানে—আপনার কি অসুবি করছি?

কিছুমাত্র না। ঘণ্টা পিছু দু টাকা ক'রে লাগবে, এই আম রেট।

শঙ্কর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, ও।

পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া দেখিল, একটি দশ টাকা নোট রহিয়াছে, সেইটি বাহির করিয়া মুক্তোর হাতে দিতেই মুক্তে খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

বাবা! রাগ তো আপনার কম নয় দেখছি!

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল, না, ছি, আপনি অতিথি মানু আমাদের নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছেন বলছেন, আপনার কাছে কি টাক নিতে পারি? সব জায়গায় কি আর ব্যবসাদারি চলে? দাঁড়ি রইলেন কেন? বিছানায় বসুন না, আমি আসছি এক্ষুনি।

মুক্তো বাহির হইয়া গেল।

একটু দেরি করিয়াই ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল, ক্লান্ত শঙ্কর তাহার

ানায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মুক্তো নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত



জঙ্গম

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়

বনফুল



[redacted]



তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৪
চতুর্থ মুদ্রণ—আষাঢ় ১৩৫৮
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-[illegible]
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] চার টাকা

জঙ্গম

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

শিরীষবাবুর বাড়ির অন্তঃপুরে বসিয়া মুকুজ্জেমশাই, শিরীষবাবু এবং শিরীষবাবুর পত্নী সুশীলাসুন্দরী কথাবার্তা বলিতেছিলেন। সুশীলাসুন্দরী অবশ্য বিশেষ কোন কথাবার্তা বলিতেছিলেন না, তিনি একটু দূরে বসিয়া মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন এবং ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। গুরুজনদের সম্মুখে অকারণে বাচালতা প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ এবং স্বভাবতই তিনি নীরবপ্রকৃতির। সব কিছু মন দিয়া শোনেন, কিন্তু বেশি কিছু বলেন না।

চিন্তিতমুখে শিরীষবাবু বলিলেন, আপনি যাবেন না, তা হ'লে কি ক'রে হবে? আমার পক্ষে একা—

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হ'লেই বা একা, তারা তো বাঘ-ভালুক নয় যে, তুমি গেলেই টপ ক'রে খেয়ে ফেলবে। তুমি মেয়ের বাপ, তুমি না গেলে চলবে কেন?

শিরীষবাবু মুখটা উঁচু করিয়া চিবুকের তলাটা চুলকাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ছেলেটিকে একবার দেখাও হবে, আর ভদ্রলোকের মনোভাবও খানিকটা বোঝা যাবে। চিঠিপত্রে তিনি খোলাখুলি কিছু বলতে চান না, সে তো দেখছ।

শিরীষবাবু চিবুক চুলকানো শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। কোঁচা

দিয়া নাকটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, সর্দিও করেছে, ভাবছি, ট্রেনে আবার এক্সপোজার লাগবে। পরের শনিবারে গেলে কেমন হয়? রাজমহলে কদিন লাগবে আপনার?

আদালতের ব্যাপার তো, ঠিক বলা যায় না। সাক্ষী-ফাক্ষিগুলোও সব ঠিক করতে হবে, তা ছাড়া, মনু হয়তো ছাড়তে চাইবে না, অনেক দিন যাই নি।

সুশীলাসুন্দরী চকিতে একবার মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া আবার সুপারি কুঁচানোতে মন দিলেন।

মনু অর্থাৎ মনোরমা নামক বিধবাটির সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রকৃত সম্পর্কটা যে কি, কেহ তাহা জানে না। সম্পর্ক একটা নিশ্চয়ই আছে, কারণ মুকুজ্জেমশাই তাহার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। মনোরমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, খুব নিষ্ঠাবতী বিধবা। মুকুজ্জেমশাই যদিও তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, কিন্তু কখনও নিকটে রাখেন না। নানা স্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত লোকের অভাব নাই, কাহারও না কাহারও পরিবারে মুকুজ্জেমশাই মনোরমাকে রাখিয়া দিয়া নিজে অন্যত্র চলিয়া যান। সাধারণত যে সকল পরিবার মুকুজ্জেমশাইয়ের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে, সেই সব পরিবারেই মনুকে তিনি রাখিয়া থাকেন। সম্প্রতি মনোরমা রাজমহলে যে পরিবারে রহিয়াছে, সেই পরিবারের কর্তাটি জেলে গিয়াছেন, আপিসের টাকা ভাঙিয়াছেন—এই তাঁহার অপরাধ। মুকুজ্জেমশাইয়ের ধারণা—লোকটি নিরীহ, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি এই অপবাদ খণ্ডন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। উকিল ব্যারিস্টার দ্বারা যতটা করা সম্ভব সবই করিয়া দেখিবেন ঠিক করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কোথাও নড়িবেন না ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু গতকল্য মনুর একখানি পত্র আসিয়াছে যে অন্তত দুই-একদিনের জন্য রাজমহলে আসা তাঁহার নিতান্ত দরকার, না

আসিলে মকদ্দমার ক্ষতি হইবে। সেই জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুকুজ্জেমশাইকে যাইতে হইতেছে।

শিরীষবাবু অকূল পাথারে পড়িয়া গিয়াছেন।

শিরীষবাবু মুখের উপর হাতটা একবার বুলাইয়া বলিলেন, আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। এতদিন যখন গেছে, তখন দু-চার-দশ দিনে আর কি এমন এসে যাবে! তা ছাড়া, যতই তাড়াতাড়ি করুন, বোশেখের আগে তো আর বিয়ে হচ্ছে না।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, হাতে কি খুব বেশি সময় আছে মনে কর তুমি? তিরিশটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম, চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে তো জন পনেরোকে বাতিল করা গেছে, কুষ্ঠির মিল জন-ছয়েকের সঙ্গে হ'ল না। বাকি আছে ন জন, এদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যতটা হবার হয়েছে, এইবার দেখাশোনা করা দরকার। সব কটিই সুপাত্র। ন জনের সঙ্গে দেখা করতে তোমার অন্তত ন সপ্তাহ লাগবে, তোমার তো শনি রবি ছাড়া ছুটি নেই।

শিরীষবাবুকে স্বীকার করিতে হইল, ছুটি নাই। কিন্তু তিনি অবুঝের মত বলিলেন, ন জনকেই দেখতে না হতে পারে। এই শঙ্কর ছেলেটিকেই আমাদের পছন্দ, শঙ্করের বাবা অম্বিকাবাবু আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও। সেজদার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কি যেন সম্পর্ক আছে ওঁদের। ওইখানেই হয়তো হয়ে যাবে। কুষ্ঠি অনুসারে তাই হওয়া উচিত।

ধর, যদি না হয়!

শিরীষবাবু অবশ্য ধরিতে রাজী নহেন, কিন্তু যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করা মুশকিল। ও-পথে না গিয়া সুতরাং তিনি বলিলেন, বুঝছেন না, আপনি সঙ্গে না থাকলে বেশ জোর পাওয়া যায় না, তা ছাড়া আপনিই সব করেস্‌পন্‌ডেন্‌স করেছেন। আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। একা একা এসব ব্যাপারে যাওয়া ঠিক নয়, আমি এর ভাল-মন্দ তেমন বুঝিও না। তা ছাড়া নিজের দায়িত্বে একটা কিছু ক'রে ফেলে শেষে যদি গোলমাল হয়, সুশীলা আমাকে—

কথাটা শিরীষবাবু শেষ করিলেন না, সুশীলার দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া গিয়া পুনরায় নাকটা ঝাড়িলেন। মুকুজ্জেমশাই ও সুশীলা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

অগত্যা স্থির হইল, মুকুজ্জেমশাই রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুকে লইয়া অম্বিকাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তৎপূর্বে কিছুই হইবে না।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, যাই, তা হ'লে মন্টুকে একটা চিঠি লিখে দিই, কাল সকালের ট্রেনেই যাব।

মুকুজ্জেমশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলে সুশীলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন ও বলিলেন, সত্যিই তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে না কি? দেখি—

কি দেখবে?

সুশীলা উঠিয়া স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন।

শিরীষবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, ও তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু সর্দির মত।

গা-টা কিন্তু ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে, আজ বরং ভাত খেয়ে কাজ নেই, রুটি দুখানা ক'রে দিই, শুকনো-শাকনা খেয়ে থাকাই সর্দির ওষুধ—সাবধান হওয়াই ভাল, মোজা পায়ে দাও।

শিরীষবাবু মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। সুশীলা আলনা হইতে গরম মোজা আনিয়া দিলেন। শিরীষবাবু মোজা পরিতে পরিতে বলিলেন, রুটি কিন্তু খাব না, বুঝলে?

তোমার কথা শুনছি কিনা আমি!

সুপারির ডালা লইয়া সুশীলাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন।

শিরীষবাবু মুখবিকৃতি করিয়া গরম মোজাকে গোড়ালি পার করাইতে লাগিলেন। এ কি বিপদে পড়িয়া গেলেন তিনি!

রান্নাঘর হইতে অমিয়াকে দেখিয়া সুশীলা মনে মনে প্রার্থনা করিতে ঠাকুর, ওর শিব-পূজো যেন সার্থক হয়, শঙ্করের সঙ্গেই ওর যেন বিয়ে হয়।

অমিয়া উঠানের ও-ধারে মাটির শিব গড়িয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছিল। যদিও মুকুজ্জেমশাই শিব লইয়া যখন-তখন তাহাকে ঠাট্টা করেন, তবু সে শিব-পূজা ছাড়ে নাই। তাহার মনের গহনে যে চিরন্তনী উমা বসিয়া আছে, তাহার তপস্যায় বাধা দিবার সামর্থ্য তাহার নিজেরও নাই।

২

বেলা মল্লিকের বাসায় প্রফেসর গুপ্ত বসিয়া ছিলেন।

বেলা বাড়িতে নাই, বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। জনার্দন সিংহের 'জেরাসে ঠাহর যাইয়ে হুজুর' এই কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া প্রফেসর গুপ্ত বাহিরের ঘরটাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলার নিকট আসিবার একটা অজুহাত অবশ্য প্রফেসর গুপ্তের আছে, সর্বদাই থাকে, এবং সে অজুহাতগুলি যে যুক্তিসহ নহে, তাহাও প্রফেসর গুপ্ত এবং বেলা উভয়েই জানেন। কিন্তু না-জানার ভান করেন। আজ প্রফেসর গুপ্ত আসিয়াছিলেন বেলাকে জানাইতে যে, তাঁহার কন্যা মান্তু মামার বাড়ি গিয়াছে, আজ আর বেলার সন্ধ্যাকালে পড়াইতে যাইবার দরকার নাই। এ খবরটা কোন-চাকরকে দিয়া পাঠাইলেই চলিত, কিন্তু—

আধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বেলা দেবীর দেখা নাই। কখন যে তিনি ফিরিবেন, তাহা জনার্দন ঠিক বলিতে পারিল না। বোস সাহেবের পত্নীকে বেলা সকালের দিকে এস্রাজ শিখাইতে যান, তাহা প্রফেসর গুপ্ত জানেন। সেখানে এতক্ষণ দেরি হইবার কথা নয়। প্রফেসর গুপ্ত আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, আর একবার হাতঘড়িটা দেখিলেন, অবশেষে হতাশ হইয়া এক টুকরা কাগজে তাঁহার আগমনবার্তা এবং আগমনের হেতু লিখিয়া জনার্দনের হাতে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার 'কার'টা যখন

[?]স হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সাত নম্বরের বাড়ির দ্বিতলের বাতায়ন হইতে বেলা যখন তাহা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনিও নামিয়া আসিলেন।

এই গলির সাত নম্বরের বাড়ির বাসিন্দাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে বেলার ভারি সুবিধা হইয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সান্নিধ্য এড়াইবার প্রয়োজন যখনই ঘটে (এবং সে প্রয়োজন অধুনা প্রায়ই ঘটিতেছে), বেলা সাত নম্বরের বাড়িতে আত্মগোপন করেন এবং যতক্ষণ না প্রফেসর গুপ্তের 'কার'টা চলিয়া যায়, ততক্ষণ সেখানে বসিয়া গল্পগুজব করিতে থাকেন। একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যতীত সাত নম্বরের বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই। বেলার সমবয়সী একজন এবং বেলার চেয়ে ছোট তিনজন মেয়েকে লইয়া বিপত্নীক বৃদ্ধ হলধরবাবু সাত নম্বরে বাস করেন। হলধরবাবু পিতৃভাবাপন্ন, মেয়েগুলি মিশুকপ্রকৃতির, বেলার সহিত বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। বড় মেয়েটি কলেজে এবং বাকি মেয়েগুলি স্কুলে পড়ে। বড় মেয়েটি বেলাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এবং বেলা তাহাকে গান বাজনা শিখিতে সহায়তা করিবেন, এরূপ একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

আজ শৈলদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া গলিতে ঢুকিয়াই প্রফেসর গুপ্তের 'কার'খানা চোখে পড়িতেই বেলা সোজা সাত নম্বরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। 'কার' চলিয়া গেলে নিশ্চিন্ত চিত্তে নামিয়া আসিলেন এবং জনার্দন সিংহের নিকট হইতে প্রফেসর গুপ্তের গমন ও আগমন সংবাদটা এমনভাবে শুনিলেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না। প্রফেসর গুপ্তের লেখা কাগজখানাও অত্যন্ত নির্বিকারভাবে দেখিলেন।

আজ রবিবার, তাড়াতাড়ি স্নানাহারটা সারিয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে, তাহা না হইলে আবার কেহ হয়তো দয়া করিয়া আসিয়া জুটিয়া যাইবেন। বিগত কয়েকটি রবিবারের অভিজ্ঞতা হইতে বেলা দেবী স্থির করিয়াছেন যে, রবিবারটা তিনি বাহিরেই কাটাইবেন। একের পর এক পুরুষ বন্ধুর অভ্যাগম, আর কিছু না হউক, দৃষ্টিকটু।

স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বেলা দেবী বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকের শুষ্ক মুখ, চুল উস্কখুস্ক, চোখে এমন একটা দৃষ্টি যাহা অল্প কথায় বর্ণনা করা শক্ত। ভয় এবং মরিয়া ভাব, ভালবাসা এবং রাগ, বিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তা প্রিয়বাবুর চকিত দৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল।

দাদা যে হঠাৎ?

প্রিয়বাবু নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে চল, বলছি।

উভয়ে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রিয়বাবু ইতিপূর্বে নিজে বেলার নিকট আসেন নাই, তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এবং বেলার ঘরখানি পরিপাটিরূপে সজ্জিত দেখিয়া তিনি কেমন যেন একটু খতমত খাইয়া গেলেন। মনে মনে বেলার যে দৈন্য-নিপীড়িত অবস্থা তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে বাস্তবের কিছুমাত্র মিল নাই দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন না, ভয় পাইয়া গেলেন। বেলা তো বেশ সুখেই আছে! আর যাই থাক, বেলার আধিভৌতিক কোন দুঃখ নাই, তাহা ঠিক।

তাঁহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, তিন মাস পরে আজ হঠাৎ এসে পড়লে যে? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে নাকি?

প্রিয়বাবুর সহসা যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল, চোপ রও, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

প্রিয়বাবু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। প্রিয়বাবুর ক্রোধের আকস্মিকতা ও অযৌক্তিকতার পরিচয় বেলা ইতিপূর্বে বহুবার পাইয়াছেন, সুতরাং তিনি বিস্মিত হইলেন না, একটু মৃদু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রিয়বাবু কিছুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি এ কি করিয়া বসিলেন! আসিয়াছেন বেলাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য, তাঁহার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য নয়; কিন্তু হঠাৎ তিনি এ কি

বলিয়া ফেলিলেন। রাগারাগি করিবার জন্য তো তিনি আসেন নাই। নিকটেই একখানা চেয়ার ছিল, তাহার উপর বসিলেন এবং নিস্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; আত্মধিক্কারে তাঁহার সমস্ত মন যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই খাপছাড়া রাগের জন্য জীবনে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বহুবার লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইল না। হঠাৎ পাশের ঘরে স্টোভ জ্বালার শব্দে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বেলা স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইতেছে।

তুমি ওই ঘরেই ব'স, চা ক'রে নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।

কোনও কথা না বলিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, মেয়েটার শরীর রক্ত-মাংসের, না, পাথরের?

একটু পরে বেলা রেকাবিতে কিছু জলখাবার এবং এক বাটি চা আনিয়া তাঁহার সামনে একটি ছোট টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, খাও।

খাব? আমি কি এখানে খাবার জন্যে এলাম?

বেলা এক গ্লাস জল আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন, খাবার জন্যে কেউ কারও বাড়িতে যায় নাকি? তবে অতিথি এলে চা জলখাবার দেওয়াটা ভদ্রতার একটা অঙ্গ।

আমি কি অতিথি নাকি যে, আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে?

বেলা কিছু না বলিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন এবং একটা ডিসে কয়েক খিলি পান লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আগে আমার কথার একটা জবাব দে, তা না হ'লে কিছু খাব না আমি।

বল।

আমার কাছে ফিরে যাবি কি না?

না।

রাগের মাথায় একটা কথা ব'লে ফেলেছি, সেইটেকেই বড় ক'রে দেখতে হবে?

বড় ক'রে দেখতাম না, যদি সেটা সত্যি কথা না হ'ত। আমি ভেবে দেখেছি, তুমি সেদিন যা বলেছিলে, সেটা খুব বড় সত্যি কথা, তার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

কি সত্যি কথা?

মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি ব'লেই যে চিরকাল তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে—এর কোনও মানে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত—তা সে মেয়েমানুষই হোক বা পুরুষমানুষই হোক।

তার মানে?

তার মানে, আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।

আমার কাছে থাকা মানে তা হ'লে কি পরাধীনতা বলতে চাও? আমি কি তোমার পর?

পর কেন হতে যাবে, কিন্তু আমি মেয়েমানুষ ব'লেই চিরকাল তোমার উপার্জনে ভাগ বসাব কেন? তাতে আমারও সম্মান নেই, তোমারও সম্মান নেই।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন

চা-টা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দিকে মনোযোগ না দিয়া প্রিয়বাবু বলিলেন, বেশ তো, রোজগার করতে চাও রোজগার কর, কিন্তু আমারই কাছে থাক, আলাদা বাসা করবার দরকার কি?

আলাদা থাকলে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, একসঙ্গে থাকলে তা সম্ভব নয়। পরস্পরের স্বাধীনতা খর্ব ক'রে একসঙ্গে বাস করার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না আমি।

খুব লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস তো!

বেলা কোনও উত্তর দিলেন না।

যাবে না তা হ'লে ফিরে ?

না।

প্রিয়বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

উঠলে যে, খাবে না ?

খাবার জন্যে আমি আসি নি। চললাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার মনে এই যে কষ্ট দিচ্ছ, এর ফল ভাল হবে না, জেনে রেখো। শুধু আমার মনে নয়, অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছ তুমি, লক্ষ্মণবাবুর মত ছেলে তোমারই জন্যে আত্মহত্যা করেছে। এ সবের ফল কখনও ভাল হয় না—কখনও না, কখনও না। এই তেজ বেশি দিন থাকবে না।

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে গিয়া প্রিয়বাবুর মাথাটা চৌকাঠে ঠুকিয়া গেল, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বেলা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লক্ষ্মণবাবুর তরুণ বিহ্বল মুখচ্ছবিটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

খুট করিয়া শব্দ হইল।

বেলা চাহিয়া দেখিলেন, শঙ্কর দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্করবাবু যে, আসুন।

শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর আসাতে বেলা যেন অনেকটা আত্মস্থ হইলেন। হাসিয়া বলিলেন, এমন অবস্থা কেন আপনার ? চান করেন নি নাকি ?

শঙ্কর সত্যই কয়েকদিন স্নান করে নাই। কাপড় ময়লা, গরম জামার পিছন দিকটায় দেওয়ালের চুন লাগিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, চুল উস্কখুস্ক।

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল, শরীরটা ভাল নেই, জ্বর হয়েছে বোধ হয়।

সেইজন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?

একটা ভীষণ দরকারে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি। কিছু টাকা চাই—ধার।

ওমা, টাকা ধার চাইবার আর লোক পেলেন না আপনি? ক টাকা?

গোটা দশেক হ'লেই আপাতত চলবে।

এখন দশ টাকা তো আমার হাতে নেই। কাল শৈলদি মাইনে দেবেন, কাল বরং দিতে পারি।

শৈলদি কে?

মিসেস এল. কে. বোস। তিনি তো আপনাকে চেনেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, সে কি গান শিখছে আজকাল আপনার কাছে?

গান নয়, বাজনা আর একটু একটু ইংরিজী।

আপনার সঙ্গে যে আলাপ আছে আমার—সে কথা বলেছেন শৈলকে?

না, বলি নি।

বলবেন।

ব'লে চাকরিটি খোয়াই আর কি!

তার মানে?

আপনার সঙ্গে আর কারও ভাব থাকতে পারে—এ শৈলদির পক্ষে অসহ্য।

শঙ্কর একটু হাসিল।

বেলা বলিলেন, চা খাবেন?

খেতে পারি।

প্রিয়বাবুর চা ও জলখাবারটা বেলা শঙ্করকে বসাইয়া খাওয়াইলেন।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, শৈলর মনোভাবটা কি ক'রে বুঝলেন আপনি?

অনেক কথা আমরা—মেয়েরা—বুঝতে পারি।

তবু বলুন না একটু, শুনি।

তা হ'লে চলুন, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। আমাকে এক জায়গায় বেরোতে হবে, কাজ আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই শঙ্কর বলিল, এইবার বলুন।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, এই ধরুন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। রিনির সঙ্গে আপনার বিয়েটা যখন ভেঙে গেল, তখন শৈলদি ভারি খুশি। একমুখ হেসে বললেন—শঙ্করদাকে জানি তো ছেলেবেলা থেকে, ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি, রিনির মত মেয়েকে দেখে গ'লে পড়বার ছেলেই ও নয়। আমার তখুনি মনে হয়েছিল, ওসব বাজে গুজব, শঙ্করদা বিয়ে করবে রিনিকে—তবেই হয়েছে!

এই পর্যন্ত বলিয়া বেলা দেবী থামিলেন, চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল কেন বলুন তো?

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

বেলা দেবী এই নীরবতা-প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পাশের একটি গলি হইতে একটি সুদৃশ্য মোটরকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল এবং একবার হর্ন দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি কদিন থেকে।

আমাকে? কেন বলুন তো?

অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং স্মিত মুখে বলিলেন, হস্টেলে যাচ্ছিলাম, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আমার।

তাহার পর বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইনি কি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন? চলুন না, কিছু যদি মনে না করেন, লিফ্ট দিয়ে দিই আপনাদের।

বেলা বলিলেন, না, ধন্যবাদ, আমি অন্য জায়গায় যাব। শঙ্করবাবু, আপনি যান ওঁর সঙ্গে, আমি একাই যাচ্ছি।

সকলেই যখন কি করিবেন ইতস্তত করিতেছেন, তখন অচিনবাবু শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ইনি কি প্রফেসর মিত্রের কেউ হন নাকি? মিষ্টিদিদির ওখানে ওঁকে দেখেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না।

শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

না, মিষ্টিদিদির কেউ হন না ইনি। ইনি হচ্ছেন মিস বেলা মল্লিক, গান-বাজনা খুব ভাল জানেন, অনেককে শিখিয়েও থাকেন। আর ইনি হচ্ছেন অচিনবাবু, মোটরকারের দালালি করেন।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিলেন।

অচিনবাবু নামটা শুনিয়া বেলা মনে মনে একটু উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকই তাহা হইলে শিক্ষয়িত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং ইঁহারই আশ্রয় পরিহার করিয়া চলিতে প্রফেসর গুপ্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন! অচিনবাবু বেলা দেবীকে এক নজর আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, কিছুদিন আগে আপনিই কি আমার কাছে শিক্ষয়িত্রীর একটা পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন? বেলা মল্লিক নামটা মনে পড়ছে যেন।

প্রথম প্রথম অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার কাছেও হয়তো ক'রে থাকব।—বেলা দেবী হাসিয়া উত্তর দিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, বাইরে—মানে, কলকাতার বাইরে মেয়ের সঙ্গে থাকবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর দরকার আমার একজন বন্ধুর। ভাল লোক পাই নি এখনও তেমন। আপনি যান্ তো এখনও যোগাড় ক'রে দিতে পারি। মাইনে পঞ্চাশ থেকে শুরু, একশো পর্যন্ত হবে। রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল জমিদার-ফ্যামিলি—

না, ধন্যবাদ। আমার আর দরকার নেই।

একটু থামিয়া বেলা দেবী বলিলেন, আপনারা যান তা হ'লে। আমি চললাম, আমার একটু কাজ আছে, নমস্কার।

বেলা দেবী চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অচিনবাবু বলিলেন, বেশ সপ্রতিভ মহিলাটি।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ।

শঙ্কর অচিনবাবুর মোটরে চড়িয়া বসিল, অচিনবাবু স্টার্ট দিলেন। কিছুদূরে গিয়া অচিনবাবু বলিলেন, হস্টেলেই ফিরবেন এখন? চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক, সন্ধ্যেবেলা হস্টেলে পৌঁছে দেব আপনাকে।

চলুন।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, দরকারটা কি?

চলুন, বলছি।

শঙ্কর কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় মুক্তোর সহিত দেখা করিতেই হইবে। অচিনবাবুর পাল্লায় পড়িয়া আবার দেরি না হইয়া যায়!

গড়ের মাঠের কাছাকাছি আসিয়া অচিনবাবু গাড়ির গতিবেগ কমাইলেন এবং নির্জন একটা স্থান দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন। সিগারেট-কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া শঙ্করকে দিলেন ও নিজে খাইলেন।

চলুন, একটু বসা যাক।

উপবেশন করিলে শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বলুন তো?

ভন্টুবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে?

আছে।

মৃন্ময়বাবু ব'লে ভন্টুবাবুর একজন বন্ধু আছেন, জানেন আপনি?

জানি।

মৃন্ময়বাবু লোকটি ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন, তিনি অকারণে আমার পেছনে লেগেছেন।

আপনার পেছনে? কেন, কারণটা কি?

কিছুই কারণ নয়, পুলিসের লোকেদের কারণের অভাব থাকে নাকি, খাড়া করলেই হ'ল একটা।

একটু নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

আপনি ভন্টুবাবুকে ব'লে একটু ইন্‌ফ্লুয়েন্স্ করতে পারেন যদি, বড় ভাল হয়।

বেশ বলব আমি ভন্টুকে।

তাহার পর হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এই ব্যাপারের জন্যে এত! আগে বললেই হ'ত।

অচিনবাবু সিগারেটের ছাইটা ঝাড়িয়া বলিলেন, না, আর একটা কথাও আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটা গুজব শুনেছিলাম—রিনির সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে; এখন আবার গুজব শুনছি—হচ্ছে না। কোন্‌টা সত্যি বলুন তো?

দুই-ই সত্যি, হবে ঠিক হয়েছিল, এখন ভেঙে গেছে।

ভেঙে গেল কেন?

সে অনেক কারণে।

অচিনবাবু প্রশ্ন করিলেন, ভেঙে গেছে—এটা ঠিক?

ঠিক।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এসব কথা জিজ্ঞেস করবার মানে?

আমার একটা উপকার করবেন?

কি বলুন?

আমরা স্বজাতি, আমার একটি মেয়ে আছে নেবেন তাকে? দেখতে সে সুশ্রী, পণও আমি যথাসাধ্য দেব। ওই আমার এক মাত্র মেয়ে, আর আমার কেউ নেই। আপনার মত ছেলের হাতে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

আমার মত ছেলের হাতে! আমার কতটুকু জানেন আপনি?

যা জানি, তাই যথেষ্ট। আপনি রাজী কি না বলুন, আপনি মত দিলে আপনার বাবাকে চিঠি লিখব।

আমি বিয়েই করব না।

একেবারেই না ?

একেবারেই না। তবে আপনার মেয়ের জন্যে অন্য পাত্র চেষ্টা করতে পারি। মেয়েটি কোথা ?

মেয়েকে দেশে রেখেছি মশাই, এ কলকাতা শহরের যা কাণ্ডকারখানা, তাতে মেয়েকে এখানে রাখতে ভরসা পাই না। দেশে আছে সে। দরকার হ'লে আনতে পারি।

ওরই জন্যে কি শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন নাকি ?

না, ওর জন্যে নয়, আমি অত টাকা কোথায় পাব বলুন ? ও আর একজনের জন্যে।

অচিনবাবু সিগারেটে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, আপনি বিয়েই করবেন না ঠিক ক'রে ফেলেছেন ?

হ্যাঁ।

কারণটা জানতে পারি কি ?

শঙ্কর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, আমাদের মত ভাল ছেলের পক্ষে বিয়ে ক'রে গোল্লায় যাওয়া উচিত নয়। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র আমাদের আহ্বান করছে।

অচিনবাবু একটু হাসিলেন।

বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। নানা রকম মামুলী কথাবার্তা চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে তাহাও বন্ধ হইল। নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল মুক্তোর কথা; এবং অচিনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলার সহিত তিনি আর একবার দেখা করিবেন কি না, করিলে কি ভাবে কোথায় করিবেন!

৩

শ্রীমৎ মুক্তানন্দ স্বামী ওরফে উমেশচন্দ্র অতিশয় চিন্তিত বিব্রত ভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরটা ধড়াস-ধড়াস করিতেছিল। চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার, বাহিরে খরস্রোতা গঙ্গার অবিরাম কল-কলধ্বনি, রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছন্দ লাভ করিয়াছে। মুক্তানন্দ একা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া কিছুদিন হইল তিনি হরিদ্বারে কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আতিথ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশবাস দেখিয়া পাণ্ডাজী তাঁহাকেই ভক্তিভরে আশ্রয় দিয়াছেন। মুক্তানন্দ সুখেই ছিলেন, বেশ সুন্দরই লাগিতেছিল, এমন কি মনে মনে কল্পনাও করিতেছিলেন যে, অবশিষ্ট জীবনটা এইখানেই বোধ হয় অতিবাহিত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। নিকটস্থ চণ্ডীপাহাড়ে বা অন্য কোন নির্জন স্থানে একটা আস্তানা বানাইয়া ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী নাম-জপ করিয়া বাকি জীবনটা বেশ সুখেই কাটিয়া যাইবে। বিশ্বাস মহাশয় নামক স্থানীয় ভক্ত ব্যক্তিটি এ বিষয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ কি হইল, একটা সামান্য স্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত মন বিকল হইয়া গেল।

স্বপ্নে তিনি দেখিলেন, ভন্টু যেন প্রকাণ্ড একটা রোলারের তলায় চাপা পড়িয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। রোলারের চাপ এত ভীষণ যে, ভন্টুর মুখ দিয়া, নাক দিয়া, এমন কি চোখ দিয়া রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পথ দিয়া জনতার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহই ভন্টুর দিকে দৃক্‌পাত করিতেছে না। ভন্টু আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, তাহার রক্তে রাস্তার খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে, কাহারও কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় ঠাকুর আসিলেন, ভন্টুর দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি কি করিব বল, তোমার নিজের লোকই যখন তোমাকে

ছাড়িয়া মুক্তির জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন আমি আর কি করিতে পারি ?

ঠাকুর চলিয়া গেলেন, ভন্টু আর্তনাদ করিতে লাগিল। এ রকম স্বপ্নের মানে কি ? স্বপ্নের কি কোন অর্থ আছে ? এ স্বপ্নের কি অর্থ হইতে পারে ? সত্যিই ভন্টু বিপন্ন নয় তো ? বিমূঢ়ের মত একা বসিয়া মুক্তানন্দ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কলনাদিনী গঙ্গার কলকলধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

৪

পরদিন দ্বিপ্রহর।

শঙ্কর মুক্তোর বিছানায় চুপচাপ একা শুইয়া ছিল। মুক্তো ঘরে ছিল না। মুক্তোর ঘরখানি ছোট, কিন্তু বেশ গোছানো। দুইখানি তক্তাপোশ রহিয়াছে, একখানি অপেক্ষাকৃত নীচু ও ছোট, অপরটি উঁচু ও বড়। বড় খাটটিতে পুরু গদি, ফরসা চাদর, ফরসা বালিশ। শঙ্কর ইহারই উপর শুইয়া ছিল। শুইয়া শুইয়া সে বহুবার-দেখা আসবাব-পত্রগুলি পুনরায় দেখিতেছিল। ছোট গ্লাস-কেসটি বেশ পরিচ্ছন্ন, নানা রকম রঙিন শাড়ি পাট করা রহিয়াছে অনেক। দেওয়ালে নানা রকম ছবি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মেম-সাহেব, কালীঘাটের পট, পুরীর জগন্নাথ। গত কার্তিক-পূজার কার্তিকের ময়ূরের পালকগুলি এক কোণে টাঙানো আছে। এক ধারে একটি আলনা। আলনায় মুক্তোর নিত্য-ব্যবহার্য কাপড়-জামা এবং তাহারই এক ধারে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি ঝুলিতেছে। মুক্তোর বাঁধা বাবুর লুঙ্গি ও গেঞ্জি। তিনি প্রত্যহ রাত্রি দশটায় আসেন, সমস্ত রাত্রি থাকেন। মুক্তোর সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত খুব পাকাপাকি রকম। রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুক্তো ইচ্ছা করিলে অপর লোক বসাইতে পার, কিন্তু দশটার পরে মুক্তোর কক্ষে অপর কাহারও প্রবেশ নিষেধ। তবে যদি কোন দিন কোন কারণে আসিতে না পারেন, সেদিন মুক্তোর

ছুটি এবং সে ছুটি মুক্তো নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে। এদিক দিয়া ওরফে দশরথবাবু ব্যবসায়ী ব্যক্তি এবং খাঁটি লোক, সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থায় কোন রকম খুঁত নাই। দশরথবাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি রোজ যে আসেন তাহা নয়; কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা এইরূপ। বলা বাহুল্য, মুক্তোর সহিত তাঁহার হৃদয়ঘটিত কোন ঝামেলা নাই, সম্পর্কটা নিতান্তই আধিভৌতিক। প্রথম দিনই আসিয়া শঙ্করের চোখে পড়িয়াছিল, আজও আবার পড়িল, কবে কে যেন দেওয়ালের উপর লাল পেন্সিল দিয়া লিখিয়া গিয়াছে, 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!' কে এই দার্শনিক? এমন মর্মান্তিক একটা বচন এমন মর্মান্তিক স্থানে লিখিয়া গিয়াছে! রোজই শঙ্কর লেখাটি পড়ে। মুক্তোকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, লেখকটি কে? মুক্তো বলে, জানি না বাবু, কত লোক আসে যায়, কে কখন লিখেছে, অত খেয়াল করি নি। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে।

অদ্ভুত মেয়ে এই মুক্তো! এতদিন ধরিয়া শঙ্কর এখানে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু মেয়েটির স্বরূপটি যে কি, তাহা আজও সে বুঝিতে পারে নাই। কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁয়া দেয় না। হাসে, নাচে, গান গায়, মদ খায়, বৈকালে গা ধুইয়া চুল বাঁধিয়া চোখে কাজল দিয়া রঙিন শাড়িটি কায়দা করিয়া পরিয়া গালে ঠোঁটে রঙ মাখিয়া খোঁপায় ফুলের মালা পরিয়া রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়ায়, ভঙ্গীভরে সিগারেট টানে, কথায় কথায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, চটিয়া গেলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, অন্ধ-আতুর দেখিলে পয়সা দেয়, গঙ্গাস্নান করিতে যায়, মেনি বিড়ালকে আদর করে, দশরথের জন্য প্রত্যহ হাঁসের ডিমের ডালনা ও পরোটা বানায়, সামনের চপ-কাটলেটওয়ালাটার সঙ্গে দুই-এক পয়সার জন্য ইতরের মত কলহ করে, ঘরে লুকাইয়া মদের বোতল রাখে এবং তাহা সুযোগমত শাঁসালো কাপ্তেনের নিকট দুর্মূল্যে বিক্রয় করে। কিন্তু শঙ্করের মনে হয়, আসল ব্যক্তিটি অন্তরালে আছে, সে কখনও ভুলিয়াও পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে না। তাহাকে একটু একটু যেন চেনা যায়, যখন সে দুপুরে

জানি বারান্দাটুকুতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকায়। মনে হয়, উহাই যেন তাহার জীবনের সত্য আকাঙ্ক্ষা, ও যেন আর কিছু চায় না, নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজের ঘরের দাওয়াটিতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে চায়।

শঙ্কর উঠিয়া বসিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, মুক্তো বারান্দায় বসিয়া চুল শুকাইতেছে কি না! দেখিল, মুক্তো নাই। তাহার চোখে পড়িল, উষা নাম্নী ওধারের ঘরের মেয়েটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া নিজের ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল। মুক্তো কোথায় আছে, কে জানে! রোজই দুপুরে শঙ্করকে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া মুক্তো বাহিরে চলিয়া যায়, কাছে বসিতে চায় না। অথচ শঙ্কর কলেজ পলাইয়া আসে তাহারই সঙ্গ-কামনায়। কিন্তু মুক্তো কেমন যেন ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। 'আসছি, বসুন।'—বলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া সে বাহির হইয়া যায় এবং পাশের ঘরে হাসি-গল্প করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া তবে আসে। আসিয়াই আবার কোন ছুতায় বাহির হইয়া যাইতে চায়। দশরথের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা যেরূপ সুনির্দিষ্ট, শঙ্করের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা এখনও সেরূপ হয় নাই। শঙ্কর মুক্তোকে একদিন দশটা টাকা জোর করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে দর-কষাকষি করিতে তাহার যেন বাধ-বাধ ঠেকে। তা ছাড়া শঙ্করের সামর্থ্যই বা কতটুকু? তাহার বাবা মাসে মাসে তাহাকে টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তাহাই তাহার সম্বল। বলা বাহুল্য, তাহা এসব ব্যাপারের পক্ষে মোটেই প্রচুর নয়। এমনিই তো হস্টেলের অনেকের কাছে ধার জমিয়া আছে। কি করিয়া শঙ্কর যে কি করিবে, তাহা সে নিজেই জানে না। অতিশয় আঁকা-বাঁকা বিপদসঙ্কুল পথে অন্ধ নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া সে চলিয়াছে। নিজের দুর্দম বাসনার আবেগই তাহার শক্তি, আর কোন সম্বল তাহার নাই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই পতিতা নারীটির মধ্যেই সে মানসীকে খুঁজিতেছে!

মানুষের কত দ্রুত পরিবর্তন হয়! দুপুরে কলেজ হইতে পলাইয়া

গণিকা-পল্লীতে আসিয়া একটি গণিকার বিছানায় সে শুইয়া থাকিবে—কিছুদিন পূর্বে ইহা কি তাহার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল? রিনিকে ঘিরিয়া যখন সে তাহার স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতেছিল, তখন কোথায় ছিল এই মুক্তো? মুক্তোর মত মেয়ের সান্নিধ্য সে কি তখন কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারিত? কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্তে সে আর মুক্তো কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে এবং পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। রিনি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে, রিনির সংস্পর্শে তাহার মনের তন্ত্রীতে যে-সুর বাজিয়াছিল, মুক্তোর সংস্পর্শে আসিয়াও ঠিক সেই সুরই বাজিতেছে। মুক্তো অশিক্ষিতা গণিকা বলিয়া সে সুর কিছুমাত্র কম উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছে না। প্রথম দুই-চারি দিন তাহার তথাকথিত ভদ্র-অন্তঃকরণে একটু দ্বিধা জাগিয়াছিল, কিন্তু সে দুই-চারি দিন মাত্র। প্রথম প্রথম নিজের প্রতি ধিক্কার হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রথম প্রথমই। এখন শঙ্করের কাছে মুক্তো গণিকা—এই কথাই বড় নয়, মুক্তো নারী—এই কথাই বড়। শুধু নারী নয়, লাঞ্ছিতা অবনমিতা নারী। সমাজের অত্যাচারে, পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উদরান্নের জন্য দেহ-বিক্রয় করিতেছে। উহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনীকে আহরণ করিয়া প্রেমের পূত মন্দিরে নির্মাল্য রচনা করিতে হইবে। মুক্তোকে তাহার চাই, একান্তভাবে চাই, তাহার চরিত্রের সমস্ত মলিনতা সত্ত্বেও চাই। আর কেহ তাহার কাছে আসিতে পাইবে না—যেমন করিয়া হোক দশরথকে তাড়াইতে হইবে। সমস্ত কলুষ সত্ত্বেও মুক্তোর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে এবং সে নারীত্বের সম্মান শঙ্কর যদি না করে, তাহা হইলে বৃথাই তাহার শিক্ষা। ক্ষুধা—মানুষের এই আদিম ক্ষুধাটা মানুষকে কত স্বপ্নই না দেখায়! রিনির জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মোহ যেন ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। তাহাকে না পাইলে সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে মনে হইত, এখন তো আর তাহা মনে হয় না। অথচ মাত্র দুই মাস কাটিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে, যেন অতি দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে, রিনি যেন অতিদূর বিগত জীবনের একটা

সুখ-স্মৃতি মাত্র, আর কিছু নয়। মিষ্টিদিদি? মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে ঘৃণা ছাড়া আর কোনও মনোভাব শঙ্করের নাই। মুক্তো গণিকা বটে, কিন্তু মুক্তোকে দেখিয়া তো ঘৃণা করিতে প্রবৃত্তি হয় না! সে রূপোপজীবিনী, ওই তাহার পেশা। মিষ্টিদিদির মত ছদ্মবেশী ঘৃণ্য জীব সে নয়। আর একটু তলাইয়া দেখিলে শঙ্কর বুঝিতে পারিত, যে কারণে মুক্তো অ-ছদ্মবেশী, সেই কারণেই মিষ্টিদিদি ছদ্মবেশী। নিরপেক্ষ বিচারে মুক্তো ও মিষ্টিদিদির কোন তফাত নাই। কিন্তু মানুষের মন বিচিত্র জিনিস, সে নিরপেক্ষতার ভান করে, কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না, হইলে সে কখনও ভালবাসিতে পারিত না।

শঙ্কর একা শুইয়া শুইয়া মুক্তোর কথা ভাবিতেছিল, মুক্তো পাশের ঘরের জানালার ফুটো দিয়া নির্নিমেষ নয়নে শঙ্করকে দেখিতেছিল। গণিকাজীবনে অনেক রকম লোক সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখে নাই। এত অসহায়! মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ঠিক যেন ভিখারীর মত। আজ পর্যন্ত যত লোকের সংস্পর্শে মুক্তো আসিয়াছে, সকলেই ঝনাৎ করিয়া টাকা ফেলে, গায়ের জোরে দাবি করে—এ তো সে রকম নয়! এ অন্য জাতের মানুষ। অমন বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু শিশুর মত অসহায়; লাজুকও কম নয়, মুখ ফুটিয়া সহজে কিছু বলিতে চায় না; যদিই বা কিছু বলে, তাও এমন ভদ্র ভাষায়, শুনিলে হাসি পায়। নিশ্চয় বিদ্বান খুব, সেদিন একখানা বই হাতে করিয়া আনিয়াছিল, কত মোটা আর কত ভারী—আগাগোড়াই ইংরেজী। অথচ কথাবার্তা যেন ছেলেমানুষের মতন, কে বলিবে অত লেখাপড়া জানে! অমন লোকের এসব আঁস্তাকুড়ে আসা কেন বাপু? মাসীটিকে তো চেনে না! সেদিন তো মাসী তাহাকে বলিয়াই দিয়াছে, ওসব কাব্যি-মার্কা ছোঁড়াকে যেন আমল না দেয় সে। অথচ মাসী নিজের মুখেই তাহাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এখন বলিতেছে বিদায় করিয়া দিতে! কোন্ দিন হয়তো মুখের ওপর কি বলিয়া বসিবে! হঠাৎ খোঁপায় টান পড়িল।

ফিরিয়া দেখিল, টিয়া। এটি তাহারই ঘর।

টিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, ঢঙ দেখে আর বাঁচি না! ঘরে গিয়ে নয়ন ভ'রে দেখ্ না! উঁকি দেওয়া কেন?

মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, খোঁপাটা খুলে দিলি, জড়িয়ে দে ভাল ক'রে।

আর জড়িয়ে দেয় না, এলো-খোঁপাতেই বেশ দেখাচ্ছে। এমনিতেই গ'লে পড়েছে, কিছু করতে হবে না, যা।

সবাই তো আর তোর মালবাবু নয়।—মুচকি হাসিয়া খোঁপাটা জড়াইতে জড়াইতে মুক্তো বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, অতিথির খবর কি, চা আনাব?

শঙ্কর শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল।

না, চা দরকার নেই।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, আমাকে তুমি অতিথি ব'লে ডাক কেন বল তো?

অতিথিকে অতিথি বলব না তো কি বলব, আপনি তো খদ্দের নন ঠিক।

শঙ্কর ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। ইহার উত্তরে ঠিক কি বলা উচিত, সহসা তাহার মাথায় আসিল না।

একটু পরে বলিল, খদ্দের মানে কি?

মুক্তো গা দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর'—এই কথা যাকে বলতে পারা যায়, সেই হ'ল খদ্দের।

আমাকে সে কথা বলতে পার না?

মুক্তো বলিল, নিশ্চয় পারি, আজ না পারি কাল না পারি একদিন পারতেই হবে, রোজগার করতে বসেছি, দানছত্র তো খুলি নি।

মুক্তো বাহিরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর বলিল, একদিন না একদিন আপনাকেও খদ্দের হতে হবে। ওই দেখুন, একজন খদ্দের ঘুরঘুর করছে। আপনি কি থাকবেন এখন? না থাকেন তো রোজগার করি কিছু।

শঙ্কর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিল, আবক্ষ-কাঁচাপাকা-দাড়ি এক ব্যক্তি সতৃষ্ণ নয়নে মুক্তোর দিকে চাহিয়া আছে।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

উঠছেন নাকি সত্যি সত্যি ?

অগত্যা উঠতে হবে বইকি, টাকা যখন সঙ্গে নেই—

মুক্তো বিস্ময়ের সুরে বলিল, সত্যি ? আজ এতক্ষণ ব'সে আছেন দেখে আমি ভাব্‌লাম বুঝি—

মুক্তো মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর কোন দিকে না চাহিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেই মুক্তোর মুখের হাসি নিবিয়া গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি একমুখ হাসি লইয়া আগাইয়া আসিতেছিল। মুক্তো তিক্ত কণ্ঠে বলিল, এখন এখানে হবে না।

সহসা তাহার নজরে পড়িল, শঙ্কর আবার ফিরিয়া আসিতেছে। মুক্তো তাহা দেখিয়া দাড়িওয়ালা লোকটিকে পুনরায় আহ্বান করিল, আচ্ছা, আসুন আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ঢুকিতেই মুক্তো ঘরে খিল দিল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া শঙ্কর বলিল, আমার বইখানা ফেলে গেছি।

কোনও উত্তর আসিল না। শঙ্কর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর মুক্তো বইখানার পাতা উল্টাইতেছিল, সাড়া দিল না। তাহার মনে হইল, ভালই হইয়াছে, বইখানার জন্যও অন্তত আর একবার আসিবে। কি অন্যমনস্ক লোক বাপ্‌।

৫

সকাল হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত দিনে বৃষ্টি ছাড়িবে বলিয়া আশা হয় না। শুধু বৃষ্টি নয়, এলোমেলো হাওয়াও বেশ জোরে বহিতেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ ছুটির দিন নয়, ভন্টু বেচারাকে আপিস যাইতেই হইবে। তা ছাড়া নানা স্থানে ঘুরিতেও হইবে। একটা গুজব শুনিতেছে, মেজকাকা নাকি পুনরায় আসিয়াছেন এবং গোয়াবাগানে সেই বন্ধুটির বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সেখানে একবার যাওয়া দরকার। আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবু নাকি অসুস্থ, সেখানে একবার না গেলে অন্যায় হইবে। তৃতীয়ত, তাহারই আপিসের একজন সহকর্মী তাহাকে অনেক করিয়া ধরিয়াছেন, বক্‌সি মহাশয়কে দিয়া তাঁহার কোষ্ঠীখানা গণনা করাইয়া দিতে হইবে, তিনি গরিব মানুষ, দুই টাকার বেশি দিতে পারিবেন না। ভন্টু প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, চেষ্টা করিবে, সুতরাং বক্‌সি মহাশয়ের নিকটেও যাইতে হইবে। চতুর্থত, চাম গ্যান্‌টঅ ক্ষরের বহুদিন কোন খবর নাই, সে ছোকরার কি হইল তাহা জানিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছে। পঞ্চমত, দাদার কাল একটি পত্র আসিয়াছে, লিখিয়াছেন, তাঁহার একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে। বউদিদির নিকটে সংবাদটি সে সযত্নে গোপন রাখিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে ধীরেন ডাক্তারের সহিত একটা পরামর্শ করা দরকার। ধীরেন ডাক্তার তো পাড়াতেই থাকে, এখনই পর্বটা সারিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। পাশের ঘরে ছেলেরা তারস্বরে পড়া করিতেছে। ভন্টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ছেলেদের পড়ার চাড় ভয়ানক বেশি, একটু অন্যমনস্ক হইলে এবং কাকা তাহা দেখিতে পাইলে রক্তারক্তি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভন্টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, এক মিনিটের জন্য তাহারা পড়া বন্ধ করে না। ভন্টুর মনে হইল, ধীরেনবাবু ডিস্পেন্সারিতে আছেন

কি না একবার খোঁজ লওয়া দরকার। এই বাদলার বাজারে যদি তাঁহার পুরাতন ওয়াটার-প্রুফটাও আজিকার মত বাগাইতে-পারা যায় মন্দ হয় না।

শন্টু!

শন্টু শুনিতে পাইল, কিন্তু এক ডাকে সাড়া দিলে পড়ায় মনোযোগ দেখানো হয় না। সে আরও জোরে পড়িতে লাগিল—The boy stood on the burning deck, whence all but—

শন্টু!

আজ্ঞে?

ভাল মানুষটির মত শন্টু আসিয়া দাঁড়াইল। বেশি মনোযোগ দেখাইলে অন্তরূপ বিপদ ঘটিয়া যাইবে হয়তো।

কটা বেজেছে দেখ্ তো।

শন্টু ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল, পৌনে আটটা।

চট ক'রে দেখে আয় তো একবার, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেন্সারিতে আছে কি না!

শন্টু চলিয়া গেল।

ভন্টু উঠিয়া বউদিদির ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ রান্নাঘরের দিকে গেল। গিয়া দেখিল, বউদিদি সশব্দে ডালে ফোড়ন সংযোগ করিয়া নাক-মুখ কুঁচকাইয়া হাঁড়ির ভিতর হাতা সঞ্চালন করিতেছেন। ভন্টুও অনুরূপভাবে নাক-মুখ কুঁচকাইয়া বউদিদির পিছনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি মুখ ফিরাইতেই বলিল, বাকুর কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না আজ! লেটেস্ট বুলেটিন কি?

বাবার আজ সকাল থেকে হাঁফটা বেড়েছে, ঠাণ্ডার জন্যে বোধ হয়।

উপায়?

খাওয়া-দাওয়া চুকলে সরষের তেল আর কর্পূর গরম ক'রে বুকে পিঠে আলিশ ক'রে দেব। ওষুধ তো উনি খাবেন না কিছুতে।

চা খান নি এখনও আজ?

এইবার ক'রে দেব। বলেছেন আথনির চা ক'রে দিতে।

বউদিদি একটু হাসিলেন।

ভন্টুও হাসিয়া বলিল, লর্ড বাকু কি সোজা চিজ! আমাকেও এক ঢোক দিও।

বাকুর সর্দি হইলে তিনি সাদা জলে চা খান না। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি পোলাওয়ের মসলা জলে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার পর তাহাতে চায়ের পাতা দিয়া চা প্রস্তুত করিতে হয়। ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া বউদিদি বলিলেন, দাঁড়াও, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

ভন্টুকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বউ দদি চলিয়া গেলেন।

ভন্টু মসলার থালা হইতে কিছু মসলা লইয়া চিবাইতে লাগিল। বউদিদি ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন, আদার রস মিশিয়ে দিলে একটু উপকার হ'ত—তা কিছুতে রাজী নন।

ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারেব একটি গুরুমশাই তুমি। এতদিনেও তুমি বাকুকে চিনলে না! হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড বাক্‌লাণ্ড্‌ চা-ও চান না, আদাও চান না, উনি চান—লিকুইড পোলাও। বাকুর কুর কুর কুর।

বলিতে বলিতে ভন্টু শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

আদার রস দিলে সর্দিটার একটু উপকার হ'ত। ভয়ানক ঝামরে রয়েছেন।

আদার ফাদার এলেও ঝামরানো কমবে না।

একটু থামিয়া ভন্টু পুনরায় বলিল, হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল মোজাজোড়া দেখে চটেন নি তো, একটু 'চিপিস' অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম, তাও বারো গণ্ডা পয়সা সাফ হয়ে গেল।

বউদিদি একটা ফরসা ন্যাকড়ায় আথনির জলের মসলাগুলি বাঁধিতেছিলেন। এই কথায় মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উল্টে-পাল্টে দেখলেন অনেকক্ষণ ধ'রে। বলেন নি কিছু।

তার মানেই চটেছেন। পছন্দ হ'লে বলতেন।

শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে, ধীরেন ডাক্তার ডিস্পেন্সারিতেই আছেন।—বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই চীৎকার শুরু করিল—The boy stood on the burning deck—

ভন্টু উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, তুমি চা-টা ততক্ষণ কর, চট ক'রে আমি ধীরেন ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি।

ধীরেন ডাক্তারের কাছে কেন ?

আসল সত্যটা গোপন করিয়া ভন্টু বলিল, দেখি যদি ওয়াটার-প্রুফটা বাগিয়ে আনতে পারি। কিন্তু বাই দি বাই, বিড্ডিকার, একটু তাড়াতাড়ি ভাত চাই আজ।

এই বাদলায় সকাল সকাল বেরিয়ে কি হবে ?

অনেক জায়গায় খজলাখজলি করতে হবে আজ।

খজলাখজলি কি ?—বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

এই কথাটা ভন্টু নূতন সৃষ্টি করিয়াছে, বউদিদি ইতিপূর্বে কথাটা শোনেন নাই।

ফইজৎ।—বলিয়া ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

বউদিদি কেৎলিতে জল দিয়া তাহাতে মসলার পুঁটুলিটি দিলেন এবং সেটি উনানে চড়াইয়া দিলেন। তাহার পর ক্ষণকাল ভাবিয়া চারটি পোস্ত বাহির করিলেন এবং তাহা বাটিতে লাগিলেন। ডাল ভাত হইয়া গিয়াছে, তরকারি যদি না-ও হইয়া উঠে, কয়েকটা পোস্তর বড়া ভাজিয়া দিলে ঠাকুরপোর খাওয়া হইয়া যাইবে।

জীর্ণ ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে দিয়া ভন্টু একটু সকাল সকালই বাহির হইল। উদ্দেশ্যটা ছিল, যাইবার মুখে গোয়াবাগানটা একটু ঘুরিয়া মেজকাকার সন্ধানটা লইয়া যাওয়া। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই সে দেখিতে পাইল, শঙ্কর ভিজিতে ভিজিতে ও-ধারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। শঙ্কর তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ভন্টু বাইক ঘুরাইল।

চাম গ্যানচঞ্জ! চাম গ্যানচঞ্জ!

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এ রকম অগাধ জলে ডুব মেরে ব'সে আছিস, ব্যাপার কি তোর?

শঙ্কর একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, ভন্টুকে সে এতদিন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিতেছিল। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হইয়া যাওয়ায় কি যে বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। একটু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসি অনেক সময় মানুষকে কথা কহিবার দায় হইতে রক্ষা করে।

ভন্টু বলিল, মিছিমিছি ভিজে লাভ কি, চল্, ওই গাড়ি-বারান্দাটার তলায় দাঁড়ানো যাক। থাম্ থাম্, সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে দেবে এক্ষুনি।

একটা মোটর বেগে বাহির বাহির হইয়া গেল।

নির্বিঘ্নে গাড়ি-বারান্দার তলায় পৌঁছিয়া ভন্টু বলিল, তোর ব্যাপার খুলে বল্ দিকিন। ডিটেলে ঢুকিস নি, সংক্ষেপে শাঁসটুকু দে।

অকস্মাৎ শঙ্করের সন্দেহ হইল, ভন্টু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছে। বলিল, ব্যাপার মানে?

মানে, তোর টিকি আন্ট্রেসেব্ল্। কোথা থাকিস আজকাল তুই?

প্রাক্টিক্যাল ক্লাস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।

রাত্তির নটা-দশটা পর্যন্ত প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস? কাকে ধাপ্পা মারছিস তুই!

শঙ্কর বলিল, এখন তুই যা, পরে সব বলব তোকে। এখন আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি এক জায়গায়। যাব একদিন তোদের বাড়ি।

আসছে রবিবারে আসিস। মেজোকাকা আবার ফিরেছেন।

তাই নাকি?

শুনছি তো। উঠেছেন গোয়াবাগানে, সেখানেই যাচ্ছি আমি।

গোয়াবাগানে কেন?

ঘোড়েল বাবাজীর কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

এ সংবাদ দুই মাস আগে শঙ্করের মনে আর কিছু না হোক কৌতূহল

উত্তিক্ত করিত, এখন তেমন কিছুই করিল না। আচ্ছন্নের মত ভন্টুর মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আশ্চর্য তো!

ভন্টু বাইকে চড়িয়া বলিল, এখন চললাম আমি, আস্রিস।

ভন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর যাইতেছিল প্রফেসর গুপ্তের নিকট টাকার চেষ্টায়। কিছু টাকার যোগাড় না করিতে পারিলে মুক্তোর নিকট আর মান থাকে না। ভিজিতে ভিজিতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসার উদ্দেশে চলিতে লাগিল।

ভন্টু গোয়াবাগানে গিয়া শুনিল যে, উমেশবাবু আসিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন বাড়িতে নাই, কখন ফিরিবেন তাহারও কোন স্থিরতা নাই। প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে ভন্টু ভাবিতে লাগিল, বাবাজী আসিয়াছেন তাহা হইলে! কিন্তু নিজের বাড়িতে না গিয়া বন্ধুর বাড়িতে অধিষ্ঠান করিবার মানে কি? এ রহস্যের উদ্ভেদ ভন্টু করিতে পারিল না। বাবাজী আসিলে গব্যঘৃত প্রভৃতির জন্য খরচ বেশ একটু বাড়ে, বাবাজী বন্ধুগৃহে অবস্থান করাতে খরচের দিক দিয়া ভন্টুর কিছু সুরাহা হইয়াছে, তথাপি ভন্টুর আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বাবাজীর এ কি ব্যবহার? রাস্তার একটা ঘড়িতে সে দেখিল, সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। ইচ্ছা করিলে নিবারণবাবুর খবরটাও এ বেলা সে লইতে পারে৷ বখেড়া মিটাইয়া রাখাই ভাল; ও-বেলা করালীচরণের ওখানে যাইতে হইবে। সে খপ্পর হইতে সহজে বাহির হওয়া মুশকিল।

টার্পেন্টাইন লেনে নিবারণবাবুর বাড়িতে গিয়া ভন্টু বিস্মিত হইল। কাল দোকানে মাস্টারের মুখে শুনিয়াছিল যে নিবারণবাবু ভয়ানক অসুস্থ, শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ ভন্টু দেখিল, ভদ্রলোক তো দিব্যি বসিয়া আছেন, অসুখের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভন্টুকে দেখিয়া নিবারণবাবুর মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আসুন আসুন ভন্টুবাবু, তারপর—হঠাৎ অকাল বোধন যে! এমন সময় তো আসেন না কোন দিন। আপিসে রেনি-ডে হয়ে গেল নাকি?

বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিতে রাখিতে ভন্টু বলিল, ভুলে যান সেসব কথা। আপনি কেমন আছেন তাই বলুন আগে।

যেমন রেখেছেন তেমন আছি। আমাদের আর থাকাথাকি কি, দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলেছি।

ওসব তো মামুলী লদ্‌কালদ্‌কি। অসুখ করেছে শুনলাম, কেমন আছেন তাই বলুন।

হাস্য-স্নিগ্ধ চক্ষে ভন্টুর প্রতি চাহিয়া নিবারণবাবু বলিলেন, মাস্টার বলেছেন বুঝি?

হ্যাঁ। কাল আর আসবার সময় পাই নি, আজ আপিস যাবার মুখে ভাবলাম, খবর নিয়ে যাই।

বেশ করেছেন এসেছেন, বসুন। খিচুড়ি খাবেন?

আমি ইটিং আপিস খুলে তবে বেরিয়েছি।

ইটিং আপিস মানে?

বিরাট ইটিং আপিস খুলেছি, আজ বউদিদি খুলিয়ে তবে ছেড়েছেন।

ইটিং আপিস কি মশাই?

খেয়ে বেরিয়েছি। তবু আনতে বলুন একটু খিচুড়ি, পুনরায় আপিস খোলা যাক। প্লেটে ক'রে সামান্য একটু আনতে বলুন, চেঁখে দেখা যাক। আপনার গিন্নীর হাতের রান্না খাই নি কখনও। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

গিন্নীর রান্না নয়, তিনি বাতের ব্যথায় কাতর, আজ ঠাণ্ডায় আরও আউরেছে। রেঁধেছে আস্‌মি।

ভিতর হইতে আস্‌মির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আমায় অমন টিকটিক ক'রো না ব'লে দিচ্ছি, পোড়া কড়া মেজে গা-গতর টাটিয়ে গেছে আমার, ব্যাসনটা তুমিই ফেনাও না, শেলাই-ফেলাই পরে ক'রো।

নিবারণবাবু হাঁকিলেন, ওরে আস্‌মি, শোন্ এদিকে।

তাহার পর অনুচ্চকণ্ঠে ভন্টুকে বলিলেন, আজ আবার ঝি-মাগী আসে নি, সব ওকেই করতে হচ্ছে, দার্জিটা তো কুটোটি পর্যন্ত নাড়বে না।

আস্‌মি দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিল।

খিচুড়ি হয়েছে তোর?

আস্‌মি মাথা নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আর কি হয়েছে?

মাছভাজা।

একটু খিচুড়ি আর মাছভাজা নিয়ে আয় ভন্‌টুর জন্যে।

আস্‌মি চলিয়া গেল।

ভন্‌টু বলিল, আপনার অসুখের খবরটা সর্বৈব ভূয়ো তা হ'লে?

ওই ছুতো ক'রে দিনকতক রেহাই নিয়েছি। কাঁহাতক আর সেতার বাজাই মশায়!

নিবারণবাবুর হাসি আবার আকর্ণবিশ্রান্ত হইয়া উঠিল, ভন্‌টু হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

আহা-হা, আবার বাই চাগল দেখছি!

ভন্‌টু স্মিত মুখে নীরব রহিল।

একটু পরেই নিবারণবাবু বলিলেন, কাল ফের দু ব্যাটা জলখাবার খেয়ে সরেছে মশায়। এর একটা বিহিত করুন। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে ফ্যাসাদ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

আস্‌মি খিচুড়ি ও মাছভাজা লইয়া প্রবেশ করায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

৬

বৃষ্টি ছাড়ে নাই। আকাশে মেঘের উপর মেঘের স্তর জমিতেছে, বাতাসের বেগ বাড়িতেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এমন দিনে লোক ঘরের বাহির হয় না, কোষ্ঠিগণনা করাইতে কে আসিবে। করালীচরণ বক্‌সির হাতে আজ কোন কাজ নাই, এমন দিনে কাজ আসিবার সম্ভাবনাও নাই।

একটা সিগারেট ধরাইয়া একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তিনি কর্দমাক্ত গলিটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কর্মহীন দিন তাঁহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। প্রতিদিন একটা না একটা কাজ হাতে থাকে এবং তাহা লইয়াই সমস্ত দিনটা কাটিয়া যায়। বিগত তিন-চার বৎসরের মধ্যে একদিনও তাঁহার অবসর ছিল না; আজ এই মেঘমেদুর দিনের পরিপূর্ণ অবসরটা লইয়া তিনি যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, টেবিলের উপর হইতে বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা বাকি আছে। দেখিলেন, আধ বোতল রহিয়াছে। বোতলে মুখ লাগাইয়াই খানিকটা পান করিলেন এবং হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মুখটা মুছিয়া সিগারেটটায় আরও গোটা-দুই টান দিলেন।

এইবার? এইবার কি করা যায়? মদ খাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া দুইটাই তো হইল। অতঃপর?

সহসা করালীচরণের কানে আসিল, সামনের খোলার বাড়িতে যে কোচোয়ান-দম্পতি বাস করে, তাহারা উচ্চকণ্ঠে কলহ শুরু করিয়াছে। উভয় পক্ষই চোখা চোখা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে তো! বাই নারায়ণ! সাগ্রহে কান পাতিয়া করালীচরণ তাহাদের অশ্লীল ভাষার গালাগালিগুলি শুনিতে লাগিলেন। অসভ্য বুড়ো কোচোয়ানটাকে তাঁহার হিংসা হইতে লাগিল। আর যাই হোক, সময় কাটাইবার জন্য বুড়োকে পরের উপর নির্ভর করিতে হয় না, ঘরের সঙ্গিনীটিই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। সঙ্গিনী! সঙ্গিনীর কথায় করালীচরণের অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল। সকলেরই তো একটা না একটা সঙ্গিনী আছে, তাঁহার বেলাতেই বিধাতা-পুরুষ এমন কৃপণ হইলেন কেন? বিবাহের বয়স তাঁহার এখনও পার হইয়া যায় নাই বোধ হয়। নিজের বয়সটা ঠিক কত তাহা তাঁহার জানা নাই, কারণ নিজের জন্মসময়ই ঠিক তিনি জানেন না।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় মায়ের নিকট হইতে বয়সের একটা খবর আনিতে হইয়াছিল, সে হিসাবে তাঁহার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কি আর এমন বয়স! এমন বয়সে কত লোকই তো বিবাহ করিতেছে। বিবাহের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মুখে একটু হাসি ফুটিল। কে এমন নিষ্ঠুর মেয়ের বাপ আছেন, যিনি সজ্ঞানে তাঁহার মত কানা কালো কুৎসিত একটা মাতালের হাতে স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করিবেন! রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যাহারা দেহ বিক্রয় করে, তাহারাও তাঁহাকে চাহে না। অর্থই যাহাদের পরমার্থ, করালীচরণের অর্থ তাহাদের নিকটও নিরর্থক।

অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! ভন্টুবাবুর পাস-বুকে কত টাকা জমিল একবার খোঁজ লইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক, দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠিগণনার চূড়ান্ত করিয়া নিজের অদৃষ্টলিপিটা পাঠ করিতে হইবে।

সহসা কোচোয়ান-দম্পতির কলহ থামিয়া গেল। আকাশের মেঘ ঘনতর হইয়া উঠিল। দমকা বাতাসে ওদিককার জানালাটা খুলিয়া গিয়া সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জানালাটার ছিটকানি নাই, সকাল হইতে ক্রমাগত ওইরূপ হইতেছে।

করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। ভন্টু কয়েকদিন হইতে আসে নাই, হাতে গোটা-পনেরো টাকা জমিয়া গিয়াছে। মদ এবং সিগারেট যাহা আছে, তাহাতে খানিকক্ষণ চলিবে। কিন্তু তাহার পরই মুশকিল। ফুরাইলে এই বর্ষায় আনিয়াই বা দেয় কে? ভন্টুই একটা ছোঁড়া বিড়ির দোকান খুলিয়াছে, ইদানীং তাহাকেই দুই-চারি আনা পয়সা দিয়া করালীচরণ ফাই-ফরমাশ খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু এই বর্ষায় সেও আসে নাই। করালীচরণের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। বাপ্ নারায়ণ! সমস্ত দিনটা আজ কাটিবে কি করিয়া?

সিগারেটে টান দিতে দিতে করালীচরণ আলমারি ও তাকের বইগুলির দিকে চাহিলেন। সমস্তই পড়া, একবার নয়—বহুবার। তবুও যদি উহারই মধ্যে এই দিনের মত কোন খোরাক পাওয়া যায়! করালীচরণ

আলমারি খুলিয়া বইগুলি নামাইতে লাগিলেন। পাঁজি, পাঁজি, ক্যাল্‌কুলাস, Tale of two Cities, পাঁজি, Scarlet Lady, Statics, পাঁজি, পাঁজি, পাঁজি, Paradise Lost, Race tips, রুবাইয়াৎ, আরব্য উপন্যাস, Astronomy, পাঁজি— বিরক্তিকর! বইয়ের গাদা ঠেলিয়া দিয়া করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নজরে পড়িল, বইগুলার পিছন হইতে একজোড়া টিকটিকি বাহির হইয়া দেওয়ালে উঠিয়াছে। ইহারা করালীচরণের আলমারিতে বহুকাল হইতে আছে। অপরিচিত নয়, চেনা। আজ কিন্তু করালীচরণ ইহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলেন। ইহারা দম্পতি! টিকটিকিদের মধ্যেও দম্পতি আছে!

টেবিলের উপর হইতে আয়নাটা তুলিয়া লইয়া করালীচরণ নিজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঠোঁট দুইটা আজকাল আরও হাজিয়া গিয়াছে। সহসা খেয়াল হইল, পাথরের চোখটা আর একবার পরিয়া দেখা যাক না, দিনের আলোতে কোন দিন পরিয়া দেখা হয় নাই। চোখটা পরিয়া আয়নার দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তিনি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল, নিদারুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় আয়নাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি চোখটা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাথরের চোখে কখনও মানুষ ভোলে! ওটা পরিলে চেহারাটা আরও যেন বীভৎস হইয়া উঠে। করালীচরণ উঠিয়া বোতলে মুখ লাগাইয়া আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ার বিরাম নাই, সমস্ত গলিটাময় প্যাচপ্যাচে কাদা। বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু বর্ষার মহিমা নাই। শতছিন্ন মলিন কাপড় পরিয়া একটা ভিখারিণী বুড়ী যেন দুঃখের ভারে অবনমিত হইয়া পথ চলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই-চারি ফোঁটা অশ্রু উদ্‌গত হইয়া উঠিতেছে, দুই-একটি বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। শ্রীহীন বেদনার মূর্তি। পাশের বাড়ির ঘড়িটা বাজিয়া উঠায় করালীচরণের হুঁশ হইল, বেলা বাড়িতেছে। বারোটা বাজিয়া গেল।

যে হোটেলটায় তিনি রোজ আহার করেন, সে হোটেলটা আজ খুলিয়াছে কিনা কে জানে! খুলিয়াছে নিশ্চয়ই।

করালীচরণ উঠিলেন, কোটটা গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

হোটেলে গিয়া কিন্তু তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। ইহারা মানুষ, না, পশু! এমন বর্ষার দিনেও সেই সনাতন কলায়ের ডাল, বড়িচচ্চড়ি, শাকভাজা, উরগুনি মাঝের ঝোল! অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, ওই অখাদ্যগুলাই দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিতে হইল। কিন্তু নাঃ, অসম্ভব; ক্ষুধা সত্ত্বেও করালীচরণ উঠিয়া পড়িলেন।

দাম দিতে দিতে হঠাৎ চোখে পড়িল, সেই পানওয়ালীটা তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে এবং হাসিতেছে। হোটেল এবং পানওয়ালীর দোকান ঠিক সামনাসামনি। করালীচরণ এতক্ষণ পানওয়ালীকে লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পানওয়ালী করালীচরণের সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহার আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। পানওয়ালীর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া হনহন করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। নিরুদ্দিষ্ট ভাবে খানিকক্ষণ চলিয়া অবশেষে একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া করালীচরণ ভিড় দেখিতে লাগিলেন। তিনিই শুধু কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না, বাহিরের পৃথিবীর তো ব্যস্ততার সীমা নাই! মোটর, ট্রাম, রিক্শ, ঘোড়ার গাড়ি, পদাতিক—সকলে মিলাইয়া কাদা ছিটাইয়া চৌরাস্তাটাকে যেন মথিত করিয়া ফেলিতেছে। সকলেরই কাজ আছে। থাকিবে না কেন? তাঁহার মত—। করালীচরণ আবার ফিরিলেন, মদ কিনিতে হইবে। এক বোতল মদ ও কিছু সিগারেট কিনিয়া ফেলা অবিলম্বে দরকার। ভন্টুবাবু কখন যে হানা দিয়া টাকাগুলি লইয়া যাইবেন স্থিরতা নাই।

ভিড় ঠেলিয়া পিছল কর্দমাক্ত ফুটপাথ দিয়া প্রায় উধ্বশ্বাসে করালীচরণ মদের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিলেন, যেন কোন জরুরী দরকারে ট্রেন ধরিতে ছুটিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দমাক্ত করালীচরণ মদ ও সিগারেট লইয়া ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের কপাট খোলা, হাঁ-হাঁ করিতেছে। মনে পড়িল, যাইবার সময় বন্ধ করিয়া যান নাই। ঘরে ঢুকিতেই নজরে পড়িল, টেবিলের উপর একটা থালায় কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। কি এ! আগাইয়া গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন, কয়েকখানা পরোটা ও হাঁসের ডিমের ডালনা। কে রাখিয়া গেল! পর-মুহূর্তেই কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে কে যেন তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এক টানে থালাটা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কপাটে খিল বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন, হারামজাদী! যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তাহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। একদিন দুর্মতি হইয়াছিল, ওই ডাকিনীদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। বেশ্যারা আবার মানুষ! দুই-চারি টাকার জন্য যাহারা—। করালীচরণ পূর্বেকার নিঃশেষিতপ্রায় বোতলটাতে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। মাগীর তাড়কা রাক্ষসীর মত চেহারা, সোহাগ জানাইতে আসিয়াছে! একটুও যদি রূপ থাকিত, দেমাকে মাটিতে পা পড়িত না, আমাকে দেখিয়া তখন হয়তো মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইত। এখন বোধ হয় কেউ পোঁছে না, তাই আমার কাছে ভিড়িয়াছে। এবার আসিলে চাবকাইয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলিব।

ঘরে খিল দেওয়ায় ঘরটা অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল। করালীচরণ মোমবাতির সন্ধান করিয়া দেখিলেন, মোমবাতি নাই। বাই নারায়ণ! আবার বাহির হইতে হইবে। করালীচরণ তালাটা খুঁজিতে লাগিলেন, এবার তালা দিয়া যাইতে হইবে। তালাটা লাগাইতে লাগাইতে করালীচরণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, থালাটা কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুদূর গিয়া চোখে পড়িল, ওই দিকের গলিতে কতকগুলা ছোঁড়া একটা দাঁড়কাক

ধরিয়াছে এবং তাহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নানা রকম যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতেছে। করালীচরণ খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া মোমবাতির খোঁজে চলিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ভন্টু আপিসের ফেরত করালীচরণের বাসার দরজা পর্যন্ত আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুনিতে পাইল, করালীচরণ উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন—It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair—we had everything before us, we had nothing before us—

ভন্টু দরজা ঠেলিয়া ঢুকিতেই করালীচরণ বইটা বন্ধ করিলেন।

বাই নারায়ণ! সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন আপনারা? একা একা পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছি—'টেল অফ টু সিটিজ'-খানা পড়ছিলাম, কি আর করি!

ভন্টু কাজের কথা পাড়িল।

আমাদের আপিসের একজন বড্ড ধরেছে, তার ছকটা যদি একটু দেখে দেন। বেচারা ভারি গরিব, দু টাকার বেশি—

ছকটা এনেছেন? কই?

করালীচরণ উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

ভন্টু ছকটা বাহির করিতেই করালীচরণ তাহার হাত হইতে তাহা প্রায় ছিনাইয়া লইলেন ও তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া দেখিতে শুরু করিলেন।

ভন্টু স্মিতমুখে করালীচরণের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা খড়খড় শব্দ শুনিয়া আলমারির মাথার উপর নজর পড়িতেই বিস্মিত হইয়া গেল।

ওটা কি আবার?

করালীচরণ চকিতে একবার সেদিকে চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, পুষলাম।

কি পাখি ওটা?

দাঁড়কাক।

দাঁড়কাক! কোথা থেকে পেলেন?

রাস্তার ছোঁড়াগুলোর কাছ থেকে কিনলাম এক টাকা দিয়ে। একটা সঙ্গী না হ'লে চলে না মশাই, একা একা আজ জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ভন্টু আলমারিটার নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, মস্ত একটা দামী খাঁচায় সত্যই একটা দাঁড়কাক রহিয়াছে। করালীচরণের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি তন্ময় হইয়া গণনায় মন দিয়াছেন। ভন্টু আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

৭

মানুষ ভাবে এক রকম, হইয়া যায় আর এক রকম। পথের নেশায় মাতিয়া মানুষ পথটাকেই বড় মনে করে, লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে পথকে সে আশ্রয় করে, সেই পথই শেষে তাহাকে পাইয়া বসে, পথ-চলার উন্মাদনায় সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

মৃন্ময়েরও তাহাই হইয়াছিল। মজফ্‌ফরপুরগামী একটা ট্রেনের কামরায় বসিয়া বসিয়া মৃন্ময় সহসা অনুভব করিল, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। হারানো পত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সে পুলিসে চাকুরি লইয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আজ সহসা সে অনুভব করিল যে, সে উদ্দেশ্যটা গৌণ হইয়া গিয়াছে, চাকরিই এখন মুখ্য। কই, সে তো বিগত এক মাসের মধ্যে স্বর্ণলতাকে একখানি চিঠিও লেখে নাই! কাজের চাপ পড়িয়াছে সত্য কথা, কিন্তু কাজের চাপই কি একমাত্র কারণ? তাহার

উৎসাহও কি কমিয়া আসে নাই? স্বর্ণলতাকে হারাইয়া যে তীব্র বেদনা সে অনুভব করিয়াছিল, যাহার তাড়নায় পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিসের চাকুরি লইয়াছিল, সে বেদনা কি এখনও তেমনই তীব্র আছে? তীব্রতাটা কি এতটুকু কমে নাই? নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করিয়া, নিজেরই অন্তরের মধ্যে সত্য সন্ধান করিয়া ডিটেক্‌টিভ মৃন্ময় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন সে যে শুধু স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিবার সময় পায় নাই তাহা নহে, স্বর্ণলতাকে ভাবিবারও সময় পায় নাই। এ কয়দিন সে শুধু মিস্টার ঘোষের কথা এবং মিস্টার ঘোষের আচরণের কথা ভাবিয়াছে।

মজুমদারের মত মিস্টার ঘোষও তাহার সহকর্মী। সম্প্রতি বাহির হইতে বদলি হইয়া আসিয়াছেন। কর্মতৎপরতা তাঁহার যেন অসাধারণ রকম প্রখর, মনও তাঁহার তেমনই অসাধারণ রকম বিষাক্ত। মৃন্ময় নিজের কর্মকুশলতার জোরে উন্নতি করিতেছে, উপরওয়ালার প্রিয়পাত্র হইতেছে, এই বম্ব্ কেসটার তদন্তের ভার পাইয়াছে—মিস্টার ঘোষের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়াছে। মিস্টার ঘোষও এই বম্ব্ কেসে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও সাহেবের নিকট প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু মৃন্ময়ের উন্নতি তিনি ভাল চক্ষে দেখিতেছেন না। কাহারও কোন উন্নতি কখনও তিনি ভাল চক্ষে দেখেন না। তাঁহার স্বভাবই ওইরূপ। তাঁহার বক্রোক্তি, আচরণের অন্তর্নিহিত তিক্ততা, গোপনে চক্রান্ত পাকাইয়া তুলিবার ক্ষমতা—মৃন্ময়কে এ কয়দিন এমন ক্ষুব্ধ ও ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার অন্য কথা ভাবিবারই অবসর ছিল না। তাহার মোটর-চাপা-পড়া সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মিস্টার মজুমদার যখন অচিনবাবুকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন, তখন মিস্টার ঘোষ স্বচ্ছন্দে ও শান্তভাবে বলিয়া বসিলেন যে, অচিনবাবুর ইহাতে যদি হাত থাকে, তাহা হইলে মৃন্ময়বাবুও নিশ্চয়ই কোন নারীঘটিত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন। লোকটার ব্যবহার-কথাবার্তা আশ্চর্য রকম ভদ্র, আশ্চর্য রকম হাস্যলিপ্ত, অথচ আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত। মজুমদার ঠিক ইহার বিপরীত। ভদ্রতার ধার ধারে না, চীৎকার করিয়া কথা বলে, অশ্লীল কথা

মুখে লাগিয়াই আছে, মন কিন্তু পরিষ্কার। মৃন্ময় অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করিয়াছে—ইহা মিস্টার ঘোষের বিদ্বেষ এবং মিস্টার মজুমদারের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছে। মজুমদারের সাবধানবাণী মৃন্ময়ের মনে পড়িল। কাজে কোন রকম খুঁত যেন না হয়, হইলে তাহা ঘোষের দৃষ্টি এড়াইবে না এবং সেই খুঁতটুকুকে নিখুঁতভাবে উপরওয়ালার নজরগোচর করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই 'চুগলি'-পটুতার জন্যই নাকি উপরওয়ালার নিকট তাহার প্রতিপত্তি। মৃন্ময় স্বভাবতই কর্তব্যপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান। জ্ঞাতসারে সে কোন খুঁত ঘটিতে দিবে না। যে কাজে সে যাইতেছে, কি ভাবে করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইবে, তাহারই ভাবনায় সে পুনরায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল। স্বর্ণলতার কথা একবার মাত্র মনে হইয়াছিল, আর হইল না।

বরং হাসির মুখখানা মনের মধ্যে দুই-একবার উঁকি দিয়া গেল। মনে পড়িল, হাসি মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছে—টিফিন-কেরিয়ারে যে লুচি আলুর দম ও মোহনভোগ সে করিয়া দিল, মনে করিয়া ঠিক সময়ে তাহা যেন সে খায়। মৃন্ময় টিফিন-কেরিয়ারটা নামাইয়া দেখিল, হাসি করিয়াছে কি! এ যে তিনজনের খাবার! কিন্তু আশ্চর্য, হাসির এই অপব্যয়প্রবণতায় মৃন্ময়ের রাগ হইল না, মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল।

৮

হাসি একা দুপুরে বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছিল। চিন্ময় আজকাল তাহাকে বাড়িতে লেখাপড়া শিখাইতেছে। আগ্রহ অবশ্য হাসিরই বেশি। বাংলা লেখাপড়াটা বাড়িতে শিখিয়া ফেলিতেই হইবে। সবাই কেমন নানারকম বই পড়ে, স্বামীকে চিঠি লেখে, হাসি কিছুই পারে না। চিন্ময়ের সাহায্য লইয়া তাই সে বর্ণ-পরিচয় হইতে শুরু করিয়া দিয়াছে। সবাই পারে, সেই বা পারিবে না কেন? প্রথম ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগেরও বেশি বাকি নাই। প্রত্যহ দশখানা করিয়া হাতের লেখা

লিখিতেছে। হাতের লেখাটা তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া ফেলিতে হইবে। কবে সে স্বামীকে ভাল করিয়া চিঠি লিখিতে পারিবে? ও-বাড়ির কুসুম কেমন সুন্দর করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখে, স্বামীর কত সুন্দর চিঠি পায়!

অতিশয় মনোযোগসহকারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সম্মুখে প্রসারিত লিখন-প্রণালী দেখিয়া হাসি হাতের লেখা লিখিতে লাগিল। দুপুরবেলায় ঘুমানো তাহার বহুদিনকার অভ্যাস; মাঝে মাঝে হাই উঠিতেছে; কিন্তু না, কিছুতেই না, হাতের লেখাগুলি শেষ করিয়া ফেলিতেই হইবে। একখানি কম হইলে চিন্ময় ঠাট্টার চোটে অস্থির করিয়া তুলিবে। এমনিই তো তাহার লেখাকে কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ নাম দিয়াছে। হাসি ঝুঁকিয়া লিখিতেছিল, এই কথা মনে হওয়াতে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া নিজের হস্তাক্ষরগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ কেন হইবে? আগেকার চেয়ে তো অনেকটা ভাল হইয়াছে। আবার সে ঝুঁকিয়া লিখিতে শুরু করিল।

৯

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

নিবারণবাবু ও মাস্টার দোকানে গিয়াছে, আসমি কাজকর্ম সারিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, মা পাশের ঘরে নিদ্রিত। দার্জি ওরফে জামলী একা বসিয়া একটি কাপড়ে রঙিন সুতা দিয়া ফুল তুলিতেছে আর ভাবিতেছে, সকলে তাহাকে ইহার জন্য এত বকে, কেন? সকলের ইহা খারাপ লাগে, অথচ তাহার ইহা ভাল লাগে কেন? বাবা বকে, মা বকে, আসমি বকে; সে কিন্তু কিছুতেই ইহা ছাড়িতে পারে না। তাহার ফুলিপিসীর কথা মনে পড়ে। ফুলিপিসীই প্রথমে তাহাকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইয়াছিল। বেচারী মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার হাতের কাজ কার্পেটের আসনটা এখনও আছে। সেই কার্পেটটার

প্রতি ফুলে ফুলে রঙিন হইয়া ফুলিপিসী এখনও বাঁচিয়া আছে। ফুলিপিসীও তাহারই মত কুৎসিত ছিল, বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী-সুখ কখনও পায় নাই। সুন্দরী দেখিয়া স্বামী আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিল। ফুলিপিসী চিরকাল বাপের বাড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। ফুলিপিসীর দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু শত দুঃখের মধ্যেও সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত, যখন সে তাহার সেলাই লইয়া বসিত। ওই ছিল তাহার একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র।

দার্জি সেলাই করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, তাহার কি বিবাহ হইবে? কত সুন্দরী মেয়ের বিবাহ হইতেছে না, তাহাকে বিবাহ করিবে কে? কত লোকই তো আসিল, দেখিল, চলিয়া গেল—কই, কেহই তো পছন্দ করিল না! আসমিটাকে বরং দুই-একজন পছন্দ করিয়াছে। আসমি যদিও কালো, কিন্তু তাহার মুখ-চোখ হাব-ভাবে লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাহার বিবাহ না হইলে তো আসমির বিবাহ হইবে না। তাহাকে কে বিবাহ করিবে? কোথায় সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যে তাহার বাহিরটাকে তুচ্ছ করিয়া ভিতরটা দেখিতে পাইবে? কোথায় সে?

দার্জি ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মানসপটে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একটি মুগ্ধ যুবকের অজানা মুখ ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সে আবার সুতা দিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

১০

নানা স্থান হইতে ঋণ করিয়া শঙ্কর কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহা লইয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। এ কয়দিন সে মুক্তোর কাছে যাইতে পারে নাই। সেদিনকার সেই ঘটনার পর শূন্যহস্তে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কয়েকদিন ক্রমাগত ঘুরিয়া পঞ্চাশটা টাকা অনেক কষ্টে

সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, গিয়াই টাকাগুলি মুক্তোর হাতে দিয়া বলিতে হইবে, তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতি আমি করিতে চাহি না, নোটগুলি ভাল করিয়া গনিয়া দেখিয়া লও। মনে করিও না, আমি তোমার ভালবাসার মূল্য দিতেছি। টাকা দিয়া ভালবাসা ক্রয়ও করা যায় না, বিক্রয়ও করা যায়, না আমি তাহা জানি। কিন্তু আমি ইহাও জানি, অর্থ-হীন ভালবাসাবাসি করিবার সঙ্গতি তোমার নাই। সেইজন্য তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কিছু আনিয়াছি। কয়েকদিনের জন্য অন্তত ব্যবসাটা বন্ধ কর। তুচ্ছ টাকার অজুহাতে আমাকে ফিরাইয়া দিবে, তাহা আমি সহ্য করিব না। টাকাটাই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় জিনিস নয়। এতকাল টাকা চিনিয়াছ, এইবার মানুষ চিনিতে শেখ। সামান্য টাকার জন্য এমন করিয়া নিজেকে যেখানে সেখানে বিলাইয়া দিও না। নিজেকে চেন।

কে, শঙ্কর নাকি? আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকেই খুঁজছি।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, ভন্টুর মেজকাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে স্মিতমুখে আগাইয়া আসিতেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্করকে দাঁড়াইতে হইল।

আমাকে ডাকছেন?

তোমাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব ভাই? তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করার দরকার আছে। তোমার মাথা যে কত সাফ, সে তো আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।

ইহা কিসের ভূমিকা বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুক্তানন্দ বলিলেন, চল, স্কোয়ারটার ভেতর বসা যাক।

বেশি দেরি হবে কি? আমার একটু দরকারী কাজ ছিল।

না না, বেশি দেরি হবে না, দুটো কথা খালি।

কলেজ স্কোয়ারে ঢুকিয়া একটা নির্জন জায়গা বাছিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, অঙ্কের ব্যাপার ভাই; তুমি ঠিক পারবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে একটা মূল্য-নির্ধারণ করে আমাকে রেহাই দিয়ে দাও তোমরা। ব'স।

উপবেশন করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, কিসের মূল্য-নির্ধারণ?

আমার।

আপনার! মানে?

মানে-টানে কিছু নেই, আমারই।

শঙ্কর কিছু বুঝিতে পারিল না। একবার মনে হইল, হয়তো বাবাজী বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং নিজের বাজার-দর কত হওয়া উচিত, তাহাই তাহার কাছে জানিয়া লইতে চান। কিন্তু মুক্তানন্দের প্রশ্নে এ ধারণা অচিরেই অপনোদিত হইল।

অ্যাভারেজ বাঙালীর পরমায়ু কত ধরতে চাও তুমি? পঞ্চাশ? পঞ্চাশের কমই বরং হবে, বেশি নয়।

শঙ্কর বলিল, না।

আমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ চলছে, বাকি রইল তা হ'লে আট বছর। এই আট বছরে কত উপার্জন করতে পারি আমি, একটা হিসেব কর দিকি। খুব বেশি ক'রে ধরলেও গড়-পড়তা মাসে ত্রিশ টাকার বেশি নয়। আট বছরে তা হ'লে কত হচ্ছে?

তিরিশ ইন্‌টু বারো মিন্‌টু আট—

ওসব ইন্‌টু-ইন্‌টু ছাড়, থোক্ টাকা কত হয় তাই বল।

শঙ্কর মনে মনে গুণ করিয়া বলিল, দু হাজার আট শো আশি টাকা।

আচ্ছা, এইবার ওর থেকে আমার খাই-খরচ কাপড়-চোপড়ের খরচ সব বাদ দাও।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাবাজী বলিয়া চলিলেন, অ্যাভারেজ কত ধরবে? আম মাছ মাংস খাই না অবশ্য, কিন্তু আলো চাল গাওয়া ঘি আমার চাই, কাপড়ও কম ক'রে বছরে থান-দশেক, জামা অন্তত গোটা চারেক ধর, তার পর ধর টুকিটাকি নানা রকম খরচা, বাঁচতে গেলেই হরেক রকম বখেড়া আছে তো!

আপনার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারছি না আমি।

পারবে, পারবে গো। তুমি পারবে না তো পারবে কে? আগে অঙ্কটা ক'ষে ফেল দিকি, আমার নিজের পার্‌সোনাল খরচ কত ধরতে চাও তুমি?

শঙ্কর যদিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না, তথাপি আজকালকার হিসাবে একটা লোকের খাওয়া-পরার খরচ ন্যূনকল্পে কত পড়িবে তাহা আন্দাজে বলিল, মাসে দশ টাকা ধরুন।

বাবাজী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

দশ টাকায় কি চলে আজকালকার দিনে! সস্তাগণ্ডার দিন কি আর আছে!

তাহার পর সস্মিতমুখে শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলিলেন, বেশ, দশ টাকাই ধর, তোমার কথা ঠেলব না আমি। দশ টাকা ধ'রেই হিসেব কর। তা হ'লে কিন্তু থাকারও একটা খরচ ধর। কলকাতা শহরে অমনই তো কেউ থাকতে দেবে না, মেসে থাকলেও সীট-রেণ্ট্ দিতে হবে। সেটাও ইনক্লুড কর। কত ধরবে সেটা—পাঁচ টাকা?

বেশ, পাঁচ টাকাই ধরুন। হ্যাঁ, পনেরো টাকার কমে চলে না একজনের আজকাল—

তা কি চলে কখনও! অথচ ভন্টু কথাটা কিছুতে বুঝছে না। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস ধরতে ভুল হয়েছে—দুধ। দৈনিক অন্তত আধ সের ক'রে দুধ দরকার আমার। মাসে তা হ'লে কত হ'ল?

পনেরো সের।

টাকায় চার সের হিসেবে ধরলে—

প্রায় টাকা চারেক।

তা হ'লে পনেরো আর চারে উনিশ হ'ল?

হ্যাঁ।

তা হ'লে এইবার অঙ্কটা ক'ষে ফেল দিকি। ত্রিশ টাকা ক'রে মাসে আয়, উনিশ টাকা ক'রে খরচা, বাঁচছে তা হ'লে—

মাসে এগারো টাকা ক'রে।

আট বছরে কত হয়, সেটা হিসেব কর এবার।

এগারো ইন্‌টু বারো ইন্‌টু আট—

মোটমাট কত বল, ইন্‌টু কেন?

শঙ্কর পুনরায় মনে মনে হিসাব শুরু করিল।

এক হাজার ছাপান্ন টাকা।

মোটে! অথচ আমার নিজের অংশেই যে বিষয় রয়েছে, পৈতৃক নয়, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি আমি, তার দামই অন্তত তিন হাজার টাকা। আমি অবশ্য সে বিষয়টা বন্ধক দিয়ে আমার গোয়াবাগানের সেই বন্ধুটির কাছ থেকে শ-পাঁচেক টাকা নিয়েছি, তবু তো আড়াই হাজার টাকা থাকে। ভন্‌টু মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে পাঁচ শো টাকা শোধ ক'রে ফেলে বিষয়টা নিয়ে নিক, ওর নামে আমি লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি। আমাকে রেহাই দিক, এসব কচকচি আমার ভালই লাগে না।

এ রকম ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন কেন আপনি?

নিজের বিবেকের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। ভন্‌টু কষ্ট ক'রে সংসার চালাচ্ছে, আমি তার কাকা— আর তা ছাড়া, স্নেহও করি আমি ওকে, আমার উচিত তার কিছু ভার লাঘব করা। কিন্তু তুমিই তো হিসেব ক'রে দেখলে ভাই, বর্তমান বাজারে ওই এক হাজার ছাপান্ন টাকার বেশি সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত—তাও যদি আমি ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পাই এবং এক-নাগাড়ে আট বচ্ছর খাটতে পারি। তার চেয়ে অত হাঙ্গামার দরকার কি, আমার মামার বাড়ির তরফ থেকে যে বিষয়টুকু আমি পেয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, নিয়ে আমায় রেহাই দাও। মাসে মাসে কিছু ফেলে দিলেই পাঁচশো টাকা দেখতে দেখতে শোধ হয়ে যাবে, তখন তিন হাজার টাকার বিষয় স্বচ্ছন্দে ভোগ কর না তুমি।

মামার বাড়ির বিষয়টা কি আপনার একার?

নিশ্চয়ই। ভন্‌টুর বাপ আর আমি তো সহোদর ভাই নই, বৈমাত্রেয় ভাই। আমার মায়ের বিষয় আমি পেয়েছি, ওতে আর কারও হক নেই। দাদামশাই ওটা মাকে দিয়েছিলেন আলাদা ক'রে।

কোথায় আছে বিষয়টা ?

আমার মামার বাড়িতে—হুগলী থেকে কিছুদূর ইন্‌টিরিয়রে।

ভন্‌টু কি বলছে ?

'ওসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে চাই না।' এতে হাঙ্গামাটা কি, তুমি বল তো ভাই ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনিই বা অত জোর-জবরদস্তি করছেন কেন ?

ওই যে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি তা হ'লে। একটা পেছটান্ থাকলে তো ধর্মে কর্মে মন বসে না। হরিদ্বারে দিব্যি একটি আস্তানা পেয়েছিলাম, কোথাও কিছু নেই, এক স্বপ্ন দেখে বসলাম। স্বপ্নের দোষ নেই, কর্তব্যে খুঁত ছিল, স্বপ্নে তার আভাস পেলাম। ফিরে আসতে হ'ল। এবার ভাবছি, কর্তব্যের জড় মেরে তবে বেরুব। কিন্তু ভন্‌টু বাগড়া লাগাচ্ছে। হিসেব-টিসেব তুমি তো দেখলে ভাই, একটু বুঝিয়ে ব'লো তাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তানন্দও উঠিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, ভন্‌টুর মাথায় গোবর পোরা, হিসেব-টিসেব ও কিছু বোঝে না, তুমি একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও ভাই। তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে, বল তো ?

কোথায় আছেন আপনি ?

আমি আছি গোয়াবাগানেই। ভন্‌টুর ওখানে উঠি নি, দাদা আমাকে দেখলে বড় বিচলিত হয়ে পড়েন, তা ছাড়া, ওদের টানাটানির সংসার, আমি গেলে বাড়তি একটা খরচ হবে তো। তার চেয়ে বিনোদের বাসাতেই আছি ভাল। দুজনেই একতন্ত্রের লোক।

বিনোদবাবুও কি সন্ন্যাসী ?

না, ঠাকুর তাকে ঘরে থেকেই সাধনা করতে আদেশ দিয়েছেন। তেল মাখতে মাখতে গালি—

শঙ্কর অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, আমি তা হ'লে চলি এবার এস।

রাত্রি আটটা হইবে। শঙ্কর গিয়া দেখিল, মুক্তো নিজের ঘরে নাই। শুনিল, আঙুরের ঘরে একজন বড়লোক বাবু বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। সেখানে আমোদের এবং মদের স্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য দশ-বারোজন নর্তকীর প্রয়োজন হওয়াতে পাড়ার যত নাচনেওয়ালী সেইখানে আহূত হইয়াছে। মুক্তোও সেখানে আছে। সংবাদটি দিয়া কালোজাম বলিল, আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি তাকে।

শঙ্কর অনুভব করিল, খবর দিলে মুক্তো আসিবে না। বলিল, আঙুরের ঘর কত দূর এখান থেকে, চলুন না, সেইখানেই যাওয়া যাক।

কালোজামকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, আমাকে সেখানে যেতে দেবে না?

কালোজাম মুচকি হাসিয়া বলিল, ওদের কারুর এখন মানা করবার ক্ষমতা নেই, চারটে থেকে ক্রমাগত মদ খাচ্ছে সবাই। তবে পরের ঘরে বিনা নেমন্তন্নে যাওয়াটা ঠিক নয়।

মুক্তো কি করছে, একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ভারি।

দেখাতে আমি পারি। জানলা খোলা আছে, ওদিকের ওই বারান্দার কোণটায় দাঁড়ালে সব দেখা যাবে। আসুন তা হ'লে চুপিচুপি।

চুপি চুপি! শঙ্করের আত্মসম্মানে একটু যেন আঘাত লাগিল। কিন্তু ইহা লইয়া অধিক বিশ্লেষণ করিবার সময় ছিল না। কালোজাম বলিল, আসুন।

সে অনুসরণ করিল।

কালোজাম তাহাকে লম্বা সরুগোছের বারান্দার একটা অন্ধকার কোণে লইয়া গিয়া একটা খালি উপুড়-করা কেরোসিন-কাঠের বাক্স দেখাইয়া বলিল, বসুন তা হ'লে এইখানে। র্যাপার দিয়ে পা-টাগুলো একটু ঢেকে বসুন,

মশা কামড়াবে না হ'লে। জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি, দাঁড়ান, গিয়ে খুলে দিয়ে আসি।

কালোজাম চলিয়া গেল। নিটোল কালোজামের মত এই মেয়েটির সহৃদয়তায় শঙ্কর মুগ্ধ হইল।

সামনে একটু ছোট উঠানের মত, তাহার ও-পারেই আঙুরের ঘর। সেখান হইতে বাজনার আওয়াজ আসিতেছে। হার্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা পুরা দমে চলিতেছে। কালোজাম গিয়া আঙুরের ঘরে উঁকি দিতেই অভ্যর্থনাসূচক একটা হৈ-হৈ হল্লা উঠিল। কালোজাম ঘরে প্রবেশ করিল, এবং মিনিট-পাঁচেক পরে জানালাটা খুলিয়া গেল।

শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, মুক্তো নাচিতেছে। মাথার উপর একটা মদের গ্লাস রাখিয়া অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে সর্বাঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া তবলার তালে তালে মুক্তো নাচিতেছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শঙ্কর চাহিয়া রহিল; মুক্তোর এমন রূপ তো সে দেখে নাই, কল্পনাও করে নাই। চক্ষু দুইটি আবেশময়, প্রতি অঙ্গ হইতে রূপ যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। কয়েকটা মাতাল লুব্ধদৃষ্টিতে বসিয়া দেখিতেছে, একটা মোটাগোছের লোক মদ খাইতেছে, জড়িতস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং নাচের তালে তালে বীভৎসভাবে পা দোলাইতেছে।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া সে কি করিত বলা যায় না; কিন্তু কালোজাম আসিয়া পড়িল এবং বলিল, চলুন, ভেতরেই বসবেন, এখানে যা মশা! মুক্তোকে চুপিচুপি ব'লে এসেছি, সে আসবে এখুনি।

শঙ্কর ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কালোজামের পিছু পিছু আসিয়া মুক্তোর ঘরে প্রবেশ করিল।

কালোজাম বলিল, আপনি এইখানেই বসুন একটু, আমি যাই, আমার লোক এসেছে।

লোকে যেমন নির্বিকার ভাবে আপিস-ঘরে ঢোকে, তেমনিই

নির্বিকার ভাবে কালোজাম নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। শঙ্কর বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। মুক্তোর নাচ দেখিয়া সে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হঠাৎ আঙুরের ঘর হইতে একটা খুব হাসির হররা উঠিতেই শঙ্কর বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপদে গিয়া বারান্দার সেই অন্ধকার কোণটায় পুনরায় হাজির হইল। দেখিল, মুক্তো নয়, আর একটি মেয়ে উঠিয়া নাচিতেছে। বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য! মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। পুরুষের মত মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, পুরুষের জুতা পায়ে দিয়া নাচিতেছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এত মদ খাইয়াছে যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, তথাপি নাচিতেছে, এবং তাহার নাচ দেখিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে, মেয়েটিও হাসিতেছে। হঠাৎ শঙ্করের মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। সে বারান্দা হইতে নামিয়া আঙুরের ঘরের দিকে যাইবে বলিয়া পা বাড়াইতেছে, এমন সময়ে মুক্তো আসিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, ও-দিকে কোথা যাচ্ছেন? আমার ঘরে চলুন। এতদিন পরে আজ এলেন যে?

শঙ্করের আর প্রতিবাদ করিবার শক্তি রহিল না। মুক্তোকে কাছে পাইয়া আসন্নপ্রসবা-নর্তকী-সমস্যার তীক্ষ্ণতা সহসা ভোঁতা হইয়া গেল, মুক্তোর পিছু পিছু সে মুক্তোর ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

মুক্তো আঁচলের ভিতর হইতে এক ডিশ মেটেচচ্চড়ি বাহির করিয়া বলিল, খান।

শঙ্কর স্থিরদৃষ্টিতে মুক্তোর পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তো মদ খাইয়াছে, চোখ মুখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখে মুখে অপূর্ব একটা মদির প্রাখর্য।

নিন, এইগুলো খান।

শঙ্কর বলিল, খিদে নেই।

তবু খান।

খেতে আমি আসি নি, আমি এসেছি তোমার কাছে। সম্ভব হ'লে এই নরক থেকে তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব আমি।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মুক্তো বলিল, নরক!

নরক নয় তো কি?

আস্পর্ধা তো কম নয় আপনার! এ নরকে এসে আমাদের উপকার করবার জন্যে কে পায়ে ধ'রে সেধেছিল আপনাকে, শুনি? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? নরক! আপনাদের সগ্‌গে আপনারাই থাকুন গিয়ে, আমরা সেখানে যেতে চাই না, সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছি আমরা।

মুক্তোর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

নিন, খান।

খাব না।

আশ্চর্য লোক আপনি! এই সেদিন ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছিলেন—তোমায় ভালবাসি মুক্তো, আজ বলছেন—এখানটা নরক! এত বাজে কথাও বলতে পারেন আপনারা!

সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি।

সত্যি?

ফিক করিয়া মুক্তো হাসিল এবং বলিল, তা হ'লে খান এগুলো।

আমি খাব না।

লক্ষ্মীটি।

অতিশয় স্নেহভরে গায়ে মাথায় হাত দিয়া মুক্তো শঙ্করকে বিছানায় বসাইল এবং নিজে মেঝেতে বসিয়া খাইবার জন্য তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, মা যেমন অবাধ্য ছেলেকে ভুলাইয়া খাওয়ায়।

শঙ্কর বলিল, আমাকে তুমি ভালবাস না? সত্যি ক'রে বল তো।

খান আগে, তারপর বলছি।

শঙ্কর আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, খাইতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইতেই মুক্তো উঠিয়া পড়িল। বলিল, আমি যাই একার ও-ঘরে।

না, ওখানে যেতে দেব না আমি।

সে কি হয়? টাকা নিয়েছি—

টাকা ফেরত দাও, এই নাও।

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া শঙ্কর মুক্তোর হাতে দিল। মুক্তো স্মিতমুখে নোটগুলি গনিয়া দেখিতেছিল—শঙ্কর বাধা দিয়া বলিল, আমাকে ভালবাস কি না বল আগে।

সত্যি কথা শুনবেন?

বল।

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, একটুও না। আপনার মত গঙ্গাজলমার্কা ছেলে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে।

তবে আমাকে আসতে দাও কেন?

ভদ্রতার খাতিরে। অত সগ্গ-নরক বিচার করে যারা, তাদের আমর ভালবাসতে পারি না। আপনারা জাপানী ফানুষ, দুদিন একদিনই দেখতে বেশ।

তাহার পর নোটগুলি গনিয়া বলিল, এ কটা টাকায় আমার কি হবে? ওদের সাত দিন মাইফেল চলবে, এক শো টাকা অগ্রিম দিয়েছে, বকশিশটা-আশটাও মিলবে। নিন আপনার টাকা, আপনি বাড়ি যান। গরিবের ছেলের এসব ঘোড়ারোগ কেন বাপু? সোন্দর দেখে বিয়ে করলেই পারেন একটা। মুখ টিপিয়া হাসিয়া কোমর দোলাইয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল।

মুক্তো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফুটা দিয়া শঙ্করকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া যখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল, মুক্তোর ইচ্ছা করিতে লাগিল, তাহাকে ডাকিয়া ফিরায়। কিন্তু পর-মুহূর্তেই

সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং আঙুরের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইবার নতুন ধরনের নাচ দেখাব একটা, তিনটে গেলাস চাই, মাথায় একটা নেব, দু হাতে দুটো।

এই নূতন প্রস্তাবে বাবুরা হৈ-হৈ করিয়া উঠিলেন।

মুক্তো পুনরায় নাচ শুরু করিল।

শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, একটু দূরে ওরিজিনাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটাকে চাপিয়া চক্ষু দুইটি ছোট করিলেন এবং তাহার পর গরম-জামার বুক পকেট হইতে একটি বৃহদাকৃতি নিকেলের ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, দশটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। তাঁহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গোঁফ-দাড়ি অন্তর্নিরুদ্ধ আলোড়নে সংক্ষুব্ধ হইল, মনে হইল, যেন এখনই বোমার মত সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া পড়িবেন; কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। এই নাবালকটার সহিত বিতণ্ডা করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। শঙ্করের প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া তিনি সোজা মুক্তোর ঘরে ঢুকিয়া গেলেন এবং সশব্দে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর ফুটপাথের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতেছিল। অপমানে, অক্ষমতায়, বিরাগে, অনুরাগে, হতাশায়, ক্ষোভে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহার ভাষা নাই। মুক্তো তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কিন্তু মুক্তোকে তো মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছে না! সেই নৃত্যপরা তন্বীকে—

মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন।

শঙ্কর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মেমসায়েব? কোন্ মেমসায়েব?

ওই যে গাড়িতে ব'সে রয়েছেন।

শঙ্কর দেখিল, রাস্তার ওপারে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইতেই শৈল জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, এস শঙ্করদা, তুমি এমন সময়ে এখানে যে ?

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুই এখানে হঠাৎ ?

আমি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম, তাই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তুমিও থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলে নাকি ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ঠিক ধরেছিস তো ! তোর কাছে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

আহা !

সহাস্য সকোপ কটাক্ষে চাহিয়া শৈল ভ্রূলতা আকুঞ্চিত করিল। তাহার পর বলিল, চল, তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে যাই। এই রাত্তিরে ঠাণ্ডায় অতটা দূর হেঁটে যেতে হবে তো আবার !

হাঁটা আমার খুব অভ্যেস আছে, তুই যা।

অতটা অহঙ্কার ভাল নয়, এস।

তুই যা না।

এস বলছি, ভাল হবে না।

শঙ্কর গাড়িতে না উঠিয়া পারিল না, উঠিয়া গিয়া শৈলর পাশে বসিল এবং ড্রাইভারকে হস্টেলের ঠিকানাটা বলিয়া দিল। শৈল বলিল, 'শিরিফরহাদ' কেমন লাগে ?

চমৎকার !

বড্ড আজগুবি কিন্তু।

এটা শৈলর মুখের কথা। আসলে সে 'শিরিফরহাদ' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, রাগ করেছ আমার ওপর ? কেন বল তো ?

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, রাগ করব কেন ?

নিশ্চয় রাগ করেছ, একবারও তো যাও না আজকাল। আমি কেমন এস্রাজ বাজাতে শিখেছি, তোমায় শোনাতে ভারি ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমি তো আজকাল যাওয়াই ছেড়েছ। কেন যাও না শঙ্করদা, একবারটি গেলে পড়ার কি এমন ক্ষতি হয় বল তো ?

রিনির কথা শৈলর মনে পড়িল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে প্রসঙ্গ সে তুলিল না।

শঙ্কর বলিল, যাব একদিন।

তোমাকে চিনি না আমি, যাবে যা তা আমি জানি।

হস্টেলের নিকট গাড়ি থামিল।

শঙ্কর নামিতে নামিতে বলিল, ঠিক যাব।

কবে ?

উত্তরের জন্য শৈল সাগ্রহে শঙ্করের মুখের পানে চাহিল।

তা ঠিক বল্‌তে পারি না এখন।

শৈল কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল আগেকার মত শঙ্করদা বলিবে, কালই যাব নিশ্চয় এবং তাহার নিশ্চয়তার অনিশ্চয়তা লইয়া শৈল তাহাকে একটু ঠাট্টা করিবে। কিন্তু শঙ্করদা বেশ ওজন করিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে। আগে তো শঙ্করদা এমন ছিল না!

এস একদিন, বুঝলে ?

যাব।

গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর পিছনের লাল বাতিটার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদূর গিয়াই গাড়ি মোড় ফিরিল। শঙ্কর তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। নির্জন পিচ-ঢালা রাস্তাটা রহস্যময় ভাষায় তাহাকে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাজমহলে মুকুজ্জেমশাই তাঁহার স্বাভাবিক রীতি-অনুযায়ী একদল ছেলে জুটাইয়া খেলায় মত্ত ছিলেন। এ খেলাটা অবশ্য বাঘ-বক্‌রি নয়, কলসী-ভাঙা খেলা। বাঘ-বকরি অপেক্ষা অধিক উত্তেজনাজনক। মাঠের মাঝে একটা খালি কলসী উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। এক-একটি বালকের চোখে কাপড় বাঁধিয়া তাহাকে বেশ দুই-চারি পাক ঘুরাইয়া তাহার হাতে একটি লাঠি দেওয়া হইতেছে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় যদি সে কলসীটিকে গিয়া লাঠির ঘায়ে ভাঙিতে পারে, তাহাকে নগদ এক টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে—মুকুজ্জেমশাই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বেশ একদল বালক জুটিয়া জটলা করিতেছে। মুকুজ্জেমশাই এক-একজনের চোখ বাঁধিয়া ছাড়িতেছেন এবং বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছেন। কেহ ঠিক বিপরীত মুখে চলিয়া যাইতেছে, কেহ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কেবল ইতস্তত করিতেছে, কেহ কলসীর পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বারম্বার দিক পরিবর্তন করিতেছে, কেহ অভিযোগ করিতেছে যে চোখ বড় বেশি জোরে বাঁধা হইয়াছে,—নানা বালক নানা রকম করিতেছে, কিন্তু কেহই কলসী ভাঙিতে পারিতেছে না। মুকুজ্জে-মশাই হাসিতেছেন।

একে একে অনেকগুলি বালকই চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। পারিলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে ভাল হইত, এক টাকার বেশি খরচ হইত না। কিন্তু সকলেই ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন মুকুজ্জেমশাই অনুভব করিলেন এবং নিকটেই একটি ময়রার দোকান থাকায় তাহা অসম্ভবও হইল না।

মোট কথা, মহানন্দে খেলা-পর্ব শেষ হইয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই যে বাড়িটাতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়িরই সম্মুখে অবস্থিত খোলা মাঠটাতে এই সব হইতেছিল। মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতে

যাইবেন, এমন সময় দুই-তিনটি বালক আসিয়া তাঁহাকে ধরিল যে, আজ কিছুতেই তাঁহার যাওয়া হইবে না। গতকল্য ক্লিওপেট্রার যে গল্পটা রাত্রে তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেটা শেষ করিয়া যাইতে হইবে।

মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, আজ আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই।

তবে আপনি গল্প আরম্ভ করলেন কেন?

অত্যন্ত অভিমান-ভরে আট-নয় বছরের একটি বালক ঠোঁট ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই ভারি বিপদে পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা, আমি গিয়েই একটা ভাল বই পাঠিয়ে দেব তোমাদের। তাতে ক্লিওপেট্রার গল্প আছে, আরও অনেক ভাল গল্প আছে।

পরশুদিন সেই যে জাহাজ-ডুবির গল্পটা বললেন, সেটাও আছে?

ওটা তো গল্প নয়, সত্যি কথা।

না, আপনি আজকের দিনটি থালি থেকে যান।

কলকাতায় আমার বড্ড দরকার আছে যে কাল। না গিয়ে উপায় নেই। তা না হ'লে তোমাদের ছেড়ে কি আমার যেতে ইচ্ছে করছে কলকাতার সেই ভিড়ে?

আবার কবে আসবেন আপনি?

আবার শিগগিরই আসব।

কথাটা বলিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে পড়িল, সেবার অর্থাৎ প্রায় বৎসর খানেক পূর্বে তিনি সাহেবগঞ্জে গিয়াছিলেন, তখনও একদল বালক-সঙ্গী তাঁহার জুটিয়াছিল এবং আসিবার সময় তাহাদেরও তিনি আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন যে শীঘ্রই ফিরিবেন। কর্মের আবর্তে পড়িয়া তাহাদেরও বিস্মৃতই হইয়াছেন, যাওয়া দূরের কথা।

তথাপি তিনি হাসিয়া আবার বলিলেন, শিগগিরই আসব আবার।

ছেলের দল ক্ষুব্ধ মনে চলিয়া গেল।

মুকুজ্জেমশাই বাসায় ঢুকিতেই মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইল এবং শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আজই তো আপনি যাবেন?

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে তাহার পানে একবার চাহিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের এ হাসি চেনে, বুঝিল, আজই তিনি যাইবেন।

মনোরমার বয়স যদিও চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ছিপছিপে গড়নের চেহারা। এই বয়সে মেয়েরা সাধারণত একটু মোটা হয়, কিন্তু মনোরমা তাহাও হয় নাই, এখনও সে তন্বী আছে। সৃষ্টিকর্তা মনোরমা-নির্মাণে অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। মনোরমার অঙ্গে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নাই। ঠোঁট দুইটি এত পাতলা, দাঁতগুলি এত ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মাগ্র, চোখ দুইটি বড় বড় না হইয়াও এমন শ্রীসম্পন্ন, চিবুকটি ছোট হইয়াও এমন মানানসই, সমস্ত দেহটা লঘু হইয়াও এত লালিত্যময় যে, বিধাতাকে তারিফ না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু এই তন্বী নারীটির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া অদৃশ্য কি যেন একটা আছে, তাহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকা যায় না, দৃষ্টি আপনিই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সমস্ত মুখচ্ছবিতে যেন একটা নীরব নিষেধ লেখা রহিয়াছে। যেন বলিতেছে, এদিকে চাহিও না। তাহার পরিমিত আলাপে, শান্ত কণ্ঠস্বরে, ধীর গমন-ভঙ্গিমায় তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, যে ধারণার প্রতিবাদ তাহার কঠিন মুখভাবে, সূক্ষ্ম নাসার সূক্ষ্মতর কম্পনে, দৃঢ়নিবদ্ধ পাতলা ঠোঁট দুইটিতে এবং সর্বোপরি তাহার কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। শান্তকণ্ঠে তাহার মৃদু কথাগুলি শুনিলে মনে হয়, তাহার মনে কোন ক্ষোভ বা অশান্তি নাই, কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে দেরি হয় না যে, প্রাণপণ শক্তিতে সে একটা বিরাট আর্তনাদের কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তরের এই নিদারুণ দ্বন্দ্বকে গোপন করিতে গিয়াই তাহার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। জোরে কথা কহিবার অথবা চলিবার ক্ষমতাও যেন আর অবশিষ্ট নাই। দৈনিক জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনে যদি বলিতে অথবা চলিতে না হইত, সে নির্বাক নিশ্চল হইয়া নির্জনে বসিয়া থাকিত। কিন্তু সমাজে বাস করিতে হয়, সমাজ তো নির্জন নয়।

বালবিধবা মনোরমাকে তাই চলিতে হয়, বলিতে হয়, কাজকর্ম করিতে হয়। কিন্তু সে এত সংক্ষিপ্ততার সহিত এগুলি করে যে, দেখিলে বিস্ময় জন্মে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, সঙ্গোপনে কি একটা গোপন বেদনাকে সে সর্বদা পালন করিতেছে এবং পাছে কেহ তাহা বুঝিতে পারে—এই আশঙ্কায় নিরুদ্বেগের একটা মুখোশ পরিয়া আছে। তাই কেহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিলে সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাহার চোখে মুখে এমন একটা জ্বালা প্রকটিত হইয়া উঠে, দর্শককে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে হয়।

মনোরমার জীবন দুঃখময়। সেই কবে, কতদিন আগে বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় সে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিতে পারে নাই, ফুলশয্যার রাত্রেও লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া ছিল, তাহার পর আর স্বামীর সহিত দেখা হইবার সুযোগ হয় নাই। তিনি ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে জাহাজ-ডুবি হইয়া মারা গিয়াছেন। স্বামীর মুখ মনোরমার মনে নাই। যখন বিবাহ হইয়াছিল, কতই-বা তাহার বয়স! দশ বৎসরও নয়। হিন্দু-বিধবাজীবনের নিষ্ঠুর নিষ্ঠার চাপেও কিন্তু মনোরমার যৌবন নিষ্পিষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং যায় নাই বলিয়াই সমাজের চক্ষে সে পতিতা। কিন্তু কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা ঠিক নয়। গুণ্ডায় তাহাকে হরণ করে নাই। সে স্বেচ্ছায় তারাপদের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা তারাপদকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল এবং আত্মীয়স্বজনেরা যদি পুলিসের হাঙ্গামা না তুলিতেন, হয়তো তারাপদর সঙ্গেই তাহার জীবনটা বেশ কাটিয়া যাইত। (যাইত কি ?—মাঝে মাঝে এখন তাহার নিজেরই সন্দেহ হয়।) পুলিসের ভয়ে তারাপদ অন্তর্ধান করিল। আত্মীয়স্বজনেরা মনোরমাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন; কিন্তু ক্ষমা করিলেন না। পদস্খলিতাকে ক্ষমা করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বাপ মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মনোরমা সংসারের মধ্যে কোন রকমে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। বাপ্-মার মৃত্যুর পর তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ভাইদের সংসারে ভ্রাতৃজায়াদের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও হয়তো মনোরমা ভিটা আঁকড়াইয়া কোনক্রমে পড়িয়া থাকিতে পারিত; কিন্তু যখন সে শুনিল যে, সে থাকাতে তাহার ভাইঝিদের বিবাহ হইতেছে না, তাহার অতীত কলঙ্কটা তাহাকে ঘিরিয়া এখনও সজীব হইয়া আছে এবং তাহাদের বিবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে, তখন সে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, দুই চক্ষু যেখানে লইয়া যায় সেইখানেই সে চলিয়া যাইবে, দাসীবৃত্তি করিয়া জীবনযাপন করিবে, ভাইদের সংসারে আর থাকিবে না। যৌবন তখনও অটুট ছিল, দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত রূপও ছিল, কাশীধামে উপনীত হইয়া মনোরমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য একাধিক ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। দুইজন গুণ্ডা গোছের লোক, একটি বিপত্নীক কাশীবাসী প্রৌঢ় এবং গুটিচারেক ছোকরার বল-বিক্রম-দরদ-অনুরোধ-ইঙ্গিতের আবর্তে পড়িয়া সে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সহসা মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখা দিলেন। মুকুজ্জেমশাই লোকটি কে, কেন তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে চাহিতেছেন, কি করিয়া তাহার খবর পাইলেন, মনোরমা কিছুই জানিত না। তিনি আসিয়া বলিলেন, শুনলাম, তুমি বিপদে পড়েছ, যদি আমার সঙ্গে আসতে চাও আসতে পার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখে মুখে কথায় বার্তায় মনোরমা কি দেখিল তাহা মনোরমাই জানে, সে নির্ভয়ে রাজী হইয়া গেল। কেবল বলিল, আমাকে নিয়ে আপনি কোথায় যাবেন?

তা এখনও ঠিক করি নি। আমি কোথাও বেশি দিন থাকি না, তবে তোমাকে ভালভাবে রাখবার বন্দোবস্ত করব কোথাও না কোথাও।

সেই হইতে মনোরমা মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে আছে এবং এ যাবৎ যত পুরুষের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই মুকুজ্জেমশাইই একমাত্র লোক, যিনি তাহার রূপ যৌবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার; তাহার ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন, ভদ্রপরিবারে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সর্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট—

কিন্তু কখনও তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনোরমার মনে পড়ে না। প্রায় বারো-তেরো বৎসর মুকুজ্জেমশাইয়ের আশ্রয়ে; কিন্তু মুকুজ্জেমশাই সেই একরকম—সৌম্যমূর্তি, সদাহাস্যমুখ, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সদাচঞ্চল ব্যক্তি।

ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নিজের জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছেন।

শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, খাবার এনে দিই তা হ'লে?

এবেলা আর খাব না, খিদে নেই, ওবেলাই যা খাওয়া হয়েছে তা হজম হয় নি এখনও।

মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, মকদ্দমার কি বুঝলেন?—ভবেশবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করতে বললেন।

ভবেশ ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই পুঁটুলি বাঁধিতে লাগিলেন, মনোরমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে ইতস্তত করিয়া মনোরমা পুনরায় আর একটি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ওঘরে কাল যে জাহাজ-ডুবির গল্পটা বলছিলেন, সেটা কি সত্যি?

মুকুজ্জেমশাই চকিত দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কি ক'রে শুনলে?

আমি বারান্দায় ছিলাম। ওটা গল্প, না, সত্যি?

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল নীরবে মনোরমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, সে কথা জেনে তোমার লাভ?

মনোরমা কিছু না বলিয়া আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন জানতে চাইছ, বল না?

এমনই।

উত্তর না দিয়া মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিলেন। বলিলেন, এবারে যেতে হবে, ট্রেনের বেশি সময় নেই। ভবেশের স্ত্রীকে ডাক।

মনোরমার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর সামান্য যেন একটু কম্পিত হইল, সে কিন্তু কিছু বলিল না। মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরে অবগুণ্ঠনবতী একটি বধূ আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মুকুজ্জেমশাইকে প্রণাম করিল।

কোন ভয় নেই মা, ভবেশ ঠিক ছাড়া পাবে।

মুকুজ্জেমশাই বাহির হইয়া গেলেন।

১২

গতকল্য শঙ্করের নামে যে মাসিক পত্রিকাটি আসিয়াছিল, তাহাই সে একা বসিয়া পড়িতেছিল। নিজের লেখাটাই বার বার করিয়া পড়িতেছিল। ছাপার অক্ষরে নিজের প্রথম রচনা। অনেক দিন আগের লেখা একটা কবিতা। সোনাদিদির কথা মনে পড়িল। সোনাদিদিই লেখাটা কাগজে পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি রিনির উদ্দেশ্যে লেখা, কিন্তু লাইনগুলার ফাঁকে ফাঁকে সোনাদিদির মুখখানা যেন উঁকি দিয়া যাইতেছে। সেদিনের কথাটা শঙ্করের মনে পড়িল, যেদিন সে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া মিষ্টিদিদি এবং সোনাদিদির শরণাপন্ন হইয়াছিল। সলজ্জ স্নিগ্ধ সংযতশ্রী রিনির মুখখানি এখনও মনে আঁকা রহিয়াছে, একটুও মলিন হয় নাই। মনের যে সুনিভৃত মণিকোঠায় বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি টাঙানো থাকে, রিনির ছবিও সেইখানে টাঙানো রহিয়াছে। রিনির নিকট হইতে কতটুকু বা সে পাইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেইটুকুই সুন্দর করিয়া কখন যে তাহার মন সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহা সে এতদিন জানিতেই পারে নাই। স্মৃতিপটে অঙ্কিত রিনির আলেখ্যের পানে চাহিয়া শঙ্কর একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। রিনির জন্য মন আর উন্মুখ নহে, উন্মুখ হইবার অধিকার তাহার নাই এবং সেজন্য দুঃখও আর নাই। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, ভালই হইয়াছে। নিজের যে পরিচয় সে ক্রমশ পাইতেছে তাহাতে মনে হয়, রিনিকে সে সুখী করিতে

পারিত না। তাহার মনের কলুষ একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত গ্লানিময় করিয়া তুলিতই। কলুষ তাহারই মনের মধ্যে ছিল, এখনও আছে। মিষ্টিদিদি উপলক্ষ মাত্র। তিনি না থাকিলেও অন্য উপায়ে ইহা ঘটিত। রিনি নষ্ট হইয়া যাইত, রিনির সম্বন্ধে তাহার স্বপ্নটাও ভাঙিয়া যাইত, বাস্তবের রূঢ় আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত না।

বাস্তবের রূঢ় আঘাত সহ্য করিয়াও আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া থাকিতে পারে মুক্তো। শঙ্করের মাংসলোলুপ অথচ স্বপ্নবিলাসী মনকে আশ্রয় দিতে পারে সে-ই। অপর কাহারও পক্ষে, বিশেষত ভদ্রঘরের সুনীতি-শৃঙ্খলিত সভ্য রমণীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। কোন ভদ্রমনা নারীই পশুটাকে সহ্য করিতে পারে না, অন্তত না পারার ভান করে। মুক্তোর পশু লইয়াই কারবার, সুতরাং সে বিষয়ে কোনরূপ ভণ্ডামি বা ছদ্মবেশ তাহার নাই। পশুদের হাটে নিজেকে সে নিলামে চড়াইয়া দিয়াছে, যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দিবে সে বিনা দ্বিধায় তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। এই নিছক কেনা-বেচার অন্তরালেও কিন্তু একজন আছে, যাহাকে টাকা দিয়া কেনা যায় না, যাহাকে অনুভব করা যায় কিন্তু ধরা যায় না, তাহাকে ঘিরিয়াই শঙ্করের স্বপ্ন রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া বেশ কিছু টাকা যোগাড় করা যায়! এক-আধ শো টাকা নয়, বেশ কিছু মোটা টাকা, যাহার বিনিময়ে সে মুক্তোকে পাইতে পারিবে। নিজের দৈন্যে নিজের উপরই তাহার ঘৃণা হইতে লাগিল। সামান্য টাকার জন্য এই অপমান, এই বঞ্চনা এই আত্ম-অসম্মান! যেমন করিয়া হউক, উপার্জন করিতে হইবে, বড়লোক হইতে হইবে। অকারণে ফিজিক্স মুখস্থ করিয়া এম. এস.-সি. পাস করার কোন সার্থকতা নাই। ওরিজিনাল মূর্খ কিন্তু ধনী, সেইজন্যই মুক্তোর উপর তাহার ন্যায্য অধিকার বেশি।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, মুক্তো কি পড়িতে পারে? এই মাসিক-পত্রিকাটা তাহাকে দিয়া আসিলে কেমন হয়? এ কবিতা কি মুক্তো বুঝিতে পারিবে?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং দুইখানি চিঠি দিয়া গেল। দুইখানিই খামের চিঠি একটি বেশ মোটা, হাতের লেখা দেখিয়াই শঙ্কর বুঝিল সুরমার চিঠি। ইদানীং অনেক দিন সে সুরমার কোন চিঠি পায় নাই। দ্বিতীয় চিঠিখানি বাবার। বাবার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, প্রয়োজনীয় কথার বেশি আর কিছু নাই। লিখিয়াছেন, মা ভাল আছেন আজকাল, শঙ্কর আগামী মাসে যেন একবার বাড়ি আসে, তাহার বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তা তিনি শেষ করিয়া ফেলিতে চান। লিখিয়াছেন, তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবে বলিয়াছিলে। আশা করি, এতদিন চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছ এবং তাহা অসাধারণ কিছু নহে। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় শিরীষবাবুর কন্যার সহিত কথাবার্তা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। দেনা-পাওনার কথা এখনও অবশ্য কিছুই ঠিক হয় নাই। সে দিক দিয়া তাঁহাদের তরফে যদি কোন বাধা না উঠে, তাহা হইলে অন্য কোন আপত্তির কারণ দেখিতে পাইতেছি না। যতদূর শুনিয়াছি এবং ফোটোতে যতদূর দেখিয়াছি, মেয়েটি সুশ্রী। তুমি যদি ইচ্ছা কর, পাত্রীটিকে দেখিয়া আসিতে পার। কলিকাতাতেই তাহারা থাকে। তোমার পত্র পাইলে শিরীষবাবুকে লিখিব, তোমার সহিত দেখা করিয়া মেয়ে দেখার বন্দোবস্ত করিতে। তুমি আগামী মাসে নিশ্চয় একবার আসিবে।

শঙ্কর ড্রয়ার খুলিয়া একখানা পোস্টকার্ড বাহির করিল এবং তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিল যে, সে ঠিক করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। ইহা লইয়া তাহাকে যেন আর অনুরোধ করা না হয়। বিবাহ করা তাহার পক্ষে এখন অসম্ভব। চিঠিখানা লিখিয়া চাকরটাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিতে বলিল। এক কাপ চা-ও ফরমাশ করিল।

সুরমার চিঠিটা খুলিতেই কতকগুলি ফোটো বাহির হইয়া পড়িল। নানা রকম ফোটো। একটা কুকুরের, একটা ফুলের, একটা ক্রন্দনাকুল একটি শিশুর, একটা মেঘের, একটা সমুদ্রের, আরও কয়েকটা নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য। সুরমা লিখিতেছে।—

শঙ্করবাবু,

অনেকদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখছি। অর্থাৎ আপনার চিঠিখানা পাওয়ার পর এতদিন কেটে গেছে যে, চিঠিখানাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজে পাচ্ছি না ব'লে যেন মনে করবেন না, যেখানে সেখানে অবহেলাভরে ফেলে রেখেছিলাম এবং অবশেষে তা ওয়েস্ট্-পেপার-বাস্কেট-বাহিত হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। মোটেই তা নয়। বরং পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে অত্যধিক যত্ন ক'রে সেটা রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন্ অ্যাটাচি কেসের কোন্ পকেটে, কোন্ টেবিলের কোন্ ড্রয়ারে অথবা কোন্ বাক্সের কোন্ খোপে যে সেই সযত্নরক্ষিত চিঠিটি আত্মগোপন ক'রে রইল, উত্তর দেবার সময় কিছুতেই তা আবিষ্কার করা গেল না। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। চিঠির উত্তরে আমরা যখন চিঠি লিখি, তখন সব সময়ে আমরা যে চিঠির উত্তরই লিখি তা নয়, উত্তর দেবার উপলক্ষ্য ক'রে নিজের লিপিকুশলতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। সব সময়ে তাতে প্রশ্নের উত্তর থাকে না, আবার অনেক সময় অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরও অযাচিত উত্তর থাকে। কারও চিঠি পেলে মনে যে সাড়া জাগে, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমরা যা করি তাই তার উত্তর। অনেক সময় নীরবতাই হয় শ্রেষ্ঠ উত্তর। অনেক সময় আবার আসল উত্তরটাকে আড়াল করবার জন্যই অবান্তর বাগ্‌বিস্তার করতে হয়; অনেক সময় পাতার পর পাতা লিখলেও উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, আবার অনেক সময়—। কিন্তু এ আমি করছি কি! আপনি কবি মানুষ। আপনাকে এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া যে নিউ-কাস্‌ল শহরে কয়লা বহন করার চেয়েও হাস্যকর। আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছেন। ভাবছেন বোধ হয়, এতদিন পরে চিঠির উত্তর এল—তাও আবোল-তাবোল?

সুতরাং আর নয়, ও-প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা দিলাম। এতদিন আপনার চিঠির যে উত্তর দিই নি, তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। ফোটোগ্রাফিতে আমাকে পেয়ে বসেছে। দিনরাত ওই নিয়েই আছি। দিনে ফোটো তুলি, রাত্রে ডেভেলপ করি। কয়েকটা নমুনা

পাঠালাম, কেমন লাগল সত্যি ক'রে জানাবেন তো? খুব কঠোর হয়ে বিচার করবেন না তা ব'লে। এই আমার প্রথম হাতে-খড়ি, সেটা মনে রাখবেন। ছোট ছেলেটির কান্নার ছবিটি খুব মিষ্টি, নয়? একটি পার্সী ভদ্রমহিলার ছেলে এটি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছে, বেশ মেয়েটি। রবীন্দ্রনাথের একজন গোঁড়া ভক্ত। ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রায় কণ্ঠস্থ। আপনার সেই কবিতাটাও ওঁকে অনুবাদ ক'রে শুনিয়েছি, খুব ভাল লেগেছে ওর। ভাল কথা, আপনি কি কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন না কি? কই, কোন লক্ষণই তো দেখতে পাই না! লিখলে নিশ্চয় কোথাও দেখতে পেতাম।

আপনার বন্ধুর কোন খবর কি পেয়েছেন ইদানীং? আমি অনেকদিন কোনও খবর পাই নি। পত্রলেখক-হিসাবে বোধ হয় কোনকালেই ওঁর প্রসিদ্ধি ছিল না। আপনিই ভাল বলতে পারবেন, কারণ আপনারা বাল্যবন্ধু। আমার সঙ্গে পরিচয় যদিও অল্পদিনের (আমি তো আগন্তুক বললেই হয়), কিন্তু এই অল্প পরিচয় সত্ত্বেও এ কথাটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, পত্রলেখক-হিসাবে ওঁকে প্রথম শ্রেণীতে দূরের কথা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিতেও ইতস্তত করা উচিত। অত্যন্ত কাজের মানুষ অর্থাৎ প্র্যাকটিকাল লোক যাঁরা, শুনেছি, অপব্যয় করবার মত সময় নেই তাঁদের এবং যে চিঠি দু কথায় লেখা যায় তার জন্যে দু শো কথা লেখাটা অত্যন্ত অন্যায় ব'লে মনে করেন তাঁরা। দু শো কথা একসঙ্গে লেখবার ক্ষমতা আছে কি না, সে প্রশ্ন না তুলেও এটা বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, দু শো কথা লেখবার ধৈর্য ওঁদের নেই। আপনার বন্ধুটির প্রথম প্রথম যা-ও বা একটু ধৈর্য ছিল, আজকাল তার থেকেও চ্যুত হয়েছেন তিনি। হয়তো পড়ার চাপ, নয়তো বা আর কিছু। অনেক সময় প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়।

কবিরা এখনও নারীদেরই প্রহেলিকা ব'লে থাকেন, আমার মনে হয়, খুব সম্ভব সেটা প্রথার খাতিরে। এককালে হয়তো নারীরা সত্যই প্রহেলিকা ছিল এবং বিস্মিত পুরুষদের মন একদা তার সমাধানেই ব্যস্ত ছিল ব'লেই

কাব্যে তার এত উল্লেখ দেখা যায়। যুগ যুগ ধ'রে পুরুষদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে নারী কিন্তু আর প্রহেলিকা নেই, নারী-সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাই তাঁরা সমাধান করেছেন। নারীদের ছলা-কলা হাব-ভাব লীলা-চাপল্য অর্থাৎ নাড়ী-নক্ষত্র আজকাল পুরুষজাতির নখদর্পণে। তবু কিন্তু পুরুষদের দৃষ্টির সম্মুখে এখনও নারীরা নিজেদের রহস্যময়ীরূপে প্রকট রাখবার চেষ্টা করেন, এবং আমার বিশ্বাস, পুরুষেরা জেনে শুনেও মুগ্ধ হবার ভান করেন। অর্থাৎ আজকাল বিজ্ঞান-মহিমায় প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রহসন। আপনারা তা দেখে যে হেসে লুটিয়ে পড়েন না, সেটা আপনাদেরই ঔদার্য, ভণ্ডামি বা সিভালরি—যাই বলুন। আমার বরং পুরুষদেরই প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়, যদিও বিজ্ঞানের প্রকোপ আপনারাও এড়াতে পারেন নি, এবং যদিও আমাদের ধারণা, আপনাদের চরিত্রের অনেকখানিই আমরা বুঝে ফেলেছি। আপনাদের আমরা সমস্ত বুঝে ফেলেছি—এই ধারণাই আরও বিভ্রান্ত করেছে আমাদের। আমাদের সম্পর্কে আপনাদের যতটুকু আমরা পাই, আপনাদের ততটুকুই হয়তো কিছু কিছু বুঝি আমরা; কিন্তু আমাদের আয়ত্তের বাইরে আপনাদের যে সত্তা, তার সঙ্গে আমাদের কিছুই পরিচয় নেই এবং সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে সবজান্তার মত চলতে যাই ব'লে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, এবং সেই হোঁচটের নানা মূর্তি নানা রূপে দেখা দেয়। কখনও মূর্ছা যাই, কখনও আত্মহত্যা করি, কখনও কবিতা লিখি, কখনও বা কোন আন্দোলনে যোগদান করি। আমি ফোটোগ্রাফ নিয়ে মেতেছি। কিন্তু ওই অপরিচয়ের অন্ধকারটাই যে লোভনীয়!

যাক। নিজের কথা নিয়েই অনেকক্ষণ বাগ্‌বিস্তার করলাম, আপনার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় নি। মিষ্টিদিদির খবর অনেকদিন পাই নি। শৈল ঠাকুরঝিও কোন চিঠিপত্র দেন না। কেমন আছেন তাঁরা? রিনি দেবী কেমন আছেন? এখনও কি আপনি তাঁর পাঠাভ্যাসে সহায়তা করছেন নাকি? পুরুষদের মধ্যে যে অংশটুকু প্রহেলিকা নয়, কাচের মত স্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর—যেটুকু, সেটুকুর সম্বন্ধে সচেতন করা বৃথা ব'লেই কিছু বললাম না।

আশা করি, আপনি এবং রিনি উভয়েই নিরাপদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। অনেকক্ষণ ধ'রে বকছি, বিরক্ত হয়ে উঠেছেন বোধ হয় এতক্ষণ। আমারও নতুন প্রিণ্টগুলো শুকিয়েছে, তুলতে হবে এইবার। ফোটোগুলো কেমন লাগল জানাবেন। প্রীতি-সম্ভাষণ নিন। ইতি—সুরমা।

ভৃত্য চা দিয়া গেল এবং বলিল যে, নীচে কমন-রুমে এক ভদ্রলোক শঙ্করের সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।

শঙ্কর বলিল, এইখানেই নিয়ে আয় ডেকে।

একটু পরেই রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে অপূর্বকৃষ্ণ স্মিত আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। বিনীত নমস্কার করিয়া অপ্রস্তুত মুখে রুমালটা পকেটে পুরিতে পুরিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, আশা করি, আপনার কাজের কোন ব্যাঘাত ক'রে বিরক্ত, মানে—

কিছু না, বসুন। চা খাবেন?

না। অনেক ধন্যবাদ। এইমাত্র চা খেয়ে আসছি আমি।

কোন দরকার আছে নাকি আমার সঙ্গে?

অপূর্ববাবু পুনরায় রুমাল বাহির করিলেন এবং গলা, ঘাড় কানের পিছন প্রভৃতি মুছিয়া যেন কিছু শক্তিসংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মরিয়া হইয়া শঙ্করের চোখের পানে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, মিস মল্লিকের সঙ্গে কি দেখা হয় আজকাল আপনার?

দেখা না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?—বিস্মিত শঙ্কর প্রশ্ন করিল। অপূর্ববাবু কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন, সত্যই তো শঙ্করবাবুর সহিত বেলা মল্লিকের দেখা না হওয়ার কোন সঙ্গত বাধা থাকিবার কথা নয়। এ প্রশ্ন করার কোনও অর্থ হয় না। অকারণে অনর্থক একটা প্রশ্ন করিয়াছেন এবং সেটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া অপূর্ববাবু মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার মুখভাবেও সেটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আবার রুমাল বাহির করিতে হইল। শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, বেলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কতদিন আগে?

আমার ? আমার তো দেখা করার তেমন সুযোগ হয় না, রবিবার ছাড়া আমার ছুটি তো তেমন— মানে— তা ছাড়া আপিস আজকাল বড় স্ট্রিক্ট, রবার্টসন সায়েব—

রবিবার তো মাসে চারটে ক'রে আছে।—বলিয়া শঙ্কর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মিস মল্লিক রবিবারে বাড়ি থাকেন না, আমি গিয়েছিলাম দু দিন। অথচ পিয়ানোর ভাল ভাল গৎ যোগাড় করেছি কয়েকটা, মানে—শুনলাম, উনি আজকাল পিয়ানোও—

শঙ্কর বলিল, পিয়ানো! পিয়ানো পেলে কোথা? শুনি নি তো?

মিস্টার বোসের একটা পিয়ানো আছে, উনি মিসেস বোসকে এস্রাজ শেখাতে যান, সেই সময় পিয়ানোটাও বাজান শুনেছি। মানে—ওদের বেয়ারাটা বলছিল—

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, বেশ তো, আপনি কি করতে চান?

অপূর্ববাবু একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, কয়েকটা ভাল গৎ পেয়েছিলাম, খুব ভাল বিলিতী গৎ, সেইগুলো ওঁকে আর কি, মানে—অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—

উপহার দিতে চান?

অপূর্ববাবু একটু হাসিলেন, চক্ষু দুইটি একটু নত করিলেন এবং সমস্ত মুখভাবে নারী-সুলভ কমনীয়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, না না, উপহার ঠিক নয়, আমি অর্থাৎ—

নির্বিকারভাবে শঙ্কর বলিল, বেশ তো, ডাকে পাঠিয়ে দিন না, দেখা যখন হচ্ছে না।

ডাকে? তা বেশ বলেছেন, সিওর পাবেন তা হ'লে, কি বলুন? আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এই ভেবে যে, আপনি হয়তো বলতে পারবেন, কখন উনি বাড়ি থাকেন, তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমিও একদিন, মানে—

উনি কখন বাড়িতে থাকেন, তা আমিও ঠিক জানি না। প্রায়ই অবশ্য থাকেন না, অনেকগুলো টুইশনি নিয়েছেন কিনা!

তা শুনেছি আমি। তা হ'লে—

অপূর্ববাবু আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ডাকেই তা হ'লে পাঠিয়ে দেব। ওঁর নাম্বারটা কি বলুন তো, টুকে নিই, ঠিক মনে নেই—

পাঞ্জাবির পকেট হইতে পকেট-বুক বাহির করিতে গিয়া কতকগুলি মেয়েদের মাথার কাঁটা বাহির হইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল। কুণ্ঠিত অপূর্ববাবু চাদর সামলাইতে সামলাইতে সেগুলি কুড়াইতে লাগিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, ওগুলো আবার কি?

ওগুলো, মানে—আমাদের পাড়ারই একটি মেয়ে কিনতে দিয়েছিল আমাকে—

কাঁটাগুলি কুড়াইয়া মিস বেলা মল্লিকের ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিত চলিয়া গেলেন। শঙ্কর মৃদু হাসিয়া চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

১৩

মানুষের সহিত পশুর প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য তো আছেই, অনেক সময় আকৃতিগত সাদৃশ্যও থাকে। এক-একজন লোকের সহিত এক-একটা পশুর অদ্ভূত রকম মিল, দেখিলেই একটা বিশেষ পশুর কথা মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে লোকটি হাওড়ায় একটা মুদীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে দেখিলেই ঘোড়ার কথা মনে হয়। মুখটা ঠিক ঘোড়ার মুখের মত—খানিকটা যেন লম্বা হইয়া সামনের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাথার সামনের দিকে লম্বা লম্বা চুল, দাঁতগুলাও লম্বা লম্বা এবং এবড়ো-খেবড়ো, যেন একটা আর-একটার ঘাড়ে চড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত দাঁতেই বিশ্রী হলুদ রঙের ছোপ। গায়ে একটা আধময়লা কামিজ, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা, পরনের কাপড়টাও ময়লা, কিন্তু বেশ কায়দা করিয়া মালকোঁচা মারিয়া পরা। দেখিলে ঘৃণা হয়। কিন্তু ভয় হয়, ভদ্রলোকের চোখ দুইটি দেখিলে।

বড় বড় কিংবা খুব ছোট ছোট নয়, মাঝারি ধরনের সাধারণ চোখ। এককালে হয়তো সাধারণ চোখের মতই খানিকটা সাদা এবং খানিকটা কালো অংশ ছিল, এখন কিন্তু সাদা অংশটি পীতাভ এবং কালো অংশটি বাদামী গোছের হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে ইহাতে হয়তো ভীতিকর কিছু দেখা যাইবে না, কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলেই ভয় হইবে। ভদ্রলোক যদিও জ্ঞাতসারে সর্বদাই চোখের দৃষ্টিতে একটা সহৃদয়তার সুন্দর পরদা টাঙাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হইলেই পরদা সরিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তরালে যে দৃষ্টি দেখা যাইতেছে, তাহা মানুষের নয়—পিশাচের। পকেট হইতে চিনাবাদাম বাহির করিয়া ভদ্রলোক খোলা ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া মুখে ফেলিতেছেন এবং লক্ষ্য করিতেছেন, মুদীর দোকানে খরিদ্দারের ভিড় কখন কমিবে। মুদীর দোকান নির্জন না হইলে তাঁহার সওদা খরিদ করা হইবে না।

একটু পরেই মুদীর দোকান নির্জন হইল এবং খগেশ্বরবাবু ওরফে যতীনবাবু ওরফে কেষ্টবাবু ওরফে তিন নম্বর আগাইয়া গেলেন এবং মুদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কর্তা, আমার সওদাটা এবার দাও দিকি।

কি চাই বলুন?

বেশি কিছু নয়, আধ-পোটাক সুপুরি। সবগুলি কিন্তু কানা হওয়া চাই।

মুদী একটু বিস্ময়ের ভান করিল। বলিল, সবগুলো কানা? কি হবে কানা সুপুরি দিয়ে?

হলুদ রঙের দন্তগুলি বিকশিত করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ওষুধ।

কিসের ওষুধ?

চুলকোনির।

মুদী বাছিয়া বাছিয়া আধ পোয়া কানা সুপারি ওজন করিয়া দিল এবং প্রসঙ্গত বলিল, কাবুফবুমা লেনের মোড়ে একটা বিড়িওয়ালা আছে, চুলকোনির অব্যর্থ ওষুধ সে জানে। খগেশ্বর ঠিকানাটা টুকিয়া লইলেন। এই ঠিকানাটারই প্রয়োজন। এই ঠিকানা জনৈক কানা-সুপারি-ক্রেতাকে দিবার জন্য মুদীও পয়সা খাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল।

কারফরমা লেন চিৎপুর-অঞ্চলে। একটি ট্যাক্সি সহযোগে খগেশ্বর রওনা হইলেন। কারফরমা লেনের কাছাকাছি আসিয়া ট্যাক্সিটা ছাড়িয়া দিলেন এবং কিছুটা দূর হাঁটিয়া গিয়া দেখিলেন, কারফরমা লেনের মোড়ে সত্যই একটা বিড়ির দোকান রহিয়াছে। থাকিবেই, তাহা খগেশ্বরবাবু জানিতেন। জনৈক বৃদ্ধ মিয়া বসিয়া বিড়ি পাকাইতেছিল।

খগেশ্বর আগাইয়া গিয়া বলিলেন, মিয়াসাহেব, ভাল গোলাপী বিড়ি চাই এক বাণ্ডিল।

মিয়াসাহেব বিড়ি দিল।

খগেশ্বর বলিলেন, আর একটি মেহেরবানি করতে হবে। শুনেছি, তুমি খুজলির ভাল দাবাই জান, ব'লে দিতে হবে সেটি আমাকে।

মিয়াসাহেব সবিস্ময়ে বলিল, খুজলির দাবাই! আমি জানি, তা কে বললে আপনাকে ?

এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে খগেশ্বর বলিলেন, যে মুদীর কাছ থেকে কানা সুপুরি কিনলাম আধ পোয়া, সেই তো তোমার নাম বাতলালে মিয়াসাহেব।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিয়াসাহেব একবার খগেশ্বরের পানে চাহিল। বলিল, দেখি সুপুরি।

মিয়াসাহেব সুপারিগুলি একটি একটি করিয়া নিরীক্ষণ করিল। হাঁ, সবগুলিই কানা বটে। বলিল, দাবাই আমার কাছে নেই, আছে হাড়কাটা গলির হীরেমন বিবির কাছে। তাকে গিয়ে বলুন, আমার খুজলি হয়েছে, আপনার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারখানার ধুলো আমার একটু চাই। এই বললেই যা চাইছেন, তা পাবেন

মিয়াসাহেব গম্ভীর মুখে পুনরায় বিড়ি পাকাইতে শুরু করিল। মিয়াসাহেব আর কোন কথা বলেন না দেখিয়া খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ঠিকানাটা ?

ঠিকানাটা নিতে হ'লে সুপুরিগুলি রেখে যেতে হবে।

বেশ।

সুপারিগুলি হস্তগত করিয়া মিয়াসাহেব হীরেমন বিবির ঠিকানাটা দিল।

হাড়কাটা গলিতে হীরেমন বিবির দ্বারস্থ হইয়া খগেশ্বর দেখিলেন যে, হীরেমন নামটা শুনিয়া অন্তর যেরূপ উন্মুখ হইয়া উঠে, বিবি আসলে সেরূপ কিছু নহেন। এককালে হয়তো রূপসী ছিলেন, এখন কিন্তু কুশ্রী, নানা-রোগগ্রস্ত জীর্ণ-শীর্ণ বারাঙ্গনা। রুক্ষ কেশ, কোটরগত চক্ষু, কঙ্কালসার দেহ। একটা খাটের উপর বসিয়া আছে, হাঁপানির টান উঠিয়াছে।

স্বল্পান্ধকার ঘরটাতে প্রবেশ করিতেই হীরেমন অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল, কে, কি চাই?

খগেশ্বর তাঁহার বাঁ পায়ের ছেঁড়া পয়জারের ধূলি প্রার্থনা করিলেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে হীরেমন বিবি বলিল, আপনি ক নম্বর?

তিন নম্বর।

কাকে কাকে চেনেন আপনি?

খগেশ্বরবাবুকে, হারাণবাবুকে, যতীন্দ্রবাবুকে, কেষ্টবাবুকে আর ম্যানেজারবাবুকে।

তা হ'লে এই রসিদটায় সই ক'রে দিন।

হীরেমন অতি কষ্টে উঠিল এবং একটি তোরঙ্গের ভিতর হইতে একটি তালা-লাগানো ছোট বাক্স এবং একটি কাগজ বাহির করিল। কাগজে লেখা ছিল, হীরেমন বিবির নিকট ঔষধ পাইলাম।

ওইটেতে সই ক'রে দিন।

খগেশ্বর পকেট হইতে একটি ছোট কাপিং পেন্সিল বাহির করিয়া বাঁ হাতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখিলেন, তিন নম্বর। এই স্বল্প পরিশ্রম করিয়াই হীরেমন বিবি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাঁপানিটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামিয়া থামিয়া সে বলিল, এই বাক্সটা নিয়ে যান। ওর ভেতরে সব লেখা আছে। বাক্সে হরফওলা তালা লাগানো আছে। তালা খোলবার কৌশল আপনি জানেন তো?

না।

আমিও জানি না।

তা হ'লে খুলব কি ক'রে?

মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে যে অন্ধ ভিখিরীটা আঁচল পেতে ব'সে থাকে মেডিকেল কলেজের সামনে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন—ক পয়সায় দিন চলে তোমার? সে যা উত্তর দেবে, সেই কথাটি অক্ষর সাজিয়ে ঠিক করলেই তালা খুলে যাবে।

খগেশ্বর বাক্সটা লইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় হীরেমন বিবি বলিল, বলবেন ম্যানেজারবাবুকে, আমি মরছি, তাঁর কি একটুও দয়া হয় না আমার ওপর? মাসে মাত্র দশ টাকায় কি চলে আমার?

হীরেমন বিবি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

খগেশ্বর বলিলেন, বলব আমি।

বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। ম্যানেজারবাবুকে বলিলেই যদি টাকা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। খগেশ্বর সিংহকে তাহা হইলে সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে নানা ঝঞ্ঝাট সহ্য করিয়া এখানে আসিতে হইত না।

মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে মেডিকেল কলেজের সামনে একটা অন্ধ ভিখারী তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল—এক পয়সা দিলা দে রাম—

খগেশ্বর তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মোড়টা অপেক্ষাকৃত জনবিরল হইতেই নিম্নস্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, ক পয়সায় দিন চলে তোমার?

ভিক্ষুক খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

খগেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

ভিক্ষুক মৃদু কণ্ঠে যেন আপন মনেই বলিল; বাক্সা লায়া হায় তো সেভেন, নেই লায়া হায় তো ঢন্‌ঢন্।

খগেশ্বর সরিয়া গিয়া একটা ল্যাম্প-পোস্টের নিকটে দাঁড়াইয়া এলোমেলো ইংরেজী অক্ষরগুলি ঘুরাইয়া seven কথাটি সাজাইয়া ফেলিলেন। তালা খুলিয়া গেল।

বাক্সের ভিতর একটি ঠিকানা ও চাবি রহিয়াছে। চাবির গায়ে একটি কাগজে লেখা 'খিড়কি-দরজা'। ম্যানেজারবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে।

ঠিকানায় পৌঁছিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। চাবি দিয়া খিড়কি-দরজা খুলিয়া খগেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি। সূচীভেদ্য অন্ধকার। অন্ধকার প্রাঙ্গণে খগেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল, উপরের ঘর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ যেন ভাসিয়া আসিতেছে। মিনিটখানেক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খগেশ্বর পকেট হইতে একটা দিয়াশালাই-কাঠি বাহির করিলেন এবং সেটা নাকে দিয়া খুব জোরে একবার হাঁচিলেন। হাঁচির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের একটি কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। উপরে উঠিবার সিঁড়িটাও আলোকিত হইল। খগেশ্বর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং গিয়াই বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। সিঁড়ির ঠিক সামনের ঘরটাতেই তিনি ফরাশে উপবিষ্ট ছিলেন। সর্বাঙ্গে দামী শাল জড়ানো, মুখে প্রসন্ন হাস্য। বাড়িতে জনপ্রাণী আর কেহ নাই।

এই যে শ্রীগরুড়, এসে পড়েছ দেখছি!

বিনীত নমস্কার করিয়া খগেশ্বর বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশেষ বেগ পেতে হয় নি তো? মুদী, বিড়িওয়ালা, হীরেমন আর অন্ধ ভিখিরী এই চারজনকে পার হয়ে এসেছ নিশ্চয়?

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে খগেশ্বর বলিলেন, তাই এসেছি।

ম্যানেজার স্মিতমুখে চাহিয়া আছেন দেখিয়া খগেশ্বর বলিলেন, ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলাম না।

কর্তার কত বিচিত্র খেয়াল, আমিই কি ছাই সব বুঝতে পারি! যা বলেন,

হুকুম তামিল ক'রে যাই। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ শুনে কর্তা বললেন, ওকে সোজাসুজি ঠিকানা দিও না। মুদী, বিড়িওয়ালা আর হীরেমনের কাছে মুখটা চিনিয়ে তবে যেন আসে। সেই রকম ব্যবস্থাই করলাম। হ'ল অনর্থক কতকগুলো অর্থব্যয়।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, তাতে আমারই বা কি, তোমারই বা কি! লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

খগেশ্বর বলিলেন, উদ্দেশ্যটা কি কিছু বুঝলেন?

ঠিক অবশ্য বুঝি নি। যতদূর আন্দাজ করছি সেটা এই যে, ওই মুদী, ওই বিড়িওয়ালা আর ওই হীরেমন ইদানীং কর্তাকে কিছু মাল সাপ্লাই করেছে। ভবিষ্যতে তুমি যদি দেহাত থেকে কোন টাটকা মাল আমদানি ক'রে আনতে পার—ওদের কারও হেফাজতে এনে দিলেই মালটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। সেইজন্যেই সম্ভবত তোমার মুখটা চিনিয়ে দিলেন ওদের। কাজের লোক ওরা, মাল যোগান দেয়, পাহারা দেয়, পাচার করে। এসব অবশ্য আমার আন্দাজ। কর্তার কথা খোদ কর্তাই জানেন। যাক ওসব কথা। তোমার কথাই শুনি। আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে চেয়েছ কেন শুনি? সংক্ষেপে বল।

খগেশ্বর সংক্ষেপেই বলিলেন, টাকা—

টাকা? কত টাকা?

যা দেবেন। দিন চলা ভার হয়েছে আমার। চাকরি গেছে, পরিবার গেছে, মেয়ে গেছে, কি-ই বা আছে! সবই তো জানেন আপনি। আপনার কর্তার সেবাতে জীবনটাই উচ্ছুগ্‌গু করেছি বলতে গেলে।

ম্যানেজারবাবু কিয়ৎকাল খগেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, গাঁজা কতটা ক'রে খাও আজকাল?

আজ্ঞে, দৈনিক চার আনার।

সৌদামিনীর কাছে পাও-টাও কিছু?

একটা আধলা না। গেলে দেখাই করে না। নিজের মেয়ে-পরিবার কে

এমন দুশমনের মত ব্যাভার করবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। না খেতে পেয়ে মরছিল, লাথি-ঝাঁটা খেয়ে দিন কাটত, আপনার কাছে এনে দিলাম, আপনি বললেন, কর্তার দুজনকেই পছন্দ হয়েছে। নিজের চোখেও দেখলাম। এখন বেশ সোনাদানা প'রে দিব্যি জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে মশাই, আর বললে বিশ্বাস যাবেন না ম্যানেজারবাবু, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

খগেশ্বরই পুনরায় কথা কহিলেন, কর্তা কি আজকাল যান-টান ওদের কাছে?

রামোঃ! কর্তার শখ ওই দু-এক দিনই। দু দিনেই পুরনো হয়ে যায়, নতুনের জন্যে ক্ষেপে ওঠেন। নতুন মাল সন্ধানে থাকে তো বল, ভাল দাম দিয়ে কিনবেন। হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ পেতে পার।

একটা ভালর চেষ্টায় আছি—

বৃদ্ধের চক্ষু দুইটি আগ্রহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, বেশ তো, যোগাড় কর।

আপাতত কিছু চাই আমার, বড় অভাবের মধ্যে আছি।

বৃদ্ধ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কুড়িটি টাকা খগেশ্বরকে দিলেন এবং বলিলেন, এখন এই নিয়ে যাও, দিন পনেরো পরে এসো আবার?

এই বাড়িতেই?

না, এ বাড়িতে নয়, এ বাড়ি বদলাতে হবে। আর বল কেন, সাত দিন অন্তর অন্তর বাড়ি বদলাতে হচ্ছে। ঠিকানা ঠিক পাবে এবার যেমন ক'রে পেলে। এবার অবশ্য মুদী বিড়িওলা আর হীরেমন থাকবে না। অন্য লোকদের মারফৎ আসবে। কর্তার হুকুম এই। প্রত্যেকবার নতুন রকম সঙ্কেতের তালা দিতে হবে। এবারকার তালাটা ঠিক খুলেছিল তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেভেন কথাটা হতেই খুলে গেল তালা।

তালা চাবি আর বাক্স দিয়ে যাও সব। এবার অন্যরকম তালা দিতে হবে।

এই যে।

খগেশ্বর তালা-সমেত কাঠের বাক্স ও খিড়কির চাবিটা ম্যানেজারবাবুর হাতে দিলেন।

সহসা চাপা গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

খগেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, ওটা কিসের শব্দ?

একজন আমলার জ্বর হয়েছে, সে-ই ও-রকম করছে ও-ঘরে প'ড়ে প'ড়ে—ও কিছু নয়।

দ্বিতলে অপর প্রান্তে অজ্ঞান বন্দিনীর কথা খগেশ্বরকে বলিবেন, এমন কাঁচা লোক বৃদ্ধ নহেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খগেশ্বরকে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও এখন। বড় ক্লান্ত আছি আজ, ঘুমুব এবার।

খগেশ্বর হাত জোড় করিলেন।

ওই তো তোমার দোষ শ্রীগরুড়, কিছুতেই তোমার খাঁই মেটানো যায় না।

আরও দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

খগেশ্বর ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

খগেশ্বর চলিয়া গেলে ম্যানেজার ধীরে ধীরে উঠিলেন ও খিড়কির দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিলেন। তাহার পর কুব্জ দেহটা ঈষৎ উন্নমিত করিয়া খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। গোঙানিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ চীৎকারে পরিণত হইল। বৃদ্ধ বুঝিলেন, এইবার জ্ঞান হইয়াছে, আর দেরি করা অনুচিত হইবে।

বারান্দাটা পার হইয়া ওদিকে একটা ঘরের দিকে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেই ঘরটার ভিতর হইতেই চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছিল। ঘরের তালা খুলিয়া বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন।

হতবুদ্ধি মেয়েটির চীৎকার ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর-মুহূর্তেই আরও তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মান্তিকরূপে তাহা অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

আর কিছু শোনা গেল না।

অচিনবাবুর কারখানি নিঃশব্দগতিতে আসিয়া বেলার বাড়ীর সম্মুখে থামিল। জনার্দন সিংহের মারফৎ নিজের কার্ডখানি পাঠাইয়া দিয়া অচিনবাবু স্টিয়ারিঙের উপর ভর দিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই বেশবাস সম্বৃত করিয়া স্মিতমুখে বেলা বাহির হইয়া আসিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, আপনিই কার্ড পাঠিয়েছেন?

অচিনবাবু মোটর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং সমস্ত মুখচ্ছবিতে নিখুঁত ভদ্রতা বিকিরণ করিয়া অতিশয় সুষ্ঠু ভঙ্গীতে একটি নমস্কার করিলেন। রাস্তায় দাঁড়াইয়া আলাপ করাটা অশোভন হইতেছে দেখিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

উভয়ে আসিয়া বাহিরের ঘরটাতে উপবেশন করিলেন। অচিনবাবু হাসিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বলিলেন, একটি দয়া করতে হবে মিস মল্লিক।

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মেয়ে বেলা নহেন। ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া তিনি চাহিয়া রহিলেন। অচিনবাবু বলিলেন, আপনার বাজনার খ্যাতি চারিদিকে শুনতে পাই, আপনার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই তাও জানি, তবু এসেছি নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যে।

ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না?

লিলুয়ায় একটা বাগান-বাড়ি ভাড়া নিয়ে চ্যারিটি পারফরম্যান্স করছি আমরা। নাচ, গান, বাজনা থাকবে সব রকমই। এর থেকে যা টাকা বাঁচবে, সেটা ভাল কাজেই খরচ হবে। মেয়েদের একটা ইস্কুল করবার ইচ্ছে আছে আমাদের। আপনাকে একটা কিছু বাজাতে হবে সেখানে—এস্রাজ সেতার যা হোক। আমি নিজে কারে ক'রে নিয়ে যাব, কারে ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাব—ঘণ্টা-দুয়েকের ব্যাপার।

কখন হবে?

দিন-দশেক পরে, সন্ধ্যে সাতটা থেকে শুরু।

সন্ধ্যেবেলায় আমার ছুটি তো নেই, বাজনা শেখাতে যেতে হয় এক জায়গায়।

বেশ তো, কোথায় বলুন না, একদিনের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেব আমি, সে ভার আমি নিচ্ছি।

সেটা ঠিক হয় না।

না না, মিস মল্লিক, কাইণ্ড্লি আপত্তি করবেন না। আপনাকে আমাদের চাইই।

আমাকে মাপ করুন, আমার সময় কম।

বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অচিনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, দেখুন, একটা সৎকার্যের জন্যে একটু ত্যাগস্বীকার যদি না করেন, তা হ'লে—

বেশ, আপনাদের স্কুলে আমি না হয় কিছু চাঁদা দেব।

সে তো দিতেই হবে, এটা হ'ল উপরি পাওনা। আপনি না থাকলে ফাংশনটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে যেতেই হবে।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, আমি কথা দিতে পারলাম না কিন্তু।

বেশ, আর একদিন আসব আমি, কথা আপনাকে দিতেই হবে।

বেলা স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন জবাব দিলেন না। অপ্রত্যাশিত এই বিপদটার হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়, মনে মনে সেই চিন্তাই তিনি করিতেছিলেন। অচিনবাবু তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি একটু ভেবে দেখুন। সৎকার্যের জন্যে কিছু করা একটা মহাপুণ্য তো বটেই, তা ছাড়া এর আর একটা দিকও আছে। অনেক বড় বড় লোকের কাছে টিকিট বিক্রি করছি আমরা, তাঁদের কাছেও আপনার গুণের পরিচয়টা দেওয়া হবে। যাই বলুন, মিড্‌ল্ ক্লাস পিপ্‌ল তো আপনাদের গুণের যথোচিত মূল্য দিতে পারে না।

অচিনবাবু আরও হয়তো কিছু বলিতেন, কিন্তু বেলা সহসা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখব। আসুন তা হ'লে।

বেলা ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অচিনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল-মুখে অত্যন্ত নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইলেন, জ্বলন্ত দিয়াশলাই-কাঠিটা খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিয়া তাহার পর সেটা নাড়িয়া নিবাইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। নিঃশব্দগতিতে গাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

অচিনবাবুর গাড়ি চলিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর গুপ্তের গাড়িখানি আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসর গুপ্ত গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন এবং জনার্দন সিংহের সেলামের প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া বাহিরের ঘরটাতে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় বেলার সহিত তাঁহার মুখামুখি দেখা হইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বেলার ওষ্ঠাধর নিমেষের জন্য কাঁপিয়া থামিয়া গেল। আত্মসম্বরণ করিয়া বেলা সহজকণ্ঠেই বলিলেন, আমি বেরুচ্ছিলাম, আপনার কি বিশেষ কোন কাজ আছে?

তোমাকে কিছু বলতে চাই।

প্রফেসর গুপ্ত কিছুদিন হইতে বেলাকে, অবশ্য বেলার সম্মতিক্রমেই, 'তুমি' বলিতে শুরু করিয়াছেন।

আমাকে? বেশ বলুন।

এখানে সে কথা বলা যাবে না, চল, মাঠে যাই।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেলা কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, তাই চলুন। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।

কি, বল?

আপনার বলবার মত যত কথা আছে, আজই শেষ ক'রে ফেলতে হবে

এর জন্যে মাঠে যতক্ষণ ব'সে থাকতে বলেন, আজ ব'সে থাকব। কাল থেকে কিন্তু আর নয়।

প্রফেসর গুপ্ত অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা তিনি বলিলেন, বেশ তাই হবে।

তা হ'লে একটু দাঁড়ান, এখুনি আসছি আমি।

বেলা দেবী ভিতরে গেলেন ও মাঠে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

চলুন।

কিছুক্ষণ পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়াছে, মাঠে অন্ধকার নামিতেছে। একটি নির্জন স্থান বাছিয়া বেলা ও প্রফেসর গুপ্ত উপবেশন করিলেন। মোটরে যদিও উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন, কিন্তু একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নাই।

প্রফেসর গুপ্তই প্রথমে কথা কহিলেন, তুমি মানুতুকে কি সত্যিই আর বাজনা শেখাবে না?

ও ঘটনার পর আর তো আপনার বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার স্ত্রী আফিং খেয়েছিলেন আমার জন্যে—এ কথা শোনার পর আর কি আপনার বাড়িতে যাওয়া চলে, আপনিই বলুন? ভাগ্যিস বেঁচে গেছেন, না বাঁচলে কি হ'ত বলুন তো?

সেটা কি আমার দোষ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার দোষ সত্যি আছে কি না, সে অপ্রিয় আলোচনা করবার অধিকার আমার নেই। আমার নিজের কোন দোষ নেই, এইটুকুই আমি জানি। আর সেটা আপনিও জানেন। অথচ—

আমার দোষ স্খালনের চেষ্টা আমি করছি না, কারণ এটাকে আমি দোষ ব'লে মনে করি না। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে এবং ভাবে ভঙ্গীতে সেটা হয়তো প্রকাশ করেছি, তাতে দোষের তো কিছু নেই।

আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে নিশ্চয় দোষের আছে। আপনি বিবাহিত, সমাজের নিয়ম মেনেই আপনার চলা উচিত। হঠাৎ আমাকে ভাল লাগবার কারণই বা কি, তা তো আমি বুঝতে পারছি না। আরও বুঝতে পারছি না, সে কথা আপনি প্রকাশ করছেন কেন?

প্রফেসর গুপ্ত ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভালবাসা কোন দিন কোন আইন মেনে চলে নি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, এর বেশি আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি জীবনে সুখী নই বেলা।

প্রফেসর গুপ্তের একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সুখী নন কেন? আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালবাসতে পারেন নি?

পারলে আমার এ দুর্দশা হ'ত না।

পারেন নি কেন? আপনার স্ত্রী তো লোক খারাপ নন।

লোক খারাপ কি ভাল, তা বিচার ক'রে কেউ কাউকে ভালবাসে না। মন্তর প'ড়ে বিয়ে করলেই ভালবাসা জন্মায় না। মনের মিল হওয়াটাই আসল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এতটুকু মনের মিল নেই—কোন দিক থেকেই নেই। আমার মানসিক সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এতটুকু সম্পর্ক নেই। আমি উপার্জন করব, তিনি খরচ করবেন, আমার চালচলনের প্রতি তীক্ষ্ণ নৈতিক দৃষ্টি রাখবেন, কোন মেয়ের সঙ্গে সামান্য ঘনিষ্ঠতা দেখলে তা নিয়ে কথায় কথায় শ্লেষ করবেন, কোন কারণে যদি তাঁর স্বার্থে একটুও আঘাত করি, তা হ'লে তাই নিয়ে গঞ্জনা দেবেন, কথায় কথায় প্রকাশ করবেন যে, তাঁর মত মহিয়সী মহিলা আমার মত লোকের হাতে প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেলেন—এই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। ঝগড়া অথবা তর্ক ছাড়া তাঁর সঙ্গে অন্য কোন প্রকার আলাপ বহুকাল হয় নি, হওয়া সম্ভবও নয়। রাস্তার একটা অশিক্ষিত কুলি অথবা অমার্জিত গাড়োয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভব নয়। কারণ আমাকে তিনি সর্বদাই তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করেন এবং

সর্বদাই সন্দেহ করেন যে, হয়তো আমি তাঁকে সে বিষয়ে ফাঁকি দিচ্ছি। আমি অবশ্য সে সন্দেহের ন্যায্য খোরাক যে সরবরাহ না করি তা নয়, করি—কারণ আমার মন সর্বদাই ক্ষুধিত।

একটু থামিয়া প্রফেসর গুপ্ত পুনরায় বলিলেন, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম যে, তোমার মধ্যে আমার মন হয়তো আশ্রয় পাবে। সব কথা শুনলে হয়তো তুমি আমার দুঃখ বুঝবে, হয়তো একটু প্রশ্রয় পাব। আমার স্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গী ক'রে এক ডেলা আফিং খেয়েছেন ব'লেই তাঁর দুঃখটা তুমি বড় ক'রে দেখো না। আমার দুঃখ আরও গভীর।

প্রফেসর গুপ্ত নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনেকক্ষণ পরে প্রফেসর গুপ্তই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

তুমি কিছু বলছ না যে?

বলবার কিছুই নেই।

কিছুই নেই?

না।

প্রফেসর গুপ্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বেলা বলিলেন, আপনার আর কিছু কি বলবার আছে?

সবই তো বললাম।

তবে চলুন, এবার ওঠা যাক।

বেলা উঠিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ওদিকে কোথা? আমার কার যে এদিকে। রাস্তা ভুলে গেলে নাকি?

রাস্তা ভুলি নি। আমি ট্যাক্সি ক'রে ফিরব। আপনি বাড়ি যান।

বেলা ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে চলিয়া গেলেন।

প্রফেসর গুপ্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

১৫

মৃন্ময়কে আজকাল প্রায়ই বাহিরে যাইতে হইতেছে। কি যেন এক ছাই কাজ জুটিয়াছে—বাড়িতে একদণ্ড থাকিবার উপায় নাই। এ রকম চাকরি করার চেয়ে অনাহারে থাকাও বরং ঢের ভাল। আজ এখানে, কাল সেখানে, একদিনও কি সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার জো আছে! যেন চরকির মত বেড়াইতেছে। একটা মানুষ কতই বা ঘুরিতে পারে, সকল জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে। হাজার হউক, মানুষ তো, কল তো আর নয়। উপরওয়ালা সাহেবদের জ্ঞান-গম্যি দয়া-মায়া বলিয়া কি কিছুই নাই। উনি না হয় ভালমানুষ লোক, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না, মুখ বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যান, তাই বলিয়া তাঁহারই উপর সব কাজের ভার চাপাইতে হইবে? আক্কেলকে বলিহারি যাই। ইত্যাকার নানারূপ চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি হাতের লেখা লিখিতেছিল। যদিও চিনু এখনও পর্যন্ত স্বীকার করিতেছে না, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে হাসির হাতের লেখা সত্যই উন্নতি লাভ করিয়াছে। খানিকটা লিখিয়া হাসি সোজা হইয়া বসিল, খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাত দিয়া সেটা ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর খাতাখানাকে একটু দূরে সরাইয়া নানাভাবে নিজের লেখাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই হাতের লেখায় স্বামীকে চিঠি লিখিলে তাহা কি খুব হাস্যকর হইবে? উনি হাসিবেন? কক্‌খনও না। বরং খুশিই হইবেন। আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। কালই একখানা চিঠি লিখিতে হইবে। খুব লুকাইয়া কিন্তু। ঠাকুরপো যেন না জানিতে পারে। ঠাকুরপো জানিতে পারিলে কিন্তু লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। জ্বালাইয়া মারিবে। এমনই তো ফাজিলের চূড়ামণি। চিঠিটা লিখিয়া ঝিয়ের মারফৎ রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলিয়া যাইবে।

নীচে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। এমন সময় কে আসিল?

বউদি, কপাট খোল।

চিন্ময়ের গলার স্বর। ঠাকুরপো আজ এত সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিল কেন? হাসি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, মাত্র আড়াইটা বাজিয়াছে। এত সকাল সকাল আসিবার মানে কি? অকারণ ভয়ে হাসির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। খারাপ খবর-টবর পায় নাই তো? নীচে পুনরায় কড়া নাড়িয়া চিন্ময় ডাকিল, বউদি!

হাসি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

কপাট খুলিতেই চিন্ময় বলিল, ঘুমুচ্ছিলে তো?

আহা, ঘুমুব কেন, লিখছিলাম। তুমি এখন এলে যে?

ক্লাস হ'ল না, প্রফেসরের অসুখ করেছে।

চিন্ময় উপরে চলিয়া গেল। কপাট বন্ধ করিয়া হাসিও উপরে আসিল। হাসির হাতের লেখা দেখিয়া চিন্ময় বলিল, সুন্দর হচ্ছে তো লেখা তোমার বউদি!

যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না।

হাসি হাতের লেখার খাতাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঠাট্টা নয়, সত্যি, বেশ হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি ডিক্‌টেশন লিখতে পার?

ডিক্‌টেশন কি আবার?

আমি বলব, তুমি শুনে শুনে লিখবে।

তা আমি পারি বোধ হয়।

ঘোড়ার ডিম পার।

নিশ্চয় পারি।

এই নাও কাগজ, লেখ।

ভুল হ'লে ঠাট্টা করতে পারবে না কিন্তু, ব'লে দিচ্ছি।

না না, ঠাট্টা করব কেন? লেখই না আগে. দেখি।

হাসি কাগজ কলম লইয়া বসিল।

চিন্ময় বলিতে লাগিল—

সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তুমি নটার সময় গোলদীঘির পূর্বদিকের একটা গেটে থাকিও। ইতি—ক খ গ ঘ

লেখা হইয়া গেলে চিন্ময় বলিল, কই, দেখি! বাঃ, চমৎকার হয়েছে! থাক্ আমার কাছে এটা।

কাগজখানা সে পকেটে পুরিয়া ফেলিল।

হাসি প্রশ্ন করিল, ওর মানে কি?

মানে আবার কি, যা মনে এল তাই বললাম।

চিন্ময় একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, অমন ক'রে চেয়ে আছ যে? এ কাগজটা এখন থাক্ আমার কাছে। এক মাস পরে আবার তোমাকে দিয়ে লেখাব খানিকটা, তারপর দুটো মিলিয়ে দেখব, উন্নতি হয়েছে কি না! —এই বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

এসেই যাচ্ছ কোথায় আবার?

মাঠে। খুব ভাল ম্যাচ আছে একটা, দেখে আসি।

খিদে পায় নি? খাবে না কিছু?

না।

চিন্ময় বাহির হইয়া গেল।

হাসি পুনরায় লিখিতে বসিল।

১৬

যেমন করিয়া হউক রোজগার করিতে হইবে। উপার্জন করিতে না পারিলে মানুষের কোন মূল্যই নাই। টাকা দিয়া প্রেম কিনিতে যাইবার প্রয়াস হাস্তকর সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্রের প্রেম করিতে যাইবার প্রয়াস অধিকতর হাস্তকর। যে নিঃস্ব, তাহার এই মানসিক বিলাসের অধিকার নাই। তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য যতই না কেন প্রচুর থাকুক, বাহিরের ঐশ্বর্য না থাকিলে তাহা খনির তিমিরগর্ভে রত্নরাজির মত চিরকালই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবে।

অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই বাহিরের ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। খনিকে খনন না করিলে মণির সন্ধান মিলিবে কিরূপে? মণি আবিষ্কার করিবার পর খনিত্র অনাবশ্যক, কিন্তু আবিষ্কারের পূর্বে খনিত্র না হইলে চলে না। খনিত্র একটা চাইই। কিছু টাকা না থাকিলে কিছুই করা যায় না। টাকাটা যে অতি তুচ্ছ জিনিস, তাহাও টাকা না থাকিলে প্রমাণ করা যায় না। অর্থ থাকিলে তবেই তাহা ত্যাগ করিয়া ত্যাগের মহত্ত্ব প্রকট করা সম্ভব, কপর্দকহীন দরিদ্রের মুখে ত্যাগের মহিমার কথা মানায় না। অর্থের অপেক্ষা প্রেম বড়, এ কথার মর্ম মুক্তোকে বুঝাইতে হইলে প্রথমেই মুক্তোকে পাওয়া দরকার এবং সেজন্য টাকার প্রয়োজন। মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলে তাহার মনে নিজেকে শঙ্কর নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে, এ বিশ্বাস নিজের উপর তাহার আছে। কিন্তু মুক্তোকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়াই যে দুরূহ! অত টাকা কোথায় পাইবে সে? অবিলম্বে উপার্জন করা দরকার, কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব? এই কলিকাতা শহরে কে তাহাকে চেনে? চিনিলেও বা কত টাকার চাকরি সে পাইতে পারে? বড় জোর মাসে পঞ্চাশ টাকার। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অল্প টাকায় মুক্তোকে তো পাওয়া যাইবে না। কেহ কিছু টাকা ধার দেয় না? মাসে মাসে তাহাকে শোধ করিয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু কে-ই বা ধার দিবে? সহসা শঙ্করের শৈলর কথা মনে পড়িল। সে বড়লোকের পত্নী। তাহার হাতে কিছু টাকা থাকিতে পারে, তাহার নিকট হইতে কোন ছুতায় ধার করিয়া আনাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। তাহার পরে ধীরে ধীরে টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিলেই চলিবে। একটা চাকরি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রফেসর গুপ্ত চেষ্টা করিলে একটা টুইশনি হয়তো তাহাকে যোগাড় করিয়া দিতে পারেন।

রবিবারের দুপুর। শঙ্কর বিছানায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল, উঠিয়া বসিল। শৈলর সহিত আজই দেখা করিতে হইবে। প্রফেসর গুপ্ত চেষ্টা

করিলে একটা টুইশনিও হয়তো তাহাকে যোগাড় করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার সহিতও দেখা করা দরকার। শঙ্কর তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শৈল একদিন যাইতেও বলিয়াছিল তাহাকে। এখন হয়তো সে একা আছে।

রাস্তায় বাহির হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। শঙ্কর তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তিনি কিন্তু শঙ্করকে চিনিয়াছিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, চিনিতে পারছেন ?

চিনিতে না পারিলেও সব সময় সেটা বলা যায় না। শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাশবাবুই পুনরায় বলিলেন, চেনবার কথা অবশ্য নয়, একটিবার মাত্র তো দেখা। প্রফেসর মিত্রের বাড়িতে টি-পার্টিতে— হয়েও গেল অনেক দিন।

শঙ্করের মনে পড়িল। সোনাদিদি ইঁহাকে শঙ্করের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাও মনে পড়িল, সোনাদিদি ইঁহার নাম দিয়াছিলেন—অগতির গতি। ভদ্রলোক নাকি পরোপকারী। শঙ্কর আর একবার প্রকাশবাবুর দিকে ভাল করিয়া চাহিল। খদ্দরের মোটা কোট ও মোটা চাদর গায়ে, কয়েক দিনের না-কামানো গোঁফ-দাড়ি মুখে, চক্ষুতে সরল দৃষ্টি। প্রকাশবাবু ঠিক তেমনই আছেন।

প্রকাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, আপনার কবিতাটা পড়লাম কাগজে, ভারি সুন্দর লাগল। আমাদের একটা কাগজ বার হচ্ছে, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।

আচ্ছা।

সেই হস্টেলেই থাকেন তো এখন ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, যাব একদিন। এখন চলি, নমস্কার।

নমস্কার।

প্রকাশবাবু চলিয়া গেলেন। শঙ্কর পুনরায় পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর অন্যমনস্কভাবে হাঁটিবার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ সে কি করিতেছে! শৈলর কাছে হাত পাতিয়া টাকা চাহিবে! শৈলর টাকা লইয়া সে—। না, তাহা অসম্ভব। তাহা সে কিছুতেই পারিবে না।

শঙ্কর ঘুরিয়া অন্যপথ ধরিল। একেবারে বিপরীত দিকে চলিতে শুরু করিল। দ্রুতবেগেই চলিতে লাগিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই। কেবল তাহার মনে হইতেছে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে হইবে, অবিলম্বে একটা কিছু করিয়া ফেলিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য, টাকাটাই শেষে এত বড় হইয়া দাঁড়াইল! মুক্তো তাহাকে চায় না—টাকা চায়! আশ্চর্য!

কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মুক্তো আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি, হঠাৎ আপনি যে এ সময়ে?

এলাম।

মুক্তো একদৃষ্টে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, বসুন। আসছি এখুনি।

শঙ্করকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। অবকাশ দিলেও যে শঙ্কর বিশেষ কিছু বলিতে পারিত, তাহা নয়। বলিবার মত কোন বক্তব্য তাহার ওষ্ঠাগ্রে ছিল না। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ভাবিতে লাগিল, মুক্তো ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কি বলিবে; বলিবার তো কিছু নাই। সত্যই কি কিছুই নাই? সত্যই কি মুক্তো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না? মুক্তোর মুখ দেখিয়া, কথাবার্তা শুনিয়া তাহা তো মনে হয় না!

আপনি এখানে হামেসা কি করতে আসেন মোসায়, বলেন তো?

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, লুঙ্গি-পরা গুণ্ডা-গোছের একটা লোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ঘাড়ে একদম চুল নাই, সামনে ঘোড়ার মত চুল, মাংসল মুখে নিষ্ঠুর এক জোড়া চোখ, অধরোষ্ঠের নীচে এক গোছা মিশকালো ক্ষুর, দাড়ি নাই, গোঁফ আছে—কিন্তু পুরাপুরি নাই, মাঝখানে খানিকটা কামাইয়া ফেলাতে মাত্র ঠোঁটের দুই পাশে খানিকটা করিয়া ঝুলিতেছে।

শঙ্কর সবিস্ময়ে লোকটার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মোতলবখানা কি মোসায়ের?

শঙ্কর নির্বাক।

জোবাব দিচ্ছেন না যে বড়?

তোমাকে জবাব দেব কেন, তুমি কে?

আমি তোমার বাপ। সালা হারামিকা বাচ্চা, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

খবরদার।

শঙ্কর হঠাৎ ঘুষি পাকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই মুক্তো ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

এ কি কাণ্ড! বাঘা, এসব কি হচ্ছে?

বাঘা বলিল, বাঃ, তুমিই তো বিবিজান আসতে বললে হামাকে। আভি বলছো, এসব কি হচ্ছে? গরদনিয়া না দিলে কি এ হারামির বাচ্চা নিকল্বে?

আচ্ছা, যা তুই।

বিনা বাক্যব্যয়ে বাঘা বাহির হইয়া গেল। যেন পোষা কুকুর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, লোকটা কে?

ও বাঘা। আমাদের আপনার লোক।

আপনার লোক মানে?

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, আপনার লোক মানে কি, তা জানেন না? যারা বিপদে আপদে রক্ষে করে, তারাই আপনার লোক। ওরা ছাড়া আমাদের আপনার লোক আর কে আছে, বলুন?

শঙ্কর বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিপদে আপদে রক্ষা করে!

অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, চা আনতে দিয়েছি।

শঙ্কর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্করবাবু, একটি কথা শুনে যান, ছুটি পায়ে পড়ি আপনার—শুনুন—শুনে যান—

শঙ্কর আর ফিরিয়া চাহিল না। যতক্ষণ দেখা গেল, মুক্তো শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল; কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না। কতটুকুই বা গলি, শঙ্কর দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গেল। মুক্তো তবু সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুণ্যলেশহীন অন্ধকার পতিতা-জীবনে একটিমাত্র পুণ্য-প্রেরণার শিখা জ্বলিয়াছিল। সেই শিখার ইন্ধন যোগাইতে গিয়াই সে নিঃস্ব হইয়া গেল। শঙ্করের মত ছেলেকে সে নষ্ট করিতে চাহে নাই। যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিল, সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যেমন করিয়া হউক, পঙ্কিলতা হইতে ইহাকে সে রক্ষা করিবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু হার মানে নাই। শঙ্করকে পঙ্ককুণ্ড হইতে সত্যই রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু এখন তাহার সমস্ত নারী-হৃদয় উন্মথিত করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল, তাহা স্বস্তির নিশ্বাস নহে। তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিতেছিল—তুমি এ কি করিলে, এ কি করিলে—ও যে চলিয়া গেল! মুক্তো বুঝিয়াছিল, শঙ্কর আর আসিবে না, শূন্য গলিটার পানে চাহিয়া তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া এমন একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, যাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, ব্লাইণ্ড্ লেন, বাহির হইবার পথ নাই। ফিরিতে হইল। কিছুদূর আসিবার পর দেখিতে পাইল, একটা বাড়ির দরজা খুলিয়া একটি মেয়ে বাহির হইয়া সামনের দরজার কড়া নাড়িতেছে। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

এই গলি থেকে বেরুবার রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পারো? আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

মেয়েটি বলিল, আর একটু এগিয়ে ডান দিকে গেলেই রাস্তা পাবেন।

শঙ্কর আগাইয়া গেল, আগাইয়া গিয়া সত্যই দেখিল, ডান দিকে বাহির হইবার পথ রহিয়াছে। আরও খানিকটা গিয়া বউবাজারে পড়িল। সামনেই একটা ট্রাম পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। একটু পরেই কিন্তু নামিয়া যাইতে হইল। সঙ্গে পয়সা ছিল না এবং সে কথা মনেও ছিল না। শঙ্কর আবার হাঁটিতে লাগিল। গলির সেই মেয়েটির মুখখানি মাঝে মাঝে মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ভারি সুন্দর স্নিগ্ধ মুখখানি! মুক্তোর মুখখানিও মনে পড়িল। পড়ুক, কিন্তু মুক্তোর কাছে সে আর যাইবে না। যাইবার আর উপায়ও নাই। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে যবনিকাপতন হইয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। একটা অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্ন হইতে সে সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া শঙ্করের চোখে পড়িল, একটা পাগলা ডাস্টবিন হইতে এঁটো ভাত তুলিয়া খাইতেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই। শঙ্করের মনে পড়িল, এই লোকটাই কিছুদিন আগে সারকুলার রোডে মাথায় কাগজের টুপি পরিয়া সকলকে নির্বিকার চিত্তে সেলাম করিয়া বেড়াইতেছিল। এখনও নির্বিকার চিত্তে ডাস্টবিন হইতে ভাত তুলিয়া খাইতেছে। ভন্টু অথবা বক্সি মহাশয় দেখিলে মোস্তাককে চিনিতে পারিত।

শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে হস্টেলের দিকেই ফিরিতে লাগিল। মুক্তোর কাছে আর যাইবে না, ইহা ঠিক করিবার পর হইতে শঙ্করের মন যেন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন কারাবাসের পর যেন সহসা মুক্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার নামে একটা জরুরী টেলিগ্রাম আসিয়াছে—বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিতেছেন।

অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিবার একটা অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

যদিও সে মনে মনে এরূপ কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। আসিয়াই যে দুই জন কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। কিছুকাল পূর্বে যখন সে বাবাকে চিঠি লিখিয়াছিল যে তাহার এখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, তখন তাহাই তাহার সত্য মনোভাব ছিল। কিন্তু এখন তাহার আর সে মনোভাব নেই। দুই দিনে সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত দেহে মনে যে ক্ষুধা জাগিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। মুক্তোকে সে পাইবে না, পাইতে পারে না এবং এখন পাইতে চাহেও না। তাহার পঙ্কিল স্পর্শ হইতে সে যে মানে মানে দূরে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে, এজন্য সে আনন্দিত। পঙ্কিল স্পর্শ! এখন মুক্তোর স্পর্শকে পঙ্কিল স্পর্শ মনে হইতেছে।

বাড়িতে আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছেন। পুরাতন ভৃত্য ব্রজ সর্বাগ্রে চুপিচুপি সংবাদটি দিল—ইঁহারা তাহার বিবাহের সম্বন্ধে পাকা কথা কহিতে আসিয়াছেন। সাড়া পাইয়া মা বাহির হইয়া আসিলেন। মায়ের চেহারা দেখিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেল। মা এত রোগা হইয়া গিয়াছেন! তাঁহার অসুস্থ শরীরের রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, মুখের দিকে তাকানো যায় না। শুষ্ক শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। চোখ-মুখের দীপ্তি নাই, কেমন যেন অসহায় অর্থহীন ভাবে শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না। শঙ্কর প্রণাম করিল। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি আশীর্বাদ করিলেন। মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, আয়, ভেতরে আয়।

শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। শঙ্করকে বিছানায় বসাইয়া হাত দিয়া চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মৃদু হা[illegible]ল, একবারও মাকে মনে পড়ে না?

শঙ্কর এতদিন যে [illegible]রিতেছিল, সে অন্য জগৎ। অনেকদিন

পরে সহসা মায়ের কাছে আসিয়া সে যেন নিজেকে ঠিক স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। কেমন যেন খাপ খাইতেছিল না। মায়ের কথা শুনিয়া সে মনে মনে লজ্জিত হইল। মুখে বলিল, কলেজের ছুটি ছিল না—

মা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হাত-মুখ ধো, খাবার আনি।

বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্করের মনে সহসা সেকালের মায়ের মুখখানা ফুটিয়া উঠিল—যখন মা টকটকে লালপাড় শাড়ি পরিতেন, যখন তাঁহার মুখখানি মহিমায় প্রদীপ্ত ছিল। পরক্ষণেই পাগলিনীর ছবিটাও মনে পড়িল। জানালার গরাদের সঙ্গে হাত বাঁধা, অসংলগ্ন আর্ত চীৎকার! এখন আবার এ কি চেহারা—সশঙ্কিত, অসমর্থ, ক্লান্ত—সমস্ত জীবনশক্তিকে কে যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

অম্বিকাবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

তুমি চা-টা খেয়ে বাইরে এস একবার, ওঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন একটু।

ওঁরা কারা?

শিরীষবাবু আর মুকুজ্জেমশাই—শিরীষবাবুর বন্ধু। শিরীষবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

যদিও শঙ্করের মত বদলাইয়াছিল, তথাপি সে বলিল, আমি তো বলেছিলাম—

জানি, চিঠি পেয়েছি তোমার। কিন্তু তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হ'ল না, আই অ্যাম সরি। চা-টা খেয়ে বাইরে এস।

আমার মতের কি কোন দাম নেই বলতে চান?

তোমার নিজের দামই যখন এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত, তখন তোমার মতের দাম সুনিশ্চিত হবে কি ক'রে?

তার মানে?

এটা কি সত্যি কথা নয় যে, আমার নামেই তুমি সমাজে এখনও পর্যন্ত বিকোচ্ছ? সুতরাং তোমার সম্বন্ধে আমার অভিরুচি এবং অভিমতই মানতে হবে তোমাকে। তোমার স্বতন্ত্র মত তখনই সহ্য করব, যখন স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। যতক্ষণ তা না করতে পারছ, ততক্ষণ আমার কথা শুনেই চলতে হবে তোমাকে।

শঙ্করের মাথার ভিতর যেন দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কে যেন সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিল। ইচ্ছা হইল, তখনই উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যায়; কিন্তু সে পারিল না। কিছুই পারিল না। একটা কথা পর্যন্ত বলিতে পারিল না। বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অম্বিকাবাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, চা-টা খেয়ে এস বাইরে—ডোন্‌ট বি এ ফুল।

শঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মানসপটে মুক্তোর মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিল, যেন শুনিতে পাইল, মুক্তো বলিতেছে—এ কটা টাকায় কি হবে, এই নিন আপনার টাকা, গরিবের ছেলের এ সব ঘোড়ারোগ কেন বাপু!

টাকা, টাকা, টাকা! টাকা না থাকিলে পৃথিবীতে কেহ সম্মান করে না, এমন কি পিতাও না। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উঠিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না, তাহার অন্তরবাসী আত্মসম্মানহীন কাঙালটা বিবাহ করিবার লোভে এতবড় অপমান সহ্য করিয়াও উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

পাশের ঘরে কথাবার্তা চলিতেছে। শঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

শিরীষবাবু মিনতিসহকারে বলিতেছিলেন, দেখুন, আমি অতি দরিদ্র, অত টাকা আমি দিতে পারব না। একটু বিবেচনা করতে হবে।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, বিবেচনা ক'রেই বলছি। আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু বেশি নয়।

আমার পক্ষে বেশি। আপনি দয়া না করলে—

দেখুন, যারা কথায় কথায় দয়া প্রার্থনা করে, সেই সব আত্মসম্মানহীন লোকের ওপর আমার কেমন যেন শ্রদ্ধা ক'মে যায়। যখন পড়তাম, তখন

করালীচরণ ব'লে একটি ছেলে আমাদের মেসে থাকত। তার অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তার আত্মসম্মানের জন্যেই তাকে আমরা সবাই খাতির করতাম। আমাকে 'দাদা, দাদা' বলত, পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল ; কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতাম তার ওই আত্মসম্মানবোধের জন্যে। সেদিন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। সে জ্যোতিষচর্চা করছে শুনে তার কাছে আমার এক আত্মীয়ের কুষ্ঠি নিয়ে গেলাম দেখাতে। সে প্রথমেই বললে, অম্বিকদা, দশ টাকা দক্ষিণা লাগবে কিন্তু। আমি তার মুখের দিকে চাইতেই সে বললে, দশ টাকা আপনার কাছে না নিলেও আমার চ'লে যাবে, কিন্তু আপনি শুধু শুধু আত্মসম্মানটা খোয়াবেন কেন ? আমাদের দেশের লোক কিছুতে এ সামান্য কথাটা মনে রাখে না। তারা সর্বদাই সকলের কাছে গলবস্ত্র হয়ে কৃপাভিক্ষা করছে। আশা করি, আপনি তাদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।

শিরীষবাবু এই তীক্ষ্ণ বক্তৃতাটি শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। বলিলেন, সত্যি বড় দরিদ্র আমি।

মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে বসিয়া ছিলেন ; বলিলেন, আচ্ছা, টাকার যোগাড় করা যাবে। উনি যা বলছেন তা ঠিকই।

শিরীষবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অম্বিকাবাবু বলিলেন, আড়াই হাজার টাকা এমন কিছু তো বেশি নয়—

শঙ্কর আর সহ্য করিতে পারিল না, দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বলিল, আমি এক পয়সা চাই না। আপনারা যদি আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, বিনাপণেই আমি বিয়ে ক'রে আসব। মেয়েও দেখতে চাই না আমি।

সকলেই অবাক হইয়া গেলেন।

অম্বিকাবাবু শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া সিগারের ছাইটা ধীরে ধীরে ঝাড়িলেন। তাহার পর শিরীষবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা হ'লে তো মামলা মিটেই গেল। সংসার-সমুদ্রে বিনা নৌকোতে পাড়ি দেবার সাহস বাবাজীবনের আছে দেখছি। আপনাদেরও যদি ওর দুঃসাহসের ওপর ভরসা

থাকে, দিন ওর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে—আই হ্যাভ নো অবজেকশন। আমি ওদের সুবিধের জন্যই নৌকার চেষ্টায় ছিলাম।

চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি সিগারে একটি মৃদু টান দিলেন। মুকুজ্জেমশাই একদৃষ্টে শঙ্করের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না, বাহির হইয়া গেল।

১৮

অল্পদিনের মধ্যেই শঙ্করের বিবাহ হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, অম্বিকাবাবু বিবাহে যোগদান করেন নাই। শঙ্কর বন্ধুবান্ধব কাহাকেও, এমন কি ভন্টুকেও, খবর দেয় নাই। শিরীষবাবু অমিয়াকে গহনাপত্র ছাড়া নগদ এক হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, শঙ্কর সে টাকা গ্রহণ করে নাই। সত্য সত্যই বিনাপণে সে অমিয়াকে বিবাহ করিল। শুভদৃষ্টির সময় শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, মেয়েটি তো অচেনা নয়, কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছে! হঠাৎ মনে পড়িল, কিছুদিন আগে একটা ব্লাইণ্ড্ লেনে ঢুকিয়া সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই মেয়েটিই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল।

অমিয়াও সবিস্ময়ে দেখিল যে, একাগ্রমনে শিবপূজা করা সত্ত্বেও ক্যালেণ্ডারের শিবের চেয়ে তাহার স্বামী ঢের বেশি সুন্দর হইয়াছে। শান্তি, বিনু, কমলি, টগর, এমন কি রেণুদির বরের চেয়েও তাহার বর দেখিতে ভাল।

কেমন চমৎকার চোখ দুইটি!

১৯

শঙ্কর হস্টেলে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, তাহার জীবনের এই প্রধান ঘটনাটি কত সহজে ঘটিয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে সে স্বপ্নেও ভাবে নাই

যে, সে বিবাহ করিবে। সহসা সে আবিষ্কার করিল যে, তাহার জীবনের গতিকে যতবার সে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবারই তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর সে ঠিক করিয়াছিল, অবিবাহিত থাকিয়া আজীবন দেশসেবা করিবে। কংগ্রেসে ভলাণ্টিয়ারি করিয়া, বন্যা-প্রপীড়িতদের জন্য চাঁদা আদায় করিয়া, দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফেরি করিয়া এবং ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করিয়া অদ্ভুত একটা উন্মাদনার মধ্যে কিছুকাল তাহার কাটিয়াছিল। এ উন্মাদনা কিন্তু বেশি দিন রহিল না। আই.এস-সি. এবং বি.এস-সি. পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞানের নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল। দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, বিজ্ঞানের সেবা করিলেই প্রকৃত দেশসেবা করা হইবে। অবৈজ্ঞানিক রীতিতে দেশসেবা অর্থহীন। এ যুগে চরকা চালাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-চেষ্টাই সমীচীন। সুতরাং ঠিক করিয়াছিল, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চাই তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু এসব মফস্বলীয় কল্পনা কলিকাতায় আসিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া শঙ্কর নিজেকে যেন পুনরায় আবিষ্কার করিল। দেখিল, তাহার মন অনিবার্য টানে যে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা বিজ্ঞান নয়—সাহিত্য। আরও আবিষ্কার করিল যে, নারী-সঙ্গ-বর্জিত জীবন আর যেই যাপন করিতে পারুক, সে পারিবে না। তাহার একজন সঙ্গিনী চাই। তাহার এই অন্তর্নিহিত কামনার টানে মিষ্টিদিদি, রিনি, মুক্তো আকস্মিকভাবে আসিল ও চলিয়া গেল। অমিয়ার মুখখানি তাহার মনে পড়িল। কত ছেলেমানুষ এবং কত লাজুক! ফুলশয্যার রাত্রে লজ্জায় চোখই খুলিল না। কোথায় ছিল এই অমিয়া? কোন্ অজ্ঞাতলোক হইতে সহসা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার জীবনে এমন কায়েমী আসন দখল করিয়া বসিল?

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চিঠি দিয়া গেল। বাবার চিঠি। শঙ্কর এইরূপই কিছু একটা প্রত্যাশা করিতেছিল, তবু সে পত্রখানি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রখানি এই—

কল্যাণবরেষু,

বিবাহ-ব্যাপারে তোমার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। অপরের টাকা না লইয়া স্বাবলম্বী হইবার সাহস তোমার আছে, ইহার প্রমাণ তুমি দিয়াছ; শক্তিও যে আছে, সে প্রমাণও আশা করি দিতে পারিবে। সুতরাং আগামী মাস হইতে তোমার খরচ দেওয়া আমি বন্ধ করিলাম। যে সমর্থ, তাহার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে অসমর্থ অসহায় লোক অসংখ্য। নিজেদের আত্মীয়—তোমার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ করিয়াছে। যে টাকাটা তোমাকে দিতাম, তাহা তাহাকে দিলে সে বেচারা বোধ হয় এম.এ.-টা পাস করিতে পারিবে। টাকাটা তাহাকেই দিব স্থির করিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে তোমার স্পর্ধার অনুরূপ শক্তি ও আত্মসম্মান দান করুন। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়

তৃতীয় অধ্যায়

১

একটি সংকীর্ণ গলি-পথে বাইকটি ঠেলিয়া ভন্‌টু চলিয়াছিল, বাইকের পিছনের চাকাটায় গোলমাল হইয়াছে, হাওয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র সারাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পকেট শূন্য। একেবারে শূন্য নয়, একটি অর্ধভুক্ত কাঁচা পেয়ারা আছে। সকালে আপিস যাইবার মুখে মৃন্ময়ের বাসায় সে কিছু টাকার চেষ্টায় গিয়াছিল। মৃন্ময় চিন্ময় কেহই বাড়িতে ছিল না, ছিল হাসি। পেয়ারা কিনিয়া সে গোয়াভা জেলি প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছিল। হাসির নিকট হইতে টাকা চাওয়া যায় না, কিন্তু পেয়ারা চাওয়া যায়। গোটা-দুই ডাঁশা পেয়ারা সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভাগ্যিস করিয়াছিল, তাই আপিসের পর কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছে। এখন চলিয়াছে নিবারণবাবুর নিকট, ধারের চেষ্টায়। অবিলম্বে কিছু টাকার প্রয়োজন। এক-আধ টাকা নয়, সাড়ে পাঁচ শত টাকা। করালীচরণ দ্রাবিড় যাইবে বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে যেমন করিয়া হউক টাকাটা তাহাকে দিতেই হবে। কি কুক্ষণেই যে সে করালীচরণের টাকায় হাত দিয়াছিল! এ টাকা না পাইলেও তাহার সংসার নিশ্চয়ই চলিয়া যাইত। খুচখুচ করিয়া টাকাগুলি খরচ হইয়া গিয়াছে, এখন মহা মুশকিল! হঠাৎ সাড়ে পাঁচ শত টাকা যোগাড় করা কি সহজ? বউদিদির অলঙ্কারগুলিও নাই। দাদা তাহার কিয়দংশ পূর্বেই সাবাড় করিয়াছিলেন, তাঁহার বি.এস-সি. পরীক্ষার ফী জমা দিবার সময় রুলি-জোড়া গিয়াছিল, ফন্‌তির অসুখের সময় হারটা গিয়াছে। নিরাভরণা বউদিদি শাঁখা লোহা ও সিঁদুরের সহায়তায় সধবার ঠাট কোনরকমে বজায় রাখিয়াছেন। বিড্‌ডিকার এ বিষয়ে মুখে অবশ্য কখনও কিছু বলেন না, কিন্তু না বলিলেও

ভন্টু সব বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াই বা কি করিবে, গহনা গড়াইয়া দিবার সামর্থ্য তো তাহার নাই। বরং মনে হইতেছে, বউদিদির গহনাগুলি এ সময়ে থাকিলে কাজে লাগিত। তিন দিন হইতে সে করালীচরণকে এড়াইয়া চলিতেছে, টাকা না লইয়া তাহার সহিত দেখা করা অসম্ভব। শঙ্করের বহুদিন হইতে দেখা নাই। সেদিন হস্টেলে গিয়া সে যাহা শুনিল, তাহা অবিশ্বাস্য। শঙ্কর নাকি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে—হস্টেলের দারোয়ানটা বলিল। দারোয়ানের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ভন্টু নয়। সে আরও খোঁজ করিয়া জানিল, ভীমজালে পড়িয়া ছোকরা গা-ঢাকা দিয়াছে। অত লদ্‌কালদ্‌কি করিলে ভীমজালে পড়িবে না! ইদানীং সে যে বড় একটা ধরা-ছোঁয়া দিত না, তাহার কারণ এতদিনে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কয়েকদিন পূর্বে ওরিজিন্যাল অর্থাৎ দশরথের মুখেও সে অতিশয় চমকপ্রদ একটি সংবাদ শুনিয়াছে। আধুনিক ছোকরাদের গালাগালি প্রসঙ্গে তাহাদের হ্যাংলামির উদাহরণস্বরূপ ওরিজিন্যাল শঙ্কর নামক একটি যুবকের উল্লেখ করিলেন। সে নাকি লুকাইয়া ওরিজিন্যালের রক্ষিতার নিকট যাতায়াত করে। কলেজের দুই-একজন প্রাক্তন সহপাঠীর নিকটও ভন্টু শঙ্করের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়াছিল এবং সমস্ত শুনিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, 'চাম্ গ্যান্‌চস্' ভীমবেগে রসাতলের উদ্দেশ্যেই রানিং আপিস খুলিয়াছে। এখন যদি ছোকরার একবার নাগাল পাওয়া যাইত, বড় ভাল হইত। আর যাই হোক, রাস্‌কেলটার মাথা বড় সাফ—কাব্যিরোগেই উহাকে খাইয়াছে।

মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। মায়ের বিষয়টি বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই সাহায্যে তিনি নাকি কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিহিত কোন নির্জন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। ভন্টুর মনে হইল, বাবাজীর বিষয়টা হস্তগত করিয়া লইলে মন্দ হইত না। এ সময়ে অন্তত তাহা কাজে লাগিতে পারিত! বাবাজী তো দিতেই চাহিয়াছিলেন।

অন্ধকার গলি। গলির দুই পাশে ঘেঁষাঘেঁষি খোলার ঘর। কোন ঘরে কলহের, কোন ঘরে বেগুনভাজার, কোন ঘরে হারমোনিয়মের, কোন ঘরে শিশুর ক্রন্দন রোল উঠিয়াছে। ভন্টুর এসব দিকে লক্ষ্য নাই। বাইকটি ঠেলিতে ঠেলিতে নানা এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটি কথাই সে কেবল ভাবিতেছে, হঠাৎ এত টাকার কথা নিবারণবাবুর কাছে পাড়িবে কি করিয়া!

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী। বিচিত্র লীলায় বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্র বিধানে জীবনধারার বিচিত্র বিকাশ। এই বৈচিত্র্যকে আমরা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করি না বলিয়াই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিলে বিস্মিত হই। বস্তুত প্রকৃতির বিচিত্র লীলানিকেতনে প্রত্যাশিত বলিয়া কিছু নাই। কোন কিছুকে আমরা প্রত্যাশিত বলিয়া মনে করি আমাদের কল্পনার দৈন্যবশত। আমাদের আরও একটা অভ্যাস—আমরা নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যাশা করি, এবং নিজেদের রুচি, বুদ্ধি, সংস্কার ও সুবিধার প্রতিকূল কিছু ঘটিলেই তাহাকে 'অপ্রত্যাশিত' আখ্যা দিয়া বিস্মিত অথবা মর্মাহত হই; ভুলিয়া যাই যে, বৈচিত্র্যই পৃথিবীর প্রাণধর্ম। প্রাণধর্মের প্রেরণায় প্রত্যাশিত, ঈষৎ-প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত—সর্বপ্রকার ঘটনাই ঘটে। আমরা ইহা জানি, বিচারের ক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে এতদনুসারে চলি না। ব্যাবহারিক জীবনে আমরা আশা করি যে, আমাদের সংস্কার, সুবিধা এবং নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সব কিছু ঘটিবে। কিন্তু তাহা ঘটে না,—কাহারও জীবনে ঘটে না, নিবারণবাবুর জীবনেও ঘটিল না। নিজের মেয়েকে কেহ মন্দ ভাবে না, নিজের বন্ধুর চরিত্রে বিশ্বাস করাও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সুবিধাজনক স্বাভাবিক ধারণার আরামদায়ক আবেষ্টনীতে মন নিশ্চিন্ত থাকে। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় নানা বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়াও আমরা ঘুমাই। সুতরাং মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত রকমে চমকিত হইতে হয়। সকালে উঠিয়া দেখি, চোরে সিঁধ কাটিয়াছে অথবা ঘরে

আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিবারণবাবুর মুখে সমস্ত শুনিয়া ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া গেল। মাস্টার আসৃমিকে লইয়া সরিয়াছে।

২

ছোট স্টেশনটি এতক্ষণ নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত ছিল। রাত্রি বারোটার সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহা সজীব হইয়া উঠিল। একটা গাড়ি আসিবে। স্টেশনের বাহিরে গভীর অন্ধকার ঝিল্লীস্বরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। চারিদিকে কেবল মাঠ। একটি সঙ্কু রাস্তা স্টেশন হইতে মাঠের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্তী বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। স্টেশনের নিকট রেলের দুই-একটি কোয়ার্টার ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নাই। আশেপাশে কেবল দিগন্তব্যাপী প্রান্তর। অমাবস্যা, সূচীভেদ্য অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। ট্রেন আসিল, দুই মিনিট থামিল এবং চলিয়া গেল। ট্রেন হইতে জন-দুয়েক যাত্রী নামিলেন, চিন্ময়ও নামিল। নির্দেশমত এই স্টেশনেই তাহার নামিবার কথা। অন্য যাত্রীদের সহিত চিন্ময়ও স্টেশনের বাহিরে সরু রাস্তাটার উপর আসিয়া হাজির হইল। অন্য যাত্রীরা আপন আপন গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। চিন্ময়ও একা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি ছেলের আসিবার কথা, কিন্তু কই, কেহই তো আসে নাই! এই অন্ধকারে পথ চেনাও মুশকিল! চিন্ময় অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

আপনি কি জাফরানপুর যাবেন?—কোমল বালককণ্ঠে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করিল।

আপনি কে?

আমি আপনাকে নেবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

তাই নাকি! আচ্ছা, এদিকে এস।

অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি নিকটে সরিয়া আসিল।

আলোর কাছে চল, দেখি, তুমি কে!

স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়া স্টেশনের আলোকে চিন্ময় চিনিতে পারিল। কলিকাতায় তাহাদের দলপতি দূর হইতে একদিন এই বালকটিকেই চিনাইয়া দিয়াছিলেন।

চিন্ময় প্রশ্ন করিল, কতদিন পূর্বে তুমি কলকাতায় গিয়েছিলে?

ও-মাসের পঁচিশে।

তারিখটাও মিলিয়া গেল।

চল, তা হ'লে যাওয়া যাক।

আবার তাহারা মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক প্রশ্ন করিল, আপনার নাম কি?

বাইশ নম্বর।

চলুন।

তরুণকান্তি পনেরো-ষোল বছরের একটি কিশোর। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া চিন্ময় অন্ধকারে মাঠে নামিয়া পড়িল। সমস্ত সন্ধ্যাটা গুমোট করিয়া ছিল, এখন বেশ ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু চারিদিকে কি ভীষণ অন্ধকার! চিন্ময় সহসা লক্ষ্য করিল, ছেলেটি তাহার পাশে পাশে নয়, আগে আগে চলিয়াছে।

তুমি আগে আগে যাচ্ছ কেন?

আমি আগেই থাকি—আপনি আমার পিছু পিছু আসুন।

কেন বল তো?

বালক কোন উত্তর দিল না। সে কিন্তু চিন্ময়ের সহিত চলিতে পারিতেছিল না, চিন্ময় তাহাকে বারম্বার ধরিয়া ফেলিতেছিল। তখন সে ছুটিয়া আবার খানিকটা আগাইয়া যাইতেছিল। চিন্ময়কে সে কিছুতেই আগাইয়া যাইতে দি'ব না।

চিন্ময় হাসিয়া বলিল, অমন ছুটে ছুটে এগিয়ে যাবার দরকারটা কি? একসঙ্গে পাশাপাশি যাই চল না।

না, আমি এগিয়ে থাকব।

কেন ?

এমনই।

চিন্ময় যে কার্যে চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা মানা। এই কিশোর তাহাকে জাফরানপুর অবধি পৌঁছাইয়া দিবে। সেখান হইতে অন্য উপায়ে কর্মস্থলে পৌঁছিতে হইবে। উভয়ে নীরবে মাঠ পার হইতে লাগিল। উভয়েই বেশ দ্রুতপদে চলিয়াছে, তাহার সঙ্গী আগাইয়া থাকিবার জন্য প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে। চিন্ময় প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

অত ছুটে চলবার দরকার কি ?

আসুন না আপনি।

তুমি পাশাপাশি না চললে আমি যাব না।

আসুন না।

তুমি কেন এগিয়ে থাকতে চাও, না বললে আমি যাব না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া ছেলেটি অবশেষে বলিল, এ মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে। আমার টর্চ আনা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভুলে গেছি।

তাতে কি হয়েছে ?

আপনাকে যদি সাপে কামড়ে দেয় ? আমার উপর ভার আছে আপনাকে জাফরানপুরে নিরাপদে পৌঁছে দেবার। আপনি আসুন।

তোমাকে যদি সাপে কামড়ায় ?

আমার চেয়ে আপনার প্রাণের দাম ঢের বেশি। আসুন।

৩

শঙ্কর বিবাগী হইয়া যায় নাই।

পিতার পত্র পাইবার পরদিন সে হস্টেল ছাড়িয়া দিল, জিনিসপত্র ও বই বিক্রয় করিয়া খুচরা ধারগুলা শোধ করিয়া ফেলিল এবং উদভ্রান্তচিত্তে

অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিল। পকেটে সাড়ে বারো আনা পয়সা মাত্র সম্বল। বিরাট কলিকাতা নগরীতে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। শঙ্কর সহসা অনুভব করিল, কলিকাতায় ধনীর স্থান আছে, দরিদ্রের স্থান আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের স্থানাভাব। ধনীর প্রাসাদ আছে, দরিদ্রের ফুটপাথ আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তের—চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন ভদ্রতাজ্ঞানবিশিষ্ট মধ্যবিত্তেরই মুশকিল। এখানে বিনা পরিচয়ে অথবা বিনা পয়সায় ভদ্রভাবে কোন আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। শঙ্করের যাহারা পরিচিত, তাহারা এত বেশি পরিচিত যে, শঙ্কর অসঙ্কোচে তাহাদের নিকট যাইতে পারে না। কোন্ লজ্জায় সে শৈলর বাড়ি যাইবে! তাহাকে সে চিরকাল অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট যাইবে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে! এই একই কারণে ভন্টুর নিকট যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া ভন্টুদের অবস্থা সে ভাল করিয়াই জানে। তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার মত সঙ্গতি তাহাদের নাই। শিরীষবাবু বদলি হইয়া গিয়াছেন, থাকিলেও শঙ্কর এমন দীনবেশে শ্বশুরবাড়ি যাইতে পারিত না। প্রফেসর গুপ্তের শরণাপন্ন হইয়া অবিলম্বে একটা টুইশনির বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। প্রফেসর গুপ্ত কি অবিলম্বে একটা টুইশনির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন? যখন প্রয়োজন ছিল না, তখন একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাকে একটা টুইশনি তিনি যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। এখনও কি পারিবেন? শিয়ালদহের সামনে একটা মুসলমানী দোকানে ঢুকিয়া সস্তায় কিছু রুটি-মাংস কিনিয়া শঙ্কর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। স্টেশনের ঘড়িটাতে দেখিল, আড়াইটা বাজিয়াছে। রবিবার প্রফেসর গুপ্ত হয়তো বাড়িতেই আছেন। তাঁহার বাড়ির দিকেই শঙ্কর অগ্রসর হইল। কোনক্রমে দশ-পনেরো টাকার মত একটা টুইশনিও যদি জুটিয়া যায়! পথ চলিতে চলিতে মায়ের কথা তাহার মনে পড়িল। বাবা যে খরচ বন্ধ করিয়াছেন, মা কি তাহা জানেন? খুব সম্ভবত জানেন না। বাবা মায়ের দুর্বল মস্তিষ্ককে পারতপক্ষে বিচলিত করিতে চাহিবেন না। সে যে বিবাহ করিয়াছে, সে কথাও কি মা জানেন না? কিংবা

হয়তো সব জানেন, বাবার ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছেন না। জানুন আর নাই জানুন, শঙ্কর নিজে তাঁহাকে কখনও জানাইবে না। মাকে নিজের অবস্থার কথা জানানোর সরল অর্থ বক্রপথে পিতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে যাওয়া। তাহা সে মরিয়া গেলেও করিবে না। সহসা অমিয়ার কথা তাহার মনে হইল। সে শিরীষবাবুর সঙ্গেই তাঁহার নূতন কর্মস্থল দিনাজপুরে গিয়াছে। অমিয়ার শিশুর মত সরল মুখখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। নিতান্ত সরল! শঙ্করকে পাইয়া যেন বর্তিয়া গিয়াছে। এমন স্বামী যেন কাহারও নাই, হইতে পারে না। এতটা সরলতা কিন্তু শঙ্করের ভাল লাগে নাই। শঙ্করের পরিণত মনের ক্ষুধা কি ওই শিশুপ্রকৃতির অমিয়া মিটাইতে পারিবে? উহাকে স্নেহ করা চলে, উহার অযৌক্তিক সারল্য দেখিয়া কৌতুকান্বিত হওয়া চলে, কিন্তু উহার সহিত রোমান্টিক প্রেম করা চলে না। ওইটুকু মেয়ে, ভালবাসার কি বোঝে ও! শঙ্কর যেন নূতন রকম একটা দামী পুতুল এবং তাহারই একান্ত নিজস্ব—এই আনন্দেই অমিয়া বিভোর। শঙ্করের মনের নিগূঢ় আকুতির বিচিত্র পিপাসার কোন খবর রাখা উহার পক্ষে সম্ভবই নয়। ও যদি কুটিল হইত, অপাঙ্গের বিলোল কটাক্ষে মুগ্ধ করিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে ব্যাহত করিতে পারিত, তাহা হইলে শঙ্করের ভাল লাগিত। এ অতিশয় সরল, অত্যন্ত সহজ। বিনা প্রতিবাদে বাহুবন্ধে ধরা দেয়, বিনা প্রশ্নে সমস্ত কিছু বিশ্বাস করে, বিনা সঙ্কোচে কৃতজ্ঞ হয়। কোন জটিলতা নাই, মনকে উৎসুক করিয়া তোলে না।

প্রফেসর গুপ্তের বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। প্রফেসর গুপ্ত ও মিষ্টিদিদি দক্ষিণ দিকের নির্জন বারান্দায় বসিয়া চা পান করিতেছেন। বাড়িতে বালক ভৃত্যটি ছাড়া আর কেহ আছে বলিয়াও মনে হইল না।

শঙ্করকে দেখিয়া মিষ্টিদিদিই হাস্যমুখে সম্বর্ধনা করিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেক দিন পরে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে, বসুন।

নির্বিকারভাবে মিষ্টিদিদি কথাগুলি বলিলেন, শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

মুখখানা বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে যে! বসুন না।

শঙ্কর উপবেশন করিল।

প্রফেসর গুপ্ত বালক-ভৃত্যটিকে ডাকিয়া আর এক পেয়ালা চা ফরমাশ করিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কাব্য-আলোচনা হচ্ছিল। 'কিং লিয়ারে'র গনেরিল আর রেগানকে কেমন লাগে তোমার?

শঙ্করের 'কিং লিয়ার' পড়া ছিল না, তবু বলিল, ভালই লাগে।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, ভাল লাগে আপনার? আপনার রুচি বদলেছে তা হ'লে বলুন। আগে তো ঝাঁজওয়ালা জিনিস বরদাস্ত করতে পারতেন না আপনি।

প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, ওর রুচির খবর রাখেন নাকি আপনি?

সামান্য একটু পরিচয় নিয়েছিলুম একদিন। একদিন একটু ঝাঁজালো সস্ চাখিয়েছিলুম, খেতে পারলেন না। কম ঝাঁজালো আরও খাবার ছিল, সেগুলো পর্যন্ত খেতে পারলেন না, উঠে যেতে হ'ল ওঁকে।

তাই নাকি! আমার তো ধারণা ছিল, শঙ্কর খুব ঝালের ভক্ত।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল কি না তাহা সে নিজেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি হাসিমুখে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর, আছেন কেমন বলুন? অনেক দিন আপনার কোন খবর পাই নি। পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?

পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।

ওমা, সে কি! এটা আপনার এগ্‌জামিনের বছর না?

প্রফেসর গুপ্তের চক্ষু দুইটিও প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

কেন, হঠাৎ হ'ল কি?

বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন, তাঁর অমতে বিনাপণে বিয়ে করেছি ব'লে।

মিষ্টিদিদি মুখে একটা বিস্মিত সহানুভূতির ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ দুইটি হইতে একটা চাপা হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ তাঁর অমতে বিয়ে করতে গেলে কেন ?

একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের ওপর অনুকম্পা হ'ল।

মিষ্টিদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম, বুঝি আর কিছু।

শঙ্কর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া বলিয়া ফেলিল, আপনি ভাববেন বইকি।

এই কথায় মিষ্টিদিদি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গে শঙ্করের ব্যঙ্গোক্তি কোথায় ভাসিয়া গেল, তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারিল না। চায়ের পেয়ালার বাকি চাটুকু নিঃশেষ করিয়া মিষ্টিদিদি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, আমি এবার চলি তা হ'লে। আপনি একটা লোকের চেষ্টায় থাকবেন কিন্তু, আমরা আমাদের সমিতি থেকে আট আনা ক'রে দিতে পারব। এর চেয়ে বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই সমিতির। অত সস্তায় কোন ট্রেন্ড্ নার্স পাওয়া যাবে না মানি, ট্রেন্ড্ নার্সের দরকারও নেই, পাহারা দেবার মত একজন লোক পেলেই হ'ল। বেখোরে খাট থেকে প'ড়ে-ট'ড়ে না যান ভদ্রলোক। ওষুধ খাওয়ারও হাঙ্গামা নেই। ওষুধ দিচ্ছেন আমাদের প্রকাশবাবু, হোমিওপ্যাথি, পনরো দিন অন্তর এক ফোঁটা।—এই বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন।

প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, আচ্ছা, চেষ্টায় থাকব—অত সস্তায় কোন বিশ্বাসযোগ্য লোক পাওয়া শক্ত।

ওর চেয়ে বেশি দেবার ক্ষমতা আমাদের সমিতির নেই। অত দেবারও ক্ষমতা নেই, মিসেস স্যানিয়ালের বোন চুনচুনের স্বামী ব'লেই আমাদের ইণ্টারেস্ট্। নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কিছু টাকা যোগাড় করেছি আমরা।

টি. বি. ব'লে সন্দেহ করেছেন, সেইটেই হয়েছে আরও মুশকিল কিনা—ডাক্তাররা তাই বলেছে, আমরা কি করব বলুন?

একটু হাসিয়া মিষ্টিদিদি আবার বলিলেন, কি ক'রে চুন্‌চুন যে ওই রোগা কুচ্ছিত লোকটার লাভে পড়ল, তাই ভেবে অবাক লাগে আমার।

প্রফেসর গুপ্ত মিষ্টিদিদির মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার মুখে মৃদু একটা হাসিও ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদিও হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, মনে রাখবেন কথাটা। মিসেস স্যানিয়াল আমার ওপর ভার দিয়েছেন, আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না যেন। শঙ্করবাবুকেও বলুন না ব্যাপারটা খুলে, উনিও হয়তো কোন লোকের সন্ধান দিতে পারবেন। অনেক জায়গায় ঘোরেন তো, পুরুষমানুষ হ'লেও চলবে। তাহার পর হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, উঃ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে আমার। এবার চলি আমি।

মিষ্টিদিদি চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি?

মিসেস মিত্রের একজন বান্ধবীর বোন চুন্‌চুন কিছুদিন আগে যতীন হাজরা ব'লে একটি লোককে লুকিয়ে বিয়ে করে। যতীন হাজরার তিন কুলে কেউ নেই, প্রেসে না কোথায় একটা কাজ করত, কোন রকমে চ'লে যাচ্ছিল। এখন সেই যতীন হাজরার হয়েছে টি. বি.—নার্স করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। চুন্‌চুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল চুন্‌চুনকে কিছুতে সেখানে যেতে দেবে না। ওদের সমিতি থেকেই তাঁর চিকিৎসার খরচ চলছে, তাঁর থাকবার জন্যে একটা ঘরও ভাড়া ক'রে দিয়েছেন ওঁরা, এখন সেবা করবার একজন লোক চাই। রোজ আট আনা ক'রে পাবে সে। আছে এমন লোক তোমার সন্ধানে?

আমিই করতে পারি।

তুমি!

আপত্তি কি, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম একটা টুইশনির চেষ্টায়। যতদিন সেটা না জুটছে, ততদিন এই করা যাক।

সত্যি সত্যি তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দেবে নাকি? ব্যাপারটা কি খুলে বল তো?

ওই তো বললাম, বাবা খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন।

প্রফেসর গুপ্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, বেশ তো, টুইশনি ক'রেই পড়াশোনা কর। পরীক্ষাটা দিয়ে ফেল।

ডিগ্রী লাভ করার কোন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। বর্তমান যুগে টাকাটাই আসল, সময় নষ্ট না ক'রে টাকা রোজগারের চেষ্টাতেই লেগে যাওয়া উচিত।

কিন্তু টাকা রোজগারের পথে বাঙালীর ছেলের ডিগ্রীটাই আসল সম্বল। ওটা নিতান্ত তুচ্ছ করবার জিনিস নয়।

ডিগ্রী সম্বল ব'লেই বাঙালীর ছেলের এত দুর্দশা।

তা হ'লে কি তোমার মতেও লেখাপড়া করাটা অনর্থক?

যারা লেখাপড়ার জন্যেই লেখাপড়া করতে চায়, তারা তা করুক এবং সম্পূর্ণভাবে তার উপযুক্ত হোক। আমি ভেবে দেখেছি, আমার দ্বারা ও সম্ভব নয়।

তার মানে?

বিদ্যার্থী হবার মত মনের জোর নেই আমার। সকলে ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযুক্ত নয়।

তুমি যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ দেখছি।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না। বালক-ভৃত্যটি এক পেয়ালা চা দিয়া গেল। শঙ্কর নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

তুমি টুইশনি ক'রেই টাকা রোজগার করবে ঠিক করেছ? ব্যবসা হিসেবে ওটা তো খুব প্রশস্ত পথ নয়।

যতদিন অন্য কোন একটা উপার্জনের পথ না পাই, ততদিন টুইশনি ক'রেই চালাব। তা ছাড়া উপায় কি? আপনি আপাতত যা হোক কি একটা যোগাড় ক'রে দিন আমাকে।

একটি আই.এস-সি. ছেলেকে কোচ করতে পারবে?

পারব।

কত মাইনে চাও?

আপনি যা ঠিক ক'রে দেবেন।

গোটা চল্লিশ হ'লে চলবে?

চলবে।

দু বেলা পড়াতে হবে কিন্তু।

তাই পড়াব।

আচ্ছা, বলব তাঁদের তা হ'লে। একটি জুনিয়র প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর কথা বলেছেন, দরে বনছে না, সে ভদ্রলোক ষাট টাকা চান। তুমি চল্লিশ টাকায় রাজী তো?

হ্যাঁ। কবে থেকে পড়াতে হবে?

আসছে মাস থেকে।

ততদিন তা হ'লে এই টি.বি. রোগীটার সেবা করা যাক।

ওসবের মধ্যে আবার গিয়ে কি করবে? রোগটা ছোঁয়াচে এবং মারাত্মক।

তা হোক, তবু আমি যাব

আচ্ছা, পাগল তো! তোমার জীবনের মূল্য এখন অনেক বেশি। বিয়ে করেছ।

শঙ্কর উত্তরে শুধু একটু হাসিল

কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, তোমার সেই বান্ধবীটির খবর শুনেছ?

কোন্ বান্ধবীটির?

বেলা মল্লিক।

না, অনেকদিন কোন খবর জানি না।

সে এক বুড়ো সাহেবের সঙ্গে জুটেছে।

তার মানে ?

একদিন বেলা সিনেমার সেকেণ্ড্ শো থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার বাড়ির ঠিক সামনে একটা বুড়ো সাহেব অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে রয়েছে। চতুর্দিকে জনপ্রাণী কেউ নেই। বেলা জনার্দনকে ডেকে ধরাধরি ক'রে অজ্ঞান সায়েবকে ঘরে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, একজন ডাক্তার ডাকলে এবং সেবা-শুশ্রূষা ক'রে সায়েবকে চাঙ্গা ক'রে তুললে।

সায়েবটা নিশ্চয় মাতাল।

না, তার স্ট্রোক হয়েছিল। অর্ধেক শরীরে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে।

তারপর ?

সায়েবের জ্ঞান হবার পর জানা গেল, সায়েব খাঁটি বিলিতী সায়েব, এখানে একটা সায়েবী দোকানে বড় চাকরি করে, কিছুদিন পর রিটায়ার ক'রে দেশে ফেরার কথা, এমন সময় এই বিপদ।

বেলার বাসার সামনে এল কি ক'রে ?

সায়েব নাকি এক ট্যাক্সিতে ছিল, ট্যাক্সিতেই অজ্ঞান হয়ে যায়। যত দূর মনে হচ্ছে, ওই ট্যাক্সিওলাই বেগতিক দেখে ওই নির্জন গলিতে সায়েবকে নামিয়ে দিয়ে স'রে পড়েছে। অজ্ঞান সায়েবকে নিয়ে সে আর ঝামেলায় ঢুকতে চায় নি।

তারপর ? এ যে রীতিমত রোমান্টিক ব্যাপার !

Truth is stranger than fiction.

তারপর কি হ'ল ?

তারপর যোগাযোগও বেশ অদ্ভুত, সায়েবের তিন কুলে কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে একটি পিয়ানো। বেলাও নাকি মিস্টার বোসের বাড়িতে পিয়ানো বাজাতে শিখেছে।

শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, শৈলর পিয়ানোটা ও বাজাত শুনেছি।

ফলে বেলা এখন রোজ সন্ধ্যেবেলায় সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত সায়েবকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়। সায়েবের 'কার' এসে ওকে নিয়ে যায়, দিয়ে যায়।

মাইনে নিশ্চয় পান এর জন্যে ?

সেটা ঠিক জানি না আমি। তবে সায়েব জাত, কারও কাছে অমনই কিছু নেয় না। নিশ্চয়ই কিছু দিচ্ছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

প্রফেসর গুপ্তও বাতায়ন-পথে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিল, মানুতুরা কি এখানে নেই নাকি, কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ?

না, ওরা অপথ একটা বাড়িতে আছে। মানুতুর বিয়ে—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

প্রফেসর গুপ্ত কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মিসেস মিত্রকে আপনি কি একটা চিঠি দেবেন ? না, আমিই মুখে গিয়ে বলব ?

তুমি ওই যক্ষ্মারোগীর সেবা না ক'রে ছাড়বে না ?

না।

তবে আর চিঠি লেখার দরকার কি, নিজেই গিয়ে বল।

তবু একটা লিখে দিন।

স্মিতহাস্য করিয়া প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, তা হ'লে প্যাডখানা আর কলমটা নিয়ে এস ওই টেবিলটা থেকে।

শঙ্কর আনিয়া দিল।

প্রফেসর গুপ্ত লিখিলেন—

মিসেস মিত্র,

অন্য লোক খোঁজার দরকার নেই। শঙ্করই সেবা করতে রাজী হয়েছে। সস্তায় এত ভাল লোক পাওয়া যেত না কালকের এন্‌গেজ্‌মেন্টের কথা মনে আছে তো ? ইতি—

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রফেসর গুপ্ত আসন্ন এন্‌গেজ্‌মেণ্টটার কথা ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ইভার চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রায় দুই মাস হইল বেচারা চিঠি লিখিয়াছে। প্যাডখানা টানিয়া লইয়া তিনি ইভাকে চিঠি লিখিতে বসিলেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ একটা চিঠি লিখিয়া তখনই সেটা পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে 'কুমারসম্ভব'খানা লইয়া উল্টাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি এই শ্লোকটিতে আটকাইয়া গেল—

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং শুচিস্মিতা
হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যমা
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভা-
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥

—শুচিস্মিতা কৃশোদরী তপস্যারতা উমা গ্রীষ্মকালে অনন্যদৃষ্টিতে সূর্যের পানে চাহিয়া আছেন। তুষারশীতল হিমালয়ের কন্যা উমা, যে হিমালয়ে

ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ।
যদ্‌বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥

—সেই হিমালয়ের সুকুমারী কন্যা উমা শ্মশানবিলাসী সন্ন্যাসীর জন্য অগ্নিপরিবেষ্টিতা হইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

প্রফেসর গুপ্তের সহসা মনে হইল, এই দুরূহ তপশ্চরণ আজকাল আর কেহ করে না। শিবই আজকাল নানা উপহার লইয়া উমার পিছু পিছু ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

৪

অমিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রাজমহলের ভবেশবাবু ছাড়া পাইয়াছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের এবার নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা; কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। কোন একটা কিছু লইয়া ব্যাপৃত থাকা

না পারিলে তিনি কেমন যেন স্বস্তি পান না। একটা কিছু জুটিয়াও যায়। মুকুজ্জেমশাই হরেরামবাবুর নিকটে গিয়াছিলেন। মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে হরেরামবাবু পোস্ট-মাস্টারি করেন। নিতান্ত নিরীহ লোক, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। থাকিবার অবসরই নাই। সকাল হইতে শুরু করিয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্যন্ত আপিসের কাজকর্ম শেষ করিতেই কাটিয়া যায়। নিড়বিড়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অতিশয় ভালমানুষ। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু হরেরামবাবুকে বড় ভালবাসেন এবং বছরে অন্তত একবার আসিয়া হরেরামবাবুর কাছে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। এবারে আসিয়া কিন্তু কিছু অধিক দিন থাকিতে হইল। পাকেচক্রে অবস্থা একটু জটিল হইয়া উঠিল।

হরেরামবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোম্বল তাঁহাকে মুশকিলে ফেলিয়া দিয়াছে। ভোম্বলের বয়স দশ-এগারো বছর মাত্র। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঘ-বকরি খেলায় সে মুকুজ্জেমশাইকে বার বার তিন বার হারাইয়া দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়া হারিয়া গিয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই বাজি রাখিয়াছিলেন যে, ভোম্বল যদি তাঁহাকে তিন বার উপর্যুপরি হারাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ভোম্বল যাহা খাইতে চাহিবে মুকুজ্জেমশাই তাহাই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইবেন। বিজেতা ভোম্বল মাংস খাইতে চাহিয়াছে। মুরারিপুর যদি শহর হইত অথবা হরেরামবাবু যদি একটু কম নিষ্ঠাবান হইতেন, তাহা হইলে মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষে এই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকু পালন করা অসম্ভব হইত না। মুরারিপুরে কসাইয়ের দোকান নাই, হরেরামবাবু বৃথা-মাংস পছন্দ করেন না। মুকুজ্জেমশাই অনুরোধ করিলে হরেরামবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো রাজী হইতেন; কিন্তু কাহারও প্রিন্সিপ্‌লে আঘাত করা মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাববিরুদ্ধ। যে যাহা লইয়া আছে, থাকুক—ইহাই তাঁহার মত। সুতরাং হরেরামবাবুকে এ অনুরোধ তিনি করিলেন না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে তিনি যাহা করিলেন, তাহা প্রিন্সিপ্‌ল্‌-সঙ্গত হইলেও হরেরামবাবুর পক্ষে আরও সাংঘাতিক হইল।

হরেরামবাবুকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, হরেরাম, আসছে অমাবস্যাতে, এস, কালীপুজো করা যাক।

মনিঅর্ডার-রেজিস্ট্রি-ভি.পি.-ইন্‌সিওর-বিক্ষুব্ধ হরেরাম প্রথমে কথাটা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারিলেন না।

কি বলছেন?

আগামী অমাবস্যাতে, এস, কালীপুজো করা যাক।

কালীপুজো?

হরেরাম আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি সমস্ত দিন আপিস লইয়া ব্যস্ত থাকেন; ভোম্বলের সহিত মুকুজ্জেমশায়ের বাজির কোন খবরই তিনি রাখেন না। বস্তুত ভোম্বল এবং মুকুজ্জেমশাই ছাড়া আর কেহই এ খবর জানে না। বিস্মিতনেত্রে হরেরাম চাহিয়া রহিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, শাক্তবংশের ছেলে তুমি, কালীপুজো করবে তাতে হয়েছে কি? তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করব। একটি কালীমূর্তি আর একটি ভাল দেখে কালো পাঁঠা যোগাড় করতে হবে।

মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত হরেরামের অনেক দিনের পরিচয়। তিনি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আপত্তি করা বৃথা। মুকুজ্জেমশাই যাহা ধরেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন না। তা ছাড়া, দেবীপূজায় আপত্তি তুলিতে তাঁহার ধর্মভীরু মন ভীত হইল। বলিলেন, অমাবস্যার আর কদিন বাকি?

দশ দিন।

এর মধ্যে কি সব হয়ে উঠবে?

এর মধ্যে ছোটখাটো মূর্তি একটা হবে না? খোঁজ কর, গ্রামে নিশ্চয় গড়তে পারে কেউ।

মাথা চুলকাইয়া হরেরাম বলিলেন, দেখি বংশীকে ব'লে। আমি কিছুই জানি না।

বংশী পিওন

বংশীর সহায়তায় সাত-আট দিনের মধ্যে ছোট একটি প্রতিমা এবং নধর একটি পাঁঠা যোগাড় হইয়া গেল। ভোম্বল উল্লসিত হইয়া উঠিল। নিরামিষান পিতার সন্তান হইলে কি হয়, মাংসের প্রতি তাহার খুব লোভ। মাংস খাইতে পায় না বলিয়া লোভটা আরও বেশি। তাহার ভারি আনন্দ হইল। পিতামাতার জ্ঞাতসারে সে অবশ্য বেশি হর্ষপ্রকাশ করিতে সাহস করিল না। বাঘ-বকরি খেলার তুচ্ছ বাজির জন্য মুকুজ্জেমশাই এত কাণ্ড করিতেছেন, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে হরেরামবাবু অত্যন্ত চটিয়া যাইবেন। নিরীহ হরেরাম চটিয়া গেলে মার-ধোর অথবা হাঁক-ডাক করেন না, নীরবে উপবাস করিতে থাকেন। সুতরাং সহসা কেহ তাঁহাকে চটাইতে চাহে না। মুকুজ্জেমশাই বাঘ-বকরি-প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিত করিলেন না। ভোম্বলও ভালমানুষের মত চুপ করিয়া রহিল।

বংশীর আনুকূল্যে মুকুজ্জেমশাই কালীপূজার আয়োজন যখন শেষ করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রকম একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল। পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের এক চিঠি আসিয়া হাজির। তাহার সার মর্ম—মুরারিপুরের কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী অভিযোগ করিয়াছেন যে, মুরারিপুর পোস্ট-অফিসে নাকি কালীপূজা করা হইতেছে। অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা হরেরামবাবুকে পোস্ট-অফিসে কালীপূজা করিতে নিষেধ করা হইতেছে। কোন গভর্মেণ্ট অফিসে এরূপ পূজাদি করা নিয়মবিরুদ্ধ।

ভোম্বল অত্যন্ত দমিয়া গেল। সঙ্কল্পিত এবং আয়োজিত দেবীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরামবাবুও মনে মনে উদ্বিগ্ন হইলেন। দমিলেন না মুকুজ্জেমশাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ওর জন্যে আর ভাবনা কি, ওই সামনের মাঠটায় একটা চালা তুলে ফেলে সেইখানেই পূজো করা যাবে। পোস্ট-অফিসে পূজো নাই বা করলাম আমরা, কি বল ভোম্বল?

ভোম্বল ভালমানুষের মত একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। নিকটে উপবিষ্ট বংশীকে সম্বোধন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি দু-চারটে

জনমজুর ডাকাও, বুঝলে বংশী—একটা ছোটখাটো চালা তুলতে আর কতক্ষণ যাবে? গ্রীষ্মকালে মাঠের মাঝখানে বরং ভালই হবে। ও জমিটা তো রামকিষুণের—সে বোধ হয় আপত্তি করবে না। তাকেও তুমি একবার জিজ্ঞেস ক'রে এস।

বংশী রামকিষুণের অনুমতি লইবার জন্য চলিয়া গেল এবং একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, রামকিষুণের আপত্তি তো নাই-ই, সে বরং খুশিই হইয়াছে। সাধুবাবা ওখানে কালীমায়ীর পূজা করিবেন, ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে! সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আরও যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুজ্জেমশাই বংশীকে চালা তুলিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং খড় বাঁশ প্রভৃতি কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পূজার যাবতীয় খরচ মুকুজ্জেমশাই-ই বহন করিতেছেন, হরেরামের নিকট হইতে এক পয়সাও লইতে রাজী হন নাই।

আয়োজিত কালীপূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে হরেরাম মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন. এখন কর্তৃপক্ষের অমতে কালীপূজা করিতে আবার তিনি মনে মনে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। যদিও পোস্ট-অফিসে করা হইতেছে না, একেবারে পোস্ট-অফিসের সীমানার বাহিরেই-হইবে; তথাপি কর্তৃপক্ষের অমতেই তো হইবে! চাকরির যা বাজার, কোথা হইতে কি হইয়া যায়, কে বলিতে পারে? অথচ নিষ্ঠাবান হিন্দুসন্তান হইয়া আয়োজিত পূজা না করাটাও—। এক দিকে মা-কালী, অন্য দিকে পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,—নিরীহ নিষ্ঠাবান হরেরাম মর্মান্তিক দোটানায় পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুকুজ্জেমশাই মা-কালীর পক্ষে, নিরুপায় হরেরামকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

মুকুজ্জেমশাই মহা উৎসাহে জনমজুর লইয়া রামকিষুণের মাঠে চালাঘর তুলিতে লাগিয়া গেলেন। ভোম্বল মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট হইতে ফর্দ ও টাকা লইয়া ডাল ঘি গরমমসলা প্রভৃতির সন্ধানে বাজারের নানা দোকানে

ঘুরিতে লাগিল। মুকুজ্জেমশাই এত রকম মসলার ফিরিস্তি দিলেন যে, মুরারিপুরে সবগুলি মেলাই মুশকিল হইয়া উঠিল। সির্কা এবং জাফরান এ দুইটি দ্রব্য তো কোথাও মিলিল না।

বেলা তিনটা নাগাদ চালা খাড়া হইয়া গেল। চালার ব্যাপার শেষ করিয়া মুকুজ্জেমশাই মাংসের ব্যাপারে মন দিলেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছিলেন, রাত্রে পূজা হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মাংসটি রাঁধিয়া ফেলিবেন। তিনি নিজেই রাঁধিবেন। ভোম্বল এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গী গোল গোল করিয়া নৈনিতাল আলু ছাড়াইতেছে। আলু ছাড়ানো হইয়া গেলে আলুগুলির গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া ভাজা মসলা পুরিতে হইবে। মুকুজ্জেমশাই নানা রকম মসলা ভাজিয়া গুঁড়া করাইতেছেন। অনেক কষ্টে জিওলপুর গ্রামের দৌলতরাম মাড়োয়ারীর নিকট জাফরান পাওয়া গিয়াছে। সির্কা পাওয়া যায় নাই। মুকুজ্জেমশাই টক দই দিয়া তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া লইবেন আশ্বাস দিয়াছেন। কালীপূজার আয়োজন পুরাদমে চলিতেছে, এমন সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গো-শকটে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় হাজির হইলেন। তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্টেশন হইতে মুরারিপুরে আসিতে হইলে গো-শকট ছাড়া অন্য কোন যান নাই, সুতরাং মাননীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে গো-শকটেই আসিতে হইয়াছে। প্রকাশ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বলিলেন, তিনি মুরারিপুর পোস্ট-অফিস ভিজিট করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মুসলমান, সেই হেতু সকলে অনুমান করিতে লাগিল যে, তাঁহার কালীপূজা-সম্পর্কিত আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। চাকুরিজীবী নিরীহ হরেরাম বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই ছিদ্রিত আলুগুলিতে মসলা পুরিতে পুরিতে একটু হাসিলেন এবং হরেরামকে বলিলেন, তুমি তোমার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সামলাও গিয়ে,

এখানে আসবার দরকার নেই তোমার। আমরা সব ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি।

হরেরাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামলাইতে লাগিলেন। মুকুজ্জেমশাই ভোম্বলদের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র গল্প বলিতে বলিতে মাংস রান্নার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ কালীপ্রতিমা আসিয়া চালায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন, গ্রামের পুরোহিত মহাশয় পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি থমথম করিতেছে। চালাঘরের পাশেই একটি তোলা উনুনে মুকুজ্জেমশাই মাংস রান্না করিতেছেন, সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। নিকটেই ভোম্বল ও তাহার তিন-চারজন সঙ্গী গুটিসুটি হইয়া বসিয়া আছে। পুরোহিত মহাশয়ও মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। জমির মালিক রামকিষুণ ও তাহার সম্বন্ধী খুবলালও সোৎসাহে জাগিয়া বসিয়া আছে। যদিও রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কাহারও চোখে ঘুম নাই। মুকুজ্জেমশাই খুব জমাইয়া একটি ভূতের গল্প শুরু করিয়াছেন।

আগামী কল্য বেলা দশটার আগে ট্রেন নাই। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়কে পোস্ট-অফিসেই রাত্রিবাস করিতে হইতেছে। তিনি কালীপূজা সম্পর্কে হরেরামবাবুর কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া আপিসের কাগজপত্র নাকি তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। ভোম্বল মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি নাকি খাতাপত্র দেখিয়াছেন। পোস্ট-অফিসের বাহিরের ঘরটাতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলভীসাহেব তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিপাটীরূপে আহার করাইয়াছেন। বংশী বলিল, এই উপলক্ষ্যে মৌলভীগৃহে মুরগীও নাকি নিহত হইয়াছে। এখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় পোস্ট-অফিসের বাহিরের ঘরটাতে নিদ্রিত। মাংস প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে,

ভূতের গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে—এমন সময় পোস্ট-আফিসের বাহিরের ঘর হইতে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল।

সাপ—সাপ!

সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, বংশী, তুমি লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে দেখ। শুধু বংশী নয়, খুবলাল, রামকিষুণ, পুরোহিত, ভোম্বল সকলেই আগাইয়া গেল। সত্যই সাপ বাহির হইয়াছে। বিরাট এক কেউটে পোস্ট-অফিসের কোণে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অবস্থা অবর্ণনীয়। সাপটাকে মারা গেল না, কোথায় যে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল বোঝা গেল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পোস্ট-অফিসে শুইতে চাহিলেন না। শশব্যস্ত হরেরাম তাঁহাকে কোথায় শুইতে দিবেন চিন্তায় পড়িলেন। রামকিষুণ বলিল, মৌলভীসাহেবের বাড়িতে খবর পাঠানো হোক। তাহাই হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মৌলভী-সাহেবের ঘরটাতে শুইতে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। চোখ বুজিলেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় সর্পটা হিংস্র ফণা উদ্যত করিয়া তর্জন করিতেছে। অতি প্রত্যূষেই তিনি মুরারিপুর ত্যাগ করিলেন। রামকিষুণ প্রথমে ব্যাপারটা ভালভাবে প্রণিধান করে নাই; কিন্তু পরে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রভাতে আসিয়া ভক্তিভরে মুকুজ্জেমশাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সাধুবাবাটি তো সহজ লোক নহেন! এত বড় অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সে যেন চরিতার্থ হইয়া গিয়াছিল। প্রকাণ্ড কেউটে আসিয়া হাজির হইয়া গেল! ম্লেচ্ছ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ পলাইতে পথ পাইল না! রামকিষুণের এতাদৃশ ভক্তিবাহুল্যে মুকুজ্জেমশাই কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন—লোকটা মাদুলি অথবা মন্ত্র চাহিয়া না বসে! এই জাতীয় অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার জীবনে অনিবার্যভাবে জুটিয়া গিয়াছে, আর সংখ্যা বাড়াইতে তিনি চান না। রামকিষুণ মাদুলি কিংবা মন্ত্র চাহিল না; কিন্তু অনুরোধ করিল, আরও দুই-চারিদিন তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইবে। তাহার কন্যার 'গওনা' অর্থাৎ দ্বিরাগমন আর কয়েক দিন পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। সে সময় পর্যন্ত যদি

সাধুবাবা 'কিরপা' করিয়া থাকিয়া যান, বড় ভাল হয়। তাঁহার আশীর্বাদ নবদম্পতীর জীবনের অমূল্য সম্পদ হইবে।

মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। ভোম্বল মাংস খাইয়া খুশি হইয়াছে, কালীপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ স্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। হরেরামবাবুর কাজকর্মে কোনরূপ গাফিলতি ধরা পড়ে নাই। সুতরাং নিশ্চিন্তচিত্তে মুকুজ্জেমশাই এবার যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, হঠাৎ রামকিষুণের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সরল প্রকৃতির লোকটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার বাধিতেছিল, অথচ মুরারিপুরে আর তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। এক স্থানে বেশিদিন থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি রামকিষুণের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সকালের ডাকে একখানি পত্র পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। জরুরী পত্রের বিষয় অবগত হইয়া রামকিষুণও আর আপত্তি করিল না। পত্রখানি হাসির। হাসিকে তিনি মুরারিপুরের ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলেন। সাধারণত তিনি কাহাকেও ঠিকানা দিয়া আসিতে চান না। কিন্তু হাসি নূতন লিখিতে শিখিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে চিঠি লিখিবে বলিয়া জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঠিকানা আদায় করিয়া লইয়াছিল; হাসির চিঠি পাইয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বড় বড় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে হাসি লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

বড় বিপদে প'ড়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। ঠাকুরপো তার এক বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছি ব'লে একদিন সন্ধ্যের সময় চ'লে যায়। সেই থেকে ঠাকুরপো আর ফেরে নি। এখন শুনছি, সে নাকি পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, তার কাছে বোমা আর রিভলবার পাওয়া গেছে। ঠাকুরপো এখন হাজতে। আজ শুনছি, ওঁরও নাকি চাকরি থাকবে না। উনি যখন মজঃফরপুর গিয়েছিলেন, তখন ওঁকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। ওঁদের

সঙ্গে মিস্টার ঘোষ ব'লে কে এক মুখপোড়া নাকি কাজ করে—চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে। আমার চিঠির ভেতরে সে কি দেখতে পেয়েছে জানি না, কিন্তু তা নিয়ে নাকি ওঁর চাকরি যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি শিগগির চ'লে আসুন। আমি বাবাকেও চিঠি লিখলুম। ইতি—

হাসি

পুনশ্চ—

দেখেছেন, আমার মাথার একেবারে ঠিক নেই। তাড়াতাড়িতে আপনাকে প্রণাম দিতেই ভুলে গেছি। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি—

হাসি

মুকুজ্জেমশাই সেই দিনই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৫

নীরব গম্ভীর রাত্রি।

মরণোন্মুখ যতীন হাজরার শয়নশিয়রে শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। ঘরের এক কোণে টেবিলের উপর একটি বাতি জ্বলিতেছে। আপেল, বেদানা, কমলালেবু প্রভৃতি দুই-চারিটি ফলও টেবিলে সাজানো আছে। মিষ্টিদিদি এগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু যতীনবাবু একটিও স্পর্শ করেন নাই। যতীনবাবু লোকটি অদ্ভুতপ্রকৃতির। আর কিছু নয়, অদ্ভুত রকম নীরব। শঙ্করের সহিত একটিও কথা হয় নাই। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ। অতিশয় ক্লান্তি-ব্যঞ্জক কোটরগত চক্ষু দুইটি বুজিয়া সর্বক্ষণই চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন। নীরবে বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর কাছে এমন আত্মসমর্পণ শঙ্কর আর কখনও দেখে নাই। শঙ্কর যতীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। লক্ষ্য করে, তাঁহার গলার দুই পাশের শিরা দুইটা অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, সন্ধ্যার পর কাশিটা বাড়িয়া উঠে। প্রয়োজন হইলে নিজেই উঠিয়া বাথ-রুমে যান, একটি বালক-ভৃত্য খাবার আনিয়া দুই

বেলা তাঁহাকে খাওয়াইয়া যায়, প্রকাশবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার করিয়া আসেন। প্রকাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরেই অতি সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা যতীনবাবু বলেন; প্রকাশবাবু চলিয়া গেলে আবার চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন। শঙ্কর যে দিবারাত্রি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে, তাহা তিনি মোটে লক্ষ্যই করিতে চান না। শঙ্কর প্যাড়ার একটা সস্তা হিন্দু হোটেলে আহারাদি সমাধা করিয়া আসে। (নিজের গরম ওভার-কোটটা বিক্রয় করিয়া সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে।) এবং নির্বাক হইয়া এই যক্ষ্মারোগীর মরণশিয়রে জাগিয়া বসিয়া থাকে।

হয়তো থাকিত না, কিন্তু চুনুচুনের জন্য থাকিতে হয়। সকলের বারণ সত্ত্বেও গভীর রাত্রে চুনুচুন লুকাইয়া স্বামীকে দেখিতে আসে। গভীর রাত্রে শঙ্কর কপাট খুলিয়া দেয়, চুনুচুন চোরের মত আসিয়া প্রবেশ করে। চুনুচুন প্রবেশ করিলে শঙ্কর বাহিরে চলিয়া যায়। চুনুচুন বেশিক্ষণ থাকে না। যতক্ষণ থাকে, শঙ্কর ফুটপাথে পায়চারি করিতে করিতে চুনুচুনের কথাই ভাবে। চুনুচুন খুব রোগা, খুব কালো, কিন্তু চোখ দুইটি তাহার সুন্দর। চোখ দুইটি বড় নয়, কিন্তু অপরূপ। চুনুচুনের সমস্ত অন্তরের ছবি যেন ওই কালো চোখ দুইটি। গভীর রাত্রে এই গোপন অভিসার শঙ্করের মনকে উতলা করিয়া তোলে। প্রেমাস্পদকে গোপনে বিবাহ করিয়া চুনুচুন গোপনেই তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। হিতৈষিণী দিদি এবং দিদির বান্ধবার দল চুনুচুনকে কিছুতেই তাহার স্বামীর সংস্রবে আসিতে দিবে না, এমন কি মৃত্যুকালেও নয়। ছোঁয়াচে রোগের অজুহাতে এ যেন প্রতিশোধ লওয়া। আজ যদি মিসেস স্যানিয়ালের ওই রোগ হয়, চুনুচুনকে কি তিনি কাছে যাইতে দিবেন না? কিন্তু এসব লইয়া দিদির সহিত তর্ক করিবার কল্পনা করাও চুনুচুনের পক্ষে অসম্ভব। অতিশয় মার্জিতরুচি মৃদুপ্রকৃতির মেয়ে। শঙ্করের মনে হয়, অতিশয় নিগূঢ়প্রকৃতির। তাহা না হইলে গোপনে বিবাহ করিতে পারিত না, গভীর রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিত না। শঙ্করের মনে হয়, চুনুচুন সমাজের সহিত ইতরের মত কলহ করিতে চায়

না, কিন্তু নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চায়। প্রকাশ্যভাবে চলিবার যদি আশা থাকে, বাধা অতিক্রম করিবার জন্ত সে অকারণে শক্তিক্ষয় করে না, গোপনতার আশ্রয় লয়। নিদ্রিত যতীনবাবুর পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া শঙ্কর চুনচুনের কথাই ভাবে। চুনচুনকে ঘিরিয়া তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। উৎসুক হইয়া না উঠিলে শঙ্কর এই নীরব মৃত্যু-পথ-যাত্রীর মাথার শিয়রে এমনভাবে হয়তো দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারিত না। পাশের বাড়ির ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গেল। আর একটু পরেই চুনচুন আসিবে। দ্বারে মৃদু করাঘাতটির প্রত্যাশায় শঙ্কর সজাগ হইয়া বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, শঙ্করের খেয়াল ছিল না। সে টেবিলের এক ধারে বসিয়া 'অ্যানা ক্যারেনিনা' পড়িতেছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করিল, যতীনবাবু [illegible] তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল, একটু ভয়ও পাইল।

শুনুন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি তাঁহার বিছানার কাছে উঠিয়া গেল। যতীনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার একটি উপকার করবেন দয়া ক'রে?

কি, বলুন?

যতীন হাজরা কয়েক মুহূর্ত শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া [illegible]। তাহার পর বলিলেন, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?

নিশ্চয়।

যতীনবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, দেখুন, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি আর বাঁচব না। আমার ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি হয়ে আসছে।

আবার চুপ করিলেন।

শঙ্কর নীরবে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে যতীনবাবু বলিলেন, মারা যাব সে জন্যে দুঃখ নেই, আমার সবচেয়ে দুঃখ যে ম'রেও আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরও অশান্তি ভোগ করার জন্যে আমার মনটা বোধ হয় বেঁচে থাকবে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

যতীনবাবু বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনি তাকে বলবেন যে, অনুতাপে আমার বুকটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আমি এ ক দিন খালি তার কথাই ভেবেছি, আর কোন কিছু ভাববার শক্তিও নেই আমার।

আপনি কার কথা বলছেন?

আমার স্ত্রীর।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যতীনবাবু বলিলেন, চুনচুনের নয়, আমার প্রথম স্ত্রীর। সে এখনও বেঁচে আছে। আমি তাকে ফেলে পালিয়ে এসেছিলাম। সে নিরপরাধ জেনেও তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ত্যাগ ক'রে এসেছিলাম। সে এখনও বেঁচে আছে। আপনি একবার দয়া ক'রে যাবেন তার কাছে? তাকে বলবেন যে, আমি—

যতীনবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

একটু চুপ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বলবেন, আমার পাপের পুরো প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জ্ব'লে পুড়ে অনুতাপ করতে করতে আমি মরেছি। আপনি দয়া একবার দয়া ক'রে যাবেন তার কাছে। গিয়ে বলবেন যে, আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারই কথা ভেবেছি, মনে মনে তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়েছি—

শঙ্কর বলিল, চুনচুন, মানে—মিসেস হাজরা কি এ কথা কিছুই জানেন না?

না। লুকিয়ে বিয়ে করেছি ওকে, সে অনেক ইতিহাস—বলবার এখন সময় নেই।

একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন, মেয়েমানুষ, দুটো মিষ্টি কথা বললেই

ভুলে যায়, অতি সহজেই ভুলে যায়। আপনি ওকে যেন ওসব কথা বলবেন না, বৃথা কষ্ট পাবে। এ কি—এ কি—এখনই সব অন্ধকার হয়ে আসছে যে—আপনি—তার—

[illegible] হইয়া গেল।

প্রথম স্ত্রীর ঠিকানা আর শঙ্করকে বলা হইল না। নির্বাক শঙ্কর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

৬

প্রথম দিন ভন্টু কথাটা পাড়িতে পারে নাই। ওইরূপ নিদারুণ সংবাদ শোনার পর টাকার কথা পাড়া সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে জিনিসটা সহজ হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু আজ না পারিয়া উপায় নাই। কাল রাত্রে করালীচরণ স্বয়ং নাকি টাকার তাগাদায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যে সে বাড়িতে ছিল না! বউদিদি বলিলেন যে, সে বাড়িতে নাই শুনিয়াও করালী নড়িতে চাহেন নাই। ভন্টুর অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, ভন্টু যেন অতি অবশ্য অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। দ্রাবিড়ী লদ্‌কোলদ্‌কির নেশায় চাম গ্যান্‌চঅ যেরূপ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে রিক্ত হস্তে তাঁহার সহিত দেখা করিলে রক্তসিক্ত হইয়া ফিরিতে হইবে। সুতরাং অশোভন [illegible] নিবারণবাবুকে আজ না খজলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে? মুখবন্ধটা কি প্রকারে করা যায়—ভন্টু ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না। এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক কথাগুলি গুছাইয়া মনে মনে মহড়া দিয়া লইলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ঠিক কথাগুলি কিছুতেই মনে আসে না। কার্যক্ষেত্রে যথাসময়ে যা হোক করিয়া ব্যাপারটা আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়। হইলও তাহাই। ভন্টু গিয়া দেখিল, নিবারণবাবু ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ভন্টুকে দেখিলে পূর্বে

যেরূপ সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিতেন, এখন তাহার কিছুই করিলেন না। ক্লান্ত কণ্ঠে কেবল বলিলেন, আসুন।

ভন্টু উপবেশন করিল। ভন্টু কবি নয়, তবু তাহার মনে একটা উপমার উদয় হইল। লোকটা যেন নিবিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, কোন খবর-টবর পেলেন ?

কিছু না। পুলিসে খবর দিয়েছি আমি।

ভন্টু নীরব রহিল।

সহসা নিবারণবাবু উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, এর জন্যে যত টাকা লাগে, খরচ করব আমি। ও-ব্যাটাকে আমি দেখে নেব যেমন ক'রে হোক।

ভন্টু তথাপি নীরব।

আস্‌মিকে জানতেন তো, অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মেয়ে সে; স্কাউণ্ড্রেলটা নিশ্চয়ই কোন রকম ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে গেছে তাকে। বুঝছেন না আপনি ?

ভন্টু সুযোগ পাইল, হাসিয়া বলিল, খুব বুঝছি। আস্‌মির কতই না বয়েস, দার্জি হ'লেও বা কথা ছিল।

দার্জিও ওসব কিছু বোঝে না. আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম্। এই রাস্কেলটা জুটেই না এই হাল হ'ল !

ভন্টু একটু হাসিয়া বলিল, সে কি আর আমি জানি না! এতদিন আপনার বাড়িতে আসছি যাচ্ছি, আপনার মেয়েদের গলার স্বরটি পর্যন্ত শুনতে পাই নি কোনদিন।

ওই যে বললাম আপনাকে, আমাদের গুষ্টিরই ধারা অন্য রকম।

নিবারণবাবুর গুষ্টির ধারা কি রকম, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভন্টু আসে নাই; সুতরাং সে চুপ করিয়া গেল। আসল কথাটা কোন্ ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে নিবারণবাবু বলিলেন, পুলিসের পাল্লায় পড়লে টিট্ হবেন বাছাধন।

ভন্টু বলিল, পুলিসের হাঙ্গামা করলে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয় !

কাগজে হয়তো এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে, আপনাকে আবার দার্জির বিয়ে দিতে হবে তো!

হ'লেই বা, সত্যি কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না বলতে চান?

ভন্টু নিবারণবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করিল, আপনার মত সরল, ধর্মভীরু লোক দুনিয়ায় খুব বেশি নেই নিবারণবাবু।

নিবারণবাবু কোন উত্তর দিলেন না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পা দোলাইতে লাগিলেন। ভন্টুও আর কোন কথা বলিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, লোকটি অতিশয় ভালমানুষ এবং ভালমানুষি জিনিসটা নির্বুদ্ধিতারই রূপান্তর।

সহসা নিবারণবাবু ভন্টুর দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, দার্জির জন্যে দিন না একটা পাত্র জুটিয়ে ভন্টুবাবু। মেয়েটা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভারি কষ্ট হয় আমার। টাকা আমি খরচ করব। তিন হাজার নগদ, গয়না, দানপত্র—যথাসাধ্য দেব আমি। ভদ্রবংশের ছেলে দিন একটি যোগাড় ক'রে, গরিব হ'লেও ক্ষতি নেই, ওদের ভরণপোষণের যা হোক একটা বন্দোবস্ত আমি ক'রে যেতে পারব। আমার ওই মেয়েরা ছাড়া আর কে আছে বলুন? তাও তো আসুমিটা—

নিবারণবাবুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। উদ্গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বিদ্যুৎচমকের মত ভন্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দুই-এক মিনিট সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিল এবং তাহার পর বলিল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে একটা প্রস্তাব করি।

কি বলুন?

আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন?

নিবারণবাবু সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ফারিতচক্ষে ভন্টুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, আমার ওই কুচ্ছিত মেয়েটাকে নেবেন আপনি?

ভন্‌টু বলিল, দেখুন, আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। আপনি আমার অবস্থা ভাল ক'রেই জানেন। দু-কুড়ি সাতের খেলা কোনক্রমে খেলে যাচ্ছি, তা-ও চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। যা মাইনে পাই, তাতে কুলোয় না। দাদার চেঞ্জের খরচ, সংসারের খরচ, সব আমাকে ওই মাইনে থেকে চালাতে হয়। চারিদিকে ধার হয়ে গেছে। আপনি যদি কিছু টাকাকড়ি দেন, ধার-টারগুলো শেষ ক'রে একটু ঝাড়া-হাত-পা হতে পারি। টাকার জন্যেই আমার বিয়ে করা। এক জায়গায় সাড়ে পাঁচ শো টাকা ধার আছে, দু-এক দিনের মধ্যে দিতে না পারলে অপমানিত হতে হবে। আমি আপনার কাছেই টাকাটা চাইব ভাবছিলাম, আপনার এই অবস্থা দেখে কেবল চাইতে পারছিলাম না। এখন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল—আপনি স্বজাতি, পালটি ঘর, আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আপনার মেয়ের বিয়ে হতে পারে। আপনারও কন্যাদায় উদ্ধার হয়, আমিও একটু ঝাড়া-হাত-পা হই। বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। চিঠিও আসছে নানা জায়গা থেকে—

নিবারণবাবু বলিলেন, আপনি দাক্ষিকে দেখেছেন ভাল ক'রে?

যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট।

আপনার বাবা রাজী হবেন তো?

চেষ্টা করব।

নিবারণবাবু উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মিনিট পরে একটি চেক-বই লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কত টাকা চাই বললেন আপনার?

সাড়ে পাচ শো।

নিবারণবাবু তৎক্ষণাৎ চেক লিখিয়া দিলেন।

কথা তা হ'লে পাকা তো?

একদম পাকা।—এই বলিয়া ভন্‌টু হেঁট হইয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইল। এবার আর নিবারণবাবু আপত্তি করিলেন না।

প্রথম চিঠি লেখার উৎসাহে কিছুদিন পূর্বে হাসি চিন্ময়কে লুকাইয়া যে চিঠিখানি স্বামীকে লিখিয়াছিল, তাহা যে মৃন্ময়ের সহকর্মী মিস্টার ঘোষের হাতে পড়িয়া এত অনর্থ সৃষ্টি করিবে, তাহা হাসির কল্পনাতীত ছিল। মৃন্ময়ও কল্পনা করে নাই যে, হাসি তাহাকে চিঠি লিখিতে পারে। মৃন্ময় জানিত, হাসি নিরক্ষর। হাসি যে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোজ হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল, এ খবর মৃন্ময়ের অজ্ঞাত ছিল। মৃন্ময়কে অবাক করিয়া দিবে বলিয়া হাসি ঘুণাক্ষরেও মৃন্ময়কে কিছু জানায় নাই। মজঃফরপুরের কাজ সারিয়া মৃন্ময় যখন কলিকাতায় চলিয়া আসে, তখন সেখানকার পোস্ট-অফিসে বলিয়া আসিয়াছিল যে, তাহার নামে যদি কোন চিঠিপত্র আসে তাহা যেন কলিকাতায় তাহার অফিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার ধারণা ছিল, যদি কোন চিঠি আসে, তাহা অফিসেরই চিঠি হইবে। সুতরাং বাড়ির ঠিকানা দিয়া আসিবার কল্পনাও তাহার মাথায় আসে নাই।

হাসির চিঠি যখন মজঃফরপুর ঘুরিয়া কলিকাতার অফিসে আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃন্ময় অফিসে ছিল না। অফিসে ছিলেন মিস্টার ঘোষ, দৈবক্রমে চিঠিখানা তাঁহারই হাতে পড়িয়া গেল। দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি কোন দাবা-খেলোয়াড় ভাল একটা চাল হঠাৎ আবিষ্কার করিলে যেমন আনন্দিত হইয়া উঠেন, মিস্টার ঘোষ ঠিক তেমনই আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। এই তো বাজি মাত হইয়া গিয়াছে! ঠিক এই হাতের লেখারই তো তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন! অসঙ্কোচে তিনি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া ফেলিলেন। কে এই হাসি? যেই হউক, মৃন্ময়বাবুর সহিত বেশ মাখামাখি আছে দেখা যাইতেছে। উত্তেজনায় আনন্দে মিস্টার ঘোষের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে অর্ধ-বিকশিত ক্রূর একটা হাসি নীরবে যেন বলিতে লাগিল, এইবার তো লোকটাকে কবলে

গিয়াছে! একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছে, এতদিন বাছাধন ডুবিয়া জলপান করিতেছিল। মিস্টার ঘোষ অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। শুধু যে বাজিমাত হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, এক ঢিলে দুইটি পক্ষীই নিহত হইয়াছে। সেদিন যে অ্যানার্কিস্ট ছোকরা ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার নিকট যে চিঠির টুকরাটা পাওয়া গিয়াছে, তাহার লেখা আর মৃন্ময়বাবুর এই হাসির লেখা তো হুবহু এক। লিপি-সমস্যার সমাধান এইবার সহজে হইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয়, চাকরি-জগতে প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বী মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের নিষ্কলঙ্ক চাকুরি-জীবনে বেশ মোটা একটা কলঙ্কও লাগিয়া দেওয়া যাইবে। চিন্ময় নামে যে ছোকরা ধরা পড়িয়াছে, শোনা যাইতেছে, সে নাকি মৃন্ময়বাবুরই সহোদর ভাই। এই হাসিটা মৃন্ময়ের কে হয়?

পরদিনই খোদ বড় সাহেব মৃন্ময়কে তলব করিলেন। মৃন্ময়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, চিন্ময় তোমার কে হয়?

ভাই।

হাসি তোমার কে হয়?

স্ত্রী।

এরা যে এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তুমি জানতে?

না।

সত্যি কথা বল।

সত্যি কথাই বলছি।

সাহেব ক্ষণকাল মৃন্ময়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা, যাও।

মৃন্ময়ের শ্বশুর মহাশয় পুলিসের বড় চাকুরে। তাঁহারই খাতিরে এবং চেষ্টায় মৃন্ময় ও হাসি রেহাই পাইয়া গেল, অর্থাৎ তাহাদের জেল হইল না। মৃন্ময়ের চাকরিটি কিন্তু গেল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, চাকুরিবিহীন মৃন্ময় মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং হাসি তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ

দিতেছে যে, জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি। এই হতভাগ্য চাকরি গিয়াছে ভালই হইয়াছে। অন্য চাকরি একটা জুটিয়া যাইবেই। এত লোকের জুটিতেছে, মৃন্ময়েরই জুটিবে না ?

মুকুজ্জেমশাই কলিকাতায় আসিয়া আর একটি সংবাদ পাইলেন। শিরীষবাবু লিখিতেছেন, বেহাইমশায় নাকি শঙ্করের পড়ার খরচ বন্ধ করিয়াছেন। শুনিতেছি, তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা ভয়ানক সংবাদ। আমি কি করিব, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, আমিই কোনক্রমে তাহার পড়ার খরচ চালাইব, সে যেন পড়া বন্ধ না করে। উত্তরে শঙ্কর লিখিয়াছে যে, সে চাকুরির চেষ্টা করিতেছে, আর পড়াশোনা করিবার তাহার ইচ্ছা নাই। আপনি যদি একবার সুযোগ পান, তাহার সহিত দেখা করিবেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, সে যেন পড়া বন্ধ না করে। আমি যেমন করিয়া হউক তাহার পড়ার খরচ চালাইব।

এই দুইটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মুকুজ্জেমশাই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কিছুদিনের মত খোরাক পাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক সক্রিয় হইয়া উঠিল।

৮

সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইতেছিল—

"একটি শিক্ষিত বাঙালী পাত্রের জন্য বাঙালী পাত্রী চাই। পাত্রী যে-কোন জাতির হইলেই চলিবে, কিন্তু শিক্ষিতা পাত্রী অথবা গান-বাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না। অক্ষরপরিচয়হীনা বয়স্থা পাত্রীই প্রয়োজন। পণ লাগিবে না। পাত্র শিক্ষিত উপার্জনক্ষম। ...নং পোস্টবক্সে আবেদন করুন।"

এ দেশে অশিক্ষিতা পাত্রীর অভাব নাই, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাও ঘরে ঘরে বিরাজমান, তথাপি এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আশানুরূপ সংখ্যায় আবেদন আসিয়া জুটিল না। "পাত্রী যে-কোন জাতি হইলেই চলিবে"—এই কথায় পুরাতন-পন্থীরা, এবং "শিক্ষিতা অথবা গান-বাজনা-জানা মেয়ে একেবারেই চলিবে না"—এই কথায় আধুনিক-পন্থীরা ভড়কাইয়া গেলেন। সকলেই ভাবিলেন, লোকটার মাথায় ছিট অথবা কোন কুমতলব আছে। নিজে শিক্ষিত, জাত মানে না, অথচ অক্ষর-পরিচয়-হীনা বয়স্থা পাত্রী বিবাহ করিতে চায়—এ আবার কি রকম!

বেলার উপর চটিয়া প্রিয়নাথ মল্লিক অবশেষে বিবাহই করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঠিক করিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত মেয়ে বিবাহ করিবেন না—কিছুতেই না। উহাদের মুখদর্শন করিলেও পাপ হয়। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞাপনের ধরন দেখিয়া শিক্ষিতা অশিক্ষিতা কোন মেয়েই জুটিল না। একেবারেই যে জোটে নাই তাহা নয়, কিন্তু যে দুই-চারিজন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বেলার গৃহত্যাগের বিবরণ শুনিয়া আর অগ্রসর হওয়া সদ্বিবেচনার কার্য মনে করেন নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলেই যে প্রিয়নাথ বিবাহ করিতেন তাহাও সুনিশ্চিত বলা যায় না। তিনি হঠাৎ খেয়ালের বশে বিজ্ঞাপনটি দিয়া ফেলিয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল, কি হইবে এমনভাবে বেলার পথ চাহিয়া! সে যদি নাই আসিতে চায়, চুলায় যাক, আমি বিবাহ করিয়া সুখী হইব। সত্য সত্যই বিবাহের সুযোগ উপস্থিত হইলে হয়তো তিনি পিছাইয়া যাইতেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া যখন কোন পাত্রীই পাওয়া গেল না, তখন ব্যাহত প্রিয়নাথ ক্ষোভে আক্রোশে মনে মনে গুমরাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের উত্তাপ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, কেমন করিয়া বেলাকে জব্দ করা যায়। যেমন করিয়া হউক তাহার দর্পটা চূর্ণ করিতে হইবে, ছলে বলে কৌশলে—যেমন করিয়া হউক।

বৃষ্টি পড়িতেছে।

ভিজিয়া ভিজিয়াই শঙ্কর হাঁটিয়া চলিয়াছে। তখনও রাগে তাহার মাথার শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। অপদার্থ লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়! হাঁদা জরদ্গব ছেলেটাকে টাকার জোরেই রাতারাতি বুদ্ধিমান করিয়া তুলিবে ভাবিয়াছে! অঙ্ক কিছু তো জানেই না, বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না, তাহাকে ফিজিক্স্ পড়াইতে হইবে! তাও না হয় চেষ্টা করা যাইত; কিন্তু উহাদের অর্থোত্তাপ অত্যন্ত বেশি, শঙ্করের পক্ষে অসহ্য। হস্তীমূর্খ ছেলেটার পিছনে শঙ্কর যে এতটা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছে, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ছেলের বাবা এমনভাবে কথাবার্তা বলেন, যেন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশে বড় নয়। আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে বলিয়া বসিলেন, ওহে মাস্টার, আজ আমাদের চণ্ডীবাবু বলছিলেন যে, পড়াশোনা তেমন নাকি সুবিধে হচ্ছে না! ফিজিক্সের কি একটা কোশ্চেন করেছিলেন উনি, কিছুই বলতে পারলে না। চণ্ডীবাবু বলছিলেন, আর কটা টাকা বেশি দিয়ে কলেজের একজন প্রফেসার রাখলেই ভাল হয়। কি বলেন আপনি, হবে আপনার দ্বারা পড়ানো? টাকার জন্যে আমি ভাবি না, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—প্রফেসারই না হয় রাখি একটা—

শঙ্করের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি সে শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, চণ্ডীবাবু কে?

একজন রিটায়ার্ড ইন্‌জিনিয়ার। আমাদের পাড়াতেই থাকেন। তিনিই কাল ভীবুকে ডেকে দু-চারটে কোশ্চেন করলেন, ও তো কিছুই বলতে পারলে না, হাঁ ক'রে রইল।

শঙ্কর বলিয়া বসিল, ও হাঁ ক'রেই থাকবে, ওর দ্বারা কিছু হবে না। ওর মাথায় কিছু ঢুকতে চায় না সহজে—

ঢোকাতে জানলেই ঢোকে। জীবু বলছিল, আপনি নাকি কেবল অঙ্কই কষান, ফিজিক্স্ কিছুই পড়ান না।

অঙ্ক না জানলে ফিজিক্স্ পড়া যায় না।

এই কথা শুনিয়া গড়গড়ায় একটা টান দিয়া হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে এমন টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন, যেন শঙ্কর হাস্যোদ্দীপক অসম্ভব কিছু একটা বলিয়া ফেলিয়াছে।

দেখুন, কারও রুটি আমি সহজে মারতে চাই না, কিন্তু মন দিয়ে একটু পড়াবেন-টড়াবেন।

আমি আর কাল থেকে আসব না, আপনি কলেজের প্রফেসারকেই বাহাল করুন।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, ভদ্রলোক ডাকিয়া বলিলেন, মাইনেটা তা হ'লে চুকিয়ে দিই, দাঁড়ান। কদ্দিন কাজ করেছেন আপনি?

আমার ঠিক মনে নেই।

দাঁড়ান, আমার টোকা আছে।

কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি আজ নিয়ে একুশ দিন কাজ করেছেন, মাসিক চল্লিশ টাকা হিসেবে আপনার আটাশ টাকা পাওনা—এই নিন। গুপ্তমশায়কে বলবেন যে আমি আপনাকে ছাড়াই নি, আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন। আমার ছেলে ওই কলেজেই পড়ে, গুপ্তমশায়ের কথায় প্রিন্সিপ্যাল ওঠেন বসেন শুনেছি, তাঁকে আমি চটাতে চাই না। আপনি নিজেই ছেড়ে গেলেন, এই কথাটা দয়া ক'রে জানিয়ে দেবেন তাঁকে।

আচ্ছা।

হনহন করিয়া চলিতে চলিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, এইবার কি করিবে? মাত্র এই কটি টাকা, কলিকাতা শহরে দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। যে মেসে সে উঠিয়াছে, তাহার চার্জ মিটাইতেই তো কুড়িটা টাকা লাগিবে। নূতন কাজের সন্ধান করিলেই কি মিলিবে? তাহার উপর কয়দিন হইতে

যে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কোথাও বাহির হওয়াই মুশকিল। সমস্ত আকাশে চাপ চাপ মেঘ, দিবারাত্রি বৃষ্টির বিরাম নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, আকাশ নির্মেঘ হইলেই বা সে কি করিত, বৃষ্টির দোহাই দিয়া তবু কয়েকটা দিন অকর্মণ্যতাটাকে সহ্য করা যাইতেছে। আকাশ একদিন না একদিন নির্মেঘ হইবেই, কিন্তু তাহার সমস্যার সমাধান কি তাহা হইলেই হইয়া যাইবে?

শঙ্করবাবু নাকি?

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, বেলা মল্লিক। অবাক হইয়া গেল। মাথায় ছাতা, পরনে ঘন নীল রঙের শাড়ি, বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে হাই-হীল জুতা, গ্রীবাভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। সমস্ত অবয়বে এমন একটা আভিজাত্যমণ্ডিত শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, শঙ্কর চোখ ফিরাইতে পারিল না, মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বেলা মল্লিকই পুনরায় কথা বলিলেন, কোথায় চলেছেন?

মেসে।

আজকাল মেসে থাকেন নাকি? আমার ধারণা ছিল, আপনি হস্টেলে থাকেন।

আপনি কিছুই শোনেন নি তা হ'লে?

না। শোনবার মত কিছু আছে নাকি?

শঙ্কর একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, শোনবার কিংবা শোনাবার মত কিছু অবশ্য নয়—

ভনিতা ছাড়ুন। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছুই নয়, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে উদরান্নের জন্যে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ?

খরচ জুটল না।

তার মানে?

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া বলিল, তার মানে, ওই

টাকার অভাবে আপনাকে পড়াশোনা বন্ধ করতে হ'ল—এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই। আপনি যে গরিবের ছেলে নন, তা আমি জানি।

বাবা বড়লোক তো আমার কি!

বেলা ভ্রূভঙ্গীসহকারে খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, আপনার এখন সময় আছে কি?

প্রচুর, কেন?

তা হ'লে আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাসায়।

শঙ্কর বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, কেন বলুন তো?

এমনই একটু গল্প-সল্প করা যাবে। আজ একটু ছুটি পেয়ে গেছি।

চলুন।

১০

ভন্টুর বউদিদি বসিয়া বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন। রবিবারে আপিসের তাড়া নাই। ভন্টু অদূরে একটি মোড়ার উপর বসিয়া নাকে, কানে, নাভি-বিবরে, পায়ের আঙুলগুলির ফাঁকে ফাঁকে তৈল-নিষেক করিয়া অতিশয় পরিপাটীরূপে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করিতেছিল। এই একদিনে ভন্টু সাধ মিটাইয়ার মত তেল মাখিয়া লয়। সপ্তাহের বাকি ছয় দিন তেল মাখিবার অবসর থাকে না। কোনক্রমে মাথায় দুই ঘটি জল ঢালিয়া এবং নাকে-মুখে যা হোক কিছু গুঁজিয়া উর্ধ্বশ্বাসে আপিসে ছুটিতে হয়। এই রবিবার দিনই বেচারা প্রাণ ভরিয়া স্নানাহার করে। বউদিদিও রবিবারের দিন আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়া থাকেন।

ভন্টু সশব্দে নাসারন্ধ্রে খানিকটা তেল টানিয়া লইয়া বলিল, বাকু কি ইটিং আপিস খুলেছেন?

তোমার আসবার আগেই বাবা খেয়ে নিয়েছেন। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি করছ কি, একেবারে আচার হয়ে গেলে যে!

ভন্‌টু কিছু না বলিয়া আবার খানিকটা তৈল নাসারন্ধ্রে সশব্দে টানিয়া লইল।

বউদিদি বলিলেন, ওই জন্যেই তো জামা-কাপড় তেল-চিটচিটে হয়ে যায়। সাবান দিলেও পরিষ্কার হতে চায় না।

অয়েলিশ অ্যাফেয়ারে বড় সুখ।

ভন্‌টু বাম তালুতে খানিকটা তৈল ঢালিয়া লইয়া গর্দানায় ঘষিতে লাগিল।

বউদিদি এক নজর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন ও বলিলেন, তোমার আর কি, তোমাকে তো সাবান কাচতে হয় না, যাকে কাচতে হয় সে-ই বোঝে।

ভন্‌টু গর্দানায় তেল মালিশ করিতে করিতে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে বলিল, বড় সুখ।

বউদিদি আর কিছু না বলিয়া বড়ি দিতে লাগিলেন।

দুই-এক মিনিট নীরবতার পর ভন্‌টু বলিল, আজ কি কি রান্না করেছ বউদি?

আলুর দম, পটল-ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মুড়ো দিয়ে মুগ ডাল—

বাবাকে ওই সমস্ত খেতে দিয়েছ নাকি?

তা দিয়েছি বইকি।

ধীরেন ডাক্তার বলছিল, ওঁকে এখন ওসব গুরুপাক জিনিস খেতে না দেওয়াই ভাল। চোখের কোল ফুলেছে, কিডনি খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই।

ঘরে ভালমন্দ রান্না হ'লে ওঁকে না দিয়ে কি পারবার জো আছে?

একটু থামিয়া বউদিদি বলিলেন, এমনিতেই তো পান থেকে চুন খসলে তুলকালাম কাণ্ড। সেদিন রাত্রে পরোটায় সামান্য একটু ময়ান কম হয়েছিল, বললেন, এ পরোটা না পরেন্‌ঠা!

ভন্টুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আজকাল বাকু আর সে রকম করেন না, না বউদিদি?

কি রকম?

রাগ হ'লে 'খিদে নেই' ব'লে মশারি-টশারি ফেলে তার ভেতর ব'সে শ্রীমদ্ভাগবত পড়তে শুরু ক'রে দিতেন সেই যে!

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, না, অনেক দিন তো সে রকম করেন নি।

ভন্টু বাকুর ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, বাকু স্লিপিং আপিস খুলেছেন বোধ হয়। কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঁ্যা, বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন।

ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল, পেটে ও পিঠে তেল মাখিতে মাখিতে বলিল, আসল ব্যাপারের কতদুর কি সেট্‌ল্‌ করলে? বাকুর কাছে পেড়েছিলে কথাটা?

না, নিবারণবাবুর টাকা তুমি ফেরত দাও।

কেন, দার্জি মেয়েটি তো মন্দ নয়। চমৎকার সেলাই-ফোঁড়াই জানে।

রঙ কি রকম?

কালো, কিন্তু কুৎসিত নয়। অনেকটা কচি নিমপাতার মত, একটু লালচে আভা আছে।

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, রঙের এসে যাচ্ছে না, আমার রঙই বা কি এমন ফরসা! কিন্তু যে বাড়িতে কেলেঙ্কারি ঘটেছে, সে বাড়িতে বিয়ে করতে হবে না টাকার জন্যে। টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও।

টাকা তো গভীর গাড্ডায়।

গাড্ডায় মানে?

করালীচরণকে দিয়ে এসেছি।

তোমাকে মানা করলুম, তবু তুমি দিয়ে এলে? ওকে দুদিন পরে দিলেই

তো চলত। এইবার তো তোমার দাদা এসে কাজে জয়েন করবেন, দুজনে মিলে কিছুদিন পরেই না হয় শোধ ক'রে দিতে টাকাটা।

কেতুরাজ করালীচরণকে তুমি চেনো না, তাই কলায়ের ডালের বড়ি দিতে দিতে স্বচ্ছন্দে কথাগুলো বলতে পারলে। চিনলে সটান ঢোঁক গিলে বসতে, ও-কথা আর উচ্চারণ করতে না।

আহা!

দুই বগলে তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ভন্টু বলিল, চাম লদ করালী দ্রাবিড়ে লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছে, তাকে আটকায় কার সাধ্য!

তা হ'লে অন্য কোথা থেকে টাকা যোগাড় ক'রে নিবারণবাবুকে দিয়ে দাও। ও-বাড়ির মেয়ে ঘরে আনা চলবে না।

পাশের ঘর হইতে গদাম করিয়া একটা শব্দ হইল।

বউদিদি ভন্টুর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, কেউ ঘুমোয় নি, সব মটকা মেরে প'ড়ে আছে তোমার ভয়ে।

ভন্টু তেল মাখিতে মাখিতে আগাইয়া গেল ও জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, একটা পাশ-বালিশ মাটিতে পড়িয়াছে। ছেলেরা সকলে চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে, সকলেরই চোখ মিটমিট করিতেছে।

এই ফনুতি, বালিশ ফেললে কে?

নুতি ঘাড় ফিরাইয়া নাকী সুরে বলিল, দাদা আমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে খালি।

শনটু, বেঁত না খেলে পিঠ সুড়সুড় করছে, নয়?

শনটু আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিল না, চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পাশ-বালিশটা তুলে চুপ ক'রে শুয়ে থাক্ সব। ফের যদি কোন আওয়াজ শুনেছি তো পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমি সকলের।

ফনুতি পাশ-বালিশটা তুলিয়া লইল এবং সকলে আর একবার নড়িয়া-চড়িয়া শুইল।

বউদিদি আবার তাগাদা দিলেন, তুমি এবার চান কর, আর কত বেলা করবে, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

তুমি ভাত বাড় না, আমার চান করতে কতক্ষণ যাবে?

তোমাকে যেন চিনি না আমি! দাঁত মাজতেই তো এক যগ যাবে এখন।

ভনটু মুখ বিকৃত করিয়া বউদিদির মুখের পানে চাহিল।

আহারাদির পর ভনটু ছোট একটি হাত-আয়না এবং ছোট একটি কাঁচি লইয়া মোড়ার উপর বসিয়া গুম্ফসংস্কার করিতেছিল। বউদিদিও আহার সমাপন করিয়া ছেলেদের পাশেই একটু গড়াইয়া লইতেছিলেন। তাঁহার তন্দ্রার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—স্বামী আসিয়াছেন, শরীর বেশ সারিয়া গিয়াছে, আর জ্বর হয় না, মুখের সে রুগ্ন ভাব আর নাই, গাল চিবুক বেশ ভারী হইয়াছে।

একটা মোটরের হর্নের শব্দে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। বাড়ির সামনে একটা মোটর আসিয়া থামিয়াছে। ভনটু আয়না ও কাঁচি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া সদর-দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল, কাহার মোটর তাহার বাসার সামনে আসিয়া থামিল! দরজা খুলিয়া ভনটু বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার আপিসের বড়বাবু! কেরানীমহলের যিনি সর্বেসর্বা, স্বয়ং তিনি আসিয়াছেন। ভনটুর আপিসের বড়বাবু বড়লোক। মোটা মাহিনা পান, তা ছাড়া ধনীর সন্তান। নিজের মোটর আছে। ভনটু সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

বড়বাবু মোটর হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, ভালই হ'ল, তুমিও এখন বাড়িতে আছ। তোমার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।

হঠাৎ বাকুর সহিত বড়বাবু কেন আলাপ করিতে আসিলেন, তাহা বিস্মিত ভনটু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও মুখে সোচ্ছ্বাসে আহ্বান করিল।

আসুন আসুন, ভেতরেই আসুন।

তাহার পর একটু সঙ্কোচভরে বলিল, বাবা কানে একটু কম শোনেন, একটু জোরে জোরে কথা বলতে হবে।

আচ্ছা।

ভন্টু বড়বাবুকে লইয়া বাকুর ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বড়বাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন ভন্টু আরও বিস্মিত হইয়া গেল। এ যে স্বপ্নাতীত আবুহোসেনী কাণ্ড! বড়বাবু নিজের মেয়ের সহিত ভন্টুর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বউদিদি উল্লসিত হইয়া

এখন স পাঁচ আনা পয়সা দাও দিকি।

কেন?

আমি মনে মনে হরির লুট মানসিক করেছিলাম, যাতে ওই নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয়।

পাগল! উইন্টার ক্যাপিটাল অফ বেঙ্গল গভর্নরকে অগ্রাহ্য করা সোজা নাকি?

উইন্টার ক্যাপিটাল কি?

বউদিদি সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, ওখানে তোমার বিয়ে হতেই পারে না।

না না, ছি! অমন অসময়ে এক কথায় করকরে সাড়ে পাঁচশোটি টাকা গুনে দিলে, তা ছাড়া বৃশ্চিক রাশি, মকর লগ্ন, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছে, নিবারণকে এমনভাবে ল্যাডারিং করা কি ঠিক হবে?

ল্যাডারিং কথাটা ভন্টু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করিল।

বউদিদি মানে বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, তার মানে?

মানে, নিশ্চিন্ত নিবারণ গাছে উঠে মজাসে গোঁফে তা দিচ্ছে, এখন মইটা সরিয়ে নিলে লোকে বলবে কি?

লোকে যাই বলুক, ওখানে বিয়ে হবে না আজই তাঁকে ব'লে

এস—বাড়ির কারও মত হচ্ছে না। কারও মত হবেও না। ও-কথা শুনলে বাকু, তোমার দাদা, কেউ রাজী হবেন না। সকলের অমতে তুমি বিয়ে করবে নাকি ?

কিন্তু ফাইভ অ্যাণ্ড হাফ সেঞ্চুরির মহড়া সামলাব কি ক'রে ? সেটা ভাবছ না কেন ?

সে আবার কি ?

বেশ খাসা আছ তুমি ! সাড়ে পাঁচ শো টাকাটা তো স পাঁচ আনার সিন্নি দিলেই উবে যাবে না ? আর আমাদের গুষ্টিশুদ্ধুকে ছাতু ক'রে ফেললেও পাঁচ টাকা বেরুবে কি না সন্দেহ। তোমার গয়নাগুলি তো বহু পূর্বেই বিক্রমপুর হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে উপায় কি সেইটে বল, সিন্নি নিয়ে লদকালেই তো চলবে না !

পণ হিসেবে বড়বাবু নিশ্চয় কিছু দেবেন, তার থেকেই দিয়ে দিও নিবারণবাবুকে।

বড়বাবু কত দেবে তার ঠিক কি ? যে রকম গোঁফ আর জুলপি লোকটার, কিছুই বিশ্বাস নেই।

বাঃ, নিশ্চয়ই দিতে হবে। বাকুকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও না।

বাকু তোমাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে। বাকুকে শেখাবে তুমি !

বাকুও এই বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য আঁকুপাকু করিতেছিলেন। তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

কই গো বড়বউমা, এস না একবার এদিকে। ভনুটুর আপিসের বড়বাবুর প্রস্তাবটা বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। চা-ও আনাও। চা খেতে খেতে বেশ জাঁকিয়ে বিবেচনা করা যাক, এস।

বউদিদি ভনুটুর দিকে চাহিয়া বাকুর পিছু পিছু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন এবং তাঁহার কানে কানে কি বলিয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাকুর কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল—বলে, লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না।

বউদিদি চা চড়াইতে গেলেন।

ভন্টু পিছন হইতে তাঁহাকে ভ্যাঙাইতে লাগিল।

অন্ধকার রাত্রি।

করালীচরণ বক্সির ঘরে মোমবাতির ম্লান আলোকে অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। বোতলের মুখে গোঁজা যে মোমবাতিটি জ্বলিতেছে, তাহারও আয়ু নিঃশেষিতপ্রায়, আর বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। বেশিক্ষণ টিকিবার আর প্রয়োজনও নাই। বক্সি মহাশয়ের গোছানো শেষ হইয়া গিয়াছে, এইবার তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। মোমবাতির স্বল্পালোকে বক্সি মহাশয় নিবিষ্টচিত্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একখানি পত্র পড়িতেছিলেন। সমস্ত মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ, চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। দ্রাবিড়ে যাইবার মুখে এ কি এক ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল! পত্রের সহিত দলিল-গোছের কি একটা কাগজ ছিল। পত্রটি এবং দলিলখানি আদ্যোপান্ত পুনরায় পড়িয়া করালীচরণ সেগুলিকে লম্বা খামের ভিতর পুরিয়া ফেলিলেন। দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়া তারপর যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। ভন্টুবাবু এখন তাড়াতাড়ি ফিরিলে যে বাঁচা যায়! ভন্টুকে তিনি কিছু মাল এবং টিকিট কিনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রায় ঘণ্টা-দুই হইয়া গেল এখনও ফিরিতেছে না কেন? অধীর করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, দ্বারপ্রান্তে ছায়ামূর্তির মত কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে

কে?

আমি।

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল, মোড়ের সেই পানওয়ালীটা। একমুখ হাসিয়া মিসি-লাগানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া পানওয়ালী বলিল, জিনিসপত্তর সব বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে আজ সকাল থেকে দেখছি, কোথাও যাওয়া হবে নাকি ঠাকুরের?

করালীচরণ কিছু না বলিয়া তাহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন, এই অযাত্রাটা ঠিক যাইবার সময় আসিয়া হাজির হইয়াছে!

আমি যেখানেই যাই না, তোর তাতে কি? দূর হ তুই এখান থেকে।

পানওয়ালী কিন্তু নড়িল না, স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।—আচ্ছা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন বল তো ঠাকুর? আমি তো তোমার ভাল ছাড়া মন্দ কোন দিন করি নি।

করালীচরণের চোখটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তুই নড়বি কি না বল্ এখান থেকে?

পানওয়ালী তথাপি নড়িল না।

আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন, তা না বললে আমি যাব না।

হারামজাদী ছোটলোক বেশ্যা, তোর মুখদর্শন করলে যে পাপ হয়, তা তুই জানিস না? আবার কৈফিয়ৎ তলব করছেন!

পানওয়ালীর মুখের হাসিটা সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তথাপি সে সপ্রতিভ ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য আর একটু হাসিয়া বলিল, ওমা, এইজন্যেই এত রাগ! আমি ভেবেছিলাম, বুঝি বা আর কিছু! মুখ দেখলে পাপ হয়, আর আমার কাছ থেকে সিগারেট পান নিলে বুঝি কিছু হয় না? ধন্যি শাস্তর তোমাদের!

দূর হ বলছি।

করালীচরণ তাড়া করিয়া গেলেন। পানওয়ালী অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভন্টু আসিয়া পড়িল।—উঃ, বড্ড দেরি করলেন আপনি ভন্টুবাবু, সব জিনিসপত্তর পেয়েছেন তো?

হ্যাঁ।

ভন্টু দুই বোতল মদ, ছোট একটি কাচের গ্লাস, পাঁচ টিন সিগারেট, এক ডজন দেশলাই, দুই প্যাকেট মোমবাতি এবং টুকিটাকি আরও নানা রকম জিনিস টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

টিকিট করেন নি?

নিশ্চয়। এই যে, নিন না।

ভন্টু ভিতরের পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিল এবং তাহার ভিতর হইতে টিকিট ও বাকি টাকা বাহির করিয়া দিল।

করালীচরণ আলমারির মাথায় দাঁড়কাকের খাঁচাটা দেখাইয়া বলিলেন, আর ওটার?

ওটার সম্বন্ধে নানা বখেড়া। খাঁচার মাপ-জোক চাই, তা ছাড়া অনেক খরচ।

গভীর বিস্ময়ের সহিত করালীচরণ বলিলেন, খরচ ব'লে কি এতদিনের সঙ্গীটাকে এখানে ফেলে রেখে যাব নাকি? কে খেতে দেবে ওকে?

ভন্টু বলিল, সে ভার না হয় আমি নিচ্ছি; আপনি বিদেশে যাচ্ছেন, কোথায় ওই ঝামেলা নিয়ে ঘুরবেন? তার চেয়ে ওকে এখানে রেখে যান, আমিই দেখাশোনা করব বরং।

আপনি ঠিক দেখাশোনা করতে পারবেন তো?

ঠিক পারব।

দেখুন—

বলছি, ঠিক পারব।

তা হ'লে গোটা-বিশেক টাকা রেখে দিন আপনি। ওকে মাছ মাংস ছাতু দেবেন রোজ। আমও বেশ খায়। দেখবেন, যেন কষ্ট না পায়। আপনি ভার নিচ্ছেন ব'লেই ভরসা ক'রে রেখে যাচ্ছি।

টাকার দরকার নেই, আমি সব ব্যবস্থা করব এখন।

না না, টাকাটা রাখুন, টাকাই হচ্ছে পেয়াদা, ওই তাগাদা দেবে আপনাকে। টাকাই নারায়ণ! বিনা টাকায় কিছু হবার জো আছে আজকাল!

ভন্টুকে টাকা লইতে হইল।

এবার চলুন, স্টেশনে যাওয়া যাক তা হ'লে। ট্রেনের আর দেরি কত?

ঘণ্টাখানেক আছে আর।

মাত্র ঘণ্টাখানেক? চলুন, চলুন, আর দেরি নয়, ট্যাক্সি ডাকুন আপনি।

ভন্টু ট্যাক্সি ডাকিতে বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ পুনরায় লম্বা খামটা হইতে চিঠি ও দলিলটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং আবার সমস্ত আদ্যোপান্ত পড়িয়া স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এবং পুনরায় সেগুলি খামে পুরিয়া আলমারির ভিতর রাখিয়া দিলেন।

ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে ভন্টু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে পানওয়ালী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভন্টু পানওয়ালীকে চিনিত। বাইক হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, ভালই হ'ল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কেন বলুন তো?

বক্‌সিমশায়ের ঘর-দোরের কি ব্যবস্থা করা যায়, তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। উনি আমার ওপরই সব ভার দিয়ে গেলেন। তুমি পারবে দেখাশোনা করতে?

কি করতে হবে বলুন?

এই ঝাঁট-পাট দেওয়া আর কি, বক্‌সিমশায়ের একটা কাগ আছে, সেটাকেও খেতে-টেতে দিতে হবে। পারবে তুমি?

পারব।

তা হ'লে এই টাকা একটা রাখ, মাছ মাংস ছাতু আম যা দরকার কিনে দিও।

টাকার দরকার নেই।

বক্‌সিমশায় দিয়ে গেছেন যে।

আপনাকে দিয়ে গেছেন, আমাকে তো আর দেন নি। আপনি কেবল একটি উবগার করবেন।

বিস্মিত ভন্‌টু বলিল, কি ?

ওঁকে জানাবেন না যে, ওঁর ঘরের ভার আপনি আমাকে দিয়েছেন।

অধিকতর বিস্মিত হইয়া ভন্‌টু বলিল, কেন ?

মিসি-মণ্ডিত দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া পানওয়ালী উত্তর দিল, আমি ওঁর দুচক্ষের বিষ ছিলুম।

ভন্‌টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

পানওয়ালী পুনরায় হাসিয়া বলিল, দিন, চাবি দিন। ওঁকে জানাবেন না কিন্তু।

জানাব কি ক'রে, ওঁর ঠিকানাই জানি না।

আচ্ছা, উনি কোথায় গেলেন বলুন তো ?

দ্রাবিড়ে।

সে আবার কোথা ? সেখানে কেন ?

পড়তে।

প'ড়ে প'ড়েই সারা হ'ল। দিবারাত্রি আর কোন কাজ নেই।

পানওয়ালী মুচকি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, মানুষে এত পড়ে কেন বলুন তো ? যত পড়ে, ততই তো মাথা গোলমাল হয়ে যায় দেখছি।

ভন্‌টু সহসা অনুভব করিল, 'নাই' পাইয়া মাগী বোধ হয় লদ্‌কালদ্‌কিতে ঢুকিবার চেষ্টায় আছে। গম্ভীরভাবে বলিল, লেখাপড়ার মর্ম সবাই বুঝলে আর ভাবনা ছিল কি ?

ইনি খুব বিদ্বান, না ?

লদ্‌কালদ্‌কি ঘনীভূত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভন্‌টু এ কথার জবাব দিল না। বলিল, চাবিটা রাখ তা হ'লে। কাগটাকে খেতে-টেতে দিও। কাল আবার আসব আমি।

সে বাইকে সওয়ার হইল।

চাবিটা হাতে করিয়া অন্ধকার গলিতে পানওয়ালী করালীচরণের রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রে ঘরটা খুলিতে তাহার সাহস হইল না।

১২

মৃন্ময় গঙ্গার ধারে একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজেকে নিতান্ত একা মনে হইতেছিল। এই সেদিন পর্যন্ত তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না, এখন অখণ্ড অবসর। নিমেষের মধ্যে সমস্ত যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। চিন্ময়টা গোপনে গোপনে এত কাণ্ড করিতেছিল! বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। সহসা মৃন্ময়ের স্বর্ণলতাকে মনে পড়িল। তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্যই তো সে পুলিসের চাকুরি লইয়াছিল। অন্বেষণ তো করা হয় নাই, চাকরিটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। চোর, জুয়াচোর, খুনে, জালিয়াৎ—ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, স্বর্ণলতাকে অন্বেষণ করিবার সে অবসর পাইল কই? প্রথম প্রথম প্রত্যহই তাহার মনে হইত, হাতের কাজটা শেষ করিয়া স্বর্ণলতার খোঁজ করিবে, কিন্তু হাতের কাজ কোন দিনই শেষ হয় নাই। শেষে স্বর্ণলতার কথা তাহার মনেও পড়িত না। মানুষ কত সহজে ভোলে! দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক দাবি এত প্রবল, এত অনিবার্য এবং এত সর্বগ্রাসী যে, অতীতকে স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাহারা নিকটে রহিয়াছে, যাহাদের সর্বদা দেখিতেছি, তাহাদেরই সকলকে সর্বতোভাবে মনে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয়। সচেতন মনের পরিসর বড় ক্ষুদ্র, সমভাবে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সেখানে অসম্ভব। স্বর্ণলতার মুখখানা মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল, সেই নিটোল গৌর মুখখানি, প্রদীপ্ত কালো চোখ দুইটি, অধরে অর্ধবিকশিত মৃদু হাসি। নিমীলিত নয়নে মৃন্ময় স্বর্ণলতার মানসমূর্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার

মনে হইল, স্বর্ণলতা যেন মৃদুগুঞ্জনে বলিতেছে, আমাকে খোঁজ নাই বলিয়াই তোমার এই শাস্তি। আমাকে খুঁজিবার জন্যই বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকুরি লইয়াছিলে, কিন্তু হাসি এবং চাকরি—ইহারাই তোমাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিল, আমার জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। এত প্রবঞ্চনা সহিবে কেন? সহসা একটা গানের সুর ও হাসির হল্লা গঙ্গাবক্ষ হইতে ভাসিয়া আসিল। মৃন্ময় চাহিয়া দেখিল, একদল লোক নৌকা-বিহার করিতেছে, সঙ্গে একজন গায়িকা। হার্মোনিয়ম ও ডুগি-তবলা সহযোগে গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

একটু তফাতে একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, ছোকরা একেবারে ব'খে গেল! দেখুন দিকি কাণ্ডখানা, ছি ছি ছি!

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, আপনি চেনেন নাকি?

চিনি না! আমাদেরই পাড়ার রাসু দত্তের মেজ ছেলে বিশু দত্ত। সোনাগাছিতে আজকাল কাপ্তেনি ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখুন দিকি কাণ্ডখানা ছোকরার!

বিশু দত্ত নামটা মৃন্ময়ের চেনা চেনা ঠেকিল। চাকুরিচ্যুত না হইলে এখনই আর একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া মৃন্ময় বিশু দত্তের অনুসরণ করিত। একটা চুরির তদন্ত করিতে করিতে বিশু দত্তের নামটা মৃন্ময়ের কর্ণগোচর হয়। বিশু দত্ত নাকি নিজের সুন্দরী রক্ষিতাকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করিয়া বড় বড় লোককে আকৃষ্ট করে এবং তাহাদিগকে নানাভাবে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাদের আংটি, ঘড়ি, টাকা প্রভৃতি অপহরণ করে। ঠিক নিজ হস্তে করে না, তাহার রক্ষিতাই নাকি তাহার নির্দেশ অনুসারে অপহরণ করে। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্বে এক শূন্য নাচের আসর হইতে পুলিস কর্তৃক সংগৃহীত একটি নর্তকীর পদাঙ্ক লইয়া সে বহু মাথা ঘামাইয়াছিল। উক্ত নর্তকীই নাকি বিশু দত্তের চতুরা প্রণয়িনী, মদ-বিহ্বল এক মাড়োয়ারী-সন্তানের বহুমূল্য একটি হীরক অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়াছিল। মাড়োয়ারীর বন্ধুবর্গ পুলিসে খবর দেন, পুলিস আসিয়া তাহাকে ধরিতে পারে নাই, নর্তকীর

পদার্থটি কেবল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। মৃন্ময়ের মনে পড়িল, তাহার বন্ধু মিস্টার মজুমদার এখনও হয়তো ব্যাপারটা লইয়া তদন্ত করিতেছেন। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে নৌকাবিহারী বিশু দত্তের সন্ধান পাইয়া মৃন্ময় উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন কিন্তু সমস্তই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। সে অসাড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বর্ণলতার মুখচ্ছবি মন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল। মৃন্ময় একমনে বসিয়া গান শুনিতে লাগিল।

১৩

বেলা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কেমন যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না, না শঙ্করবাবু?

কি ক'রে বুঝলেন আপনি?

কি ক'রে, তা বলতে পারব না, কিন্তু ঠিক কি না বলুন? এই নিন, বড় কাপটাই আপনি নিন, এই নিয়ে তিন কাপ হ'ল কিন্তু।

তা হোক। খেতে তো আজ দেরি হবে, কত রাত্তির হবে বলুন দেখি?

এগারোটার কম নয়। একা হাতে সব করতে হবে তো!

আপনার কজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছেন?

বেশি নয়, একজন।

তারপর একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আপনিও চেনেন তাকে।

কে?

চুনচুন।

শঙ্কর বিস্মিত হইল।

আমি যে চুনচুনকে জানি, তা আপনাকে কে বললে?

বেলা স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি সব জানি।

সব জানেন, মানে? আর কি জানেন?

আপনি ওর স্বামীর মৃত্যুকালে শুশ্রূষা করেছিলেন এবং আপনার দশ টাকা যা পাওনা হয়েছিল তা আপনি নেন নি।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইল।

এত খবর আপনি পেলেন কোথা থেকে?

চুনচুনের কাছ থেকেই।

দুই-এক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া বেলা বলিলেন, আপনার ন্যায্য পাওনা দশ টাকা আপনি নিলেন না কেন?

এমনিই।

এমনিই? নিছক এমনিই?

বেলা দেবী ফিক করিয়া হাসিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, কেন নেন নি, তাও আমি জানি।

কি বলুন তো?

বলব না। ইকমিকের আঁচটা ঠিক আছে কি না দেখে আসি। একটু বসুন আপনি।

বেলা পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বেলার আগ্রহাতিশয্যে শঙ্কর মেসের বাসা উঠাইয়া দিয়া বেলার বাসাতেই আসিয়া বাস করিতেছে। দৃষ্টিকটু হইবে বলিয়া শঙ্কর প্রথমে আসিতে চাহে নাই। কিন্তু বেলা কিছুতেই শোনেন নাই। তাঁহার যুক্তি—লোকে কি বলিবে, না বলিবে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে শুরু করিলে মাথাই ঘামিয়া সারা হইয়া যাইবে, আর কিছুই হইবে না। শঙ্কর একদা বিপন্ন বেলাকে আশ্রয় দিয়াছিল, এখন ঘটনাচক্রে শঙ্কর বিপন্ন হইয়াছে, বেলার কি উচিত নয় এখন তাহাকে দুই-চারি দিনের জন্যও আশ্রয় দেওয়া এবং বেলার যখন সে সুবিধা রহিয়াছে? বেলার আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িল, সমাজের নিষ্কর্মাদের দিকটাও তো দেখতে হবে। পরের আচরণের সমালোচনা ক'রেই বেচারারা সময় কাটায়। ওই তাদের মানসিক রোমন্থনের একমাত্র জাবর, তার থেকে

তাদের বঞ্চিত করাটা কি উচিত? আমার তো মনে হয়, ওদের মুখ চেয়েই মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু আচরণ করা কর্তব্য।

একরূপ জোর করিয়াই বেলা শঙ্করকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শঙ্কর আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইতেছে না। বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে। কিন্তু এ কথাও সে মনে মনে বারম্বার স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না যে, ভাগ্যে বেলার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, না হইলে সে কি মুশকিলেই পড়িত! টুইশনি ছাড়িয়া দেওয়াতে প্রফেসর গুপ্ত একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রফেসর গুপ্তের কথাগুলি তাহার কানে বাজিতেছে—আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে বনে যাও। কলকাতা শহরে বাবুয়ানি ক'রে থাকবে, অথচ আত্মসম্মানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলে সইতে পারবে না, তা হয় না। তা ছাড়া, অমন সজারুর মত বিবেক নিয়ে কোথাও কিছু করতে পারবে না তুমি, আজীবন কেবল কষ্ট ভোগ করবে। স্থানকালের উপযোগী নতুন বিবেক তৈরি ক'রে নাও।

সুতরাং টুইশনির জন্য প্রফেসর গুপ্তের নিকট পুনরায় আর যাওয়া চলে না। কিন্তু বেলার কাছেই বা আর কতদিন থাকা চলিবে? কিন্তু বেলা অবশ্য বার বার বলিতেছেন যে, যতদিন না একটা কাজ হয় ততদিন আপনি আমার বাসায় থাকুন। কিন্তু তাহা শঙ্কর পারিবে না। অবিলম্বে যেমন করিয়া হউক তাহাকে বেলার বাসা ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু যে বেলার উপার্জনে ভাগ বসাইতে তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিতেছে তাহা নয়, অন্তর-গুহা-নিবাসী পশুটা বারম্বার প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। শঙ্কর যদিও ইহা সুনিশ্চিত ভাবেই জানে যে, প্রলুব্ধ পশুর কবলে পড়িয়া বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা আর যাহারই থাক্, বেলার নাই। বিধিদত্ত এক অদ্ভুত বর্মে তিনি আবৃত। আক্রমণ করিলে পশুটাই ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, বেলার কিছু হইবে না। সমস্ত জানিয়াও কিন্তু পশুটা প্রলুব্ধ হয়, বরং বেশি করিয়া হয়। সুতরাং এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া হইতে যত শীঘ্র অপসৃত হইয়া পড়িতে পারা যায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু অপসৃত হইবার

কোন পথই শঙ্কর দেখিতে পাইতেছে না। কোথায় যাইবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহাই বা কয়দিন সম্ভব? তাহার বর্তমান তমসাচ্ছন্ন জীবনে বেলা মল্লিকই এখন একমাত্র আলো, যাহার সাহায্যে সে অন্তত খানিকটা পথ অতিবাহন করিতে পারে। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, বেলা মল্লিক শুধু আলো নয়, শিখাও। একটু অসাবধান হইলেই তাহা দহন করে, এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও মন অসাবধান হইবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। মাত্র কয়েকদিন বেলা মল্লিকের সহিত আলাপ করিয়া শঙ্কর ইহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই পলাইবার পথ খুঁজিতেছে। বেলা আশ্রয় দিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্রয় দিবেন না। হাসিতে হাসিতে যে কথাগুলি বেলা আজ সকালে বলিয়াছিলেন, তাহা শঙ্করের মনে পড়িল। শঙ্কর বেলাকে বলিয়াছিল, আর কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না মিস মল্লিক, একটা বিয়ে করুন।

আমি তো এক্ষুনি রাজী, কিন্তু পাত্র কই?

কি রকম পাত্র চাই আপনার?

গোটা এবং সুস্বাদু।

তার মানে?

তার মানে—সুস্বাদু পেয়ারা হ'লেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা গোটা হওয়া চাই। তার আধখানা আর একজন কামড়ে খেয়ে গেছে, সে রকম জিনিস আমার চাই না। কারও উচ্ছিষ্ট জিনিস ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে। তাই ব'লে গোটা নিম, গোটা মাকাল বা গোটা কুমড়োর প্রতিও লোভ নেই আমার।

সে রকম পাত্রের অভাব কি?

বেলা নাসাকুঞ্চিত করিয়া ওষ্ঠভঙ্গীসহকারে উত্তর দিয়াছিলেন, সব ঘুঁটো।

কটা লোক দেখেছেন আপনি?

যে কটা দেখেছি, তাই যথেষ্ট। হাঁড়ির ভাত একটা ছুটো টিপলেই

বোঝা যায়, বাকিগুলোর অবস্থা কি রকম। দেশসুদ্ধ ব্যাটাছেলে হয় হাঁদা, না হয় এঁটো।

হাসিতে হাসিতে প্রসঙ্গটা উঠিয়াছিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু হাসির অন্তরালবর্তী সত্যটা শঙ্কর উপলব্ধি না করিয়া পারে নাই।

ইক্‌মিকের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া বেলা দেবী ফিরিয়া আসিলেন।

বড্ড দেরি হয়ে গেল, নয়? বেগুনগুলো পোড়ালাম, বিরিঞ্চি করব।

এত রকম রান্না আপনি শিখলেন কোথা থেকে?

'পাকপ্রণালী' থেকে।

চুন্‌চুনকে নেমন্তন্ন করেছেন যখন, তখন সব নিরামিষ রান্না করেছেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, চুন্‌চুনের জন্যে ভারি দুঃখ হয় আমার।

বেলা দেবী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, সাবধান, দুঃখ হওয়াটাই কিন্তু প্রথম ধাপ।

তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আমার বরং রাগ হয়। মনে হয়, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনই ফল।

কেন?

ও-রকম বোকার মত লুকিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিল ব'লে।

বাঃ, ভালবেসেছিল, বিয়ে করবে না?

ভালবাসলেই তাকে বিয়ে করতে হবে? বেশ তো যুক্তি আপনার! সত্যি সত্যি যাকে ভালবাসা যায়, তাকে বিয়ে না করাই বরং ভাল, ভালবাসাটা ঘষা পয়সার মত হয়ে যায় না।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আপনি থামুন তো, এসব ব্যাপারে আপনার নিজের যখন কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তখন এ বিষয়ে আপনার কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নই আমি। ওসব কেতাবী কথা আমিও জানি।

অভিজ্ঞতা নেই, আপনি জানলেন কি ক'রে?

আমি জানি।

কিছু জানেন না। কিংবা জেনেও না-জানার ভান করছেন।

উভয়ে উভয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর বলিল, অর্থাৎ, আপনি বলতে চান, আপনি কাউকে ভালবেসেছেন, অথচ তাঁকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠেন নি?

আকুল হয়ে উঠলেও দমন করেছি সে আকুলতা। আমার আকুলতা আমার আত্মসম্মানজ্ঞান আচ্ছন্ন করতে পারে নি কখনও, পারবেও না

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, যে ভালবাসা আত্মসম্মানজ্ঞানকে বিপর্যস্ত ক'রে দিতে না পারে, সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়।

আপনি পুরুষের দিক দিয়ে ভাবছেন, আমি বলছি ভদ্র মেয়ের মনোভাব।

আলোচনা হয়তো আরও কিছুদূর অগ্রসর হইত, কিন্তু দ্বারের বাহিরে একটা মোটর থামিবার শব্দ হওয়াতে আর হইল না।

বেলা দেবী উঠিয়া পড়িলেন।

সায়েবের ওখান থেকে মোটর এল। আপনি বসুন, আমি চট ক'রে ঘুরে আসছি এক্ষুনি।

আজ না গেলে কি হয়?

আর কিছু না, কিছুই বলবেন না; কিন্তু বড় কষ্ট পাবেন। এত অসহায় যদি দেখেন তাঁকে—। আমি যাব আর আসব।

সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছে তা হ'লে বলুন।

হ্যাঁ, ঠিক মা আর ছেলের মত।

হাসিয়া বেলা পাশের ঘরে বেশ পরিবর্তন করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি ততক্ষণ 'ওল্ড্ কিউরিয়সিটি শপ'-খানা পড়ুন। আমি বেশি দেরি করব না। আর ইতিমধ্যে যদি ঢুনঢুন এসে পড়ে, তা হ'লে তো ভালই হবে।

মুচকি হাসিয়া বেলা চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া 'ওল্‌ড্‌ কিউরিয়সিটি শপ'-খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মানসপটে চুন্‌চুনের মুখখানা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। চুন্‌চুনের কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দিল।

১৪

সাড়ে পাঁচ শত টাকার নোটগুলি সযত্নে ভিতরের পকেটে রাখিয়া ভন্‌টু নিবারণবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কি করিয়া নিবারণবাবুকে কথাটা বলিবে, তাহা সহসা তাহার মাথায় আসিল না। বেচারা তাহার সহিত দার্জির বিবাহ দিবেন বলিয়া কত আশা করিয়া বসিয়া আছেন! সহসা এমন করিয়া তাঁহার আশাভঙ্গ করিতে হইবে! নিবারণবাবুর আশাভঙ্গ করিতে ভন্‌টুর হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো! তা ছাড়া, লোকটা দাগী লোক, একবার একটা গুরুতর ঘা খাইয়াছেন। অকারণে আবার একটা আঘাত করা সত্যই অন্যায় হইবে। কিন্তু আঘাত না করিয়া ভন্‌টুর উপায়ও নাই। যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, তাহাই সত্য হইতে চলিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের খামখেয়ালী বাদশাহ হারুন-অল-রশীদের প্রেতাত্মাই সম্ভবত জুলফি-দার বড়বাবুর স্কন্ধে ভর করিয়াছে। তিনি ভন্‌টুকে জামাই না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। ইহার জন্য যত অর্থ লাগে, তাহা তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। এতদিন ধরিয়া তিনি ভন্‌টুর গতিবিধি, চরিত্রবল, কর্মতৎপরতা, কর্তব্যবোধ—সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, কোনরূপ বাধাকেই তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে চান না। বাধার যতগুলি ঐরাবত ভন্‌টু খাড়া করিয়াছিল, জুলফি-দারের উৎসাহস্রোতে সমস্তগুলিই ভাসিয়া

গিয়াছে। বিবাহ-সম্পর্কে ভন্টুর সঙ্গত অসঙ্গত যতগুলি দাবি ছিল, সমস্তই তিনি মিটাইয়া দিতে প্রস্তুত। অসঙ্গত দাবিগুলি শুনিয়া জুলফি-দার বরং অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এগুলির দ্বারা ভন্টুর চরিত্রের মহত্তর দিকটাই নাকি তাঁহার নিকট আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভন্টু বড়বাবুকে বলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার কন্যাকে যত টাকার অলঙ্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে টাকার দ্বারা যেন ঠিক এক ধরনের দুই সেট গহনা গড়ানো হয়। কারণ বড়লোকের মেয়ে এক-গা গহনা পরিয়া আসিবে এবং তাহার বউদিদি—গুড় ওল্ড্ বিড্ডিকার—নিরাভরণা হইয়া থাকিবেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। সংসারের জন্যই বউদিদির গহনাগুলি একে একে গিয়াছে, বউদিদির গহনা আগে না হইলে সে কোন ক্রমেই পূর্ণালঙ্কৃতা বধূ ঘরে আনিতে পারিবে না। বড়বাবু এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইয়াছেন। ভন্টুর দ্বিতীয় প্রস্তাব—বিবাহরূপ দায়িত্ব লইবার পূর্বে সে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা লাইফ ইন্সিওরেন্স করিতে চায়, কিন্তু এখন তাহার যাহা বেতন, তাহার দ্বারা সে প্রিমিয়ম চালাইতে পারিবে না। বড়বাবু প্রিমিয়ম চালাইতে রাজী হইয়াছেন। বড়বাবুর ভাষায়—মানি ইজ নো কোশ্চেন—তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার জন্য একটি সৎপাত্র চান। তিনি ইচ্ছা করিলে মেয়েকে বড়লোকের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন; মেয়েটি সুশ্রী, তাঁহার টাকাও আছে। কিন্তু তিনি বড়লোকের ঘরের বয়াটে অকর্মণ্য পাত্রের হাতে মেয়েকে দিতে চান না। তিনি চান গরিবের ঘরের সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, কর্মঠ একটি যুবক এবং ভন্টুর মধ্যে তাহা তিনি পাইয়াছেন। টাকার জন্য তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আপিসের বড়বাবু শ্বশুর হইলে অনিবার্যভাবে চাকরিরও উন্নতি হইবে। তাহার প্রমোশনের জন্য বড়বাবু ইতিমধ্যে রেকমেণ্ড করিয়াছেন। মেয়েটিও দেখিতে ভাল, কুষ্ঠিতেও নাকি রাজ-যোটক হইয়াছে। এতগুলি প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিবারণবাবুর কালো মেয়েকে বিবাহ করিবে এতবড় আদর্শবাদী ভন্টু নয়। নিজের সুবিধার জন্যই সে দার্জিকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল, এখন অধিকতর সুবিধার খাতিরে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে

মোটেই কুণ্ঠিত নয়। বড়বাবুকে নিবারণবাবু-ঘটিত সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় বড়বাবু তৎক্ষণাৎ তাহাকে নগদ সাড়ে পাঁচ শত টাকা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন টাকাটা অবিলম্বে নিবারণবাবুকে ফেরত দিয়া আসিতে। কথাটা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। একটা অজুহাত তো খাড়া করিতে হইবে!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ভন্টু শেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, আজই সে নিবারণবাবুকে টাকাটা দিবে না। আজ দার্জির কুষ্ঠিটা চাহিয়া আনিবে এবং পরদিন গিয়া বলিবে যে, কুষ্ঠির মিল হইল না। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না। তাহার পর টাকাটা ফেরত দিলে দেখিতে শুনিতে সব দিক দিয়াই ভদ্র হইবে। সব ক্ষেত্রে সরল সত্য কথা বলিলে কি চলে?

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে এবং অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে। ভন্টু যখন নিবারণবাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল, তখন নিবারণবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দার্জিই সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিল এবং বাহিরের ঘরটা খুলিয়া ভন্টুকে বসিতে বলিল। ভন্টু দার্জিকে সামনাসামনি দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। দার্জি অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াইল না, বাহিরের ঘরটা খুলিয়া দিয়াই চলিয়া গেল। ভন্টু বসিয়া রহিল। পাশের বাড়ির ছাদে একজন প্রৌঢ়া বিধবা বড়ি দিতেছিলেন এবং আপন মনেই কাহার উদ্দেশ্যে কি যেন বলিতেছিলেন, ভন্টু অন্যমনস্ক হইয়া তাহাই শুনিতেছিল। দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া ভন্টু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দার্জি সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কি?

যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি বল?

দার্জি কিছুক্ষণ আনতচক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমার ইচ্ছে নয় যে, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে ভন্টু কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল,

কয়েক মুহূর্ত তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিস্মিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, ইচ্ছে নেই কেন?

দুই চক্ষুর দৃষ্টি ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া দার্জি মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আপনি আমাকে বিয়ে করছেন খালি টাকার জন্যে।

ভন্টু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দার্জিই পুনরায় বলিল, তা ছাড়া আমি ভিন্ন বাবাকে দেখবার এখন কেউ নেই। আপনি দয়া ক'রে ভেঙে দিন বিয়েটা। আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।

আর কিছু না বলিয়া দার্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

ভন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ রকম ঘটনা যে বঙ্গদেশে ঘটিতে পারে, তাহা ভন্টুর কল্পনাতীত ছিল। একটু পরেই নিবারণবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিতেই ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অসঙ্কোচে তাঁহার হাতে টাকাগুলি দিয়া বলিল, মাপ করবেন নিবারণবাবু, বাবা বউদি—কেউ মত দিচ্ছেন না।

নিবারণবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন।

সে কি? মানে—

কিছুতেই মত হচ্ছে না, কি করি বলুন?

আমি একবার গিয়ে যদি—

না, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

নোটের তাড়া হাতে করিয়া নিবারণবাবু বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১৫

মুকুজ্জেমশাই নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া তিনি মৃন্ময়

এবং শঙ্করের জন্য চাকরির চেষ্টা করিতেছিলেন। একরূপ জোর করিয়াই তিনি হাসিকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া মৃন্ময়কে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। শঙ্করের কিন্তু কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছিলেন না। শিরীষবাবু তাহাকে যে ঠিকানা দিয়াছিলেন, তাহা একটি মেসের ঠিকানা। মুকুজ্জেমশাই সেখানে গিয়া শঙ্করের দেখা পান নাই; কয়েক দিন পূর্বেই নাকি শঙ্কর সে বাসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। হয়তো শঙ্কর শিরীষবাবুকে তাহার নূতন ঠিকানা জানাইয়াছে—এই আশায় মুকুজ্জেমশাই শিরীষবাবুকে পুনরায় পত্র দিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত জবাব আসে নাই। মৃন্ময়কে লইয়া পরিচিত অপরিচিত নানা ব্যক্তির ও আপিসের দ্বারে মুকুজ্জেমশাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অমিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে মুকুজ্জেমশাই যেমন একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, এই চাকুরি অনুসন্ধানেও তিনি ঠিক তাহাই করিতেছেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইংরেজী বাংলা কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকা কেনা হয়। মৃন্ময় অথবা শঙ্করের উপযুক্ত যেখানে যত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখেন সর্বত্রই একটি করিয়া দরখাস্ত পেশ করিয়া দেন। কর্তৃপক্ষ কলিকাতায় থাকিলে নিজে গিয়া অথবা মৃন্ময়কে পাঠাইয়া তদ্বির করেন। এ পর্যন্ত তিনি কুড়ি জায়গায় দরখাস্ত করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, কিন্তু দমেন নাই। মৃন্ময় দমিয়া গেলে হাসিয়া বলিয়াছেন, ছেলেবেলার সেই কবিতাটা ভুলে গেলে—'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ'? দমে গেলে চলবে কেন? চেষ্টা থাকলে ঠিক একটা না একটা কিছু লেগে যাবেই, দেখ না তুমি।—বলেন আর হাসেন। মৃন্ময় লজ্জিত হইয়া পড়ে।

সেদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে মৃন্ময় বাসায় একা ছিল। মুকুজ্জেমশাই একবিংশ দরখাস্তটির তদ্বির করিতে স্বয়ং বাহির হইয়াছিলেন। মৃন্ময় একা শুইয়া শুইয়া নিজের ছন্নছাড়া জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। বাল্যকালে, পিতা-মাতা মারা গিয়াছেন, দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের যৎসামান্য সাহায্যে এবং প্রাইভেট

টুইশনি করিয়া বহুকষ্টে সে এম. এ. পাস করিয়াছে। নিজে পছন্দ করিয়া স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিয়াছিল এবং এই বিবাহের জন্যই দূর-সম্পর্কের সেই আত্মীয়টির সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটে। আত্মীয়টির ইচ্ছা ছিল, বিবাহ-বাজারে মৃন্ময়কে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন করিবেন। কিন্তু আদর্শবাদী মৃন্ময় তাহা ঘটিতে দেয় নাই। সে নিজে পছন্দ করিয়া দরিদ্রের কন্যা স্বর্ণলতাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছিল এবং অনেক আশা করিয়া এই কলিকাতা শহরেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়াছিল। অতিশয় আকস্মিক-ভাবে তাহার সে সংসার ছারখার হইয়া গেল। মনের আবেগে তখন মূর্খের মতন সে কি অদ্ভুত কাণ্ডটাই করিয়া বসিল! স্বর্ণলতাকে খুঁজিবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকরি লইল। একবার ভাবিল না যে, পুনরায় বিবাহ করা মানেই—স্বর্ণলতাকে অপমান করা, তাহার স্মৃতির সম্মুখে একটা যবনিকা টাঙাইয়া দেওয়া। স্বর্ণলতার সদ্যবিরহে সে ভাবিয়াছিল যে, হাসিকে অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু উন্মেষিত-যৌবনা অনুরাগিণী পত্নীর সুনিবিড় সান্নিধ্যকে ঔদাসীন্যভরে পাশ কাটাইয়া যাওয়া কি এতই সহজ! তিলে তিলে ক্ষণে ক্ষণে অনিবার্যভাবে হাসি মৃন্ময়ের মনে আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। স্বর্ণলতার কথা এখন জোর করিয়া মনে করিতে হয়। তাহার স্মৃতিকে সজীব রাখিবার জন্য প্রথম প্রথম সে প্রতিদিন তাহাকে পত্র লিখিত। কিন্তু তাহাও ক্রমশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সহসা মৃন্ময় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। স্বর্ণলতার পত্রগুলি সে যে চন্দনকাঠের বাক্সটাতে রাখিত, সে বাক্সটা তো হাসির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ের গরম জামা কাপড় যে ট্রাঙ্কটাতে থাকিত, সেই ট্রাঙ্কটাতেই চন্দনকাঠের বাক্সটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে ট্রাঙ্কটা তো হাসি লইয়া গিয়াছে। এতদিন সে ট্রাঙ্কের চাবি মৃন্ময়ের কাছে থাকিত, যাইবার সময় হাসি চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দনের বাক্সটার কথা মৃন্ময়ের মনেই ছিল না। স্বর্ণলতার কথা হাসি কিছুই জানে না। হাসি এখন বেশ লিখিতে পড়িতেও শিখিয়াছে, সে যদি চিঠিগুলা পড়ে... মৃন্ময় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মৃন্ময়বাবু বাড়ি আছেন নাকি ?

আছি, আসুন।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া মৃন্ময় বুঝিল, পাশের বাড়ির এম. এ.-পরীক্ষার্থী বিকাশবাবু আসিয়াছেন। ভদ্রলোক এবার ফিলজফিতে এম. এ. পরীক্ষা দিতেছেন। মৃন্ময়ও ফিলজফিতে এম. এ. শুনিয়া বিকাশবাবু মৃন্ময়ের নিকট সাহায্য লইবার জন্য মাঝে মাঝে আসেন। কাল মৃন্ময় বাড়ি ছিল না, বিকাশবাবু আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন—মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট মৃন্ময় তাহা শুনিয়াছিল। মৃন্ময় উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

বিকাশবাবু আসিয়াই বলিলেন, মুকুজ্জেমশাই কোথায় ?

তিনি বেরিয়েছেন।

হি ইজ এ ওয়াণ্ডারফুল ম্যান। অদ্ভুত লোক মশাই, কাল আপনি বাড়ি ছিলেন না, আমি একটু হতাশ হয়েই ফিরছিলুম; মুকুজ্জেমশাই বললেন, পরীক্ষা নাকি কাল থেকে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, মৃন্ময়বাবুকে আজ একবার পেলে ভাল হ'ত। মুকুজ্জেমশাই আমাকে তখন কয়েকটা কোশ্চেন সাজেস্ট্ ক'রে দিলেন, বললেন, এগুলো ভাল ক'রে দেখে যেও, পড়তে পারে। আমি তো প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলুম, মুকুজ্জেমশাই যে এম. এ.-র ফিলজফির কোশ্চেন সাজেস্ট্ করতে পারেন, তা আমার ধারণারই বাইরে ছিল। যাই হোক, বললেন যখন, দেখে গেলুম। আমাদের অবস্থা তো বোঝেন—ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস অ্যাট এ স্ট্র। গিয়ে দেখি, ঠিক পড়েছে মশাই। উনিও নিশ্চয় এম. এ., নয় ? কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই।

মৃন্ময়ও বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, আমি ঠিক জানি না, উনি নিজের কোন পরিচয় কাউকে দেন না।

ফিরবেন কখন ?

ঠিক বলতে পারি না। এলে খবর দেব আপনাকে।

দেবেন তো কাইণ্ডলি, নেক্সট্ পেপারটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব।

আচ্ছা।

বিকাশবাবু চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের নূতন পরিচয় পাইয়া মৃন্ময় যদিও বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বিস্ময় তাহার মনকে এখন ততটা অধিকার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত মন একটি মাত্র চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, হাসির হাতে যদি স্বর্ণলতার চিঠিগুলি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?

১৬

শৈলর দিন কাটিতেছিল, কারণ সময়ের গতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অমোঘ নিয়মে সূর্য উঠে এবং অস্ত যায়, মানবের সুখদুঃখে দিশাহারা হইয়া এক মুহূর্তের জন্যও শ্লথগতি হয় না। বড় অফিসার মিস্টার এল. কে. ঘোসের পত্নী শৈলবালারও জীবনের দিনগুলি একে একে আসিতেছিল এবং যাইতেছিল। শৈল সুখী ছিল না। শৈল সুখী ছিল কি না—এ প্রশ্নও কাহারও মনে উদিত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুখের উপকরণ হিসাবে যে সব জিনিস আহরণ করিবার জন্য আমরা প্রলুব্ধ হই, যাহার জন্য নিজেকে ক্লিষ্ট করি, অপরকে বঞ্চিত করি, মনুষ্যত্বকে খর্ব করি—সুখের সে উপকরণগুলির অভাব শৈলর ছিল না। শৈল বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের পত্নী। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, গহনা কিছুরই অভাব নাই। স্বামী রূপবান পদস্থ ব্যক্তি। শৈলর সহিত তিনি কোন দুর্ব্যবহার করেনই না, বরং শৈলর সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে স্বামীর নৈতিক কর্তব্যবোধ মিস্টার এল. কে. বোসের একটু বেশি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বাড়িতে ঠাকুর চাকর দাই বাবুর্চি বেয়ারা গিজগিজ করিতেছে, শৈলকে গান-বাজনা এবং ইংরেজী শিখাইবার জন্য মিস মল্লিককে বাহাল করিয়াছেন, শৈলর নিজের ব্যবহারের জন্য আলাদা একখানা মোটরও তিনি সেদিন তাহার জন্মদিনে তাহাকে উপহার দিয়াছেন। শৈল তথাপি সুখী নয়। তাহার কারণ, অন্তরের

অন্তরতম প্রদেশে যে উৎস উৎসারিত হইলে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ সুখী হয়, শৈলর অন্তরে সে উৎস ছিল না। শৈল স্বামীকে প্রিয়তম করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। শৈল স্বামীকে ভয় করে, তাঁহার নানাবিধ গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হয়, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না। মিস্টার বোসের কর্মব্যস্ত জীবন ঘড়ির কাঁটা অনুসারে নিয়মিত। তিনি নিক্তির ওজনে কর্তব্য করেন, চুল চিরিয়া বিচার করেন, ওজন করিয়া কথা বলেন। চাকরির উন্নতিই তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান, উপরওয়ালা সাহেবদের বিষয়ই তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্থান তাঁহার জীবনে নাই। যতটুকু আছে, তাহা সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য। ঝকঝকে বাঁধানো কতকগুলি মূল্যবান সংস্করণের নামজাদা পুস্তক দামী আলমারিতে সাজানো আছে, প্রতি ঘরের দেওয়ালে সুন্দর ফ্রেমে প্রসিদ্ধ কয়েকখানি ছবিও ঝুলিতেছে। বাড়িতে গ্রামোফোন আছে; পত্নীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আছে ; রেডিওর চলন তখন ছিল না, থাকিলেও লেটেস্ট মডেল নিশ্চয় মিস্টার বোসের গৃহ অলঙ্কৃত করিত। কিন্তু মিস্টার বোসের অন্তরে ইহাদের কোন শ্রদ্ধার স্থান নাই; মনে মনে তিনি এসব কবিত্ব-টবিত্বকে অনুকম্পার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। শৈলর সহিত মাঝে মাঝে ইহা লইয়া আলোচনা হয়। মিস্টার বোসের ভাষায়—এ সমস্ত ওয়ার্থলেস অকর্মণ্য লোকদের উপজীব্য ; পৃথিবীতে যাহারা কাজের লোক, তাহাদের ওসব লইয়া মাতামাতি করিবার অবসর কই? সুতরাং শৈলর নূতন-শেখা সুরটা শুনিয়া মুগ্ধ হইবার, নূতন প্যাটার্নের সেলাইটা দেখিয়া তারিফ করিবার অথবা নূতন শোনা নাটকটার কাহিনী ধৈর্যভরে শুনিবার ইচ্ছা মিস্টার বোসের নাই, ইচ্ছা নাই বলিয়া অবকাশও নাই। তিনি নিখুঁত কর্মতৎপরতার সহিত নিজের নিখুঁত কর্মজীবন যাপন করিয়া চলিয়াছেন। নিম্নতম কর্মচারীরা সকলে জানে, বোস সায়েব ভারি স্ট্রিক্ট্ লোক, কোন কিছুরই বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না।

শৈল মাঝে মাঝে ভাবে, তাহার স্বামী যদি একটু কম নিখুঁত হইত, একটু কম বুদ্ধিমান হইত, একটু কম মাহিনার চাকরি করিত, তাহা হইলে হয়তো সে সুখী হইত। এমন প্রবল রকম নিখুঁত লোককে ভয় করা চলে, শ্রদ্ধা করা চলে, ভালবাসা যায় না।

শৈলর মাঝে মাঝে শঙ্করদার কথা মনে পড়ে। বাল্যকালে শঙ্করদা তাহার সঙ্গী ছিল, তাহার অসঙ্গত মান ভাঙাইবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিত! শঙ্করদা আজকাল আর আসে না। কেনই বা আসিবে? বিবাহ হইয়াছে, নূতন বউ লইয়া সে হয়তো আনন্দেই আছে। মিস মল্লিকের সহিত শঙ্করদার মাঝে মাঝে নাকি দেখা হয়! মিস মল্লিককে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলে শঙ্করদা নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু ডাকিয়া পাঠাইতে লজ্জা করে, ভয়ও হয়।

১৭

সকালের টুইশনি সারিয়া বেলা দেবী এগারোটা নাগাদ বাসায় ফিরিলেন। স্নানাহার করিয়া আবার বাহির হইতে হইবে। দুপুরে আরও গোটা-দুই টুইশনি আছে। মেয়েদের গানের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে বেলা মল্লিকের পসার বেশ জমিয়া গিয়াছে। প্রথমত মেয়েদের গান শিখাইবার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারী শিক্ষকেরই বেশি চাহিদা, দ্বিতীয়ত বেলার শুধু রূপ নয়—গুণও আছে। গান-বাজনায় বেশ দখল হইয়াছে, হারমোনিয়ম, সেতার, এস্রাজ, পিয়ানো—এই চারিটি যন্ত্র খুব ভালভাবে বাজাইতে পারেন এবং ছাত্রীদের খুব যত্নসহকারে শিখাইয়া থাকেন। বেতনও যে খুব অসম্ভব রকম বেশি তাহা নয়, সুতরাং গীত-বাদ্য-জিজ্ঞাসু ছাত্রীমহলে বেলা দেবীর চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমন কি সময়ের অভাবে আজকাল অনেক ছাত্রীকে ফিরাইয়া দিতেও হইতেছে। দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়া প্রথমে তিনি অকূল পাথারে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সত্য

সত্যই নিজের পায়ে সমর্থভাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। দাদার প্রতি মনোভাবও অনেকটা কোমল হইয়া আসিয়াছে। হয়তো আর কিছুদিন পরে দাদার নিকট তিনি ফিরিয়াও যাইতেন। মনের ভিতর এই যুক্তিটা ক্রমশ অঙ্কুরিত হইতেছিল—এখন আর ফিরিয়া যাইতে আপত্তি কি, এখন তো আমি সত্য সত্যই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দাদার অর্থ অথবা অনুগ্রহের উপর আর তো নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। অন্য সব টুইশনি ছাড়িয়া দিলেও ওই বৃদ্ধ সাহেবটি যাহা দেন, তাহাতেই তাহার একার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল। বেলা দেবী ফিরিয়া আসিয়াই একখানি পত্র পাইলেন—প্রিয়নাথ মল্লিকের পত্র। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পড়িলেন, সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিতেছেন—

বেলা,

এতদিন পরে বুঝিলাম, কেন তুমি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলে এবং এতদিন পরে তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ভ্রান্ত ধারণাও অপনোদিত হইয়া গেল। এতদিন তোমাকে আমি পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়েদের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলিয়া ছোট করিয়া দেখিতে পারি নাই। তোমার স্বাধীনভাবে থাকিবার অসামাজিক ইচ্ছাকে তোমার খামখেয়ালী জেদী প্রকৃতিরই স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তুমিও পুরুষ-সঙ্গ-লোলুপ সাধারণ মেয়ে, শাসনের গণ্ডি ডিঙাইয়া স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা করিতে চাও। শঙ্করবাবু নামক ব্যক্তিটি যে তোমার প্রণয়ী, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন তোমার আচরণে তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি আশ্চর্য হইয়া কেবল ভাবিতেছি, তোমার সামাজিক জ্ঞান কি একেবারে লোপ পাইয়াছে! লোকটাকে প্রকাশ্যভাবে ঘরে স্থান দিয়াছ! তোমাকে এখনও অনুরোধ করিতেছি, এখনও তুমি যদি ভালভাবে থাকিতে

চাও, আমার কাছে ফিরিয়া এস। ইহাই আমার শেষ অনুরোধ জানিবে।

ইতি—তোমার দাদা

প্রিয়নাথ মল্লিক

বেলা পত্রখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দাদার নিকট ফিরিয়া যাইবার যে ইচ্ছাটি মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহা মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল। শঙ্করকে প্রকাশ্যভাবে বাড়িতে স্থান দেওয়ায় ক্ষুব্ধ জনার্দন সিংহও চাকরিতে জবাব দিয়া গিয়াছে। এই পত্রখানি বেলাকে দ্বিতীয়বার আঘাত করিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় আঘাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক্, বেলা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। শঙ্করবাবুর যতদিন না কোথাও চাকরি হইতেছে, ততদিন বেলা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিবেন না, ইহাতে যে-ই যাহা বলুক না কেন!

বেলা দেবী পাশের ঘরে গেলেন। ইকমিক কুকারটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, একটু গরম আছে, একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া লইতে হইবে, শঙ্করবাবু হয়তো এখনই আসিয়া পড়িবেন। তেলের শিশিটা এবং সাবানের কৌটা লইয়া বেলা বাথ-রুমে গেলেন। বাথ-রুমের ভিতর যে তৃতীয় আঘাত উদ্যত হইয়া ছিল, তাহা বেলা প্রত্যাশা করেন নাই। বাথ-রুমের জানালা গলাইয়া কে একটা প্রকাণ্ড খাম মেঝের উপর ফেলিয়া গিয়াছে। জনার্দন সিং নাই, সুতরাং ও-পাশের ছোট দেওয়ালটা অতিক্রম করিয়াই কেহ নিশ্চয়ই আসিয়াছিল এবং জানালা গলাইয়া ইহা রাখিয়া গিয়াছে। বিস্মিত বেলা দেবী খামটা তুলিয়া লইলেন। বেশ মোটা লম্বা খাম। খাম খুলিয়া বেলা দেবীর সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত হইয়া গেল। খামের ভিতর অতিশয় অশ্লীল ছবি এবং ততোধিক অশ্লীল একটা চিঠি। চিঠিটা দরখাস্তের আকারে লেখা, নীচে আট-দশজনের নাম। প্রণয়ী-হিসাবে ইহারা সকলেই যে শঙ্করের অপেক্ষা বেশি যোগ্য, তাহাই অতি অশ্লীল ভাষায় বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ

করিয়াছে। বেলা কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর খামখানা লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহা স্পিরিটে ভিজাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলেন। খামখানা যখন নিঃশেষে পুড়িয়া গেল, তখন আবার তিনি বাথ-রূমে ফিরিয়া গেলেন।

একটু পরেই শঙ্কর আসিয়া পড়িল। সঙ্গে চুন্‌চুন। চুন্‌চুনকে দেখিয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ও, তাই এত দেরি! আমি ভাবছিলাম, শঙ্করবাবু চাকরির সন্ধানে বুঝি বিবাগীই বা হয়ে গেলেন! চুন্‌চুনের সঙ্গে কোথায় দেখা?

শঙ্কর বলিল, আমিই ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

বেলা চুন্‌চুনের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোরা সার্ভিস সিকিওরিং বিউরো খুলেছিস নাকি?

চুন্‌চুনের মুখ বিষণ্ণ, তবু এই কথাগুলি শুনিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, না, শঙ্করবাবু গিয়েছিলেন প্রকাশবাবুর খোঁজে।

প্রকাশবাবুর খোঁজে কেন?

শঙ্কর বলিল, প্রকাশবাবু আমার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন। তাঁর জানা-শোনা একটা প্রেসে প্রুফ-রীডারের একটা কাজ নাকি খালি আছে।

কত মাইনে?

প্রকাশবাবুর দেখাই পেলাম না। চুন্‌চুনের দিদির সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি সব শুনে দয়ার্দ্র হলেন, বললেন, যতদিন আপনার কোন কাজ না হয়, ততদিন না হয় আমার ছেলে দুটিকে পড়ান আর আমাদের বাড়িতে থাকুন।

বেলা দেবী অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া একটু হাসিলেন।—আপনি রাজী হয়ে এসেছেন তো?

না হয়ে উপায় কি ?

একটু থামিয়া শঙ্কর আবার বলিল, এনি পোর্ট ইন দি স্টর্ম্। আপনার দাক্ষিণ্যে আর কত দিন বাস করা যায় বলুন ?

বেলা ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সংবাদে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য শঙ্করের এই আকুলতায় তাঁহার মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তবু তিনি হাসিয়া বলিলেন, বেশ করেছেন। এখন চলুন খাওয়া যাক, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চুন্‌চুন, তুই খেয়ে এসেছিস তো ?

চুন্‌চুন বলিল, হ্যাঁ।

তিনজনে খাইবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

১৮

বাবাজী ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী কুমারিকা অন্তরীপে বেশিদিন বাস করিতে পারিলেন না। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবদুপাসনা করিবার পক্ষে স্থানটি উপযোগী হইলেও বাবাজী একটি মহা অসুবিধায় পড়িলেন। মনের মত তেমন কোন বাঙালী কাছে-পিঠে নাই। একেবারে বাঙালী-বর্জিত স্থানে কি থাকা যায় ? শুধু সমুদ্র দেখিয়া মন ভরে না। কাছাকাছি কথা বলিবার মত একজনও লোক না থাকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে যে ! সেখানকার ভাষা বাবাজীর পক্ষে দুর্বোধ্য, ইংরেজী ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দী বলিয়া কতদিন চালানো যায় ? তা ছাড়া, আর একটা কথাও বাবাজীর বার বার মনে হইতে লাগিল। স্বদেশ হইতে এতদূরে আসিয়া বসবাস করাটা কি ঠিক ? হাজার হোক স্বদেশ। আত্মীয়স্বজনও আছে ; ভন্‌টুও আছে, তা ছাড়া ঠাকুরও ওই দেশেই থাকেন—সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদূরে থাকিতে মুক্তানন্দ স্বামীর অন্তরাত্মা রাজী হইল না। দেশের কাছাকাছি নির্জন স্থান দুর্লভ নয়। গঙ্গার ধারে অমন ঢের জায়গা পড়িয়া আছে এই গঙ্গা-হীন বিদেশ-বিভুঁয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সংসারের

জালে অবশ্য তিনি নিজেকে জড়াইবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া এখানে পড়িয়া থাকিবারও প্রয়োজন নাই। আর একটা কথা, টাকাও ফুরাইয়া আসিতেছিল। অর্থাভাবে পড়িলে এই অচেনা অজানা জায়গায় কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? নিজের অতবড় বিষয়টা বাধা দিয়া বন্ধুর নিকট হইতে তিনি মাত্র পাঁচ শত টাকা আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিন শত টাকা শেষ হইয়া গিয়াছিল। আরও টাকা পাঠাইবার জন্য বন্ধুকে পত্র দিয়াছিলেন, কোন উত্তর আসে নাই; এ বিষয়েও উদাসীন থাকা তাঁহার উচিত বলিয়া মনে হইল না। ভন্টুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে। ভন্টু লিখিয়াছে যে, সে মেজকাকার বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে চাহে না। মেজকাকার বিষয়ের ব্যবস্থা মেজকাকা নিজেই করুন। বাবাজীর মনে হইল, চিঠিতে অভিমানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। হইবেই না বা কেন! হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো। এই বয়সেই সমস্ত সংসারের বোঝাটা তাহার উপর পড়িয়াছে। বিষ্টুটা এক পাল ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়া তুচ্ছ একটা অসুখের ছুতায় দিব্য সমুদ্রের ধারে গিয়া বায়ু সেবন করিতেছে। ভন্টুর অগ্রজ বিষ্ণুবাবুর প্রতি পুরাতন ক্রোধ বাবাজীর অন্তরে নূতন করিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক চিন্তা করিয়া তিনি ঠিক করিয়া ফেলিলেন, কুমারিকায় আর থাকা চলিবে না। তল্পিতল্পা গুটাইয়া তিনি স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৯

মোটরের দালাল অচিনবাবুর অদম্য অনুসন্ধিৎসার ফলেই একদিন প্রিয়নাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বেলাকে কিছুতেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়া অচিনবাবু অবশেষে প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং হিতৈষীর ছদ্মবেশে তাঁহার চরিত্র পর্যবেক্ষণ

করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের সহিত আলাপ করিয়া অচিনবাবু বুঝিয়াছিলেন যে, ভগ্নীর উপর বিরূপ হইলেও প্রিয়নাথ ভগ্নীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য এখনও সমুৎসুক। এই ঔৎসুক্যকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার বাসনায় অচিনবাবু প্রিয়নাথের বিরক্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে শুরু করিলেন। প্রতিদিন আসিয়া প্রিয়নাথকে বেলার গতিবিধির অতিরঞ্জিত নানা কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। বেলার বাসায় শঙ্করের অভ্যাগমে তাঁহার আরও সুবিধা হইয়া গেল, বেলা যে সত্য সত্যই কি ভাবে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, তাহা উদাহরণ-সম্বলিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ তিনি পাইলেন। এমন কি মোটরে চড়াইয়া একদিন রাত্রে তিনি প্রিয়নাথ মল্লিককে বেলার-বাসায়-প্রবেশোন্মুখ শঙ্করকে দেখাইয়া পর্যন্ত দিলেন। স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া প্রিয়নাথের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তখনি মোটর হইতে নামিয়া তিনি একটা অনর্থ সৃষ্টি করিতেন, অচিনবাবু অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরদিন প্রিয়বাবু বেলাকে যে পত্রাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা অচিনবাবু জানিতেন না। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

আপনি চিঠি লিখে দিয়েছেন?

নিশ্চয়।

কি লিখলেন?

সোজা সত্য কথা, লিখে দিলাম—তোমার স্বাধীনতার মর্ম সব বুঝতে পেরেছি, ভাল চাও তো এখনও ফিরে এস।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হাস্যময় হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, অত সোজায় আসবেন না তিনি।

প্রিয়নাথ মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একদৃষ্টে অচিনবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ঈজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া শুইয়া ছিলেন, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

আমার কি ইচ্ছে করছে জানেন?

অচিনবাবুর মুখে এতটুকু হাসি নাই, কেবল চোখ দুইটি হাসিতেছে।

কি বলুন?

ইচ্ছে করছে, চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে ওকে এখানে নিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ ক'রে আটকে রেখে দিই।

অচিনবাবুর চোখের হাসি মুহূর্তে প্রখর হইয়া উঠিল। একটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়া চক্ষুর দৃষ্টি যেন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টির প্রাখর্য কণ্ঠস্বরে সংক্রামিত হইল না। অতিশয় ধীরভাবে যেন একটা নিঃসংশয় মত তিনি ব্যক্ত করিতেছেন এমনভাবে বলিলেন, মিস মল্লিককে যদি আনতে চান, জোর ক'রেই আনতে হবে। কেবল মুখের কথায় তিনি আসবেন না।

প্রিয়নাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার খানিকক্ষণ অচিনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, ভাবছেন কি?

ভাবছি, সত্যাই কি জোর ক'রে ওকে আনা যায় না কোন রকমে?

তা যাবে না কেন? তবে একটু রিস্কি ব্যাপার।

তাহার পরই অচিনবাবু বানাইয়া একটি গল্প বলিলেন। যশোরে একবার নাকি এক স্বামীগৃহবিমুখা বধূকে তিনি জোর করিয়া মোটরে তুলিয়া স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং সে ক্রমশ নাকি পোষ মানিয়াছিল।

একে আনতে পারেন আপনি?

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি চকচক করিতে লাগিল। এই প্রশ্নটির জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে আমার সঙ্গে। কারণ পুলিস-কেস হ'লে আমি একা হাঙ্গামায় পড়তে চাই না। আপনি হলেন ওর ন্যাচারাল গার্জেন, এ রকম জোরজবরদস্তি করবার খানিকটা অধিকার আছে আপনার।

নিশ্চয়ই আছে। পুলিসকে সব কথা খুলে বললে—দে উইল সি মাই পয়েণ্ট। এ তো মগের মুলুক নয়, ব্রিটিশ রাজত্ব।

অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি পুনরায় হাস্যময় হইয়া উঠিল। প্রিয়নাথ আবার কিছুক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি যদি বন্দোবস্ত করতে পারেন, করুন। চোখের সামনে বোনটাকে এমনভাবে উচ্ছন্ন যেতে দিতে পারি না। পুলিস-কেস হয় হোক, কুচ পরোয়া নেই, আই শ্যাল রিস্‌ক্ ইট।

আচ্ছা, ভেবে দেখি।

অচিনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার ভাবিয়া দেখিবার বেশি কিছু ছিল না। এই সম্ভাবনাটা মনে উদিত হইবামাত্র বিদ্যুৎগতিতে তিনি সমস্তটা ভাবিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রিয়নাথের অজুহাতে এবং প্রিয়নাথকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া বেলাকে জোর করিয়া কি ভাবে অপহরণ করা সম্ভব, তাহা অচিনবাবু অবিলম্বে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। গোলমালে প্রিয়নাথকে ফাঁকি দিয়া কি করিয়া বেলাকে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা যাইবে, এই অংশটুকু এখনও তাঁহার ভাবা হয় নাই। এই অংশটুকু পরিপাটীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। পরিপাটীরূপে চিন্তা না করিয়া অচিনবাবু ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই জাতীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে অচিনবাবু অঙ্কের মত সমস্ত জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কষিয়া লইয়া তবে কার্য আরম্ভ করেন। মনে মনে সমস্ত জটিলতার সমাধান করিয়া এবং পূর্বাহ্নেই তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তবে অচিনবাবু কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই অংশটুকুর সমাধানও যে তিনি সুচারুরূপে করিতে পারিবেন, সে বিশ্বাস তাঁহার আছে। তাহার পর, অর্থাৎ বেলা দেবীকে একবার আয়ত্তাধীনে পাইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। অচিনবাবুর ধারণা, মেয়েমানুষ অনেকটা বুনো জানোয়ারের মত। সহজে ধরা দেয় না, ধরা দিলেও প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু কিছুদিন খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্রমশ পোষ মানে এবং অবশেষে খেলা দেখায়।

অচিনবাবুর মোটরকার নিঃশব্দগতিতে কড়েয়ার দিকে ছুটিতে লাগিল। ম্যানেজারবাবু সম্প্রতি যে নূতন বাসাটায় উঠিয়া আসিয়াছেন, তাহা কড়েয়াতে একটা গলির মধ্যে। ম্যানেজারবাবু যদি মোটা রকম দক্ষিণা দিতে রাজী হন, তাহা হইলেই এই বিপজ্জনক ব্যাপারে অচিনবাবু হাত দিবেন, নতুবা নয়। সম্প্রতি তাঁহার কিছু টাকারও প্রয়োজন ঘটিয়াছে, মেয়েটার জন্য একটা ভাল পাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, কিন্তু তাহারা নগদ দশ হাজার টাকা চায়। অত টাকা অচিনবাবুর হাতে নাই। অচিনবাবুর মোটর একটা গলি পার হইয়া সারকুলার রোডে পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। সারকুলার রোড নির্জন। অচিনবাবু মোটরের স্পীড বাড়াইয়া দিলেন।

২০

ম্যানেজারবাবুকে ঘন ঘন বাসা পরিবর্তন করিতে হয় বটে, কিন্তু কখনও কোন ছোট বাসায় তিনি যান না। প্রকাণ্ড দুই-তিন মহলা বাড়ি না হইলে তাঁহার চলে না। কড়েয়ার বাড়িটাও প্রকাণ্ড। এই প্রকাণ্ড বাড়ির একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে ম্যানেজার একা বসিয়া ছিলেন। ঘরের এক কোণে একটি ছোট ইলেকট্রিক পাখা নিঃশব্দে ঘুরিতেছিল এবং আর এক কোণে একটি ঘন বেগুনী রঙের ছোট বাল্‌ব অন্ধকারকে যৎসামান্য আলোকিত করিয়া পারিপার্শ্বিককে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানেজারবাবু প্রখর আলোক সহ্য করিতে পারেন না। দিবসেও তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া চতুর্দিকে পরদা ফেলিয়া সূর্যালোককে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিয়া রাখেন। অন্ধকার-বিলাসী তাঁহার মন অন্ধকারেই নিশাচরের মত সঞ্চরণ করিতে চায়। বহুকাল ধরিয়া তাঁহার ক্ষুধিত বাসনা অতৃপ্ত আবেগে নিবিড় অন্ধকারে যে জটিল রহস্যময় পথে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, অন্ধকারে যে পথ অফুরন্ত বলিয়া মনে হইতেছে, আলোকপাত করিয়া সে পথের সীমারেখা দেখিয়া কি হইবে? সীমা তো আছেই, কিন্তু তাহা দেখিয়া

লাভ কি ? অতলস্পর্শী যে গহ্বরটা সুনিশ্চিতভাবেই একদিন তাঁহাকে গ্রাস করিবে, তাহার বিভীষিকাকে যতদূর সম্ভব তিনি আড়াল করিয়া রাখিতে চান অথবা একা অন্ধকারে বসিয়া এই সবই তিনি কল্পনা করেন—তাহা বলা শক্ত। ম্যানেজারবাবুর মনের খবর কেহ জানে না, কিন্তু ইহা তাঁহার অনুচরবর্গেরা সকলেই জানে যে, অন্ধকার, বড় জোর ঈষৎ-আলোকিত অন্ধকার, তাঁহার প্রিয় আবেষ্টনী।···বাহিরের ঘরে ইলেকট্রিক বেল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ম্যানেজারবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। খুব সম্ভবত অচিনবাবু আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য তিনি খবর পাঠাইয়াছিলেন। অচিনবাবুকে দিয়া চিঠিখানা লিখাইয়া খগেশ্বরকে পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে নূতন মালটিকে হস্তগত করা যাইবে না। অচিনবাবু চিঠিখানা লিখিতে রাজী হইবে তো ? কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারবাবুর জরা-শিথিল মুখমণ্ডল নীরব হাস্যে আরও কদাকার হইয়া উঠিল। রাজী হইবে না! কিছু টাকা কবুল করিলেই রাজী হইবে।

বেঁটে গ্যাঁট্টাগোঁট্টা ছোকরাটি নিঃশব্দে আসিয়া ছায়ামূর্তির মত দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

কি ?

নীচে মোটরকারের দালালবাবুটি এসেছেন।

বেশ, সিঁড়ির দরজাটা খুলে দাও।

ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

নীচে প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে সিঁড়িটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। অচিনবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। দ্বার উন্মুক্তই ছিল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে ম্যানেজারবাবুর ঘরের বেগুনী বাল্‌ব নিবিয়া গিয়া সাধারণ একটি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

অচিনবাবু প্রবেশ করিতেই ম্যানেজারবাবু বলিয়া উঠিলেন, আপনার ভাগ্য ভাল, কিছু টাকা লাভ হয়ে যাবে আপনার আজ। তাই ডেকে

পাঠিয়েছিলাম আজ আপনাকে। মাত্র দুটি লাইন একটি চিঠি লিখে দিতে হবে, এর জন্যে কর্তামশাই নগদ এক শো টাকা স্যাংশন করেছেন। আসুন, বসুন।

কিসের চিঠি?

আরে মশাই, বসুনই না আগে।

অচিনবাবু উপবেশন করিলেন।

ম্যানেজারবাবু সত্য মিথ্যা মিশাইয়া একটি গল্পের অবতারণা করিলেন, কিছুদিন আগে, মনে আছে, যমুনা ব'লে একটি মেয়ের সন্ধান এনেছিলেন আপনি?

গল্পের এ অংশটুকু সত্য।

অচিনবাবু বলিলেন, মনে আছে, তাকে তো কোন রকমেই বাগাতে না পেরে শেষটা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দিয়েছিলেন তো? কর্তার আর একটি এজেণ্ট কিন্তু তার নাগাল পেয়েছে।

ম্যানেজারবাবু সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া ক্ষণকাল অচিনবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু মুশকিলেও পড়েছেন তিনি। মেয়েটির এখনও আপনার ওপর অগাধ বিশ্বাস। মেয়েটা বলছে যে, অচিনবাবু যদি আমাকে যেতে লেখেন, তা হ'লে আমি কলকাতা যেতে পারি।

অচিনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, কিন্তু আমি যখন তাকে নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলুম, তখন তো সে আসতে চায় নি! এই এজেণ্টটি কে?

জানেন তো কর্তার কড়া হুকুম, একজন এজেণ্টের নাম আর একজনের কাছে করা চলবে না।

যমুনা মেয়েটা আবার আসতে চাইছে? আশ্চর্য!

স্মিতমুখে ম্যানেজার বলিলেন, তবে আর মেয়েমানুষ বলেছে কেন?

তাহার পর বলিলেন, আরে মশাই, আপনিও নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? দিন না দু লাইন লিখে, আমারও হুকুম তামিল করা হোক, আপনারও

কিছু লাভ হোক। তারপর কর্তা তাঁর এজেণ্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে—আপনারই বা কি, আমারই বা কি ?

ম্যানেজার আর কালবিলম্ব করিলেন না, কুব্জ দেহটাকে সোজা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহকোণে অবস্থিত লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া আনিলেন, তাক হইতে চিঠি লিখিবার প্যাড এবং ফাউণ্টেন-পেন পাড়িয়া আনিয়া বলিলেন, নিন, লিখে দিন চিঠিখানা।

কি লিখব ?

লিখুন না—কল্যাণীয়াসু, তুমি লোকটির সহিত অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমিই ইহাকে পাঠাইয়াছি। বিশেষ দরকার আছে। বাস্, নামটা সই ক'রে দিন, ঠিকানাটাও দিয়ে দিন।

অচিনবাবু যথাযথ লিখিয়া দিলেন।

ম্যানেজার পত্রখানি হস্তগত করিয়া এক শত টাকার নোটখানি অচিনবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, এই নিন আপনার পারিশ্রমিক। তারপর আর সব খবর কি বলুন ?

অচিনবাবু খবর বলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

নোটটি পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, ভাল খবর আছে একটা।

কি বলুন তো ?

খুব ভাল জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, কায়দা ক'রে সাপটে নিতে পারলে মালের মতন মাল একখানা।

বলুন, বলুন।

ম্যানেজারবাবু কুব্জ দেহটাকে উন্নমিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। অচিনবাবু রঙ এবং রস দিয়া বেলা মল্লিকের বর্ণনা শুরু করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সমস্ত শুনিয়া ম্যানেজারবাবু বলিলেন, আপনি যেমন বলছেন, তেমন জিনিস যদি হয়, টাকার জন্যে কর্তামশাই পেছপাও হবেন না।

মেয়েমানুষের পেছনে অনেক টাকা উড়িয়েছেন তিনি, আরও ওড়াবার ক্ষমতাও আছে তাঁর। তবে জিনিসটি সরেস হওয়া চাই।

জিনিস খুব সরেস।

তা হ'লে টাকার জন্যে ভাবনা নেই।

হাজার দশেক খরচ হতে পারে।

হাজার বিশেক হ'লেও কর্তা ভ্রূক্ষেপ করবেন না, জিনিস যদি ভাল হয়।

আমি বলছি, জিনিস খুবই ভাল।

তা হ'লে লেগে পড়ুন, টাকার জন্যে ভাববেন না।

অচিনবাবু উঠিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহার মোটরখানি নিঃশব্দগতিতে গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। অচিনবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারবাবুর ঘরে পুনরায় বেগুনী বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অচিনবাবু-বর্ণিত বেলা মল্লিকের কাল্পনিক মূর্তিটি ঘিরিয়া তাঁহার লেলিহান বাসনা ক্রমশ উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। স্ফীতনাসারন্ধ্র, মুদিতচক্ষু তিনি নিস্পন্দ হইয়া এক কোণে বসিয়া ছিলেন। দ্বারে আবার শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলেন, বেঁটে গ্যাঁট্টাগোঁট্টা সেই ছায়ামূর্তি পুনরায় দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কি আবার?

সেই জু মেয়েটি ম'রে গেল।

ও। আচ্ছা প্যাক ক'রে ফেল তা হ'লে। বড় প্যাকিং কেস আছে তো?

আছে।

প্যাক ক'রে সেই বুড়ো জু-টার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। ডাক্তারবাবু সার্টিফিকেটও একখানা দিয়ে গেছেন, সেটাও নিয়ে যেও। সেই বুড়ো জু-ই মড়ার ব্যবস্থা করবে। তার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে কাল। এখুনি সরিয়ে ফেল তার বাড়িতে, দেরি ক'রো না।

ম্যানেজার এমন অনাকুলিত চিত্তে আদেশ দিলেন, যেন একটা কাচের পাত্র অসাবধানে ভাঙিয়া গিয়াছে, টুকরাগুলা সরাইয়া ফেলিতে বলিতেছেন।

ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঘন বেগুনী রঙের নিবিড় পরিবেষ্টনীতে নিষ্ঠুর নীরবতা পুনরায় ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

২১

মৃন্ময় ছিল না।

অতিশয় তুচ্ছ একটা অজুহাত দেখাইয়া হাসির নিকট চলিয়া গিয়াছিল। অজুহাতটার তুচ্ছতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করেন নাই, বরং সস্নেহ কৌতুকভরে তাহার যাওয়াটার সমর্থনই করিয়াছিলেন। সত্যই তো মৃন্ময় কি রকম ধরনের চাকরি লইবে, সে সম্বন্ধে হাসির সহিত একটা পরামর্শ করা কর্তব্য বইকি! মৃন্ময়ের অবিলম্বে চলিয়া যাওয়া উচিত। মৃন্ময় চলিয়া গেলে মুকুজ্জেমশাই অনুকম্পাভরে ভাবিয়াছিলেন, আহা বেচারা, একটা বলিষ্ঠ রকম অজুহাত খাড়া করিতে পারে নাই, চাকরি সম্বন্ধে হাসির মতামতও লইতে গিয়াছে! যেন বহু মনিব আসিয়া চাকরির জন্য তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, কোন্‌টা গ্রহণ করিবে সে ঠিক করিতে পারিতেছে না।

মুকুজ্জেমশাই আরও একটা কারণে মৃন্ময়কে ছুটি দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, মৃন্ময় ক্রমশ কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে। এমনিই সে বড় একটা হাসে না, কিন্তু এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। হাসি বাপের বাড়ি যাইবার পর সেই গাম্ভীর্যের উপর একটা বিষাদের কালিমাও যেন দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই ভাবিলেন, যাক, দিনকতক হাসির নিকট ঘুরিয়া আসুক, আমি একাই যতটা পারি করি।

মৃন্ময় কিন্তু হাসির নিকট গিয়াছিল সেই চিঠিগুলির সন্ধানে।

মুকুজ্জেমশাই এবং হাসির অভিভাবক ভদ্রলোক যদিও মৃন্ময়ের গৃহত্যাগিনী পত্নীর কথা জানিতেন, কিন্তু হাসিকে সে কথা বলেন নাই। সে পত্নীর নামও তাঁহারা জানিতেন না, এবং তাহাকে ঘিরিয়া মৃন্ময়ের অন্তরলোকে যেসব অসাধারণ কাণ্ড ঘটিতেছিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও তাঁহারা কোনদিন পান নাই। সুতরাং স্বর্ণলতাকে লিখিত চিঠিগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছিল, মুকুজ্জেমশাই বাসায় একা ছিলেন। বেশ ভালই ছিলেন। সমস্ত সকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া, সমস্ত দুপুর পূর্বলিখিত দরখাস্তগুলির সম্বন্ধে তদ্বির করিয়া এবং সমস্ত সন্ধ্যা নূতন বিজ্ঞাপন অনুযায়ী দরখাস্ত লিখিয়া তাঁহার ভালই কাটিতেছিল। প্রতিদিন দুপুরে বাহির হইবার মুখে রাত্রের লেখা দরখাস্তগুলি টাইপ করাইবার জন্য দিয়া আসিতেন। শিরীষবাবুর নিকট হইতে শঙ্করের নূতন ঠিকানাও তিনি পাইয়াছেন, শঙ্করের সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছেন। সে একটা ছোটখাটো টুইশনি যোগাড় করিয়াছে এবং কি করিয়া প্রুফ দেখিতে হয় অধ্যবসায়সহকারে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। বিকাশবাবু নামক এম.এ.-পরীক্ষার্থী যুবকটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মধ্যে অপ্রত্যাশিতরূপে একজন বিদ্বান অধ্যাপক আবিষ্কার করিয়া পুলকোচ্ছ্বাসের আতিশয্যবশত মুকুজ্জেমশাইয়ের কার্গে বিস্ফোরৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুকুজ্জেমশাই তাঁহার উৎসাহ-অনলে শীতল বারিসিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। অতিশয় নিরীহভাবে তিনি বিকাশবাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি নিজে ফিলজফির 'ফ'-ও জানেন না, অন্যত্র তিনি একজন এম.এ.-পরীক্ষার্থীকে ওই প্রশ্নগুলি পড়িতে দেখিয়াছেন এবং সেগুলি তাঁহার মনে ছিল বলিয়াই আকস্মিকভাবে বিকাশবাবুকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজে মূর্খ মানুষ, ফিলজফির কিছুই বোঝেন না। এই কথায় মুকুজ্জেমশাইয়ের সৌভাগ্যক্রমে বিকাশবাবু নিরস্ত হইয়াছেন এবং মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট আসা কমাইয়া দিয়া সত্য-দত্ত পরীক্ষার খবরাখবর করিতে ব্যস্ত হইয়া আছেন। একা একা

নিজের আরব্ধ কার্যে মশগুল হইয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিনগুলি সুন্দর কাটিতেছিল।

এমন সময় একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেদিন রবিবার মুকুজ্জেমশাই বাসায়। অতিশয় অপ্রত্যাশিতভাবে কোন খবর না দিয়া রাজমহল হইতে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে কেহ নাই—একাই আসিয়াছে।

এ কি, তুমি যে হঠাৎ?

মনোরমার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, এমনই এলুম, ওখানে আর ভাল লাগছিল না।

মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল।

একা চ'লে এলে, ভয় করল না?

না।

এ বাসার ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারলে কি ক'রে?

ঠিকানা খুঁজতে গিয়েই দেরি হ'ল, আমি হাওড়ায় এসে পৌঁছেছি সকালের ট্রেনে।

তারপর?

হাওড়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে আর জিজ্ঞেস করতে করতে আসছি।

হাওড়া থেকে হেঁটে আসছ?

পয়সা ছিল না।

মুকুজ্জেমশাই অবাক হইয়া গেলেন।

এমন ক'রে আসবার মানেটা কি?

ওখানে আর ভাল লাগছিল না।—এইটুকু বলিয়া মনোরমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মুকুজ্জেমশাই বুঝিলেন, হাজার প্রশ্ন করিলেও ইহার বেশি আর সে কিছুই বলিবে না।

যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোও গিয়ে। উঠোনের ও-পাশেই কল আছে। কলে বোধ হয় জল এসেছে এতক্ষণ।

মনোরমা ক্ষুদ্র পুঁটলিটি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, মনোরমার এ আচরণের অর্থ কি? অর্থ যাহাই থাকুক, আন্দাজ করিয়া লইতে হইবে। স্বল্পভাষিণী মনোরমা যাহা বলিয়াছে, তাহার বেশি আর কিছু বলিবে না। মাত্র চার-পাঁচ দিন পূর্বে মুকুজ্জেমশাই ভবেশকে কুড়ি টাকা এবং মনোরমার হাতখরচ পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন। এই পাঁচ টাকা সম্বল করিয়াই মনোরমা এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়াছে তো, কিন্তু এখন তাহাকে লইয়া কি করা যায়? ভবেশের কাছে মনোরমাকে রাখিয়া মুকুজ্জেমশাই বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। হঠাৎ মনোরমার হইল কি? ভবেশকে মুকুজ্জেমশাই ভাল করিয়াই চেনেন, মনোরমার সহিত সে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিবে, ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। সহসা মুকুজ্জেমশাইয়ের মনে হইল, মনোরমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে হয়তো অনেকক্ষণ কিছুই খায় নাই। মুকুজ্জেমশাই উঠিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। উঠানে নামিয়া দেখিলেন, কলের কাছেও কেহ নাই, কল হইতে জল পড়িতেছে। মনোরমা গেল কোথায়? মৃন্ময় যে ঘরটায় শুইত, দেখিলেন, তাহার দরজাটা খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় উঠিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া মুকুজ্জেমশাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চৌকির উপর মনোরমা উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইরূপ যে কিছু একটা ঘটিবে, তাহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অনাথার প্রতি করুণাবশত। কর্তব্য ক্রমশ কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুকুজ্জেমশাইকে অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

কি হ'ল তোমার ?

মনোরমা নীরব।

মুকুজ্জেমশাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ওঠ ওঠ, কি ব্যাপার সব খুলে বল তো ?

মনোরমা উঠিয়া বসিল এবং বেশবাস সম্বৃত করিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

হ'ল কি তোমার ? এ রকম করার মানে কি ?

মনোরমা খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া ক্রন্দনকম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমি আর সহ্য করতে পারি না।

কি সহ্য করতে পার না ?

আপনার দয়া।

তার মানে ?

মনোরমা সহসা ঘুরিয়া বসিল। অশ্রুবাষ্পাকুল আরক্ত নয়ন দুইটি মুকুজ্জেমশাইয়ের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, আপনি কি মনে করেন আমি মানুষ নই, আমার প্রাণ ব'লে কোন জিনিস নেই, আপনি চিরকাল দয়া ক'রে যাবেন আর আমি তা চিরকাল সহ্য করব ? আপনার দয়া পাবার কি যোগ্যতা আছে আমার ? কেন শুধু শুধু আপনি এমন ক'রে চিরকাল আমার ভার ব'য়ে বেড়াবেন ? কাশীর একটা আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে কেন সকলের কাছে আত্মীয় ব'লে পরিচয় দেবেন, আপনার ওপর যখন সত্যিকার কোন দাবিই নেই আমার ?

কে বললে দাবি নেই ?

উৎসুক-নয়নে মনোরমা প্রশ্ন করিল, কিসের দাবি ?

প্রত্যেক মানুষের ওপরই প্রত্যেক মানুষের দাবি আছে।

কেন ?

কারণ মানুষ পশু নয়।

আপনি কি যেখানে যত অসহায় আছে, সকলকেই এমনই ক'রে সাহায্য করেন ?

ক্ষমতায় কুলোলে নিশ্চয়ই করতাম, সকলকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নেই।

মনোরমা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আরও কত লোক তো আছে, যারা আমার চেয়ে আপনার দয়া পাবার ঢের বেশি যোগ্য ? আপনি আমাকেই বা বেছে নিলেন কেন ?

কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তা বিচার করবার অধিকার আমার নেই। যে আমার সামনে পড়ে, যথাসাধ্য তারই উপকার করবার চেষ্টা করি। তখন কাশীতে ছিলুম, হঠাৎ একজনের মুখে তোমার খবর পেলুম, তোমার কাছে গিয়ে তোমার মুখে সমস্ত শুনে কষ্ট হ'ল, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চাইলাম তুমিও স্বেচ্ছায় চ'লে এলে—এর বেশি তো আর কিছু নয়। তার পর থেকে আমি যথাসাধ্য তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছি।

মনোরমা চৌকি হইতে নামিয়া কাপড়-চোপড় আর একবার সামলাইয়া লইয়া ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

কি সহ্য করতে পারছ না ?

বললাম তো, আপনার দয়া।

সহ্য করতে পারছ না কেন ?

কারণ আমি পশু নই,—মানুষ।

নিজের উত্তরটাই এমন তির্যকভাবে নিজের কাছে ফিরিয়া আসায় মুকুজ্জেমশাই ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিলেন। কিন্তু বিস্মিত হইলেন যখন দেখিলেন, মনোরমা নিজের ছোট পুঁটলিটি লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

ও কি ? কোথায় যাচ্ছ ?

যেদিকে দু চক্ষু যায়, এমনভাবে কারও দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ম'রে যাওয়া ঢের ভাল।

মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না, স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

পর মুহূর্তেই গুরুভার পতনের শব্দে সচকিত হইয়া মুকুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়া দেখিলেন, মনোরমা সিঁড়ির উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মুকুজ্জেমশাই ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন; অজ্ঞান মনোরমাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন।

গভীর রাত্রে মনোরমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একজন অপরিচিতা নারী তাহাকে শুশ্রূষা করিতেছে।

আপনি কে?

আমি নার্স।

আপনি কি ক'রে এলেন?

আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এসেছিলাম, তিনিই আমাকে রেখে গেছেন।

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, ওই যে সন্ন্যাসী মতন কে একজন ছিলেন, তিনিই ডেকেছিলেন ডাক্তারবাবুকে।

তিনি কোথায়?

তিনি আপনার সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে কোথায় যেন গেলেন। কাল সকালে আসবেন ব'লে গেছেন। আপনি বেশি কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু নিষেধ ক'রে গেছেন।

মুকুজ্জেমশাই বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলে—চাই না, চাই না, তোমার এত দয়া চাই না আমি।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

চুনচুনের দিদি মিসেস স্যানিয়াল নাতিসাধারণ-প্রকৃতির মহিলা। বলিষ্ঠ চওড়া-চওড়া গড়ন, শক্তিব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, একটু লক্ষ্য করিলে গোঁফের রেখা পর্যন্ত দেখা যায়। মনোবৃত্তিও পুরুষভাবাপন্ন নির্ভীক বলিষ্ঠ। নারীসুলভ কমনীয়তা হয়তো তাঁহার এককালে ছিল, (না থাকিলে অধুনামৃত মিস্টার স্যানিয়াল কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন?) এখন কিন্তু তাঁহার মধ্যে নারীসুলভ কোন প্রকার মাধুর্য নাই। শুধু তাহাই নহে, বর্তমানে তিনি মাধুর্যবিরোধী, রূপসজ্জার কোন প্রকার আতিশয্য সহ্য করিতে পারেন না। কমনীয়তা এবং মাধুর্য লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে গিয়াই যে আজকালকার মেয়েরা অধঃপাতে যাইতেছে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। মিস্টার স্যানিয়াল পাঁচ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন এবং মিসেস স্যানিয়াল এই পাঁচ বৎসরকাল সাতিশয় দক্ষতার সহিত নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে নিজের সংসার-তরণীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কি নিজের দূরসম্পর্কের ভগিনী চুনচুনকে পর্যন্ত নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। হাব-ভাব-বিলাসিনী প্রসাধন-কুশলা সাধারণ রমণী হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না—এ কথা প্রায়ই তিনি পরিচিত-মহলে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহার এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে চুনচুন লুকাইয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের সর্বসাবধানতা-উল্লঙ্ঘিনী দুষ্টা দক্ষতার প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আজকালকার ব্যাপার দেখিয়া মিসেস স্যানিয়ালের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সাবধানতার প্রাচীর যত উচ্চই হউক, আজকালকার মেয়েরা ঠিক তাহা ডিঙাইয়া যাইবে। মিসেস স্যানিয়াল প্রতিদিন কথায় কথায় ভগবানকে ধন্যবাদ দেন যে, ভগবান তাঁহাকে একটি মেয়েও দেন নাই, তাঁহার দুইটি সন্তানই পুত্র-সন্তান। মেয়েদের উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ, তাঁহার ধারণা, আজকাল মেয়েগুলাই সমাজটাকে উচ্ছন্ন দিতেছে। মেয়েরা আশকারা না দিলে পুরুষের সাধ্য কি অগ্রসর হয়। মেয়েদেরই কর্তব্য,

অবাঞ্ছিত পুরুষসংসর্গ সযত্নে পরিহার করিয়া চলা। আজকাল কি ছেলে কি মেয়ে কর্তব্যজ্ঞান কাহারও নাই। এই যে তিনি চুন্‌চুনকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার লুকাইয়া-বিবাহ-করা স্বামীর চিকিৎসার যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন এবং সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও চুন্‌চুনকে দূর করিয়া দেন নাই—সমস্তই কর্তব্যের খাতিরে। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা প্রবল। তিনি যে কর্তব্যপরায়ণা, সৎপথবর্তিনী এবং নিষ্কলুষা—এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা শুধু যে তাঁহার নিজ সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে; তিনি নারীজাতির উন্নতিকল্পে একটি নারী-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, পাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রত্যহ বিনা-বেতনে এক ঘণ্টা অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, উপযুক্তপাত্রে যথাসাধ্য দান করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ নহেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া, তাহার বিপন্ন অবস্থা শুনিয়া এবং তাহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মিসেস স্যানিয়াল তাহাকে নিজের ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে বাহাল করিয়াছেন। তাঁহার একটি ছেলে এবার কলেজে ঢুকিয়াছে, আর একটি স্কুলে পড়ে। মিসেস স্যানিয়াল কিন্তু শঙ্করকে আকারে ইঙ্গিতে এই কথাটি বারম্বার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যেহেতু শঙ্কর একটা উচ্চ আদর্শের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে এবং যেহেতু তিনি চুন্‌চুনের স্বামীর শুশ্রূষা-সম্পর্কে শঙ্করের উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন, সেই হেতুই তিনি শঙ্করকে নিজগৃহে স্থান দিতেছেন, অখিল-অনিলের জন্য গৃহশিক্ষকের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ সৎ অথচ সমাজ-কর্তৃক-লাঞ্ছিত যুবককে সাহায্য করা যে কোন কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

শঙ্কর কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় আসিয়া ঠিক যেন দুইটি উপবাসী মৎকুনের পাল্লায় পড়িয়া গেল। অখিল-অনিলের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র। তাহারা শঙ্করের বিদ্যাবুদ্ধিকে যেন দোহন করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বড় না মিল্‌টন বড়, অ্যালজ্যাব্রা শিখিয়া কি উপকার হয়, মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডলের চাপ কি পরিমাণ, মহিলা-কবি তরু দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টি, জোনাকি আলো দেয় কি উপায়ে, একই মাটি হইতে রস আহরণ করিয়া বিভিন্ন গাছ

বিভিন্ন ফল কোটায় ও ফল ফলায় কি করিয়া, দুধ এবং ডিমের মধ্যে কোন্‌টি বেশি পুষ্টিকর এবং কেন, মানস-সরোবরে নীলপদ্ম ফোটে কি না, ওয়াটার্লু যুদ্ধে কোন্ পক্ষে কত সৈন্য ছিল—ইত্যাকার নানাবিধ জটিল প্রশ্নে তাহারা শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সব সময় সহজ নয়, ছাত্রদের নিকট উত্তর দিতে অপারগ হইলেও কেমন যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হয়; সুতরাং উত্যক্ত শঙ্কর যথাসাধ্য তাহাদের এড়াইয়া চলিত, পারতপক্ষে বাড়িতে থাকিত না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই সঙ্গতিহীন অসহায় অবস্থায় আশ্রয় পাইয়া শঙ্কর কিছুতেই ইহাদের উপর কৃতজ্ঞ হইতে পারিল না। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জ্ঞানস্পৃহা তাহাকে এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল, কোন রকমে কোথাও একটা চাকরি জুটিলে এই উচ্চাদর্শ-প্রণোদিত পরিবারের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সে যেন বাঁচে।

প্রুফ-রীডিং সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছে এবং প্রকাশবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহার জানা-শোনা একটি প্রেসে তাহাকে ঢুকাইয়া দিতে পারিবেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটিও একদিন আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি তাহার চাকরির জন্য নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াছেন এবং যত দিন একটা কিছু না জোটে, তত দিন নাকি করিতে থাকিবেন। সেদিন তিনি শঙ্করকে দিয়া চার-পাঁচটি দরখাস্তে সহি করাইয়া লইয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই শ্বশুরবাড়ি-সম্পর্কিত লোক। শ্বশুরবাড়ির তরফ হইতে কোন প্রকার সাহায্য লইতে তাহার আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হয়। যে আত্মসম্মানের জন্য সে পিতামাতার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে, সেই আত্মসম্মানকে খর্ব করিয়া সে শ্বশুরবাড়ির লোকের নিকট হইতে সাহায্য লইতে যাইবে কোন্ লজ্জায়? কাহারও নিকট সে কোন সাহায্য লইবে না, নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ের উপরই তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু এই মুকুজ্জেমশাইকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। লোকটি অদ্ভুত-প্রকৃতির, তাঁহার নাকি সংসারের কোন

বন্ধন নাই, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপকার করা নাকি তাঁহার পেশা। তিনি বিশেষ কাহারও নন—তিনি সকলের। শিরীষবাবুর সহিতও তাঁহার পরিচয় নাকি আকস্মিক।

শঙ্কর সেদিন যে দরখাস্তগুলিতে সহি করিয়াছিল, তাহার একটির ঠিকানা বোম্বাইয়ের একটি পোস্ট বক্স। একটা বাংলা মাসিক পত্রিকার জন্য একজন সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। বোম্বাই শহরে কে বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেছে? সুরমার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সুরমার চিঠি অনেকদিন পায় নাই, উৎপলও বহুদিন পূর্বে চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে। আর কিছুদিন পূর্বে হইলে শঙ্কর হয়তো সুরমাকে পত্র লিখিত, কিন্তু এখন আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। একদা যে সুরমা তাহার মার্জিত রুচি, সংযত অথচ সাবলীল সৌন্দর্য দিয়া তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে সুরমা অহরহ নিকটে থাকিলে হয়তো শঙ্করের মানসলোকে বিপর্যয় ঘটাইতে পারিত; কিন্তু সুরমা দূরে চলিয়া গিয়াছে, অন্তরাল ধীরে ধীরে আপন অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিস্মৃতির কুহেলিকায় সুরমা কখন যে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শঙ্কর তাহা বুঝিতেও পারে নাই। দরখাস্ত-প্রসঙ্গে তাহার কথা মনে পড়িল বটে, কিন্তু চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইল না।

এখন শঙ্করের মানসলোক জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে আর একজন—অমিয়া নয়, চুনচুন। মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আসিয়া এবং চুনচুনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শঙ্কর চুনচুনের ঘনিষ্ঠতর যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে সে আরও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত মেয়ে, কিছুতেই বিচলিত হয় না। মিসেস স্যানিয়ালের গৃহের যাবতীয় কর্ম চুনচুন একাই করে, কিন্তু এমন নীরবে এবং এমন হাসিমুখে করে যে, শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। কর্তব্যপরায়ণা নিষ্কলুষা মিসেস স্যানিয়াল চুনচুনের দুষ্কৃতির জন্য কথায় কথায় তাহাকে শ্লেষাত্মক উপদেশ দেন, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটি যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ফাই-ফরমাশ করিয়া করিয়া একদণ্ড চুনচুনকে স্থির থাকিতে দেয় না, মিসেস স্যানিয়ালের দূর-সম্পর্কের অপুত্রক বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবু প্রত্যহ

সন্ধ্যাবেলা আসিয়া একমুখ কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি ও ভ্রূ লইয়া একদৃষ্টে চুনচুনের দিকে চাহিয়া থাকেন (এবং মিসেস স্যানিয়ালের সহিত কর্তব্যমৌখিক সদালাপ করেন); কিন্তু চুনচুন এতটুকু বিরক্ত বা বিচলিত হয় না। ইহাদের সহিত অকারণ বাদানুবাদ করিয়া নিজের আত্মমর্যাদা নষ্ট করে না, মুখে অসহায় ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে না, নীরবে হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করে। শঙ্কর অবাক হইয়া যায়। তাহার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই স্মিতমুখী শান্ত মেয়েটির মনের মধ্যে আর একজন চুনচুন বাস করে, তাহার লক্ষ্য স্থির আছে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য অনিবার্য সুনিশ্চিত গতিতে সে পথ অতিবাহন করিতেছে। বাহিরে অকারণে আত্মপ্রকাশ করিয়া সে বিব্রত হইতে চাহে না, বাহিরের জগৎকে ফাঁকি দিবার জন্যই সে বাহিরের জগতে অনাড়ম্বরে অতিশয় সাধারণ বেশে থাকে। আসলে সে অসাধারণ, আসলে সে বিদ্রোহিনী, প্রেমের জন্যই প্রেমাস্পদকে বরণ করে,—সামাজিক বা আর্থিক কারণে নয়। যতীন হাজরার যক্ষ্মাবিধ্বস্ত মুখচ্ছবি শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে পড়ে। চুনচুনের প্রতি সমস্ত মন শ্রদ্ধায় অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইচ্ছা করে, ওই রহস্যময়ীর অন্তরের রহস্যালোকে প্রবেশ করিয়া দিশাহারা হইয়া যায়।

শঙ্কর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে চুনচুনের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—

একখানা প্রকাণ্ড নীল রঙের মোটর সহসা শঙ্করের পাশেই থামিয়া গেল। মোটরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইল শৈল।

শঙ্করদা, কোথায় চলেছ?

শৈল!

তবু ভাল, চিনতে পেরেছ।

চিনতে পারব না, বলিস কি?

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

কোথাও না, এমনই হাঁটছি।

আমার সঙ্গে একটু মার্কেটে চল তা হ'লে। অনেক জিনিস কিনতে হবে, তুমি পছন্দ ক'রে দেবে।

তার মানে ?

লক্ষ্মীটি, চল।

শৈল দ্বার খুলিয়া আহ্বান করিল, শঙ্কর 'না' বলিতে পারিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে নানা রঙের শাড়ি, জামা, উল, ছিট, বাসন, টী-সেট এবং টুকিটাকি আরও নানাবিধ জিনিস কিনিয়া শঙ্করকে লইয়া শৈল বাড়ি ফিরিল। মিস্টার বোস বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সম্প্রতি যে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহাতে ক্রমাগত ট্যুর করিয়া বেড়াইতে হয়। তিনি ট্যুরে বাহিরে ছিলেন।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই।

এখনই যাবে কি ! সে হবে না, ওপরে চল, কিছুই তো কথা হ'ল না।

শঙ্করকে উপরে যাইতে হইল।

উপরে গিয়া শৈল বলিল, এখনও তো আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি।

কি কথা ?

বউ কেমন হ'ল ?

শঙ্কর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, কার বউ ?

তোমার, তোমার গো, লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ভেবেছ, কেউ টের পায় নি বুঝি ? সব জানি আমি।

শঙ্কর বুঝিল, আর লুকাইবার উপায় নাই।

কাউকে জানাই নি, তুই খবর পেলি কি ক'রে ?

কুসুমি চিঠি লিখেছে। কুসুমিকে মনে পড়ে ?

বিদ্যুৎঝলকের মত শঙ্করের মনে কুসুমির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। কুসুম শৈলর বাল্যসখী। শৈলর সঙ্গে প্রায় তাহাদের বাড়িতে আসিত, শঙ্করকে

দেখিলেই মুচকি হাসিয়া ছুটিয়া পলাইত। কুসুমের কচি মুখখানা তাহার চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

কুসুমি খবর পেলে কি ক'রে?

সে কপাল পুড়িয়ে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে যে। তোমাদের বাড়ি থেকেই খবর পেয়েছে। তুমি নাকি জ্যাঠামশাইয়ের অমতে বিয়ে করেছ?

হ্যাঁ।

কেন, অমিয়াকে খুব বেশি মনে ধরেছিল?

বড্ড।

উভয়েই মুচকি হাসিয়া পরস্পরের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর শঙ্কর হাসিয়া বলিল, বিয়ের আগে তাকে আমি দেখিই নি।

তবে?

বিয়ে করবারই ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু বাবা যখন পণের জন্যে আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে দর-কষাকষি শুরু ক'রে দিলেন, তখন আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল। রোখের মাথায় ঠিক ক'রে ফেললুম যে, বিনাপণে ওইখানেই বিয়ে করব।

শৈল ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

তাই করলুম।

জ্যাঠামশাই কি করলেন?

কি আর করবেন, রেগে আমার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রে দিলেন।

ও মা, তাই নাকি? তারপর?—উৎকণ্ঠায় শৈলর দুইটি চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তুমি এখন কি করছ তা হ'লে?

শঙ্কর গম্ভীরভাবে মিথ্যা কথা বলিল, চাকরি করছি।

কোথায়?

একটা আপিসে।

কোথা থাক ?

একটা মেসে।

কোন্ মেসে, ঠিকানাটা বল না ?

কিছুদিন আগে শঙ্কর যে মেসটাতে ছিল, তাহার ঠিকানা বলিয়া দিল। শৈল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একবার তাহার ইচ্ছা হইল, শঙ্করকে বলে, এখানে আসিয়া থাকিতে; কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হইল, একটু ভয়ও হইল, বলিতে পারিল না। বেয়ারা মোটর হইতে জিনিসগুলি নামাইয়া আনিয়াছিল, বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, এগুলো কোন্ ঘরে রাখব মা ?

এখানেই নিয়ে আয়।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শৈল বলিল, ওমা, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। দাদা যে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। চিঠিপত্র পাও নি তুমি ?

না। কতদিন ফিরেছে ?

তা প্রায় মাস-দুই হবে। বম্বেতেই শুনছি থাকবে, কি একটা ব্যবসা করবে নাকি, শ্বশুর টাকা দিচ্ছে, শ্বশুর খুব বড়লোক তো।

ও।

শঙ্কর আর কিছু বলিল না। সুরমার কথা একবার মনে হইল, উৎপলের মুখটাও মনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়া গেল, কিন্তু মনে তেমন কোন সাড় জাগিল না। কিছুদিন আগে তাহার যে মন উৎপল এবং সুরমাকে লইয়া মাতিয়াছিল, সে মন আর নাই। নূতন মন নূতন জগতে নূতন প্রেরণায় নূতন স্বপ্ন দেখিতেছে। দুইটি ভৃত্য ও বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং জিনিসগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে একবার বলিয়াছিল, আবার বলিল, অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করলি তুই।

অনর্থক কেন ?

শাড়ি, আসন, টী সেট নিশ্চয়ই তোর যথেষ্ট আছে, তবু কি দরকার ছিল আবার কেনবার ?

কি নিয়ে থাকব তা না হ'লে ? ওদের নেড়ে-চেড়েই তো সময় কাটে। আঃ, চুলে দুলটা আটকে গেল, ছাড়িয়ে দাও না শঙ্করদা।

ছাড়াইয়া দিতে দিতে শঙ্কর বলিল, শাড়ি নেড়ে তোর সময় কাটে ? কি যে বাজে কথা বলিস !

সত্যি বলছি।

গান-বাজনা শিখছিলি যে ?

শিখেছি কিছু কিছু, শোনাব কাকে, ঘরের দেওয়ালকে ? সেইজন্যে আর ভাল লাগে না ওসব !

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল।

শঙ্কর বলিল, এবার আমি যাই, আমার কাজ আছে।

কাজ, কাজ, কাজ—সবারই খালি কাজ।

একটু অস্বাভাবিক ঝাঁজের সহিত কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া ঝাঁজটাকে মোলায়েম করিবার জন্য শৈল হাসিল।

কাজ না করলে চলে কই ?

না, তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না, অনেকক্ষণ থাকতে হবে এখানে, তোমার সেই কবিতাগুলো তোমার মুখে শুনব আবার।

কোন্ কবিতাগুলো ?

সেই যেগুলো ইস্কুলে লিখেছিলে।

সেগুলো কোথায় ?

আমার কাছে আছে। খাতাখানা চুরি করেছিলাম, মনে নেই ? বার ক'রে আনি, থাম—তুমি বিছানার ওপর ভাল ক'রে ব'স।

একরূপ জোর করিয়া শঙ্করকে বিছানার উপর বসাইয়া শৈল বাহির হইয়া গেল এবং কয়েক মিনিট পরে জীর্ণ-মলাট একখানা খাতা আনিয়া শঙ্করের হাতে দিয়া বলিল, পড়।

নিজের লেখা সমঝদার শ্রোতাকে পড়িয়া শোনাইবার দুর্দমনীয় বাসনা শঙ্করের মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ; তবু সে বলিল, সত্যি বলছি, আমার কাজ আছে এখন।

লক্ষীটি, তোমার পায়ে পড়ি, এখনই চ'লে যেও না। চা আনতে বলছি, চা খেয়ে যেও, ততক্ষণ পড় না একটু, শুনি—বড্ড একগুঁয়ে তুমি শঙ্করদা।

শৈল ঠোঁট উল্টাইয়া অভিমান করিল। শঙ্করের সেই বহুদিন আগেকার কিশোরী শৈলকে মনে পড়িল, সে-ও ঠিক এমনই করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কথায় কথায় মুখ ভার করিত।

দুই ঘণ্টা পরে শঙ্কর যখন শৈলর বাড়ি হইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কবিতার খাতাটা সমস্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শৈল তাহাকে ছাড়ে নাই। শৈলর শেষ কথাগুলি শঙ্করের কানে বাজিতেছিল—মাঝে মাঝে তুমি এসো শঙ্করদা, আমার বড্ড একা একা লাগে। আর বাজিতেছিল শৈলর প্রশ্নটা—বউ কেমন হয়েছে সত্যি বল না, নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ; রঙ কেমন, আমার চেয়েও ফরসা ?

আসিবার সময় শৈল একটা কাগজে মুড়িয়া নূতন কেনা একখানা দামী শাড়ি অমিয়ার জন্য দিয়াছে। উপহার। শৈল কিছুতেই ছাড়িল না, শঙ্করকে লইতে হইল। প্যাকেটটা বগলে করিয়া শঙ্কর ধর্মতলার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পাশের বারান্দায় সজ্জিত পুরাতন পুস্তকগুলি শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সরিয়া গিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। কি চমৎকার চমৎকার সব বই ! লুব্ধ আগ্রহে সে বই বাছিয়া সাজাইতে লাগিল। এসব বই সে কোনদিন পড়িবে কি না, পড়িবার সময় পাইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিল না। একগাদা বই বাছিয়া ফেলিল।

আরও ঘণ্টা-খানেক পরে শঙ্কর যখন বাসায় ফিরিল, তখন তাহার বগলে একগাদা বই, কিন্তু শাড়ির প্যাকেটটি নাই। অর্ধমূল্যে শাড়িটি বিক্রয় করিয়া সে বইগুলি কিনিয়া আনিয়াছে।

আরও খানিকক্ষণ পরে স্তূপীকৃত বইগুলি সামনে রাখিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শাড়িখানা বিক্রয় করিয়া তাহার মনটা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিল। শৈল যদি জানিতে পারে, কি মনে করিবে? অমিয়া শুনিলেই বা কি ভাবিবে?

চুন্‌চুন আসিয়া প্রবেশ করিল।

এত বই কোথা থেকে আনলেন?

কিনে আনলাম।

কেন?

পড়ব।

চুন্‌চুনের দৃষ্টিতে বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

শঙ্করের মনের গ্লানিটুকু কাটিয়া গেল।

২৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

নিজের শূন্য ঘরে বেলা মল্লিক একা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ঘরের বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না। সকাল হইতে একটা বদখত চেহারার লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। এখনও লোকটা গলির মোড়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। বিগত কয়েক দিনে জানালার ভিতর দিয়া আরও অশ্লীল চিঠি ও চিত্র আসিয়াছে। জনার্দন সিং চলিয়া যাইবার পর অন্য কোন চাকরও যোগাড় করা সম্ভবপর হয় নাই। কয়েক দিন হইতে অবিরত চেষ্টা করিয়াও একটা চাকর জোটে নাই, মনে হইতেছে, ষড়যন্ত্র করিয়াই সকলে যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শূন্য ঘরে একা বসিয়া বেলার নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে হইতেছিল। দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

বেলা দেবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কে?

মিহি গলায় উত্তর আসিল, আমি অপূর্ব।

ও, অপূর্ববাবু! আসুন আসুন।

অপূর্ববাবুর মত লোক আসাতেও বেলা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্বার খুলিয়া দিতেই এসেন্সের গন্ধ ছড়াইয়া, পাউডার-মণ্ডিত মুখে মৃদুহাস্য বিকীর্ণ করিতে করিতে সঙ্কুচিত বিনীত অপূর্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গায়ে গিলে-করা আদ্ধির পাঞ্জাবি, পায়ে সবুজ রঙের জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি। চক্ষু দুইটি কিন্তু গর্তস্থ। মুখের মধ্যে কেবল গালের হাড় দুইটি এবং দাঁতগুলি প্রবলভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করিতেছে।

স্মিতহাস্যে নমস্কার করিয়া বেলা বলিলেন, আসুন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে যে, অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছি।

অপূর্ববাবুর মুখভাব করুণ হইয়া উঠিল।

আসুন, এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল যে!

আমি কতবার এসে ফিরে গেছি, আপনার দেখাই পাই না।

তাই নাকি?

যখনই এসেছি, আপনার ওই গোঁফ-ওলা দারোয়ান এক কথায় আমাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছে। আজ তো তাকে দেখতে পেলুম না! মানে—লোকটা একটু যেন—

অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন। পকেট হইতে ফিনফিনে পাতলা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে গোঁফ-ওয়ালা দারোয়ানটির সম্বন্ধে সত্য অথচ অরূঢ় কি বলিবেন, নির্ণয় করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

বেলা দেবীই প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন।

হ্যাঁ, লোকটা একটু রাফ-গোছের ছিল, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি। ছাড়িয়ে দিয়েও কিন্তু মুশকিলে পড়েছি, একটা দারোয়ান না হ'লে চলছে না। একটা ভাল লোক পেলে এখুনি বাহাল করি।

আকস্মিক পুলকোচ্ছ্বাসে অপূর্ববাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আসিবার

সঙ্গে সঙ্গেই বেলা দেবীর এমন একটা উপকারে লাগিতে পারিবেন, ইহা যে অভাবনীয় ব্যাপার!

আজই তাঁহার আপিসের নেপালী দারোয়ানটা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিল, দেশ হইতে তাহার ভাই আসিয়াছে, অপূর্ববাবু যদি তাহাকে কোথাও লাগাইয়া দিতে পারেন, বড় উপকৃত হয় সে।

আছে আপনার সন্ধানে কোন লোক?

আর একবার রুমালে মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, নেপালী রাখবেন?

কেন রাখব না, যদি বিশ্বাসী হয়?

আমার জানাশোনা একটি নেপালী আছে। ঠিক জানাশোনা নয়, মানে—আমাদের আপিসের যে নেপালী দারোয়ানটা আছে, তারই ভাই—তাকে আমি পার্‌সোনালি অবশ্য—তবে যতদূর মনে হয়—মানে, যদি বলেন, আমি নিজে গিয়ে, অর্থাৎ—

নিজের অসংলগ্ন বাক্যজালে বিজড়িত হইয়া অপূর্ববাবু থামিয়া গেলেন।

বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোথা থাকে সে?

বড়বাজারে।

তার বাসাটা চেনেন আপনি?

চিনি।

তা হ'লে চলুন, এখনই গিয়ে ডেকে আনা যাক তাকে।

এখনই?

হ্যাঁ, এখনই—আজই বাহাল করব। একা এমন অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে ভয় করে।

এখান থেকে এখন বড়বাজার যাওয়া মানে—

নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া অপূর্ববাবু পুনরায় বলিলেন, মানে নটা বেজে গেছে কিনা, যেতে আসতে প্রায়—

চলুন না, ট্যাক্সি ক'রে যাই।

বেলার সহিত ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসিয়া যাওয়াটা যদিও লোভনীয়

ব্যাপার, কিন্তু ভাড়াও তো কম লাগিবে না! বেলা যদি নিজে হইতে ভাড়াটা না দেন, তাঁহার কাছে ভাড়াটা দাবি করাও তো শোভন হইবে না! তুচ্ছ এই দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া অকারণে চার-পাঁচটা টাকা ব্যয় করা— অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ফাঁপরে পড়িয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কি, ভাবছেন কি?

ভাবছি, এখন কেন ট্যাক্সি ক'রে হাঙ্গামা করতে যাবেন, মানে—টুমরো আমি পজিটিভ্‌লি—কথা দিচ্ছি আপনাকে—

সহসা বেলার নজরে পড়িল, ওদিকের জানালাটা হইতে একটা ছায়ামূর্তি যেন সরিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। গলির মোড়ের সেই লোকটার কথাও বেলার মনে হইল।

বেলা বলিলেন, না, আজ রাত্রেই আমার একজন লোক চাই। ডাকুন একটা ট্যাক্সিই।

ট্যাক্সি, মানে—

অপূর্ববাবু পুনরায় ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

বেলা বলিলেন, আশ্চর্য লোক তো আপনি! আমি ভাড়া দেব, আপনি ইতস্তত করছেন কেন?

না না, ভাড়ার কথা নয়, মানে—দেখি, কটা টাকা আছে আমার কাছে।

অপূর্ববাবু পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগ হাতড়াইতে লাগিলেন।

আপনি ভাড়া দিতে যাবেন কেন? কি মুশকিল! যান, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসুন।

বেশ, তাই যাই।

বাধ্য বালকের মত অপূর্বকৃষ্ণ যাইতে উদ্যত হইলেন। বেলার হঠাৎ লোকটার প্রতি অনুকম্পা হইল। ভদ্রলোক আসিতে না আসিতে তাঁহাকে এমন করিয়া ফরমাশ করাটা অনুচিত হইতেছে।

একটু চা খাবেন? চা খেয়ে বরং যান। আসুন, একটু চা-ই করা যাক

আগে, আমারও আজ বিকেলে চা খাওয়া হয় নি, চা-টা খেয়ে তারপর বেরুনো যাবে।

চা-পানান্তে কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর ট্যাক্সি খুঁজিতে বাহির হইয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। বেলা দেবী যদি চায়ের হাঙ্গামাটা না তুলিতেন, তাহা হইলে হয়তো অচিনবাবু-নিয়োজিত চরটি অচিনবাবু-নিয়োজিত ট্যাক্সিখানি ঠিক গলির মোড়টিতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার সুযোগ পাইত না।

অপূর্ববাবু বাহির হইয়া দেখিলেন, গলির ঠিক মোড়েই একটি ভাল সিডান-বডি ট্যাক্সি রহিয়াছে, ডাকিবামাত্রই হর্ন দিতে দিতে সেটি অবিলম্বে আগাইয়া আসিল। বিগত কয়েক দিবস হইতে বেলা দেবীকে কোন উপায়ে আরোহীরূপে পাইবার জন্য ট্যাক্সিখানি অচিনবাবু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আশেপাশে অপেক্ষা করিতেছিল।

বেলা দেবীর গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, তাঁহার ঘরে অশ্লীল চিঠি ছবি ফেলিয়া উত্যক্ত করিবার জন্য এবং তাঁহার ঘরের আনাচে-কানাচে আড়ি পাতিবার জন্য একটি চরও অচিনবাবু নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ট্যাক্সির প্রয়োজন হইতে পারে শুনিবামাত্র চরটি গিয়া ট্যাক্সিখানাকে ডাকিয়া আনিয়া মোড়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল।

বেলা দেবী এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া বলিলেন, চল, বড়বাজার।

অপূর্ববাবু বেলার সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, পিয়ানোর সেতারের এস্রাজের অনেক ভাল গৎ যোগাড় করেছি, অনেক দিন থেকে দেব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে উঠছে না, মানে—

আজ আনলেই পারতেন।

আজও যে আপনার দেখা পাব, তা আশা করি নি। তা ছাড়া—

মোটর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

অপূর্ববাবু এবং বেলা দেবী কেহই লক্ষ্য করিলেন না যে, গাড়ি বড়বাজার অভিমুখে যাইতেছে না। সিডান-বডি গাড়ির অভ্যন্তরে তাঁহারা কথোপকথনে অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ দ্রুতগতিতে চলিবার পর গাড়িখানা সহসা থামিয়া গেল।

ড্রাইভার বলিল, আপনারা নামুন, গাড়ির তেল ক'মে গেছে। আমি আর একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি আপনাদের মোড় থেকে।

অপূর্ববাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, সে কি! তেল ফুরিয়ে গেছে, মানে, আগেই তোমার—

এরূপ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছেন বলিয়া অপূর্ববাবু নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হইয়া পড়িলেন এবং মুখভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন।

বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন, এক পয়সা ভাড়া দেব না তোমাকে।

এ-সংবাদে ড্রাইভার বিচলিত হইল না, অ্যালবার্ট টেরিতে একবার হাত বুলাইল, বুক-খোলা জামার পকেট হইতে সুদৃশ্য একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল এবং একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, বেশ, তাই যদি আপনার ধম্মো হয়, দেবেন না। এখন আমার গাড়িটা ছেড়ে দিন দয়া ক'রে।

নামিতেই হইল।

ড্রাইভার ভাড়ার জন্য অধিক জেদ না করিয়া গম্ভীরমুখে গাড়ি হাঁকাইয়া গলিটা হইতে বাহির হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর অন্ধকার গলি। কলিকাতা শহরেও যে এমন একটা অন্ধকার গলি থাকিতে পারে, তাহা ধারণা করা শক্ত।

বেলা বলিলেন, চলুন, হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়া যাক, তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সি নিলেই হবে।

বেশ, তাই চলুন। উঃ, কি ভীষণ অন্ধকার!

অন্ধকার গলিটার দুই পাশের বাড়িগুলা বিরাটকায় জন্তুর মত মনে

হইতেছে। কোন বাড়িতে যে কোন লোক আছে মনে হয় না, চারিদিক নিস্তব্ধ।

অন্ধকারে দুইজনে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, গলিটা আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদূরে গিয়া বড়রাস্তায় পড়িয়াছে, কে জানে! খানিক দূরে গিয়া একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা গেল, হেলিয়া-পড়া একটা থামের উপর একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলিতেছে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, যাক, বাঁচা গেল, তবু একটা আলো পাওয়া গেল, মানে—অন্ধকারে যেন ক্রমশ, ঠিক ভয় নয়, একটু যেন গা-ছমছমের মত—

অপূর্ব কথা শেষ করিতে পারিলেন না। আচম্বিতে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পাশের আর একটা ক্ষুদ্রতর গলি হইতে বলিষ্ঠ একটা লোক ছুটিয়া আসিল এবং অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে জাপটাইয়া ধরিয়া ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের কয়েকটা বাড়ির কপাট খুলিয়া গেল, দুই-একটা ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ভূপতিত অপূর্বকৃষ্ণকে ঘিরিয়া একটা ছোটলোকের জনতা কলরব শুরু করিয়া দিল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় বেলা দেবী ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ক্ষণপরেই আত্মস্থ হইয়া আগাইয়া গেলেন এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন, এই, এই, ছেড়ে দাও ওঁকে, উনি চোর নন।

জনতা হইতে কে একজন বলিল, ইস, ভারি দরদ যে দেখছি!

আর একজন ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে সায় দিল, হ্যাঁ, পীরিত একেবারে উথলে পড়ছে!

বেলার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলেন, বলিষ্ঠ গুণ্ডাটা অপূর্ববাবুর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

এই, কি করছ? ওঠ, ওঠ বলছি, ছেড়ে দাও ওঁকে।

গুণ্ডাটা ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, ছেড়ে দেব কি ঠাকরুণ! আমার ঘড়ি চুরি ক'রে ভাগছিল শালা, ওকে আমি ছেড়ে দেব?

কই তোমার ঘড়ি?

এই যে, দ্যাখেন না—শালার পকেট থেকে টান মেরে বার করলাম।

রূপার চেনসুদ্ধ একটা নিকেলের ঘড়ি সে তুলিয়া দেখাইল।

ও ঘড়ি ওঁর কাছে ছিল না। শিগগির ওঠ বলছি তুমি।

মজা ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া জনতার ভিতর হইতে রোগা-গোছের এক ছোকরা আনন্দাতিশয্যে মুখের ভিতর আঙুল পুরিয়া সিটি দিল।

আর একজন বলিল, নাঃ, এমন পীরিত মাইরি নাটক-নভেলেও দেখা যায় না।

ফতুয়া-পরা প্রৌঢ়-গোছের একজন ভদ্রলোক বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি, এই মাগীকে সুদ্ধু নিয়ে ওই ব্যাটাকে টানতে টানতে থানায় যাও। ছি ছি ছি ছি! ভদ্দরলোকের পোশাক প'রে যত ব্যাটা ছিঁচকে আঁদাড়ে পাদাড়ে ঘুরছে আজকাল! কালে কালে কতই যে দেখব বাবা!

একটি দ্বিতল বাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি যুবকও সবিস্ময়ে সব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। বেলা দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ওকে ছাড়বে কি না?

জনতার ভিতর হইতে উত্তর আসিল, মাইরি আর কি!

এমন সময় একটা মোটরের হেড-লাইট পড়িয়া সমস্ত স্থানটা আলোকিত হইয়া উঠিল। মোটরখানি নিঃশব্দ-গতিতে আসিয়া হর্ন দিয়া জনতার সম্মুখে থামিয়া গেল, অচিনবাবু স্টিয়ারিং ছাড়িয়া মোটর হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব আয়োজন অনুযায়ী পটভূমিকা ঠিক প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার স্বকীয় ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইলেন।

অতীব বিস্মিতকণ্ঠে ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া বলিলেন, এ কি, মিস্ মল্লিক নাকি! আপনি হঠাৎ এখানে? বাই জোভ!

বেলা মল্লিক যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি অপূর্ববাবুকে উদ্ধার করুন আগে।

নিশ্চয়।

অচিনবাবু রুষ্ট ভঙ্গীতে আগাইয়া গিয়া গুণ্ডাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন এবং তাহাতে ঠিক যেন জাদুমন্ত্রের মত কাজ হইল। গুণ্ডাটা হঠাৎ অপূর্ববাবুকে ছাড়িয়া দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গলিটার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। লোকটার অভিনয়দক্ষতায় অচিনবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। বেলা দেবী লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতেন, অচিনবাবুর চক্ষু দুইটি হইতে একটা চাপা কৌতুকের হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। গুণ্ডাটা পলায়ন করিতেই বেলা পুনরায় অপূর্ববাবুর কাছে গেলেন, দেখিলেন, মূর্ছিত অপূর্ববাবুর নিস্পন্দ দেহটা ধূলায় লুটাইতেছে; আদ্দির পাঞ্জাবি ছিন্ন, নাগরা পদচ্যুত হইয়াছে। অপূর্ববাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটার উপর ঝুঁকিয়া বেলা ডাকিতে লাগিলেন, অপূর্ববাবু, অপূর্ববাবু, ও অপূর্ববাবু!

অপূর্ববাবুর তবু জ্ঞান হয় না। অচিনবাবু তখন অপূর্ববাবুর দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিলেন, ঝাঁকানি খাইয়া তাঁহার জ্ঞান হইল, এবং জ্ঞান হইতেই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মিস মল্লিক—অ্যাঁ—আমি কোথায়—মিস মল্লিক—আমি—আপনি—

প্রিয়নাথ মল্লিক মোটরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া ভগ্নীর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করিতেছিলেন। অচিনবাবু তো তাহা হইলে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। অচিনবাবু আজকাল প্রায় প্রতিদিনই বলিতেছেন যে, শুধু শঙ্কর নয়, বেলার আজকাল নিত্য নূতন বন্ধু জুটিতেছে। আজ একটু আগেই অচিনবাবু প্রিয়নাথবাবুকে বলিয়াছিলেন, মিস মল্লিকের পুরানো গানের মাস্টারের সঙ্গে আজকাল খুব মাখামাখি। আমার এক চর এসে খবর দিলে, এখনই ওঁরা ট্যাক্সি ক'রে বেলগাছিয়া অঞ্চলে এক এঁদো আড্ডায় যাবেন ঠিক করেছেন। শুনে আমার রাগ হয়ে গেল মশাই; আমি একটা গুণ্ডা ঠিক করেছি,

অপূর্ববাবুকে ধ'রে বেশ ক'রে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেয় যেন। এই সময় আমরাও চলুন যাই, মিস মল্লিককে পাকড়াও ক'রে আনা যাক যদি পারা যায়। বুঝলেন না, এ একটা মস্ত সুযোগ।

সত্যই তো, অপূর্ববাবুর সঙ্গে বেলা বেলগাছিয়ায় এই অন্ধকার গলিটায় আসিয়াছে! এখানে আসিবার তাহার কি কারণ থাকিতে পারে? ক্রুদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রিয়নাথ বেলার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেলা অপূর্ববাবুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

না না, ভয় কি আপনার। চলুন, উঠুন, এই যে নিন, জুতো পায়ে দিন।

প্রিয়নাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তিনি বলিয়া বসিলেন, ঢের হয়েছে, আর সোহাগ জানাতে হবে না। বদমায়েস পাজি কোথাকার!

অগ্রজের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বেলা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বিচলিত হইলেন না। অন্তত বাহিরে তাহার কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না। তিনি প্রিয়নাথের দিকে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার পর তাঁহার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অপূর্ববাবুকে বলিলেন, উঠুন, এই নিন, আমার কাঁধে হাত দিন।

প্রিয়নাথের চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল। স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া শ্বাপদের মত দন্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বিচ, বিচ, এ কমান বিচ! কুকুরেরও অধম!

বেলা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

অচিনবাবু কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। এই লোকটা সব মাটি করিল। এত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া আনিলেন যে, বেলা মোটরে উঠার আগে কিছুতেই তিনি যেন আত্মপ্রকাশ না করেন। আত্মপ্রকাশ করিলে বেলা হয়তো মোটরে উঠিতেই চাহিবেন না। বেলাকে মোটরে উঠাইয়া

স্টার্ট দিয়া তবে আত্মপ্রকাশ করিলেই চলিত। সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল। অচিনবাবুর প্ল্যান ছিল, অপূর্ববাবুকে পৌঁছাইয়া দিয়া বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া তিনি সোজা বাহির হইয়া যাইবেন। বেলার দাদাকে বলিবেন যে, তাঁহার একটু কাজ আছে, কাজটুকু সারিয়া তিনি তাঁহাকে এবং বেলাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। কলিকাতার বাহিরে কয়েকজন গুণ্ডা এবং একটা ট্যাক্সি তিনি ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন। বন্দোবস্ত ছিল যে, বেলা এবং বেলার দাদাকে লইয়া একটি জনবিরল মাঠের কাছাকাছি তিনি মোটর থামাইবেন এবং কাজের ছুতায় নামিয়া গিয়া গুণ্ডাগুলিকে খবর দিবেন। তাহারা অচিনবাবুর অনুপস্থিতিতে আসিয়া বেলাকে হরণ করিবে এবং বেলার দাদাকে অচিনবাবুর মোটরে হাত পা মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইবে। প্রিয়নাথের চোখের সম্মুখে গুণ্ডা কর্তৃক বেলা অপহৃত হইলে এবং পরে অচিনবাবু আসিয়া প্রিয়নাথকে উদ্ধার করিলে অচিনবাবুর সহিত বেলা-অপহরণের যে কোন সংস্রব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কার করা শক্ত হইবে। কিন্তু প্রিয়নাথ সহসা আত্মপ্রকাশ করাতে সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।

বেলার কাঁধে ভর দিয়া অপূর্বকৃষ্ণ পালিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অচিনবাবু সহাস্য মুখে সহৃদয় ভঙ্গীতে মোটরের দ্বার খুলিয়া বলিলেন, আসুন আসুন, চলুন, পৌঁছে দিই আপনাদের। আপনি উঠুন প্রিয়নাথবাবু। বেলার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়নাথবাবু উঠিয়া বসিলেন। অপূর্ববাবুও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

আপনিও উঠুন।

অনেক ধন্যবাদ, আপনি অপূর্ববাবুকে ওঁর বাসায় পৌঁছে দিন, আমি যাব না।

চলুন না, আপনাকেও আপনার বাসায় নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, আমি এখন বাসায় ফিরব না।

বেশ তো, কোথায় ফিরবেন বলুন, সেইখানেই নাবিয়ে দিয়ে যাই।

না, তার দরকার নেই, আপনারা যান।

মোটরের ভিতর হইতে প্রিয়নাথ গর্জন করিয়া উঠিলেন, চুলের ঝুঁটি ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে আসুন ওকে, সোজা কথায় ও আসবে না।

অচিনবাবু বলিলেন, আঃ, থামুন আপনি, কি যে বলেন! তাহার পর বেলার দিকে ফিরিয়া একটু অনুনয়ভরে বলিলেন, চলুন চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না আপনি, চলুন। এবং হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন।

হাত ছেড়ে দিন আমার।

আপনি যাবেন না?

না।

কারণটা কি?

আমার খুশি।

সহসা বেলার নজরে পড়িল, আজ সকাল হইতে যে লোকটা তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল জনতার মধ্যে সেও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেলার সন্দেহ হইল, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা যোগাযোগ রহিয়াছে। বহুকাল পূর্বে প্রফেসর গুপ্ত অচিনবাবু সম্বন্ধে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথাটাও মনে পড়িয়া গেল।

চলুন চলুন, ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না।—অচিনবাবু পুনরায় অনুরোধ করিলেন।

আমি যাব না, কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন, অপূর্ববাবুকে পৌঁছে দিন আপনি।

জোর ক'রে যদি ধ'রে নিয়ে যাই, কি করতে পারেন আপনি?

মোটরের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া প্রিয়নাথ পুনরায় গর্জন করিলেন, জোর ক'রেই আসুন না আপনি, কি করে ও দেখি একবার!

আসুন, কি ছেলেমানুষি করছেন!

অচিনবাবু এবার একটু জোরেই বেলার হস্তাকর্ষণ করিলেন। বেলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া সহসা অচিনবাবুর গণ্ডে সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া বারান্দায় দণ্ডায়মান প্রৌঢ়টিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একজন

মহিলাকে এরা সবাই অপমান করছে আর আপনারা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন! কেউ একটু সাহায্য করবেন না আমাকে?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আর পাঁচজনের মত দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে দেখিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। সহসা এই প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া গেলেন।

সাহায্য! আরে, বলে কি? আমাকে সুদ্ধ জড়াতে চায়, কি আপদ!

আর কিছু না পারেন, আমাকে অন্তত সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে থানায় পৌঁছে দিন। পুলিসের আশ্রয়ে তবু খানিকটা ভরসা পাব।

দ্বিতলের বাতায়ন হইতে যুবকের মুখটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সশরীরে তিনি বাহিরে আসিয়া বেলা মল্লিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আসুন, আমার এই বাইরের ঘরে এসে বসুন, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করছি আমি।

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, স্বাস্থ্যবান দীর্ঘাকৃতি একটি যুবক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন, এইবার ঠিক হয়েছে, রতনে রতন চিনেছে। এবং সমস্ত ঘটনাবলীর উপর যবনিকাপাত করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দিলেন।

বেলা মল্লিক অবিলম্বে গিয়া যুবকের বাহিরের ঘরে বসিলেন। অচিনবাবুর যদিও ক্রোধে আপাদমস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং এখন ইহা লইয়া ধাঁটাধাঁটি করা অনুচিত হইবে ভাবিয়া গম্ভীরভাবে মোটরে উঠিয়া মোটরে স্টার্ট দিলেন। প্রিয়নাথ এবং অপূর্ববাবু বেলার কাণ্ড দেখিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। নিঃশব্দ-গতিতে মোটর গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

জনতাও ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

প্রফেসর গুপ্ত খোলা ছাদে বসিয়া কাব্য-আলোচনা করিতেছিলেন। দক্ষিণা বাতাস বহিতেছিল, পাশের তেপায়ার উপর রক্ষিত সুদৃশ্য কাচপাত্রে

স্তূপীকৃত বেলফুলগুলি হইতে মৃদু সৌরভ সমীরিত হইতেছিল, সবুজ রেশমের ঘেরাটোপ-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতির আলোকে পরিবেষ্টনী শ্যামস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, একটি আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া আবেশবিহ্বল-নয়নে মিষ্টিদিদি বসিয়া ছিলেন এবং প্রফেসর গুপ্ত তন্ময়চিত্তে মহাকবি ভাস বিরচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটক পাঠ করিতেছিলেন—

"যদি তাবদয়ং স্বপ্নো ধন্যমপ্রতিবোধনম্।

অথায়ং বিভ্রমো বা স্যাদ বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্॥

কাব্যের ছন্দ-মন্ত্রে উভয়েই স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহা যে বিংশ শতাব্দী এবং তাঁহারা কলিকাতা শহরে আছেন—প্রত্যক্ষভাবে এ চেতনা প্রফেসর গুপ্তের অন্তত ছিল না। অতি-দূর বিগত রূপলোকের আবেষ্টনীতে উদয়ন-বাসবদত্তা-পদ্মাবতীর আনন্দ-শঙ্কা-শিহরণের মধ্যে নিজেকে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হইল।

বাহিরের দুয়ারে কে কড়া নাড়িতেছে!

এখানে আবার কে আসিল! এই সব উপদ্রবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই প্রফেসর গুপ্ত আলাদা এ ছোট বাসাটি ভাড়া করিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রকন্যা আলাদা বাসায় থাকে, প্রফেসর গুপ্ত সকালে সেখানে থাকেন, রাত্রেও সেখানে ফিরিয়া যান, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সামাজিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ আছে। কলিকাতার নির্জন অংশে এই ছোট বাসাটি তিনি ভাড়া করিয়াছেন—সংসারের কলরব, স্ত্রীর মুখর ভাষণ এবং কৌতূহলী প্রতিবেশীগণের আপ্যায়ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অবসরটুকু বিনোদন করিবার জন্য। নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই-চারিজন বান্ধব-বান্ধবী ভিন্ন এ বাসার ঠিকানাই কেহ জানে না। এত রাত্রে কে আসিল?

প্রফেসর গুপ্ত উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

পাশের বাড়িতে নয় তো?

আবার শব্দ হইল।

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এই বাড়িতেই। যান, দেখে আসুন, কে এল! আমাকেও এবার পৌঁছে দিয়ে আসুন, রাত অনেক হ'ল। রিনিটা এতদিন ছিল, কোন ভাবনাই ছিল না।

প্রফেসর গুপ্ত উঠিতে উঠিতে বলিলেন, রিনি কি চ'লে গেছে?

হ্যাঁ, পরশুদিন ওর স্বামী এসে নিয়ে গেছে ওকে।

লক্ষ্ণৌ?

হ্যাঁ।

প্রফেসর গুপ্ত নামিয়া গেলেন।

কপাট খুলিয়া যাঁহাকে তিনি দেখিলেন, তাঁহাকে তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই, মিস বেলা মল্লিক অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া গ্রীবাভঙ্গী-সহকারে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রফেসর গুপ্তের মনে পড়িল, এই নূতন বাসাটার ঠিকানা দিয়া কিছুদিন পূর্বে তিনি বেলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু বেলা আসেন নাই। রাস্তার উপরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল এবং ট্যাক্সিতে একজন কে যেন বসিয়া ছিলেন।

হঠাৎ তুমি এ সময়ে যে?

যখন নেমন্তন্ন করেছিলেন, আসতে পারি নি, আজ বিপদে প'ড়ে এসেছি। আমাকে এক রাত্রির জন্যে আজ আশ্রয় দিতে পারবেন?

কেন, ব্যাপার কি?

আমি এখনই বাসায় ফিরে দেখলাম, আমার ঘরে তালা ভেঙে কে ঢুকেছিল। আমার চাকরবাকর এখন কেউ নেই, একা ও-বাসায় থাকতে ভয় করছে।

জনার্দন সিং কোথা গেল?

সে দেশে গেছে। আশ্রয় দিতে পারবেন এক রাত্রের মত?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, ভেতরে এস। মিসেস মিত্রও আছেন এখানে।

মিষ্টিদি?

হ্যাঁ।

দাঁড়ান, ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে।

ট্যাক্সির নিকট গিয়া বেলা সেই যুবকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, যেন সে তাঁহাকে আবার বেলগাছিয়ায় পৌঁছাইয়া দেয়, এজন্য তিনি অগ্রিম ভাড়াও দিয়া দিলেন। ট্যাক্সি চলিয়া গেল। প্রফেসর গুপ্ত ও বেলা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মিষ্টিদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, এ কি, বেলা নাকি? তারপর, হঠাৎ কি মনে ক'রে?

এমনই এলাম।—তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আজ থাকব রাত্রে এখানে।

তার মানে?

প্রফেসর গুপ্ত উত্তর দিলেন, ওর বাড়িতে তালা ভেঙে কে যেন ঢুকেছিল আজ, সেই ভয়ে ও পালিয়ে এসেছে, এখানে থাকতে চাইছে রাত্রে।

মিষ্টিদিদির মুখের হাসিটা একটু যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তবু জোর করিয়া একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বেলা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রফেসর গুপ্ত সহসা সবিস্ময়ে বলিলেন, ও কি, তোমার কোমরে ওটা কি?

ছোরা। এখুনি কিনলাম।

কেন?

কাছে একটা থাকা ভাল।

মিষ্টিদিদিও ক্ষণকাল কুচকুচে কালো খাপটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন এবং পুনরায় আর একটু হাসিয়া পুনরুক্তি করিলেন, কি ভীতু মেয়ে বাবা!

বলা বাহুল্য, প্রফেসর গুপ্ত একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। প্রথমত, বেলার এই আকস্মিক আবির্ভাব সত্যই যে আকস্মিক, প্রফেসর গুপ্ত ইহার বিন্দুবিসর্গও যে পূর্বাহ্ণে জানিতেন না, তাহা হয়তো মিসেস মিত্র বিশ্বাস করিবেন না। কারণ তাঁহার হাসির অন্তরালে যাহা

বিচ্ছুরিত হইতেছিল, তাহা আনন্দজনিত অথবা আনন্দজনক নহে। দ্বিতীয়ত, তিনি ভাবিতেছিলেন, বেলাকে লইয়া কোথায় রাখা যায়? এ বাসায় প্রফেসর গুপ্ত থাকেন না, রাত্রে বাড়িতে ফিরিয়া যান, সেখানে বেলাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। অথচ এখানেও বেলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া অসঙ্গত। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। বেলা এবং মিষ্টিদিদি নীরবে পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রফেসর গুপ্ত ভাবিতেছিলেন, কি করা যায়!

সহসা মিষ্টিদিদি সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

বেলা এখানে কোথা থাকবে? তার চেয়ে চলুক আমার সঙ্গে, রিনিটা চ'লে গিয়ে বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

প্রফেসর গুপ্ত সোৎসাহে সায় দিলেন।

বেশ তো, সেই ভাল।

বেলাও নিশ্চিন্ত হইলেন। [illegible] ন্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে প্রফেসর গুপ্তের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল [illegible] মিষ্টিদিদির সাহচর্য মনোরম না হইলেও নিরাপদ। একটা রাত্রি কোনরকমে তাঁহার সহিত কাটাইয়া দেওয়া পারে। বেশ তো, তাই চলুন।

সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন।

২৬

শঙ্করের পক্ষে মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা শ্বাসরোধকর হইয়া উঠিয়াছিল। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্র দুইটির অত্যাচার আর সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহারা শঙ্করের অজ্ঞতার কিছু-না-কিছু নিদর্শন প্রায় প্রত্যহই গোপনে মাতৃসমীপে উপস্থাপিত করিত। কর্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়াল তাহা লইয়া শঙ্করকে সোজাসুজি কিছু বলা যদিও অকর্তব্য মনে করিতেন, কিন্তু বাঁকাপথে শঙ্করকে সচেতন করিয়া

দিতে ইতস্তত করিতেন না। যেমন আজ সকালে বলিতেছিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, অনিলটার সব বিষয়ে জানবার এমন আগ্রহ! আমাকে কাল থেকে ও বিরক্ত ক'রে মারছে পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় জানবার জন্তে। আপনাকে হয়তো ভয়ে বলতে পারে নি, আপনি তো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যান, পেঙ্গুইন পাখিদের বিষয় দয়া ক'রে দেখে আসবেন তো একটু, আপনারও হয়তো সব জানা নেই ও-সম্বন্ধে। আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। ভয়ে ভয়ে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, এরূপ ভীতু প্রকৃতির বালক অনিলচন্দ্র নয়। সে শঙ্করকে পেঙ্গুইনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে এবং শঙ্কর অজ্ঞতা প্রকাশ করায় মুখ টিপিয়া হাসিয়াছে। কারণ নিজের জ্ঞানবৃদ্ধি-মানসে তো সে শঙ্করকে প্রশ্ন করে নাই, সে শঙ্করের বিদ্যার দৌড় কত দূর তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য প্রশ্নটা করিয়াছিল এবং তজ্জন্য একজন সহপাঠীর বাড়িতে একটা মাসিক-পত্রে পেঙ্গুইন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজে পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হইয়া বসিয়াছিল। শঙ্করকে বিব্রত করাই তাহার উদ্দেশ্য। শঙ্কর মিসেস স্তানিয়ালকে মৃদু হাসিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, সে যত শীঘ্র সম্ভব পেঙ্গুইন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনিলের জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত করিয়া দিবে। অনিল সম্বন্ধে সত্য সত্যই তাহার যাহা মনে হইতেছিল, তাহা সে মিসেস স্তানিয়ালকে বলে নাই। অকস্মাৎ সহায়-সম্পতি-বিহীন হইয়া ক্রমশ সে এই সত্যটি উপলব্ধি করিতেছিল যে, জটিল সংসার-পথে স্বচ্ছন্দে চলিতে হইলে সব সময় মুখের কথা এবং মনের কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। অনুগৃহীত ব্যক্তির মুখের রূঢ় সত্যভাষণ কেহই শুনিতে চাহে না। প্রফেসর গুপ্ত তাহাকে যে টুইশনিটি জুটাইয়া দিয়াছিলেন, একটু মানাইয়া চলিলে তাহা থাকিত এবং তাহাকে এমন দুর্দশায় পড়িতে হইত না। স্পষ্ট-ভাষণের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া না আনিলে যে উপায় নাই, তাহা সে বুঝিয়াছিল বলিয়াই মিসেস স্তানিয়ালকে বলিতে পারিল না, আপনার

পুত্র দুইটি ডেঁপো হইয়া উঠিয়াছে এবং এই ডেঁপোমির প্রশ্রয় দিলে উহারা উচ্ছন্ন যাইবে। মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়কে আদর্শ মানবে পরিণত করিবার দায়িত্ব তাহার নহে। তাহার কর্তব্য সর্বাগ্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হওয়া। যেমন করিয়া হউক নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। যতদিন তাহা না পারিতেছে, ততদিন একটা অন্তঃসারশূন্য আত্মসম্মানকে উগ্রভাবে আস্ফালিত করিয়া লাভ নাই। যতদিন একটা কিছু না জুটিতেছে, ততদিন পেটভাতায় থাকিয়াও অখিল-অনিলের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইবে। শঙ্কর ভাবিয়া পাইত না, অখিল-অনিল তাহাকে ক্রমাগত এমন জ্বালাতন করে কেন? শঙ্কর না জানিলেও একটা কারণ ছিল। শঙ্কর আসিবার পূর্বে চুনচুন ইহাদের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, শঙ্কর খুব বিদ্বান, নানা বিষয়ে তাহার প্রচুর জ্ঞান। শঙ্করের বিদ্যাবত্তাকে পদে পদে বিমলিন করিয়া দিয়া তাহারা চুনচুনের উক্তি যে মিথ্যা, মিসেস স্যানিয়ালের নিকট তাহাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইত। মিসেস স্যানিয়ালের কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই সম্ভবত তিনি শঙ্করকে বিদায় করিয়া দেন নাই। শঙ্কর যে প্রতিদিন দুই বেলা অখিল-অনিলের পাঠ্যবিষয়গুলি অতিশয় পরিশ্রমসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেয়—সে সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া তিনি প্রায় প্রত্যহই বিপত্নীক দেবর পীতাম্বরবাবুকে বলিয়া থাকেন, যদিও আমার অখিল-অনিলকে পড়াবার মত বিদ্যে শঙ্করবাবুর নেই, তবু ছেলেটিকে রেখেছি বাড়িতে, ভদ্রলোকের ছেলে, বিপদে পড়েছে, হাজার হোক—। কাঁচাপাকা-গোঁফ-দাড়ি-ভ্রূ-সমন্বিত পীতাম্বরবাবু চোখে মুখে এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তোলেন, যাহার অর্থ—এই তো আপনার মত মহিয়সী মহিলার উপযুক্ত কথা। শঙ্কর-সম্পর্কীয় আলোচনা অবশ্য বেশিক্ষণ চলিত না। কারণ পীতাম্বরবাবু আসিলেই মিসেস স্যানিয়াল কোন না কোন ছুতায় চুনচুনকে আহ্বান করিতেন এবং তাহাকে পীতাম্বরবাবুর দৃষ্টির সম্মুখবর্তী করিয়া দিতেন। এই ঈষন্নির্বোধ প্রৌঢ় বিপত্নীক দেবরটির স্কন্ধে চুনচুনকে চাপাইয়া দিবার সুবুদ্ধি সম্ভবত কর্তব্যপরায়ণতার জন্যই তাঁহার মস্তিষ্কে কিছুদিন হইতে অঙ্কুরিত

হইয়াছিল। চুনচুন আবার কখন কি করিয়া বসে, সে সম্বন্ধে তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। পীতাম্বরবাবু শুধু বিপত্নীক নহেন, অপুত্রক এবং শাঁসালো। চুনচুনের সহিত ইঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে সব দিক দিয়াই সুখের হইবে—ইহাই কর্তব্যপরায়ণা মিসেস স্যানিয়ালের বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি চলিতেছিলেন। বিধবা-বিবাহ তো আজকাল অনেকেই করিতেছে, ইহারাই বা করিবে না কেন? চুনচুন যদিও কিছু বলে নাই, তবু শঙ্কর দুই-চারি দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। কিন্তু, শুধু বুঝিয়া কি করিবে? চুনচুনকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কোন সঙ্গতিই এখন তাহার নাই। নিজের সামর্থ্য থাকিলে চুনচুনকে হয়তো সাহায্য করিতে পারিত, কিন্তু এখন সে নিজেই নিরুপায়। চুনচুনের এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা শঙ্করকে আরও যেন উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব, একটা চাকুরি তাহাকে যোগাড় করিয়া ফেলিতেই হইবে।

অখিল-অনিলকে পড়াইয়া রাত্রি প্রায় নয়টার পর শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল। প্রকাশবাবুর সহিত দেখা করিয়া আজই সে ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, ওই প্রুফ-রীডারের চাকুরিটা তাহার হইবে কি না! প্রুফ সংশোধন করা বিদ্যাটা সে তো ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল দুপুরবেলাটা সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটায়। সাহিত্য, বিশেষত সাহিত্য-সমালোচনার বইগুলি তাহার বড় ভাল লাগে। আমাদের দেশে সাহিত্য বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা যে কতদূর অসাহিত্য, ক্রমশ তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে। বিদেশী সাহিত্যের নকলে মৌলিকতা জাহির করিতে গিয়া যেসব অসুন্দর রচনা ছদ্মবেশে আসর জমাইতেছে, তাহাদের ব্যঙ্গ করিয়া সে কয়েকটা কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া শঙ্কর সহসা থামিয়া গেল। ঠিক বাহিরের ঘরে প্রকাশবাবু এবং আরও কে

একজন বসিয়া তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলেন। উৎকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কই মশাই, প্রুফ-রীডার সেই যে ছেলেটির কথা আপনি বলেছিলেন, তাকে আনলেন না তো ?

বক্তা সম্ভবত প্রেসের মালিক।

প্রকাশবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাকে হাতে রেখেছি, একটু অপেক্ষা করুন না মশাই দুদিন।

কেন ?

আরে মশাই, ও হ'ল গিয়ে (ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে) পরের ছেলে। একটি নিজেদের ছোকরা যদি পাই, তা হ'লে আর ওকে ডাকি কেন, বুঝলেন না ? আমাদের মাইতি মশায়ের একটি ভাইপো দেশ থেকে নাকি আসবে শিগগির শুনেছি, সে যদি আসে, তা হ'লে আর—। শঙ্কর আর দ্বারে করাঘাত করিল না, দাঁড়াইলও না। বিপরীত মুখে সোজা হনহন করিয়া চলিতে লাগিল।...নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে হাঁটিবার পর শঙ্করের খেয়াল হইল, এইবার বাড়ি ফেরা দরকার, রাত হইয়াছে। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য একটা গলিতে ঢুকিবামাত্রই একটি দ্রুতগামী সাইকেলের সহিত ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া যাইবার মত হইল। সাইকেল-আরোহী নামিয়া পড়িল।

এ কি, চাম গ্যান্‌টঅ যে !

ভন্টু !

কোথাও লাগে নি তো ?

না।

এত জোরে বেল দিচ্ছিলাম, তুই শুনতে পাস নি ? খিঙিং আপিস খুলতে খুলতে আসছিলি বুঝি ? একদিন খিংং আপিস খুলবি দেখছি। অনেকদিন তোর খবর-টবর পাই না—ব্যাপার কি বল্‌তো, কোথা যাচ্ছিস ?

বাসায়।

বাসা আবার কোথায় ?

গড়পার।

যদিও ভন্টু সব জানিত, তবু জিজ্ঞাসা করিল, হস্টেলে থাকিস না আজকাল ?

না।

চল্, আমাদের বাড়ি চল্। বিড্ডিকার আজ ফৈশিয় অ্যাফেয়ারে ঢুকেছে, এতদিন পরে তোকে দেখলে খুশি হবে। কাল রবিবার, আমার ছুটি আছে, হোল নাইট প্রোগ্রামে ঢুকি চল্, আজ তোর সমস্ত হদিস ইন ডিটেল আয়ত্ত করব।

শঙ্কর দোটানায় পড়িয়া গেল। দুঃখের দিনে পুরাতন বন্ধু ভন্টুকে দেখিয়া ভালও লাগিতেছিল, অথচ তাহার সহিত যাইতেও কেমন যেন ইচ্ছা করিতেছিল না, কেমন যেন সঙ্কোচ হইতেছিল। যে ভন্টুকে সে এতকাল অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়াছে, তাহাকে সে নিজের সব কথা খুলিয়া বলিবে কি করিয়া ? কোনও একটা অজুহাতে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু ভন্টু কিছুতেই ছাড়ল না।

শঙ্কর তখন বলিল, তা হ'লে বাসায় একটা খবর দিয়ে যেতে হয়, তা না হ'লে ওরা ভাববে।

বেশ, তাই চল্।

শঙ্কর যখন ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল, তখন প্রায় রাত এগারোটা। ভন্টুর বউদিদি রান্নাবাড়া শেষ করিয়া ভন্টুর অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। ভন্টুর সহিত শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

ওমা, এতদিন পরে পথ ভুলে না কি ?

শঙ্কর একটু হাসিল।

ভন্টু বলিল, ও একটা চোর, চেন না ওকে।

এস, ব'স।

বউদিদি তাড়াতাড়ি একটা মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছ না কি?

ভন্টু পুনরায় উত্তর দিল, ভুলে যাও সেসব কথা, মুড়ি মুলে খাবে ও এখন।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, শুনলাম, আপনি মাছ-টাছ অনেক রকম রান্না করেছেন, সেই লোভে এলাম।

বেশ তো।

ভন্টু বাইকটা উঠানে রাখিবার জন্য সেটাকে ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

শঙ্কর বউদিদিকে বলিল, আমি খবর-টবর না দিয়ে অসময়ে এলাম, কম প'ড়ে যাবে না তো?

একমুখ হাসিয়া বউদিদি উত্তর দিলেন, যা আছে তিন জনে ভাগ ক'রে খাব।

ঘরের ভিতর হইতে দরাজ গলায় বাকু হাঁক দিলেন, ও বউমা, ভন্টু ফিরল? চারদিকে যা দাঙ্গা হচ্ছে!

বউদিদি ঘরের ভিতর গেলেন।

ভন্টু ফিরেছে, বাঁচা গেল! ও, তাই নাকি? শঙ্করও এসেছে, ভাল ভাল। কিন্তু চারদিকে ভীষণ দাঙ্গা, সব লোক ক্ষেপে উঠেছে, শঙ্করকে আজ আর যেতে দিও না এত রাত্রে, এইখানেই খাওয়াদাওয়া ক'রে শুয়ে থাক। 'বঙ্গবাসী' যা লিখছে—ভীষণ কাণ্ড।

বউদিদি হাস্য-স্নিগ্ধ মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভন্টু বাইক রাখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বউদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ড কি বলছেন?

উনি আজ সন্ধ্যে থেকে নিজের আলোটি জ্বেলে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজে বেরিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে নাকি দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তুমি এতক্ষণ ফিরছিলে না, খুব ভাবছিলেন উনি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, দাঙ্গা তো বড়বাজার অঞ্চলে গত সপ্তাহে হয়েছিল, এখন তো আর কিছু নেই।

ভন্‌টু বলিল, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ডের কাণ্ডকারখানাই আলাদা, তুই তার কি বুঝবি ?

বউদিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাবা যে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পড়েন, ওঁর কাছে খবরটা আজ এসে পৌঁছেছে। উনি কানে তো একদম কিছু শোনেন না, 'বঙ্গবাসী' প'ড়েই বাইরের খবর যা কিছু পান।

ভন্‌টু জিজ্ঞাসা করিল, নতুন আলোটা বাকুর পছন্দ হয়েছে ?

খুব। কাউকে হাত দিতে দেন না, আমি সন্তর্পণে খালি তেলটি ভ'রে দিই। উনি নিজের হাতে চিমনি ডোম সমস্ত পরিষ্কার করেন। এ তুমি এক আপদ জুটিয়েছ বাপু।

কেন ?

ছাইয়ের গুঁড়ো, ফরসা ন্যাকড়া, কাঁচি—ওঁর বাতি জ্বালার তরিবৎ করতে করতে সমস্ত বিকেলটা যায় আমার।

ভন্‌টু শরীরের উপরাধ নাচাইতে নাচাইতে বলিল, বা কুর কুর কুর কুর কুর কুর—

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, বউয়ের কাছে ও-রকম ঢঙ করলে বউ কাছেও ঘেঁষবে না ব'লে দিচ্ছি। শঙ্কর-ঠাকুরপোকে বলেছ সব কথা ?

শঙ্কর বলিল, শুনেছি।

একমুখ হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, আপিসের বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, অনেক দেবে থোবে।

ভন্‌টু বাকুর ঘরের জানালায় উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। শঙ্করকে বলিল, দেখ্‌ দেখ্‌, লর্ড বাক্‌ল্যাণ্ডকে দেখবি আয়।

শঙ্করও উঠিয়া উঁকি দিয়া দেখিল, ধপধপে ফরসা বিছানায় বসিয়া পরিষ্কার-ওয়াড়-দেওয়া এবং দামী-তোয়ালে-আবৃত তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া বাকু 'বঙ্গবাসী' পাঠ করিতেছেন। পাশে টুলের উপর প্রকাণ্ড গড়গড়া, রূপালী-জরি-লাগানো জমকালো নল, মাথার দিকে টেবিলে শুভ্র-ডোম-সমন্বিত সুদৃশ্য টেবিল-ল্যাম্প্‌। চশমার পুরু লেন্স্‌ হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে।

শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন ধপধপে ফরসা মুখমণ্ডলে একটা গম্ভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস বসিয়া রহিয়াছেন।

বউদিদি দুইখানি আসন পাতিয়া গ্লাসে জল গড়াইতে গড়াইতে বলিলেন, আর রাত ক'রো না, ব'স তোমরা।

উভয়ে আসিয়া উপবেশন করিল।

ভন্টু বলিল, দাদা বোধ হয় আজ স্টার্ট্ করবেন বউদি।

বউদিদি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তাই তো লিখেছিলেন।

শঙ্কর খবরটা শোনে নাই, বলিল, দাদা ফিরে আসছেন নাকি?

বউদিদি নিজের আনন্দ আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, শরীর বেশ সেরে গেছে, জ্বর-টর আর হয় না।

জলের গ্লাস দুইটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বউদিদি ভাত বাড়িবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে যাইতেছিলেন।

ভন্টু বলিল, বউদি, শোন, মাছের মুড়োটা এই ছোকরাকে দিও। অত্যন্ত সৎকার্য করছেন ইনি আজকাল; বিয়ে ক'রে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গ্রে-ট সোল!

বিবাহের কথায় বউদিদি শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

ভন্টু শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, অমন গোমড়া-গোছের মুখ ক'রে কেন ব'সে আছিস রে রাস্কেল! ভরপেট খেয়ে আজ ঘুমো, কাল জালফিদারিক ব্যাপারে ঢুকব, দেখি কি করতে পারি!

জালফিদারিক মানে?

জুলফিদার শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় করলে জালফিদারিক হয় না?

তাতে কি?

আমাদের আপিসের বড়বাবুকে দেখিস নি কখনও?

না।

হি ইজ জুলফিদার দি গ্রেট—মাই প্রস্‌পেক্‌টিভ ফাদার-ইন-ল। কাল

তাকে খুঁজলে দেখব, তোর জন্যে যদি কিছু করতে পারি। আজ ভরপেট খেয়ে বাফেলোয়িং কর্।

বাফেলোয়িং শব্দটাও শঙ্কর বুঝিতে পারিল না এবং তাহা লক্ষ্য করিয়া ভন্টু বলিল, মোষের মত ঘুমো।

বউদিদি দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ের সম্মুখে তাহা রাখিয়া বলিলেন, খাও, নেবু কেটে রেখেছি, নিয়ে আসছি।

ভন্টু বলিল, সেটি হচ্ছে না। তোমার যা কিছু আছে—পাই পয়সা সমস্ত নিয়ে এস, আর একখানা থালাও নিয়ে এস, যা আছে তিনজনে সমান ভাগ ক'রে খাব। আমরা ইডিয়টের মত গোগ্রাসে গিলে যাব আর তুমি উপোস ক'রে গ্রেট্নেসের লদ্‌কালদ্‌কি করবে, সেটি হচ্ছে না।

ব'স না তোমরা, বসছি আমিও।

আমাদের সামনে বসতে হবে, তোমাকে চিনি না আমি—থিফ কোথাকার!

বাবা বাবা, বড় জ্বালাতন কর তুমি ঠাকুরপো!

শঙ্কর বলিল, ভাগ ক'রে খাওয়ারই তো কথা হয়েছিল।

অগত্যা বউদিদি আর একটি থালা আনিতে গেলেন।

২৫

পরদিন সকালে শঙ্কর বাসায় ফিরিয়াই শুনিল যে, মুকুজ্জেমশাই কাল রাত্রে তাহার চলিয়া যাইবার পর আসিয়াছিলেন এবং শঙ্করকে অবিলম্বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাও দিয়া গিয়াছেন। ঠিকানাটা প্যারুপেন্টাইন লেনের। মুকুজ্জেমশাই বাসা পরিবর্তন করিয়াছেন, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় আর তিনি থাকেন না। সংবাদটা শুনিয়াই শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় মিসেস স্যানিয়াল বলিলেন, আপনি এখন আবার বেরুচ্ছেন নাকি কোথাও?

হ্যাঁ।

অখিল ডিনামিক্‌সের কি যেন একটা বুঝতে পারছে না। কাল রাত্রে আপনি চ'লে যাবার পর থেকেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও। ভেবেছিল, আপনি ফিরলে সকালেই বুঝিয়ে নেবে। কাল তো আপনি সারারাত বাইরে রইলেন, আজ আবার এসেই বেরিয়ে যাচ্ছেন! ওরে অখিল!

অখিল পাশের ঘরে বসিয়া ক্যারম খেলিতেছিল। শঙ্করের মেজাজটা ভাল ছিল না, তথাপি যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর দিল, এখন আমাকে যেতেই হবে, আমি ফিরে এসে বুঝিয়ে দেব।

মিসেস স্যানিয়ালের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল। মিসেস স্যানিয়াল শঙ্করের গমন-পথের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ গুম হইয়া রহিলেন এবং তাহার পর চুনচুনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, ক্রমশ গুণ বেরুচ্ছে ভদ্রলোকের। শুধু শুধু কি আর ভগবান কাউকে বিপদে ফেলেন! তা ফেলেন না। কি ছেলে, কি মেয়ে—আজকাল কারও কর্তব্যবোধ নেই, সেইজন্যেই এত দুঃখ তাদের। চুনচুন ঘরের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল, নীরবে তাহাই করিতে লাগিল। মিসেস স্যানিয়াল তাহার দিকে একটা রুষ্ট দৃষ্টি হানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর দ্রুত পথ অতিবাহন করিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। সারা মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি। ভন্টু, ভন্টুর বউদিদি কাল তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছে; ভন্টু তাহাকে আশ্বাসও দিয়াছে যে, যেমন করিয়া হউক সে তাহার হবু-শ্বশুরকে ধরিয়া তাহাকে তাহাদেরই আপিসে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া দিবে। তাহাদের আপিসে শীঘ্রই একজন নাকি লোক বাহাল করা হইবে, বেতন পঁচাত্তর টাকা হইতে শুরু—দেড়শোর গ্রেড। ভন্টু বলিয়াছে, এখন এইটাতেই ঢোক্, তারপর জুলফিদারকে ধরে লিফ্‌ট করিয়ে দেব তোর। একবার সুড়ঙ্গ কেটে ঢোক্ তো। এই দেখ্ না, আমার আড়াইশোর গ্রেডে লিফ্‌ট হয়ে গেছে? চাকরির এমন একটা আশু এবং সুনিশ্চিত-প্রায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিন্তু শঙ্করের চিত্ত আনন্দিত হইয়া উঠে নাই।

মনের ভিতরটা কেমন যেন করকর করিতেছিল। যে ভন্টু বিদ্যায় বুদ্ধিতে সব বিষয়ে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, সে-ই তাহাকে ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। ধনীর একমাত্র কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, আড়াই শত টাকা বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছে, ইতিমধ্যে কিছু লাইফ ইন্সিওর করিয়াছে এবং শীঘ্র আরও করিবে। অথচ সে আত্মীয়পরিজন বিচ্যুত হইয়া অত্যন্ত ঝুটা একটা আদর্শের পতাকা স্কন্ধে করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ আদর্শের মূল্য কি? তা ছাড়া, সত্যই কি আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল? সে অমিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়—ঝোঁকের মাথায় নিজের ক্ষুধিত বাসনা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার জন্য। সে উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই। ওই অতি-সরল হাবা-গোবা অমিয়া ইন্ধনের যোগ্যতাও লাভ করিতে পারে নাই। বাসনা-বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করিবার মত ক্ষমতা ওই ঘোমটা-দেওয়া জড়ভরত প্রকৃতির অমিয়ার মধ্যে নাই। শঙ্করের বারম্বার মনে হইতে লাগিল, সে ঠকিয়া গিয়াছে—ভয়ঙ্কর ঠকিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর উপায় নাই, এই ভুলটাকে লইয়াই সারা জীবন চলিতে হইবে। ঈর্ষার ক্ষুদ্র কীটটা অন্তরের অন্তস্তলে বসিয়া দংশন করিতেছিল, নিজের দুরবস্থায় এবং ভন্টুর সচ্ছলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ কেমন যেন বিষাইয়া উঠিয়াছিল, মনে এতটুকু স্বস্তি ছিল না।

খানিকক্ষণ হাঁটিবার পর অনেক খুঁজিয়া সে অবশেষে সার্পেন্টাইন লেনে মুকুজ্জেমশাইয়ের নূতন বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। একটি ছোট দ্বিতল বাসা। নীচের বসিবার ঘরটি খোলাই ছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই নাই, আর একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন।

মুকুজ্জেমশাই কোথায়?

তিনি একটু বেরিয়েছেন, আপনার নামই কি শঙ্করবাবু?

হ্যাঁ।

বসুন, আপনাকে বসতে ব'লে গেছেন তিনি, এখনই আসবেন।

শঙ্কর নিকটের বেঞ্চিতে উপবেশন করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি শঙ্করের

মুখের দিকে সস্মিত ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আপনাকে যেন কোথায় দেখছি ব'লে মনে হচ্ছে।

শঙ্করও হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আপনার মুখটাও চেনা চেনা ঠেকছে।

ভন্টু থাকিলে আসুনি-দারুজির পিতা নিবারণবাবুকে অবিলম্বে চিনিতে পারিত। শঙ্কর মাত্র একদিন ভন্টুর সহিত নিবারণবাবুর দোকানে চা পান করিতে গিয়াছিল; সুতরাং নিবারণবাবুকে ঠিক কোথায় দেখিয়াছে মনে করিতে পারিল না। এই ছোট দ্বিতল বাড়িখানি নিবারণবাবুরই, মুকুজ্জেমশাই ভাড়া লইয়াছেন। নিবারণবাবু যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়িটিও পাশেই। শুধু ভাড়াটে হিসাবেই নয়, মুকুজ্জেমশাই লোকটি পরোপকারপ্রবণ এবং নানাস্থানে তাঁহার অনেক [illegible]শোনা লোক আছে শুনিয়া নিবারণবাবু তাঁহার সহিত আলাপ ক[illegible]। আসুনির কোন সন্ধানই এখনও মেলে নাই। পুলিসে সংবাদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু পুলিস কিছু করিতে পারিতেছে না। নিবারণবাবু মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, মুকুজ্জেমশাইকে সব কথা বলিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

আপনি বসুন শঙ্করবাবু, আমি উঠি। আপনাকে আটকাবার জন্যেই মুকুজ্জেমশাই আমাকে বসিয়ে রেখে গেলেন। মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে তিনি এই একটু বেরিয়েছেন, এখনই এসে পড়বেন।

মৃন্ময়বাবু এখানে আছেন নাকি?

হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীও এসেছেন, ওপরে আছেন। আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, আমাকে দোকানে বেরুতে হবে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন। মৃন্ময়ের স্ত্রীর কথায় বহুদিন আগেকার একটা ছবি শঙ্করের মনে জাগিয়া উঠিল। মৃন্ময় মোটর চাপা পড়িয়া হাসপাতালে ছিল এবং তাহার স্ত্রীকে রাত্রে সেখানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রোরুদ্যমানা হাসির মুখখানা মনে পড়িল। সহসা রিনির মুখখানাও মনে পড়িয়া গেল। লক্ষ্ণৌয়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে রিনির বিবাহ হইয়াছে। শঙ্করকে কি তাহার এখনও মনে আছে? শঙ্করকে কি সে

ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? বহুদিন পরে রিনির স্মৃতিকে ঘিরিয়া তাহার কল্পনা স্বপ্নলোক সৃজন করিতে লাগিল।

শঙ্কর এসে পড়েছ দেখছি!

অন্যমনস্ক শঙ্কর সচকিত হইয়া দেখিল, মুকুজ্জেমশাই আসিয়াছেন, সঙ্গে মৃন্ময়। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু বসিলেন না, বলিলেন, তুমি এইখানেই খেয়ে যেও, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, পালিও না যেন। আমি সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট থেকে আসছি এখনই ঘুরে।

ও বাসায় কে আছে?

ও বাসায় একটি রুগী আছে। আমারই চেনা-শোনা একজন, রাজমহল থেকে এসেছে; যে দাতব্য ছাত্রে থাকত সেখানে, সে দু দিন থেকে আসছে না। তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসছি আমি এখনই। তুমি যেও না, বম্বে থেকে চিঠি এসেছে, হয়তো হয়েও যেতে পারে কাজটা। ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন তারা তোমার ফোটো চেয়েছে একখানা। আমি একজন ফোটোগ্রাফারকে ব'লে এলাম, সে বিকেলের দিকে আসবে।—মৃন্ময়, ও মৃন্ময়, তুমি এসে শঙ্করের সঙ্গে গল্প-সল্প কর ততক্ষণ।

শঙ্কর মৃন্ময়ের দিকে পিছন ফিরিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত কথা কহিতেছিল, কখন সে উপরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সে টের পায় নাই।

আপনি যান, আমি বসছি।

মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর পুনরায় বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ফোটো চাহিয়াছে কেন? ফোটো লইয়া তাহারা কি করিবে? সম্ভব-অসম্ভব নানা কল্পনা মনে জাগিতে লাগিল। মনে হইল, যিনি মাসিক-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, হয়তো তিনি একটি কন্যারত্নেরও স্বত্বাধিকারী। পছন্দসই একটি সহকারী সম্পাদক পাইলে তাহাকে জামাই-পদেও বরণ করিবেন। এবার ফোটো চাহিয়াছেন। ফোটো পছন্দ হইলে বোধ হয় কুষ্ঠি চাহিয়া পাঠাইবেন। মনে মনে শঙ্কর এক ব্যক্তিকে জামাই সহকারী

সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া কল্পনায় রঙ চড়াইতে লাগিল। মেয়েটি হয়তো লাবণ্যময়ী পুষ্পিত-যৌবনা তন্বী, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতি মাসে হয়তো একটি করিয়া কবিতা লিখিতে হইবে, হয়তো কবিতা তাহার পছন্দ হইবে না, হয়তো সেই বিম্বাধরোষ্ঠীকে বিগলিত করিবার সাধনায় নব নব ছন্দ উপমার অনুসন্ধানে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে। হয়তো—

সহসা উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়া একটা উচ্চ নারীকণ্ঠস্বর তাহার কল্পনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

জানি গো জানি, সব জানি—আমার কাছে আর অত ভালবাসা ফলাতে হবে না; তোমার স্বর্ণলতার কাছে ওসব সোহাগ জানাওগে যাও, তোমাকে বুঝতে আর বাকি নেই আমার।

স্বর্ণলতা! চকিতের মধ্যে শঙ্করের মনে বহুকাল পূর্বের আর একটি রাত্রির কথা মনে পড়িল। স্বর্ণলতার নামাঙ্কিত সেই চিঠিখানি এখনও তাহার কাছে আছে। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর লক্ষ্য করিল, তাহার চক্ষু দুইটি হইতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।—মৃন্ময় হাসিয়া বলিল।

তা হ'লই বা। আমি বেশ তো ব'সেই আছি।

একটু ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় বলিল, আমার সব কথা শুনেছেন আপনি?

না, কিছুই শুনি নি।

শোনবার কথা অবশ্য নয়, কারণ কাউকেই আমি জানাই নি, এমন কি ভন্টুকে পর্যন্ত নয়। মুকুজ্জেমশাই অবশ্য জানেন সব কথা, কিন্তু তাঁকেও হালি, মানে—আমার স্ত্রী বলেছে, আমি বলি নি।

তাহার পর জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা পাঁচজনকে ব'লে বেড়িয়ে লাভ কি বলুন?

মিনিটখানেক অস্বস্তিকর একটা নীরবতার পর শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি?

আমার এক ছোট্ট ভাই ছিল, চিনতেন তাকে আপনি ? আপনাদের কলেজেই পড়ত।

কি নাম বলুন তো ?

চিন্ময়।

শঙ্কর মনে করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনে পড়িল না। তথাপি বলিল, মনে হচ্ছে যেন নামটা শোনা।

আমার সেই ভাই বোমার দলে যোগ দিয়ে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে জেলে আছে এখন। আর সেইজন্যেই আমার চাকরিটি গেছে। আমি পুলিসের আই.বি.তে চাকরি করতাম। যার নিজের ভাই রেভলিউশনারি, তাকে আই.বি.তে রাখবে কেন ? মৃন্ময় সহসা চুপ করিয়া গিয়া আবার বলিল, দুঃখ তাও নয়, আসল দুঃখ—। পুনরায় থামিয়া গেল, আবার তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা অস্বাভাবিক জ্বালা ফুটিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে হঠাৎ আবার জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আসল দুঃখ, **I am a fallen man**—আমার পতন হয়েছে, সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। **I have bungled my whole life**—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছি।

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল, মৃন্ময় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট বসুন, আমি ব'লে আসি—আপনি খাবেন আজ দুপুরে। আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি।

শঙ্করকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

২৬

যে দিন মনোরমা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায় অজ্ঞান হইয়া গেল, সেদিন হইতে মুকুজ্জেমশাই ও-বাসায় আর রাত্রিবাস করেন নাই। ডাক্তার, নার্স ডাকিয়া তিনি মনোরমার চিকিৎসার

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রে সেখানে থাকা উচিত মনে করেন নাই। পরদিন গিয়া একজন রাঁধুনী ও একজন চাকরানী বাহাল করিয়া মনোরমাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, আমি রোজ আসব। বুড়ী রাঁধুনী তার ছেলেকে নিয়ে রাত্রে থাকবে, চাকরানীও রাত নটা পর্যন্ত থাকবে। আমার সঙ্গে আর একটি ছেলে আছে, তাই আমি আর একটি বাসা নিয়েছি। আমি রোজ এসে খবর নিয়ে যাব তোমার, কোন ভাবনা নেই।

মনোরমা কোন আপত্তি করে নাই, বস্তুত কোন উত্তরই সে দেয় নাই। অজ্ঞান হইয়া যাইবার পর হইতে সে অসম্ভব রকম নীরব হইয়া গিয়াছে, মুকুজ্জেমশাই প্রত্যহ আসেন, খোঁজ-খবর করেন, সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার শেষ বক্তব্য যেন সে বলিয়া দিয়াছে, আর যেন তাহার বলিবার কিছু নাই।

আজ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা নাই। রাঁধুনী বলিল, সেও সকাল হইতে মনোরমাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঘরের ভিতর মুকুজ্জেমশাইয়ের নামে একটি পত্র পাওয়া গেল। অতি ক্ষুদ্র পত্র।

শ্রীচরণেষু, আমি চলিলাম। আমাকে খুঁজিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। ইতি—

প্রণতা

মনোরমা

২৭

যদিও মিষ্টিদিদির স্বামী অধ্যাপক মিত্রের কিছুদিন হইতে 'হার্ট্ ট্রাবল্' বাড়িয়াছিল, তথাপি তিনি একটি থিসিস লিখিতেছিলেন এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়া ছিলেন। অধ্যাপক মিত্রের সহিত মিষ্টিদিদির সম্পর্ক কোনদিনই বেশি রকম ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। থিসিস লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি আরও যেন দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে গ্রীক নাটকের প্রভাব

লইয়া তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, অন্য কিছুর খবর রাখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। মিষ্টিদিদি কখন বাড়িতে থাকেন, কখন থাকেন না, কখন আসেন, কখন যান, কাহার সঙ্গে মেশেন, কাহার সঙ্গে মেশেন না—এ সকল খবর রাখিবার কোন প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না, কারণ এ সকল খবরের সহিত তাঁহার থিসিসের কোন সম্পর্ক নাই। গ্রীক নাটকের কোন প্রভাব ইংরেজী নাটকে পড়িয়াছে কি না এবং পড়িয়া থাকিলে কতটুকু পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতেই তিনি ব্যস্ত। ইহা লইয়াই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কলেজে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নিজের বাড়ির লাইব্রেরি-ঘরে অতিবাহিত হয়। পুরাতন ভৃত্য জগদীশ তাঁহার স্নান, আহার, বেশ-পরিবর্তন হইতে শুরু করিয়া কখন তাঁহার কলেজ যাইবার সময় হইল, কবে কোথায় কাহার সহিত এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে, কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় বইগুলি হাতের কাছে রাখিতে হইবে, সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে। অর্থাৎ জগদীশ যদি স্ত্রীলোক হইত, তাহা হইলে জগদীশকে ব্যাকরণসম্মতভাবে প্রফেসর মিত্রের জীবন-সঙ্গিনী বলা চলিতে পারিত। মিষ্টিদিদি সামাজিক আসরে মিসেস মিত্র, মিস্টার মিত্রের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া তাঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই। রঙ্গমঞ্চের বাহিরে দুইজন দুই জগতের লোক।

মিষ্টিদিদির প্রতি প্রফেসর মিত্রের মনোভাব কিন্তু অদ্ভুত-ধরনের। প্রফেসর মিত্র মিষ্টিদিদিকে যেন ভয় করেন। অপরাধী বালক যেমন ভয়ে ভয়ে অভিভাবককে এড়াইয়া চলে এবং অভিভাবক কোন একটা কিছু লইয়া অন্যমনস্ক থাকিলে নিশ্চিন্ত হয়, প্রফেসর মিত্রও ঠিক তেমনই মিষ্টিদিদিকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন এবং মিষ্টিদিদি যা-হোক-একটা কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিলে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন। প্রফেসর মিত্র মিষ্টিদিদিকে যে চেনেন না তাহা নয়, কিন্তু না চিনিবার ভান করেন। মিষ্টিদিদি নিকটে আসিলে সমস্ত দন্তপাতি বিকশিত করিয়া এমন আন্তরিকতার সহিত আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি হাসেন যে, মনে হয়, তিনি কিছুই জানেন না ; মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির খোশামোদ করিতেছেন ; মনে হয়, তিনি মিষ্টিদিদির প্রীত্যর্থে

সব-কিছুই করিতে প্রস্তুত। মিষ্টিদিদি সরিয়া গেলেই তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়, জগদীশকে ডাকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিতে বলেন এবং রুদ্ধ দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টিতে দুই-একবার তাকাইয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। শুধু যে মিষ্টিদিদিকে দেখিয়াই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা নয়, মিষ্টিদিদির ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরটা তাঁহার পড়ার ঘরে ঢুকিলেও তিনি সমান অস্বস্তি বোধ করেন এবং অনুরূপ আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া তাহার গায়ে মাথায় আলতো আলতো হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। মিষ্টিদিদি অথবা মিষ্টিদিদির কুকুর উভয়ের সম্বন্ধেই প্রফেসর মিত্রের মনোভাব অনেকটা এক রকম, অধ্যয়নের অন্তরায় হিসাবেই যেন উভয়কেই তিনি ভয় করেন এবং উহাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন না বলিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করেন। তাঁহার নিজের ধারণা অর্থাৎ যে ধারণাটাকে তিনি সচেতন মনের সদরে কিঞ্চিৎ কপটতার সহিত প্রশ্রয় দেন তাহা এই যে, দুর্নিবার অধ্যয়ন-স্পৃহাই একটা নেশার মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং বহুবিধ কর্তব্যকর্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছে। এই বিচ্যুতির জন্য তিনি সর্বদাই লজ্জিত। ইহার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই তিনি যেন মিষ্টিদিদির স্বেচ্ছাচারকে সহ্য করেন; শুধু তাহাই নয়, স্বেচ্ছাচারের আবিলতরঙ্গে গা ভাসাইয়া মিষ্টিদিদি যে দয়া করিয়া তাঁহাকে রেহাই দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার প্রতি একটা কৃত্রিম কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। প্রফেসর মিত্র কোন দিন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই, দেখিতে চাহেন নাই—আসল গলদ কোন্‌খানে! নিজের দুর্বলতা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না, এমন কি নিজের কাছেও নহে। সর্বগ্রাসী অধ্যয়ন-স্পৃহার উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া মিত্রমহাশয় সুখে ছিলেন, দোষারোপ করিবার মত একটা কিছু না পাইলে তিনি পাগল হইয়া যাইতেন।

প্রফেসর মিত্র অ্যারিস্টোফ্যানিস পড়িতেছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে। মিষ্টিদিদি বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। ফিরিলেও তিনি সোজা উপরে চলিয়া যাইবেন, প্রফেসর মিত্রকে বিরক্ত করিবেন না, ইহাই চিরাচরিত

প্রথা। কিন্তু আজ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল, সশব্দে দ্বার ঠেলিয়া মিষ্টিদিদি প্রবেশ করিলেন। সর্বাঙ্গে কমলা রঙের জরিদার শাড়ি ঝলমল করিতেছে, চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখা। মনে মনে বিব্রত হইলেও প্রফেসর মিত্র নাক হইতে চশমাটি কপালে তুলিয়া আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসিটি হাসিয়া বলিলেন, ও, তুমি! কোথায় গিয়েছিলে, সিনেমায়?

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, কি বই ছিল?

সিনেমায় যাই নি, প্রফেসর গুপ্তের বাড়ি থেকে আসছি।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-মিশ্রিত একটি তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া এক হাত কোমরে দিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ঠামে মিষ্টিদিদি দাঁড়াইলেন, টেবিলে স্তূপীকৃত বইগুলির দিকে একবার চাহিয়া প্রফেসর মিত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঘৃণা যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল। প্রফেসর মিত্র বিচলিত হইলেন না, বলিলেন, ওঃ, প্রফেসর গুপ্ত। বেশ বেশ।

মিষ্টিদিদি কাজের কথা পাড়িলেন, আমাকে দুশো টাকার একখানা চেক দাও দিকি।

দুশো টাকার চেক? কেন?

কাল আমি দার্জিলিং যাব, এখানে আর ভাল লাগছে না।

ও। প্রফেসার গুপ্তও যাবেন নাকি?

না, একাই যাব।

প্রফেসর মিত্র আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। ড্রয়ার খুলিয়া চেক-বহি বাহির করিলেন এবং দুই শত টাকার চেক লিখিয়া দিলেন। মিষ্টিদিদি চেক লইয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া গেলেন। কাল সত্যই তিনি দার্জিলিং চলিয়া যাইবেন। প্রফেসর গুপ্তকে উতলা করিবার জন্যই অল্প কিছুদিন সরিয়া থাকা দরকার। বেলা যদিও পরদিন উঠিয়াই নিজের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য প্রফেসর গুপ্তের দুর্ভাবনার বহরটা মিষ্টিদিদির নিকট মোটেই উপাদেয় মনে হয় নাই। আজ মিষ্টিদিদি প্রফেসর গুপ্তের সহিত ছদ্ম কলহ করিয়া আসিয়াছেন, কাল ছদ্ম অভিমান করিয়া

কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষ-মানুষকে বশে রাখিতে হইলে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হয়।

২৮

মৃন্ময়ের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া, বিশেষত মৃন্ময়ের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, শঙ্কর একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা শুধু যে মুষড়াইয়া গিয়াছে তাহা নয়, কেমন যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের নিজের দুঃখও কম নয়, কিন্তু মৃন্ময়ের দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। শঙ্কর স্বেচ্ছায় খেয়ালের বশবর্তী হইয়া দুঃখকে বরণ করিয়াছে, নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, দুঃখের ভারে ভগ্নমেরুদণ্ড হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে নাই। তাহার আদর্শ ঝুটা হইতে পারে, সে কিন্তু সে আদর্শ হইতে এতটুকু বিচ্যুত হয় নাই, তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকেই এখনও আঁকড়াইয়া আছে। অর্থাৎ তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধন একটা বলিষ্ঠতা দ্বারা মহিমান্বিত। পিতামাতার বিরুদ্ধে অমিয়াকে বিবাহ করিয়া সে হয়তো ভুল করিয়াছে, কিন্তু সেই ভুলটাকে সংশোধন করিবার নিমিত্ত সে নিজের অহঙ্কৃত পৌরুষকে অপমানিত করে নাই। সগৌরবে উন্নত শিরে নিজের স্বেচ্ছাকৃত ভুলের লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে ও করিবে। এমন কিছুই করে নাই বা করিবে না, যাহা আত্মধিক্কারের গ্লানিতে সমস্ত অন্তর অহরহ বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। মৃন্ময়ের কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছে। হাসিকে বিবাহ করিয়া অন্তর্হিতা স্বর্ণলতার প্রেমে একনিষ্ঠ থাকিয়া পুলিসে চাকরি করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন হইলে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া দিব—এই অসম্ভব আদর্শকে অনুসরণ করিতে গিয়া মৃন্ময় স্বাভাবিক নিয়মে আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়া হাসিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। বিনিময়ে হাসির ভালবাসা সে পাইয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিয়া হাসি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হাসি যদি মৃন্ময়কে আর একটু কম ভালবাসিত

অথবা সে যদি আর একটু চাপা গম্ভীরপ্রকৃতির মেয়ে হইত, তাহা হইলে তাহার ঈর্ষাক্ষুব্ধ অন্তর এমন প্রখরভাবে হিংস্র হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে মৃন্ময়কে অকপটে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া এবং মনের ভাষার সহিত মুখের ভাষার পার্থক্য রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অকপটে সে মৃন্ময়কে এই প্রতারণার জন্য ধিক্কার দিতেছে। মৃন্ময়ের চাকুরিবিহীন জীবন হাসির বাক্যবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে।

মৃন্ময়ের আর একটা মুশকিল হইয়াছিল, কাহারও কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে পারিতেছিল না। কাহার নিকট বলিবে? সে মুখ-চোরা-প্রকৃতির লোক, কাহারও সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না, কাহারও সহিত তাহার হৃদ্যতা জন্মে না। ভন্টু তাহার পরিচিত, কিন্তু ভন্টুর অভিধান-বহির্ভূত বাক্যাবলীকে সে ভয় করে। হয়তো তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে কতকগুলা অদ্ভুত শব্দ সৃজন করিয়া বসিবে এবং যেখানে সেখানে আওড়াইতে থাকিবে। তা ছাড়া ভন্টুর পরিবারের সকলেরই সম্বন্ধে মৃন্ময়ের আর একটা কারণে কিঞ্চিৎ বিরূপ মনোভাব ছিল। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা ইহারা কেহই সহানুভূতির চক্ষে দেখে নাই, ইহাকে একটা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে ফেলিয়া তাহা লইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছে। মৃন্ময়কে তাহারা অবশ্য অনুকম্পার চক্ষে দেখিত, কিন্তু মৃন্ময় পুনরায় যখন বিবাহ করিল, তখন তাহা তাহাদের নিকট আর একটা স্থূল রসিকতার খোরাক যোগাইল মাত্র। সেজন্য মৃন্ময় ভন্টুকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে।

সেদিন শঙ্করকে নিকটে পাইয়া, শঙ্করের নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়া এবং তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ সহৃদয় আলাপে মুগ্ধ হইয়া মৃন্ময় নিজের সমস্ত কথা শঙ্করকে খুলিয়া বলিয়াছিল। অনুরোধ করিয়াছিল, শঙ্কর যেন আবার আসে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ফেরত তাই সে পুনরায় একদিন মৃন্ময়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল। দেখিল, মৃন্ময় একাই আছে, মুখুজ্জেমশাই বাহিরে গিয়াছেন। শঙ্কর বলিল, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকদূর নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর মৃন্ময় বলিল, জ্বালাতন হয়ে উঠেছি।

কেন?

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সে অন্য দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষণকাল নীরবতার পর সহসা মৃন্ময় বলিল, চানাচুর খাবেন?

আপত্তি কি!

মোড়ে একটা লোক চানাচুর বিক্রয় করিতেছিল, মৃন্ময় আগাইয়া গিয়া তাহার নিকট হইতে তিন ঠোঙা চানাচুর খরিদ করিয়া ফেলিল। মনিব্যাগের ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি পয়সা বাহির করিয়া কিছুক্ষণ সেটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। ব্যাগটা উপুড় করাতে একটা আনি বাহির হইল। চানাচুরের দাম চুকাইয়া পয়সা দুইটি ব্যাগে পুরিতে পুরিতে বলিল, বাস্, দুটি পয়সা মাত্র বাকি রইল আর।

তিন ঠোঙা কিনলেন কেন?

একটা আমার স্ত্রীর জন্যে নিয়ে যাব, ভারি ভালবাসেন চানাচুর খেতে।

হাসিয়া মৃন্ময় একটি ঠোঙা পকেটে পুরিল। আসলে চানাচুওয়ালাকে দেখিয়া হাসির কথাই তাহার মনে হইয়াছিল; হাসির জন্য কিনিতে গিয়াই ভদ্রতার খাতিরে আরও দুই ঠোঙা কিনিতে হইল।

চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে নীরবে উভয়ে হাঁটিতে লাগিল। মিনিট-খানেক পরে শঙ্কর সহসা দেখিল, মৃন্ময় পাশে নাই, সে যে কখন একটা কাপড়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, ভিড়ে শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারে নাই। শঙ্কর দেখিল, একটা শো-কেসের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া মৃন্ময় দাঁড়াইয়া আছে।

কি দেখছেন?

কি চমৎকার শাড়িখানা দেখুন, কি অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠী রঙ!

মৃন্ময় খানিকক্ষণ শাড়িটার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল, যাই, চলুন।

আবার উভয়ে চলিতে শুরু করিল।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর মৃন্ময় আপন মনেই যেন বলিল, কে জানে! তাহার পর শঙ্করের দিকে হঠাৎ ফিরিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা বলুন তো?

কি বিষয়ে?

আবার নতুন ক'রে শুরু করলে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে?

নিশ্চয়।

মৃন্ময় কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর দেখিল, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

শঙ্কর পুনরায় বলিল, না পাবার কোন কারণ নেই।

মৃন্ময় ইহারও কোন জবাব দিল না, আবার নীরবে দুইজনে পথ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া বলিল, কিছুতেই জুটছে না, আশ্চর্য!

কি?

চাকরি।

আমারও তো সেই অবস্থা।

আপনার চাকরি তো হয়ে গেছে।

কে বললে?

আপনি আসবার একটু আগে ভন্টু এসেছিল। সে বললে, তার আপিসে যে চাকরিটা ছিল, সেটা আপনি পেয়ে গেছেন।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আমিও ওই চাকরিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, ভন্টু বললে, সে তা জানত না। আমিও অবশ্য ভন্টুকে কিছু বলি নি, মানে—আপনি তো সবই জানেন।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

মৃন্ময় হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল, চলুন, ফেরা যাক। আর বেড়াতে ভাল লাগছে না।

বেশ, চলুন।

ফিরিবার পথে মৃন্ময় বলিল, একটা উপকার করবেন আমার?

কি?

আমি খবরের কাগজে মুড়ে আমার শালখানা লুকিয়ে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি ক'রে হোক, কিছু টাকা কাল এনে দিতে হবে। এসব জিনিস কোথায় বিক্রি করে আমার জানা নেই, আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে।

মৃন্ময়ের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া শঙ্কর দেখিল, মৃন্ময় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

২৯

সমস্ত শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই নিবারণবাবুকে বলিলেন, আপনার মেয়ে দোষী কি নির্দোষ, সে কথা এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

নিবারণবাবু সকরুণভাবে মুকুজ্জেমশাইয়ের দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করুন আপনি, একেবারে নির্দোষ সে। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

আহা, আপনি অমন করছেন কেন? সে দোষী হোক নির্দোষ হোক, তাতে কিচ্ছু এসে যায় না।

খুব এসে যায়। সে নির্দোষ—এ বিশ্বাস না থাকলে কি তাকে ফিরে পাবার জন্যে আমি এমন উতলা হতাম?—নিবারণবাবুর গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, তার নিজের কোন দোষ নেই।

মুকুজ্জেমশাই হাসিমুখে উত্তর দিলেন, বেশ, বিশ্বাস করলাম।

নিবারণবাবু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিতেই মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমি তো আপনার কথাতে অবিশ্বাস করি নি, আমি বলতে চাইছিলাম যে, সে যদি দোষীও হয়, তা হ'লেও তাকে আমি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতাম।

নিবারণবাবু অবুঝের মত পুনরায় বলিলেন, না, সে দোষী নয়। মুকুজ্জেমশাই স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন, আর উত্তর দিলেন না। একটু পরে নিবারণবাবু বলিলেন, তা হ'লে আপনি—

এ কাজে আমি কয়েকদিন পরে হাত দেব। শঙ্কর আর মৃন্ময়ের যতক্ষণ না একটা কিছু হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অন্য কোন কাজে হাত দিতে পারছি না। আর একজনেরও খোঁজ করতে হবে আমাকে। আপনাকে এ বিষয়ে আর বার বার এসে বলতে হবে না, আমার যথাসাধ্য আমি ঠিক যথাসময়ে করব। আচ্ছা, এবার আমি উঠি। বেরুতে হবে একবার।

আচ্ছা, আমি এখন যাই তা হ'লে।

নিবারণবাবু চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্জেমশাই কয়েকখানি টাইপ-করা দরখাস্ত গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবারণবাবু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িলেন। মৃন্ময়কে এবং শঙ্করকে তিনি দুই স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি নিজে আরও দুই স্থানে যাইবেন, তা ছাড়া তিনটি আপিসে তিনখানি দরখাস্ত দিয়া আসিতে হইবে, পোস্টে না পাঠাইয়া সেখানকার পৈরবি-চুমরান্বিত বাবুদের হাতে দিলে বেশি ফলপ্রদ হইবে। শিরীষের পত্রখানিও অবিলম্বে পোস্ট করা দরকার, তাহা না হইলে সে আবার অকারণে ছুটি লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া পড়িবে। শঙ্করের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে মুকুজ্জেমশাইয়ের সহসা মনে হইল, শিরীষকে বোধ হয় সুশীলাই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহা না করিলে শিরীষ মনে মনে হাজার চিন্তিত হইলেও একা এতদূরে আসিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চাহিত কি না সন্দেহ। কিছুদূর গিয়া মুকুজ্জেমশাই

থামিলেন এবং অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে হইল, সুশীলাকে এ বিষয়ে কিছু লেখা উচিত। ফিরিয়া আসিয়া শিরীষবাবুর নামে লেখা খামটি জল দিয়া ভিজাইয়া খুলিয়া লিখিলেন—

কল্যাণীয়া সুশীলা,

তুমি সম্ভবত শঙ্করের জন্য বেশি উতলা হইয়াছ এবং শিরীষকে উত্যক্ত করিতেছ। শিরীষ অবশ্য তাহা আমাকে লেখে নাই, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি। শিরীষকে উত্যক্ত করিও না, শঙ্কর ভাল আছে, শীঘ্রই তাহার একটা চাকরি জুটিবেই। অমিয়াকেও চিন্তিত হইতে বারণ করিও। ইতি—

মুকুজ্জেমশাই

খামটি জুড়িয়া মুকুজ্জেমশাই আবার বাহির হইয়া গেলেন।

দিন-দশেক পরে শঙ্কর সহসা কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিল যে, মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে সে আর থাকিবে না। নিজের জন্য নয়, চুনচুনের জন্যই তাহাকে মিসেস স্যানিয়ালের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার জন্য চুনচুনকে অহরহ বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইতেছে। চুনচুন নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু শঙ্করের আর সহ্য হইতেছে না। শঙ্কর হাঁটিতে হাঁটিতে বেলার বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বেলার বাসাতেই বরং সে আপাতত কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় লইবে, কিন্তু মিসেস স্যানিয়ালের ওখানে আর নয়। বেলার বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর কিন্তু অবাক হইয়া গেল। বাড়ির সামনে 'টু লেট' ঝুলিতেছে, দরজায় তালা-লাগানো। বেলা বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে! শঙ্কর খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ গেল কোথায়? পাশের বাড়ির একটি ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, প্রায় পনেরো-ষোল দিন পূর্বে মিস মল্লিক বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ইহার বেশি কোন খবর সে আর বলিতে পারিল না, আশে-পাশে কেহই পারিল না। আশ্চর্য এই কলিকাতা শহর! কেহ কাহারও খবর রাখে না, প্রতিবেশীর খবর রাখার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করে না। এখানে অতি-পরিচিত লোকেরও নাগাল পাইতে হইলে বাড়ির রাস্তা এবং নম্বর জানা থাকা প্রয়োজন। ঠিকানার সূত্রটুকু হারাইয়া গেলে, এই বিরাট জনসমুদ্রে লোকটাই হারাইয়া যাইবে। যদি দৈবানুগ্রহে অকস্মাৎ কোনদিন দেখা না হইয়া যায়, তাহা হইলে বেলাও হয়তো হারাইয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, প্রফেসর গুপ্তের নিকট খোঁজ করিলে হয়তো কোন খবর পাওয়া যাইতে পারে, এ বাড়িটা তো প্রফেসর গুপ্তেরই একজন বন্ধুর বাড়ি। প্রফেসর গুপ্তের বাড়িতে গিয়া শঙ্কর শুনিল, প্রফেসর গুপ্ত বাড়িতে নাই। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গলিটা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। ঠিক করিল, আর একদিন আসিয়া খোঁজ করিবে। আরও খানিকক্ষণ অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় ঘুরিয়া সে ঠিক করিল, ভন্টুর বাসায় যাওয়া যাক, এতক্ষণ সে হয়তো আপিস হইতে ফিরিয়াছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিয়া শঙ্কর দেখিল যে, আর একটু দেরি হইলে ভন্টুর সহিতও দেখা হইত না। এক-একদিন এ রকম হয়, কাহারও সহিত দেখা হয় না, যাত্রাটাই নিষ্ফল হইয়া যায়। ভন্টু বাইকে চড়িতে যাইতেছিল, শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তোর কাছেই যাব ভাবছিলাম, জাল্‌ফিদারিক অ্যাফেয়ার সাক্‌সেস্‌ফুল, চাকরি হয়ে গেছে, দিন পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্‌ লেটার পাবি। জুল্‌ফিদার প্রথমটা একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই, কচলে কচলে ব্যাঙ তেতো ক'রে ফেললাম, শেষটা দিক হয়ে জুল্‌ফিদার রাজী হ'ল।

শঙ্কর বলিল, আমার কিন্তু ভাই একটা অনুরোধ আছে।

কি?

চল্, রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। কোন্ দিকে যাচ্ছিস তুই?

আমি তোর খোঁজেই ম্যাডাম গুম্ফের বাসায় যাব ঠিক করেছিলাম। তুই যখন এসে পড়েছিস, তখন চল্, আর এক জায়গায় যাওয়া যাক, সেখানে যাওয়া দরকার।

ভন্টু ইতিমধ্যেই নিজস্ব ধরনে মিসেস স্যানিয়ালের নূতন নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

হাসছিস যে?

নামকরণটা বেশ হয়েছে।

ভন্টু কিছু না বলিয়া নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া গলা হইতে 'গোঁক' 'গোঁক' ধরনের একটা শব্দ বাহির করিল।

কোন্ দিকে যাচ্ছিস তুই বল্ তো?

ওরিজিন্যালের কাছে।

মানে, দশরথবাবুর কাছে?

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে মুক্তোর মুখখানা মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল।

কি রে, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, ভাবছিস, আমি কিছু জানি না! ওরিজিন্যালের কাছ থেকে সব হদিস পেয়েছি তোর। কানা করালীও কিছু আভাস দিয়েছিল তোর কুষ্ঠি দেখে।

কিসের আভাস?

মোল্লা অ্যাফেয়ারের।

কাছা দেয় না বলিয়া ভন্টু নারী মাত্রকেই মোল্লা বলে, শঙ্কর তাহা জানিত। ওরিজিন্যালের নিকট হইতে ভন্টু মুক্তোর ব্যাপার শুনিয়াছে নাকি? শঙ্করের মুখটা একটু যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে পর-মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, শুনেছিস, বেশ করেছিস। এবং অত্যন্ত সপ্রতিভ একটা হাসি হাসিয়া বলিল, চল্।

ভন্টু অলক্ষিতে মুখ বিকৃত করিয়া একটু ভ্যাঙাইল এবং চলিতে শুরু

করিল। খানিকক্ষণ নীরবে চলিবার পর বলিল, ম্যাডাম গুপ্তের আস্তানা এবার ত্যাগ্ কর্ তুই। চাকরি তো হয়ে গেল, এবার আলাদা একটা বাসা কর্, বউকে নিয়ে আয়, ওসব মোল্লাফায়িং ছাড়্।

আমি চাকরি করব না।

ভন্টু যেন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িল।

চাকরি করবি না, মানে?

চাকরি করব না তা বলছি না, কিন্তু তোর এ চাকরিটা করব না। এটাতে তুই মৃন্ময়বাবুকে ঢুকিয়ে দে, ও ভদ্দরলোকের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়।

ভন্টু নির্বাক বিস্ময়ে শঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল। ছোকরা হন্যে কুকুরের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মাথা গুঁজিবার একটা জায়গা নাই, কাল কোথায় কি ভাবে অন্ন জুটবে তাহাও বোধ হয় অনিশ্চিত, অথচ ভাল একটা চাকরি হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে! যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিয়া রাখাই ভন্টুর জীবনের মূলমন্ত্র। এ জাতীয় মনোবৃত্তি তাহার ধারণার অতীত।

মৃন্ময়কে না হয় ঢুকিয়ে দিলাম, কিন্তু তোর হাল কি হবে? তোর কি একটা ভয়-ডরও নেই?

শঙ্কর সহাস্যে উত্তর দিল, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়?

শিশিরে কি ভয়?

মৃন্ময়বাবুর চাকরি পাওয়া আগে দরকার। ভদ্দরলোক কাপড়-জামা বিক্রি করতে শুরু করেছেন। আমাকে নিজের শালখানা বিক্রি করবার জন্যে দিয়েছেন, যদিও এখনও বিক্রি করতে পারি নি।

মোমবাতির এ রকম দুরবস্থা হয়েছে, অথচ আমাকে কিছু বলে নি তো!

শঙ্কর ইহার কোন উত্তর দিল না। উভয়ে আবার নীরবে চলিতে লাগিল।

তুই তা হ'লে তোর বাবার কাছে ফিরে যা, হাতে পায়ে ধ'রে মিটিয়ে ফেল্‌গে যা।

সে অসম্ভব।

উন্মাদ হয়ে গেলি নাকি হঠাৎ? বাবার কাছে ফিরে যাবি না, চাকরি জুটিয়ে দিলে করবি না, একাধিক মোল্লা জুটিয়েছিস—

শঙ্কর হাসিয়া ফেলিল।

কোন ভয় নেই তোর, সব ঠিক হয়ে যাবে। মৃন্ময়কে এ চাকরিটায় ঢুকিয়ে দে তুই।

তার মানে জুলফিদারকে ফ্রেশ খজ্লাতে হবে। খজলে খজলে লোকটাকে এমনিই তো ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেলেছি, বেশি খজলালে আবার দরুচে না যায়!

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। সে বারম্বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তো মনের মধ্যে বারম্বার আনাগোনা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হাঁটিয়া শঙ্কর বলিল, আমি আর দশরথবাবুর কাছে যাব না, তুই যা।

ভনটু মুখটা স্থচালো করিয়া বলিল, কেন, লজ্জা করছে বুঝি?

অনর্থক একটা অপ্রিয় জিনিসের ভেতর গিয়ে লাভ কি?

ওরিজিন্যাল কম্প্লিটলি চেঞ্জ্‌ড, সে মানুষই আর নেই। গুম হয়ে চুপচাপ ব'সে থাকে, কথা-টথা একদম বলে না। যে মেয়েমানুষটাকে রেখেছিল, সেটা খুন হয়ে যাবার পর মিস্টার ফাইভ কেমন যেন হয়ে গেছে, তা ছাড়া হাঁপানিতে ধরেছে।

কে খুন হয়ে গেছে? মুক্তো?

খবরের কাগজে পড়িস নি তুই? মহা হৈ-চৈ হ'ল যে কদিন তাই নিয়ে।

খবরের কাগজের সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক নেই। সত্যি জানিস তুই? কে খুন করলে?

কতকগুলো গুণ্ডা। তাকে খুন ক'রে তার গয়নাপত্তর টাকাকড়ি যা ছিল সব নিয়ে গেছে। একটা ভাঙা তোরঙ্গ খালি প'ড়ে ছিল, ওরিজিন্যালের কাছে আছে সেটা।

খানিকক্ষণ হাঁটিয়া উভয়ে ওরিজিন্যালের বাসার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়িখানা যেন স্তূপীকৃত পুঞ্জীভূত খানিকটা অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলো নাই। ভন্টু সাইকেলের ঘণ্টা বাজাইতেই সম্মুখের দ্বার খুলিয়া এক ব্যক্তি সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, কে, ভন্টুবাবু নাকি? কদিন আসেন নি, আমি ভাবছিলাম, কি হ'ল আবার আপনার! কেমন আছেন?

অবুস্থবু।

ভেতরে আসুন, একটু পরামর্শ আছে। সঙ্গে উনি কে?

চাম গ্যান্‌ঢঅ।

দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।

ভদ্রলোক পুনরায় ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানে কানে চুপি চুপি বলিল, ইনি হচ্ছেন নেপো, দই মারতে এসেছেন। ওরিজিন্যালের দূরসম্পর্কের ভাগনে হয়, নিঃসন্তান বড়লোক মামার দুঃখে বিগলিত হয়ে সেবা করতে এসেছে রাস্কেল। হাড় কিপ্‌টে।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলিয়া উঠিল।

ভন্টু বলিল, চল্‌, এবার যাওয়া যাক।

শঙ্কর ভিতরে গিয়া লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিল। লোকটি যুবক নয়, প্রৌঢ়। গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, গোঁফ দাড়ি নাই, গলায় কণ্ঠি, চোখে মুখে চতুরতার সহিত বৈষ্ণবভাবের অদ্ভুত একটা সমন্বয়। ভন্টু বলিল, আপনি কি এতক্ষণ অন্ধকারে ব'সে ছিলেন নাকি?

ভদ্রলোক এতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, ভন্টুর কথা শুনিবামাত্র প্রশান্তভাবে চোখ দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন এবং কথাটা যেন ভালভাবে প্রণিধান করিয়া পুনরায় চাহিলেন।

কেরোসিনের আলো জেলে কতখানি অন্ধকার আমরা দূর করতে পারি, বলুন?

লন্‌কোলদ্‌কি রেখে আসল কথাটা কি বলুন ?

মামা যে একেবারে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, তার উপায় কি করি বলুন আগে আপনি।—এইটুকু বলিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং খানিকক্ষণ বুজাইয়া রাখিয়া আবার খুলিলেন। শঙ্কর লক্ষ্য করিল যে, নিজের এবং অপরের কথোপকথনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি চক্ষু বোজেন এবং খোলেন। ইহার মধ্যে বেশ একটা ছন্দ আছে।

শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন এবং ভন্টুর দিকে ফিরিয়া চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিন।

উনি চাম্‌ গ্যান্‌টঅ—শঙ্কর, আমার একজন পুরোনো বন্ধু। এবং শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, ইনি হচ্ছেন নৌফউ-শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র কর—দশরথবাবুর ভাগ্নে, মামার জন্যে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন ক'রে ফেলেছেন।

সতীশবাবু সবিনয়ে শঙ্করকে নমস্কার করিতে শঙ্করও প্রতি-নমস্কার করিল।

ভন্টু বলিল, দশরথবাবুর সঙ্গে দেখা হবে এখন ?

সতীশবাবু স্মিতহাস্যসহকারে চক্ষু দুইটি বুজিয়া এবং খুলিয়া বলিলেন, কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই, তিনি একটিও কথা বলবেন না, খালি বিরক্ত হবেন। আগে যা-ও দু-একটা কথা বলছিলেন, আজকাল তা-ও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। দূর থেকে অবশ্য দেখে যেতে পারেন।

বেশ তো, এসেছি যখন, দূর থেকেই দেখে যাওয়া যাক।

তা হ'লে আসুন দোতলায়। আলো-টালো নিয়ে যাব না, জানলা দিয়ে লুকিয়ে দেখে যান। লোকজন কেউ এলে বড্ড অসোয়াস্তি বোধ করেন। অবশ্য এক আপনি ছাড়া আজকাল আর বিশেষ কেউ আসেনও না, সুখের পায়রারা সব উড়ে চ'লে গেছে। আপনিই যা মাঝে মাঝে খবর-টবর নেন।

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন এবং খুলিলেন।

ভন্টু কণ্ঠ হইতে বার-দুই গোঁক গোঁক শব্দ করিল।

শঙ্কর কিছুই বলিল না, মুক্তোর মৃত্যু-সংবাদে তাহার সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু দোতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দোতলাও অন্ধকার। প্রকাণ্ড দালানটার এক প্রান্তে শুধু মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল।

সতীশবাবু চুপিচুপি বলিলেন, ওই ঘরটাতে আছেন উনি, আপনারা চুপিচুপি এগিয়ে যান, একটু গেলেই জানলা দিয়ে দেখতে পাবেন।

কিছুদূর গিয়াই ওরিজিন্যালকে দেখা গেল। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে, একটা কালো র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ওরিজিন্যাল বসিয়া আছেন। মুখটা ভাল দেখা যাইতেছে না, কিন্তু যতটুকু দেখা যাইতেছে ততটুকুই যথেষ্ট ভীতিকর। সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, রগের এবং কপালের শিরাগুলি স্ফীত, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। একটা তীব্র ঘৃণা সমস্ত চোখে মুখে যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। দুই হাতে দুইটা বালিশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া ওরিজিন্যাল হাঁপাইতেছেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সতীশবাবুর পিছু পিছু শঙ্কর ও ভন্টু পুনরায় নামিয়া আসিল। ভন্টু যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা এখন উত্থাপন করা যদিও একটু অসমীচীন মনে হইল, তথাপি একবার চেষ্টা করিতে সে ছাড়িল না।

আচ্ছা, সাইকেলের একটা ভাল সীট সস্তায় বিক্রি ছিল, দশরথবাবু সেটা দেবেন বলেছিলেন আমাকে। সেটা কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন?

চক্ষু দুইটি বুজিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশবাবু চক্ষু দুইটি পুনরুন্মীলন করিলেন এবং অত্যন্ত নিরীহভাবে মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, আমি তো ওসবের কিছুই জানি না, দোকানের খবর নেবার কি আর অবসর আছে?

ওই মট্‌রা ব্যাটা যা করছে তাই হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, আপনার যদি অসুবিধা না হয়—

সতীশবাবু চক্ষু বুজিলেন ও খুলিলেন।

ভন্‌টু বলিল, কি বলুন?

চিকিৎসা নিয়ে মহা বিভ্রাটে পড়েছি। এখানকার ডাক্তারদের ভাঁজ-ভোঁজ ধাঁত-ঘোঁত বিলি-ব্যবস্থা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি ভন্‌টুবাবু। দু বেলা আসছে যাচ্ছে, দামী দামী ওষুধ ফরমাশ করছে, নানারকম এগ্‌জামিন করাচ্ছে, কিন্তু ফল তো কিছুই হচ্ছে না, হু-হু ক'রে অর্থব্যয় হচ্ছে কেবল, দু দিন থেকে কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বলি কি, হোমিওপ্যাথি করাব? পাড়ায় একজন—

ভন্‌টু বলিল, যাই করুন, খরচের ত্রুটি করবেন না। হোমিওপ্যাথি করতে চান, ভাল ভাল রুই-কাতলাদের নিয়ে আসুন। 'যার নেই কোন গতি, সেই করে হোমিওপ্যাথি'—এ রকম কোন বাজে চামাটুকে জোটাবেন না, ডাকতে হয় চাম্‌ লদ্‌ কাউকে ডাকুন। মানে—লোকে যেন এ অপবাদ দেবার সুযোগ না পায় যে, টাকার জন্যেই আপনি—

সতীশবাবু চক্ষু দুইটি বুজিয়া ফেলিলেন ও নিমীলিত চক্ষেই মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, কাকে বলছেন আপনি ভন্‌টুবাবু? তাহার পর চক্ষু খুলিয়া আর একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, দেখি আরও দু দিন।

শঙ্কর স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সহসা বলিয়া বসিল, মুক্তোর সেই তোরঙটা একবার দেখতে পারি?

ভন্‌টু বলিল, সেটা বোধ হয় ও-ঘরে আছে।

সতীশবাবু সোৎসুকে বলিলেন, কি বলুন তো?

ভন্‌টু বলিল, সে আপনি জানেন না, আমি জানি, এ ঘটনা আপনি আসার পূর্বেই ঘটেছিল। এই পাশের ঘরের কোণেই তোরঙটা আছে, আয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি,—চাম্‌ গ্যান্‌ঢ়অ তুই, না দেখে তো ছাড়বি না, দেখি আলোটা একবার।

সতীশবাবু বলিলেন, ভাঙা হলদে তোরঙ্গটার কথা বলছেন? সেটা আমি পরশুদিন ভাঙা সব জিনিস-পত্তরের সঙ্গে বিক্রি ক'রে দিলাম যে। ভাবলাম, কি হবে ও ঝরঝরে ট্রাঙ্কটা রেখে? তাতে দুটি জিনিস মাত্র ছিল, একটি নীল রঙের খদ্দরের চাদর, আর একটি ফোটো। রেখে দিয়েছি সে দুটি, দেখতে চান তো দেখতে পারেন।

দেওয়ালের গা-আলমারি হইতে খবরের কাগজে মোড়া ছোট একটি পুলিন্দা বাহির করিয়া সতীশবাবু শঙ্করের হাতে দিলেন। শঙ্কর পুলিন্দাটি খুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কাহার ফোটো! এ যে চুনচুনের স্বামী যতীন হাজরা! ফোটোর মুখখানা নখ দিয়া আঁচড়াইয়া কে যেন ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে! আঁকাবাঁকা অক্ষরে নীচে লেখা, "স্বামী নয়—শয়তান।" খদ্দরের নীল চাদরখানাও শঙ্কর চিনিতে পারিল, সে-ই একদিন মুক্তোকে ইহা কিনিয়া দিয়াছিল।

রাত্রি-দশটা নাগাদ হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর অবশেষে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল, যেমন করিয়া হউক মিসেস স্যানিয়ালের বাসা ত্যাগ করিবে, কিন্তু সে কথা তাহার মনেই ছিল না। রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার সমস্ত মনে এই কথাটাই প্রবলভাবে শুধু জাগিতেছিল যে, যে বিচিত্র যোগাযোগের ফলে এবং বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে মুক্তো, যতীন হাজরা এবং চুনচুনের জীবনে তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সেই বিচিত্র যোগাযোগের নামই কি অদৃষ্ট? এই যোগাযোগ কি কোন শক্তিমান বিধাতার নিগূঢ় অভিসন্ধি? না, এমনিই আকস্মিক যোগাযোগ? কোথায় আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি, এই চলার কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, থাকিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া বোঝা সম্ভবপর কি না, কে আমাদের চালক—নানা প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্তে তাহার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইতে লাগিল।

কড়া নাড়িতেই দ্বার খুলিয়া গেল। শঙ্কর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া

দেখিল, চুনচুন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল।

৩১

একটা বিরাট প্রান্তরে বীভৎস তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। সুরা-উন্মত্ত ঘূর্ণিত-লোচন ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ একদল পুরুষ অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের গলায় নারী-মুণ্ডের মালা, কটি বেষ্টন করিয়া নারী-হস্ত-পদ-রচিত মেখলা। মুক্তোর দেহটা অদূরে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্ন দেহটা ঘিরিয়াই নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আরও কিছুদূরে একদল বন্দিনী—মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, শৈল, রিনি, চুনচুন—তাহাদের ঘিরিয়াও একদল উন্মত্ত পুরুষ পাশব চীৎকারে প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে, সকলের হাতে খড়্গ। নিকটে অভ্রভেদী একটা রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠ···

সহসা শঙ্করের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। স্বপ্নের ঘোরটা তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, মাংসলোলুপ নরপশুদের উন্মত্ত চীৎকার তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল। খানিকক্ষণ মুহ্যমানের মত সে বিছানায় বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হাত-মুখ ধুইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিতেই মিসেস স্যানিয়াল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, দু দিন থেকে আপনার এই চিঠিখানা এসে প'ড়ে আছে, আমার আর দিতেই মনে থাকে না। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, মনে থাকবে কি ক'রে, আপনার দেখাই পাওয়া যায় না আজকাল। মিসেস স্যানিয়াল ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ করিয়া অগ্নিগর্ভ এবং কর্তব্যদ্যোতক একটা দৃষ্টি শঙ্করের দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং শঙ্করকে চিঠিখানা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর খামটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, দামী নীল রঙের খাম, হাতের লেখা চিনিতে পারিল না। খুলিয়া দেখিল, বেলার চিঠি—

শঙ্করবাবু,

আপনাকে ইতিপূর্বে কখনও চিঠি লিখি নি এবং জীবনে আর হয়তো কখনও লেখবার সুযোগও হবে না। আজও না লিখলে চলত, কিন্তু দেশ ছেড়ে চ'লে যাবার আগে আপনার সঙ্গে (কেবল আপনার সঙ্গেই) একবার দেখা ক'রে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি যে চ'লে যাচ্ছি, এ খবর কাউকে জানালাম না; জানাতে ইচ্ছে হ'ল না। যে বুড়ো সায়েবটিকে রোজ পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতাম, তাঁর সঙ্গে বিলেত চললাম। তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সংসারে আপন জন কেউ নেই, তিনি অনেক দিন থেকেই আমাকে বলছিলেন তাঁর সঙ্গে যেতে। দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছে ছিল না ব'লে এতদিন রাজী হই নি। কিন্তু এখন দেখছি, এ দেশে আমার মত মেয়ের পক্ষে ভদ্রভাবে বাস করা অসম্ভব। এ দেশে যে কোন মেয়ে, তা সে সুরূপা কুরূপা যাই হোক, যদি ভদ্রভাবে থাকতে চায়, তা হ'লে তাকে বিয়ে ক'রে অর্থাৎ একজন পুরুষের পদানত হয়ে থাকতে হবে—সে পুরুষটি যুবক বৃদ্ধ, মূর্খ বিদ্বান, সচ্চরিত্র দুশ্চরিত্র যাই হোন। অধিকাংশ মেয়ের পক্ষে এইটেই হয়তো বাঞ্ছিত পরম গতি এবং সমাজের কল্যাণের পক্ষে এই হয়তো সুচিন্তিত সুষ্ঠু ব্যবস্থা। আমি কিন্তু পারলাম না, আমার বিদঘুটে রুচি নিয়ে কিছুতেই এ ব্যবস্থা মানতে প্রবৃত্তি হ'ল না আমার। এর জন্যে অহরহ ক্ষণে ক্ষণে অপমানিত হয়েছি, কিন্তু দমি নি; তবে শেষটা হার মানতেই হ'ল। এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছি। কারণ এখন এটা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, এ দেশে থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। ও-দেশ নিরাপদ কি না জানি না, কিন্তু যত দূর শুনেছি তাতে মনে হয়, ওরা আর যাই করুক, নারীকে অপমান করে না। বহুকালব্যাপী স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে ওদের সে ভয় ঘুচেছে। এসব অবশ্য আমাদের কল্পনা, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা যে কি, স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না। সেখানেও যদি গিয়ে দেখি যে, ও-দেশও এ দেশেরই মত, তা হ'লে অনতিক্রম্য নিয়তিকে মেনে নিয়ে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে, আমরা কাগজে কলমে যতই

না কেন নিজেদের মহিমার ঢাক পেটাই, আসলে এখনও মেয়েরা পুরুষ-পদানত জীব ছাড়া আর কিছু নয়, এবং মানব-সভ্যতার পরিধি তার আদিম গুহা ছেড়ে বেশি দূর অগ্রসর হয় নি।

আমাদের জাহাজ ৬রা ছাড়বে। আমি বাসা ছেড়ে দিয়েছি, মিস্টার স্মিথের ফ্ল্যাটেই আছি, ১৫০নং চৌরঙ্গী স্ট্রীট। আপনি যদি সময় ক'রে একবার দেখা ক'রে যান, বড়ই সুখী হব। আপনি আমাকে যে বায়রন-গ্রন্থাবলী দিয়েছিলেন, সেটা আমি সযত্নে রেখেছি এবং যতদিন বাঁচব সযত্নে রাখব। কিন্তু আপনার একটি অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি—I could not accept Byron.

কাল নিশ্চয়ই আসবেন, সকালের দিকে আমি বাসায় থাকব॥ ইতি—

বেলা মল্লিক

শঙ্কর ক্যালেণ্ডারের পানে চাহিয়া দেখিল, আজ পাঁচ তারিখ। পরশুদিন বেলার জাহাজ ছাড়িয়া গিয়াছে। শঙ্কর কল্পনায় দেখিতে লাগিল, জাহাজের রেলিঙে ভর দিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বেলা তাহার পথপানে চাহিয়া আছেন।

৩২

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল।

এই সাতটা দিন শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটাইয়া দিল। যেদিন সে বেলার চিঠি পাইল, সেই দিনই সে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া উঠিল। মিসেস স্যানিয়ালের বাসায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভন্টুর আপিসে মৃন্ময়ের চাকরিটা হইয়া যাওয়াতে মুকুজ্জেমশাই শঙ্করের চাকরির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে একটি ভাল চাকরি খালি ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের পরিচিত পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের একজন পদস্থ

৯৩

অফিসার সিমলায় ছিলেন, চিঠি লেখার চেয়ে নিজে গেলে বেশি কাজ হইবে ভাবিয়া মুকুজ্জেমশাই নিজেই সেখানে গিয়াছিলেন। মৃন্ময় কাজে যোগদান করিয়াছিল, সুতরাং শঙ্করের দিনগুলি রাস্তায় এবং ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে কাটিতেছিল। দিনে সে মৃন্ময়ের সহিত খাইয়া বাহির হইয়া যাইত এবং রাত্রে ফিরিত সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর। তাহার খাবার বাহিরের ঘরে ঢাকা দেওয়া থাকিত। সে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল। তাহার অত্যুচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা সে হজম করিতে পারিতেছিল না; কারণ ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত যে, নিজের অহঙ্কারের প্রেরণাতেই সে মৃন্ময়ের উপকারটা করিয়াছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ। মৃন্ময় যদি না-ও থাকিত, তাহা হইলেও সে ভন্টুর আপিসে ভন্টুর অধস্তন কর্মচারী হইয়া কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু মৃন্ময় ইহা জানে না, সে শঙ্করকে দেখিলে এমন একটা মুখভাব করে, যেন সে দেব-দর্শন করিতেছে। শঙ্কর মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়ে, অনুপার্জিত এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় এবং এইজন্যই তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একজন মানুষ আর একজন মানুষের সান্নিধ্য যে কত কারণেই এড়ায়!

শঙ্কর শুধু যে মৃন্ময়কে এড়াইয়া চলিতেছিল তাহা নয়, সে সকলকেই এড়াইয়া চলিতেছিল। মানুষের সঙ্গই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মিল্‌টন, শেক্‌স্‌পীয়ার, শেলী, কীট্‌স্‌, রবীন্দ্রনাথের জগতে পরিভ্রমণ করিয়া, অবাস্তব কল্পলোকের নর-নারীর সাহচর্যে সে নিজেকেও ভুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করিতেছিল যে, এই অবাস্তব লোকের প্রাণীগুলিকেই বাস্তব জীবনের স্থায়ী অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ উহারা নির্ভরযোগ্য, চিরকাল উহাদের এক রূপ। শেলী কীট্‌সের স্কাইলার্ক নাইটিঙ্গেল কখনও বেসুরা গাহিবে না, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কখনও জরাগ্রস্ত হইবে না, শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি চিরদিন এক সুরে এক ভাবে এক ভঙ্গীতে কথা বলিবে, ব্রুটাস কখনও দেশদ্রোহী হইবে না, ওফেলিয়া কখনও পাপীয়সী হইবে না, ইয়াগো কখনও মহাত্মা হইবে না। কিন্তু বাস্তব

জগতের ক্ষণভঙ্গুর মানুষেরা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইয়া বুদ্বুদের মত অবশেষে একদিন বিলীন হইয়া যাইবে। তাহাদের উপর নির্ভর করিলে নিরাশ হইতে হইবে। কল্প-জগতের সার্থক সৃষ্টিগুলি অমর এবং অপরিবর্তনীয় বলিয়াই নির্ভরযোগ্য। তাহারা আজ এক কথা—কাল আর এক কথা বলে না। স্বপ্নের পাথায় ভর করিয়া শঙ্করের মন দিব্যলোকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সহসা একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে রূঢ় মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিতে হইল। বাসায় ফিরিয়া টেলিগ্রাম পাইল, সন্ন্যাসরোগে বাবা মারা গিয়াছেন। টেলিগ্রামটার দিকে সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

ট্রেনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল, বাবার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল না কেন? সমস্ত অন্তরটা মাঝে মাঝে মুচড়াইয়া উঠিতেছে, মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা, কিন্তু চোখে জল নাই। কিছুতেই সে কাঁদিতে পারিল না, ট্রেনের কামরায় একা শুষ্ক চক্ষে অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৩৩

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল মাস-দেড়েক পরে। আসিয়া স্টেশন হইতে সে সোজা ভন্টুর বাসায় গেল।

কবে এলি?

এখনই, সোজা স্টেশন থেকে তোর কাছেই এসেছি।

কেন?

তোর সেই কানা করালীর খবর কি বল্ তো?

তাকে নিয়ে কি করবি?

বাবা এক অদ্ভুত-উইল ক'রে গেছেন। আমি জানতাম না, করালীচরণ বক্সির সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব ছিল। বাবা মায়ের নামে ব্যাঙ্কে একটা ফিক্সড্

ডিপোজিট ক'রে গেছেন, তারই সুদ থেকে মায়ের চ'লে যাবে। দেশের বাড়িটাও মাকে দিয়ে গেছেন। আর বাকি সম্পত্তির সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন করালীচরণ বক্সির ওপর। উইলে লেখা আছে—করালীচরণ যদি দেখেন যে, আমি নিজের পায়ে ভালভাবে দাঁড়াতে পেরেছি, তা হ'লে, এবং যদি তিনি সমীচীন মনে করেন, তা হ'লে তাঁর বাকি সম্পত্তি আমি নয়—আমার স্ত্রী পাবে। আমি নিজের পায়ে যদি ভালভাবে দাঁড়াতে না পারি, তা হ'লে সমস্ত সম্পত্তি কোন সৎকার্যে দান ক'রে দিতে হবে, আমার স্ত্রী কিছু পাবে না।

ভন্টু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, করালীচরণ তো ভ্রাবিড়ে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তবু চল্, তার বাড়ির একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আসা যাক। অনেক দিন যাওয়া হয়'নি সেখানে।

মহা মুশকিলে প'ড়ে গেছি ভাই, মা ভয়ানক মুষড়ে গেছে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না আমাকে; অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি আমি। উইলের কথা মা জানে না। আমি করালীচরণকে শুধু বলতে এসেছি, এ কথা মাকে কিছুতে যেন জানানো না হয়। একটা চাকরি জুটলেই মাকে এনে নিজের কাছে রাখব আমি।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি তুই রাস্কেল, তোর কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? সে চাকরিও তোর হয় নি, উনি যাবার আগেই লোক বাহাল হয়ে গেছে।

উভয়ে করালীচরণের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

গলিতে ঢুকিয়াই পানওয়ালীর সঙ্গে দেখা হইল। ঠিক মোড়েই তাহার দোকান। দোকানে দুইজন খরিদ্দার দাঁড়াইয়া ছিল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র মিশিমণ্ডিত দন্ত বাহির করিয়া একমুখ হাসিয়া পানওয়ালী বলিল, ঘর খোলাই

আছে, আপনারা বসুন গিয়ে, আমি এই পান ক খিলি সেজে দিয়েই যাচ্ছি।

এই বলিয়া নিপুণ ত্বরিতহস্তে চেরা পানগুলিতে সে চুন ও খয়েরগোলা মাখাইতে লাগিল। ভন্টু ও শঙ্কর বক্‌সিমশায়ের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। দ্বার উন্মুক্তই ছিল। তাহা দেখিয়া ভন্টু বলিল, দেখেছিস মাগীর আক্কেল, কপাট খুলে রেখে দিয়েছে, কেউ ঢোকে যদি! বক্‌সিমশায়ের অনেক জিনিসপত্তর আছে ঘরের মধ্যে, এই মোল্লাদের কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া উভয়েই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিল। পচা ঘায়ের গন্ধ। মোস্তাক চৌকির উপর শুইয়া ছিল, তাহারা প্রবেশ করিতেই উঠিয়া বসিল এবং মুখবিকৃতি করিতে করিতে অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারি কায়দায় তাহাদের স্যালিউট করিল। মোস্তাকের বাঁ পায়ের পাতায় ময়লা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা প্রকাণ্ড একটা ঘা। পুঁজরক্তে ন্যাকড়াটা ভিজিয়া রহিয়াছে এবং তাহা ঘিরিয়া বহু মাছি ভনভন করিতেছে। মোস্তাকের মুখময় গোঁফ-দাড়ি, মাথায় অবিন্যস্ত চুলের বোঝা ধুলায় অযত্নে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত-বেদনাতুর। স্যালিউট করিয়া মোস্তাক আবার চোখ বুজিয়া চৌকির উপর শুইয়া পড়িল, কোন কথা বলিল না, যেন তাহার যাহা করিবার ছিল করিয়া ফেলিল, আর কিছু করিবার নাই। ভন্টু ও শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।'

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ কে ?

ও মোস্তাক, বক্‌সিমশায়ের বন্ধু।

পানওয়ালী আসিয়া প্রবেশ করিল।

ওকে নিয়েই বিপদে পড়েছি বাবু। বলছে, পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চ'লে গেছে। পরশু থেকে এখানে এসেছে, কিন্তু ওষুধ-বিষুধ কিছু লাগাতে দেবে না, পাড়ার ডাক্তারবাবুটির খোশামুদি ক'রে ডেকে এনে দেখালুম, তাঁর ব্যবস্থামত তুলো আইডিন ব্যাণ্ডেজ কিনে আনলুম; কিন্তু আনলে কি

হবে, ও পায়ে হাত দিতে দেবে কি? একে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো?

ভন্টু বলিল, হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

পানওয়ালী ইহাতে আপত্তি করিল। মাথা নাড়িয়া বলিল, না, তা আমি পারব না, হাসপাতালে শুনেছি বড় কষ্ট দেয় গরিবদের। ওরে পাগলা, ভাত খেয়েছিস?

মোস্তাক কোন জবাব দিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। পানওয়ালা ঘরের কোণের দিকে আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল।

খেয়েছে দেখছি। কত ভাত ছড়িয়েছে! কাল তো সমস্ত রাত খেলে না, সকালে এসে দেখি, ভাতের থালা যেমনকার তেমনই প'ড়ে আছে; সে ভাত আবার কুকুরকে ধ'রে দিই। আ আমার কপাল, একেই বলে পাগল শাকচচ্চড়ি সব খেয়েছে, মাছটা খায় নি! মাছের পেটিটা দিলাম বেছে কাঁটা নেই ব'লে—ভাগ্যিস বেরালে নিয়ে যায় নি! নে, খা।

পানওয়ালী মাছের পেটিটা তুলিয়া মোস্তাকের মুখে ধরিল, মোস্তাক কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল। ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, কাকটা কই?

ওধারে উঠোনে আছে। কি দস্যি কাক! পরশু হলুদজল ক'রে নাওয়াতে গেছি, এমন ঠুকরে দিয়েছে হাতে যে, জ্ব'লে মরি!

পানওয়ালী হাতের ক্ষত দেখাইয়া হাসিল। আচ্ছা, এই বইগুলোর কি করি বলুন তো? উই ধরেছে, ঝেড়ে ঝেড়ে রোদে দিয়েছিলুম। কবে আসবে? কোন খবর পেয়েছেন?

কিছু না।

খবর পেলে আগে থাকতে জানাবেন আমাকে একটু। তা না হলে আমাকে এখানে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে যাবে।

মিশি-মাখানো দাঁত বাহির করিয়া পানওয়ালী হাসিল।

বইগুলো চল তো দেখি। অনেক দামী বই আছে।

দেখুন না।

শঙ্কর চুপ করিয়া ছিল। পানওয়ালী, মোস্তাক এবং খাঁচায় পোয়া দাঁড়কাকের সহিত একচক্ষু করালীচরণকে সংযুক্ত করিয়া তাহার মন এক বিচিত্র রসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এই লোকটিরই হাতে বাবা বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া গিয়াছেন! সহসা একটা কথা মনে করিয়া লোকটার উপর শঙ্করের শ্রদ্ধা হইল। তাহার বিবাহ-সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করালীচরণ করিয়াছিলেন, তাহা তো অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে।

ভন্টু আলমারি খুলিয়া দেখিতেছিল।

ওরে, এখানে একটা লম্বা খামে কি একটা দলিলের মত রয়েছে, দেখ্ তো, এটাই তোর ব্যাপার কি না!

হ্যাঁ, এ তো বাবার হাতের লেখা।

খুলিয়া দেখিল, বাবার উইলের একটা কপি এবং করালীর নামে একখানি চিঠি। চিঠিতে অম্বিকাবাবু করালীচরণকে এই ভার গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। সমস্ত পড়িয়া শঙ্কর বলিল, এগুলো এখন এখানেই থাক্, করালীবাবু এলে তখন যা হয় করা যাবে।

ভন্টু পানওয়ালীকে বলিল, আমরা চললাম এখন।

পানওয়ালী চোখের ইশারায় ভন্টুকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, পাগলাটাকে আপনি একটু ভয় দেখিয়ে শাসন ক'রে দিয়ে যান, যাতে ও ওষুধ লাগাতে দেয় আমাকে।

ভন্টু মোস্তাকের কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, তুমি যদি ওষুধ লাগাতে না দাও, কালই তোমাকে হাসপাতালে দিয়ে আসব, সেখানে পা কেটে দেবে তোমার।

মোস্তাক চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

পানওয়ালী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভন্টু ও শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল।

শঙ্কর বলিল, চল্, মৃন্ময়ের বাসায় যাই।

তুই যা, আমাকে জুল্‌ফিদারের কাছে যেতে হবে।—বলিয়া সে বাইকে সওয়ার হইল।

৩৪

মৃন্ময় বাড়িতে ছিল না। গিয়াই মুকুজ্জেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল।

সব নির্বিঘ্নে হয়ে গেল তো?

হ্যাঁ।

শিরীষের সঙ্গে দেখা হ'ল? অমিয়া এসেছিল?

সকলেই এসেছিল। শ্বশুরমশায় চ'লে গেলেন, অমিয়া মায়ের কাছেই রইল।

তোমার বাবা কোন উইল ক'রে গেছেন নাকি?

শঙ্কর উইলের কথা খুলিয়া বলিল, মুকুজ্জেমশাইয়ের নিকট ইহা গোপন করার কোন প্রয়োজন সে দেখিল না। সব শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের চোখ দুইটি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

নিজের পায়ে তো তুমি দাঁড়িয়ে গেছই, চাকরি তোমার হয়ে গেছে।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া ইংরেজীতে লেখা একখানি চিঠি আনিয়া দিলেন। জনৈক পি. দত্ত তাহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'আদর্শ' নামক বাংলা মাসিক-পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিতেছেন। তিনি শঙ্করকেই কলিকাতায় আপিস খুলিবার ভার দিয়াছেন। মাসিক এক শত টাকা বেতনের মধ্যে একজন সহকারী সম্পাদক ও একটি ক্লার্ক নিয়োগ করিতে এবং একটি ভাল প্রেসে কাগজ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। কাগজের ছাপা এবং গেট-আপ যেন ভাল হয়, প্রেসের বিল তিনি আলাদা দিবেন। লেখকদেরও যথোচিত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। শঙ্করের পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতার ব্যাঙ্কে টাকাকড়ির সব বন্দোবস্ত করিবেন।

উত্তেজনায় শঙ্করের কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিল। কে এই পি. দত্ত তাহার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য বোম্বেতে বসিয়া আছেন?

মৃন্ময় উপরে ছিল, নামিয়া আসিল।

আপনার আর একখানা চিঠি এসেছে, আমার কাছে আছে।

টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একটি মোটা খামের চিঠি মৃন্ময় শঙ্করকে দিল। শঙ্কর দেখিল, সুরমার চিঠি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেল। আজ রাত্রেই আমি খুলনায় যাচ্ছি।

খুলনা? কেন?

দরকার আছে।

মুকুজ্জেমশাই মনোরমা এবং আসুমির খোঁজে বাহির হইতেছেন সে কথা আর বলিলেন না, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা তাঁহার স্বভাব নয়। তিনি নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন।

লোকের সঙ্গ শঙ্করের আর ভাল লাগিতেছিল না; সুরমার পত্রটা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

গড়ের মাঠে একটি নির্জন অংশে বসিয়া শঙ্কর সুরমার পত্রখানি পড়িতেছিল। খামের ভিতর দুইখানি চিঠি ছিল—একটি সুরমার, আর একটি উৎপলের। সুরমা লিখিয়াছে—

শঙ্করবাবু,

এই আপনার কাছে আমার প্রথম চিঠি। অর্থাৎ এ চিঠির ভাব, ভাষা, হাতের লেখা সবই আমার। এতদিন আপনাকে যে সব চিঠি আমি লিখেছি, সেগুলোর হাতের লেখা আমার ছিল বটে, কিন্তু ভাব ভাষা আমার ছিল না। আপনার বন্ধু চিঠিগুলো বিলেত থেকে লিখে পাঠাতেন, আমি সেগুলো টুকে দিতুম। আপনার বন্ধুকে চেনেন তো? একটা অদ্ভুত রকম কিছু ক'রে মজা দেখতে পেলে আর কিছু চান না উনি। এমন কি সেবারে যে ফোটোগুলো পাঠিয়েছিলুম, সেগুলোও উনি বিলেত থেকে তুলে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর পাল্লায় প'ড়ে আপনার বন্ধু এই

যে সামান্য চাতুরীটুকু করেছি, এর জন্যে আমি লজ্জিত এবং এর জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি—যদিও পনেরো আনা দোষ আপনার বন্ধুটিরই। উনিও এই সঙ্গে আপনাকে চিঠি দিচ্ছেন, তাতে সব কথা জানতে পারবেন। আমার নমস্কার নিন। আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

শ্রীসুরমা ঘোষ

উৎপল লিখিয়াছে—

ভাই শঙ্কর,

এতদিন সুরমার বেনামীতে তোমাকে যে চিঠিগুলি লিখেছি, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তোমার নাড়ী পরীক্ষা করা। কলকাতায় লক্ষ্য করেছিলাম যে, সুরমার সান্নিধ্যে তোমার নাড়ী কিঞ্চিৎ রসস্থ হয়েছিল। সে ধারণা আরও দৃঢ় হ'ল, যখন দেখলাম, তুমি আমার আসবার দিন হন্তদন্ত হয়ে হাওড়া স্টেশনে একরাশ লাল লাল গোলাপ নিয়ে হাজির হ'লে। ট্রেনে যেতে যেতে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল, সুরমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে ফেলা গেল যে, তোমার ঈষৎ-সচেতন রস-পিপাসাকে উতলা ক'রে তুলতে পারে এমন একটা কিছু ক'রে দূর থেকে ব'সে মজা দেখতে হবে। চিঠি লেখাই সাব্যস্ত হ'ল, কিন্তু সুরমা নিজে কিছুতেই চিঠি লিখতে রাজী হ'ল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? আমাদের দেশের মেয়েরা সব বিষয়েই সর্বক্ষণ সিরিয়াস, রসিকতাকে নিছক রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করা ওদের সাধ্যাতীত। যাই হোক, সুরমাকে অনেক কষ্টে রাজী করালুম যে, আমি চিঠিগুলো লিখে দেব, ও টুকে পাঠিয়ে দেবে এবং তোমার উত্তর এলে উত্তরগুলো আমার কাছে পাঠাবে। এটা অবশ্য আশা করি নি যে, তুমি 'যাও পাখি ব'লো তারে' মার্কা গোলাপী চিঠির কাগজে সবুজ কালি দিয়ে রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে উচ্ছ্বসিত প্রেম-পত্র লিখতে থাকবে। তবে এটা নিশ্চয়ই আশা করেছিলুম যে, তোমার সভ্যভব্য চিঠির মধ্যেও এমন এক-আধটা খোঁচ থাকবে, যা উপভোগ ক'রে আমরা আনন্দ পাব। তুমি কিন্তু আমাদের নিরাশ করেছ। অমন নিরামিষ চিঠি বোধ হয় ভাইও বোনকে লেখে না। নিরাশ হয়ে অবশ্য আনন্দিতই হয়েছি এবং বুঝেছি, কলকাতায় সুরমার সান্নিধ্যে তোমার মনে যে রস-সঞ্চার

হয়েছিল, সে রকম রস-সঞ্চার যে কোন সুন্দরী যুবতীর সান্নিধ্যে যে কোন সুস্থ যুবকের মনে হওয়া জৈবিক ধর্ম অনুসারেই স্বাভাবিক। বিলেতে থাকবার সময় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ সত্য দু-চারবার হৃদয়ঙ্গম করেছি। রস-সঞ্চার হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু রস-দমন করাটাই মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্বের পরিচয় তোমার মধ্যে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

যাক ওসব কথা, এইবার কাজের কথা বলি শোন। বিলেত গিয়েছিলাম ব্যারিস্টারি পড়তে, প'ড়ে এসেছি জার্নালিজম্। অক্স্‌ফোর্ডের একটা ডিগ্রী অর্জন করেছি। সেই ডিগ্রী নিয়ে বহু তৃতীয় শ্রেণীর লোকের দ্বারস্থ হয়ে তাঁদের দৈহিক নানা স্থানে প্রচুর তৈলনিষেক করতে পারলে হয়তো চুশো আড়াইশো টাকা বেতনের একটা চাকরি যোগাড় করতে পারা যেত, কিন্তু তা করতে প্রবৃত্ত হ'ল না। তুমি তো ভাই জানই, চাকরি করা জিনিসটাকে আমি বরাবর ঘৃণা করি। সেই-জন্যেই বোধ হয় কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান আমাকে একটি পয়সাওয়ালো শ্বশুর জুটিয়ে দিয়েছেন। আমার শ্বশুর ব্যবসা ক'রে ব্যাঙ্কে যে টাকা সঞ্চয় করেছেন, তার পরিমাণ ঠিক কত আমি জানি না। তবে তিনি মেয়েকে (অর্থাৎ সুরমাকে) পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকাটা অযাচিতভাবে হাতে এসে পড়াতে ঠিক করেছি যে, একখানা বাংলা এবং একখানা ইংরেজী মাসিক-পত্র বেশ ভাল ভাবে বার করব। খুব ভাল মাসিক-পত্র আমাদের দেশে নেই, উঁচু আদর্শ রক্ষা ক'রে যদি চালাতে পারা যায়, নিশ্চয়ই ভাল ভাবে চলবে। বাংলা কাগজটার নাম দিয়েছি 'আদর্শ', ইংরেজীটার 'The Ideal'। ইংরেজী কাগজটা আমি এখানে থেকে চালাব, বাংলা কাগজটার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি প্রথমে বাংলা কাগজটার একজন সহকারী সম্পাদকের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আবেদন-কারীদের মধ্যে একজন শঙ্করসেবক রায় দেখে সন্দেহ হ'ল যে, হয়তো এ আমাদেরই শঙ্কর। ফোটো চেয়ে পাঠালাম। ফোটো আসতে সন্দেহ দূর হ'ল। তোমার বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে কোন উত্তর পাই নি, তাই ফোটো চাইতে হয়েছিল। তোমাকে সহকারী নয়, পুরোপুরি সম্পাদকই হতে হবে। পি. দত্তের সই-করা চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছ। পি. দত্ত অপর কেউ নয়, আমার বড় শ্বশুর—প্রবীর

নয়। আমি ইংরেজী কাগজটার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছি, প্রবীর আমার হয়ে কাগজটার সম্পর্কে চিঠিপত্র লেখালেখি করছে।

এই সম্পর্কে আমার অনেক হিতৈষী বাঙালী-চরিত্রের অতীত নজির উদ্ধার ক'রে আমাকে সাবধান করেছেন যে, টাকাটা মারা যাবে অর্থাৎ তোমার অপটুতা অথবা অসাধুতা অথবা দুইই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করবে যে, আমি চমকে যাব। বন্ধু-প্রীতি বিষয়ে নাতিক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ রচনা ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার এমন একটা সুযোগ পেয়েও আমি সেটা ছেড়ে দিলাম, তার কারণ, জিনিসটা অত্যন্ত 'ভাল্‌গার' শোনাবে। দ্বিতীয়ত, টাকাগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছি, অপ্রত্যাশিতভাবে যদি যায়ও, বেশি লাগবে না আমার। তবে এ বিষয়ে আমার সত্যিকার মত কি, তা তোমাকে বলছি। বেশি জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না। সাঁতার শিখতে গিয়ে দু-চারজন ডুবে মরে তা সত্যি, কিন্তু এই দু-চারজনের উদাহরণ আস্ফালন ক'রে সব সাঁতার-শিক্ষার্থীদের ভড়কে দেওয়ার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না। বন্ধু হিসেবে তোমাকে এইটুকু শুধু অনুরোধ করছি যে, যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন ক'রে সাঁতারটা শিখে ফেল। অগাধ জলে স্বচ্ছন্দে সাঁতরাবার কৌশলটা আয়ত্ত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমাকে যত দূর জানি, অসাধ্যসাধন করবার শক্তি তোমার আছে। আর একটা কথা, যদি ডোব, আর কারও কিছু হবে না, তুমিই ডুববে। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শুরু ক'রে দাও। আশা করি, অন্যান্য সব খবর ভাল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হলাম। শৈলর চিঠিতে তোমার সব খবর জেনেছি। অবিলম্বে উত্তর দিও। ইতি—

উৎপল

কে, শঙ্করবাবু নাকি, এখানে একা ব'সে কি হচ্ছে?

শঙ্কর চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, ঠিক পিছনে অচিনবাবু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভদ্রলোক যে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, শঙ্কর মোটেই টের পায় নাই।

এখানে কি করছেন?

এমনিই বেড়াতে এসেছি।

আচ্ছা, একটা খবর আমাকে বলতে পাবেন ? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, খবরটা জানবার জন্যে নেমে পড়লাম।

কি খবর ?

মিস বেলা মল্লিক আজকাল কোন্ ঠিকানায় আছেন ?

তিনি এ দেশে নেই, বিলেতে গেছেন।

বলেন কি, বিলেত! কার সঙ্গে ?

একটি বুড়ো সায়েবকে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন, তাঁরই সঙ্গে।

অচিনবাবু গভীর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

যাক, তা হ'লে তো মিটেই গেল। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

না, আমি এখন যাব না।

কবিতা ভাবছেন বুঝি ?—মৃদু হাসিয়া অচিনবাবু কারে গিয়া আরোহণ করিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শঙ্কর বাসায় ফিরিল। ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টা দিতে দিতে ভন্টু আসিয়া হাজির হইল এবং হাসিয়া বলিল, তুই কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি ?

না, আমি এই ফিরছি।

তা হ'লে তো ভালই হ'ল। আমি জুলফিদারের কাছে গিয়েছিলাম; সব বলছি, চ, জুলফিদার দি গ্রেট আবার এক হাত দেখিয়েছে। কড়া নাড়্।

কড়া নাড়িতেই মৃন্ময় দ্বার খুলিয়া দিল।

মৃন্ময়কে দেখিয়া ভন্টু বলিল, মিস্টার ক্যাণ্ডল, তুই আর মিসেস স্মাইল পরশুদিন সকালে আমাদের বাসায় যাস। শঙ্কর, তুইও যাস। পরশু রবিবার আছে, জুলফিদার আমাকে ড্রেসিং আপিস খুলবে ঠিক করেছে।

সে খাবার কি ?

আশীর্বাদ করবে রে রাস্কেল, এটা বুঝতে পারছিস না? জুলফিদার কিন্তু এ'গেন এক হাত দেখিয়েছে।

কি রকম?

তোর কথা আজ আবার জুলফিদারকে বলেছিলাম। জুলফিদার বললে যে, আমাদের আপিসে তো আর চাকরি খালি নেই, তবে হল্ অ্যাণ্ডারসনে একটা পোস্ট্ শিগগিরই খালি হবে, সেটা আমি যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, ওঁর খুব ভাল চাকরি হয়ে গেছে।

কোথায়?

মৃন্ময় সব কথা খুলিয়া বলিতে ভন্টু খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল।

চোর কোথাকার, আমাকে তো কিছু বলিস নি এতক্ষণ! তা হ'লে চা খাওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই। স্মাইলকে খুব কড়া ক'রে চা করতে বল্। চা খেয়ে এখুনি বেরুতে হবে।

মৃন্ময় চায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

আবার কোথায় বেরুবি এখন?

ওহো, তোকে বলতেই ভুলে গেছি, ওরিজিন্যাল গন। তাকে পোড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মারা গেলেন?

বেঁচে গেলেন বল্।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভন্টু বলিল, বাবাজীর কাণ্ড শুনেছিস?

না।

বাবাজীকে বিয়ের খবর দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম, বাবাজী কি উত্তর দিয়েছে দেখ্।

ভন্টু পকেট হইতে একটি পোস্ট্কার্ড বাহির করিয়া দিল।

কল্যাণবরেষু,

তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম ছিল। তুমিও যে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুচরণের মত বিবাহ করিয়া এক দঙ্গল অপোগণ্ড সৃষ্টি করিতে থাকিবে, ইহা আমি ভাবি নাই। আমি প্রায় পনেরো দিন হইল প্রয়াগে আসিয়াছি, ইচ্ছা ছিল, তোমাকে গিয়া একবার দেখিয়া আসিব। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সংসারের কীট তোমরা, সংসারের পাঁকেই সমস্ত জীবন কাটাও। আমাকে আর উহার মধ্যে টানিও না। দূর হইতে আশীর্বাদ করিতেছি, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। ওই অবস্থায় যতটা সুখ সম্ভব, ততটা সুখ যেন তোমাদের ভাগ্যে ঘটে। ইতি—

আশীর্বাদক

তোমার মেজকাকা

পড়িয়া শঙ্কর পোস্ট্‌কার্ডখানি ফেরত দিল।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, চাম চামাট্‌ বাবাজী।

কিন্তু বাবাজীর চিঠিতে ভন্টু যে মর্মাহত হইয়াছে, তাহা সে হাসি দিয়া ঢাকিতে পারিল না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজিল।

চা খাইয়া ভন্টু চলিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে মৃন্ময় উপরের ঘরে উঠিয়া গেল, তাহার ঘুম পাইয়াছিল। নীচের ঘরে শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অপরিচিত পি. দত্তের চিঠি পাইয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিলেও সুরমা ও উৎপলের চিঠি পাইয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল যে, এ চাকরি সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। শৈলর দাদা ও সুরমার স্বামী বাল্যবন্ধু উৎপলের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া সে জীবনযাপন করিতে পারিবে না। যাহাদের চক্ষে সে নিজেকে এতদিন মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কাছে নিজের গৌরব খর্ব করিতে পারিবে না। ভন্টু এবং উৎপল শ্বশুরের প্রসাদে প্রসন্নমনে থাকুক এবং নিজেদের লইয়াই থাকুক, শঙ্করের উপর তাহাদের

অশ্রুপাবর্ষণ করিতে হইবে না। ঈর্ষায়, ক্ষোভে, তিক্ততায় তাহার সমস্ত অন্তরটা জ্বালা করিতে লাগিল। সে তখনই কাগজ কলম লইয়া আসিল এবং উৎপলের চিঠির জবাব লিখিয়া ফেলিল।—

ভাই উৎপল,

তোমার চিঠি পেয়ে এবং তোমার আর্থিক সচ্ছলতার কথা শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিলাস-ব্যসনে মন না দিয়ে সাহিত্য-সেবায় মন দিয়েছ, এটাও আনন্দের কথা। আমি যদিও তোমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে স-ফোটো দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, যে ভার আমাকে তুমি দিতে চেয়েছ সে ভার নিতে আমি অক্ষম। প্রথমত, তোমার সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আদর্শ না মিলতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন বন্ধুর অধীনে কাজ করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। বন্ধু প্রভু হ'লে উভয় পক্ষকেই অশান্তি ভোগ করতে হয়। সাহিত্য-সেবা আমিও করব, কিন্তু এ ভাবে করতে পারব না। কারণ মনের প্রসন্নতা এবং স্বাধীনতা না থাকলে সাহিত্যচর্চা করা যায় না। তুমি অন্য লোক দেখ।

তোমরা দুজনে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছিলে, তা থেকে যে আমি মানে মানে উত্তীর্ণ হয়েছি, এটা উভয়েরই সুখের বিষয়। সেদিন আমার সর্বস্ব ব্যয় ক'রে লাল লাল গোলাপ ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ—তখন আমি বোকা ছিলাম। নি-খরচায় ঠোঁটের কোলে একটু হাসি আর চোখের কোণে একটু ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা বিকিরণ ক'রে কাজ হাসিল করবার আর্টটা তখনও ভাল ক'রে আয়ত্ত করতে পারি নি। বোকার মত অর্থব্যয় ক'রে বসেছিলাম। এখন এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করবার চেষ্টা করছি যে, আমার বোকামিটাকে কেন্দ্র ক'রে তোমরা দুজনে আনন্দলাভ করেছিলে তো! পরোক্ষভাবেও বন্ধু-দম্পতিকে খুশি করতে পেরেছি—তাই বা কম কি!

তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ সুরমার মত মহিলা তোমার সহধর্মিণী এবং সুরমার বাবার মত সহৃদয় ব্যক্তি তোমার শ্বশুর। আশা করি, ভাল আছ সব। মাঝে মাঝে গরিব বন্ধুর খবর নিও। ইতি—

শঙ্কর

চিঠিটা খামে পুরিয়া সে ঠিকানা লিখিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, চিঠিটা এখনই পোস্ট্ করিয়া দিলে ভা   কারণ কি জানি আবার যদি মত বদলাইয়া যায়! পারিপার্শ্বিক টনার চাপে বিবেকের যুক্তি হয়তো নাও টিকিতে পারে। টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া দেখিল, একটা টিকিটও আছে। খামে টিকিট আঁটিয়া কপাট খুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। নিকটে কোন ডাকবাক্স ছিল না, হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্কর বড়রাস্তায় গিয়া পড়িল। বড়রাস্তাতেও খানিকক্ষণ হাঁটিয়া তবে সে ডাকবাক্স পাইল। চিঠিখানা পোস্ট্ করিয়া দিয়া যেন সে বাঁচিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের কপাট খোলা। মনে পড়িল, সে নিজেই কপাট খুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ভিতরে ঢুকিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত সাহেবী-পোশাক-পরা এক ব্যক্তি তাহার বিছানায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। সর্বাঙ্গে মদের গন্ধ। শঙ্কর খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ আবার কে?

গায়ে হাত দিয়া একটু ঠেলিতেই সাহেব উঠিয়া বসিলেন এবং মদিরাবিহ্বল চক্ষু মেলিয়া শঙ্করের মুখের দিকে এক সেকেণ্ড চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কে?

আমি এইখানে থাকি।

আপনি এখানে থাকেন? You mean this is your house?

আমার নিজের বাড়ি নয়, আমরা ভাড়াটে। আপনি কে?

মাই গড! এটা কি বীডন স্ট্রীট নয়?

আজ্ঞে না, এটা সার্পেন্টাইন লেন।

আই সী।

সাহেব খানিকক্ষণ খোলা দ্বারটার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সাধারণত গেরস্ত-বাড়িতে এত

রাত্রে কপাট খোলা থাকে না, তাই ভাবলাম, বুঝি আমারই বাড়ি। আই অ্যাম সো সরি, এটা সাবুপেন্‌টাইন লেন! আই অ্যাম সো সরি।

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না।

শঙ্কর বলিল, বসুন, যাচ্ছেন কেন?

ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া সাহেব বলিলেন, আই সী, you are a gentleman. না, আমি আর বসব না, উঠি এবার।

ভদ্রলোকের টলমলায়মান অবস্থা দেখিয়া শঙ্কর আবার বলিল, না না, বসুন।

O, you are a damned good fellow.

তাহার পর শঙ্করের মুখের দিকে খানিকক্ষণ স্মিতমুখে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি স্টুডেন্ট্‌?

না।

No? But you look it. কি করেন আপনি?

কিছুই করি না আপাতত।

No? কিছু করবার ইচ্ছে রাখেন?

তাহার পর ঘাড়টা একটু কাত করিয়া সাহেব বলিলেন, What is your propensity? To swindle or to dwindle? These are the two things one must choose between.

কথাবার্তা শুনিয়া লোকটিকে নেহাত খেলো বলিয়া শঙ্করের মনে হইল না। শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। এই অদ্ভুত অতিথিটিকে তাহার বেশ লাগিতেছিল।

সাহেব বলিলেন, নিজে যদিও আমি একজন রটার, কিন্তু বাপের দৌলতে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। I can shunt you on to any one of those two lines, I mean, swindling and dwindling. There are marvelous possibilities in both of them. আপনার মনের ঝোঁক কোন্‌ দিকে?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আমি সাহিত্য-চর্চা করতে চাই।

O God Almighty, you are a poet!

That's funny and that's great!

সাহেব পকেট হইতে একটা কার্ড-কেস বাহির করিলেন; তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, Will you lend me your poet's plume please?

শঙ্কর হাসিয়া দোয়াত কলম আগাইয়া দিল।

সাহেব কার্ডের পিছনে লিখিলেন, "Hiron, he is a gentleman. Please take him in your gang." তাহার নীচে নিজের নাম সই করিয়া কার্ডখানি শঙ্করের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, হিরণ is a bright boy—সেও সাহিত্যচর্চা করছে, at least that's his present pose—চ'লে যান তার কাছে। আমি উঠি—I am so sorry, I disturbed you.

সাহেব উঠিলেন।

আমি কি আপনার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব?

No, thanks. মোটরে উঠে ব'সে স্টিয়ারিং ধরতে পারলে I am as steady as a rock.

সাহেব টলিতে টলিতে গিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর স্টার্ট করিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কার্ডখানি উল্টাইয়া দেখিল, নাম লেখা রহিয়াছে - যোগেন রায়।

কে এই যোগেন রায়?

শঙ্কর কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসিল না, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনকে নানাভাবে নাড়া দিতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িবার পর স্বপ্ন দেখিল, সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নয়—অমিয়াকে।

পরদিন সকালে উঠিয়াই শঙ্কর ঠিক করিল, হিরণবাবু বলিয়া কেহ আছে কি না খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে কার্ডখানি বাহির করিল এবং কার্ডখানির দিকে চাহিয়া নির্বাক হইয়া গেল। সুরামত্ত যোগেন রায় সবই লিখিয়াছেন, কিন্তু ঠিকানা দেন নাই। নিজেরও না, হিরণবাবুরও না। শঙ্কর তবু বাহির হইয়া পড়িল। বীডন স্ট্রীটটা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

প্রায় প্রতি বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া বেলা বারোটা-নাগাদ শঙ্কর যোগেন রায়ের বাড়িটা বাহির করিল বটে, কিন্তু যোগেন রায়ের দেখা পাইল না। শুনিল, যোগেনবাবু সকালের ট্রেনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। হতাশ হইয়া শঙ্কর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা বুক্‌স্টলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। স্টলে নানারকম বই ও মাসিক পত্রিকা। শঙ্কর তাহার প্রিয় ও পরিচিত মাসিক-পত্রিকা 'সংস্কারক'খানা উল্টাইতে লাগিল। একটু পরে তাহার নজরে পড়িল, 'ক্ষত্রিয়' নামে একটা নূতন পত্রিকা বাহির হইয়াছে। টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাগজ, সম্পাদক—জ্যোতির্ময় বসু। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—পিছনের দিকে একটা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। "একজন সুদক্ষ প্রুফ-রীডার চাই। শ্রীহিরণকুমার রায়ের নিকট আবেদন করুন। ঠিকানা—"। ঠিকানা দেওয়া আছে। ইনি যোগেনবাবুর হিরণ নয় তো! শঙ্কর অবিলম্বে হিরণবাবুর ঠিকানার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

আধ ঘণ্টা পরে শঙ্কর হিরণবাবুর বাহিরের ঘরে বসিয়া অধীর-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া একটি নাতিস্থূল সুদর্শন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন, ঈষৎ কটা চুলগুলি ব্যাক্‌

ব্রাশ করা, বাঁ হাতের অনামিকায় দামী-পাথর-বসানো একটি আঙটি। ডান হাতে মোটা বর্মা চুরুট।

আপনিই আমাকে খুঁজছেন?

আমি হিরণবাবুকে খুঁজছি।

আমারই নাম হিরণ, কি চান আপনি?

আপনি কি যোগেন রায় ব'লে কাউকে চেনেন?

চিনি।

শঙ্কর কার্ডখানি তাহার হাতে দিল।

হিরণবাবু কার্ডে লেখা কথাগুলি পড়িলেন, কার্ডখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, যোগীনদার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?

শঙ্কর আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল।

যোগীনদা দুদিনের জন্যে কলকাতায় এসেই একটা ইতিহাস ক'রে গেছেন দেখছি!

একটু থামিয়া হিরণবাবু বলিলেন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন?

শুনলাম, আপনারা একটা কাগজ বার করছেন, তাতে যদি আমাকে কোন কাজে—

আপনি লেখক?

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, কিছু কিছু লিখি।

কি লেখেন?

বেশির ভাগই কবিতা।

বেশ, আপনার লেখা নিয়ে আসবেন।

কখন আসব?

আজ বিকেলেই আসতে পারেন।

শঙ্কর কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি

এখন একেবারে বেকার। গ্রাসাচ্ছাদনের মত একটা কোন কিছু যদি জুটিয়ে দিতে পারেন ভাল হয়, আমি যে কোন কাজ করতে রাজী আছি।

কবিতা লেখা ছাড়া আপনার আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে? কতদূর লেখাপড়া করেছেন আপনি? বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

শঙ্কর একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল, হিরণবাবুও বসিলেন।

আমি এম. এস-সি. পর্যন্ত পড়েছি, পরীক্ষা দিই নি।

বেশ করেছেন। পরীক্ষাটা দিলেন না কেন?

আর্থিক নানা কারণে, ফী জমা দেবার টাকা পাই নি।

যাক, তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম, পারমার্থিক কোন হেতু আছে বুঝি। রবীন্দ্রনাথের যে হেতু ডিগ্রী নেই, সেই হেতু আজকাল অনেকে ডিগ্রী না থাকাটাকেই কবি হওয়ার সপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি ব'লে মনে করেন। আপনার সে কম্‌প্লেক্স্ নেই দেখে সুখী হলাম। আপনি প্রুফ দেখতে পারেন?

পারি। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখলাম—

দেখেছেন? আমিই দিয়েছি ওটা। আপনাকে কাজটা দিতে পারি। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বার্‌বেল' ব'লে আমি একটা বই লিখিয়েছি কয়েকজন ব্যায়ামবীরকে দিয়ে, সেটা ছাপা হচ্ছে। আপনি যদি তার প্রুফ ভাল ক'রে দেখে দিতে পারেন, দৈনিক এক টাকা হিসেবে আপনাকে এখনই আমি বাহাল করতে পারি।

আমি পারব।

আপনি কোথা আছেন?

আমার এক বন্ধুর বাসায় আছি। সেখানেই পেয়িং গেস্ট্ হয়ে থাকব আপাতত ভাবছি।

সেখানে যদি অসুবিধে হয়, আমার একটা আন্‌ইউজ্‌ড্ নতুন বাথরুম আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও আপনি থাকতে পারেন ফ্রী-অফ কস্ট্।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, দেখি।

বেশ, তা হ'লে বিকেলে আসবেন, 'ক্ষত্রিয়' কয়েকখানা মাত্র বেরিয়েছে, আমাদের মতামত মিলিটারি, আমরা যা সত্য ব'লে মনে করি তা প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে মিথ্যা আবর্জনাগুলোকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হবে ব'লেও মনে করি। বিকেলে আসবেন, সেই সময় সব দেখাব আপনাকে।

আচ্ছা।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল

চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল, কোথাকার অপরিচিত যোগেন রায় মদের ঝোঁকে তাহার খোলা দরজায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হিরণবাবুর ঠিকানা দিয়া গেলেন! জীবনের অধিকাংশ প্রধান ঘটনার অন্তরালেই এক আকস্মিক যোগাযোগের রহস্য। জন্ম জীবন মৃত্যু—জীবনের এই অতি-প্রত্যাশিত ঘটনাগুলিও ভাবিয়া দেখিলে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের দলেই। আনন্দের আতিশয্যে শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। হিরণবাবু লোকটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। বেশ সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি।

সেই দিন বৈকালেই শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া হিরণবাবুর কাছে হাজির হইল। তাহার যেন তর সহিতেছিল না। গিয়া দেখিল, আড্ডা গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত চেয়ার কয়টি অধিকৃত, তক্তপোশেরও অনেকখানি ভরিয়া গিয়াছে। ঘোরতর তর্ক চলিতেছে। সিগার-সিগারেটও এত বেগে পুড়িতেছে যে, ঘরের খানিকটা অংশ কুজ্ঝটিকাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে। তক্তপোশের এক ধারে ট্রের উপর কতকগুলি চায়ের পেয়ালা ধূমায়িত হইতেছে এবং বালক-ভৃত্যটি একে একে সেগুলি তার্কিকদের হাতে ধরাইয়া দিতেছে।

শঙ্কর প্রবেশ করিতেই সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন।

হিরণবাবু বলিলেন, লেখা এনেছেন?

এনেছি।

কই, দিন

শঙ্কর সসঙ্কোচে পকেট হইতে কবিতা দুইটি বাহির করিয়া দিল। আশা করিয়াছিল, হিরণবাবু তখনই সেগুলি পড়িবেন এবং পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। কিন্তু হিরণবাবু সেসব কিছুই করিলেন না। লেখাগুলি একবার খুলিয়া পর্যন্ত দেখিলেন না, ড্রয়ার টানিয়া অতিশয় নির্বিকারভাবে সেগুলি ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আর একটি ড্রয়ার খুলিয়া 'ডাম্বেল, মুগুর ও বার্বেলে'র একতাড়া প্রুফ শঙ্করকে দিয়া বলিলেন, কাল বিকেলবেলায়ই চাই।

একটা পেন্সিল কি কলম পেলে এখুনি আমি শুরু করতে পারি।

এত গোলমালে পারবেন?

পারব।

বেশ, পেন্সিল দিচ্ছি আমি, বসুন। ওরে নবনে, ও-ঘর থেকে টুল একটা নিয়ে আয়, এক কাপ চা দে বাবুকে।

টুল আসিল, চা আসিল। চা পান করিয়া শঙ্কর প্রুফ দেখিতে শুরু করিয়া দিল। আড্ডায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুবক। শঙ্করের আগমনে তাঁহারা মিনিটখানেকের জন্য চুপ করিয়াছিলেন, আবার শুরু করিয়া দিলেন। আলোচনা চলিতেছিল চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু এবং আধুনিক একজন বিদ্রোহী কবিকে লইয়া। তর্ক-মুখর চটুল বিদ্রূপাত্মক আলোচনা। শঙ্করের খুব ভাল লাগিতেছিল, কিন্তু অনাহূতভাবে আলোচনায় সে যোগদান করিল না। নীরবে বসিয়া প্রুফগুলি দেখিতে লাগিল।

অতিশয় অনাড়ম্বরভাবে তাহার সাহিত্যিক-জীবন শুরু হইয়া গেল।

৩৬

মৃন্ময় আপিস হইতে যখন ফিরিল, তখনও শঙ্কর ফেরে নাই। শঙ্কর আজকাল সকালে উঠিয়াই হিরণবাবুর কাছে চলিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটায়। দ্বিপ্রহরের ভোজনটা সে নিকটবর্তী একটা হোটেলে আনা-তিনেকের মধ্যে সারিয়া লয়; আরও তিন আনা দিয়া দুই প্যাকেট সস্তা

সিগারেট কেনে, রাত্রে মৃন্ময়ের বাসায় খায় এবং শোয়। ইহার জন্যে মৃন্ময়কে সে মাসে দশ টাকা করিয়া দিবে ঠিক করিয়াছে। মৃন্ময় প্রথমে কিছুতেই টাকা লইতে রাজী হয় নাই; কিন্তু যখন সে দেখিল, টাকা না লইলে শঙ্কর থাকিবে না, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। এই শঙ্করবাবু লোকটির ব্যবহার, চালচলন এবং আদর্শনিষ্ঠা মৃন্ময়কে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছিল। নিজের আদর্শভ্রষ্ট জীবনে শঙ্করকে পাইয়া তাহার মন অনেকটা যেন স্বস্তিলাভ করিয়াছিল; ভগ্নহাল ছিন্নপাল তরণীর আরোহীদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ মাঝি থাকিলে নৌকা-পরিচালক মাঝি যেমন ভরসা পায়, শঙ্করকে পাইয়া মৃন্ময়ের মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইয়াছিল। শঙ্কর অধিকাংশ সময় বাড়িতে থাকে না, শঙ্করের জীবনযাত্রার সহিত এবং জীবনের আদর্শের সহিত মৃন্ময়ের জীবনযাত্রা অথবা আদর্শের কিছুমাত্র মিল নাই; শঙ্কর বঙ্গের এই চাকরিটাও যে মনোবৃত্তির প্রভাবে লইল না, সে মনোবৃত্তির সমর্থন যদিও মৃন্ময় করে না; তবু মৃন্ময় মনে মনে শঙ্করের উপর নির্ভর করিতে শুরু করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—যখনই যতটুকু দেখা হয়, শঙ্কর সহানুভূতিসহকারে মৃন্ময়ের সমস্ত কাহিনী শোনে এবং আশ্বাস দেয় যে, সব ঠিক হইয়া যাইবে। সব ঠিক হইয়া যাইবে—এতবড় আশ্বাস কয়জন এমন করিয়া দিতে পারে!

বাড়িতে ঢুকিতেই নীচের তলায় ডানহাতি ঘরটায় শঙ্কর থাকে। শঙ্কর যাইবার সময় তালা লাগাইয়া দিয়া যায়—হাসির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, রাত্রির খাবার রাখিয়া যাইবার জন্য। মৃন্ময় ঢুকিয়া বন্ধ তালাটার পানে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করবাবু ফেরেন নাই তাহা হইলে। তাহার বগলে একটা প্যাকেট ছিল। শঙ্করবাবুকে আগে দেখাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু—। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া মৃন্ময় অবশেষে উপরে উঠিয়া গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে হাসি চুল বাঁধিতেছিল। হাসির সমস্ত মুখখানাতে কেমন একটা বিষাদের ছাপ পড়িয়াছে। মৃন্ময় যে

স্বর্ণলতাকে ভালবাসে—এ কথা জানিয়া অবধি হাসির জীবনে অন্ধকার নামিয়াছে। স্বর্ণলতা যে মৃন্ময়ের পূর্বপক্ষের স্ত্রী, অপর কেহ নহে, ভালবাসাটা যে তাহার ন্যায্য পাওনা—এ বার্তায় সে অন্ধকার কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বরং স্বর্ণলতার প্রতি এই প্রেমটা যদি অবৈধ প্রণয় হইত, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে একটা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া এবং মৃন্ময়কে এজন্য ন্যায়ত লাঞ্ছিত করিবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া হাসির আক্রোশ হয়তো কিছু কমিত। কিন্তু বিবাহিত বিগত স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী প্রেম পোষণ করে, তাহার বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে! মৃন্ময় প্রবেশ করিতেই সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল এবং কাগজের বাক্সটা দেখিয়া প্রশ্ন করিল, ওটা কি?

কাপড়।

কার কাপড়?

ভন্টুর যে পরশু বিয়ে, ভুলেই গেছ?

ও।

চুলের বিনুনিটা ঠিক করিতে করিতে হাসি আগাইয়া আসিল।

কি কাপড় কিনলে?

মৃন্ময় হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিল (হয়তো সেইজন্যই তাহার মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল), কোন উত্তর না দিয়া জুতার ফিতাই খুলিতে লাগিল। হাসি আগাইয়া আসিয়া কাগজের বাক্সের ডালাটা খুলিয়া ফেলিল।

দুখানা কাপড় কেন?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতেই মৃন্ময় উত্তর দিল, একখানা তোমার জন্যে। ওই ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটা—

আমার শাড়ি চাই না।

বাক্সটা তাচ্ছিল্যভরে ঠেলিয়া দিয়া হাসি পুনরায় আয়নার কাছে গেল এবং দাঁত দিয়া ফিতাটি কামড়াইয়া পুনরায় প্রসাধনে মন দিল। মৃন্ময় এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তাহার লাল মুখখানা সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল, পছন্দ ক'রে এনেছি—

আমার চাই না।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া বলিল, তুমি মাইনে তো এখনও পাও নি, দাদামশাই যে টাকা দিয়ে গেছেন তার থেকেই তো সংসার চলছে, বাড়ি-ভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি, তুমি কাপড় কেনবার টাকা পেলে কোথা ?

মৃন্ময় যে শঙ্করের সাহায্যে শালখানা বাঁধা রাখিয়াছিল, হাসি তাহা টের পায় নাই। মৃন্ময় হাসিকে এখনও সে কথা বলিল না, মিথ্যা কথা বলিল।

একটা চেনা দোকান থেকে ধারে এনেছি। মাইনে পেলে পরে দিয়ে দিলেই হবে।

ধার ক'রে বাবুয়ানি করবার দরকার কি ?

মৃন্ময় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না; তাহার ঠোঁট দুইটা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল মাত্র।

আগে হাসি এমন করিত না, স্বর্ণলতাকে আবিষ্কার করিয়া অবধি তাহার মন কেমন যেন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণলতা নাগালের বাহিরে, তাহার কিছুই সে করিতে পারে না, মৃন্ময়কে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাই সে মনের জ্বালা মিটাইতে চায়। অথচ হাসিই একদিন মৃন্ময়ের সামান্যতম কষ্ট দূর করিবার জন্য কি না করিতে পারিত !

৫৭

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শঙ্কর 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার লেখক, প্রুফ-রীডার, ম্যানেজার এবং প্রকাশক হইয়া পড়িল। যদিও হিরণবাবু তাহাতে সংশ্লিষ্ট রহিলেন এবং প্রকাশ্যত হিরণবাবুর বন্ধু জ্যোতির্ময়বাবুর সম্পাদক বলিয়া নাম ছাপা হইতে লাগিল, কিন্তু আসলে শঙ্করই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। হিরণবাবু এবং জ্যোতির্ময়বাবুর নিকট সাহিত্যচর্চা খেয়াল মাত্র ছিল, কিন্তু শঙ্করের ইহা অন্তরের বস্তু। সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া

সে ইহার উন্নতিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং তাহার একাগ্রতা দেখিয়া হিরণবাবু তাহার হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একদা যে শঙ্কর দুইটি কবিতা লইয়া সসংকোচে হিরণবাবুর নিকট আসিয়াছিল (একটি হিরণবাবু মনোনীত করিয়া ছাপিয়াছিলেন, অপরটি তাঁহার পছন্দ হয় নাই), আজ সেই শঙ্করের নিকটই হিরণবাবু নিজের লেখা আনিয়া বলিতেছেন, দেখ তো, এটা তোমার কাগজে চলবে কি না ?

বস্তুত কাগজখানা যেন শঙ্করের নিজেরই হইয়া গিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উহা লইয়াই তাহার কাটিতেছে। 'ডাম্বেল, মুগুর ও বার্‌বেল' নামক পুস্তকের প্রুফ দেখিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না, বাকি সময়টা সে 'ক্ষত্রিয়' লইয়া থাকে। তাহার নিজের মনের মধ্যে যে নিরস্ত্র ক্ষত্রিয় এতদিন রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতেছিল, হঠাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও সুযোগ লাভ করিয়া সে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি-আধুনিক-মার্কা ডেঁপো ছোকরাদের চাবকাইয়া পিঠের ছাল ছাড়াইয়া দিবে সে। ইহারা অতীতের মহত্ত্ব স্বীকার করে না, দেশের লোকেদের চেনে না, বিদেশী আলট্রা-মডার্নিজ্‌মের নকলে 'নতুন কিছু' করিয়া বাহাদুরি দেখাইতে চায় এবং সেই উপলক্ষ্যে নিজেদের নপুংসক কামনা-কণ্ডুয়নকে কখনও সুবোধ্য, কখনও দুর্বোধ্য ভাষায় প্রচার করে। ইহাদের ভণ্ডামিটাকে চূর্ণ করিতে হইবে। অতিশয় উত্তেজনার মধ্যে তাহার দিন কাটিতেছে। অনেকগুলি ভাল লোকের সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে। ভাল লোক মানে, লোকগুলিকে শঙ্করের ভাল লাগিয়াছে। জ্যোতির্ময়বাবু—যিনি নামে কাগজের সম্পাদক—তিনি বেশ একটু অদ্ভুতপ্রকৃতির লোক। নিজে যদিও তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্মদের গালাগালি দিয়া তিনি যত আনন্দ পান, অন্য আর কিছু করিয়া ততটা পান না। রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত অদ্ভুত। তিনি আমাদের পরাধীনতাটাকে টাইফয়েড-জাতীয় একটা ব্যাধি হিসাবে গণ্য করেন। বলেন, তাড়াহুড়া করিয়া লাভ নাই, নিজের প্রাণশক্তি-প্রভাবে ব্যাধি যদি সারিবার হয়, আপনিই সারিবে। আমাদের দেখা উচিত,

চিকিৎসার ছুতা করিয়া রাজনৈতিক নেতাগুলি যেন আমাদের সর্বনাশ না করেন। আর একটি বিচিত্র লোক সুরেন্দ্রনাথ সোম। বেঁটেখাটো মানুষটি, অত্যন্ত রোগা, মাইনাস ফাইভ চশমা, নিরামিষাশী, স্কুলে মাস্টারি করেন। যদিও মাত্র বি. এ. পাস, কিন্তু অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হেন বিষয় নাই যাহার সম্বন্ধে দুই-চারি কথা না জানেন। মদ এবং শিকার বিষয়ে তিনি তো বিশেষজ্ঞ। নিজে যদিও কখনও জীবনে মদ স্পর্শ করেন নাই, সিগারেট পর্যন্ত খান না, কিন্তু কোন্ মদে কত অ্যাল্‌কহল আছে, কি রকম গ্রেপ হইতে ভাল মদ প্রস্তুত হয়, সস্তা মদ এবং দামী মদের তফাত কি, কি রকম সেলারে মদ রাখা উচিত, মদের বোতলের কাচ অ্যাল্‌কালি-ফ্রী হইলে বা না হইলে কি ভাবে মদের গুণে তারতম্য ঘটিবার সম্ভাবনা, মদের ব্যবসা কোন্ দেশে কি ভাবে চলে, সাহিত্যসৃষ্টির উপর মদের প্রভাব কি এবং তাহা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত—এ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। শিকার বিষয়েও তাই। ইংরেজী সাহিত্যে তো বটেই, ফরাসী সাহিত্যেও লোকটির অগাধ অধিকার। মাঝে মাঝে আড্ডায় আসেন এবং কদাচিৎ কখনও ভারী ওজনের প্রবন্ধ লেখেন। সুরেনবাবু 'ক্ষত্রিয়' কাগজটির প্রতি স্নেহশীল—সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা হিরণদার সহিত ঘনিষ্ঠতাবশত। যে জন্যই হোক, তিনি 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে ততটা নয়, যতটা সংশোধক হিসাবে। মাস্টার মানুষ, ভুল কিছুতেই তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। তিনি 'ক্ষত্রিয়ে'র ভুল তো সংশোধন করেনই, অন্য কোন কোন পত্রিকায় কি কি ভুল বাহির হইয়াছে তাহা শঙ্করকে আনিয়া দেন, এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শঙ্করের লেখনী হিংস্র হইয়া উঠে। শঙ্করের লেখনীতে যে এমন একটা হিংস্রতা ছিল, তাহা শঙ্কর নিজেও এতদিন জানিত না; নিজের এই তীক্ষ্ণ-নখদন্ত-সমন্বিত নব রূপ সে নিজেই সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ছোন রায় এই আড্ডার আর একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কখনও কবিতা লেখে না, কিন্তু মনে-প্রাণে কবি। মাথায় রুক্ষ

তৈলহীন অবিন্যস্ত চুল, চোখে আকুল উতলা দৃষ্টি, মুখে শেলী কীট্‌স্ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথ, পরনে আধময়লা ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে স্যাণ্ডাল। প্রত্যহ সকালে বাজার করিতে যাইবার মুখে থলিটি হাতে করিয়া আড্ডায় প্রবেশ করে, খানিকক্ষণ আড্ডা দেয়, কবিতা আওড়ায়, এক-একদিন ভাবের আবেগে কাঁদিয়া পর্যন্ত ফেলে। মদ খাওয়া অভ্যাস আছে, অথচ উপার্জন কম, সেইজন্য দুর্দশাটা আরও বেশি। বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু একপাল ছেলে মেয়ে। দশটা পাঁচটা একটা আপিসে কেরানীগিরি করে, বৈকালে মনিহারী দোকানে গিয়া তাহাদের বিজ্ঞাপনী-সাহিত্য লেখে, সন্ধ্যাবেলায় এক জায়গায় টুইশনি করে, তবু কুলায় না। 'ক্ষত্রিয়' কাগজের সহিত তাহার মতের মিল নাই, কিন্তু হিরণদাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে। হিরণবাবুও তাহাকে স্নেহ করেন, এত স্নেহ করেন যে মাঝে মাঝে নিজের পকেট হইতে পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে মদ খাওয়ান। শঙ্করেরও ছবিকে বড় ভাল লাগে! আরও অনেকে আড্ডায় আসে। দীপেন, জ্যোতিষদা, চঞ্চল, বরেন, নিপু, শ্যামল এবং আরও অনেকে; সকলেই যুবক, সকলেই সাহিত্য-রসিক। কেহ ধনীর সন্তান, কেহ চাকুরে, কেহ বেকার, কেহ বিজ্‌নেস করিতেছে। হিরণবাবু সকলেরই হিরণদা। শঙ্করও আজকাল হিরণবাবুকে হিরণদা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। হিরণদা যদিও এই আড্ডার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজেকে কখনও জাহির করেন না। তিনি কেন্দ্রেই বাস করেন বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে। তাঁহার পছন্দ-অপছন্দ মতামত আড্ডায় কাহারও অগোচর নাই, সকলেই তদনুসারে চলেনও; কিন্তু হিরণদা উগ্রভাবে নিজের দলপতিত্ব কখনও প্রকাশ করেন না। হিরণদার সম্বন্ধে একটা কথা ভাবিয়া শঙ্কর অবাক হয়, লোকটার প্রতিভা যে কিরূপ, তাহা বোঝা যায় না। সাহিত্যচর্চা যে খেয়ালমাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নানা বিষয়ে কৌতূহল, এবং 'ক্ষত্রিয়' নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার বহুমুখী কৌতূহলের একটা মুখ মাত্র। শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ এই কাগজটা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ঠিক সেই মনোভাব লইয়া

যে মনোভাব লইয়া দুষ্ট ছেলে দুষ্টামি করে। বঙ্গদেশরূপ মহারণ্যের নানা বৃক্ষে নানাজাতীয় পতঙ্গ নানারকম চক্র নির্মাণ করিয়া গুঞ্জন করিতেছে, প্রত্যেক চক্রে এক-একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া দেখাই যাক না, কি রকম মজাটা হয়! এতদিন তিনি নিজেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এখন শঙ্করের মধ্যে একজন সক্ষম লোষ্ট্রনিক্ষেপক আবিষ্কার করিয়া তিনি তাহার হাতে এ কার্য ছাড়িয়া দিয়া অপর দিকে মন দিয়াছেন। একটা কুস্তির আখড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেখানে অনেকগুলি যুবক এবং কুস্তিগীর পালোয়ান জুটাইয়া বক্সিং, জুজুৎসু এবং শরীরচর্চার নানারূপ আয়োজন তিনি করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অশক্ত অসুস্থ বলিয়াই আমরা ভীরু দার্শনিক হইয়া পড়িতেছি। জীবনদ্বন্দ্বের নির্মম সত্যগুলিকে সুস্থভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই কুস্তির আখড়াতেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত নিবদ্ধ নহে, আরও নানাদিকে তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত। জন্তু-জানোয়ারের বিষয়ে ঝোঁক আছে। বাড়িতে শুধু কাবুলী বিড়াল এবং অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর নয়, বাঘের বাচ্চাও পুঁষিয়াছেন। ইহা ছাড়া ডাকটিকিট সংগ্রহ, দিয়াশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ, পুরাতন শাল সংগ্রহ, সেকেলে বাসন সংগ্রহ প্রভৃতিতেও তাঁহার আগ্রহ কম নয়। কিরণবাবু বড়লোকের ছেলে, সর্বঘটবিহারী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বেকার। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যই নিজের কিছু করিবার নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি অনুযায়ী সব কিছুতেই সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন। পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, সুতরাং বাধা দিবার কেহ নাই। যোগীনদাও নাকি এককালে এই ধরনের ছিলেন, একটা চাকরি জোটাতে আজকাল সব থামিয়া গিয়াছে। যোজেন রায়ের পরিচয় শঙ্কর পাইয়াছে। তিনি বিলাতী ডিগ্রী ও সুপারিশের জোরে একটি নামজাদা বিলাতী লাইফ ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানির ম্যানেজার হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসেন এবং বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাইয়া যান। যখন কলিকাতায়

থাকেন না, তখন বীডন স্ট্রীটের বাড়িটা খালি পড়িয়া থাকে, বাড়ি ভাড়া দেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। যোগীনদাও অবিবাহিত, রসিক, কিন্তু নিদারুণ মাতাল। আর একটি নূতন ধরনের লোকের সহিত শঙ্করের পরিচয় হইয়াছে, ডাক্তার মুখার্জি। ইনি একজন রিটায়ার্ড আই. এম. এস. অফিসার, বিলাতের এম. ডি., রিটায়ার্ড লেফটেনাণ্ট-কর্নেল। এককালে হিরণবাবুর পিতৃবন্ধু ছিলেন, এখন হিরণের বন্ধু। এমন কি সিগার আদান-প্রদান চলে। লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। বিদ্বান বহুদর্শী লোক, কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার নাই। গোঁফদাঁড়ি কামানো, ফরসা রঙ, ভারী মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, গায়ে ঢিলা গলাবন্ধ সাদা চায়না কোট, পরনে সাদা থান, মুখে প্রকাণ্ড সিগার এবং প্রশান্ত হাসি। মাঝে মাঝে যখন আড্ডায় আসেন, সমস্ত আড্ডাটা যেন ভরাট হইয়া উঠে। সাহিত্যরসিক, স্পষ্টবাদী, শক্তিশালী ব্যক্তি।

এই নূতন সমাজে নূতন প্রেরণা লইয়া শঙ্কর নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে নিজের একটা বিশিষ্ট স্থানও করিয়া লইয়াছে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিন্তা তাহাকে মধ্যে মধ্যে আকুল করিয়া তুলিতেছে, হিরণদার 'ডাম্বেল, মুগুর এবং বারবেল' পুস্তকের প্রুফ দেখা হইয়া গেলে সে কি করিবে, অর্থোপার্জনের স্থায়ী রকম কোন ব্যবস্থাই তো সে এখনও পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর ভাবিতেছিল, ডাক্তার মুখার্জি তাহাকে একটা চাকরির আশ্বাস দিয়াছিলেন কয়েক দিন পূর্বে, কিন্তু তাহার পর হইতে আর তিনি আসেন নাই। তিনি কোন্ ঠিকানায় থাকেন, তাহাও শঙ্করের জানা নাই···সহসা অমিয়ার মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল, ভীরু সলজ্জ চোখ দুইটি। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল, অমিয়ার কথা সে তো মোটেই ভাবিতেছিল না! এমন হয় কেন? ইহার নাম টেলিপ্যাথি? অমিয়ার মুখখানাই অসংলগ্নভাবে মনের ভিতর যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রুফে মনঃসংযোগ করিল। প্রুফগুলাতে কি অদ্ভুত ভুলই থাকে! সমস্ত [illegible] এবং সমস্ত 'ধ' 'থ' হইয়া গিয়াছে।

যে ঘরে হিরণদার আড্ডা বসে, ঠিক তাহার পাশের ছোট ঘরটাতে (অর্থাৎ আনইউজ্‌ড বাথ-রুমটিতে) শঙ্কর নিজের জন্ত ছোট্ট একটি আপিসের মত করিয়া লইয়াছিল। হিরণদা একটি ছোট টেবিল, শেল্‌ফ এবং চেয়ার দিয়াছিলেন। এই ছোট ঘরটিতেই শঙ্কর পড়ে, লেখে, প্রুফ সংশোধন করে। ইহাই 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস। কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ এতদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আপিস হিরণদার টেবিলের ড্রয়ারেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে শঙ্কর আড্ডায় গিয়া যোগ দেয়। আড্ডা সাধারণত শুরু হয় বৈকাল হইতে এবং চলে রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। সেদিন রবিবার, একটু সকাল সকালই আড্ডা শুরু হইয়াছে এবং পাঁচটা নাগাদ বেশ গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিষদার গলা-খাঁকারি, চঞ্চলের উচ্চহাস্ত হইতেই তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। হিরণদা শঙ্করকে শুনাইয়া শুনাইয়া সকলকে সতর্ক করিতেছেন, অত চেঁচিয়ো নয়, শঙ্কর চ'টে যাবে, প্রুফ নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে ও।

শঙ্কর জানে, হিরণদার এই সতর্ক বাণীর অর্থ কি। অর্থ—উঠিয়া এস। শঙ্কর উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হিরণদা বলিলেন, আমার দোষ নেই কিন্তু, আমি সেই থেকে সবাইকে মানা করছি।

শঙ্কর হাসিয়া টুল টানিয়া উপবেশন করিল।

হিরণদা হাঁকিলেন, নবীন, এক কাপ চা।

ডাক্তার মুখার্জী আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে উঠলে কেন সব? শঙ্কর, তোমার চাকরি ঠিক ক'রে এলুম, 'সংস্কারক' আপিসে প্রুফ-রীডার, মাসে চল্লিশ টাকা ক'রে পাবে। আপাতত ওইতেই ঢুকে পড়—তারপর দেখা যাবে।

'সংস্কারক' কাগজে তাহার চাকরি হইয়াছে! শঙ্কর নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হীরালাল মজুমদার সম্পাদিত 'সংস্কারক' কাগজে! ইহা যে সে কল্পনাও করে নাই।

কয়েক দিন পরে শঙ্কর, ভন্টু ও মৃন্ময় গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। খানিকক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, ঝুলে তো পড়লাম ভাই খুজবুজকে নিয়ে, এখন অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

ভন্টুর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দুমতীকে লাগছে কেমন?

উচ্ছ্বসিত ভন্টু বলিল, চমৎকার ভাই, ঠিক মাখন-লদ্‌কানো টোস্টের মত, বেশ নরম নরম অথচ মুচমুচে। বিড়্‌ডিকার তো একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তুই অমিয়াকে আনছিস কবে?

শিগগিরই আনব।

এনে ফেল্।

মৃন্ময় একটি কথাও বলে নাই, চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

ভন্টু ভাবিতেছিল ইন্দুমতীর কথা, তাহাদের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা, তেল গহনা পাইয়া বউদিদির আনন্দের কথা। এতদিন দুঃখে কাটাইয়া বউদিদি এইবার বোধ হয় সুখের মুখ দেখিতে পাইলেন।

শঙ্কর ভাবিতেছিল সাহিত্যের কথা। 'সংস্কারক' পত্রিকার সংস্পর্শে সে যখন আসিতে পারিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি! শেক্‌স্‌পীয়ার, দান্তে, টলস্টয়, ডস্টয়েভ্‌স্‌কি··· মহিমান্বিত মূর্তিগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছিল··· বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ··· এই দেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কল্পনা-বিহঙ্গম মৃত্তিকা ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বলোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

জঙ্গম

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়

বনফুল







বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২



প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৫২
দ্বিতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪
তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৮
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়



সাড়ে ছয় টাকা

জঙ্গম

চতুর্থ অধ্যায়

১

সাহিত্যিক জীবন! ইহার নাম সাহিত্যিক জীবন? 'সংস্কারক'-আপিসের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর মনে মনে নিজের সাহিত্যিক জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া যাহা অনুভব করিল, তাহা গৌরবজনক নহে। সাহিত্যিক মানে কেরানী। সাধারণ কেরানীর মত সেও তো দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়া পরের ফরমাশ অনুযায়ী কলম পিষিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। গোটা দুই বাজে উপন্যাস, চলনসই কয়েকটা গল্প এবং চানাচুর-মার্কা কয়েকটা কবিতা লেখা ছাড়া আর কি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে সে! ভাল লেখা দূরে থাক্, ভাল বই পড়িবারই তো অবসর পায় নাই। চাকরি বজায় রাখিতেই সমস্ত শক্তি ও সময় চলিয়া যাইতেছে। 'সংস্কারক'-সম্পাদকের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের রুচি অনুযায়ী লেখা নির্বাচন করিতে এবং সেই দুর্বল রচনাগুলিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করিয়া মাসের ঠিক পয়লা তারিখে প্রকাশ করিতেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, নিঃসন্তান সম্পাদক মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ভাগিনেয় নিলয়কুমারকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাহার যে-কোন রচনাকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-মর্যাদা দিয়া ছাপিতে হয়, তাহার বন্ধুদের অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যিক চালিয়াতি নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইহাই তাহার বর্তমান চাকরি এবং ইহাই তাহার সাহিত্য-চর্চা। অথচ এই চাকরি বজায় রাখিবার জন্য কত কৌশল, কত প্রচেষ্টা! ভুজঙ্গের মুখার্জির সুপারিশে প্রুফ-রীডার হইয়া মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে

সে 'সংস্কারক' আপিসে ঢুকিয়াছিল, তাহার পর এই দুই বৎসরের মধ্যে, নিজের দক্ষতাগুণেই হউক বা ডাক্তার মুখার্জির গোপন সুপারিশ বলেই হউক, তাহার পদোন্নতি ঘটিয়াছে। সে এখন প্রুফ-রীডার নয়, সহকারী সম্পাদক। দুই বৎসর পূর্বে হীরালাল মজুমদারের সহকারী হইবার কল্পনা তাহার পক্ষে কল্পনা-বিলাস হইত, কিন্তু এখন সেই সহকারী-পদ পাইয়া সে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে, কিছু হইল না, কিছু হইল না, সময়টা বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। মনে হইতেছে, অহরহ মনে হইতেছে, কিন্তু চাকরি ছাড়িবার উপায় নাই। কলিকাতা শহরে অর্থই একমাত্র বল। মাস শেষ হইলে অন্তত পক্ষে দেড় শত টাকা চাইই। চাকরি ছাড়া চলিবে না, বরং চাকরিটা যাহাতে আরও পাকা হয় সে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিতেছে। আপিসে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে—চণ্ডীচরণ দস্তিদার, নিলয়কুমারের বন্ধু। অনেকে বলেন নিলয়কুমারের চর। মামার আপিসের সমস্ত হালচালের সম্পূর্ণ খবর রাখিবার জন্যই নাকি নিলয়বাবু চণ্ডীচরণবাবুকে আপিসে ঢুকাইয়াছেন। তিনি আপিসে আসিয়াই একটি দল পাকাইয়াছেন। দলটি শঙ্করকে শত্রু-পক্ষীয় বলিয়া মনে করে। মনে করে, শঙ্কর হীরালাল-বাবুর গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়। শঙ্করের আশঙ্কা এই চণ্ডীচরণবাবুর চক্রান্তেই হয়তো তাহার একদিন চাকরি যাইবে। কারণ, কাগজে-কলমে হীরালালবাবু মালিক হইলেও আসল মালিক নিলয়কুমার। তাই নিলয়কুমারকে তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্কর ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু বাহিরে ব্যগ্র হইতেছে। আজই তো সমস্ত দিন ধরিয়া সে সদ্যবিবাহিত নিলয়কুমারের জন্য সস্তায় একটি বাড়ি ঠিক করিয়া আসিল। নিলয়কুমার নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া মাতুলের বাড়িতে থাকিতে চান না। এতদিন মাতুলের কাছেই ছিলেন; কিন্তু বিবাহ করিবামাত্র তাঁহার আত্মসম্মানবোধ সম্ভবত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি অন্য বাসায় উঠিয়া যাইতে চান, হীরালালবাবুও নাকি ইহাতে মত দিয়াছেন। চণ্ডীচরণবাবু ও নিলয়বাবু নিজেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ভদ্রপল্লীতে সস্তায় বাড়ি আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না, আজ শঙ্কর বাড়িটা খুঁজিয়া দিল।

চণ্ডীচরণ দস্তিদারের উপর টেক্কা দিয়াছে। নিলয়কুমার এবং তৎপত্নী রেণুকা যদি সুপ্রসন্ন থাকেন, শঙ্করের চাকরি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হীরলালবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, নিজে কিছু দেখিতে পারেন না। নিলয়কুমার অফিস-ডিরেক্টার হিসাবে মোটা মাসোহারা লইয়া আপিসের সর্বময় কর্তা। ইঁহাকে সন্তুষ্ট না করিলে চাকরি থাকিবে না।

নিলয়কুমার উপর-চালাক-গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্তা শুনিলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোন শাঁস নাই। শঙ্কর ইহা জানে, কিন্তু ভুলিয়াও কখনও তাহা প্রকাশ করে না, বরং আচার-ব্যবহারে এমন একটা সশ্রদ্ধ ভাব দেখায় যে, সে যেন নিলয়কুমারের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। বাড়ি খুঁজিয়া দিয়া শঙ্কর তাঁহাকে আজ আরও খুশি করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, রেণুকা দেবীর একটি অতি-সাধারণ কবিতার এমন উচ্ছ্বসিত অনর্গল প্রশংসা করিয়াছে যে, নিজের আচরণে সে নিজেই বিস্ময়বোধ করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের দলের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে এ কি করিতেছে? ইহাই কি সাহিত্য-চর্চা? সহসা তাহার মন আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সহসা মনে হইল, বিবাহ করিয়া এমনভাবে জড়াইয়া না পড়িলে হয়তো তাহার এ অধঃপতন ঘটিত না, অতিশয় যুক্তিহীনভাবে সহসা অমিয়ার উপর রাগ হইল, আবার তখনই মনে হইল—না না, সে বেচারীর দোষ কি? তাহাকে সে-ই তো নিজে যাচিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে এবং বিবাহ করিয়া সম্ভবত তাহারই প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বের একটা ঘটনা শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সমস্ত চিত্রটা মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, হাওড়ার পুল খোলা, রাত্রেই গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতা ফিরিতে হইবে। সঙ্গীরা সবাই মাতাল, একজন রাস্তায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া একজন মাঝির ঘুম ভাঙাইল, বেশি পয়সার লোভে সে তাহাদের গঙ্গা পার করিয়া দিতে রাজীও হইল; কিন্তু গঙ্গার এমন অবস্থা যে ডিঙি তীর পর্যন্ত আসিতে পারে না।

শঙ্কর সঙ্গীদের প্রত্যেককে কাঁধে করিয়া নৌকায় তুলিল। গঙ্গার জলে বিষ্ঠা ভাসিতেছে, চতুর্দিকে কর্দম ও আবর্জনা। সমস্ত অতিক্রম করিয়া শঙ্কর সঙ্গীদের লইয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল ; হু-হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিয়াছে, ও-পারে কলিকাতা শহরের আলো-আঁধারির রহস্য, রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছে, হুইস্কির নেশাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নৃত্যপরা তন্বীর যৌবন-মাদকতায় কল্পনা আবিষ্ট—মেয়েটার নামটা কি ছিল? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু মনে করিতে পারিল না।

"উড়িষ্যার বনে জঙ্গলে"র পর ইঞ্চি তিনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কোন কবিতা-টবিতা থাকে তো দিন।

প্রিণ্টার শীতলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শঙ্কর রেণুকা দেবীর কবিতাটা দিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। এ ধরনের কবিতা তো প্রতি মাসেই ছাপিতে হয়, রেণুকা দেবীরটা ছাপিতেই বা দোষ কি? ছাপিলে তাহার লাভ বই ক্ষতি নাই। ছন্দ মিল সবই তো ঠিক আছে, ভাবটিও বেশ উদাস-করা উদাস-করা গোছের। মন্দ কি? শীতলবাবু চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর নিজের আচরণে নিজেই অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

২

'ক্ষত্রিয়' অবশ্য এখনও জীবিত আছে।

কিন্তু কোনক্রমে। কোন আয় তো হয়ই না, মাঘের পত্রিকা চৈত্রে বাহির হয়, তাও ভাল লেখা জোটে না। 'ক্ষত্রিয়ে'র পুরাতন দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হিরণদা ইরিগেশন বিভাগে বড় চাকরি করিতেছেন, জ্যোতির্ময়বাবু একটা ইংরেজী দৈনিক-পত্রিকার সাব-এডিটার, সুরেন্দ্র সোম শিক্ষকতা উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে কর্মে অবসর লইয়া দেশে গিয়াছেন, সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটা ভারী ওজনের 'উদ্ভট-

গোছের প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ছবি রায় একাধিকবার প্রেমে পড়িয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া, ক্রমবর্ধমান পরিবার লইয়া একটা আশঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে; পরিচিত কেহ তাহাকে দেখিলেই সরিয়া পড়ে, কারণ দেখা হইলেই সে ধার চায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করে নাই, শুষ্ক রুক্ষ কেশভার ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া সে শঙ্করের কাছে মাঝে মাঝে আসে এবং শেলী ব্রাউনিং কীট্‌স্‌ আওড়াইয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে রোমান্টিক ধরনের প্রবন্ধ বা কবিতাও লিখিয়া আনে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার জন্য। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আরও দুইজন লেখক জুটিয়াছেন, একজন ডাক্তার মুখার্জি এবং আর একজন লোকনাথ ঘোষাল। ডাক্তার মুখার্জির এমন কলমের জোর আছে, তাহা শঙ্কর ইতিপূর্বে জানিত না। লোকনাথ ঘোষাল লোকটিও অদ্ভুতপ্রকৃতির। এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক শঙ্কর আর দেখে নাই। সাহিত্যই তাঁহার জীবনের ধ্যান জ্ঞান, সাহিত্য ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না, আর কিছু জানিতে চান না। বেহারের এক পল্লীগ্রামে তিনি স্কুল-মাস্টারি করেন এবং মাস্টারি করিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাহিত্য-সাধনায় ব্যয় করেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ঠুনকো শৌখিন ব্যাপার নয়, জীবনের মর্মমূলে সে সাধনা রস-পরিবেশন করে, আলো-বাতাসের মত তাহা তাঁহার নিকট সত্য ও প্রয়োজনীয়। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকরূপে লোকনাথবাবুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছে। আলাপ করিয়া শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার মুখার্জি এবং লোকনাথবাবুর লেখায় 'ক্ষত্রিয়' সত্যই সমৃদ্ধ। শঙ্করের আশা, তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সত্যই একদা আদর্শ সাহিত্য-পত্রিকায় পরিণত হইবে, তাই এত অসুবিধার মধ্যেও সে 'ক্ষত্রিয়'কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখনও সে আদর্শ বহু দূরে, এখনও কেবল নিন্দা এবং গালাগালি দিয়াই কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে হয়। গালাগালির বিষয়ও সেই এক, প্রতিভাহীন বামনদের স্পর্ধিত চন্দ্র-লোলুপতা। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মুখার্জি দিল্লী হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, শঙ্কর তাহাই পড়িতেছিল। ডাক্তার মুখার্জি আজকাল দিল্লীতে, কারণ তাঁহার একমাত্র পুত্র দিল্লীতেই চাকরি করেন।

ডাক্তার মুখার্জি লিখিতেছেন—

শঙ্কর,

আধুনিক লেখকদের ওপর তুমি চটেছ। আমি তোমার চেয়ে বেশিদিন বাংলা দেশে বাস করেছি, আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি, তাই চটবার কারণ পাচ্ছি না।

সেকালে রবিবাবুর নাম করলে ঢিল খেতে হ'ত ; আমাদের প্রাণ বাঁচানো দায় ছিল। রবিবাবুর ছন্দ নেই, মিল নেই, গাম্ভীর্য নেই, ভাষার মাধুর্য নেই —এই রকম কত দোষ যে দেখতে পেয়েছিল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা, তা বলবার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে রবিবাবুর ভাষাকে চেস্ট বাংলায় রূপান্তরিত করবার জন্যে নম্বর দেওয়া হ'ত।

এখন সেদিন গেছে। এখন রবিবাবু নাকচ হয়েছেন পিচের গন্ধ আর পেট্রোলের গন্ধ কবিতায় ঢোকান নি ব'লে।

সেকালে টিকি আর তিলকের মধ্যে ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম আর ইলেক্‌ট্রিসিটি, বিধবার অলঙ্কারের স্বর্ণে উত্তেজক তাড়িত এবং শূদ্রের চোখের দুষ্ট ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ বেরুত। এর জন্যে অনেকেরই ফিজিক্স পড়বার দরকার হয় নি, এমন কি যাঁরা ফিজিক্স চর্চা করতেন ঊঁরাও ওই রকম বক্তৃতা দিতেন কেউ কেউ।

সেকালে গল্প বেরুত—ডাকাতরা বৃক্ষকোটরে প্রবেশ করলে, আর ডিটেক্‌টিভ মাইক্রস্‌কোপ লাগিয়ে তাদের ধ'রে ফেললে।

একালে ইলেক্‌ট্রিসিটির বদলে এসেছে ফ্রয়েডিজ্‌ম আর সাইকলজি। এখন মা চুমু খেলে বেবির মুখ লাল হয়ে ওঠে, মামা ভাগনীর রিপ্রেশন তাড়াবার জন্যে বক্তৃতা করে। সেকালে যাঁরা মামী-কাকীকে কাশী পাঠাতেন তাঁদের কাব্যের একমাত্র বিষয় ছিল সতীত্ব। একালে সতীত্ব নেই। যুবারা সেক্‌সের বিজ্ঞাপন পড়া (অনেক সময় আবার সেটা কন্টিনেন্টাল নভেল বা সিনেমার মারফৎ) আর রতিবিলাস খাওয়ার অবসরে রাস্তায় মেয়েদের হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের ঘুমন্ত মুঠোয় টাকা গুঁজে দিয়ে চ'লে আসছে। সেকালের প্রব্‌লেম ছিল ক-খ-জানা মেয়ের হাতে স্বামীর লাঞ্ছনা। একালকার

প্রব্লেম হয়েছে লেবার-এর দুঃখ। যেখানে ভিক্ষা পেলেই পেট ভ'রে খেতে পাওয়া যায়; যেখানে অতি অধমেরও কাকা দাদা প্রভৃতি আশ্রয়স্থল আছে—সেখানকার লেবার প্রব্লেম কি মর্মান্তিক!

এক খামচা লঙ্কাবাটা বা একটা পেঁয়াজ দিয়ে যারা এক থালা ভাত খায়, তাদের পাড়ায় যেতে হয় ডিমের খোলা মাড়িয়ে! গিয়ে দেখতে হয়, দরমার দেওয়ালে খবরের কাগজের ওয়াল-পেপার আর বালিশের তলায়—দি ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড!

সেকাল আর একাল পাশাপাশি বসিয়ে দেখ, ইউক্লিডের ফোর্থ থিয়োরেমের মত মিলে যাবে।

এখনকার অধঃপতনে দুঃখ বা রাগ হতে গেলে প্রি-সাপোজ করতে হয় যে, এর আগে এক সময় এর চেয়ে ভাল কিছু ছিল।

সেকালে দেখেছিলুম, একজন মহাত্মা ভদ্র কুলবধূর নাম ক'রে কেচ্ছা করলেন আর চারিদিকে বাহবা বাহবা প'ড়ে গেল। শেষে তাঁর জেল হ'ল। কিন্তু যেদিন জেল থেকে বেরুলেন, কলেজের ছেলেরা মাথায় ক'রে তাঁকে নিয়ে এল। একালে দেখি সিবিল-ডিস্ওবিডিয়েন্স মুভ্মেণ্টে দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে, নিজেদের ডিফেণ্ড করছে না। জেলে গিয়ে কিন্তু মালিশের তেল বা পানের চুন কম হ'লে আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করছে, আর হরলিক্স মিল্ক না পেলে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করছে! সেকালের সাহিত্য বা পলিটিক্স যা ছিল, একালেও ঠিক তাই আছে,—বাইরের চেহারাটায় একটু অদল-বদল হয়েছে মাত্র। দাণ্ডী-মার্চ বা সণ্ট-রেডের সাব্লাইম বা রিডিকুলাস কারুর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করল না। বিহার ভূমিকম্প কারুর কাব্যের খোরাক যোগাল না। এবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখি—সিরাজ এবং ইংরেজ যখন বঙ্গদেশের বুকে সমুদ্রমন্থন করছিল, তখন বই বেরিয়েছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত। কি আর বলি! তোমরা সবাই ভাল? ইতি শুভার্থী

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার মুখার্জির পত্রখানা পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহার ঠিক এই রূপ সে এতদিন দেখে নাই। আধুনিকনামা এই অপদার্থ

লোকগুলার সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গীই যেন বদলাইয়া গেল। ইহারা যে এই পরাধীন দেশের সনাতন মনোবৃত্তিরই নব রূপ, তাহা এতদিন তাহার ধারণাতে আসে নাই। সহসা তাহার মনে হইল, সে কি নিজেও তাহাদেরই দলভুক্ত নয়, না হয় তাহার ধরনটা একটু ভিন্ন রকমের। সে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় উহাদের রচনাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ কি সত্যই সাহিত্যিক ব্যঙ্গ? তাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কি নাই? আধুনিক লেখকদের হঠাৎ-জনপ্রিয়তা কি তাহার চিত্তকে ঈর্ষাক্ষুব্ধ করিয়া তোলে নাই? এই ঈর্ষা এবং এই ঈর্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মহত্ত্বের অভিনয় করা কি পরাধীন জাতির মজ্জাগত প্রবৃত্তি নয়? যে পরাধীনতার প্রকোপে এই আধুনিকেরা নকল-নবিস, সেই পরাধীনতার প্রকোপে সেও ঈর্ষাক্লিষ্ট নকল-সংস্কারক। কিন্তু না না... সহসা শঙ্করের যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। নিজেকে এতটা হীন সে ভাবিতে পারিল না। ঈর্ষা? ঈর্ষার জন্যই সে এত সব করিয়াছে? আর একটা কথা তাহার মনে হইল। উহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তো তাহার বাধে নাই! একই হোটেলে একই ধরনের আহার্য ও মদ্য সেবন করিয়া একই বারবনিতার বাড়িতে রাত্রি কাটাইতে তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই; এমন কি যাহাদের সঙ্গে এই [illegible] বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে তাহার উগ্রতাটা যেন অনেকটা [illegible] হইয়া আসিয়াছে। মানসিক শুচিতাই যদি তাহার ব্যঙ্গের কারণ হইত, তাহা হইলে সে ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতে পারিত কি? কিন্তু না না, কোথায় যেন ভুল হইতেছে—সাহিত্যিক বিরোধের সহিত সামাজিক প্রীতি-অপ্রীতির কোনও সম্পর্ক নাই। তাহার নিকটতম বন্ধুর রচিত সাহিত্যও তাহার বিচারের মানদণ্ডে হীন হইতে পারে এবং তাহা লইয়া নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে স্বস্তি পাইল এবং পুনরায় মনোযোগসহকারে প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকারই প্রুফ সে দেখিতেছিল। ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—নয়টা বাজিয়া গিয়াছে; একটু পরেই আপিসের জন্য উঠিতে হইবে। একজন

বেয়ারা প্রবেশ করিয়া একটা চিঠি দিয়া গেল। শৈলর চিঠি, শৈল ডাকিয়াছে।

৩

আপিসে ভন্‌টু আসিয়া হাজির।

এখনও প্রূফ লদ্‌কাচ্ছিস? ওঠ্।

কেন, কি করতে হবে?

লব্‌স্টারিং।

সে আবার কি?

লব্‌স্টার মানে জানিস না? গলদা-চিংড়ি। ইটিং আপিসে ঢুকব আজ, এখন না কিনলে তো পাওয়াই যাবে না। ওঠ্।

এটা শেষ ক'রে দিই, থাম্, মেশিন না হ'লে ব'সে থাকবে। তা ছাড়া এখন আমার ঢের কাজ বাকি—বাজারে যাবার সময় নেই, ব'স্।

ভন্‌টু মুখ সুচালো করিয়া তাহার দিকে একবার তাকাইল এবং চেয়ার টানিয়া বসিল।

হঠাৎ গলদা-চিংড়ি খাবার শখ কেন?

বিয়ে ক'রে সিংকিং আপিস খুলছি।

অর্থাৎ?

দরাঞ্চে ব্যাপার।

কি রকম?

বিড্‌ডিকারের নাকে লব্‌স্টার-ফ্রাইং গন্ধ এন্‌টারিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর কোন মন্তব্য না করিয়া স্মিতমুখে প্রূফই দেখিতে লাগিল। ভন্‌টু বলিয়া চলিল, বুঝতে পারলি না তো? পারবার কথাও নয়, বুঝিয়ে বলি তা হ'লে শোন্। আমার মাইনে যদিও একটু বেড়েছে—কিন্তু চাল বাড়াই নি আমি, বিড্‌ডিকারকে সেই সাবেক চালে নৌকোর হালটিতে বসিয়ে রেখেছি। প্রাচীন কলাইয়ের ডাল, পোস্ত আর মৌরলামাছের বাজি

টক, প্লাস একটা জাবদা-গোছের ভেজিটেব্‌লের তরকারি—এই মামুলি ফরমুলা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন বিড্‌ডিকারের নাকে চিংড়িমাছ-ভাজা গন্ধ ঢুকল।

পাশের বাড়ি থেকে?

না, দোতলা থেকে। বিড্‌ডিকার দোতলায় উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলে, ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ইন্দুমতী স্টোভে লব্‌স্টার ফ্রাই করছে। তাও মাত্র দুটি—একটি বোধ হয় নিজের জন্যে, আর একটি আমার জন্যে।

শঙ্কর হাসিয়া ভন্‌টুর পানে চাহিয়া আবার প্রুফে মন দিল।

ভন্‌টু বলিল, বোঝ, ভাল ক'রে তলিয়ে বুঝে দেখ ব্যাপারটা।

এতে আর বোঝবার কি আছে?

ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে চিংড়িমাছ আনিয়ে গোপনে ইটিং আপিস খুলছে—বোঝবার কিছু নেই?

যাঃ।

তুই দেখছি বিড্‌ডিকারেরও এক কাঠি ওপরে গেলি। বিড্‌ডিকারও প্রথমে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল।

শঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

বিড্‌ডিকারের যা স্বভাব, দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। বলছে, ও বড়লোকের মেয়ে, যা-তা জিনিস কি রোজ রোজ মুখে রোচে বেচারীর, তোমারই কিপ্‌টেমির জন্যে এসব হচ্ছে, আজ বেশি ক'রে গলদা-চিংড়ি আনাও, সবাই মিলে খাওয়া যাক।

একটু থামিয়া ভন্‌টু পুনরায় বলিল, বোঝ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল।

এখনও ধার শোধ ক'রে উঠতে পারি নি, দাদার আবার জ্বর হচ্ছে, ডাক্তাররা বলছে ফের চেঞ্জে পাঠাতে।

শঙ্কর আবার হাসল।

মুচকি মুচকি হাসছিস যে বড়? মরিয়া হয়ে উঠেছি আজ, লব্‌স্টারের চরম ক'রে ছাড়ব আমি। ওঠ্‌।

আমি এখন উঠতে পারব না, অনেক কাজ বাকি আছে আমার। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল, চণ্ডীচরণ দস্তিদার শ্যেনচক্ষু মেলে চেয়ে আছে, কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

ভন্টু মুখ সূচালো করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তা হ'লে রাত্রে যেও এবং ওইখানেই ইটিং আপিস খুলো। কটি লব্‌স্টার খাবে তুমি ?

গোটা চারেক।

বলিস কি রে ?

ভন্টু উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললাম, মৃন্ময়কেও ব'লে যাই। ক্যাণ্ডুলকে নিয়ে কিন্তু মহা মুশকিলে পড়েছি ভাই ; ও আপিসের কাজ একদম কিচ্ছু করে না, অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে থাকে খালি। এমন থক্‌বকিয়ে গেল কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

কেন, কি করে ?

কিচ্ছু করে না। কিছু বললেই ফ্যালফ্যাল ক'রে লুকিং আপিস খোলে খালি। ও কি রে, তুই আবার আংটি লদ্‌কালি কবে ? দেখি দেখি, এ যে দামী জিনিস দেখছি।

আমার নয়, অপরের।

ফের মোল্লা জুটিয়েছিস নাকি ?

না।

আমি চললাম। আর দেরি করলে পাওয়া যাবে না।

ভন্টু চলিয়া গেল।

আংটির কথা উঠিতে শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল, কুমার পলাশকান্তি আজ যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহাকে একটি গল্প লিখিয়া দিতে হইবে। এই জমিদার-পুত্রটির সাহিত্য-বাই চাগিয়াছে। নিজের কোন প্রতিভা নাই, অপরের দ্বারা গল্প লিখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করেন এবং ভাল কাগজে ভাল লোক দিয়া ভাল সমালোচনা লিখাইয়া লইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বলা বাহুল্য, সবই টাকার জোরে। এই দামী হীরার আংটিটা তাঁহারই।

শঙ্কর শখ করিয়া আঙুলে পরিয়াছিল, তিনি আর খুলিয়া লন নাই। বলিয়াছিলেন, ব্যস্ত কি, বেশ মানাইয়াছে, থাক্ না, পরে লইলেই হইবে। 'সংস্কারক' 'পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে, বিশেষত 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার উগ্র সমালোচককে, খুশি করিয়া রাখিতে তিনি ব্যগ্র। একটি গল্প লিখিয়া দিবার জন্য তিনি শঙ্করকে দুই শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। একটি উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারিলে হাজার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুমার পলাশকান্তি লক্ষ্মীর দৌলতে সরস্বতীর দরবারেও আসর জমাইতে চাহেন। এককালে রেসের শখ ছিল, এখন সাহিত্যের শখ হইয়াছে।

ভন্টু চলিয়া যাইবার পর শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ প্রুফ দেখিল, কিন্তু হঠাৎ একটা 'ফোন' আসাতে তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হইল।

ফোনে চুন্‌চুন বলিল, আসবেন একবার? যদি আপনার অসুবিধে না হয়, আমি মনুমেণ্টের কাছে থাকব।

শঙ্করের মনে হইল, অবিলম্বে যাওয়া দরকার। ড্রয়ার টানিয়া আপিসেরই কয়েকটা টাকা সে পকেটে পুরিয়া লইল এবং অতিশয় উত্তেজনাভরে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল, আরও দুই স্থানে যাইতে হইবে।—প্রথম শৈলর বাসায়, দ্বিতীয় আসৃমি-দার্জির পিতা নিবারণবাবুর কাছে। কুমার পলাশকান্তি যদিও আজ যাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে আজ যাওয়া হইবে না, সময় নাই। চুন্‌চুন, শৈল এবং নিবারণবাবু সারিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিতে এমনিই অনেক রাত হইয়া যাইবে।

অমিয়ার মুখখানা মনে একবার উঁকি দিয়া গেল। পথে হঠাৎ পলাশকান্তিরই সহিত দেখা। তিনি তাঁহার মূল্যবান মোটরখানি নিঃশব্দে থামাইয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইলেন। কুমার পলাশকান্তি (বন্ধু ও পারিষদবর্গ তাঁহাকে আদর করিয়া 'কুমার' বলিয়া ডাকেন, সত্যই তিনি রাজপুত্র নহেন) এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা নারীসুলভ কমনীয়তা এবং সেই ধরনের দীপ্তি বিদ্যমান, যাহার মূল কারণ প্রতিভা নহে, আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং অভিজাত-সমাজ-সঙ্গ। প্রিয়দর্শন ব্যক্তি তিনি।

শঙ্করবাবু, আমার কাছেই যাচ্ছেন নাকি ?

না, জরুরি দরকারে আর এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। আপনার কাছে কাল যাব।

আমার গল্পের কত দূর ?

অর্ধেকের ওপর হয়ে গেছে।

আচম্বিতে শঙ্করের মুখ দিয়া মিথ্যাই বাহির হইয়া পড়িল।

মুহূর্তকাল নীরবতার পর পলাশকান্তি বলিলেন, আজ কাগজ পড়েছেন ?

না।

অ'চনবাবুর দশ বছর জেল হয়ে গেল। আজ রায় বেরিয়েছে।

সংবাদটার জন্য শঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। সহসা তাহার মনে বহুদিন আগেকার একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিল। অচিনবাবুর সহিত সে একবার ওই বৃদ্ধ ম্যানেজারটার নিকট গিয়াছিল টাকার চেষ্টায়। অচিনবাবু বলিয়াছিলেন যে, বুড়াকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অনায়াসেই হাজার খানেক টাকা ধার পাওয়া যাইতে পারে, বেশি সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সুদ পর্যন্ত লাগিবে না। তিনি টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন ; কিন্তু পরিবর্তে যে প্রস্তাবে শঙ্করকে রাজী [illegible] বলিয়াছিলেন, তাহা শঙ্কর পারে নাই।

[illegible]শকান্তি বলিলেন, সমস্ত ডিটেল্‌স্ আজ কাগজে বেরিয়েছে, প'ড়ে দেখবেন ; উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। ওই ম্যানেজারটা সাংঘাতিক লোক ছিল মশাই। আর সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে এই যে, লোকটা অনেকদিন থেকে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তার কামনা মরে নি।

শঙ্করের নিকট ইহা নূতন খবর নহে। তবু সে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, তাই নাকি ?

এই যে কাগজে বেরিয়েছে, দেখুন না, সৌদামিনী আর তার মেয়ে সাক্ষী দিচ্ছে, কাগজটা আপনি রাখুন, আমার পড়া হয়ে গেছে।

শঙ্কর কাগজখানা লইয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত খবরই বাহির হইয়াছে। অচিনবাবু বৃদ্ধ ম্যানেজারকে যে চিঠিখানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া খগেশ্বর অচিনবাবুর কন্যাকেই ভুলাইয়া আনিয়া ম্যানেজারের কবলে সমর্পণ

করিয়া দিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া অচিনবাবু ম্যানেজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। পলাশকান্তি বলিলেন, 'আমার এ গাড়িখানা অচিনবাবুই কিনে দিয়েছিলেন, তখন কে জানত যে ভদ্রলোক এমন ধারা—

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া শঙ্কর বলিল, ভদ্রলোকের ওয়ারিশ কেউ নেই?

না, অথচ টাকার কুমীর। একটা উইল নাকি ক'রে গেছেন, এখনও তা কোর্টের জিম্মায়।

ও।

এ রকম নরপিশাচ দেখা যায় না মশাই, কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। কাগজে একটা ফর্দ দিয়েছে দেখেছেন? সি. আই. ডি. বেচারাদেরও কম খাটতে হয় নি। লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

একটু থামিয়া পলাশকান্তি পুনরায় বলিলেন, এতে হয়তো উপন্যাসের খোরাকও পাবেন আপনি। এই নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে দিন না আমাকে, দেবেন? বেশ সাইকলজিক্যাল-গোছের একটা—

আচ্ছা, প'ড়ে দেখব। এখন একটু তাড়া আছে, চলি।

আচ্ছা।

কাগজটা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর পলাশকান্তির নিকট বিদায় লইল। অচিনবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু। কতটুকুই বা তাহার সঙ্গে পরিচয় ছিল? লোকটার জীবনে যে এত জটিলতা এবং তাহার পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত জেলে, তাহাই বা কে জানিত! সহসা শঙ্করের মনে হইল, কাহার সহিতই বা তাহার এতদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পরিচয় আছে? কাহার জীবনের সম্পূর্ণ রহস্য সে জানে? এমন কি, নিজের বিষয়েও তাহার জ্ঞান কতটুকু? এই প্রসঙ্গেই তাহার মনে পড়িল যে, যদিও তাহার মনের মধ্যে একটা নারীমাংসলোলুপ পশু বাস করে, কিন্তু কই, সেদিন ম্যানেজারের প্রস্তাবে সে তো সম্মত হইতে পারে নাই? পশুটার মাংসলোলুপতা হঠাৎ বিলুপ্ত

হইয়া গেল কি করিয়া ?···অচিনবাবুর সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। রিনির জন্মদিনে মিষ্টিদিদি আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। কোথায় রিনি! তাহার ডাক্তার স্বামীকে লইয়া সে হয়তো সুখেই আছে। শঙ্করের কথা হয়তো তাহার মনেই পড়ে না। কোথায় রিনি, কোথায় অচিনবাবু, কোথায় মিষ্টিদিদি! জীবনে একদিন যাহারা কত বড় ছিল, আজ তাহাদের কথা মনেও পড়ে না। বেলার মুখখানিও মনের মধ্যে ভাসিয়া আসিল—গ্রীবা বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গীভরা হাসি হাসিতেছে। একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে না।

৪

ট্রাম হইতে নামিয়াই শঙ্কর দেখিতে পাইল, চুন্‌চুন মাঠে ঘাসের উপর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু চুন্‌চুনকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যতদিন সে অব্যবস্থিত ছিল, ততদিনই সে চুন্‌চুনের সহিত দেখা করে নাই। কিন্তু 'সংস্কার' আপিসে চাকরি হওয়া মাত্র সে মিসেস স্যানিয়ালের দৃষ্টি এড়াইয়া চুনচুনের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। কলিকাতা শহর এবং বর্তমান যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্যাণে তাহা অসম্ভব হয় নাই। চুন্‌চুনের অবস্থা এখনও ঠিক পূর্ববৎ। এখনও সে ঠিক আগের মতই মিসেস স্যানিয়ালের নিষ্পাপ গৃহস্থালীতে মিসেস স্যানিয়ালের উপদেশাবলী, মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়ের অনুকম্পা, মিসেস স্যানিয়ালের বৃদ্ধ দেবর পীতাম্বরবাবুর নিষ্পলক দৃষ্টি সহ্য করিয়া নীরবে বাস করিতেছে, এতটুকু বিদ্রোহ করে নাই। আজকাল শঙ্করের সহিত তাহার সম্পর্ক অনেকটা গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের ন্যায়। শঙ্কর তাহাকে বই দেয়, সে তাহা পড়িয়া ফেরত দেয়। ফেরত দিবার সময় পঠিত পুস্তক লইয়া হয়তো মাঝে মাঝে আলোচনাও হয়। এই আলোচনার মধ্যে একজন গ্রন্থকার অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিলেও সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনায়াসে ইহা এতদিনে তাহাদের ব্যক্তিগত আশা-আশঙ্কা-আকুতিময়

আলাপে পরিণত হইতে পারিত, শঙ্করের সেদিকে প্রবণতাও যে কিছু কম তাহা নহে, কিন্তু চুনচুন মেয়েটি সত্যই অদ্ভুত। সে কোনদিন কোন আচরণ দ্বারা ইহার সম্ভাবনাকে পর্যন্ত প্রশ্রয় দেয় নাই। একটা সুন্দর শুভ্র ফুলে খানিকটা কালি ঢালিয়া দিবার চেষ্টা যেমন সুস্থ সহজ মানুষ করে না, তেমনই শঙ্করও চুনচুনের সহিত কোনদিন প্রেমালাপ করিবার চেষ্টা করে নাই। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুনও তাহাদের সম্পর্কটাকে বোধ হয় এই একই মনোভাব লইয়া দেখে—যদিও কি যে তাহার মনোভাব তাহা শঙ্কর বুঝিতে পারে না। ইহার অস্বাভাবিকতা, ইহার রহস্যময়তা তাহাকে অনুসন্ধিৎসু করে, কিন্তু বাহিরে শঙ্কর শোভন সংযত ভাবটা বজায় না রাখিয়া পারে না। তাহার মনে হয়, এই দুর্ভেদ্য আবরণ একদিন স্বাভাবিক নিয়মে খসিয়া পড়িবেই ; কিন্তু কি করিয়া কখন কাহার জন্য যে পড়িবে, তাহা তাহার কল্পনাতীত। শঙ্কর যখনই চুনচুনের সহিত দেখা করিতে আসে, সঙ্গে করিয়া কিছু টাকা আনে। চুনচুনের ফোন আসিলেই তাহার মনে হয়, নিশ্চয়ই সে কোন বিপদে পড়িয়াছে, মিসেস স্যানিয়াল হয়তো তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, কিংবা হয়তো নিজেই সে উত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রতি বারেই সে গিয়া হতাশ হয়। স্মিত নম্র হাসি হাসিয়া চুনচুন বই ফেরত দেয়, কিংবা হয়তো কোন দুর্বোধ্য অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করে, কিংবা অমনই একটা কিছু। নাটকীয় কোন কিছু ঘটে না। অথচ শঙ্করের মনে হয়, ভিতরে ভিতরে মেয়েটি না জানি কোন্ রহস্যময় লোকের অধিবাসিনী, সঙ্গোপনে কি যেন ভাবিতেছে, কিন্তু এসবের কোন বাহ্যিক প্রমাণ শঙ্কর কোনদিন পায় নাই। কালো রঙ, ছিপছিপে গড়ন, স্বপ্নময় চোখ, এতদিন আলাপ, মেয়েটি শঙ্করকে কল্পনায় আকৃষ্ট করিতেছে, অথচ কাছে আসিলে ইহার সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মোহ যেন ফুরাইয়া যায়।

কি খবর ?

খবর আছে একটা, আমি কলেজে ভর্তি হব, কোন্ কলেজ ভাল বলুন দিকি—বেথুন, না, ডায়োসেশন ?

শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

এতদিন পরে হঠাৎ কলেজে পড়ার শখ?

শখ অনেকদিন থেকেই ছিল, খরচ জুটছিল না।

এখন জুটল কোথা থেকে?

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে—অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইল—চুন্‌চুন বলিল, পীতাম্বরবাবু দেবেন।

পীতাম্বরবাবু? হঠাৎ তাঁর এত দয়া?

চুন্‌চুন এ কথার জবাব দিল না। ক্ষণকাল নীরবতার পর পুনরায় প্রশ্ন করিল, কোন্ কলেজটা ভাল, বলুন না?

তা পীতাম্বরবাবুই ঠিক ক'রে দেবেন না?

পীতাম্বরবাবু নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানেন না, তিনি আমাকেই ঠিক করতে বলেছেন।

মিসেস স্যানিয়াল তো আছেন।

তিনি বেথুন কলেজের পক্ষপাতী। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বেথুন কলেজে যদি আমার আপত্তি থাকে, তা হ'লে আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি বাধা দেবেন না।

ওঃ!

ক্ষণকাল নীরবতার পর চুন্‌চুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কলেজটা ভাল?

এখন ঠিক বলতে পারছি না, খোঁজ নিয়ে কাল বলব।

বেশ। চলুন, অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

এ কথাটুকু ফোনে বললেই পারতে।

আপনি অবসর দিলেন কই, আপনাকে আসতে ব'লে তখনই ভাবলাম—ফোনেই জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আপনি তখন কেটে দিয়েছেন।

উভয়েই নীরবে পাশাপাশি খানিকক্ষণ হাঁটিল। চুন্‌চুন একটু পরে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি কাজ ক্ষতি ক'রে এসেছেন বুঝি? আমি—

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, অকৃত্রিম কুণ্ঠাভরে চুন্‌চুন যেন ফুটপাথের সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

নীরবে খানিকক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর শঙ্কর প্রশ্ন করিল, 'চোখের বালি' কেমন লাগছে ?

খুব ভাল লাগছে না।

লাগছে না ?

আমি বুঝতে পারছি না বোধ হয়।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, হয়তো ইহার রসবোধ নাই এবং সেই জন্যই বোধ হয় ইহার জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটে না। হয়তো—

হর্ন দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি আগাইয়া আসিল। শঙ্করের চিন্তাধারা ভিন্ন পথ ধরিল।

চল, তোমাকে ট্যাক্সি ক'রে পৌঁছে দিই।

চলুন।

ট্যাক্সিতে উভয়ে চড়িয়া বসিল।

৫

শঙ্কর যখন শৈলর বাসায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ড্রয়িং-রুমে ঢুকিতেই মিস্টার এল. কে. বোসের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি নিখুঁত সাহেবী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন। শঙ্করকে দেখিয়া থামিলেন এবং ফেল্টের টুপিটি মাথা হইতে ঈষৎ আলগা করিয়া শঙ্করকে অভিবাদন-করত হাসিয়া বলিলেন, হঠাৎ পথ ভুলে নাকি ?

শঙ্কর একটু মৃদু হাসিল।

বহুদিন আপনার দেখা নেই, আগে যা-ও বা আসতেন, খ্যাতিলাভ করার পর থেকে তো একেবারে বর্জন করেছেন আমাদের। আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

শৈল ডেকে পাঠিয়েছে।

সো সিলি অব হার! আপনার মত 'বিজি' লোককে ডেকে পাঠানো!

শঙ্কর পুনরায় হাসিল, মিস্টার বোসও হাসিলেন। তাহার পর পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস বাহির করিয়া শঙ্করের সামনে সেটি খুলিয়া ধরিলেন, আমরা আর বেশি দিন এখানে নেই, বদলির খবর এসেছে।

কোথা যাচ্ছেন ?

এলাহাবাদ।

শঙ্কর একটি সিগার তুলিয়া লইল, মিস্টার বোস একটি চকচকে সিগারেট-লাইটার বাহির করিয়া সেটি ধরাইয়া দিলেন, নিজেও একটি ধরাইলেন। এক্‌স্‌কিউজ মি, আমাকে বেরুতে হচ্ছে ; ক্লাবে ব্রিজ টুর্নামেণ্টে জয়েন করেছি, আজ আমার খেলার দিন, উইল্‌সনের সঙ্গে খেলতে হবে, সে সোজা লোক নয়, স্নুতরাং একটু—

অর্থপূর্ণ একটা মুচকি হাসি হাসিয়া মিস্টার বোস অসম্পূর্ণ বাক্যটাকে পূর্ণতা দান করিলেন। তাহার পর দাঁতে সিগারটা চাপিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অন্তরঙ্গের মত আন্তরিক সহৃদয়তার সহিতই প্রশ্ন করিলেন, শুধু খ্যাতিই হচ্ছে, না, পকেটেও কিছু আসছে ? হ্যাট ইজ হোয়াট ম্যাটার্স ইন দি লং রান, ইউ নো—

শঙ্কর কিছু না বলিয়া আর একটু হাসিল। মিস্টার বোস হাত-ঘড়ি দেখিলেন। তাহার পর ঘরের কোণে গিয়া ছড়ি রাখিবার র‍্যাক হইতে একটি ছড়ি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, হেঁটেই যাওয়া যাক। শঙ্করের পানে চাহিয়া হাসিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বিশেষ কোন ভঙ্গীভরে গেলেন না ; কিন্তু তবু শঙ্করের মনে এই অনুভূতিটুকু জাগাইয়া দিয়া গেলেন যে, তিনি পদব্রজে ক্লাবে গমন করিয়া একটা অসাধ্য সাধনই বুঝি বা করিলেন। শঙ্করের কেন এরূপ মনে হইল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো বলিতে পারিত না ; কিন্তু তাহার মনে হইল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া নীচে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। নীচের দালানে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব্‌ বিমর্ষভাবে জ্বলিতেছে, চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং বলিল, মাঈজী উপরে আছেন। উপরে উঠিতে উঠিতে তাহার

নিজেরই কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। সত্যই অনেকদিন সে শৈলর কাছে আসে নাই। শৈলর কথা আজকাল তাহার মনেই পড়ে না।

শৈল দালানেই ছিল, পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। কোন প্রশ্ন করিল না।

তুই এসব কি করছিস?

শৈল তবু উত্তর দিল না। কাঁচি দিয়া কি একটা কাটিতেছিল, নীরবে তাহাই কাটিতে লাগিল।

শৈল দালানে ছোটখাটো একটি দরজির দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল যেন। কাঁচি, কল, ফিতা, ফ্রিল, ছিট, প্যাটার্ন—চতুর্দিকে ছড়ানো। শঙ্কর নিকটের চেয়ারটায় বসিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেল। সবই ছোট ছেলের জামা, একেবারে শিশুর গায়ের।

এত জামা করছিস কার জন্যে, তোর দাইয়ের কটা ছেলে-মেয়ে—

কেন, দাই ছাড়া আর কারও ছেলেমেয়ে হতে নেই?

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, যদিও পা-কল, তবু শৈল হাত দিয়া ঘুরাইয়া সেলাই করিতেছে। আরও লক্ষ্য করিল, শৈলর মুখে একটা পাণ্ডুর সুন্দর শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতৃত্বের পূর্বাভাস। শঙ্কর বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শৈলও নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ আজ ডেকে পাঠিয়েছিস কেন?

শৈল কিছু বলিল না, সেলাই থামাইয়া উঠিয়া গেল। মিনিট কয়েক পরে ঘর হইতে একটা খাতা আনিয়া বলিল, এই নাও।

কি এ?

শঙ্কর খাতাখানা চিনিতে পারিয়াছিল, তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তোমার কবিতার খাতাখানা, ফিরিয়ে দিলুম।

শঙ্কর খাতাখানা হাতে লইয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, কি যে বলিবে সহসা ভাবিয়া পাইল না। শৈল আবার কলে আসিয়া বসিল এবং নীরবে সেলাই করিতে লাগিল। শঙ্কর শৈলর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া

রহিল; তাহার মনে হইল, শৈল যেন বড় বেশি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরি, চুনির দুলটা আলোকবিদ্ধ একবিন্দু রক্তের মত কাঁপিতেছে।

এতদিন পরে খাতাখানা ফিরিয়ে দেবার মানে?

ও খাতা রাখবার আর আমার অধিকার নেই।

শৈল কল ছাড়িয়া আবার উঠিল এবং ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। পর-মুহূর্তেই কপাটটা একটু খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল, আর আমার কিছু বলবার নেই শঙ্করদা, তুমি আব তোমার সময় নষ্ট ক'রে ব'সে থেকো না, তোমার অনেক কাজ। আমার শরীরটা ভাল নেই, একটু শুই আমি, বড ক্লান্ত লাগছে।

আবার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। শৈল তাহার মুখেব উপর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। সেই শৈল। একবার তাহার মনে হইল, শৈলকে ডাকে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ডাকিয়া কি হইবে? দুই-চারিটা মৌখিক মিষ্ট বচনে আর কতকাল তাহাকে ভুলাইবে সে? এ ভণ্ডামির প্রয়োজনই বা কি?

শঙ্কর উঠিয়া নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কাগজ পোড়ার গন্ধ পাইয়া শৈল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দেখিল, কবিতার খাতাখানা সিগারের আগুনে পুড়িতেছে। অন্যমনস্ক শঙ্কর খাতাখানার উপর জ্বলন্ত সিগারটা নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

৬

মৃন্ময়ের বাসায় থাকিবার সময় আস্মি-দাজ্জির পিতা নিবারণবাবুর সহিত শঙ্করের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইহার ফলে নিবারণবাবু যেন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ভন্টুর ব্যবহারে নিবারণবাবু মর্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ

নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা আহত হইয়াছিলেন তিনি ভন্টুর অন্তর্ধানে। সেই হইতে ভন্টু আর নিবারণবাবুর বাসায় পদার্পণ করে নাই। ভন্টুর লজ্জা করিত।

প্রতিবেশী হিসাবে কিছুদিন বাস করিয়া শঙ্কর ভন্টুর স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে নিবারণবাবু শুধু আকৃষ্ট নয়, বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্কর মুকুজ্জেমশাইয়ের স্নেহভাজন, শঙ্কর নিজে চাকরি না লইয়া মৃন্ময়কে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে, শঙ্কর বিদ্বান একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, সর্বোপরি সে ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে—এই সকল ধারণা থাকাতে নিবারণবাবু শঙ্করের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজকাল কোনরূপ বিপদে পড়িলে শঙ্করের কথাই তাঁহার সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁহার চিররুগ্ন স্ত্রীর কি সেবাটাই না শঙ্করবাবু করিয়াছিলেন! যদিও তাঁহার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত বাঁচেন নাই, কিন্তু লোকটির যে পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন তাহা কোনদিন ভুলিবার নয়।

শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিতেই নিবারণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আসুন শঙ্করবাবু, আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি, দোকানে বেরুই নি এখনও।

গলির মধ্যে নিবারণবাবুর চায়ের দোকানটি এখনও ঠিক আছে, প্রত্যহ তিনি সেখানে গিয়া বসেন।

কেন, ব্যাপার কি?

আস্‌মির খোঁজ পাওয়া গেছে, মুকুজ্জেমশাই ধুবড়ি থেকে এই চিঠি লিখেছেন দেখুন।

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া প'ড়িয়া দেখিল। অনেক অনুসন্ধানের পর মুকুজ্জেমশাই ধুবড়িতে আস্‌মি এবং মাস্টারকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের একজন পরিচিত পদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় এ কার্য সফল হইয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কেবল তাহাদের আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের দুইজনের বিবাহও দিয়াছেন। লিখিয়াছেন—এ ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়াই সর্বাপেক্ষা সমীচীন; পাছে নিবারণবাবু কোনরূপ আপত্তি তোলেন,

তাই তাঁহাকে এ কথা জানানো হয় নাই। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মাস্টারের একটি চাকরিও তিনি চা-বাগানে জুটাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পরিচিত একটি ম্যানেজারের সহিত দেখা হইয়া যায়, তিনি অবিলম্বে মাস্টারকে তাঁহার অধীনে ভর্তি করিয়া লইয়াছেন, মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। নিবারণবাবু যেন বিবাহ-ব্যাপারে ক্ষুব্ধ না হন, কপিলবাবু (অর্থাৎ মাস্টার) কুলীন না হইলেও তাঁহার স্বজাতি এবং মোটের উপর লোক মন্দ নয়। মানুষ দেবতা নয়, তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করিতে হইবে বইকি।

শঙ্কর পত্রখানি পাঠ করিয়া নিবারণবাবুকে ফেরত দিল।

বুঝলেন, কদিন থেকে আমার ডান চোখের ওপর-পাতাটা ক্রমাগত নাচছিল।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, ভালই তো হয়েছে।

ভাল! একে ভাল বলেন আপনি! ওই নচ্ছারটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে, এ কথা ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে মশাই।

যাক, সে তো যা হবার হয়ে গেছে, এইবার তাদের আসতে লিখুন।

আসতে লিখব? আমি? নিবারণ শর্মা সে বান্দাই নয়। ওদের আর মুখদর্শন করব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, বুঝলেন, মুখদর্শন করব না। ওই কালসাপকে আবার নেমন্তন্ন!

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। এখন আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি, তাই বলুন। তাদের কোনও খবর পেলেন?

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল।

না, এখনও তারা খবর দেয় নি, আমি খোঁজ করব কাল।

করবেন দয়া ক'রে একটু। মেয়েটার একটা গতি ক'রে আমি সোজা কাশী চ'লে যাই মশাই, আর পারি না।

যে পাত্রটি সেদিন দার্জিকে দেখিয়া গিয়াছিল—(শঙ্করই তাহাকে

যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল) সে দার্জিকে পছন্দ করে নাই। শঙ্কর ইহা জানিত, কিন্তু রূঢ় সত্যটা সে বলিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি উঠি এখন, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।

কাল খবরটা নেবেন ?

নেব।

মাঝে একদিন আর এক ছোকরা দেখে গেল, তার পছন্দ হয় নি।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিবারণবাবু বলিলেন, পছন্দ হ'লেও তার সঙ্গে আমি দিতুম না, ঠোঁটে ধবল, তিন কুলে কেউ নেই।

ও, তাই নাকি ?

আর বলেন কেন ? যত ব্যাটা কদর্য লোফার শ্বশুরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার চেষ্টায় আছে।

শঙ্কর একটু হাসিল।

আমি আজ যাই, তাড়া আছে।

আসুন, আপনার নানা কাজ, আমার কথাটা মনে রাখবেন।

আচ্ছা। শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তা হইতে শুনিতে পাইল, নিবারণবাবু বলিয়া উঠিলেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল !

৭

ভন্টুর বাসায় যখন শঙ্কর গিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। মাহিনা বাড়াতে ভন্টুর দৈন্যদশা অনেকটা ঘুচিয়াছিল। মুখে সে যা-ই বলুক, চাল সে বদলাইয়াছে। আগে বাড়িতে ঢুকিলেই ময়লা বিছানা, ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া মাদুর, দড়ির আলনায় স্তূপীকৃত মলিন জামাকাপড়, দালানের কোণে ভাঙা তক্তাপোশ প্রভৃতিতে যে দারিদ্র্য প্রকট হইয়া থাকিত, এখন তাহা আর নাই। বাড়িতে এখন বেশ একটা লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিয়াছে।

সে বাড়িও এখন নাই, ভন্টু বাড়ি বদলাইয়াছে, বেশ ভদ্রগোছের দ্বিতল একটি বাড়ি। দ্বিতলের ছোট দুইখানি ঘর লইয়া ভন্টু থাকে, একটি শুইবার বসিবার ঘর—অপরটি বাথ-রুম। বাথ-রুম না হইলে ইন্দুমতীর চলে না। একতলার শ্রেষ্ঠ ঘরখানি অবশ্যই বাকু লইয়াছেন। ঢুকিতেই প্রথমে বাকুর ঘর।

ঢুকিয়াই শঙ্কর বাকুর দরাজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, উপদেবতা নন! তা হলে বাঁচা গেল। কিন্তু অবিশ্বাস ক'রো না, ওঁরা আছেন।

বউদিদির সহিতই কথা হইতেছিল। বউদিদি ঘরের মেঝেতে পান সাজিতে সাজিতে শ্বশুরের সহিত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে দিতে গল্প করিতেছিলেন। ঘাড় নাড়িয়া যখন কুলাইতেছিল না, তখন উঠিয়া গিয়া শ্বশুরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছিলেন। বধির বাকু তাহা না হইলে কিছুই শুনিতে পান না। শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি একমুখ হাসিয়া সম্বর্ধনা করিলেন।

এস, বড় রাত করলে কিন্তু। ঠাকুরপো বোধ হয় তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ। মৃন্ময় ঠাকুরপোও আসে নি এখনও।

ভূতের গল্প হচ্ছিল নাকি?

বউদিদি হাসিলেন।

নন্টুর অসুখ করেছিল কিনা, তার পথ্যের দিন ঠাকুরপোর আপিসের এক বন্ধু কিছু জ্যান্ত কইমাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছগুলো দালানের কোণটায় ঢালা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা মাছ কখন যে লাফাতে লাফাতে গিয়ে ওই পুরনো বড় তোরঙ্গটার পেছনে গিয়ে ঢুকেছিল, তা আমরা কেউ টেরও পাই নি। ক্রমে সে মাছ ম'রে প'চে বাড়িময় দুর্গন্ধ, ঠাকুরপো চারিদিকে ফিনাইল ছেটাচ্ছে, কিছুতেই গন্ধ যায় না। বাবা বললেন—পঞ্চপাঠ এ বাড়ি বদলাও, নিশ্চয় কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে। আজ ঘর ধোয়া হচ্ছিল, তোরঙ্গটা সরাতে গিয়ে সেই পচা মাছ বেরুল।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, যত আজগুবি কাণ্ড আপনাদের, এ যুগে ভূত আছে নাকি?

বউদিদি উঠিয়া বাকুর কানে চুপিচুপি বলিলেন, শঙ্কর ঠাকুরপো ভূত-টুতে একদম বিশ্বাস করে না, বলছে—আপনাদের যত সব আজগুবি কাণ্ড।

বাকু তামাক খাইতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গড়গড়ার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি নলটি মুখ হইতে নামাইয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; তাহার পর নল দিয়াই সামনের মোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন, ব'স। তোমরা, আজকালকার ছোকরারা, দুপাতা ইংরিজী প'ড়ে কিছুই তো মানতে চাও না। একটা গল্প বলি শোন।

বৃদ্ধ গড়গড়ায় একটা মধ্যম গোছের টান দিয়া শুরু করিলেন, শোন। তখন আমি ঝরিয়া কলিয়ারিতে কণ্ট্রাক্টারি করি। ঠিক দুকুরবেলা, বোশেখ মাস, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর চারিদিকে, কোল রেজিং হচ্ছে, আমি শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম, ভনুটুর গর্ভধারিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে টকটকে লালপেড়ে কাপড়, মাথায় চওড়া সিঁদুর। আমি অবাক হয়ে গেলুম, এখানে এল কি ক'রে, কথা কইতে যাব, মিলিয়ে গেল।

বাকু গড়গড়ায় টান দিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

খানিকক্ষণ পরে টেলিগ্রাম পেলুম, মারা গেছে। তোমার সায়ান্স কি বলে?

কোথায় ছিলেন তিনি?

দেশের বাড়িতে, দুশো মাইল দূরে।

শঙ্কর কি বলিবে, চুপ করিয়া রহিল। বউদিদি বহুবার-শ্রুত এই কাহিনীটি আর একবার শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে পানের খিলিগুলিতে লবঙ্গ গাঁথিতে লাগিলেন। এই হাসি বাকু যদি দেখিতে পান, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি খিলিগুলি মুড়িয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তুমি ব'স, আমি ঠাকুরপোকে ডেকে দিই।

বাকু গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ তাম্রকূট চর্চা করিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিলেন।

বউমাটিকে নিয়ে এস একদিন, দেখি।

তাহার পর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, মিলিয়ে দেখেছিলে?

শঙ্কর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল।

ঠিক মিলে গেছে তো? জানি, মিলবেই।

শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। বাকুর বদ্ধ ধারণা—স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মুখ এক ছাঁচের হইবেই। ভন্টুর বিবাহের পরও বাকু শঙ্করকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—লক্ষ্য ক'রে দেখ তুমি, ভন্টুর আর নতুন বউমার মুখের 'কাট্' হুবহু এক রকম, হতেই হবে যে! ভন্টুর গর্ভধারিণীর ফোটোগ্রাফ আছে, আমার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—নাক মুখ চোখ গড়ন সমস্ত একরকম। শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াছিল, কারণ প্রতিবাদ করা বৃথা। বাকু এ বিষয়ে এমন গোঁড়া যে, যদি কোন স্বামী-স্ত্রীর মুখ এক রকম না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ধারণা—স্বামী-স্ত্রী নয়, কোনরূপ গোলমাল আছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পও তিনি করেন। একবার ট্রেনে যাইতে যাইতে তিনি নাকি একটি বেখাপ্পা দম্পতি দেখিয়াছিলেন। স্বামীর মুখ গোলাকার, কিন্তু স্ত্রীর সোজা লম্বা। বাকুর ঘোরতর খটকা লাগে। দুই-চারি স্টেশন পরেই খটকা ভাঙিল; পুলিস আসিয়া হাজির হইল, ছোকরা আর-একজনের স্ত্রীকে লইয়া সরিতেছে।

মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল।

বউদিদি আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো তোমাদের ওপরেই যেতে বললে। তোমরা ওপরে ব'সগে, আমি গরম-টরম করি ততক্ষণ।

বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিলেন, বউমা, এ কলকেটায় আর কিছু নেই, তুমি আর একটা কলকে ঠিক ক'রে দিয়ে যাও।

মৃন্ময় ও শঙ্কর উপরে উঠিয়া যাইতেছিল। শঙ্করের বগলে একটা পুলিন্দা ছিল, শঙ্কর তাহা যথাসম্ভব সঙ্গোপনেই রাখিয়াছিল, তবু তাহা বউদিদির দৃষ্টি এড়াইল না।

বগলে ওটা কি, শঙ্কর ঠাকুরপো ?

শাড়ি একখানা।

অমিয়ার জন্যে কিনলে বুঝি ?

শঙ্কর কেবল মুচকি হাসিয়াই উত্তর দিল।

মৃন্ময়ও হাসিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার হাসিটা কেমন যেন প্রাণবন্ত হইল না, বরং মুখখানা যেন আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। হাসিকে শাড়ি কিনিয়া দেওয়ার ঘটনাটা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল বোধ হয়। ঘটনাটা অনেক দিনের হইলেও সে ভোলে নাই।

শঙ্কর ও মৃন্ময় উপরে উঠিয়া গেল।

ভন্টু বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। ইন্দুমতী ঘরের এক কোণে বসিয়া উলের কি যেন একটা বুনিতেছিল। শঙ্কর ও মৃন্ময় প্রবেশ করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও আধুনিক কায়দা অনুযায়ী নমস্কার করিল।

আসুন।

ঘরে খানকয়েক মোড়া ছিল, শঙ্কর ও মৃন্ময় উপবেশন করিল। ভন্টু বিছানায় উপুড় হইয়াই রহিল এবং বলিল, শঙ্কর, তুই এসে আমার কোমরটার ওপর চ'ড়ে ব'স্ তো।

কেন, কি হ'ল কোমরে ?

জখম হয়েছে।

ইন্দুমতী মুখ টিপিয়া হাসিল এবং বলিল, আমি যাই নীচে, দেখিগে, দিদি কি করছেন !

ভন্টু উঠিয়া বসিল এবং বলিল, লবস্টারমেধ যজ্ঞের হোতাকে আর খজলে লাভ কি, তিনি একাই একশো।

ইন্দুমতী বলিল, চা ক'রে আনব ?

শঙ্কর বলিল, এখন আর চা খেয়ে কি হবে ? আপনি বসুন।

ভন্টু মুখ সুচালো করিয়া বলিল, ওঁকে অত সমীহ ক'রে লাভ কি ? উনি একটি চামাটু, লুকিয়ে চিংড়িমাছ ভাজা খেতে চান।

ইন্দুমতী বড় বড় চোখ দুইটি ভন্টুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, তুমি সবাইকে ওই কথা ব'লে বেড়াচ্ছ বুঝি?

ভন্টু গলার ভিতর হইতে গোঁক-গোঁক শব্দ করিল।

মৃন্ময় ভন্টুর সান্নিধ্যে কখনও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, হয়তো সে এই নিমন্ত্রণেও আসিত না; কিন্তু ভন্টুকে এড়াইয়া চলা এখন তাহার পক্ষে অশোভন, ভন্টু এখন তাহার উপরওয়ালা কেরানী। শঙ্করের পকেট হইতে কুমার পলাশকান্তির দেওয়া খবরের কাগজটা দেখা যাইতেছিল। মৃন্ময়ের তাহা চোখে পড়িতে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

আজকের কাগজ নাকি ওটা?

হ্যাঁ।

দিন তো, দেখাই হয় নি আজকের কাগজ।

কাগজখানা লইয়া সে এক ধারে সরিয়া বসিয়া পড়িতে শুরু করিয়া দিল।

শঙ্কর ইন্দুমতীকে বলিল, ভন্টুর কথা বিশ্বাস করি না আমরা। বসুন আপনি।

অনুযোগ-ভরা সুরে ইন্দুমতী বলিল, দেখুন তো কাণ্ড, শন্টু নন্টু ওরা দুজনে রোজই আমাকে বলত—কাকীমা, গলদাচিংড়ি ভাজা খাব, পয়সা দাও, দোকানে কেমন ভাজা হচ্ছে গরম গরম। আমি তাদের বললুম, দোকানের ভাজা খাবার দরকার কি? গলদাচিংড়ি তোরা কিনে আন্, আমি স্টোভে লুকিয়ে ভেজে দেব তোদের দুপুরে।

লুকিয়ে কেন?

ফন্তি-মিনুর যে আবার পেট ভাল নয়, দেখতে পেলে কাঁদবে।

ভন্টু মন্তব্য করিল, থিফ কোথাকার!

নিজেদের খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই বল, আমার নামে দোষ দেওয়া কেন শুধু শুধু?

অভিমানভরে ঠোঁট ফুলাইয়া ইন্দুমতী বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর একটু হাসিল এবং বলিল, কেন বেচারীকে রাগালি শুধু শুধু?

ভন্টু পুনরায় গোঁক-গোঁক করিয়া শব্দ করিল। বিছানার উপর একটা রেজিস্টার্ড খাম পড়িয়া ছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি রে?

পানউলির পরামর্শে কানা করালীকে একটা রেজিস্টার্ড চিঠি লিখেছিলাম, চিঠিখানা ফিরে এসেছে।

সত্যি, কি করা যায় বল্ তো? আমি তো উইলের কথা মাকে কিছু বলি নি।

বলবার দরকার কি?

বাবার অত টাকা মাঠে মারা যাবে?

ব্যাঙ্ক মাঠ নয়।

কানা করালী যদি না ফেরে?

টাকাটা সুদে বাড়ুক না। তুই হাত দিলেই তো সব উপে যাবে, তোর হাত তো জাদুকরের হাত!

তবু একটা কিছু—

বছর কয়েক টোঁক গিলে ব'সে থাক্ এখন। পরে কোন উকিলের পরামর্শ নিলেই হবে।

সেই কাকটা আছে এখনও?

সেটা ডাইং আপিস খুলেছে। পানউলি আর একটা এনে পুষেছে, ওর ধারণা, করালী ফিরে এসে যদি কাক দেখতে না পায় খুন ক'রে ফেলবে ওকে।

বলিস কি?

লদ্‌লদে ব্যাপার! পানউলি শবরীফাই।

সহসা মৃন্ময় চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি?

মনে হইল, কেহ যেন তাহার মাথায় ডাঙশ মারিয়াছে।

কি?

এই দেখুন, স্বর্ণলতার নাম রয়েছে।

ম্যানেজারের কবলে অচিনবাবুর সহায়তায় যে সব নারী কবলিত

হইয়াছিল, কাগজে পুলিস তাহাদের যে ফর্দটা বাহির করিয়াছে, শঙ্কর দেখিল, তাহাতে সত্যই স্বর্ণলতার নাম রহিয়াছে। মৃন্ময় বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি বিহ্বল, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে।

৮

গভীর অন্ধকার রাত্রি।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় শুইয়া আছে। অতিশয় দ্রুত ছন্দে আজ সন্ধ্যা হইতে যে যে ঘটনাগুলি তাহার মানসপটে রেখাপাত করিয়া গেল, তাহাদেরই কথা সে ভাবিতেছিল। অচিনবাবু, চুনচুন, নিবারণবাবু, শৈল, মৃন্ময়, ভন্টু, পলাশকান্তি, ম্যানেজার, কপিলবাবু, আস্‌মি, দার্জি—সকলেই একই জীবনের বিকাশ, অথচ প্রত্যেকেই কত বিভিন্ন! সে গত কয়েকদিন হইতে কাব্যরচনার উপযোগী বিষয় খুঁজিতেছিল, এই তো এত বিষয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো নূতন বস্তুর পরিচয় মিলিতেছে, ইহাদের কয়েকটিকে একত্র করিয়া গাঁথিলেই তো কাব্য হয়; জীবনই তো কাব্য, প্রত্যেক জীবনের হাসি কান্না, হতাশা-বৈরাগ্য প্রকৃতির পীড়ন এবং সেই পীড়ন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস, ইহাই মানব-জীবন এবং ইহাই মানব-জীবনের কাব্য। সমস্ত অন্তর দিয়া জীবনের সত্যকে অনুভব করিতে হইবে, কল্পনার বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত করিয়া তাহাকে বাণীলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সার্থকভাবে ইহা করিতে পারিলেই তো কাব্য হইল। মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়াই আকাশের দিকে চাহিতে হইবে। সহসা কবি লোকনাথের কথাগুলি শঙ্করের স্মরণ হইল। তিনি এই সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন, কল্পনার ভঙ্গীতে ও রসসৃষ্টির আদর্শে লেখকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, আরও থাকা চাই বাস্তব সংসার ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, সৎ অসৎ উচ্চ নীচ সকলকেই অন্তরের মধ্যে স্থান দিয়া মানব-জীবনের বিচিত্র বিকাশ হিসাবে দেখিতে হইবে। তাহাদের মহত্ত্ব-ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, তাহাদের জীবনচরিতের

অন্তরালে অজ্ঞাত সেই প্রাণশক্তির দুর্জ্ঞেয় পিপাসার সন্ধান করিতে হইবে, যে পিপাসা নানা জনকে নানা পথে লইয়া যাইতেছে। ছোট খাঁচায় বড় পাখির পাখা-ঝাপটানির যে রক্তারক্তি—মনুষ্য-জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি, প্রকৃতি-শাসিত মানুষের দুর্দশা, মূঢ় প্রবৃত্তি ও অকৃতের আকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের দ্বন্দ্বই কাব্যলোকের আলো-ছায়া।

…সহসা অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং ঘুমের ঘোরে শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল। রঙিন শাড়িখানি পাইয়া আজ সে ভারি খুশি হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অমিয়াকে মনে করিয়া শঙ্কর শাড়িখানা কিনে নাই, শাড়িখানা দেখিয়াই অমিয়ার কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। নানারূপ ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সে অমিয়ার দিকে মন দিতে পারে না। মনে হয়, তাহার প্রতি সে অবিচার করিতেছে, বাহিরের ঐশ্বর্য দিয়া তাই সে অমিয়াকে ভুলাইতে চায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয়, সত্যই কি অমিয়া ভোলে? ভোলে কি না তাহা শঙ্কর জানে না, কিন্তু ইহা সে জানে যে, অমিয়া কখনও বিচলিত হয় না, তাহার আচরণ সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন করে না। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহ তাহার মনে জাগে না, স্বামীর সম্বন্ধে কোনরূপ হীন ধারণা পোষণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। নীরবে শান্তমুখে সে পত্নীর কর্তব্য করিয়া যায়। শঙ্কর নিজে কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বইকি। যুবতী পত্নীকে কোন্ যুবক-স্বামী ভাল না বাসে!

৯

শঙ্করের মা দেশে থাকেন। শঙ্করের অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্করের নিকট আসিয়া তিনি থাকিতে রাজী হন নাই। নানা অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি পল্লীগ্রামে থাকিতে চান। স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া তাঁহার স্মৃতি ধ্যান করিবার জন্য নয়; তাঁহাকে দেখিয়া ঠিক তাহা মনে হয় না, বরং মনে হয় যে, বিধবা হইয়া তিনি যেন সুস্থতরই হইয়াছেন। অম্বিকাবাবুর প্রখর প্রবল

ব্যক্তিত্বের চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহার মনের স্বাস্থ্য যেন বিকল হইয়াছিল, চাপমুক্ত হইয়া তিনি যেন সুস্থ বোধ করিতেছেন। তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন পল্লীপ্রীতির জন্যও নয়। অবশ্য নিরীহপ্রকৃতির মানুষ তিনি, নিজের পূজা আহ্নিক লইয়া অনাড়ম্বর নিরুপদ্রব পল্লীজীবন যাপন করা কষ্টকর নয় তাঁহার পক্ষে। কিন্তু এজন্যও তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন না। একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া দেশে থাকার হেতু অন্য। তিনি দেশে থাকেন শঙ্করের জন্যই। দূর হইতেই তিনি পুত্রের মহিমাচ্ছটা নীরবে উপভোগ করেন, নিকটে আসিয়া তাহাতে ছায়াপাত করিতে তাঁহার বড় শঙ্কা হয়, নিকটে আসিলে তাঁহার দুর্ভাগ্যের ছায়া পাছে পুত্রকেও স্পর্শ করে। তাঁহার অন্য কোন প্রকার পাগলামি নাই, কিন্তু তাঁহার এই একটা বদ্ধ ধারণা যে, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। তাঁহার এক পুত্র গিয়াছে, স্বামী গিয়াছে, তাঁহার ধারণা, তাঁহার সংস্পর্শে ছিল বলিয়াই গিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে তিনি শঙ্করের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছেন।

কালীঘাটে একটা মানত ছিল, তাহাই শোধ করিতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া শঙ্করের কাছে কয়েকদিন ছিলেন। অমিয়া যদিও তাঁহার কাছে ইতিপূর্বে কিছুকাল ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে তখন তেমন ভাল করিয়া দেখেন নাই। রঙিন-কাপড়-পরা নতমুখী বধূটি তখন তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত করে নাই। এই কয়দিনে অমিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে কেমন যেন একটা অনুকম্পামিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়াছে। অমিয়া শঙ্করের বধূ বলিয়া নয়, অমিয়া শঙ্করের অনুপযুক্ত বলিয়া অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু কিছু বলেন নাই। যখন তাঁহার মত্ততা থাকে না, তখন তিনি অতিশয় নীরবপ্রকৃতির লোক, নিজেকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন এবং প্রায় অধিকাংশ সময় ঠাকুরঘরেই কাটান। অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিলেন, একটা অনুকম্পামিশ্রিত স্নেহও জাগিল; ইচ্ছা হইল যে, তাহাকে বকিয়া বকিয়া সংশোধন করিয়া শঙ্করের উপযুক্ত করিয়া দেন; কিন্তু তাহা হইলে শঙ্করের কাছে থাকিতে হইবে, তাহা তো অসম্ভব। তিনি মানত শোধ করিয়া চলিয়া

গেলেন। ট্রেনে চড়িয়া শঙ্করকে শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বউটাকে দেখিস একটু, সব সময়ে নিজেকে নিয়ে থাকলেই কি চলে?

আচ্ছা।

ট্রেন চলিয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, মা এ কথা বলিলেন কেন? ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মায়ের কথাটা সে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল। কোন নিগূঢ় অর্থ আছে নাকি? পর-মুহূর্তেই হুইলারের স্টলের পুস্তকসম্ভার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সব ভুলিয়া সে সেই দিকেই আগাইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে কয়েকখানা বই কিনিয়া সে বাড়ি ফিরিল। ভাল বই দেখিলে সে লোভ সামলাইতে পারে না, ধার করিয়াও কিনিয়া ফেলে। জানে, সব বই সে পড়িতে পারিবে না, পড়িবার সময় নাই; তবু কেনে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে থামিয়া গেল, চোখে পড়িল, দোতলার জানালায় অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখের একটা পাশ, কবরীর খানিকটা অংশ, রঙিন শাড়ির বিস্রস্ত প্রান্তটুকু, আর কিছু নয়—অমিয়ার এ রূপ সে তো কখনও দেখে নাই! মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

১০

অনেক দিন পরে শঙ্কর একা মাঠে গিয়া বসিয়া ছিল। বসিয়া বসিয়া সে নিজেরই অতীত জীবনটার পর্যালোচনা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, যাহা তাহার কাম্য, তাহার সন্ধান মিলিয়াছে কি? সারা জীবন সে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলুক —এই কামনায় তাহার চিত্ত সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত। বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া সে সাধ তাহার মিটিয়াছিল। আজও তাহার সহপাঠীরা এবং শিক্ষকেরা তাহার ভাল-ছেলেত্ব লইয়া সগর্বে আলোচনা করেন। পরীক্ষায় প্রথম হইবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অন্তরে চিরস্থায়ী হইল না। ম্যাট্রিকুলেশন

পরীক্ষা দিবার পরই তাহার মনে দেশসেবা করিবার আগ্রহ জাগিল, মনে হইল, ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া, কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হইয়া, বন্যাদুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া, চরকা চালাইয়া, খদ্দর পরিধান করিয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। অনন্যকর্ম হইয়া কিছুকাল এ কর্তব্য সে পালনও করিয়াছিল; কিন্তু যেই খবর বাহির হইল যে, সে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছে, অমনই তাহার মত বদলাইয়া গেল, অমনই অবলীলাক্রমে সে কলেজে ভরতি হইয়া বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান পড়িতে লাগিল। শুধু পিতার আদেশেই নয়, তাহার নিজেরও মত বদলাইয়াছিল বইকি। চরকা ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কিন্তু সে বুঝিয়াছিল যে, কিছুই হইতেছে না, দেশের লোকের সত্যকার কোন উপকারই সে করিতে পারিতেছে না, কেবল হুজুকে মাতিয়া হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। ক্রমশ সে বুঝিয়াছিল যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাধনাই প্রকৃত দেশসেবা, বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নতি না করিয়া চরকা চালাইতে গেলে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি হইবে না। একটা নূতন আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যেন সে আই. এস-সি. এবং বি. এস-সি. পাস করিয়া ফেলিল। তাহার এই ব্রহ্মচর্য এবং বিজ্ঞানসাধনার আদর্শ মফস্বলে অটুট ছিল, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সুরমা, রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, বেলা, শৈল, মুক্তোরা আসিয়া তাহার মনে যে আলোড়ন তুলিল, তাহাতে তাহার পূর্বজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধ-স্বপ্ন আদর্শ-কর্তব্যের সমস্ত মানদণ্ড উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনে হইল, জীবনকে উপভোগ করাই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য, চার্বাকদর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন। কিন্তু সে দর্শন অনুসরণ করিয়াই বা লাভ কি হইল, কত রামী বামী ক্ষেন্তি, কত বীণা আশা রাধা, কত মিষ্টিদিদি তেতোদিদি আসিল এবং গেল—সকলের নামও মনে নাই; কিন্তু কি হইল? জীবনকে উপভোগ করা হইল কি? পীবর বক্ষ, চটুল চাহনি, লাস্য-হাস্য, ভাব-ভঙ্গী কিছুরই তো অভাব ছিল না; তবু মনে এখনও অতৃপ্তি কেন? কেন মনে হইতেছে, জীবনটা বৃথায় গেল? জীবনকে সে তো কম উপভোগ করে নাই! কিন্তু এখন আর ওসব কিছুই ভাল

লাগিতেছে না। চুনচুন কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও আর তেমন মাদকতা নাই। চুনচুনের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে সে উত্তেজিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহার কাছে গেলেই সে উত্তেজনা নির্বাপিত হইয়া যায়, মনে হয়, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট আসিয়াছে।

যে বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একদিন চরকা-নীতিকে উপহাস করিয়াছিল, সে বিজ্ঞানও তাহাকে বেশি দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে নাই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রভাবকে অস্বীকার সে করে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কোনরূপ প্রগতি যে অসম্ভব তাহা সে জানে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াই যে করিতে হইবে, ইহাও সর্বতোভাবে সে স্বীকার করে, তবু সে বিজ্ঞানচর্চা ত্যাগ করিয়াছে। সুযোগ পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। কেন? সহসা তাহার মনে হইল, আমাদের চিন্তার সহিত আমাদের কার্যের কি সত্যই কোন যোগ আছে? চিন্তা করিয়া যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি আমরা সব সময়ে করি? কোন সময়ে কি করি? তাহার মনে হইল, চিন্তা করা শিক্ষিত মনের বিলাস মাত্র, আমাদের কার্যের সহিত তাহার ক্বচিৎ সম্পর্ক থাকে। আমরা যাহা করি, তাহা চিন্তাপ্রণোদিত হইয়া করি না, নিজের সুখের জন্য করি। সে সুখের পিপাসা অন্তরের যে অন্ধকার কন্দর হইতে উৎসারিত হয়, তাহার সন্ধান আজও আমরা পাই নাই। চিন্তা করিয়া সৎ-অসৎ ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিতের একটা আদর্শ আমরা খাড়া করি বটে, কিন্তু তদনুসারে আমরা চলি না, আমরা চলি নিজেদের আন্তরিক প্রেরণায়। সে প্রেরণার সহিত যদি কেতাদুরস্ত নীতির মিল থাকে ভালই, যদি না থাকে তাহা হইলেও আমরা নিরস্ত হই না, যাহা করিবার আমরা ঠিক করিয়া যাই, কোন অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তি তখন যেন আমাদের উপর ভর করিয়া আমাদের নীতিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এই শক্তিই তাহাকে হয়তো বিজ্ঞানের পথ হইতে সাহিত্যের পথে আনিয়াছে, সুগম সুপরিচিত পথ হইতে টানিয়া দুর্গম অপরিচিত পথে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই শক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াও কিন্তু আর একটা যুক্তির মোহ হইতে শঙ্কর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার

মনে হইতেছিল যে, দেশের মনে বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করা যদি সত্যই প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যস্থতাতেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্যই সে বিজ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত বাহন। বিজ্ঞানকে সম্যকরূপে গ্রহণ করিবার মত সুস্থ মনোবৃত্তিও দেশের সাহিত্যই গঠন করিবে। তাই সাহিত্যের পথকেই সে জীবনের পথরূপে বাছিয়া লইয়াছে, এই পথ ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে।

হঠাৎ যেন আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছাত্রজীবনে স্কুলের হেডপণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্য তাহার মনে যে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, 'আনন্দমঠ' পাঠ করিয়া যে দেশকে সে জননী-জন্মভূমি বলিয়া জানিয়াছিল, সেই দেশাত্মবোধই তাহাকে জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে এতদিন পরিচালিত করিয়াছে, তাহার সকল কর্মে প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—রবীন্দ্রনাথের এ সঙ্কল্পকে সে-ই তো মূর্ত করিবে। সাহিত্যের পথই তাহার পথ, এই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। কিন্তু ইহার নাম কি সাহিত্য-পথে চলা? 'সংস্কারক' আপিসে চাকরি করা মানে কি সাহিত্য-চর্চা? শঙ্করের রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। 'নারীস্তোত্র' নামে সে যে কবিতাটা লিখিয়াছিল, মজুমদার মহাশয় তাহা 'সংস্কারক' পত্রিকায় ছাপিতে নিষেধ করিয়াছেন। সে নিজে সহকারী সম্পাদক, অনায়াসেই সে লেখাটা তাঁহাকে না দেখাইয়াও ছাপিতে পারিত। কিন্তু অদ্যাবধি সে কোন লেখা সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে ছাপে নাই, সম্পাদক মহাশয়ও এ যাবৎ তাহার কোনও লেখায় আপত্তি প্রকাশ করেন নাই, আজ হঠাৎ 'নারাস্তোত্র' কবিতাটা তাঁহার খারাপ লাগিয়া গেল? অশ্লীল? কি এমন অশ্লীলতা আছে উহাতে? 'শৃঙ্গার' 'স্তন' 'স্বচ্ছবসনা' 'নীবিবন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটা কথায় দাগ দিয়া তিনি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্ ভাল কবির কবিতাতে এসব কথা নাই? কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, এমন কি রবীন্দ্রনাথও—। শঙ্করের হাসি পাইল—ওই বেরসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হীরালাল মজুমদারের নির্দেশ অনুসারে কাব্যরচনা করিতে হইবে নাকি? চণ্ডীচরণ দস্তিদারের কথা মনে পড়িল। ওই লোকটি হয়তো

হীরালালবাবুর হৃদয় হরণ করিতে পারিবে। কাব্যরসবিবর্জিত খাঁটি কর্মক্ষম ব্যক্তি। কম কথা বলেন। ঠিক সময়ে—কখনও কখনও ঠিক সময়ের পূর্বেও—আপিসে আসেন এবং রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যান। নিলয়কুমারের সহকারী হিসাবে বাহাল হইয়াছেন, 'সংস্কারক' পত্রিকার ব্যবসায়ের দিকটা দেখাই নাকি তাঁহার একমাত্র কার্য। শঙ্করের কিন্তু সন্দেহ হয়, নীরবে তাহার গতি-বিধি লক্ষ্য করাই তাঁহার প্রধান কার্য। সর্বদাই যেন একটা মুখোশ পরিয়া আছেন। একটি বাজে কথা বলেন না, রসিকতা করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করা যায় না। চণ্ডীচরণ অতীত জীবনে পড়াশুনার বিশেষ ধার ধারেন নাই, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত নাকি পড়িয়াছিলেন এবং তাহার জোরেই নাকি তিনি কুড়ি বৎসর পূর্বে কোন সদাগরি অফিসের কেরানীগিরি যোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছয় মাস পূর্বে তাঁহার কেরানীজীবন শেষ হইয়াছে; কিন্তু সামর্থ্য এবং চাকুরিস্পৃহা এখনও শেষ হয় নাই বলিয়া পুনরায় তিনি কাজে লাগিয়াছেন। এই ইতিহাসটুকুই শঙ্কর জানিত, আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে যে, চণ্ডীচরণ শুধু কেরানীমাত্র নহেন, তিনি একজন প্রত্নতাত্ত্বিকও। অর্থাৎ সাহিত্যের দরবারে তাঁহারও কিঞ্চিৎ দাবি আছে। তাঁহার প্রত্নতত্ত্বও আবার এমন বিষয়ে, যে সম্বন্ধে শঙ্করের কোনও জ্ঞান নাই। প্রাচীন মিশর তাঁহার বিষয়। সবজান্তা নিলয়কুমার নাকি ইজিপ্টোলজির একজন সমঝদার, তিনি চণ্ডীচরণকে খুব উৎসাহিত করিতেছেন। খবরটা শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনে একটা অস্বস্তি জাগিয়াছে, তাহার মনে হইতেছে, হয়তো এই দাবির জোরেই চণ্ডীচরণবাবু একদিন তাহাকে পদচ্যুত করাইয়া নিজেই 'সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদক হইয়া বসিবেন এবং ভিতরে ভিতরে হয়তো তাহারই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

অনেক রাত্রে শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, মৃন্ময়ের স্ত্রী হাসি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। যাহা শুনিল, তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময় আপিসের টাকা ভাঙিয়া ধরা পড়িয়াছে। সে নাকি এখন জেলে। অতিশয় শান্ত কণ্ঠে হাসি সংবাদটি দিল। বিস্ময়ে শঙ্করের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সে চুপ করিয়া হাসির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময় চুরি করিয়া

জেলে গিয়াছে! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু ইহার সম্ভাব্যতা লইয়া বিচার করিবার সময় নাই, শঙ্করের মনে হইল, অবিলম্বে কিছু একটা করা প্রয়োজন।

আপনি বসুন, আমি ভন্টুর কাছে যাই। দেখি, কতদূর কি করা যেতে পারে! হয়তো কোথাও কোন ভুল হয়েছে—

কোথাও যাবার দরকার নেই। ভন্টুবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন, কিছু হবে না। কিছু ভুলও হয় নি, উনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছেন, টাকাও ফেরত দিতে রাজী নন। ওঁর জেল হবেই।

কত টাকা?

দশ হাজার।

দশ হাজার! এত টাকা কি ক'রে পেলে?

আপিসের সিন্দুকে ছিল, কেশিয়ারের টেবিল থেকে চাবিটা সরিয়ে টাকাটা নিয়েছেন।

টাকাটা কোথা?

হাসি চুপ করিয়া রহিল।

সহসা তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা টপটপ করিয়া গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। ভাবিতেছিল, কি করিয়া এই নূতন সমস্যাটির সমাধান করিবে। মৃন্ময়ের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, হাসিই সমস্যা। হাসির আপনজন কেহ নাই। মৃন্ময়ই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে পরিবারে তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছে, সেখানে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। সংবাদ পাইলে মুকুজ্জেমশাই অবশ্য আসিবেন, ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিবেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা ব্যবস্থাও করিবেন; কিন্তু হাসির তাহা ইচ্ছা নয়। হাসি শঙ্করকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে যেন খবর না দেওয়া হয়; তিনি তাহার যে উপকার করিয়াছেন সে ঋণই সে জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে

না, ঋণের বোঝা আর সে বাড়াইতে চাহে না। কিন্তু সে যে ঠিক কি করিতে চায় তাহাও এখন পর্যন্ত খুলিয়া বলে নাই।

তুমি এখনও ঘুমোও নি ?

অমিয়া শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল।

না। হাসিকে নিয়ে কি করা যায় তাই ভাবছি।

আমাদের কাছেই থাক্, কি আর করবে ?

আমাদের কাছেই থাকবে ?

আমাদের কাছেই এসেছে যখন, কোথায় আর যাবে, যেতে বলাটা কি ভাল দেখায় ?

তা বটে। তা হ'লে থাক্।

শঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইল। অমিয়া তাহার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া চুল কুরিয়া দিতে লাগল।

ঘুমোও তুমি।

ঘুমুচ্ছি।

শঙ্করের কিন্তু ঘুম আসিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমিয়া না হইয়া যদি অপর কোন মেয়ে হইত, তাহা হইলে হাসির অভ্যাগমে সে শঙ্কিত হইয়া পড়িত। হাসি সুন্দরী এবং যুবতী। অমিয়ার মনে কিন্তু এতটুকু শঙ্কা নাই। শঙ্কর সম্বন্ধে সে এত নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় যে, শঙ্কর তাহার আচরণে অবাক হইয়া যায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয় যে, অমিয়া বোধ হয় অতিশয় নির্বোধ। আবার মনে হয়, কই, বুদ্ধিহীনতার আর কোন লক্ষণ তো সে দেখিতে পায় না; কেবল এই বিষয়েই—যে বিষয়ে নারীবুদ্ধি সর্বাপেক্ষা প্রখর—সে বিষয়েই সে নির্বোধ ?

১১

তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। শঙ্কর নীচের ঘরটায় বসিয়া 'কাব্যে বাস্তবতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব'

কথাটা যে অর্থে লইয়া বাস্তববাদীদের বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে উপহাসযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উপহসিত সমালোচকদের পক্ষ লইয়া নানা উদাহরণ দিয়া শঙ্কর ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল যে, সমালোচকগণ কাব্যে যে 'বস্তু'র সন্ধান করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বস্তু নহে। সে বস্তুর সংজ্ঞা বিভিন্ন। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থই কাব্যবস্তু হইতে পারে না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকজনের মর্মগ্রাহ্য হয়। যে সব সমালোচক কাব্যে বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সেই বস্তুরই সন্ধান করিয়াছেন যাহা রসিকচিত্তগ্রাহী। কাব্যলোকের কুসুম এবং উদ্ভিদ-বিদ্যার কুসুমে আকাশ-পাতাল তফাত—ইহা যে নিয়মে সত্য, বিদেশাগত অবাস্তবতা অথবা অতিবাস্তবতা সেই একই নিয়মে এই সমালোচকগণ কর্তৃক অবাস্তবশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে যাহা 'অকাব্য', তাহাই কাব্যবিচারে অবাস্তব, কারণ কাব্যের বস্তু তাহাতে নাই।

শঙ্কর আছ নাকি ভাই ?

দ্বার ঠেলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ভন্টুর মেজকাকা প্রবেশ করিলেন।

এ কি, আপনি কবে এলেন ?

কঠিন বন্ধন ভাই, বুঝলে, মায়ার বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন।

বসুন।

উপবেশন করিয়া মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, রঙিন চশমাটা নাকে এমন এঁটে বসেছে যে, খোলা দুষ্কর।

কবে এলেন ?

এলাম মানে ! গেলুম কবে ?

শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিল, মুক্তানন্দ এখন প্রতি কথারই দার্শনিক জবাব দিবেন।

তোমরা যেতে দিচ্ছ কই ভাই, বার বার যাচ্ছি,আর ফিরে আসছি।

কাল ভন্টুর সঙ্গে দেখা হ'ল, সে তো কিছু বললে না !

আমি বিনোদের বাসাতেই উঠেছি। মানে, ভন্টুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না।

মিটিমিটি চাহিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। তাহার পর যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, সেইজন্যেই তো তোমার ঠিকানা যোগাড় ক'রে এই ভোরে তোমার কাছে আসা। তুমি একটা উপায় বাতলে দাও ভাই।

কিসের উপায়?

ভন্টুর কাছে যাবার।

কেন, ভন্টুর কাছে যাবার বাধাটা কি?

ওই দেখ, তুমি বুদ্ধিমান লোক হয়ে বুঝতে পারছ না—বাধাটা কি? আমি সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহীর বাড়িতে যেতে এমনিতেই তো কত বাধা, তার উপর ভন্টু নিজের ভাইপো, মোটা মাইনের চাকরি করে শুনেছি, বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে করেছে। গেলেই ভাববে, ওই রে, বাবাজী কোন মতলবে এসেছে নিশ্চয়। আজকাল সন্ন্যাসী দেখলেই লোকে ভাবে, ব্যাটার কোন মতলব আছে।

মুক্তানন্দ চক্ষু বুজিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সহসা চক্ষু খুলিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, আমি একটা উপায় ভেবে এসেছি, তুমি যদি রাজী হও।

বলুন।

তোমাকে কিন্তু একটি মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলতে হবে যে, আমার সঙ্গে রাস্তায় তোমার হঠাৎ দেখা, তুমি যেন জোর ক'রে আমাকে ভন্টুর কাছে নিয়ে এসেছ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, বেশ। বিকেলে আসবেন তা হ'লে, এখন ব্যস্ত আছি একটু।

ইহাতে মুক্তানন্দ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উঠিয়া বলিলেন, বিকেলে? আচ্ছা, তাই আসব। লেখক-হিসেবে তোমার নামডাক খুব শুনছি। আনন্দের কথা, তোমার নামডাক হবে না তো কার হবে? লিখছ নাকি কিছু এখন

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মুক্তানন্দ একবার ঝুঁকিয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

লেখ, তোমাকে আর বিরক্ত করব না তা হ'লে।

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সবই মায়া, কিছুই কিছু নয়।—বলিয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্করের মনে পড়িল, আজ বৈকালে হাসির জন্য একবার প্রফেসার গুপ্তের নিকটও যাইতে হইবে। প্রবন্ধটা এখনই শেষ করা প্রয়োজন। লিখিতে যাইবে, নিপু আসিয়া প্রবেশ করিল। হিরণদার আড্ডায় নিপুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছিল। হিরণদার আড্ডার অধিকাংশ সভ্যের সহিত এখন আর দেখাই হয় না, কেবল নিপু আর ছবি টিকিয়া আছে। নিপুও সাহিত্য-রসিক। সে নাকি গোপনে সাহিত্য-রচনাও করে, কিন্তু কাহাকেও তাহা দেখায় না। সহসা সকলকে তাক লাগাইয়া প্রভাত-সূর্যের মত অনিবার্য দীপ্তিতে একদিন বঙ্গসাহিত্য-গগনকে উদ্ভাসিত করিয়া সে সমুদিত হইবে—ইহাই তাহার আকাঙ্ক্ষা। এখন অন্ধকারে তাহার তপস্যা চলিতেছে। দরিদ্রের সন্তান। এখনও বিবাহ করে নাই। আত্মীয়স্বজন কেহই তাহাকে তাহার বিদ্যা অথবা সাহিত্য-সাধনার জন্য শ্রদ্ধা করে না। সে বেকার, অসামাজিক। একমাত্র শঙ্করই তাহাকে আমল দেয়, তাই সে শঙ্করের কাছে আসে। কিন্তু শঙ্করের কাছে আসিয়াও সে স্বস্তি পায় না। মনটা কেমন যেন বিষাইয়া উঠে।

কিছু লিখছ নাকি?

শঙ্কর যাহা লিখিয়াছিল দেখাইল।

কিছু হয় নি। তুমি যা লিখেছ, তা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছেন—

ঠিক এমনি ক'রে কোথায় বলেছেন?

নিপু কয়েকটা প্রবন্ধের নাম করিল। শঙ্কর তাহার একটাও পড়ে নাই। পড়িবে কখন? চাকরি করিতেই সমস্ত সময় চলিয়া যায়।

ছেঁড়া জামার পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া নিপু বলিল, ধারটা শোধ করতে এসেছি। কেরানীগিরি জুটেছে একটা।

তাই নাকি, শুনি নি তো?

তথাপি ইহা সত্য।

নিপু হাসিল। তাহার হাসির মধ্যেও কেমন যেন একটা চাপা ঈর্ষা চকমক করিয়া উঠিল।

চলি এখন।

নিপু চলিয়া গেল।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর প্রবন্ধটা কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

১২

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। পত্নী সুলেখা তাঁহার গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধু লক্ষ্য নয়, গতি প্রতিরোধ করিতেও তিনি উদ্যত। পুত্রকন্যাকে লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, স্বামীর প্রতি এমন করিয়া মনোযোগ দিবার অবসর, এমন কি প্রবৃত্তিও, তাঁহার এতদিন ছিল না। স্বামীকে অবশ্য তিনি চিনিতেন। বেলার সহিত তাঁহার সম্পর্কটা চোখের সম্মুখেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা রুচি এবং এম. এ. ডিগ্রী সত্ত্বেও এইজন্য তাঁহাকে নিতান্ত সেকেলে ধরনে অহিফেনও গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহার মনের অন্য অবলম্বন ছিল—পুত্র-কন্যা। কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পুত্রটি মারা গিয়াছে। আর সন্তান নাই, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজেই তিনি অধিক সন্তানের জননীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, অন্য কোন বন্ধনও নাই, স্বামীই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

তিনি নিজে যদিও স্বামীকে চিনিতেন, কিন্তু পাঁচজনের কাছে যাহা বলিয়া বেড়াইতেন তাহা ঠিক বিপরীত। পরিচিত মহলে আকারে ইঙ্গিতে তিনি এতদিন এই কথাই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, স্বামী তাঁহার দেবচরিত্র ব্যক্তি, কাব্য লইয়া আত্মহারা হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পত্নী-প্রীতি অনন্য-

সাধারণ। তাঁহার ধারণা ছিল যে, লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে ; কিন্তু সহসা সেদিন তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করিবার ভান করে মাত্র। আসল কথাটা সকলেই জানে। এক নিমন্ত্রণ-বাড়িতে স্বকর্ণে সেদিন তিনি আড়াল হইতে শুনিয়াছেন—একটা ঘরে মিষ্টিদিদির সহিত তাঁহার স্বামীর নাম জড়াইয়া একদল মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। মিষ্টিদিদি নাকি তাঁহার স্বামীকে ফেলিয়া কোন এক মুসলমান যুবকের সহিত কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহার মেয়ের বয়সী মেয়েরা ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেছে। প্রফেসার গুপ্ত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার আলাদা বাসাটিতে চলিয়া যান, আজও যাইতেছিলেন, সুলেখা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কোথায় যাচ্ছ ?

প্রফেসার গুপ্ত একটু বিস্মিত হইলেন। এ রকম প্রশ্ন সুলেখা সাধারণত করেন না।

যেখানে রোজ যাই।

কোথায় ?

প্রফেসার গুপ্ত দাঁড়াইয়া পড়িলেন, রিম্‌লেস চশমাটা একবার ঠিক করিয়া লইলেন।

জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?

হবে।

সুলেখার গলার স্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিল, তাহা করুণ বা কোমল কিছু নহে, তাহা আগুন। একটু ইতস্তত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ আজকে এসবের মানে ?

মানে, সন্ধ্যের পর তুমি আর কোথাও বেরুতে পারবে না, যদি কোথাও যাও আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়ের সময় এ রকম কোন শর্ত ছিল ব'লে তো মনে পড়ছে না।

ছিল বইকি, তুমি আমাকে সুখে রাখতে বাধ্য।

ও। আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

সুলেখার দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, দেখ, কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, নিজে সুখী হতে হয়। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে জীবনে তুমি কখনও সুখী হতে পারবে না। আমি অবশ্য চেষ্টা করব।

আমাকে সুখীই যদি না করতে পারবে, তা হ'লে বিয়ে করেছিলে কেন?

ঠিক ওই একই প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারি, কিন্তু তা আমি করব না। আমার উত্তর—সমাজে থাকতে গেলে একটা বিয়ে করা প্রয়োজন, তাই করেছি। ভেবেছিলাম—। যাক সে কথা।

কি ভেবেছিলে?

এখনই বলতে হবে সেটা?

বলই না শুনি!

ভেবেছিলাম, তুমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছ, তখন তোমার সঙ্গে আমার মনের খানিকটা মিল হবে। এখন দেখছি, সেটা মহা ভুল। পরীক্ষা পাস করলেই মিল হয় না।

তুমিই কি মিল হবার মত লোক?

সেটা তো নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। তোমার সঙ্গে মিল হচ্ছে না, এইটুকু শুধু বলতে পারি। যতদূর দেখছি, উচ্চশিক্ষা তোমার দেহকে রুগ্ন বিগতযৌবন এবং মনকে অহঙ্কারী করেছে, আর কিছুই করে নি। সাধারণ মেয়ের মতই তুমি বিলাসী, লোভী, স্বার্থপর। ডিগ্রীটা তোমার নতুন প্যাটার্নের আর্মলেট বা নেক্‌লেসের মত আর পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেবার আর একটা অলঙ্কার মাত্র, ওতে তোমার মনের কোনও উন্নতি হয় নি। তোমার কাছে যে কাল্‌চার আশা করেছিলাম, তা তোমার নেই।

আমার কাল্‌চার আছে কি নেই, সেই বিচার তোমাকে করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি—

প্রফেসার গুপ্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমার সঙ্গে কেবল কাব্য আলোচনা করবে, এই আশা ক'রেই আমাকে বিয়ে করেছিলে নাকি? তা যদি ক'রে থাক, তা হ'লে হতাশ হবার

কারণ আছে। তোমার মত কাব্য-রোগ আমার নেই, তা স্বীকার করছি।

প্রফেসার গুপ্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, আমার যেসব পুরুষ বন্ধু আছে, তাদের কারও কাব্য-রোগ নেই ; কিন্তু তবু তাদের মনের সঙ্গে আমার মনের সুর ঠিক মেলে। দেখ, এসব কথা তর্ক ক'রে বোঝানো যায় না।

আসল কথাটা চাপা দিচ্ছ কেন ? আমি পুরুষ বন্ধুদের কথা বলছি না, মেয়ে বন্ধুদের কথা বলছি। যাদের সঙ্গ পাবার জন্যে তুমি কাঙালের মত ঘুরে বেড়াও, তারা কি আমার চেয়ে বেশি কাব্য-রসিকা ?

তা কেন হবে ?

তা হ'লে যাও কেন ?

সব কথা কি খোলাখুলি আলোচনা করা যায় ?

গোপন তো আর কিছুই নেই, সবাই তো সব কথা জেনে ফেলেছে। আমি জানতে চাই, আমাকে বার বার এমন অপমান কেন করবে তুমি ?

আমার তো মনে পড়ছে না, জ্ঞাতসারে কখনও তোমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছি। আমি বরং বরাবর বাঁচিয়েই চলেছি তোমাকে। তুমিই বরং আফিং-টাফিং খেয়ে আমাকে অপদস্থ করেছ।

আমি কি সাধে আফিং খেয়েছিলাম ? বাধ্য হয়ে খেয়েছিলাম।

আমিও যা করছি, বাধ্য হয়েই করছি।

বাধ্য হয়ে করছ ! তাই নাকি ? কি রকম ?

সুলেখার চোখের দৃষ্টি ব্যঙ্গশানিত হইয়া উঠিল।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, তবে শোন। আমার মনের একটা অবলম্বন চাই। তুমি তা হতে পার নি। তুমি—শুধু তুমি নয়, তোমাদের অনেকেই দুয়ের বার হয়ে গেছ। কাব্যলোকের প্রিয়া কিংবা গৃহলোকের লক্ষ্মী কোনটাই তোমরা হতে পার নি। সেকালের মত তুমি 'পতি পরম গুরু' এই কথা বিশ্বাস ক'রে যদি আমার ঘরের লক্ষ্মী হতে পারতে, তা হ'লে হয়তো—

ঘরের লক্ষ্মী মানে ?

মানে, সেই মেয়ে, যে আমার সুখের জন্যে সর্বতোভাবে দেহ-মন-প্রাণ

উৎসর্গ করেছে, যে শুধু আমার শয্যাসঙ্গিনী নয়, আমার সর্বপ্রকার তৃপ্তিবিধায়িনী, যে আমার জন্যে নিজে হাতে রান্না করে, আমি কি কি ভালবাসি তার খোঁজ রেখে তদনুসারে চলে, আমি যাতে অসুখী হই কখনও এমন কাজ করে না, আমি অসুস্থ হ'লে যে দিবারাত্র আমার সেবা করে, আমার পিকদানি বা কমোড পরিষ্কার ক'রেও যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, আমার পুত্রকন্যার জননী হয়ে যে নিজেকে বিব্রতা মনে করে না—গর্বিত হয়, নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েও যে আমাকে সুখী করবার জন্যে সতত উন্মুখ—

অর্থাৎ, যে তোমার দাসী—

শুধু দাসী নয়, সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে দাসী। এ রকম দাসীর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই, কোন পুরুষেরই নেই বোধ হয়। এরা দাসী নয়, এরাই লক্ষ্মী, এরাই রাণী। কিন্তু এখন তোমরা পুরুষের দাসত্ব করতে চাও না, সে ক্ষমতাই নেই তোমাদের, এখন তোমরা চাও স্বাধীনতা।

চাইই তো।

বেশ, স্বাধীন হও, আমাকেও স্বাধীন হতে দাও।

আমি যদি তোমার মত স্বাধীন হই, তা হ'লে কি ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে?

ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে কি না, এই ভেবে যারা কাজ করে, তারা স্বাধীনচিত্ত নয়, তারা সুবিধাবাদী। তোমাদের স্বাধীনতার মানে কি জান? তোমাদের স্বাধীনতার মানে, স্বামীর অর্থে শাড়ি গাড়ি গয়না কিনে ভদ্রতার মুখোশ প'রে সমাজের পাঁচজনের কাছে ফ্লারিশ ক'রে বেড়ানো। ঠাকুর রান্না করুক, চাকর বিছানা করুক, বেয়ারা ফরমাশ খাটুক, বয় হাতে হাতে সব জিনিস এগিয়ে দিক, দাই বোতল খাইয়ে ছেলে মানুষ করুক, স্বামী রাশি রাশি টাকা রোজকার ক'রে তোমার পদানত হয়ে থাকুক, তোমার সুবিধার জন্যে সবাই সব করুক, কেবল তুমি নিজে কুটোটি নাড়বে না। এই হ'ল তোমাদের আদর্শ স্বাধীনতা। মাঝে মাঝে রান্না সেলাই অবশ্য তোমরা যে

। কর তা নয়, কিন্তু তা শৌখিন রান্না সেলাই, তাতে গৃহস্থের কোন উপকার য় না, তারও একমাত্র উদ্দেশ্য ফ্লারিশ করা; এত স্বার্থপর তোমরা যে, মা তেও রাজী হও না, পাছে ফিগার খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে।

আমাদের সবই খারাপ বুঝলাম, কিন্তু যাদের পিছনে পিছনে তুমি ঘুরে বড়াও, তারা কিসে আমাদের চেয়ে ভাল? তাদের কি আছে?

রূপ আছে, যৌবন আছে। পুরুষের কাছে এগুলোও কম লোভনীয় জিনিস নয়। তোমার তাও নেই। দেহের খোরাক মনের খোরাক কিছুই যাগাতে পার না, কি লোভে থাকব তোমার কাছে?

সুলেখা হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন।

মিষ্টিদিদির যৌবন আছে নাকি?

যৌবন না থাক্, এমন একটা মাদকতা আছে, যা তোমার নেই। আসল থা কি জান? আমরা মুগ্ধ হতে চাই। রূপ, যৌবন, প্রেম, প্রেমের অভিনয়, সবা, রান্না, আত্মত্যাগ—যা হোক একটা নিয়ে আমরা মেতে থাকতে চাই। মি আমাকে কি দিয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার অতি স্থূল টাকাকড়ির ম্পর্ক এবং সে সম্পর্ক আশা করি কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক আছে।

মিষ্টিদিদিও তো তোমাকে আর আমল দিচ্ছে না শুনছি। এক মুসলমান ছাঁড়ার সঙ্গে চ'লে গেছে—

এক মিষ্টিদিদি গেছে, আর এক মিষ্টিদিদি আসবে। পৃথিবীতে মিষ্টিদিদিদের ভাব ঘটবে না কখনও।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এসেছেন।

শঙ্কর অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, বাহিরে কেহ ছিল না বলিয়া এতক্ষণ ংবাদ পাঠাইতে পারে নাই। শয়নকক্ষের ঠিক পাশের ঘরেই বাহিরের র। শঙ্কর সব শুনিয়াছিল।

কি খবর?

প্রফেসর গুপ্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর হাসির জন্য আসিয়াছিল। হাসি কোন বোর্ডিঙে থাকিয়া লেখাপড়া

করিতে চায়। বাড়িতে নিজের চেষ্টায় সে ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়িয়াছে, এখন স্কুলে ভরতি হইতে চায়। প্রফেসার গুপ্তের সাহায্যে তাহাকে একটি ভাল স্কুলে ভরতি করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেই শঙ্কর আসিয়াছে। প্রফেসার গুপ্ত এ কার্য যত সহজে ও সুষ্ঠুরূপে পারিবেন, অপরে তাহা পারিবে না। শিক্ষয়িত্রী-মহলে প্রফেসার গুপ্তের খাতির আছে, তাহা ছাড়া তিনি নিজেও শিক্ষা-বিভাগের লোক, কোন্ স্কুলটা ভাল তাহা হয়তো ঠিকমত বাছিয়া দিতে পারিবেন।

সব শুনিয়া প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ আছে কোন? আমি তো যতদূর দেখেছি, লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ঠিক খাপ খাচ্ছে না সমাজের সঙ্গে।

লেখাপড়া-জানা ছেলেরাই কি খাপ খাচ্ছে? আপনি খাপ খেয়েছেন?

প্রফেসার গুপ্ত স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, পুরুষরা বেখাপ্পা হ'লে ততটা এসে যায় না। মেয়েরা বেখাপ্পা হ'লে বড় মুশকিল।

আমার তো ধারণা, মেয়েরা কিছুতেই বেখাপ্পা হয় না। ওদের প্রকৃতি জলের মত, যে পাত্রেই রাখুন ঠিক সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে।

করবে—যদি ওদের প্রকৃতিকে শিক্ষা দিয়ে বদলে না দাও। শিক্ষা পেলেই জল জ'মে বরফ হয়ে যায়।

একটু উত্তাপ পেলে কিন্তু গ'লে যায় আবার। জল কতক্ষণ বরফ হয়ে থাকবে, বলুন?

কিন্তু আমরা উত্তাপ দিই কি ক'রে, বল? আমাদের নিজেদেরই যে উত্তাপ প্রয়োজন, আমরা নিজেরাই যে বরফ হয়ে গেছি—বিলিতি রেফ্রিজারেটারে ঢুকে।

ওদেরও আপনারাই ঢুকিয়েছেন। একটা কথা ভেবে দেখছেন না কেন ওরা প্রাণপণে আমাদের মনের মত হবারই তো চেষ্টা করছে। যখন যা বলেছেন, তখনই তাই করেছে। ন বছরে গৌরীদান করতেন যখন, তখনও ওরা আপত্তি করে নি। চিতায় পুড়িয়ে মারতেন যখন, তখনও বেচারীরা

দলে দলে পুড়ে মরেছে। যখন পালকি ক'রে নিয়ে গেছেন পালকি ক'রে গেছে, যখন হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন হেঁটেই গেছে। ও বেচারীদের দোষ কি? আজ আপনারা চাইছেন, ওরা স্কুল-কলেজে পড়ুক, নাচগান শিখুক—ওরা প্রাণপণে তাই করছে। কাল যদি আপনাদের চাহিদা বদলায়, ওদেরও রূপ বদলাবে।

সব ঠিক। কিন্তু আমি সমাজ-সংস্কারক নই, আমি সামান্য মানুষ, যে কদিন বাঁচি একটু সুখে থাকতে চাই। I am fed up with the present lot. I would like to have—

প্রফেসার গুপ্ত কথাটা শেষ করিলেন না, একটু থামিয়া বলিলেন, মেয়েটির নাম কি বললে? হাসি? আচ্ছা, আজ আমি ফোনে কয়জনের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে রাখব, তুমি কাল এসো। তোমার সাহিত্যচর্চা কেমন চলছে? তোমার 'জীবন-পথে' বইখানা তত ভাল লাগে নি আমার কিন্তু। বড় পানসে।

ভাল হবে কি ক'রে বলুন, চাকরি করতে করতে সাহিত্যচর্চা করা যায় না।

তার কোন মানে নেই; উনুনের ভেতর পুড়লেও আগুন আগুনই থাকে; ওসব লেম এক্স্‌কিউজ।

শঙ্কর মুচকি হাসিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে খুব দমিয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল, 'জীবন-পথে' বইটা পড়িয়া প্রফেসার গুপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন।

তুমি বসবে, না, যাবে এখুনি?

আমাকে যেতে হবে।

চল তা হ'লে, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সুলেখা পাশের ঘরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

আমাকে চিনতে পারেন ?

কই, মনে পড়ছে না—

চিবুকের ডান দিকে কালো তিলটা দেখেও মনে পড়ছে না ?

শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমার সম্বন্ধে অত কথা আপনি জানলেন কি ক'রে ?

কল্পনা করেছি।

সবটা কিন্তু অলীক কল্পনা ব'লে মনে হয় না।

অলীক কে বললে ? কল্পনাতেই সত্য ব'লে অনুভব করেছি ব'লেই লিখেছি।

আমার সম্বন্ধে ওই সব অনুভব করেছেন সত্যি সত্যি ?

করেছি ব'লেই তো লিখেছি।

আমার সব কথা জানেন ?

জানি বইকি।

ত্রিশ বছরের একটা মেয়ের মনে সংসার সম্বন্ধে অতখানি বৈরাগ্য এসেছিল হঠাৎ ? ডাক্তারকে পেলাম না ব'লেই ক্ষিদে চ'লে যাবে ? পোলাও পেলাম না ব'লে ভাত খাওয়াও বন্ধ ক'রে দেব ?

পোলাও না পেলে মনের যে ভাবটা হওয়া স্বাভাবিক, তাই আমি লিখেছি। ভাত খাওয়ার খবর দেওয়া আমার বিষয়ের বাইরে।

বুভুক্ষাই যখন আপনার বিষয়, তখন ও-খবরটা বাদ দিলে চলবে কেন ?

ওই নোংরা খবরটা দেবার দরকার কি ?

ইচ্ছে করলেই তো আপনারা নোংরাকেও সুন্দর ক'রে তুলতে পারেন। স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চ'লে আসার খবরটাও কম নোংরা নয় কিছু।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, জানেন! ডাক্তারকে পাই নি ব'লে দুঃখ হয়েছিল অবশ্য আমার, কিন্তু তা ব'লে তার

কম্পাউণ্ডারটিকে ছাড়তে পারি নি আমি। পরের সংস্করণে যোগ ক'রে দেবেন খবরটা। আরও রিয়ালিস্টিক হবে।

শঙ্করের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। আশেপাশে চাহিয়া দেখিল। সত্যই স্বপ্ন তাহা হইলে! অদ্ভুত স্বপ্ন! তাহার 'পান্থনিবাস' পুস্তকের নায়িকা যমুনা স্বপ্নে দেখা দিয়া গেল।

আশ্চর্য!

১৪

বিনিদ্র নয়নে হাসি একা শুইয়া ছিল।

কাঁদিতেছিল না, ভাবিতেছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা নয়, দুর্মতির কথা ভাবিতেছিল। স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিবার পর মৃন্ময়কে সে কত অপমানই না করিয়াছে! মৃন্ময় কিন্তু সে অপমান গায়ে মাখে নাই। অসংলগ্ন ভাষায় অসহায়ভাবে কেবল তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, ইহা তাহার যে কর্তব্য, তাহা হইতে সে যদি বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে হাসিই বা তাহার উপর নির্ভর করিবে কোন্ ভরসায়? মৃন্ময় এত কথা এমনভাবে গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু বার বার এই কথাই বলিয়াছে। হাসি বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে চাহে নাই। ঈর্ষার কৃষ্ণধূমে তাহার আকাশ বাতাস তখন অস্বচ্ছ হইয়া ছিল।

আমাকে অনুমতি দাও তুমি।

মৃন্ময়ের কথাগুলি এখনও তাহার কানে বাজিতেছে।

আমাকে সত্যিই যদি ভালবেসে থাক, সত্যিই যদি শ্রদ্ধা করতে চাও, আমার মনুষ্যত্বকে খর্ব ক'রো না। এই ঘৃণিত পশুজীবন থেকে অব্যাহতি পেতে দাও আমাকে।

মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। প্রশস্ত উন্নত ললাট, রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাসা। ক্ষণিকের জন্য হাসি যেন এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময়ের কথাও মনে পড়িল। সেও আর ফিরিবে না। সহসা হাসি

উঠিয়া বসিল। আলুলায়িত কুন্তল দুই হাত দিয়া ঠিক করিতে করিতে আবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, তোমার সহধর্মিনী হইবার যোগ্যতা আমি লাভ করিবই। আমি যত ছোট ছিলাম, সত্যই তত ছোট আমি নই।

আলো জ্বালিয়া সে মৃন্ময়কে চিঠি লিখিতে বসিল। এ চিঠি মৃন্ময় কোনদিন পাইবে না জানিয়াও লিখিতে বসিল। আজ সে সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিয়াছিল, কেন মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিত!

১৫

হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি এটা ঠিক জান তো যে, সে বাড়িতে বড়সড় বিবাহযোগ্য আর কোন মেয়ে নেই?

না।

মেয়েটির নাম সেলিমা?

হ্যাঁ।

বাড়ির ঠিক পিছনেই পুকুর আছে?

ঠিক পিছনেই।

সামনে পাশাপাশি দুটো আমগাছ?

হ্যাঁ।

বাস্, আর কিছু দরকার নেই, ঠিক দেখে আসব আমি। তোমার যাবার দরকার নেই, আমি নিজেই চিনে বার করতে পারব। তোমার হবু শ্বশুরের নাম আলিজান—ঠিক মনে থাকবে আমার। তুমি যাও।

মুকুজ্জেমশাই আর একবার সহাস্য দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

পাশেই কাজিগ্রাম, সেখানে তোমার পিসীর কাছে চ'লে যাও তুমি।

আচ্ছা।

একটু অনিচ্ছাসহকারেই যেন রমজান রাজী হইল।

উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া একটা গোলমাল শোনা গেল। দেখা গেল, একজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটা আসিয়া পড়িল।

পালান শিগগির, একটা পাগল একটা লাঠি নিয়ে সকলের মাথা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে, দুজন খুন হয়ে গেছে। ওদিকে যাবেন না, পালান।

সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল, কোন প্রশ্ন করিবার অবসর দিল না।

মুকুজ্জেমশাই মুচকি হাসিয়া রমজানের দিকে চাহিলেন।

রমজান বলিল, চলুন, এই গলিটার ভেতর ঢুকে পড়ি।

আগে থাকতেই? এই লোকটাই পাগল কি না তার ঠিক কি? একটু এগিয়ে দেখাই যাক না!

মুকুজ্জেমশাই গলিতে ঢুকিলেন না, থামিলেনও না, যেমন চলিতেছিলেন চলিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া রমজানকে অনুসরণ করিতে হইল। একটু পরে সত্যই কিন্তু পাগলকে দেখা গেল, মোটা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সগর্জনে ছুটিয়া আসিতেছে। দৈত্যের মত চেহারা, ভীষণদর্শন। রমজান তাড়াতাড়ি পাশের একটা দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িল; আশপাশের কপাট জানালা সব নিমেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, কোথাও পলাইবার চেষ্টা করিলেন না। পাগলটাও এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। সেও মুকুজ্জেমশাইয়ের সামনে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রক্তচক্ষু মেলিয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ হেঁট হইয়া প্রণাম করিল এবং যেমন আসিয়াছিল তেমনই আবার লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

রমজান দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, তোমার বউ বিপত্তারিণী হবে বোঝা যাচ্ছে। এতবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। লাঠিটা মাথায় বসিয়ে দিলেই হয়েছিল আর কি!

রমজান অবাক হইয়া গিয়াছিল।

ও-রকম করলে কেন বলুন তো?

তবে আর পাগল বলেছে কেন?

আপনি দাওয়ায় উঠলেন না কেন?

ফুরসৎ পেলাম কই, এসে পড়ল যে! তা ছাড়া পালালেই যে সব নিস্তার পাওয়া যায়, তা ভেবো না। সিঙ্গাপুরে একবার একটা মাতাল। পিস্তল দিয়ে রাস্তায়—

গল্প করিতে করিতে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন।

আসৃমিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন মনো খোঁজ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পান নাই। এখন রমজানের হবু-বধূকে দেখিতে চলিয়াছেন। রমজানকে তিনি বড় করেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া রমজান এখন একটি ভাল চ পাইয়াছে। রমজানের বাপের সহিতই মুকুজ্জেমশাইয়ের বহুকাল হৃদ্যতা, রমজানের পড়ার খরচও মুকুজ্জেমশাই কিছুকাল চালাইয়া এ কথা অবশ্য রমজান অথবা রমজানের বাবা জানে না, তাহারা জা মুকুজ্জেমশাইয়ের কোন ধনী বন্ধু মুকুজ্জেমশাইয়ের অনুরোধে এই সাহা করিয়াছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে মুকুজ্জেমশাই দুই দিন আগে রম বাড়ি গিয়াছিলেন। গিয়া শুনিলেন, আলিজানের কন্যা সেলিমার রমজানের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। গোঁড়া মুসলমান সমাজে মেয়ে-দেখানোর প্রথা নাই। ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া রমজানের গোঁ ঘুচিয়াছে, প্রথা কিন্তু বদলায় নাই। রমজানের মুখ দেখিয়াই মুকুজ্জে বুঝিলেন, রমজান মনে মনে ক্ষুব্ধ। রমজানের বাবাকে লুকাইয়া তাই উভ বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছেন, আলিজা বাড়ির পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন কি সেলিমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন। সমস্ত দিনের মধ্যে সে নিশ্চয়ই দু একবার ঘাটে আসিবে। রমজানেরও মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত যাইবার ই কিন্তু পাছে, জানাজানি হইয়া যায়—এই ভয়ে মুকুজ্জেমশাই তাহাকে স লইয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন। রমজান সুতরাং মুকুজ্জেমশাইকে শ্বশুর-বা

গ্রামের রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া কাজিগ্রামে পিসীর বাড়িতে চলিয়া যাইবে। আলিজানের বাড়ি রেল-স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ। কাঁচা রাস্তা, হাঁটিয়া যাইতে হইবে, বৈশাখের দারুণ দ্বিপ্রহর। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু দমিবার লোক নহেন।

১৬

চুনচুন বেথুন কলেজে ভরতি হইয়াছে, হাসিও বেথুন স্কুলে ভরতি হইয়া গেল। চুনচুনের খরচ পীতাম্বরবাবু দিবেন, হাসি নিজের খরচ নিজেই চালাইবে। দুইটা ব্যাপারই শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে। মনে মনে সে একটু আহতও হইয়াছে। যদিও তাহার নিজের আয় যৎসামান্য—চুনচুন কিংবা হাসির পড়ার ব্যয়ভার অংশত বহন করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, তথাপি তাহা যদি বাধ্য হইয়া তাহাকে করিতে হইত, তাহা হইলে সে যেন মনে মনে তৃপ্তি লাভ করিত। দুইটি জটিল ব্যাপারেরই এমন সহজ সমাধানে সে একটুও খুশি হয় নাই। কিন্তু এ অস্বস্তি যে কিসের জন্য, তাহাও সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। চুনচুন কিংবা হাসির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া অবশেষে তাহাদের প্রেমাস্পদ হওয়ার বাসনা তাহার আর নাই, তাহার মনের সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। বস্তুত নারী বলিয়াই যে তাহাদের সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সমুৎসুক এ কথা সত্য নহে, উহারা নারী না হইয়া পুরুষ হইলেও সে হয়তো এই অস্বস্তি ভোগ করিত। অবহিতচিত্তে আত্মবিশ্লেষণ করিলে সে বুঝিতে পারিত যে, বাহাদুরি দেখাইবার দুই-দুইটা সুযোগ এমন ভাবে হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতেই সে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব লইয়া বেশিক্ষণ সময়ক্ষেপ করিবার মত সময় সে পাইল না, লোকনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন।

কবি লোকনাথ ঘোষালের সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কি একটা ছুটিতে তিনি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। গৃহিণীর নিকট কলিকাতা আসিবার কয়েকটি গুরুতর কারণ অবশ্য তিনি দেখাইয়া

আসিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিবার তাঁহার একমাত্র কারণ শঙ্কর। কন্যার জন্য পাত্র অথবা নিজের গণ্ডমালার জন্য চিকিৎসক অন্বেষণ করা তাঁহার অজুহাত মাত্র। সাহিত্যিক ছাড়া জগতে আপনার বলিতে তাঁহার কেহ নাই, থাকিলেও তাহাদের তিনি গ্রাহ্য করেন না। কন্যার পাত্র অথবা গণ্ডমালার চিকিৎসক জুটিবার হইলে ঠিক সময়ে আসিয়া জুটিয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস, এসবের জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যপদবাচ্য সভ্য ব্যক্তির যাহা লইয়া সত্যই ব্যস্ত হওয়া উচিত, তাহার নাম সাহিত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার প্রিয়, অসাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার শত্রু। লোকনাথ সুদর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো রঙ, খর্বাকৃতি, কদমছাঁট চুল, আরক্ত চক্ষু, চোঁখের কোণে পিচুটি। চোখে মুখে একটা দর্প প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও পরিস্ফুট।

কিছুদিন পূর্বে শঙ্কর কয়েকটি সনেট লিখিয়াছিল। বিভিন্ন মাসিকপত্রে সেগুলি প্রকাশিতও হইয়াছিল। লোকনাথবাবু তাহার প্রত্যেকটি পড়িয়াছিলেন। যে সব লেখকের সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও আশা পোষণ করেন, তাহাদের কোন লেখা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। সনেট লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল।

লোকনাথবাবু সাধারণত মৃদু হাসিয়া আস্তে আস্তে কথা বলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আপনার সনেটগুলি গীতিকবিতা হিসেবে উৎকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সনেট হয় নি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, সনেট কি এক জাতীয় গীতিকবিতা নয়?

কিন্তু গীতিকবিতা মাত্রেই সনেট নয়।

লোকনাথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে একটি দীপ্তি প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কর বুঝিতে পারিল, তাঁহার মনে আবেগ আসিয়াছে। সে চুপ করিয়া রহিল।

না, গীতিকবিতা মাত্রেই সনেট নয়, দুধ মানে যেমন ক্ষীর নয়। বুঝুন ব্যাপারটা ভাল ক'রে, লিরিকের সমস্ত উপকরণই ওতে থাকবে, অথচ স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট থাকা চাই।

শঙ্কর বলিল, তার মানে, সনেটে কোন রকম বাহুল্য থাকবে না, এই তো বলতে চান ?

যে কোন রস-রচনাতেই বাহুল্য বর্জনীয়, কেবল সনেটেরই বিশেষত্ব নয় তা। সনেটের ব্যাপারটা কি জানেন ?

লোকনাথবাবু খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, রসেটি বলেছেন—

A sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul's Eternity
To one dead deathless hour—

এই হ'ল সনেটের পরিচয়। অন্যান্য লিরিক কবিতার মত সনেটে আবেগ থাকা চাই, গভীরতা থাকা চাই, গভীর রসবোধের পরিচয় থাকা চাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই একটা বিশিষ্ট বাঁধন, কেন্দ্রীভূত ঘনীভূত একটা জিনিস, যাতে বাঁধন সত্ত্বেও অথবা বাঁধনের জন্যেই একটা চমৎকার রসরূপ ফুটে ওঠে। সেইজন্যেই যে কোন লিরিক ভাবকেই সনেটের রূপ দেওয়া যায় না।

ও।

লোকনাথবাবু বলিলেন, সুতরাং বুঝতে পারছেন, আপনার ওগুলো সনেট হয় নি।

বুঝতে পারছি।

শঙ্কর কিন্তু বুঝিতে পারে নাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে লোকনাথবাবুকে কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, তাই কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না ; করিলেই তাঁহার সহিত হৃদ্যতা আর থাকিবে না।

লোকনাথবাবু বলিয়া চলিলেন, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত গভীর ভাবধারা একটা বিশিষ্ট শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েও, অর্থাৎ ছন্দ-মিলের বিশিষ্ট বন্ধনে বন্দী হয়েও যখন রসোত্তীর্ণ হবে, তখনই তাকে সনেট বলব। আগেই বলেছি, তাই যদি হয়, তা হ'লেই বুঝতে পারছেন—যে কোন ভাব সনেটের উপযোগী নয়। অর্থাৎ, মিলবন্ধনের কৃত্রিমতা এবং ভাবোচ্ছ্বাসের অকৃত্রিমতা যেখানে স্বাভাবিক প্রবণতাবশত রসকেন্দ্রে ঘনীভূত হচ্ছে—

একই ভাবকে নানা ভাষায় নানা কথায় বারম্বার রূপান্তরিত করিয়া বক্তৃতা করা লোকনাথবাবুর স্বভাব। আজ কিন্তু বক্তৃতায় বাধা পড়িল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ বা প্রসাধনে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে পূর্বে ভীত লুব্ধ যে অনিশ্চয়তা ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া লোকটিকে সকলের নিকট খেলো করিয়া তুলিত, তাহা এখন আর নাই। তাঁহার হাবভাবে বেশ একটা সপ্রতিভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ ভঙ্গীভরে নমস্কার করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাকে ঠিক এ সময়ে বাড়িতে পাব ভাবি নি, যদিও এ সময় ঠিক অফিস-আওয়ার নয়, তবু, মানে—

লোকনাথ উঠিয়া পড়িলেন। বক্তৃতায় বাধা পড়িলে তিনি আর বসেন না। বলিয়া গেলেন, সন্ধ্যাবেলা আবার তিনি আসবেন এবং যদি পান কয়েকটি বিখ্যাত সনেটও যোগাড় করিয়া আনিবেন।

আমি আরও আগেই আসতাম, কিন্তু মোড়ে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই—, অথচ—

ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না? বসুন।

বিখ্যাত শক্তিমান লোকের সম্মুখে বসিতে পাইলে অবিখ্যাত অশক্ত ব্যক্তি যেমন কাঁচুমাচু হইয়া পড়ে, অপূর্বকৃষ্ণও সেই নীতি অনুযায়ী অতিশয় সসঙ্কোচে শঙ্করের নির্দিষ্ট আসনটিতে উপবেশন করিলেন।

একটি অনুগ্রহ আমাকে করতে হবে।

বলুন।

আমার বিয়ে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি যদি দয়া ক'রে, মানে, যদিও এটা আমার দুঃসাহস, তবু অনেক দিনের পরিচয়ের জোরে—

এর সঙ্গে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সম্পর্ক কি?

এর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, মানে, তাঁর সঙ্গে মোড়ে দেখা হওয়াতেই দেরি হয়ে গেল। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে দেখলে বিয়ের চেয়ে সেটাও কম ইম্‌পরট্যাণ্ট নয়, কিন্তু—

কেন, হয়েছে কি ?

অপূর্বকৃষ্ণের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

শোনেন নি ? প্রিয়নাথ মল্লিক এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন যে ! কাগজে বেরিয়েছে তো খবরটা।

আমি পড়ি নি। প্রিয়নাথ মল্লিক কে ?

বেলা মল্লিকের দাদাকে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ? মানে, আমি এক্‌স্‌পেক্ট করেছিলুম—যদিও অবশ্য আপনার—

কি হয়েছে তাঁর ?

অপূর্বকৃষ্ণ ক্ষণকাল থামিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, খবরটা শঙ্করকে বলা সমীচীন হইবে কি না। কিন্তু ব্যাপারটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার দ্বিধা বিদূরিত হইল।

কি হয়েছে প্রিয়বাবুর ?

তিনি এক অদ্ভুত রগ-চটা মেজাজের লোক, মানে, তা না হ'লে আপিসের মধ্যে অমন ক'রে প্রফুল্লবাবুকে—, তা ছাড়া ভদ্রলোকের দোষও এমন কিছু—

কি করেছেন প্রফুল্লবাবুকে ?

রুল-পেটা করেছেন।

কেন, হঠাৎ ?

হ্যাঁ, হঠাৎই। প্রফুল্লবাবুর দোষ ছিল না তত, তিনি এমনই ঠাট্টার ছলে, ঠিক ঠাট্টার ছলেও নয়—ভাল ভেবেই কথাটা বলেছিলেন, অথচ প্রিয়বাবু, মানে, বোধ হয়—

শঙ্কর অধীর হইয়া উঠিতেছিল, আশ্চর্য স্বভাব ভদ্রলোকের ! কিছুতেই কোন কথা সোজা করিয়া বলিতে পারেন না।

কি কথা বলেছিলেন ?

আমরা সকলেই জানতাম, অর্থাৎ আমার অন্তত তাই ধারণা ছিল যে, বেলা দেবীর ওই সব কাণ্ড-কারখানার ফলে প্রিয়বাবু আজকালকার লেখাপড়া-জানা মেয়েদেরই ওপর চটা। তাই প্রফুল্লবাবু তাঁকে খুশি করবেন

ভেবে—অবশ্য তিনি যে খুশি হবেনই এ কথা প্রফুল্লবাবুর ইম্যাজিন করাটা একটু, মানে, ফার্-ফেচেড বলতে পারেন, কিন্তু—

কি বলেছিলেন তিনি ?

তেমন কিছু নয়, এই একটু, মানে, ভাষাটা অবশ্য একটু ইয়ে গোছের, মানে অশ্লীলই বলতে হবে, কিন্তু প্রিয়বাবু ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে ওভারলুক করতে পারতেন।

এর জন্যে রুল-পেটা করলেন তিনি প্রফুল্লবাবুকে ?

সে এক ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড, ভদ্রলোক মাথা ফেটে অজ্ঞান, পুলিস-কেস—

কি বলিলেন তাঁর উকিল ?

খুব বেশি আশা দিলেন না—দেওয়া শক্ত, মানে—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়নাথ মল্লিকের মুখখানা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

আমার বিয়েতে যাবেন তো? আপনি এ রকম নিমন্ত্রণ রোজই পান নিশ্চয়, তবু যদি দয়া ক'রে—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

সেইজন্যেই চিঠি না পাঠিয়ে পার্‌সোনালি এলাম, জানি, আপনি বিজি লোক, অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেও হয়তো—

যাব।

জায়গাটা চিৎপুরের গলি, এই চিঠিতেই ঠিকানা দেওয়া আছে।

সুদৃশ্য কার্ডে ছাপানো নিমন্ত্রণ-লিপিটি অপূর্বকৃষ্ণ বাহির করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া নাক মুখ কান মুছিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, লোকে বসতে পেলেই, মানে, প্রোভার্বটা জানা আছে নিশ্চয়ই আপনার—। এবং হাসিলেন।

লোকনাথবাবুর নিরন্ধ্র সমালোচনার পর অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের তোষামোদ শঙ্করের বড় ভাল লাগিতেছিল। সে প্রসন্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, আবার কি ?

কাঁচুমাচু মুখ করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, শুধু আমার নয়, মীনুরও অনুরোধ—দয়া ক'রে একটি কবিতা যদি লিখে দেন। বেশি বড় নয়, একটি সনেট শুধু, সেদিন কি একটা কাগজে আপনার সনেট একখানা পড়লাম, ওয়াণ্ডারফুল—সিম্‌প্লি ওয়াণ্ডারফুল।

শঙ্করের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

দেবেন লিখে ?

আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

অপূর্বকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে তাহার! অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের প্রশংসার জন্য সে লালায়িত!

পিওন চিঠি দিয়া গেল। আর একটি বিবাহের নিমন্ত্রণ। পড়িয়া শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল—চুন্‌চুনের সহিত পীতাম্বরবাবুর বিবাহ!

বিস্মিত হইল; কিন্তু ইহা লইয়া তাহার অন্তরে তেমন কোন আলোড়ন জাগিল না। তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া লোকনাথবাবুর কথাগুলিই কেবল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—আপনার ওগুলো সনেট হয় নি।

১৭

শঙ্কর সবিস্ময়ে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের বিদ্যাবত্তার কথা চিন্তা করিতে করিতে আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। লোকটাকে এতদিন সে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ মাসে 'সংস্কারকে'র জন্য যে প্রবন্ধটি তিনি দিয়াছেন, যাহার প্রুফ সে এইমাত্র সংশোধন করিয়া ফিরিতেছে, তাহা পড়িবার পর লোকটির প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট না হইয়া পারা যায় না। "প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা" প্রবন্ধের নাম; কিন্তু দুইটি নয়, অনেক জ্ঞাতব্য কথাই তিনি লিখিয়াছেন। আর যাহারই থাক্, শঙ্করের অন্তত এসব কিছুই জানা ছিল না। আবিসিনিয়ার পর্বতকন্দর হইতে নীল নদের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত, নিম্ন-মিশরের সহিত ব-অক্ষরের সাদৃশ্য, পেলুশিয়ান কেনোপিকের উদ্ভব,

প্রাচীন ইজ্‌রেলাইট্‌সদের কাহিনী, জোসেফের ইতিবৃত্ত, ফারাওদের পূর্ববর্তী রাখাল রাজাগণের ইতিহাস, হিলিওপোলিস ফিনিক্স সম্বন্ধে তথ্য, আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া নগরীর অতীত মহিমা—শঙ্কর সত্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই জানিত না, অথচ চণ্ডীচরণ দস্তিদার—

আমাকে চিনিতে পারেন দাদা?

একটি রোগা লম্বাগোছের যুবক প্রণাম করিয়া শঙ্করের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক শীর্ণ চেহারা দেখিলেই মনে হয়, তাহার শরীরের সমস্ত রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, অস্থি এবং চর্ম ছাড়া দেহে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। শঙ্কর চিনিতে পারিল না।

আমি আপনার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ।

ও।

উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আপনার পড়ার খরচ বন্ধ ক'রে পিসেমশাই আমাকেই এম. এ. পড়ার খরচ দিয়েছিলেন।

ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমাকে সেই কোন্ ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম, তাই চিনতে পারছি না। কোথায় আছ, এখন কি করছ?

কিছুই করছি না।

কতদিন এম. এ. পাস করেছ?

পাস করতে পারি নি। বার তিনেক চেষ্টা ক'রেও পারি নি। করলেও বা কি হ'ত, বলুন?

হাসিল। এবড়ো-খেবড়ো পানের-ছোপ-ধরা বিশ্রী দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িতেই নিত্যানন্দের স্বরূপ যেন উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল।

কোথায় আছ এখানে?

দেশ থেকে আজই এসেছি, একজন ফ্রেণ্ডের বাড়িতে উঠেছি।

আমার বাসায় এসো, ঠিকানাটা হচ্ছে—

ঠিকানা জানি। আপনার ঠিকানা কে না জানে, আপনি আজকাল বিখ্যাত লোক।

তারপর হাসিয়া বলিল, কাল যাব। এখন অন্য জায়গায় কাজ আছে একটু। বউদি এখানেই আছেন তো?

আছেন।

নিত্যানন্দ চলিয়া গেল।

শঙ্কর তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার আপন মামাতো-ভাই, অথচ কত অপরিচিত!

১৮

ভন্টু আপিস হইতে ফিরিতেছিল। আজ তাহার অনেক পূর্বেই ফেরা উচিত ছিল, কিন্তু কাজ সারিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। কাজ কি একটা যে, তাড়াতাড়ি শেষ হইবে? মৃন্ময়ের জেল হওয়ার পর হইতে কাজের চাপ আরও বাড়িয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি নিজে দেখিয়া ক্যাশ মিলাইয়া সমস্ত টাকা জমা দিয়া তবে তাহার ছুটি। ইন্দু কেমন আছে কে জানে? ইন্দুমতী আসন্নপ্রসবা, ক্রমাগত ভুগিতেছে। আজ সকালে বার দুই বমি করিয়া চোখ উলটাইয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিল যে, পট করিয়া চল্লিশটি টাকা খসিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়িতে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই ডাকিতে হইল, তিনি নাকি উহার নাড়ী এবং ধাত ভাল বুঝেন। তাঁহার ফী বত্রিশ টাকা এবং যে সকল ঔষধ পথ্য তিনি ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, তাহার দামও আট টাকা। মুখটি বুজিয়া দিতে হইল। তিনি বলিয়া গেলেন যে, প্রসবের পূর্বে প্রসূতির যেসব পরিচর্যা প্রয়োজন, তাহার কিছুই করা হইতেছে না। আসন্ন-প্রসবার যে পরিমাণ দুধ ফল খাওয়া উচিত, যতটা বিশ্রাম এবং ব্যায়াম করা দরকার, তাহার কিছুই হয় নাই। সত্যই হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারের নানাবিধ খরচ। দাদা আবার চেঞ্জে গিয়াছেন, তাঁহাকে খরচ পাঠাইতে হয়; দাদার ছেলেরা স্কুলে পড়িতেছে, তাহাদের সব খরচ দিতে হয়; বাকু অহিফেন এবং দুধের মাত্রা বাড়াইয়াছেন; বাবাজী আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহার জন্য খাঁটি গব্যঘৃত কিনিতে হইতেছে। ইহার উপর

প্রসূতি-পরিচর্যার খরচ কি করিয়া জুটাইবে সে! তাহার মাহিনা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সংসার-খরচ তদপেক্ষা ঢের বেশি বাড়িয়াছে। ইন্দু এ বেলা কেমন আছে, কে জানে? একবার ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা করিয়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু ইন্দুর এ বেলার খবরটা না জানিয়া যাওয়া বৃথা। হঠাৎ ভন্টুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, বাইকের ব্রেকটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে নামিয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড! এ তো সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

বল হরি হরিবোল—

করালীচরণ বক্‌সি মড়া বহিয়া লইয়া যাইতেছেন। করালীচরণ বক্‌সি! কাহার মড়া? করালীচরণ দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়াছেন নাকি? কবে? ভন্টু কিছুই তো জানে না! সে গত ছয় মাস করালীচরণের কোন খোঁজই রাখে নাই। অবসরও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নাই। দুই বৎসর পূর্বে সে হয়তো আগাইয়া গিয়া কুশল প্রশ্ন করিত, এমন কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া আসিতেও হয়তো তাহার বাধিত না, আজ কিন্তু এসব করিবার কল্পনাও সে করিল না, পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। বরং এই চিন্তাই মনে উদিত হইল, চাম্‌লদ আমাকে দেখিতে পায় নাই তো!

১৯

অনেক রাত্রে চিৎপুর রোড দিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। এমন আনন্দময় উন্মাদনা তাহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। তাহার দেহের প্রতি শিরায়-উপশিরায় যেন সুরা তরঙ্গিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, লোকনাথ ঘোষালের বিচারই কি ঠিক? প্রফেসার গুপ্তের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাহিত্য-রুচিই কি সাহিত্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড? তাহার মনের অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সে হয়তো জ্ঞাতসারে সচেতন ছিল না, থাকিলে লোকনাথ ঘোষাল অথবা প্রফেসার গুপ্তের রসবোধে সন্দিহান হইতে সে হয়তো ইতস্তত করিত। কিন্তু অবিমিশ্র প্রশংসার মদিরায় তাহার সমস্ত চিত্ত বিহ্বল, লোকনাথ ঘোষাল

প্রফেসার গুপ্ত সব তখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের বিবাহ-বাসরে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ভক্ত পাঠিকার সহিত দেখা হইয়া যাইবে, ইহা কে কল্পনা করিয়াছিল! কুমারী নীরা বসাক সত্যই তাঁহাকে অবাক করিয়া দিয়াছে। সে তাহার সমস্ত লেখা শুধু যে পড়িয়াছে তাহা নয়, মনোযোগসহকারে বারম্বার পড়িয়াছে। তাহার কবিতা তো বটেই, কিছু কিছু গদ্যও তাহার কণ্ঠস্থ, অনায়াসে মুখস্থ বলিয়া গেল। 'জীবন-পথে' পুস্তকের নীহার তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, "উদ্বন্ধন" গল্পের নায়িকার দুঃখে সে অশ্রুপাত করিয়াছে, "নাম-না-জানা" গল্পের সূক্ষ্ম রসে সে অভিভূত। তাহার রুচি তুচ্ছ করিবার মত নয়। টলস্টয়-গোর্কি-পড়া মেয়ে। তাহার রসবোধ নাই—এ কথা বলা চলে না। অতিশয় দক্ষতার সহিত সে 'পান্থ-নিবাসে'র যমুনা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিল, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় দেখাইল। শঙ্কর সত্যই অবাক হইয়া গিয়াছে। কুমারী নীরা বসাকের মুখখানা বারম্বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মেয়েটি দেখিতে কুৎসিত। সামনের দাঁতগুলি বড় বড়, গায়ের রঙ কালো, সামনের চুলগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটিতেও তেমন কিছু সৌন্দর্য নাই। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা করিতে করিতে সে যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সমস্ত কদর্যতাকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহার চোখে মুখে যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা দেহাতীত এবং সত্যই অনবদ্য। শঙ্করকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। শঙ্করের জীবনে অনেক নারী আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন মেয়ে শঙ্কর আর দেখে নাই। অধিকাংশ নারীর দেহটাই সর্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু নীরা বসাক রূপের অভাব সত্ত্বেও মনকে আকর্ষণ করে। সে যে নারী, এ কথাটাই মনে থাকে না। এ কোথায় ছিল এতদিন? এই প্রসঙ্গে চুনচুনের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। চুনচুনেরও সাহিত্যপ্রীতি আছে, কিন্তু তাহা এত বেশি নীরব যে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। চুনচুনেরও আজ বিবাহ হইয়া গেল। শঙ্কর যায় নাই, তাহার প্রবৃত্তিই হয় নাই। চুনচুন যে স্বেচ্ছায় পীতাম্বরবাবুকে বিবাহ করিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। ওই লোভী লোমশ বুড়াটার মধ্যে সে কি এমন দেখিতে পাইল? যদি কোনদিন চুনচুনের সঙ্গে

নির্জনে দেখা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে, পীতাম্বরবাবুর মাধুর্যটা কোথায়? হয়তো কিছু আছে, যাহা শঙ্করের অনধিগম্য। সহসা শঙ্করের মনে হইল, চুনচুনের সহিত এতদিনের পরিচয়, অথচ তাহার সম্বন্ধে সে কত কম জানে! যতীন হাজরার শোচনীয় মৃত্যুর রাত্রিটা মনে পড়িল:-- সেই গভীর রাত্রে গোপনে খিল খুলিয়া দেওয়া! সেদিনও চুনচুন যেমন রহস্যময়ী ছিল, আজও তেমনই রহস্যময়ী আছে। তাহার অন্তরলোকের দ্বার আজও শঙ্কর খুলিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল, খুলিবার প্রয়োজনটাই বা কি? সকলের অন্তরলোকের খবর যে তাহাকে রাখিতেই হইবে, এমনই বা কি কথা আছে? সিগারেট বাহির করিবার জন্য সে পকেটে হাত পুঁরিল। হাত পুরিতেই বিবাহের প্রীতি-উপহারখানা হাতে ঠেকিল। একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া বহুবার-পঠিত সনেটটা সে আবার পড়িল। চমৎকার করিয়া ছাপাইয়াছে! অপূর্ববাবুর রুচিটা যে সুমার্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপূর্বকৃষ্ণের উপর শঙ্করের বরাবরই বিতৃষ্ণা, আজ এই উপলক্ষ্যে বিতৃষ্ণাটা যেন অনেক কমিয়া গেল। মনে হইল, তাহার উপর এতদিন সে অকারণে অবিচার করিয়াছে। তাহার উপর রুষ্ট হইয়া থাকিবার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণই তো নাই। কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক, অতিশয় নিরীহ, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকিতে চান না, কাহারও উপকার ভিন্ন অপকার করেন না, সঙ্গীত-বিষয়ে সত্যই গুণী। নারীজাতি সম্বন্ধে অবশ্য কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে দুর্বলতা কাহার নাই? বউটিও বেশ হইয়াছে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। মেয়েটি কিছুকাল পূর্বে অপূর্বকৃষ্ণেরই ছাত্রী ছিলেন। গরিব ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, অপূর্বকৃষ্ণের সহায়তাতেই নাকি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছেন, গান-বাজনাও শিখিয়াছেন। হয়তো উহারা সুখেই থাকিবে।

কিছুদূরে গিয়াই শঙ্কর কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণের কথা ভুলিয়াই গেল। পকেট হইতে সনেটটা বাহির করিয়া আর একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া আবার সেটা পড়িতে লাগিল। সকলেই কবিতাটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ

বিডন স্ট্রীটে ঢুকিয়া পড়িল। বিডন স্ট্রীটের একটা গলিতেই লোকনাথবাবু থাকেন।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, তবু লোকনাথবাবু জাগিয়াই ছিলেন। "বঙ্কিমচন্দ্র" সম্বন্ধে বিরাট একটা প্রবন্ধ লিখিবেন, বহুদিন হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। মফস্বলে সব বই পাওয়া যায় না বলিয়া লিখিতে পারেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া লাইব্রেরি হইতে পুরাতন মাসিক ও নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় অংশগুলি টুকিয়া লইতেছিলেন। শঙ্করের ডাকে কপাট খুলিয়া দিলেন এবং এত রাত্রে শঙ্করকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

এত রাত্রে কি মনে ক'রে ?

একটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম, আপনি কি করছেন দেখে যাই।

আসুন আসুন। আমি বঙ্কিমকে নিয়ে পড়েছি। বঙ্কিম আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পুরোধা, অথচ তাঁর সম্বন্ধে ভাল ক'রে কোন আলোচনাই হয় নি এখনও। আমি ভাবছি, আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি ক'রে যাব। বঙ্কিমের ভাষার লিপিচাতুর্য প্রথমে দেখাতে চাই, বুঝলেন ? বঙ্কিমের ভাষাটা—

বঙ্কিম-আলোচনা শুরু হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে শঙ্কর বাড়ি ফিরিল। বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিল বটে, কিন্তু মন তাহার অপ্রসন্ন। লোকনাথবাবু সনেটটির প্রশংসা তো করেনই নাই, বরং ভৎর্সনা করিয়াছেন। কবিতা লইয়া এ রকম খেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অমিয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। পাশে থালায় পরটা ঢাকা দেওয়া। শঙ্করের ডাকে অপ্রতিভমুখে সে উঠিয়া বসিল। শঙ্করও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যে আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ ছিল, এ কথা সে অমিয়াকে বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

যাই, পরটাগুলো গরম করি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছ কি ক'রে, যা মশা !

মশারির ভেতর আলো ঢোকে না। এখানে শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম।

তাহার পর মিটিমিটি চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, তোমারই বই পড়ছিলাম একখানা।

কোন্‌টা?

'পান্থনিবাস'খানা।

কেমন লাগল?

বেশ।

শঙ্কর কোটটা খুলিয়া চেয়ারে রাখিল।

আবার ওখানে রাখছ? আলনা রয়েছে তা হ'লে কেন?—অমিয় কোটটা তুলিয়া যথাস্থানে রাখিল। তাহার পর পাশের ঘর হইতে একটা কাপড় আনিয়া বলিল, কাপড়টাও ছেড়ে ফেল, সমস্তটা দিন ওই এক কাপড়ে রয়েছ।

কাপড় ছাড়া হইয়া গেলে অমিয়া বলিল, হাত পা মুখ ধোবে না? বারান্দার কোণে জল গামছা সব ঠিক ক'রে রেখেছি।

শঙ্কর হাত মুখ ধুইয়া আসিল।

'পান্থনিবাস'খানা ভাল লাগল তা হ'লে তোমার?

হ্যাঁ, বেশ তো। তবে—

আবার তবে কি?

আমি সব বুঝতে পারি নি ভাল। আমার বিদ্যের দৌড় আর কতদূর!

কোন্‌খানটা বুঝতে পার নি?

ওই যমুনাকে। ও-রকম মেয়ে আছে নাকি? কি বিচ্ছিরি কাণ্ড, ও রকম করে নাকি কেউ?

করে বইকি।

রাম রাম!

যমুনা মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নানা বিপদ-আপদের মধ্যে পড়িয়া অবশেষে নার্স হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে এবং কালক্রমে একজন ডাক্তারের প্রেমে পড়িয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রেম

একমাত্র কাম্য ধন। কিন্তু উক্ত ডাক্তার যখন তাহার প্রণয়-ফাঁদে ধরা দিল না, তখন যমুনার মনে হইল—কিছুই কিছু নয়, পৃথিবীটা একটা পান্থনিবাস মাত্র। ইহাই 'পান্থনিবাসে'র গল্প। এ সম্বন্ধে শঙ্কর নীরা বসাকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছে, লোকনাথ ঘোষালের চুল-চেরা সমালোচনাও শুনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, অমিয়াকেও এই গল্পের আর্ট সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু অমিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার গাল-বালিশ করেছি আজ, দেখবে? এক দিকে টকটকে লাল শালু আর এক দিকে কালো সাটিন—এই দেখ। ভাল হয় নি? আমার ইচ্ছে ছিল, এ দিকটা নীল রঙের দিয়ে—

বেশ হয়েছে। পরটা গরম কর।

এই করি। ক্ষিধে পেয়েছে বুঝি? পাবে না, সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছ! এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

লোকনাথবাবুর কাছে।

আবার সনেটের কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

২০

অপরাহ্ণ।

'সংস্কারক'-আপিসে শঙ্কর যথারীতি প্রুফ দেখিতেছিল। একটি নয়-দশ বৎসরের বালক সসঙ্কোচে প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু কোথায়?

আমি শঙ্কর। কেন?

বালক একটি চিঠি দিল। ছবির চিঠি। ক্ষুদ্র পত্র।—

ভাই শঙ্কর,

তিন দিন থেকে জ্বরে প'ড়ে আছি। শয্যাসঙ্গিনীও সঙ্গ নিয়েছেন। ঝি পলাতকা। সুতরাং বুঝতেই পারছ। তোমাকে লিখছি, কারণ তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই লেখবার নেই। কেউ ঠিক বুঝবেও না। সময় নষ্ট ক'রে তোমাকে আসতে বলছি না, কিন্তু যখন হয় একবার এসো ভাই। এটি

আমার বড় ছেলে। যদি অসম্ভব না হয়, এর হাতে, এক টাকা না পার, গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিও অন্তত। কাল থেকে সকলের অনাহার চলছে।

পত্রপাঠান্তে শঙ্কর বালকের দিকে চাহিল। ফরসা রঙ, শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মলিন বেশবাস। পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিল, একটি মাত্র টাকাই আছে।— এই নাও। বাবাকে ব'লো, একটু পরেই যাচ্ছি আমি।

বালক চলিয়া গেল। প্রুফটা শেষ করিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। চণ্ডীচরণবাবুর নিকট গিয়া বলিল, গোটা দশেক টাকা আমার এখনই চাই।

চণ্ডীচরণ বিনাবাক্যব্যয়ে শঙ্করের নামে খরচ লিখিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল যে, সে আপিসের নিকট হইতে প্রায় দেড় শত টাকার উপর ধার করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি একটু বেরুচ্ছি, বুঝলেন? ছবির খুব অসুখ।

চণ্ডীচরণবাবু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, 'হাঁ' 'না' কোনও জবাব দিলেন না। শঙ্করের মনে হইল, চণ্ডীবাবুর কাছে সে বৃথা জবাবদিহি করিতে গেল কেন? নিজের উপরই এজন্য সে চটিয়া গেল এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং যেমন তাহার স্বভাব অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। সহসা বেথুন কলেজের গেটের সম্মুখে চুন্‌চুনের সহিত দেখা। চুন্‌চুন ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করকে দেখিয়া চুন্‌চুন মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল, একটি অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্যরেখা অধরপ্রান্তে ফুটিল কি ফুটিল না বোঝাও গেল না। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। না দাঁড়াইয়া উপায় ছিল না, কিন্তু কি বলিবে, সহসা সে ভাবিয়া পাইল না। চুন্‌চুনই কথা কহিল।

অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। আজই ভাবছিলাম, আপনাকে ফোন করব। সন্ধ্যের দিকে আপনার কবে অবসর আছে বলুন তো?

কেন?

উনি বলছিলেন, একদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে।

আমার অবসর নেই।

চুন্‌চুন ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ঘাড়

ফিরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শঙ্করের মনে হইল, দৃশ্যটা শোভন হইতেছে না। বেশিক্ষণ অবশ্য এভাবে থাকিতে হইবে না, অদূরে চুন্‌চুনের ট্রাম দেখা যাইতেছে।

বলিল, আচ্ছা, চলি তবে আমি।

আপনি মিছিমিছি রাগ ক'রে আছেন।

কি ক'রে বুঝলে, রাগ ক'রে আছি?

চুন্‌চুন চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্করও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোমার মত মেয়ে যখন পীতাম্বরবাবুর মত লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে, তখন রাগ হয় না, আশ্চর্য লাগে, একটু দুঃখও হয়।

আমার মতন সাধারণ একজন মেয়েকে আপনি অত বড় ক'রে দেখছেন কেন, বুঝতে পারছি না।

পীতাম্বরবাবুর কি আছে যে, তাকে বিয়ে করলে তুমি?

টাকা।

শঙ্কর ভাল করিয়া চুন্‌চুনের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। না, ব্যঙ্গ নয়, উহাই তাহার মনের কথা। অবাক হইয়া গেল।

টাকা! টাকার জন্যে তুমি বিয়ে করেছ?

শঙ্করের মুক্তোকে মনে পড়িল।

চুন্‌চুন উত্তর দিল না, সম্মুখেই দেওয়ালটার পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। শঙ্করের, কি জানি কেন, হঠাৎ যতীন হাজরার মুখটাও মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ কথাগুলিও।

যতীনবাবুকে নিশ্চয় তুমি টাকার জন্যে বিয়ে কর নি?

টাকার জন্যেই করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় ঠকিয়েছিলেন, তাঁর সত্যি কিছু ছিল না।

টাকার জন্যেই বিয়ে করেছিলে তাঁকে?

মনে করুন, করেছিলাম; তাতেই বা লজ্জা পাবার কি আছে? টাকা না হ'লে সংসার চলে না, আর আমাদের মত মেয়ের—যার না আছে রূপ, না

আছে গুণ—বিয়ে করা ছাড়া ভদ্রভাবে টাকা সংগ্রহের আর কি উপায় আছে, বলুন ?

তোমার সম্বন্ধে ঠিক এ ধারণা ছিল না আমার।

কি ধারণা ছিল ?

আমার ধারণা ছিল, একটা উচ্চ আদর্শের জন্য তুমি অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করতে পার।

আদর্শ বজায় রাখবার মত সঙ্গতি নেই আমার। শুধু আমার কেন, অনেকেরই নেই। এই দেখুন না, আপনার মত লোককেও টাকার জন্যে তুচ্ছ একটা চাকরি করতে হচ্ছে। ও-কাজ কি আপনার উপযুক্ত ? কিন্তু উপায় কি বলুন, সংসারে টাকাটা দরকার যে।

ট্রাম আসিয়া পড়িল।

আমি যাচ্ছি। আসবেন একদিন।

ট্রাম চলিয়া গেল।

২১

শঙ্কর কিছুদিন পূর্বে 'হাতুড়ি' নাম দিয়া একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক কাব্য হিসাবে পুস্তকটি অনেকের প্রশংসা লাভও করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সম্পর্কে ডাক্তার মুখার্জির একটি পত্র আসিয়াছে, শঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহা পড়িতেছিল।

শঙ্কর,

বল্‌শেভিজ্‌ম্ নিয়ে কবিতা লিখে তুমিও আধুনিক হবার চেষ্টা করছ দেখে কষ্ট হ'ল। অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছ নিশ্চয়। বাংলা দেশে সমঝদার জোটা একটা দুর্বিপাক। এই সমঝদারের গুঁতোয় সত্যেন্দ্র দত্ত 'বাঙালী পল্টন' আর শরৎ চাটুজ্জে বোধ হয় 'শেষপ্রশ্ন' লেখেন। রবীন্দ্রনাথও আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। তোমার লেখা যে সব জায়গায় খারাপ হয়েছে তা বলছি না, কিন্তু পপুলার এবং আধুনিক হবার 'আপ্রাণ' প্রয়াস রসিকের

নিকট হাস্যকর। নিন্দা শুনতে যদি ভালবাস, তবলা বাঁধা হবার আগে গান আরম্ভ ক'রে লম্বকর্ণ শ্রোতাদের তাক লাগাবার প্রবৃত্তি যদি কম থাকে তো তোমার উচিত আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ হাতুড়ির ঠকঠক সহ্য করা। কারণ আমার বিশ্বাস, তোমার অন্য সমঝদারেরা একটু আধটু বেসুরে বিক্ষুব্ধ হন না এবং তুমিও সেই কুসংসর্গে প'ড়ে বেসুরে সুর-সাধনা আরম্ভ করেছ। কিন্তু এ আমি করছি কি? না:—

চিঠিতে আর কাব্য সমালোচনা করব না। লিখতে লিখতে হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব হ'ল। শাস্ত্রের উপদেশ—এখন বনং ব্রজেৎ। বনে যেতে হয় নি, চারদিকে আপনা-আপনি বন গজিয়ে উঠল। কালো চুল সাদা হ'ল, সাদা দাঁত কালো হ'ল, স্বচ্ছ চোখের মণি ঝাপসা হয়ে এল ক্রমশ। যে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসর কাটালুম, সে তার রূপ বদলে ফেললে। পুরনো যা ছিল তা আর হাতের কাছে নেই, নতুন যা এল তাকে চিনি না। সব বদলে গেল, বদলাল না শুধু 'সোহং দেবদত্ত'—এই জ্ঞান। তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ বক্তৃতা ক'রে ফেলি। তারপর চমকে থেমে গিয়ে হাতড়ে দেখি, আশে-পাশে কেউ নেই। অতএব বক্তৃতা করব না। যদি কখনও দেখা হয়, আমার কথা বোঝাবার চেষ্টা করব। ইতি—

শুভার্থী

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

২২

ছবির এবং ছবির স্ত্রীর টাইফয়েড হইয়াছে।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। শঙ্কর ছাড়া ইহাদের দেখিবার কেহ নাই। শঙ্করই ডাক্তার ডাকিয়াছে, ঔষধপত্র আনিতেছে, বেশি বাড়াবাড়ি হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবাও করিতেছে। সমস্ত খরচও তাহারই, ছবি কপর্দকহীন। ধার বাড়িতেছে। সেজন্য শঙ্কর ক্ষুব্ধ নয়, তাহার প্রধান ক্ষোভ—লিখিবার সময় পাইতেছে না। রাত্রিটুকুই

লিখিবার সময়। কিন্তু ছবিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া যায় না। ছবির স্ত্রীও শয্যাগত। এ বাড়ির কেহই সুস্থ নয়। সাতটি সন্তান, কাহারও জ্বর, কাহারও সর্দি, কাহারও চোখ উঠিয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গে পাঁচড়া, একজনের হাঁপানি—অনাহারক্লিষ্ট রুক্ষ শীর্ণ সকলেই। দারিদ্র্যের ঠিক এই মূর্তি বড় করুণ। যাহারা সমাজে সোজাসুজি গরিব বলিয়া পরিচিত, তাহাদের দীনতা এমন মর্মান্তিক নয়। কারণ তাহা প্রত্যাশিত সরল দীনতা। ইহা শুধু দীনতা নয়, ইহা দীনতা এবং দীনতাকে অপটুভাবে ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়া অতিশয় করুণ। পচা জিনিসকে সুদৃশ্য আবরণ দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয়, ইহা তাহাই। তোশকের ছিটটি সুন্দর, সুরুচির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু সেই সুরুচির মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া দ্বিতীয় তোশক প্রস্তুত করানো সম্ভবপর হয় নাই। এখন তাহা মলমূত্রে ভিজিয়া উঠিয়াছে ; বাড়িতে দ্বিতীয় তোশক নাই, মলিন অংশটুকু কাপড় চাপা দেওয়া আছে, মাছি ভনভন করিতেছে। এমনই সব জিনিসেই। যে কাপটি দিয়া ঔষধপত্র খাওয়ানো হইতেছে, তাহা এককালে সুদৃশ্য ছিল, কিন্তু এখন তাহা হাতলহীন, ফাটা, ফাটার ফাঁকে ময়লা জমিয়া আছে। স্ত্রীর হাতে চুড়ি ঝকমক করিতেছে, কিন্তু একটিও স্বর্ণের নহে, সমস্ত গিলটি-করা।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা বসিয়া ভাবিতেছিল। লেখকেরা কাগজ কলম লইয়াই যে সর্বদা লেখে তাহা নয়, তাহারা মনে মনেও লেখে, শঙ্করও একা বসিয়া মনে মনে লিখিতেছিল। নূতনতম এক কাব্য-নীহারিকা তাহার মনের আকাশে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছিল।

ছবি প্রলাপ বকিতে লাগিল—ব্রাউনিঙের কবিতা। অসুখে পড়িয়াও বেচারী কবিতা ভোলে নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, এত সাহিত্যরস পান করিয়াও তাহার এই দুর্দশা কেন? সব দিক দিয়াই সে তো অমানুষ। মনে প্রশ্ন জাগিল, সাহিত্য দিয়া সত্যই কি কাহারও উপকার করা যায়? অন্ধকারে আলেয়ার পিছনে অথবা ঊষর মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া যাহারা পথ হারাইয়া ফেলে, সেও তাহাদেরই মত একটা মিথ্যা আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে না তো?

২৩

ইন্দু সামলাইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে নাই। ইন্দুর মুখেই ভন্টু শুনিল যে, এই সময়ে তাহার নাকি একটা কঠিন ফাঁড়াও আছে। ভন্টু আর স্থির থাকিতে পারিল না, করালীচরণের উদ্দেশ্যে বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঝামাপুকুরের গলিতে ঢুকিয়া সে দেখিতে পাইল, পানওয়ালীর দোকানটা খোলা নাই। খোলা থাকিলে সুবিধা হইত, তাহার নিকট হইতে করালীচরণের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। এতদিন পরে দেখা, বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিলে চাম্‌লদ হয়তো ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। যা 'লোক, কিছুই বলা যায় না। ভন্টুর সাংসারিক অবস্থা যখন মন্দ ছিল, তখন সে করালীচরণকে অতিশয় ভয় ও সমীহ করিয়া চলিত। এখনও অবশ্য তাহার মনের ঠিক সে ভাব নাই, তবুও করালীচরণের সম্মুখীন হইতে সে কেমন যেন ইতস্তত করিতেছিল। ইন্দুমতীর ফাঁড়ার খবরটা কর্ণগোচর না হইলে সে হয়তো আসিতই না।

সে ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছিল, তাহার কারণ—সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। সে করালীচরণকে কথা দিয়াছিল যে, তাহার বাসার তত্ত্বাবধান করিবে; কিন্তু সে বহুকাল এদিকে আসে নাই। করালীচরণের কুড়িটা টাকাও তাহার কাছে আছে। আছে মানে—পাওনা আছে। সঙ্গে নাই।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া অবশেষে ভন্টু আগাইয়া গেল। দেখিল, দরজা বন্ধ। ঠেলিবামাত্রই কিন্তু খুলিয়া গেল।

কে ?

ভন্টু সবিস্ময়ে দেখিল, করালীচরণ টেবিলটাকে ঘরের এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বোতলের মুখে মোমবাতি জ্বলিতেছে, টেবিলের এক ধারে একগাদা বই স্তূপীকৃত করা আছে। করালীচরণ ঝুঁকিয়া কি যেন করিতেছিলেন, শব্দ পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছেন।

আমি ভন্টু।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। চিবুকটা একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভন্টু? ভন্টু কে?

ভন্টু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাই নারায়ণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এগিয়ে আস্থন না, মুখখানা দেখি একবার।

ভন্টু তাঁহার কথাগুলা ঠিক যেন বুঝিতে পারিতেছিল না।

তবু একটু আগাইয়া গেল।

ভন্টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি আরও ক্ষণকাল নিবদ্ধ রাখিয়া করালীচরণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শঙ্কা ও ক্রোধ যুগপৎ ঘনাইয়া উঠিল।

ও, আপনি। বস্থন।

এইবার ভন্টু বুঝিতে পারিল, কেন সে করালীচরণের কথা বুঝিতে পারিতেছিল না। করালীচরণের দাঁত নাই, সমস্ত মুখটাই যেন তুবড়াইয়া গিয়াছে।

ভন্টু প্রশস্ত চৌকিটির এক ধারে উপবেশন করিল।

কিছু মনে করবেন না, নামটা আপনার মনে ছিল না। আপনি যদি শেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্‌টন, ডার্‌বিন, ফ্যারাডে বা ওদের মত কেউ হতেন, তা হ'লে হয়তো থাকত।

একটু থামিয়া অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, বাই নারায়ণ! বিড়বিড় করিয়া আরও খানিকটা কি বলিলেন, ভন্টু বুঝিতে পারিল না। সে মনে মনে স্বগতোক্তি করিল, চাম্‌লদ ভীম জালে ফেলবার অ্যারেঞ্জ্‌মেণ্ট করছে দেখছি।

প্রকাশ্যে বলিল, আমার নতুন বাসার ঠিকানা পানউলী জানত। আপনি যদি একটু খবর—

আমি যখন এলাম, তখন ঠিকানা বলবার মত অবস্থা ছিল না পানউলীর।

সে তখন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছিল এই চৌকিতে প'ড়ে প'ড়ে। মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক ছিল না কাছে।

করালীচরণ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ভন্টু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। করালী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার বলিয়া উঠিলেন, বেশ হয়েছে, বেশ্যা মাগীর কাছে আসবে কে?

চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল। এক চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি পুনরায় তিনি ভন্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন। ভন্টুর মনে হইল, যেন তাহার কপালে কেহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

ভন্টু বিস্ময় প্রকাশের ভান করিয়া বলিল, পানউলীর কাছে' কেউ ছিল না?

বিব্রত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া কোনক্রমে প্রশ্নটা করিল।

মোস্তাক ছিল, কিন্তু মোস্তাক তখন একপাল কুকুরবাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত।

চৌকির অপর প্রান্তে পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল।

না না, তুমি ঘুমোও, তোমার কোনও দোষ দিচ্ছি না। তুমি ঠিকই করেছিলে। একটা মর-মর বুড়ী বেশ্যার মুখে দু ফোঁটা জল দেওয়ার চেয়ে কচি কচি কুকুরবাচ্চা ঘাঁটা ঢের বেশি আর্টিস্টিক। তুমি একজন আর্টিস্ট। ঘুমোও তুমি, উঠো না।

মোস্তাক গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, উঠিল না।

ভন্টু চুপ করিয়াই রহিল, এই পরিবর্তিত করালীচরণ বক্সিকে কোনও কথা বলিতে তাহার সাহসেই কুলাইতেছিল না। অথচ একদিন ইহার সহিত তাহার কত হৃদ্যতাই ছিল! অনেকদিন আগেকার একটা ছবি ভন্টুর মনে পড়িল। নৈহাটি স্টেশনে বসন্তরোগাক্রান্ত ভিড়-পরিবৃত অসহায় করালীচরণের ছবিটা। কত অসহায়! ভন্টুই দয়াপরবশ হইয়া সেদিন তাহাকে তুলিয়া আনিয়া হাসপাতালে দিয়া আসিয়াছিল। অথচ ইহারই সহিত এখন কথা কহিতে সাহসে কুলাইতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, চেহারা বদলাইয়া গেলে মানুষটাই বদলাইয়া যায় হয়তো। যাহার

গোঁফদাড়ি ছিল না, সে যদি বহুকাল পরে একমুখ গোঁফদাড়ি লইয়া হাজির হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত পূর্বেকার সহজ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। করালীচরণের দন্তহীন তোবড়ানো মুখের পানে চাহিয়া ভন্‌টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

করালীচরণই কথা কহিলেন, আচ্ছা, ভন্‌টুবাবু, কল্পনা ব'লে কোনও বালাই আছে আপনার মধ্যে?

আজ্ঞে?

আপনি কল্পনা করতে পারেন?

একটু একটু পারি হয়তো।

পারেন? কল্পনা করতে পারেন, একটা কঙ্কালসার কদাকার বুড়ী বেশ্যা অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে, তার মৃত্যু-সময়ে মুখে এক ফোঁটা জল দেবার লোক কেউ কাছে নেই? কদাকার মুখ ভাল ক'রে দেখেছেন কখনও? গালের হাড় উঁচু, কপালের শিরা বার-করা, বড় বড় দাঁত, তাতে আবার মিশি লাগানো—

করালীচরণ হয়তো বর্ণনাটা আরও ফলাও করিয়া করিতেন, কিন্তু কুঁই-কুঁই করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। মোস্তাক তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং নিঃশব্দে ঘরের কোণে আলমারির পাশটায় গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোনদিকে না চাহিয়া রুদ্যমান বাচ্চাগুলিকে বগলদাবা করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মা-টা আবার বোধ হয় পালিয়েছে। বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভন্‌টু ভাবিতেছিল, কোনও ছুতায় এই ভীম জাল ছিন্ন করিয়া এইবার পলায়ন করা উচিত। কোষ্ঠিগণনা করাইবার আশা সে বহুপূর্বেই বিসর্জন দিয়াছিল। আর একদিন আসা যাইবে। আজ চাম্‌লদ বিরক্তি-মাউণ্টেনের তুঙ্গে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ কর্কশকণ্ঠে করালীচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, দেখেছেন কখনও

াকার মুখ? শুধু কদাকার নয়, তৃষিত, মুমূর্ষু, যে তার কুৎসিত হাসি ও
র্য কটাক্ষ দিয়ে আজীবন লোক ভোলাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু
জনকেও ভোলাতে পারে নি, একটা লোকও তার আপন হয় নি, তার
্যকালে কেউ কাছে আসে নি—দেখেছেন এ রকম কখনও?

মানে, অবশ্য তাকে—

মিছে কথা বলবেন না, আমি জানি আপনি দেখেন নি, আমিও দেখি নি।
খ থাকলেই দেখা যায় না, চোখের সামনে থাকলেও না।

পানউলীর কথা বলছেন তো?

ঠিক ধরেছেন। তা হ'লে শুধু আমার চোখে নয়, আপনার চোখেও
কুচ্ছিৎ ছিল। বাই নারায়ণ, পৃথিবীতে কেউ ভাল চোখেও দেখত
মাগীকে।

মরিচা-ধরা একটা টিনের কৌটা খুলিয়া করালীচরণ একটি আধপোড়া
ড়ি বাহির করিলেন এবং সেটি মোমবাতির শিখায় ধরাইয়া লইয়া নীরবে
নিতে লাগিলেন। তাহার পর সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভালই
ল, চ'লে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

ঠিক করি নি এখনও।

কবে যাবেন?

তাও ঠিক করি নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

করালীচরণই পুনরায় কথা কহিলেন, আজ হঠাৎ এলেন যে, কোনও
কার ছিল নিশ্চয়?

একটি কুষ্ঠি দেখাতে এনেছিলাম।

গণনা করা আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। ও-শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই।
জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যর্থতা' নাম দিয়ে একখানা বই লিখছি, এই দেখুন।

একটা খাতা তুলিয়া দেখাইলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস নেই?

না।

করালীচরণের চক্ষুটা দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আপনি দ্রাবিড় থেকে ফিরলেন কবে?

করালীচরণ গুম হইয়া রহিলেন।

হাত দেখে জন্মতারিখ বার করতে পারে, এ রকম জ্যোতিষী কলকাতায় বেশি নেই। আপনি যদি—

চুপ করুন।

অপ্রত্যাশিত ধমক খাইয়া ভন্টু থামিয়া গেল।

করালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, কুষ্ঠি-ফুষ্ঠি দেখে কচু হয়। ওসব ছিঁড়ে কুচিকুচি ক'রে নর্দমায় ফেলে দিন গে যান। সব মিথ্যে, বাজে, রাবিশ—

করালীচরণ প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। টেবিলের বইগুলি দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতে দিতে রুদ্ধ আক্রোশে তর্জন করিতে লাগিলেন, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যের স্তূপ সব, জঞ্জাল—

ভন্টু ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

কি করছেন আপনি, বক্সি মশাই?

বকবক করবেন না, বাড়ি যান।

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে?

একটি কথা শুধু জানতে চাই, যদি দয়া ক'রে বলেন।

না, বলব না।

তাহার পর কি মনে করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কি বলুন?

জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার অবিশ্বাস হ'ল কেন?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবার কেন আছে নাকি?

না, এতদিন যাতে আপনার অগাধ বিশ্বাস ছিল, যা আরও ভাল ক'রে শেখবার জন্যে আপনি দ্রাবিড় গেলেন, আজ হঠাৎ—

করালীচরণ বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি।

করালীচরণের চোখ-মুখ এমন হইয়া উঠিল যে, ভন্টু আর ঘরের ভিতর থাকা সমীচীন মনে করিল না, সভয়ে বাহির হইয়া গেল। করালীচরণ দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভন্টু বাহিরে আসিয়া দেখিল, মোস্তাক একটা ল্যাম্প-পোস্টের নীচে একটা কালো কুকুরীকে জোর করিয়া চাপিয়া দাঁড়াইয়া রাখিয়াছে, বাচ্চাগুলি মহানন্দে স্তন্যপান করিতেছে। ভন্টু ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বাইকে চড়িয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। অপমানে তাহার কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। করালী যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা তাহার স্বপ্নাতীত ছিল।

কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া করালীচরণ দ্বারে কান লাগাইয়া রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাগ নয়, তাঁহার ভয় হইতেছিল। ভন্টু হয়তো যাইবে না, এখনই হয়তো ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্যটি জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইবে। কিছুতেই তিনি হয়তো বাধা দিতে পারিবেন না। দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠী হইতে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসংশয়রূপে জানিয়াছেন যে, তাঁহার মা বেশ্যা ছিলেন। এই নিদারুণ কথা পৃথিবীতে আর কেহ জানিবে না। না, আর দেরি করা নয়, এখনই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। এখনই হয়তো ভন্টুবাবু একদল চেনা লোক লইয়া হাজির হইবে। ভন্টুকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার নাম মোটেই তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহারই আগমন-আশঙ্কায় অতি ভয়ে ভয়ে দিনপাত করিতেছিলেন। বাড়িটা বিক্রয় করিবার জন্যই কলিকাতায় আসা। নিদারুণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সে ব্যাপার তো আজ চুকিয়া গেল। আর দেরি করিয়া কি হইবে? করালীচরণ হাতের কাছে যাহা পাইলেন, একটা পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, মোস্তাকও চলিয়া গিয়াছে। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন।

এই ট্যাক্সি!

ছুটন্ত ট্যাক্সিটা থামিতেই করালীচরণ তাহাতে চড়িয়া বলিলেন, হাওড়া, জল্‌দি।

হাওড়ায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, একখানা ট্রেন ছাড়িতেছে। বিনা টিকিটেই তাহাতে তিনি চড়িয়া বসিলেন।

২৪

দিনকয়েক পরে ভন্‌টুর মনে পড়িয়া গেল, শঙ্করের বাবার উইলটা তো করালীচরণের কাছে আছে। শঙ্করকে খবর দিয়া উইলটা অবিলম্বে উদ্ধার করিয়া আনা প্রয়োজন। তাহার নিজের আর করালীচরণের বাসায় যাইতে সাহস হইতেছিল না, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। লোকটার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অভদ্র। ভন্‌টু এখন আর সে ভন্‌টু নাই। আপিসে তাহার পদোন্নতি হইয়াছে, নিম্নতন অনেক কেরানী তাহাকে দুই বেলা ঝুঁকিয়া নমস্কার করে। যেখানে-সেখানে যখন-তখন আগেকার মত অদ্ভুত বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়া সে আর ভাঁড়ামি করে না। তাহার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হাজার হোক সে একটা ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু, জুলফিদার-কন্যা ইন্দুমতীর স্বামী। করালীচরণের সেদিনকার অপমানটা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। উইলটা কিন্তু উদ্ধার করিতে হইবে যেমন করিয়া হোক। শঙ্করকে অন্তত খবরটা দেওয়া দরকার। ইন্দুর জন্য এক বাক্স ওভাল্‌টিন-বিস্কুটও কিনিয়া আনা দরকার। ভন্‌টু বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শঙ্করের বাড়ির দরজায় নামিয়া ভন্‌টু খানিকক্ষণ বাইকের ঘণ্টা বাজাইল। শুধু ভন্‌টু নয়, অনেকেরই ধারণা, বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া বাইকের ঘণ্টা বা মোটরের হর্ন বাজাইলেই বাড়ির ভিতর হইতে লোকজন ছুটিয়া বাহির হই আসিবে; ডাকিবার প্রয়োজন নাই। অনেকে বাহির হইয়া আসেও। শঙ্কর আসিল না, কারণ শঙ্কর বাড়িতে ছিল না। ভন্‌টুকে অবশেষে বাইকটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া বারান্দার উপর উঠিয়া কড়া নাড়িতে হইল। অগত্যা

দ্বিতল হইতে জানালা ফাঁক করিয়া দেখিল এবং নিত্যানন্দকে মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভনটুবাবু এসেছেন।

নিত্যানন্দ কয়েকদিন হইতে শঙ্করের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর ছাত্রের বাসা হইতে ফেরে নাই।

দাদা বাড়ি নেই।—নিত্যানন্দই গলা বাড়াইয়া বলিল।

কোথা গেছে, কখন ফিরবে?

ঠিক জানি না। যদি কিছু বলবার থাকে, ব'লে যান।

সে অপরকে বললে চলবে না, তাকেই বলতে হবে। আচ্ছা, আমি পরে আসব।

ভনটু চলিয়া গেল।

নিত্যানন্দ অমিয়াকে বলিল, কি যে একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে দাদা সময় নষ্ট করছেন! ক্রমাগত লোক এসে ফিরে যাচ্ছে।

অমিয়া শুধু একটু হাসিল।

কিছু ভাল লাগছে না, একটু চা কর দিকি বউদি।

করি।

ওভালটিন্-বিস্কুট কিনিয়া ভনটুর মনে হইল, ঝামাপুকুরটা একবার ঘুরিয়া গেলে হয়। ভিতরে না ঢুকিলেই হইল, বাহির হইতে চাম্‌লদের হালচালটা দেখিয়া যাইতে ক্ষতি কি? করালীচরণের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া কিন্তু ভনটুকে বাইক হইতে নামিতে হইল—বাড়িতে তালা বন্ধ, সম্মুখে "টু লেট" ঝুলিতেছে। মোড়ের পানের দোকানটা খোলা আছে বটে, কিন্তু সেখানে পানউলী নাই—ছোকরা-গোছের আর একজন বসিয়া পান বেচিতেছে। তাহারই নিকট ভনটু সংবাদ পাইল, দোকানটা পানউলীর নিজস্ব ছিল না, অপরের দোকানে সে চাকুরি করিত। কিছুদিন পূর্বে অসুখ হওয়াতে দোকানের মালিক তাহাকে ছাড়াইয়া দেয়। তখন পানউলী করালীচরণের বাসাতেই আশ্রয় লইয়াছিল। করালীচরণ যেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিনই তাহার মৃত্যু হয়। করালীচরণ-প্রসঙ্গে ছোকরাটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অমন লোক হয় না বাবু, বুঝলেন, কি ধুমধাম ক'রে ছাদ্দটা করলে পানউলীর! লোকজন কাঙাল গরিব কত যে খাওয়ালে! পানউলী ম'রে যাওয়াতে হাউহাউ ক'রে সে কি কান্না মশাই, যেন আপনার লোক মরেছে কেউ, নিজে কাঁধে ক'রে নিয়ে গেল,—লোক ছিল বটে।

তাহার নিকটই ভন্‌টু শুনিল, করালীচরণ বাড়ি বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না।

২৫

ছবির শ্বাস উঠিয়াছে। পাশের ঘরে তাহার স্ত্রী কাদম্বিনীও অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছে। ছবির শিয়রে শঙ্কর জাগিয়া বসিয়া আছে, কাদম্বিনীর কাছে আছেন তাহার বৃদ্ধ পিতা হরিনাথবাবু। ছেলেমেয়েদের অন্য একটি বাসায় সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবির শ্বশুর হরিনাথবাবু কলিকাতার বাহিরে থাকেন, ইহাদের অসুখের সংবাদ শুনিয়া সপরিবারে আসিয়া অন্য একটি বাসায় উঠিয়াছেন। ছবির ছেলেমেয়েরা সেই বাসায় গিয়াছে। হরিনাথবাবু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। আবক্ষ পাকা দাড়ি, কম কথা বলেন, উচিত কথা বলেন এবং যেটুকু বলেন বেশ গুছাইয়া বলেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস হয় না। হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে। শঙ্করের বার বার মনে হইতেছিল যে, বোধ হয় দারিদ্র্যের জন্যই হরিনাথবাবু অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলেন—সে নিজে প্রয়োজন হইলে টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু স্বল্পভাষ এবং মুখভাবে একটা নিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কর জোর করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। তাঁহার মতেই মত দিতে হইয়াছে। হরিনাথবাবুই ছবির আপন লোক, শঙ্কর ছবির কে? শঙ্কর এ কয়দিন বাড়ি যায় নাই, দিবারাত্রি কেবল ছবিকে লইয়াই আছে। তাহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছে, এ বিপদে ছবিকে ফেলিয়া যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। ছবির যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, শঙ্করের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। তাহার শ্বশুর আসিয়াছে—এই অজুহাতে অজ্ঞা

এখন তাই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। বিনা বেতনে মন একজন সহৃদয় একনিষ্ঠ নার্স পাইয়া হরিনাথবাবুও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হরিনাথবাবুর সহিত ব্রাহ্ম নিলয়কুমারের ধর্মগত যোগাযোগ থাকাতে আপিসের ছুটিও সহজেই মিলিয়াছিল।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। মুমূর্ষু ছবির শিয়রে বসিয়া বসিয়া শঙ্কর ছবির কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, ছবির সহিত তাহার পরিচয় কতটুকু? তাহার পূর্বজীবনের কতটুকু সে জানে, উত্তর-জীবনের কতটুকু বা জানিবে? ছবির সাহিত্যপ্রীতি আছে, তাহারও আছে। পরিচয়ের সূত্র মাত্র এইটুকু। মনে পড়িল, ছবির সহিত তাহার দেখাও খুব যে ঘন ঘন হইত তাহা নহে, ক্বচিৎ কখনও হইত। মাঝে মাঝে আসিয়া টাকা ধার চাহিত, হয়তো বা কখনও কোন দিন মদ খাইয়া ঈষৎ মত্ত অবস্থায় আসিত, শেলী কীট্‌স ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতে করিতে উত্তেজনার আবেগে টেবিল চেয়ার উলটাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিত, কখনও বা নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংসারের নিত্য-উদীয়মান অভাবের তালিকা দেখাইয়া পরামর্শ চাহিত এবং পর-মুহূর্তেই আবার নিম্নকণ্ঠে জানাইত যে, রামবাগানে একটি মেয়ের গান শুনিয়া সে তাহার প্রেমে পড়িয়াছে—মাইরি বলছি, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল গানের জন্যে। তাহার মনের শিল্পবোধ ছিল, সৌন্দর্যের প্রতি পিপাসা ছিল এবং সেইজন্যই বোধ হয় তাহাকে এত ভাল লাগিত। শুধু তাই কি? সুখদুঃখনিষ্পিষ্ট মানুষটাকেও কি কম ভাল লাগিত! ছবির অতীত জীবনের যে ঘটনাগুলির খবর শঙ্কর জানিত, ছায়াছবির মত সেগুলি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। খামখেয়ালী দুশ্চরিত্র মাতালটার এইবার শ্বাস উঠিয়াছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হইয়া যাইবে। লোকটা সাহিত্যিক ছিল! পরাধীন দেশের শৌখিন সাহিত্যিক! কবিতা আওড়াইত, মদ খাইত, প্রেমে পড়িত! আস্পর্ধা কম নয়।

সহসা শঙ্করের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এ কি অকালমৃত্যু! প্রতিভার এ কি শোচনীয় অপচয়! এই ছবি কি না হইতে পারিত!···শ্বাস উঠিয়াছে। কি কষ্ট, কি নিদারুণ কষ্ট! শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সমস্ত পেশীগুলি

প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, চতুর্দিকে বাতাসের অভাব নাই, কিন্তু তাহার ব্যায়ত আনন, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, নীল ওষ্ঠাধর, ঘর্মাক্ত কলেবর, আর্ত ম্লানায়মান দৃষ্টি যেন সমস্বরে বলিতেছে—পাইলাম না, পাইলাম না, আকাশ-ভরা এত বাতাস, আমি কিন্তু এতটুকু পাইলাম না।

কপাট ঠেলিয়া পাশের ঘর হইতে হরিনাথবাবু আসিলেন, আসিয়া সন্তর্পণে কপাটটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

কি রকম বুঝছেন?

যাহা বুঝিতেছিল, তাহা কি ব্যক্ত করা যায়? শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হরিনাথবাবু ক্ষণকাল ছবির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার হাতে পিতলের তৈয়ারি প্রকাণ্ড ভারী 'ওঁ'।

ওটা কি হবে?

ওটা ওর বুকের ওপর রেখে দেব। আমরা আর কি করতে পারি বলুন—সবই তাঁর ইচ্ছা।

একে বেচারার এই শ্বাসকষ্ট, তাহার উপর বুকে এই ভারী জিনিসটা চাপাইয়া দিতে হইবে! কিন্তু সে বাধা দিতে পারিল না, বরং তাড়াতাড়ি বুকের চাদরটা সরাইয়া দিল। হরিনাথবাবু বুকের উপর পিতলনির্মিত 'ওঁ'টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন এবং বাহির হইতে সন্তর্পণে কপাটটি ভেজাইয়া দিলেন।

২৬

নিপু আসিয়াছিল। কয়েক দিন পূর্বে আসিয়া সে শঙ্করকে স্বরচিত একখানি উপন্যাস দিয়া গিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল। নিপুই বক্তা।

নিপু বলিতেছিল, আমি চাই না যে, তুমি আমার লেখাটার প্রশংসা কর। প্রশংসা পেতে ইচ্ছে করলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাই আমি পেতে পারতাম।

গবু সেবার যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল, তখন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল লেখাটা, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে—

গবু কে?

গবুকে চেন না! ওরাই তো কামিং লাইট! 'মজদুর-দর্পণ' ব'লে একখানা কাগজও করেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—রবিবাবু এর গোড়ার দিকটা শুনেছিলেন, ভালই বলেছিলেন শুনলাম। ইচ্ছে করলে তাঁর প্রশংসা পেতে পারতাম, কিন্তু ওসবে রুচি নেই আমার। তোমাকেও প্রশংসার জন্যে দিই নি, আমি এটা তোমাকে দিয়েছি নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের নমুনা হিসেবে। আমি উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছি, নূতন যুগের নূতন সাহিত্যের রূপ কি—মানে নবতম রূপ কি—হয়তো হঠাৎ বেখাপ্পা বেসুরো মনে হবে তোমার—আমি জিনিসটা দেখাতে পেরেছি কি না, তাও জানি না। ভাল ক'রে প'ড়ে তবে সমালোচনা ক'রো। মাঝখানটায় একটু হয়তো জটিল ব'লে মনে হবে—মার্ক্সিজ্‌ম সোজা জিনিস নয়। কত দূর পড়েছ?

সবটা পড়ি নি এখনও।

শঙ্কর মিথ্যে কথা বলিয়া ফেলিল।

না না, তাড়াতাড়ি পড়বার দরকার নেই, আমি এত তাড়াতাড়ি ছাপাতামও না—বঙ্গদেশের সাহিত্য-সমাজে স্থান পাবার লোভ আমার মোটে নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে স্থান হয়ে গেল দেখছি। বিশ্বেশ্বরবাবুকে পড়তে দিয়েছিলাম, তাঁর প্রেস আছে, তিনি একরকম জোর ক'রেই ছাপিয়ে ফেললেন। ছাপার ভুলও বিস্তর থেকে গেছে—এ দেশের যেমন পাঠকসমাজ, তেমনই ছাপাখানা—

ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তিক্ত হাসি হাসিতে হাসিতে নিপুর কথা বলার একটা বিশেষ ধরন আছে। কথা শোনারও বৈশিষ্ট্য আছে তাহার। অপরে যখন কথা বলে, তখন সে মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকে, বক্তার দিকে নয়। শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিপুর চোখের দৃষ্টিতে খ্যাতিলোলুপতা এবং তাহা গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস। গায়ে

আধ-ময়লা টুইলের শার্ট, পায়ে বার্নিশহীন গ্রীসিয়ান স্লিপার, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখময় ব্রণ ও মুখভাবে বুভুক্ষার চিহ্ন। বেরসিক অশিক্ষিত জনতার প্রতি অসীম অবজ্ঞার ভান, অথচ বই ছাপাইয়া তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার আকুল আগ্রহ। দ্বারস্থ হইয়াও নিজের স্পর্ধিত গর্বটাকে আস্ফালন করিবার হাস্যকর আড়ম্বর! সবই মানাইয়া যাইত, যদি প্রতিভা থাকিত। কিন্তু হায় হায়, সেই বস্তুটিরই একান্ত অভাব। তাই কেবল নানা কৌশলে, নানা ছুতায়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বত্র হুল ফুটাইয়া কালি ছিটাইয়া, সকলকে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া পরোক্ষে অপরোক্ষে নিজের নকল নূতনত্বের ঢাকটা পিটাইবার এই অদম্য অভিযান! কিন্তু ঢাকটাও ফাটা, বীভৎস বিকট আওয়াজ বাহির হইতেছে। সুর যে জমিতেছে না তাহা ইহারা জানে, তাই ইহাদের বুলি—আমরা বেসুরের সাধক, আমরা বিদ্রোহী, আমরা উল্টা কথা বলি, আমাদের এই নূতন ঢঙের অভিনব মর্যাদা, পুরাতনপন্থী তোমরা বুঝিবে না। কিন্তু ইহা যে ইহাদের আসর-জমানো মৌখিক বুলি-মাত্র, মনের কথা নয়, তাহার প্রমাণ ইহারা বই লিখিয়া সর্বাগ্রে সেটি পুরাতনপন্থীদেরই হাতে তুলিয়া দেয় এবং তাহাদের প্রশংসাবাক্য শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

এ শ্রেণীর অনেক লেখকের সম্পর্কে শঙ্করকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সমঝদার হিরণদার বন্ধু নিপুদাও যে এই দলের, তাহা শঙ্কর জানিত না, কল্পনাও করে নাই। নিপুদার সাহিত্যিক বুদ্ধির প্রতি তাহার আস্থা ছিল। তাহার ধারণা ছিল, নিপুদা গোপনে গোপনে একটা বিরাট কিছুর সাধনা করিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার তপস্যা চলিতেছে বাংলা ভাষার ইতিহাস অথবা অভিধান অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা সুসম্পন্ন করিয়া তিনি একদিন তাক লাগাইয়া দিবেন। নিপুদা যে শেষে এই কমিউনিস্টিক কসরৎ দেখাইবেন, তাহা শঙ্কর প্রত্যাশা করে নাই। কমিউনিজ্‌ম লইয়া প্রবন্ধ সহ্য হয়, কাল্পনিক কাব্যও হয়তো চলিতে পারে, কিন্তু রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের বাস্তব জীবন মনে করিয়া উপন্যাস অসহ্য। যেন কতকগুলি বল্‌শেভিক মতবাদ

মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে এবং অবশেষে মার্ক্স-লেনিনের জয়গান করিয়া ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌কে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নিপুদার উপন্যাসে মহারাজা মেথর সব সমান। মন্দির মসজিদ কিছু নাই, চতুর্দিকে কেবল জনগণ-পরিচালিত অসংখ্য ফ্যাক্টরি। সিনেমা এবং লাউড-স্পীকারে এন্‌তার শিক্ষা বিতরণ চলিতেছে। লাঙলের বদলে ট্র্যাক্‌টার, ধর্মের বদলে কর্ম, বিবাহের বদলে প্রেম এবং সন্তান। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিংশ শতাব্দীর রামহীন রামরাজত্ব শুরু হইয়া গিয়াছে! যে আদর্শ নিপুদা খাড়া করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় নয়, কারণ সে আদর্শ মার্ক্স-লেনিনের প্রতিভায় প্রদীপ্ত। নিপুদার তাহাতে কোনও কৃতিত্ব নাই। নিপুদার যাহা নিজস্ব কৃতিত্ব—এই জগদ্দল উপন্যাসখানি—তাহা একেবারে রাবিশ। তাহার একটি চরিত্র জীবন্ত নয়, তাহাতে এতটুকু কবিত্ব নাই, জীবনদর্শন নাই, কল্পনার প্রসার নাই। আছে কেবল বল্‌শেভিজ্‌ম্‌।

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার, শঙ্করকে ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। যে 'ক্ষত্রিয়' কাগজের আদর্শ ছিল অ-সাহিত্যকে তাড়না করা, সেই 'ক্ষত্রিয়' কাগজেরই পৃষ্ঠায় ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। উপায় নাই। হিরণদার বন্ধু নিপুদা। তাহার সম্বন্ধে সত্য কথা বলা চলিবে না। বলিলেও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে হইবে। তিক্ত সত্যটাকে প্রশংসার মিষ্ট প্রলেপে ঢাকিয়া দিতে হইবে।

২৭

নীরা বসাক ও তাহার বান্ধবী কুন্তলা মুখোপাধ্যায় হাস্যপরিহাসসহকারে যে আলাপে ব্যাপৃত ছিল, তাহাকে ঠিক সাহিত্যালাপ বলা যায় না, যদিও আলাপের মূল বিষয় একজন উদীয়মান সাহিত্যিক—শঙ্করসেবক রায়।

নীরার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত, কুন্তলা গম্ভীর।

সেদিন সামান্য একটু প্রশংসা করবামাত্র লোকটা এমন গদগদ হয়ে পড়ল যে, মনে হ'ল, সার্টিফিকেট কেন, লোকটাকে দিয়ে ঘানি পর্যন্ত টানিয়ে

নেওয়া যায়। তার ওই ট্র্যাশ বইখানার এমন বাগিয়ে প্রশংসা করেছিলাম আমি যে, আমার নিজেরই তাক লেগে গিয়েছিল।

সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিস?

প্রথম দিনই কি সার্টিফিকেট চাওয়া যায়? জমিটা তৈরি ক'রে রেখেছি, এইবার বীজ ছড়ালেই গাছ গজাবে।

নীরা বসাকের চোখ-মুখ পুনরায় হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুন্তলা বলিল, আমার কিন্তু লোকটিকে অত বোকা ব'লে মনে হয় না। তা ছাড়া, এও আমার মনে হয় না যে, সত্যি সত্যি তুমি ওর লেখাকে ট্র্যাশ ব'লে মনে কর।

কি তোমার মনে হয় শুনে?

আমার মনে হয়, শঙ্করবাবুর লেখা সত্যি সত্যি তোমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু যেহেতু আমার ভাল লাগে না এবং যেহেতু কুমার পলাশকান্তি আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা প্রকাশ করছেন, সেই হেতু তুমি আমার মন রেখে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথাগুলো বলছ।

নীরা বসাকের সমস্ত মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, আচ্ছা, কি তুই কুন্ত!

কুন্তলার গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না। সে বাতায়ন-পথে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একফালি রোদ বাঁ গালে পড়িয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে—টানা টানা চোখ দুইটি যেন আবেশবিহ্বল হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্যের পানে চাহিয়া চাহিয়া নীরা বসাকের সমস্ত অন্তঃকরণ সহসা যেন বিষাইয়া উঠিল। এ মেয়েটার সহিত কিছুতেই পারা গেল না। স্কুলে কলেজে এতদিন একসঙ্গে কাটিল, কিছুতেই কোনও বিষয়ে ইহাকে আঁটিয়া উঠা গেল না। কুন্তলা যদি অহঙ্কারী হইত, তাহা হইলে সেই ছুতায় ইহার সহিত মনোমালিন্য করা চলিত। কিন্তু সে মোটেই অহঙ্কারী নয়। রূপে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, বংশগরিমায়—সর্ববিষয়ে সে অনেক বড়, অথচ তাহার নীচতা নাই, আত্মম্ভরিতা নাই, আস্ফালন নাই। আর নীরা

বসাক? তাহার রূপ নাই, গুণ নাই অর্থও নাই। অর্থাভাবেই তাহার এম.এ. পড়াটা হইল না, অথচ কুন্তলা স্বচ্ছন্দে এম.এ. পড়িতেছে। কুন্তলার প্রেমের জন্য কুমার পলাশকান্তির মত লোক উন্মুখ, আর সে অনিল সান্ন্যালকেও ভুলাইতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি চললাম। কুমার পলাশকান্তিকে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই।

আমি বলেছি। কিন্তু আমার বলায় তোমার অনিলবাবুর চাকরি হবে না।

এই কথা শুনিবামাত্র নীরা বসাকের মনের মেঘ কাটিয়া যেন আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। সে আবার বসিয়া পড়িল।

তুই বলেছিস। হবে না কি ক'রে বুঝলি?

কুমার পলাশকান্তিকে আমি বিদেয় ক'রে দিয়েছি—ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'রিফিউজ' করেছি।

নীরা যেন নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কুমার পলাশকান্তিকে কুন্তলা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যে পলাশকান্তিকে গাঁথিবার জন্য শত শত সভ্য ছিপ সর্বদা সমুদ্যত, যাহার করুণাকণা লাভ করিবার জন্য, যাহার দামী মোটরে একবার চড়িবার জন্য অভিজাতবংশীয় যুবতী কন্যারা লালায়িত, তাহাকে কুন্তলা বিদায় করিয়া দিয়াছে!

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, কেন, কি হ'ল হঠাৎ?

হবে আবার কি! তুই কি আশা করেছিলি, আমি ওকে বিয়ে করব?

করেছিলুম বইকি।

করেছিলি? আমার সম্বন্ধে তোর ধারণা যে এত হীন, তা জানা ছিল না।

কেন, বিয়ে করতে আপত্তিটা কি?

আমি অভিজাত ব্রাহ্মণ-বংশের মেয়ে, হস্টেলে থেকে না হয় এম.এ. পড়ছি, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছি, হেসে কথা কইছি—তা ব'লে যাকে-তাকে বিয়ে করব!

কুমার পলাশকান্তি যে-সে লোক নয়।

ও তো একটা বেনে। ওর স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। টাকা ছাড়া আর কি আছে ওর? সে টাকাও আবার স্বোপার্জিত নয়।

তুই কাকে বিয়ে করবি তা হ'লে?

আমার বাবা মা পছন্দ ক'রে যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন, তাঁকে। তাঁরা অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণকেই পছন্দ করবেন আশা করি।

ও বাবা, এত লেখাপড়া শিখেও তোর এখনও এত জাতবিচার আছে, তা তো জানতাম না!

জাত যখন আছে, তখন তা মানতেই হয়। সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকলেও বাবলাগাছকে আমগাছের মর্যাদা দিতে পারি না।

সেকালের কুলীনরা একশো দুশো বিয়ে করত শুনেছি, তোর বাবা যদি সে রকম কোন এক কুলীনকে পছন্দ করেন, বিয়ে করবি তুই?

নীরার দৃষ্টি সকৌতুকে নাচিতে লাগিল।

কুন্তলা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল।

সে রকম কুলীন আজকাল দুষ্প্রাপ্য। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে, সে রকম কোন কুলীনের হাতে বাবা আমাকে সম্প্রদান করবেন ঠিক করেছেন, তা হ'লেও আমি আপত্তি করব না। বিবাহ সামাজিক ধর্ম, ওতে নিজের মত চালাতে যাওয়া অন্যায়।

ও-রকম স্বামীকে ভক্তি করতে পারবি?

ভক্তি করতে পারা না-পারা নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতার ওপর নির্ভর করে পাথরের নুড়ি, কদাকার বিগ্রহ—এসবকেও তো লোকে ভক্তি করতে পারছে

নীরা বুঝিল, তর্ক করা বৃথা। কুন্তলাকে সে তর্কে হারাইতে পারিবে না তাহাকে সে কোনদিন বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কুন্তলা বলিল, এক স্বামীর এক স্ত্রী হওয়া আজকালকার রেওয়াজ, কিন্তু আমার মনে হয়, ওটা দারিদ্র্যের চিহ্ন। সত্যি সত্যি যদি কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর ভরণ-পোষণ মনোরঞ্জন করতে পারে তা হ'লে মানতেই হবে, সে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষ-প্রবর। সে শ্রদ্ধেয়, হে

নয়। একটিমাত্র স্ত্রী নিয়ে হ্যাতাজোবড়া হয়ে যারা প্রতি পদে হিমসিম খেতে খেতে নাকে কেঁদে মরে, তারা অসমর্থ অপুরুষের দল, ওই একটিমাত্র স্ত্রীকেও তারা সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারে না—তারা অক্ষম, কৃপার পাত্র।

আগেকার ওই কুলীনরা কি তা হ'লে—

আগেকার কুলীনেরা কি ছিলেন, তর্কের বিষয় তা নয়। যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, সে হেয়, না, শ্রদ্ধেয়—তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

মুসলমানদের হারেম তোর মতে তা হ'লে ভাল ?

সভ্যসমাজে আজকাল যা হচ্ছে, তার চেয়ে ঢের ভাল। আজকালকার সভ্যসমাজের মেয়েরা সেজে-গুজে রূপ-যৌবন দুলিয়ে হাটে বাজারে সস্তা পণ্যসামগ্রীর মত নিজেদের যাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। কাক, কোকিল, ময়না, শালিক সবাই একবার ক'রে ঠুকরে যাচ্ছে। বাদশার হারেমে, আর যাই থাক্, এ দুর্দশা নেই। সেখানে একশো থাক্, দুশো থাক্, প্রত্যেকেই বেগম, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, প্রত্যেকের কাছেই বাদশা আসেন—হয়তো বছরে একবার, কিন্তু সেই একবারের মহিমাই এত যথেষ্ট যে, তার স্বপ্নে বাকি বছরটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। একাধিক বারও তুমি বাদশাকে আকর্ষণ করতে পার, যদি তোমার নিজের গুণ থাকে। সত্যিকার গুণের কদর হারেমে বাদশার কাছেই হয়। বাদশা বুভুক্ষু দরিদ্র নয় যে, যা পাবে, নির্বিচারে হ্যাংলার মত গিলে ফেলবে। বাদশা সমঝদার, সূক্ষ্ম রসের রসিক, তার কাছে ফাঁকি চলে না, মেকি চলে না—

বাবা বাবা! থাম্। এত বাজে বকতেও পারিস!

নীরা হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যি চললি নাকি ?

হ্যাঁ।

অনিল সাণ্ডেলকে এত ভাল লেগেছে যে, বিয়ে না করলে আর চলছে না ? ও যে তোর চেয়ে ছোট।

বিয়ে করব কে বললে! কুমার পলাশকান্তি যদি ওঁকে প্রাইভেট

সেক্রেটারি ক'রে নেন, তা হ'লে—মানে, মিসেস স্যানিয়েল বড় কষ্টে পড়েছেন আজকাল—তা ছাড়াও—

বুঝেছি।

কুন্তলার গম্ভীর মুখে হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নীরা বসাক ছেলেমানুষের মত কিল তুলিয়া বলিল, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি। তাহার পর কণ্ঠস্বরে যতটা আন্তরিকতা ফোটানো সম্ভব, তাহা ফুটাইয়া বলিল, পাগল নাকি, আমি বিয়ে করব ওই অনিলটাকে, কি যে ভাবিস তোরা আমাকে!

কুন্তলা কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায়?

হচ্ছে।

আমি যাই তা হ'লে। শঙ্করবাবুর কাছে যেতে হবে একবার।

সত্যই যেন কুন্তলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে, এমনই একটা মুখভাব করিয়া নীরা বাহির হইয়া গেল। সে নিজে জানে যে, অনিল সান্ন্যালের একটা চাকরি যদি সত্যই জুটিয়া যায়, তাহা হইলে অনিল তাহাকে বিবাহ করিবে। বেকার অবস্থায় মায়ের আদেশের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস তাহার নাই। নীরাকে সে ভালবাসিয়াছে, নীরাকেই সে বিবাহ করিবে, কিন্তু তৎপূর্বে একটা চাকরি পাওয়া দরকার। কিন্তু আই.এ.-ফেল অনিলের কিছুতেই চাকরি জুটিতেছে না। কুমার পলাশকান্তি মাসিক এত শত টাকা বেতনে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবেন বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। নীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, এই চাকরিটা অনিলের যাহাতে হয়। শঙ্করের সার্টিফিকেট এবং কুন্তলার সুপারিশ কুমার পলাশকান্তির নিকট মূল্যবান, তাই বেচারা এত ছুটাছুটি করিতেছে। সে নিজেও বেকার। ইচ্ছা করিলে একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি অবশ্য সে যোগাড় করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাই তাহার হয় না। সে সংসারী হইতে চায়, নীড় বাঁধিতে চায়। চাকরি করিবার প্রবৃত্তিই তাহার নাই। ভগবান তাহার রূপ দেন নাই, যৌবনও বিগতপ্রায়। পাত্র খুঁজিয়া তাহার বিবাহ দিবে এমন কোন অভিভাবকও

্যাহার নাই। তাহাকে নিজেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে অনেক খুঁজিয়াছে, অনেক ছলনা, অনেক অভিনয় করিয়াছে—কেহই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই, এক এই অনিল ছাড়া। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা—চাকরি না কিছুতেই বিবাহ করিবে না। নীরা, যেমন করিয়া হোক, তাহার চাকরি জুটাইয়া দিবে। অনিলকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করিবে না। বিবাহ হইয়া গেলে লোকে যদি নিন্দা করে করুক, কুন্তলা যদি টিটকারি দেয় দিক, সে গ্রাহ্য করিবে না। এখন কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা করে, কুন্তলার কাছেও লজ্জা করে। আহা, অনিলের চাকরিটা যদি হইয়া যায়! নীরার সমস্ত দেহমন যে পিপাসায় হাহাকার করিতেছে, কুন্তলা তাহার কতটুকু বোঝে!

নীরা দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল।

২৮

সকাল হইতে শুরু হইয়াছে। বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, আর কত বাকি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই। করিলেই লোকনাথ ঘোষালের আত্মসম্মান আহত হইবে। আহতপুচ্ছ গোক্ষুরকে বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু আহত-সম্মান লোকনাথকে সহ্য করা কঠিন। তাহা ছাড়া ভালও লাগিতেছে, তাই শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি শ্রবণ করিতেছে। সুদীর্ঘ হইলেও প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। অমিয়ার কথা স্মরণ করিয়া এবং নিজের নানাবিধ কাজের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও অবহিত মুগ্ধ চিত্তেই সে প্রবন্ধটি শুনিতেছে এবং ভাবিতেছে, এই পণ্ডিত সুরসিক ব্যক্তিটিকে কেহ চিনিল না কেন? 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় শঙ্কর ইঁহার মূল্যবান প্রবন্ধ আজকাল বাহির করিতেছে, কিন্তু পাঠকসমাজে তেমন কোন সাড়া পড়ে নাই তো! দুই-চারিজন বিদগ্ধ ব্যক্তি প্রশংসা করিয়াছেন ঘটে, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাই লোকনাথ ঘোষালের নাম দেখিলেই পাতা উলটাইয়া যায়। অথচ··· দ্বার ঠেলিয়া একজন যুবক

আসিয়া প্রবেশ করিল। যুবককে দেখিয়া শঙ্কর একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। লোকনাথবাবুর সম্মুখে ভদ্রলোক না আসিলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু আর উপায় নাই। স্মিতমুখে আহ্বান করিতেই হইল। যুবক প্রশ্ন করিল, আপনি যাচ্ছেন তো তা হ'লে

আপনাদের সভা কবে?

আগামী মঙ্গলবার।

সেদিন আমার ছুটি নেই।

কবে যেতে পারবেন বলুন, সেই রকমই ব্যবস্থা করব আমরা।

রবিবারের আগে আমার অবসর নেই।

বেশ, তাই হবে। রবিবারেই একেবারে 'কার' নিয়ে আসব তা হ'লে সভা পাঁচটায় হবে, বারোটা নাগাদ আসব, এতদূর যেতেও তো হবে।

বেশ, তাই আসবেন।

নমস্কারান্তে যুবক চলিয়া গেল।

লোকনাথবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিসের সভা?

কোন্নগরে একটা সাহিত্য-সভা হবে, তাতেই আমাকে সভাপতি করতে চান ওঁরা।

ও।

লোকনাথ ঘোষালের মুখে কিসের যেন একটা ছায়া সহসা ঘনাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ তিনি কোনও কথাই বলিলেন না। তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, আজ উঠি। এটুকু আর একদিন হবে, বেলা অনেক হয়েছে আজ।

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পক্ষে আর বসিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কি যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। জীবনে সাহিত্য ছাড়া তিনি আর কিছুই চাহেন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনে একমাত্র আকর্ষণ। ইহার জন্য সংসার সমাজ পাপ পুণ্য পরলোক আত্মা, এমন কি ভগবান তিনি তুচ্ছ করিয়াছেন, সাহিত্য ছাড়া আর কোন কিছুতেই তাঁহার নাই, আর কোন বিষয়ে তিনি আনন্দ পান না। এই সাহিত্যের মধ্যেই তিনি

জীবন-রহস্যের যে লীলাময় দেবতাকে, রসমূর্ত যে সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন, আজীবন বাণীসাধনায় আত্মহারা হইয়া তাহারই মহিমা-কীর্তন তিনি করিতেছেন। কিন্তু কই, তাঁহার কথা তো কেহ শুনিল না!' কোন সাহিত্য-সভা হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল না তো! নাবালক শঙ্করের কথা সকলে শুনিতে চায়, অথচ তাঁহাকে সকলে এড়াইয়া চলে—অধিকাংশ লোক চেনেই না। এই ছোকরা তো তাঁহাকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করিল না! এই দেশে, এই সমাজে, আত্মীয়স্বজনপরিত্যক্ত হইয়া কাহার জন্য কিসের জন্য তিনি এই দুরূহ তপশ্চর্যা করিতেছেন? কেহই তো তাঁহার কথা শোনে না, জোর করিয়া শুনাইলেও শুনিতে চায় না। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে শঙ্করের অস্বস্তি তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। শঙ্করও স্থিরভাবে তাঁহার লেখা শুনিতে অপারগ! তবে এসব কেন—কেন—কেন?

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া লোকনাথ ঘোষাল কলিকাতার ফুটপাথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। হাতে বিরাট প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি—চোখে বিদ্যুদ্দীপ্তি।

লোকনাথবাবু আকস্মিক অন্তর্ধানে শঙ্কর একটু হাসিল। লোকনাথবাবুর ব্যথা যে কোথায়, তাহা তাহার অবিদিত নাই; কিন্তু সে ব্যথা দূর করা তাহার সাধ্যাতীত। কিছুক্ষণ শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, আবার মনে হইল, যে নিষ্ঠাসহকারে সাহিত্যসেবা করা উচিত, সে নিষ্ঠা তাহার নাই—সে আদর্শভ্রষ্ট হইতেছে। মনে হইল, লোকনাথ ঘোষালই নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক—সে পল্লবগ্রাহী সুবিধাবাদী ব্যবসাদার। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়িল, অমিয়া তাহার অপেক্ষায় এখনও অভুক্ত বসিয়া আছে। উঠিতে যাইবে, এমন সময় আর এক বাধা—নীরা বসাক আসিয়া প্রবেশ করিল। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মাথার সামনের কেশবিরল অংশের অবিন্যস্ত চুলগুলা হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, আসতে পারি?

আসুন।

মুখমণ্ডলে শ্রদ্ধার আভাস বিচ্ছুরিত করিতে করিতে চেয়ার টানিয়া নীরা বসিল।

এ সময় হঠাৎ?

না এসে পারলাম না। এ মাসের 'সংস্কারে' "অভ্যুদয়" কবিতাটাব জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বসুন।

কি চমৎকারই লিখেছেন! সত্যি, আপনিই আধুনিক যুগের যুগপ্রবর্তক কবি।

নীরা বসাকের চোখের দৃষ্টিতে ভক্তি শ্রদ্ধা যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। শঙ্কর অমিয়ার কথা ভুলিয়া গেল। কণ্ঠস্বরে একটু আবদারের আমেজ মাখাইয়া নীরা আবার বলিল, কি ক'রে আপনি এমন লেখেন বলুন না, অবাক লাগে, সত্যি!

শঙ্কর স্মিতমুখে বসিয়া রহিল—প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনটাই করা শোভন নয়।

নীরা 'অভ্যুদয়' কবিতার খানিকটা আবৃত্তি করিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিল, এসব কি ক'রে লিখছেন আপনি! এ যে আগুন!

ওই ধরনের আর একটা কবিতা লিখেছি কাল।

একটু শুনতে পাই না?—সাগ্রহ মিনতি-ভরা কণ্ঠে নীরা অনুরোধ জানাইল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ড্রয়ার টানিয়া শঙ্কর কবিতাটি বাহির করিল এবং পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ কবিতা। শেষ হইয়া যাইবার পর নীরার মুখ দিয়া খানিকক্ষণ কোন বাক্যস্ফূর্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে মৃদুকণ্ঠে কেবল নিঃসৃত হইল—চমৎকার! খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আচ্ছা, এবার উঠি তা হ'লে, নমস্কার।

নমস্কার।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনেছি, কুমার পলাশকান্তির সঙ্গে আলাপ আছে আপনার।

আছে।

যদি দয়া ক'রে তা হ'লে একটা কাজ করেন, একটি দরিদ্র পরিবারের বড় উপকার হয়।

কি বলুন্?

আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া শঙ্কর বলিল, আমিও ওদের ভাল ক'রে চিনি। অনিল অখিলকে পড়াবার জন্যে মিসেস স্যানিয়ালের বাড়িতে আমি ছিলাম যে কিছুদিন।

নীরা সব জানিত, তবু বিস্ময়ের ভান করিল।

ওমা, তাই নাকি! তা হ'লে দিন একটা চিঠি।

আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু কুমার পলাশকান্তির একটি অনুরোধ আমি রাখি নি, তিনি যদি আমারটা না রাখেন?

ঠিক দুই দিন পূর্বে কুমার পলাশকান্তির তাগাদায় অস্থির হইয়া শঙ্কর অবশেষে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে গল্প লিখিয়া দিতে পারিবে না, কুমার তাহাকে যেন ক্ষমা করেন, তাহার মোটেই সময় নাই। সে ব্যস্ততার দোহাই দিয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে তাহার গল্প লিখিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না, বিবেকে বাধিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আংটিটাও ফেরত দেওয়াতে প্রত্যাখ্যানটা একটু রূঢ়ই হইয়াছে। এত কথা সে অবশ্য নীরাকে বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দিতে পারবেন না তা হ'লে?

সম্ভব হ'লে দিতাম।

নীরা বসাকের সমস্ত সপ্রতিভতা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল! সে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি লইয়া শঙ্কর কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিল। তাহার কেবলই ভয় হইতেছিল, তিনি যদি বাড়িতে না থাকেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ সময় প্রায়ই তিনি বাহির হইয়া যান। নীরা বসাকের বিবর্ণ ম্লান মুখচ্ছবি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত কাহিনী সে শুনিয়াছিল। কুন্তলার কাছে গোপন করিলেও শঙ্করের কাছে নীরা কিছুই গোপন করে নাই। কুন্তলা ঠিকই ধরিয়াছিল, নীরা সত্যই শঙ্করের ভক্ত। লেখা পড়িয়াই সে শঙ্করকে এত ভক্তি করিত যে, তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার রচনার ভিতর দিয়া সে যে সহৃদয় ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার নিকট অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে নাই।

শঙ্কর দ্রুতপদে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানে চোখ পড়িতে সে একটু বিস্মিত হইয়া গেল। প্রফেসার গুপ্ত ও সুলেখা কাপড় কিনিতেছেন—একটি চমৎকার শাড়ির পাট খুলিয়া উভয়ে সেটি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সুলেখার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছে না যে, স্বামীর সহিত তাঁহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব আছে। অত অপমানের পরও সুলেখা ঠিক আগেকার মতই স্বামীর ঘর করিতেছেন, বিদ্রোহ করিয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। হয়তো তাঁহারই আদরে আবদারে বিগলিত হইয়া প্রফেসার গুপ্ত তাঁহারই জন্য শাড়ি কিনিতে আসিয়াছেন। প্রফেসার গুপ্তের চরিত্র যে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার নিজেরই একটি ছাত্রীর সহিত তাঁহার নাম জড়াইয়া প্রফেসার-মহলে যে কানাঘুষা চলিতেছে, তাহা শঙ্কর শুনিয়াছে। সুলেখাও হয়তো শুনিয়াছেন। সুলেখার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া শঙ্কর আগাইয়া গেল। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল, ইহাই জীবন।

অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া শঙ্কর জীবনের আর একটি ছবি দেখিতে পাইল না। আসৃমি-দার্জির পিতা নিবারণবাবু শঙ্করকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের

গলিতে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিলেন। তিনি বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। কাঁকড়া, ভেটকিমাছ, মাটন প্রভৃতি নানারূপ সুখাদ্য তিনি কিনিয়াছেন। আসৃমি-সহ পলাতক মাস্টার ফিরিয়াছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নয়, নিবারণবাবুর আহ্বানে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া শুধু চিঠি নয়, তিনি টেলিগ্রাম পর্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কাছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে হইল।

অনিলের চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্য শঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল।

৩০

আসৃমিকে লইয়া তবলাবাদক মাস্টার কপিলবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিবারণবাবুর অন্তরের কথা নিবারণবাবুই সম্যকরূপে জানেন, বাহিরে তাহার যতটুকু প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা পরিচিতমহলে কিঞ্চিৎ বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে। আসৃমি ও মাস্টারকে ঘিরিয়া নিবারণ-গৃহে প্রতিদিন একটা না একটা ছোট বড় উৎসব লাগিয়াই আছে। নিবারণ যে ইহাদের বিরুদ্ধে পুলিসে নালিশ করিয়াছিলেন অথবা কখনও ইহাদের মুখ-দর্শন করিবেন না বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বর্তমান আচরণ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। দার্জির আচরণও ঠিক পূর্ববৎ আছে। দার্জি সর্বদা স্বল্পভাষিণী, সর্বদা কর্তব্যপরায়ণা। সে সহসা মিষ্ট কথায় গলিয়াও পড়ে না, রুষ্ট কথায় ফোঁস করিয়াও উঠে না। যাহা তাহার ভাগ্যে জোটে, তাহাই সে মানিয়া লয়। অদৃষ্টকে শান্ত মুখে মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনাড়ম্বর জীবনযাপন-কৌশল সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। মনে হয়, তাহার যেন কোন অভাববোধই নাই। থাকিবে কি করিয়া? যে আনন্দের অভাব জীবনকে শুষ্ক করিয়া দেয়, সে আনন্দ তাহার প্রচুর পরিমাণে আছে। সে শিল্পী। সূচীশিল্পে সে তন্ময় হইয়া থাকে, বাবাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে।

আর কি চাই? তাহার বিশ্বাস, সে ছাড়া তাহার বাবাকে আর কেহ চেনে না, বোঝে না। আস্‌মি আসার পর হইতে সে সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছে—কখন শঙ্করবাবু হঠাৎ আসিয়া পড়েন! শঙ্করবাবুর নিকট নিবারণবাবু আস্‌মি ও কপিলবাবুর সম্বন্ধে যেসব গর্জন করিয়াছিলেন, তাহা দার্জির অবিদিত নাই। তাই তাহার সর্বদা ভয় হয়, শঙ্করবাবু এখন যদি আসিয়া পড়েন, কি ভাবিবেন! বাহিরের কোন লোকের নিকট তাহার বাবা অপমানিত বা অপ্রস্তুত হইলে তাহার বড় কষ্ট হয়। এই একটি জিনিসই তাহার পক্ষে সত্য সত্যই কষ্টদায়ক। অথচ বাবা এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন! সেদিনও একটি লোককে তিনি তাহার বিবাহের জন্য কি খোশামোদই না করিতেছিলেন—সে পাশের ঘর হইতে স্বকর্ণে শুনিয়াছে। কি দরকার তাহার বিবাহ করিবার? সে বাবাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তাহার জন্য আর পাত্র খুজিতে হইবে না। সে বিবাহ করিবে না। আস্‌মি বিবাহ করিয়াছে, সেও যদি বিবাহ করে, তাহার অসহায় বাবাকে দেখিবে কে? না, সে বিবাহ করিবে না।

সেলাইয়ের ফোঁড় তুলিতে তুলিতে সে ভাবিতেছিল, শঙ্করবাবুর নিকট কি করিয়া বাবার মান বাঁচানো যায়! সহসা তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিয়া ফেলিল, শঙ্করবাবু যদি আসেনই, তাঁহাকে আগেই আড়ালে ডাকিয়া সে বলিয়া দিবে যে, বাবার নয়, তাহারই আগ্রহাতিশয্যে আস্‌মিরা আসিয়াছে। তাহারই অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাবা তাহাদের আসিতে লিখিয়াছিলেন এবং তাহারই মুখ চাহিয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ব্যাপারটার সমাধান করিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, হেঁট হইয়া সেলাইয়ের বাক্সের ভিতর উড্ডীয়মান শুকপক্ষীর পালকের উপযোগী সবুজ রঙের সুতা অন্বেষণে সে ব্যাপৃত হইল।

আস্‌মি, মাস্টার ও নিবারণবাবু আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়াছেন। দার্জি যায় নাই। সে কোথাও যায় না। নিস্তব্ধ দুপুরে একা বসিয়া সেলাই করিতেই তাহার ভাল লাগে।

করালীচরণের আকস্মিক অভ্যাগম ও অন্তর্ধানে ভন্‌টু শঙ্করের বাবার উইল সম্বন্ধে প্রথমে হঠাৎ যতটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পরে ততটা উদ্বিগ্ন সে আর রহিল না। প্রথম কারণ—শঙ্করের নাগাল সে পাইল না, শঙ্কর বাড়িতেই থাকিত না, মুমূর্ষু ছবিকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত। দ্বিতীয় কারণ—ইন্দুমতী, ইন্দুমতীর বাবা, বাবাজী ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী এবং আপিসের কাজকর্ম তাহাকে এমন ব্যাপৃত করিয়া রাখিল যে, শঙ্করের কথা তাহার আর মনেই রহিল না। অন্তর এবং বহির্লোকের নানা ঘটনা-পরম্পরা এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহাকে উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হয়—ঘূর্ণাবর্ত।

ইন্দুমতী বড়লোকের মেয়ে, চিরকাল সুখে মানুষ হইয়াছে, বাপের বাড়িতে সর্বদা তাহার সহিত ঝি-চাকর ঘুরিত। সম্প্রতি সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে, ঝি-চাকরের সংখ্যা দ্বিগুণিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু ভন্‌টু একটি চাকর ছাড়াইয়া দিয়াছে অর্থাৎ দিতে বাধ্য হইয়াছে। অসুস্থ বেতনহীন দাদার চেঞ্জের খরচ, শন্‌টু-নন্‌টুর পড়ার খরচ, বিশাল বাড়িভাড়া, এতগুলি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন, ঔষধপত্র, লোক-লৌকিকতা—এসব তো আছেই, তাহার উপর চাপিয়াছে বাবাজীর গব্যঘৃত আলোচাল এবং বাকুর দুধ ও ঔষধ। বাকু অসুস্থ, তাঁহার শোথ হইয়াছে, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। কবিরাজ মহাশয় অন্য পথ্য নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ভন্‌টুকে চাকর ছাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। ইন্দুমতীকেই সদ্যপ্রসূত শিশুর কাঁথা কাপড় স্বহস্তে কাচিতে হইতেছে। ইন্দুমতী অবশ্য কাচিতে আপত্তি করে নাই, হাসিমুখেই সেসব করিতেছে ; কিন্তু ওই হাসির অন্তরালেই কি যেন একটা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইতেছে, যাহাতে বাবাজী ক্রুদ্ধ, বউদিদি ভীত এবং ভন্‌টু উতলা হইয়া পড়িয়াছে। বউদিদির অসংখ্য কাজ। তিনি উঠেন ভোর পাঁচটায়, শুইতে যান রাত্রি এগারোটায় কিংবা তাহারও পরে—ইহার মধ্যেও সুময় করিয়া ইন্দুমতীর কাঁথা কাপড় কাচিয়া দিতে তিনি রাজী আছেন; কিন্তু ইন্দু

কিছুতেই তাহা করিতে দিবে না, নিজেই কাচিবে। তাহার গোঁ দেখিয়া বউদিদি হাসেন, একটু ভয়ও পান—বড়লোকের মেয়ে মনে মনে না জানি কি ভাবিতেছে!

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাবাজী একদিন আপিস-গমনোন্মুখ ভনুটুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, তোর কি চোখ নেই? দেখতে পাস না? মেয়েটা খেটে খেটে ম'ল যে!

ভনুটু একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, কি আর এমন খাটছে ও! বউদি ওর চেয়ে ঢের বেশি খাটেন।

একটা মহিষের পক্ষে যা সহজ, বুলবুলির পক্ষে তা সহজ নয়। তুমি বিবাহ করেছ একটি বুলবুলিকে, তাকে দিয়ে ঘানি টানালে চলবে কেন বাপু?

ভনুটু চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটিল।

বাবাজী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তবু খুব করছে। খুব—

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, একটি কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার—জীবাত্মাকে কষ্ট দিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হতে হয়। ও না হয় গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে কর্মফলবশত তোমার স্ত্রী হয়েছে, তাই ব'লেই যে তাকে নির্যাতন করতে হবে, এ একটা কোন যুক্তি নয়।

গত কয়েক দিন হইতে ভনুটুর মনেও ঠিক এই কথাগুলি জাগিতেছিল, হঠাৎ বাবাজীর মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া বাবাজীর প্রতি সহসা তাহার যেন একটু শ্রদ্ধাই হইল।

বলিল, কি করব, আপনিই ব'লে দিন।

আমি কি বলব বল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার কাছে তুমিও যা, তোমার দাদা বিষ্ণুও তাই। উভয়েরই মঙ্গল আমি কামনা করি, কিন্তু তাই ব'লে যা ন্যায্য ব'লে বুঝেছি, মনে-প্রাণে যেটা সত্য ব'লে অনুভব করছি, তা যদি না বলি, তা হ'লে বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হবে আমাকে। তাই বলছি, বউমাকে কষ্ট দিও না।

আমি কি ইচ্ছে ক'রে কষ্ট দিচ্ছি?

তোমার এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে উনি কষ্ট না পান।

কি করব, বলুন ?

তোমার দাদাকে চিঠি লেখ, কাজে এসে জয়েন করুক। সে সমুদ্রের ধারে ব'সে ব'সে সিনারি দেখবে আর তুমি তার সংসার ঘাড়ে নিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অবিচার করবে, এটা তো ন্যায্য কথা নয়।

ভন্টু চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজী তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পাঁকে যে পড়বে, তা আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার। আমি কতকাল ধ'রে আশা করেছিলাম যে, তোমাকে সঙ্গী ক'রে নিয়ে কোন তীর্থস্থানে বাকি জীবনটা নাম-জপ ক'রে কাটিয়ে দেব। ও ছাড়া আর কি করবার আছে, বল ? সংসারে এসে তাঁর মহিমাই যদি না কীর্তন করতে পারলাম, শূয়োরের মত পাঁকে নাক জুবড়েই যদি মানব-জীবনটা কাটিয়ে দিতে হ'ল, তা হ'লে আর হ'ল কি ? কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই, তুমি ফট ক'রে বিয়ে ক'রে বসলে, এইবার মজাটা বোঝ।

ভন্টু সহসা সচেতন হইল—বাবাজী যে পথে এইবার তাঁহার চিন্তাধারাকে চালিত করিয়াছেন, সে পথ অন্তহীন। তাহার আপিসের বেলা হইয়া যাইতেছে। সে বাইকে সওয়ার হইয়া পড়িল। তাহার আজ অনেক কাজ। আপিসের অনেকগুলি ফাইল ক্লিয়ার করিতে হইবে, খোকার জন্য সোয়েটার কিনিতে হইবে, বাকুর জন্য কবিরাজের বাড়ি যাইতে হইবে, একজন স্বর্ণকারের নিকট ইন্দুর জন্য একটি হাল-ফ্যাশানের হার গড়াইতে দিয়াছে, তাহাকে একবার গিয়া চুমরাইতে হইবে, কারণ তাহাকে এখন নগদ টাকা সে দিতে পারিবে না। হার হইলে আবার এক ফ্যাসাদ আছে, বউদিদি ও বাকুর নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইবে যে, হারটা তাহার শ্বশুর দিয়াছেন। হঠাৎ ভন্টুর মনে হইল, এত সব চাতুরীর কি প্রয়োজন, সে তো কোন অন্যায় কার্য করিতেছে না! বাবাজীর কথাগুলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

হাসি অপেক্ষা করিতেছে।

পড়াশোনায় সে ক্লাসের মেয়েদের ও শিক্ষয়িত্রীদের তাক লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ধারণাই ছিল না যে, একজন গৃহস্থ-ঘরের বউ হঠাৎ স্কুলে ভরতি হইয়া অতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে। গৃহস্থালীর নানা কাজকর্মের অবসরে নিশ্চয়ই সে পড়াশোনার চর্চা রাখিয়াছিল, তাহা না হইলে হঠাৎ এতটা উৎকর্ষ লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহার যে হাতের লেখা সে একদিন প্রবাসী মৃন্ময়কে চিঠি লিখিবার জন্য চিন্ময়ের সহায়তায় শুরু করিয়াছিল, যে হাতের লেখার জন্য মৃন্ময়ের চাকরি গিয়াছিল, যে হাতের লেখায় সে আজও মৃন্ময়কে প্রত্যহ পত্র লেখে, সর্বাপেক্ষা সেই হাতের লেখাই সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। সত্যই মুক্তার মত লেখা। পড়াশোনায় কোনও বিষয়ে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। অথচ ব্যবহারে সে অতিশয় অনাড়ম্বর ও সপ্রতিভ। অহঙ্কারী নয়, গম্ভীর নয়, স্বামী চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে বলিয়া বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ সর্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। অতিশয় সহজভাবে সে সকলের সঙ্গে মেশে, হাসে, কথা কয়। কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা নাই, সকলেই তাহাকে ভালবাসে। অনেকেই বিস্মিত হয়। যাহার স্বামী জেলে, সে কি করিয়া এমন সহজভাবে থাকে, যেন কিছুই হয় নাই! হাসি নিজেই মাঝে মাঝে নিজেকে চিনিতে পারে না, নিজের এই বিবর্তন দেখিয়া নিজেই সে বিস্মিত হইয়া যায়। বাল্যকালে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া যখন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ হইতেছিল, তখন সে সঙ্কোচে মরিয়া থাকিত, মুকুজ্জেমশাইয়ের চেষ্টায় যখন মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ হইল সে যেন বাঁচিয়া উঠিল—রাজপুত্রের স্পর্শে যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল—ভীরু নয়ন তুলিয়া সে দেখিল, সম্মুখে দেবতা দাঁড়াইয়া আছে, যে দেবতা তাহারই, আর কাহারও নয়। তারপর দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে আপন মহিমায় বিকশিত হইয়া আপন অধিকারে প্রমত্ত হইয়া

ভীরু রাজকন্যা যখন রাজেন্দ্রাণী হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সহসা আবির্ভূত হইল নেপথ্যবাসিনী মৃত স্বর্ণলতার প্রেতাত্মা ও তাহার বিস্ময়কর ইতিহাস—আকস্মিক বজ্রপাতের নিদারুণ প্রহারে তাহার সুখ-প্রাসাদ নিমেষে যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে অবলুণ্ঠিত হইল, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। যাহাকে ঘিরিয়া তাহার হৃদয়ের শতদল বিকশিত হইয়াছিল, তাহাকেই ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত করিল, ক্রোধে ঈর্ষায় সমস্ত অন্তর পুড়িয়া গেল, মনে হইল, এই বুঝি শেষ, সমস্ত মহিমার উপর অন্ধকারের যবনিকা নামিল। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার নূতন জ্যোতি দেখা দিয়াছে। সহসা সে মৃন্ময়কে—চিন্ময়ের অগ্রজ মৃন্ময়কে, নূতন রূপে নূতন মহিমায় আবিষ্কার করিয়াছে।

সমস্ত অন্তর দিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। অপেক্ষা করিতেছিল, কবে তাহার পরম গৌরব ও চরম সর্বনাশের সংবাদ বহন করিয়া তাহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিবসটি আসিবে, যেদিন সে বুঝিতে পারিবে যে জীবনের প্রদীপটি জ্বলিল কি না!

দ্বার-পথে শব্দ হইল।

হাসি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুচারু প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে একখানা কাগজ।

কি সুচারু?

সুচারু কোন কথা বলিতে পারিল না। অথচ সে খবরটা দিতেই আসিয়াছিল, কিন্তু হাসিকে দেখিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ওটা কি আজকের কাগজ?

হ্যাঁ।

দেখি।

কাগজ দেখিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরার রক্তধারা যেন হিমানী-স্রোতে রূপান্তরিত হইল। প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। মৃন্ময়ের তপস্যা সফল হইয়াছে, এতদিনে ধর্ষিতা স্বর্ণলতার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিল, মৃন্ময় জেলে নৃশংসভাবে

অচিনবাবুকে হত্যা করিয়াছে। হাসির মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ জ্বলিল।

৩৩

সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর বিহ্বল হইয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মধ্যে যে এ সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা কে জানিত! আমরা মানুষকে কতটুকু চিনি!

পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মৃন্ময়ের মুখখানাই বারম্বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। গত কয়েক দিন নীরা বসাক ও অনিল তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। অনিল সান্ন্যালের উপর সে প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু নীরার সংস্পর্শে আসিয়া সে অপ্রসন্নতা কাটিয়া গিয়াছিল। To know all is to forgive all. সমস্ত শুনিবার পর আর রাগ করিয়া থাকা চলে না। কি করিলে ইহারা সুখী হইবে, এই চিন্তাই তাহার মনকে অধিকার করিয়া তাহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল। সহসা ইহাদের অবলুপ্ত করিয়া মৃন্ময় ও হাসি আসিয়া দাঁড়াইল। নীরা বসাক ও অনিলের সহিত তাহার যে সম্পর্ক, মৃন্ময় ও হাসির সহিতও তাহাই। এখন কিন্তু মনে হইতে লাগিল, উহারা তাহার বেশি আপন। উহাদের সহিত বেশি আত্মীয়তা অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত অজ্ঞাতসারে গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

...হঠাৎ, এক কোণে একগাদা পুরাতন মাসিকপত্র নজরে পড়িল—নাম 'বান্ধব'। কৌতূহল হইল। উবু হইয়া বসিয়া সে উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইল, একটি প্রবন্ধের নাম 'প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা'—সহসা কে যেন তাহাকে চাবুক মারিল।

চণ্ডীচরণ দস্তিদার চোর! ইহারই ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতা লইয়া সে সভায় সভায় গর্ব করিয়া বেড়াইতেছে! তাহার সমস্ত উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন শিথিল শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিয়া অমিয়ার নিকট শুনিল, তাহার মামাতো-ভাই নিত্যানন্দ টাকা লইয়া বাজার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল, মদ খাইয়া ফিরিয়াছে, পাশের ঘরে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর এমন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল যে, চুপ করিয়া চাহিয়াই রহিল। তাহার পর হঠাৎ যেন তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। সক্রোধে পাশের ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। উলঙ্গ নিত্যানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। শঙ্করের মনে পড়িল, সেও তো কিছুদিন আগে মদ খাইত। কিছু বলিল না, সন্তর্পণে কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

•
•
•

গভীর রাত্রি।

শঙ্কর লেখনী-হস্তে একা জাগিয়া আছে, পাশের ঘরে অমিয়া ঘুমাইতেছে। চতুর্দিকের নিবিড় নীরবতা তাহাকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, সে একটি কথাও লিখিতে পারিতেছে না, লেখনী-হস্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে হইতেছে, গভীর রাত্রির নিবিড় নীরবতার মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, যাহা নীরব বলিয়াই উপেক্ষণীয় নহে; মনে হইতেছে, অদৃশ্য অসংখ্য চক্ষু যেন নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, নামহীন নির্দেশহীন অগণ্য অনুভূতিপুঞ্জ আশেপাশে ঊর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে যেন স্পন্দিত হইতেছে, ধরণীর ধূলিকণা ও মহাকাশের নীহারিকাপুঞ্জ শ্রুতি-অগম্য যে বিরাট ছন্দে ছন্দিত, অন্ধকারে তাহার কিছু আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে, অন্ধকার-অবলুপ্ত সৃষ্টি অদৃশ্য অন্তরলোকে নব রূপে মূর্তি-পরিগ্রহ করিতেছে, নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর আত্মা স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া জ্যোতির্ময় আকাশলোকে যাত্রা করিয়াছে, অস্ফুট হাসি-কান্নার অসংখ্য অমূর্ত তরঙ্গ নিঃশব্দে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—নির্বাক শঙ্কর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে।

পাশের ঘরে চুড়ির শব্দ হইল। সহসা সমস্ত মায়ালোক যেন মিলাইয়া গেল। সে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিল। মনে হইল, অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল; তাহার দীর্ঘনিশ্বাস-পতনের শব্দও যেন শোনা গেল। খোলা জানালা দিয়া

একটা দমকা বাতাস ঢুকিল, টেবিল হইতে একটা কাগজ উড়িয়া গেল। শঙ্কর তুলিয়া দেখিল, বাড়ি-ভাড়ার বিল। দুই মাসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছে।

শঙ্কর লেখনী লইয়া আবার লিখিবার উদ্যোগ করিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, কি লেখা যায়? অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল—কিছুই লেখা গেল না। কি লিখিবে? গতানুগতিক নিয়ম বজায় রাখিয়া কতকগুলা চটুল কথার জাল বুনিয়া যাইবে? এতদিন তো ইহাই করিয়াছে, সাহিত্য-সেবার ছুতায় মনিহারী দোকান সাজাইয়া লোক ভুলাইয়াছে। জীবনের কোন্ নিগূঢ় রহস্য তাহার কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে? সাহিত্যের ভিতর দিয়া জীবনের কি আদর্শ সে দেশের লোকের সম্মুখে ধরিতে চায়? সে আদর্শের পথে সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? সে আদর্শের জন্য সে কতটা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে? সে তো এতকাল কেবল লোকের মনোরঞ্জন করিয়া, সাহিত্যের নামে অনুষ্ঠিত যত সব বাজে সভার সভাপতিত্ব করিয়া, হাততালি মালা এবং প্রশংসা কুড়াইয়া অতি সস্তা মেকি জিনিসের বেসাতি করিয়াছে মাত্র।

মৃন্ময়ের কথা মনে পড়িল। আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া সে অবলীলাক্রমে ফাঁসি-কাঠে উঠিয়াছে। তাহার টাকা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল জেলে গিয়া অচিনবাবুর নাগাল পাওয়া। আদর্শের জন্য মৃন্ময় স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিল। সে পারিবে কি?

৩৪

অনিল ও নীরা বসাক, মৃন্ময় ও হাসিকে লইয়া শঙ্করের কয়েক দিন বেশ কাটিয়া গেল, অর্থাৎ এ কয়দিন উহাদের লইয়া শঙ্কর নিজেকে বেশ ভুলিয়া রহিল। ইহার পূর্বে ভুলিয়াছিল ছবিকে লইয়া। সহসা সে আবিষ্কার করিল, কোন কিছু লইয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকিবার উপলক্ষ্য পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়, তা সে উপলক্ষ্য যতই না কেন তুচ্ছ হউক। বস্তুত, কিছুদিন হইতে এই উপলক্ষ্যই সে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে লোকনাথবাবুর

সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণ করে, নিপুদার সহিত সোৎসাহে কমিউনিজ্‌ম-বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেয়, যেখানে-সেখানে সভাপতিত্ব করিতে ছুটিয়া যায় কেবল অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার জন্য! যে প্রশ্নটা কিছুদিন হইতে বারম্বার তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, যে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় তাহার সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, যে প্রশ্নের সদুত্তর সে কিছুতেই নিজেকে দিতে পারিতেছে না—সেই দুরূহ প্রশ্নটাকে এড়াইবার জন্যই সে বাহিরের একটা-কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিতে চায়। লোকনাথবাবুর প্রবন্ধ মনোহারী, নিপুদার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিয়া আনন্দ আছে, নীরা বসাকের প্রশংসা মাদকতাময়, সাহিত্য-সভার হাততালি শিরা-উপশিরায় উন্মাদনা সঞ্চার করে—সবই ঠিক; কিন্তু কেবল ওই সব কারণেই সে যে উহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহা ঠিক নয়। সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া বাহিরের ভিড়ে আত্মগোপন করিতে চায়, নিজের মনের অনিবার্য প্রশ্নটাকে বাহিরের কোলাহলে নীরব করিয়া দিতে চায়। তাহার একা থাকিতে ভয় করে।

অনিলের চাকরি হইয়া গিয়াছে। তিন আইন অনুসারে নীরা বসাকের সহিত তাহার বিবাহও হইয়া গেল। উপস্থিত হাতে উত্তেজক কোন কাজ নাই। এ মাসে 'সংস্কারক' পত্রিকার কাজও যাহা ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। আপিস হইতে শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নটি সহসা শতমূর্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার নাম কি সাহিত্য-সাধনা? আর যদি সত্যই সে সাধনা করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই বা কাহার কতটুকু উপকার করিতে পারে? বড় জোর তাহা কতকগুলি প্রকৃষ্টমনা ব্যক্তির মানসিক বিলাসের উপকরণ যোগাইবে। কিন্তু তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা করা! দেশের উন্নতিকল্পেই একদা তুমি চরকা ঘাড়ে করিয়াছিলে, চরকা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান পড়িতে গিয়াছিলে, বিজ্ঞান ছাড়িয়া এখন সাহিত্য-সেবা করিতেছ! ইহাই কি সেই সাহিত্য-সেবার নমুনা? তোমার ও-সাহিত্য কয়টা খাজনা-পীড়িত কৃষকের দুঃখমোচন করিবে, কয়জন নিরন্নকে আহার যোগাইবে, কয়জন রোগীর ঔষধ-পথ্যের

সংস্থান করিবে, কয়জন অশিক্ষিত ব্যক্তির সুশিক্ষার সহায়ক হইবে, দুঃখীকে সুখী করিবে? তুমি বলিতেছ, আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক দুঃখ-মোচনই উহার উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, বলিতে পার, তোমার ও সাহিত্য দেশের কয়জনের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? ইহা কয়জনের আত্মগোচর হইতে পারে? যে দেশের শত-করা পাঁচজনের শুধু অক্ষর-পরিচয় মাত্র আছে, সে দেশের কয়জন সাহিত্য-রস পান করিতে সক্ষম? যাহারা সক্ষম, তাহারাও কি তোমার ও-সাহিত্যের ভাষা বোঝে? ও-সাহিত্যের ভাববিলাসের সহিত কি তাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে? দেশসেবার অজুহাতে তুমি যাহা করিতেছ, তাহা আত্মরতি মাত্র। তুমি এবং তোমার মত ভাববিলাসী কয়েকজন পরস্পর আত্মপ্রশংসা করিবার অছিলায় মিথ্যা মায়ালোক সৃজন করিয়াছ, তাহার সহিত দেশের জন-সাধারণের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহাদের ছোটলোক বল, তাহারা তাড়ির আড্ডায় বসিয়া যাহা করে, তোমরাও তোমাদের সাহিত্য-সভায় বসিয়া তদপেক্ষা মহত্তর কিছু কর না। তাহাদেরও উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন, তোমাদেরও উদ্দেশ্য তাই! চিত্তবিনোদন করিতে বসিয়া তাহারাও গালাগালি মারামারি চীৎকার করে, ভিন্ন ভাষায় তোমরাও তাহাই কর। ইহার সহিত দেশের অথবা দশের কোন সম্পর্ক নাই—ইহা নিতান্তই তোমাদের গোষ্ঠীগত ব্যাপার। যাহারা তোমাদের গোষ্ঠীর লোক—সাহিত্য-সম্পৃক্ত হওয়াতে তাহারাই বা কি এমন মহত্তর ব্যক্তি হইয়াছে? তাহাদের জীবনের কতটা আধ্যাত্মিক সুখসাধন করিয়াছ? কতটা দুঃখমোচন সম্ভব হইয়াছে? তোমাদের দলের সকলেই তো দুঃখী। শুধু তাই নয়, সাধারণ সামাজিক মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে অধিকাংশই পাপিষ্ঠ নরাধম। ছবি, প্রফেসার গুপ্ত, লোকনাথ ঘোষাল, নিলয়কুমার, নীরা বসাক, নিপুদা, চণ্ডীচরণ দস্তিদার, হীরালাল মজুমদার, সে নিজে, অর্থাৎ সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট যাহারা—তাহারা একজনও কি মনুষ্য-হিসাবে শ্রদ্ধেয়? তবে? যে কয়জনকে সে জীবনে সত্য-সত্যই শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছে, তাহাদের কাহারও তো সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সহসা তাহার স্কুলের হেডপণ্ডিত

ধরণীধর ভট্টাচার্যকে মনে পড়িল। তিনি, মুকুজ্জেমশাই, বেলা মল্লিক, ভন্টুর বউদি, মৃন্ময়, হাসি, তাহার নিজের বাবা—ইঁহারা কেহই সাহিত্যের স্রষ্টা বা সমঝদার হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহেন।

বহুদিন পূর্বে গ্রামে গ্রামে চরকা ও খদ্দর প্রচার করিতে করিতে তাহার যেমন মনে হইয়াছিল যে, সে ভুল পথে চলিতেছে। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে সে যেমন উপলব্ধি করিয়াছিল যে, বিজ্ঞানের পথ তাহার পথ নহে—সাহিত্যের পথে চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়, সাহিত্যের পথেই সে দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিবে, আজও তেমনই আবার অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল, দেশের দুঃখ ঘুচাইব—ইহাই যদি তাহার জীবনের আদর্শ হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের পথও ভুল পথ। অন্যান্য নানারূপ বিলাসের মত ইহাও একরূপ বিলাস।

আরে! কে, শঙ্কর নাকি?

চলন্ত ট্রাম হইতে যে ব্যক্তিটি লাফাইয়া নামিল, তাহাকে সে এ সময়ে এখানে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই।

উৎপল বম্বে হইতে কবে আসিল!

৫৫

শঙ্করের উচ্ছ্বাসহীন প্রশংসা নিপুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। নিপু বুঝিয়াছিল, ওই কয় ছত্র মামুলি সমালোচনার মূল্য কি এবং অর্থ কি! মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে মনে মনে জ্বলিতেছিল। সে জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, যখন দৈনিক কাগজগুলি শঙ্করের গুণগান করিয়া সাড়ম্বরে তাহার অভিভাষণটি বাহির করিল। অভিভাষণে যাহা ছিল, তাহা সুরুচিসঙ্গত সাহিত্যিক আলোচনা। শাশ্বত সাহিত্যের লক্ষণগুলির বিচার এবং বাংলা সাহিত্যে তাহাদের প্রকাশ লইয়া আনন্দ অথবা অভাব লইয়া দুঃখ। নিরপেক্ষ যে কোন সাহিত্যিকের নিকট অভিভাষণটি নিঃসন্দেহে উপাদেয়; কিন্তু নিপুর মনে হইল, উহা তৃতীয় শ্রেণীর চর্বিতচর্বণ। উহাতে নূতন কথা কি আছে?

মানবের ইতিহাসে যে নবযুগ সূচিত হইতেছে, রুশ দেশের জার-প্রপীড়িত জনসাধারণ সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য বিদ্রোহ করিয়া পুরাতন বিধিবিধান উলটাইয়া দিয়া যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, শঙ্করের অভিভাষণে তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। সুতরাং উহা বাজে। শাশ্বত সাহিত্যের সনাতন বুলি অনেকবার অনেক লোকের নিকট শোনা গিয়াছে, উহা শুনিবার আর প্রবৃত্তি নাই। মানবের অগ্রগতির, মানবের আধুনিকতম প্রতিভার নব জয়যাত্রার বাণী যদি শুনাইতে পার, তবেই তাহা শ্রাব্য। রুশ দেশের সহিত আমাদের দেশের মিল আছে। রুশ দেশ কৃষিপ্রধান, আমাদের দেশও কৃষিপ্রধান। তাহারাও একদিন ঠিক আমাদেরই মত দুর্দশাপন্ন ছিল। আমাদেরই মত নিরক্ষর, আমাদেরই মত রোগে অনাহারে জীর্ণ, ঋণভারে করভারে প্রপীড়িত। আমাদেরই মত তাহারা ধীরে ধীরে লয় পাইতেছিল, যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, আমাদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে সেই মন্ত্রের ধ্বনি যে কবির বীণায় ঝঙ্কৃত হইবে, সে-ই নবযুগের কবি।

ঠোঁট বাঁকাইয়া নিপু যাহাদের নিকট বক্তৃতা করিতেছিল, তাহারা সকলেই তরুণ-বয়স্ক, সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী এবং রুশসাহিত্যে রুশভিজ্ঞ। প্রায় সকলেই বেকার, সকলেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সকলেরই নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা এত অত্যুচ্চ যে, সে উচ্চতার নিকট হিমালয়ও হীন হইয়া যায়, সকলেই স্বদেশহিতৈষী এবং সকলেরই ধারণা, যাহা করিলে স্বদেশের হিত হয় তাহা কেবল তাহাদেরই জানা আছে, অপরের নয়। দেশের নিকট যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত, স্বদেশের মুক্তির জন্য যাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—ইহাদের মতে, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিহীন। নূতন যুগের নূতন প্রেরণার খবর রাখেন না। এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ির জয়গান করিয়া বেড়ান। তাঁহারা অধিকাংশই ক্যাপিটালিস্ট অথবা পেটি-বুর্জোয়া। তাঁহারা যাহা করিতেছেন অথবা বলিতেছেন, তাহা ক্যাপিটালিজ্‌ম-গন্ধী, তাহাতে সমগ্র দেশের উপকার হইবে না, তাহা মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, শ্রমিকদের অথবা কৃষকদের নয়।

তাই ইহারা নূতন করিয়া দেশকে গঠন করিতে চায়। সাহিত্য যেহেতু লোকশিক্ষার প্রধান বাহন এবং সংবাদপত্র যেহেতু জনমত গঠন করে, সেই হেতু ইহাদের সকলেই প্রায় সাহিত্য অথবা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে ব্যগ্র। ইহাদের নিজেদেরও সাহিত্য-পত্রিকা আছে, যদিও তাহার প্রচার খুব কম, কারণ লোকে যে রসের লোভে সাহিত্য-পত্রিকা কেনে, ইহাদের পত্রিকা সে রসে বঞ্চিত। ইহাদের পত্রিকা 'থিওরি' প্রচার করে, কিন্তু তাহা সাহিত্য হইয়া উঠে না। নিপুর যুগান্তকারী উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা নিপুকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছে। যে নিপুকে আত্মীয়স্বজন কেহই কোন দিন আমল দেয় নাই, হিরণদার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সম্পর্কে আসিয়াও যে কিছুতেই নিজেকে পাদপ্রদীপের সম্মুখীন করিতে পারে নাই (কোথাকার অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্কর আসিয়া যেখানে আসর জমাইয়া বসিল), সেই নিপু নিজেকে সহসা একটা দলের শীর্ষভাগে দেখিয়া মনে মনে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিল, যাহা তাহার প্রকৃত মনোভাবের বিপরীত। ভাবটা এই যে, আঃ, তোমরা আমাকে এ কি বিপদে ফেলিলে! আমি তো এসব চাই না, আমি চাই নির্জনে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া মন্ত্রের সাধনা করিতে। আমি সামান্য কেরানী বটে, কিন্তু আমি তপস্বী।

শঙ্কর সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিল, লোকনাথবাবুর মত একটা জ্ঞানী লোক শঙ্করবাবুর পিছনে আছেন ব'লেই ওঁর সাহিত্য-সমাজে যা কিছু প্রতিপত্তি। আর একজন বলিল, কাল কিন্তু লোকনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি দেখলাম, শঙ্করের উপর একটু চটেছেন, বেশ একটু অপ্রসন্ন মনে হ'ল।

তাই নাকি?

সংবাদটাকে নিপু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

তা হ'লে চল না, লোকনাথবাবুকে দিয়েই শঙ্করের অভিভাষণের একটা স্কেদিং সমালোচনা লেখানো যাক। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—

একজন ভক্ত বলিল, লোকনাথবাবু কি আপনার মত লিখতে পারবেন?

আমি নিজের নাম দিয়ে ওটা আর লিখতে চাই না।

সদলবলে সকলে লোকনাথবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল। লোকনাথবাবু বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, নিপুকে দেখিয়া সোচ্ছাসে বলিয়া উঠিলেন, শঙ্করবাবুর অভিভাষণটা পড়েছেন? চমৎকার হয়েছে। আমি যাচ্ছি তাকে অভিনন্দন জানাতে, এতটা আমি আশা করি নি।

নিপুকে হতাশ হইতে হইল। সদলবলে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যাবেন আপনি?

না। আমার অন্য কাজ আছে একটু এখন।

আমি চললাম তবে।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শঙ্করের অভিভাষণ পড়িয়া সাহিত্য-প্রেমিক লোকনাথ ঘোষালের মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল।

নিপু সেই ছোকরাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ওঁরা সবাই পেটি-বুর্জোয়া। আমাদের সঙ্গে ওঁদের সুর মিলতেই পারে না।

ঠিক হইল, অভিভাষণের স্কেদিং সমালোচনা নিপুই লিখিবে, কিন্তু বেনামীতে। স্কেদিং সমালোচনাটা লিখিতে বসিয়া নিপু কিন্তু প্রথমটা একটু বিপদে পড়িল। শঙ্করের অভিভাষণটা পুনরায় আগাগোড়া পড়িয়া তাহার মনে হইল, কিসের বিরুদ্ধে সে সমালোচনা করিবে! শঙ্কর যাহা লিখিয়াছে, তাহা এতই যুক্তিযুক্ত, তাহার ভাষা এতই জোরালো এবং ভঙ্গী এমনই চিত্তাকর্ষক যে, তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে ভদ্র অন্তঃকরণ স্বভাবতই একটু সঙ্কুচিত হয়। হাজার হোক, সে একদিন 'ক্ষত্রিয়'-দলের একজন সমঝদার সভ্য ছিল তো, সাহিত্যস্রষ্টা না হইলেও অন্তরের অন্তস্তলে সে সুসাহিত্যের রসগ্রাহী, মুখে তাহা স্বীকার করুক আর না করুক।

অনেকক্ষণ সে কলম হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবন্ধ ত্যাগ করিয়া তাহার চিন্তা অতীতে ফিরিয়া গেল। হিরণদাকে মনে পড়িল। বড়লোকের খামখেয়ালী ছেলে হিরণদা, পিতার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া নানারূপ খেয়াল চরিতার্থ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, এবং তাহারা (সে নিজেও তাহাদের মধ্যে একজন) ওই উচ্ছৃঙ্খল

বড়লোকের ছেলেটার তোষামোদ করিবার জন্য বিদূষক-বেশে তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিল। সমঝদার হিসাবে ততটা নয়, যতটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায়। হিরণদা দিলদরিয়া লোক ছিলেন। কখনও কাহাকেও এক টুকরা রুটি ছুঁড়িয়া দিয়া, কখনও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া, এমন কি কখনও কাহারও মদের খরচ যোগাইয়াও তিনি তাহাদের অনেককে মাঝে মাঝে অনুগৃহীত করিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন শঙ্করকে। কারণ, শঙ্করই সর্বাপেক্ষা বেশি পদলেহী ছিল। লেখা-ব্যাপারে যতটা না হোক, লেহন-ব্যাপারে সে সত্যই একজন বড় আর্টিস্ট। বেশি কথা না বলিয়াও সর্বাপেক্ষা বেশি খোশামোদ করিতে পারে, তাহার গালাগালির মধ্যেও খোশামোদ প্রচ্ছন্ন থাকে। শাঁসালো ব্যক্তির খোশামোদ করাই তাহার পেশা। ইদানীং শঙ্কর যেসব পুস্তক অথবা প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিল, তাহা নিপুর মনে পড়িতে লাগিল। প্রত্যেকটি সমালোচনায় খোশামোদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, এমন কি যাহাদের পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছে, তাহাদেরও এক অদ্ভুত উপায়ে খোশামোদই করিয়াছে, তাহাদের অন্তরঙ্গ হিতৈষী সাজিয়া কটুভাষণের অন্তরালেই তাহাদের তুষ্টিবিধান করিতে চাহিয়াছে। নিপুর বইটার যে এই ছদ্ম-প্রশংসা করিয়াছে, ইহা তাহার ওই হীন মনোবৃত্তিরই পরিচয়। ভালই যদি না লাগিয়াছিল, সোজা ভাষায় গালাগালি দিলেই পারিত, তাহাতে বরং ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত। কিন্তু এ কি!

সহসা নিপুর মনে হইল, ইহাই পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, ইহারা ক্ষমতাবানের খোশামোদ করিয়া অক্ষমের উপর তাহার প্রতিশোধ লয়। খোশামোদ করিতে পারে না বলিয়া নিপুর এই দুর্দশা।

সহসা তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল।

সে লিখিতে শুরু করিল।

উৎপল ও সুরমার সহিত অনেক দিন পরে দেখা হইয়া শঙ্কর যেন তাহার পূর্বজীবনের স্বাদ খানিকটা ফিরিয়া পাইল, যে পূর্বজীবনে সুরমার সান্নিধ্যে তাহার মনে প্রথম রঙ ধরিয়াছিল, রিনিকে ঘিরিয়া প্রথম প্রণয়ের উদ্বোধন হইয়াছিল, মিষ্টিদিদির মাদকতায় প্রথম পদস্খলন ঘটিয়াছিল, কলিকাতা শহরের প্রথম স্পর্শে যে জীবন মাধুর্য-আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেই পূর্বজীবনের অনুভূতি তাহার মনে আজ আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল স্মিতমুখী সুরমাকে দেখিয়া। আজ যেন শঙ্কর নূতন করিয়া আবার উপলব্ধি করিল, বিংশ শতাব্দীর যে প্রকাশ আমরা নারী-প্রগতিতে কামনা করি, যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখিয়া আমরা আমাদের মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাই, তাহা যেন শোভনভাবে সার্থক হইয়াছে সুরমা-চরিত্রে। সুরমা সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনীর কন্যা, ধনীর বধূ। কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোনরূপ উগ্রতা নাই, তাহা অতিশয় বিনম্র ও সুমধুর। কথায় বার্তায়, আকারে ইঙ্গিতে সে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয় না যে, অধুনা-প্রকাশিত বিদেশী পুস্তক সে সর্বদাই পড়িয়া থাকে অথবা তাহাদের চারখানা মোটরকার আছে। অথচ অতি-বিনয়ের অভিনয়ও তাহার নাই। তাহার এই সহজ সপ্রতিভ সুমার্জিত রূপ শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে, তাহাতে কোনরূপ আড়ষ্টতাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, সংযম আছে। সে পরপুরুষের সঙ্গে মেশে, আলাপ করে, হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দেয়; কিন্তু তাহার চরিত্রে কোথায় কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা কিছুতেই শোভনতার সীমারেখা অতিক্রম করে না। শঙ্করের কবিতা উপন্যাস গল্প লইয়া সে অনেক আলোচনা করিল। নীরা বসাকের মত সোচ্ছ্বাসে নয়, নিপুদার মত অবজ্ঞাভরেও নয়, যাহা বলিল, সবিনয় শ্রদ্ধাসহকারেই বলিল। তাহাতে বাচালতা নাই, নিজের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা নাই, কিন্তু আন্তরিকতা আছে। সব লেখার প্রশংসা করিল না, কিন্তু যেগুলির অপ্রশংসা করিল, তাহা অন্তরকে ব্যথিত করে না; কারণ তাহা ঠিক নিন্দা নয়, তাহা যেন 'আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই' অথবা 'আমার রুচি একটু আলাদা রকমের' জাতীয় মন্তব্য।

উৎপলের বয়স কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু মন বদলায় নাই। সে এখনও ঠিক তেমনই দুষ্টবুদ্ধি, তেমনই খামখেয়ালী আছে। আগের মতই এখনও সে নূতন কিছু করিবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। দুই বৎসর কাগজ চালাইয়া শঙ্করের মত সেও নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, সাহিত্য-ব্যবসা ভদ্রলোকের কর্ম নহে। এ দেশে ভদ্রভাবে সাহিত্য-ব্যবসা করিতে গেলে দেশটাকে সর্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে হইবে। জমি প্রস্তুত না করিয়া বীজ বপন করা মূর্খতারই নামান্তর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি ক'রে জমি প্রস্তুত করবে তুমি?

শিক্ষা দিয়ে।

কোথায়, কাকে শিক্ষা দেবে?

ও, তুই বুঝি শুনিস নি, আমি আমাদের গ্রামের জমিদারিটা কিনে ফেলেছি? সেখানেই ভাবছি—

কিনে ফেলেছিস? রাজবল্লভবাবুরা কোথা গেলেন?

কলকাতা চ'লে এসেছেন বোধ হয়। আজকাল অধিকাংশ জমিদারই তো কলকাতায় চ'লে আসছেন। পাড়াগাঁ আর ভাল লাগছে না তাঁদের।

কি ক'রে কিনলি তুই?

কেনারামবাবুর মারফৎ।

শঙ্কর এবং উৎপল এক গ্রামেরই ছেলে। উৎপল গ্রামের জমিদার হইয়াছে! সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

উৎপল সোৎসাহে বলিতে লাগিল, রাজবল্লভবাবুর জমিদারি শুধু আমাদের গ্রামখানি নিয়েই নয়, পাশাপাশি দশখানা গ্রাম আছে। আমি ভাবছি, সমস্তটা নিয়ে একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করব। শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি—সব রকমের যাতে উন্নতি হয়, তার চেষ্টা করার ইচ্ছে আছে।

অনেক টাকার দরকার তাতে।

অনেক টাকা আমার আছে। শ্বশুর মশাই যে টাকা আমায় দিয়েছিলেন, তার খানিকটা অবশ্য আমি জার্নালিজ্‌ম করতে গিয়ে নষ্ট করেছি—খুব বেশি অবশ্য নয়, হাজার দশেক; কিন্তু বাকিটা শ্বশুর মশাইয়ের পরামর্শমত ব্যবসাতে খাটিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। টাকার জন্যে আটকাবে না, তা

ছাড়া আমি হয়তো প্রথমে একখানা গ্রাম নিয়ে আরম্ভ করব, কেনারামবাবুকে আমার প্ল্যান লিখেও পাঠিয়েছি।

তিনি—

শঙ্কর একটু হাসিল।

তিনি ছাড়া গ্রামে আর তো কোন বুদ্ধিমান লোকই দেখতে পাই না। তাঁকে দিয়ে যে চলবে না, তা বুঝতে পারছি, ভাল লোকের চেষ্টাতেও আছি; দেখি যদি—

সহসা উৎপল থামিয়া গেল। খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তুই যাবি? তোকে বলতে ভয় করে। তোর আত্মসম্মান যে রকম প্রখর, হয়তো হঠাৎ চ'টে উঠবি। চল্ না, দুজনে মিলে নিজেদের গ্রামটার উন্নতি করা যাক। তোর কথার সুরে মনে হচ্ছে, আমার মতন তোরও ভুল ভেঙেছে। সাহিত্য-টাহিত্য ক'রে কিছু হবে না এখন এ দেশের। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।

তুই কি তোর অধীনে চাকরি নিয়ে যেতে বলছিস আমাকে?

তা ঠিক বলছি না, আমি তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবেও থাকতে পার। জ্যাঠামশাই যা রেখে গেছেন, তাতে তোমার স্বচ্ছন্দে চ'লে যাওয়া উচিত।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। বাবার উইলের কথা সে উৎপলকে বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল করালীচরণকে। করালীচরণের আগমন ও নির্গমন বার্তা সে জানিত না। ভন্টুর সহিত তাহার দেখাই হয় নাই। এই সূত্রে তাহার মনে পড়িল, ভন্টুর বউদিদি কাল আপিসে শন্টুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি একবার তাহার সাক্ষাৎ চান। কাল নানা গোলমালে যাওয়া হয় নাই। সময় করিয়া একবার যাইতেই হইবে। শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠছিস? আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখিস একটু।

আচ্ছা।

উপন্যাসে যাহা লিখিলে সমালোচকরা নাসা কুঞ্চিত করিয়া মনে করেন য, আর্ট ক্ষুণ্ণ হইল, লেখক যেন নিজের সুবিধার জন্য জোর করিয়া ঘটনাটা ়ই স্থানে ঘটাইয়া দিলেন; জীবনে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সময় ত্য সত্যই তাহা ঘটে। শঙ্করের জীবনে ইতিপূর্বে এ রকম একাধিকবার টিয়াছে, আবার ঘটিল।

শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার বাবার উইলের কথাই ভাবিতে ভাবিতে থ চলিতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, ফুটপাথের এক ধারে মোস্তাক সিয়া আছে। তাহার বগলে একগাদা কাগজ, এক কানে জবাফুল, অন্য ানে বিড়ি, নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া শাঁক-আলু ভক্ষণ করিতেছে। মোস্তাককে দখিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল—হয়তো করালীচরণের খবর এ বলিতে পারে। ন্তত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

মোস্তাক, কি হচ্ছে এখানে ?

মোস্তাক শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট রিল। বগল হইতে কাগজের গাদা ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল।

আহা, তোমার সব প'ড়ে গেল যে! দাঁড়াও, তুলে দিচ্ছি।

তুলিয়া দিতে গিয়া কিন্তু যাহা তাহার হাতে পড়িল, তাহা যে এখানে ভাবে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তাহার বাবার ইল এবং করালীচরণকে লেখা তাঁহার সেই চিঠিখানা।

এ তুমি কোথা থেকে পেলে ?

মোস্তাক তাহার কর্তব্য সমাপন করিয়া পুনরায় শাঁক-আলুতে মন িয়াছিল। কোনও জবাব দিল না।

বক্‌সি মশাই কি ফিরেছেন ?

এই কথায় মোস্তাক হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া দিল।

আমি এই কাগজ দুখানা নিয়ে যাই, কেমন ?

মোস্তাক আপত্তি করিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শঙ্কর ভনুটুর

বাড়ি যাইতেছিল, হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া সে ঝামাপুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইল, করালীচরণের খোঁজটা লইয়া যাওয়াই ভাল।

গলিটা ধোঁয়ায় ধুলায় আচ্ছন্ন। পানের দোকানের সামনে একজন কাবুলীওয়ালা একজন পাওনাদারকে লাঞ্ছিত করিতেছে, কয়েকজন লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ঋণগ্রস্ত লোকটার দুর্দশা দেখিতেছে। কাবুলীওয়ালার টকটকে লাল মখমলের জরি-বসানো ওয়েস্টকোটটা স্বল্পালোকেই চকচক করিতেছে। তাহার অন্তরের লোলুপতা নিষ্ঠুরতা যেন উহাতেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে শঙ্কর দেখিতে পাইল, করালীচরণের বাসার সম্মুখে আলো জ্বলিতেছে, কে যেন দাঁড়াইয়াও আছে। কাছে গিয়া দেখিল, করালীচরণ নয়—একটি বারবনিতা, সাজসজ্জা করিয়া খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করিতেছে। শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—মুখটা যেন চেনা-চেনা বলিয়া মনে হইতেছে। হাঁ, চেনাই তো! এ যে উষা—মুক্তোর প্রতিবেশিনী উষা। কেরানীবাগান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানে ঘর-ভাড়া করিয়াছে নাকি? করালীচরণ কোথায় গেল?

আসুন বাবু, অনেকদিন পরে যে, পথ ভুলে নাকি?

উষাও শঙ্করকে চিনিতে পারিয়াছিল, একমুখ হাসিয়া সম্বর্ধনা করিল শঙ্কর কিন্তু আর দাঁড়াইল না, দাঁড়াইতে পারিল না। সেই উষার হাসি আজ এত বীভৎস!

শঙ্কর প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩৮

বউদিদি ঘরে খিল দিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছিলেন। অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছিলেন—তুমি আর দেরি ক'রো না, তাড়াতাড়ি চ'লে এসে কাজে জয়েন কর। সংসারে খরচ দিন দিন বাড়ছে। ঠাকুরপো এত খরচ একা আর চালাতে পারছে না। কাল তার শ্বশুর এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরপোকে নাকি বলেছেন যে, তিনি না হয় মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য

করবেন, যতদিন না তুমি চেঞ্জ থেকে ফিরে আস। ঠাকুরপো একটু দোনোমোনো করছিল, আমি কিন্তু তাতে মত দিলাম না। কুটুমের কাছ থেকে এ ভাবে টাকা নেওয়াটা কি ভাল দেখায়! কিন্তু এটাও ঠিক যে, ঠাকুরপো বেচারা একা আর পেরে উঠছে না। তুমি আর ওখানে থেকো না, চ'লে এস। এখানেই নিয়ম ক'রে থাকলে শরীর সেরে যাবে। নন্টুরও কদিন থেকে রোজ জ্বর আসছে সন্ধ্যেবেলা, কুইনিন খেয়ে গেল না, ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওরও নাকি বুকের দোষ জন্মাচ্ছে। ভগবান কপালে কি যে লিখেছেন, জানি না।

বউদি!

বউদিদি তাড়াতাড়ি কলম নামাইয়া খাতার তলায় চিঠিটা চাপা দিলেন, গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইলেন, তাহার পর খিল খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

শঙ্কর ঠাকুরপো নাকি? এস, এত রাত্রে যে?

নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। ভন্টু ঘুমিয়েছে নাকি?

সে শ্বশুর-বাড়ি গেছে ইন্দুকে নিয়ে, জামাই-ষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে।

ও। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো?

ব'স, বলছি, দালানেই এস।

বাকুর ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া শঙ্কর বলিল, বাকুও আজ বড্ড শিগগির শুয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

ওঁর শরীরটা খুব খারাপ। শোথটা কিছুতেই কমছে না।

অন্য সময় হইলে হয়তো শঙ্কর বাকুর অসুখের বিষয়ে দুই-চারিটি প্রশ্ন করিত। এখন কিন্তু তাহার মনের অবস্থা এরূপ যে, এ সম্বন্ধে সে কিছুই বলিল না। মোক্তাকের নিকট হইতে বাবার উইলের যে নকলটা সে পাইয়াছিল, তাহা সে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। বাবার আসল উইলটা দেশে দেরাজের মধ্যে আছে। উইলের কোন সাক্ষী নাই, উইল রেজেস্টারি করা নাই। সেটাকেও অবলুপ্ত করিয়া দিলে উইলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতেই পারিবে না। কিন্তু শঙ্করের মনে

হইতেছিল, কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলেই কি উইল নষ্ট হইয়া যায়? আইনত যাহাই হউক, ধর্মত বাবার বিষয় সে কি লইতে পারে? বাবা তো তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই। সে যদি কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে অমিয়াই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে, সে নয়—ইহাই তাহার বাবার অন্তিম ইচ্ছা।

ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

শঙ্করকে একটি মোড়া আগাইয়া দিয়া বউদিদি নিজে একখানি আসন টানিয়া বসিলেন। শঙ্কর হঠাৎ যেন বউদিদি ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হইল। মোড়াতে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, বাবাজী কোথায়?

তিনি আজ চ'লে গেছেন।

চ'লে গেছেন? কোথা গেলেন?

তা জানি না। ঠাকুরপোর সঙ্গে আজ সকালে বাইরের ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ কি যে কথা হ'ল, তাও জানি না। ঠাকুরপো আপিস চ'লে যাবার পর উনিও নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন দেখলাম।

কি লেখা আছে তাতে?

মুচকি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, মাত্র একটি লাইন—আমার আর ভাল লাগছে না, চললাম।

বউদিদি চুপ করিয়া গেলেন। একটা বিষাদের ম্লান ছায়ায় তাঁহার হাসি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বউদিদি বলিলেন, ঠাকুরপোকে একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে তুমি? তুমিই যদি পার, আমি তো ব'লে ব'লে হার মেনেছি।

কি কথা?

ইন্দুকে নিয়ে ও আলাদা বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকুক। এমন ক'রে আমাদের সব্বাইকে নিয়ে ও আর পেরে উঠছে না। ওর মুখের পানে

চাইলে কষ্ট হয় আমার। আজকাল জলখাবার খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের সব্বাইকে জড়িয়ে কষ্ট পাবার কি দরকার ওর? উনি এসে কাজে জয়েন করুন, তা হ'লেই আমাদের এক রকম ক'রে চ'লে যাবে। 'আমার কথায় ও মোটে কান দেয় না।

শঙ্কর ইহাও প্রত্যাশা করে নাই। ভন্‌টুকে ও বউদিদিকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিতে সে অভ্যস্ত নহে। বউদিদি এ কি বলিতেছেন!

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন, কি, হ'ল কি?

বউদিদি সবিস্তার সব বলিতে লাগিলেন। ইন্দু অথবা ভন্‌টু কাহারও দোষ দিলেন না, কিন্তু অবস্থা যাহা সত্যই দাঁড়াইয়াছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

৩৭

শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, লেটার-বক্সের ভিতর একখানা মাসিক-পত্রিকা রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল 'মজদুর-দর্পণ'। উলটাইতেই চোখে পড়িল, তাহার সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কে কি লিখিল? নিরতিশয় ক্লান্তি সত্ত্বেও সে নীচের ঘরে বসিয়া সাগ্রহে প্রবন্ধটি পড়িতে শুরু করিয়া দিল, নিজের সম্বন্ধে এত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধে কে কি লিখিয়াছে, তাহা অবিলম্বে জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। পড়িতে পড়িতে কিন্তু তাহার সমস্ত মন ক্ষোভে গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য নাম দেওয়া থাকিলেও নিপুদার লেখা চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই ঈর্ষা-তিক্ত যুক্তি, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ছলে সকলকে হীন করিয়া দিবার এই প্রয়াস, সহজ ভাবকে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার এই বক্র ভঙ্গী—নিপুদা ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না। সে যেন মানসপটে নিপুদার মুখখানা দেখিতে পাইল। গালের হাড় উঁচু, চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা, গালে কপালে মেচেতার দাগ, ঠোঁট বাঁকাইয়া কথা

বলিবার ভঙ্গী। গ্রন্থকীট লোকটা জীবনে কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে 'মজদুর'দের উদ্ধার করিবার ছুতায় যেখানে-সেখানে নিজেকে জাহির করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া শঙ্কর ঘাড় ফিরাইল। অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

তুমি এত রাত ক'রে ফিরলে?

কেন, কি হয়েছে?

নিতাই ঠাকুরপো—

অমিয়া আর বলিতে পারিল না, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট শঙ্করের কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি করেছে নিতাই?

অনেক জেরার পর শঙ্কর জানিতে পারিল, চাকরটা সন্ধ্যার সময় ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অমিয়া বাড়িতে একা ছিল। নিতাই কোথা হইতে মদ খাইয়া আসিয়া হঠাৎ তাহাকে পিছন দিক হইতে জাপটাইয়া ধরে। অনেক ধস্তাধস্তির পর নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে পাশের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া ছিল। নিতাই টেবিলের ড্রয়ার হইতে চাবির রিং লইয়া আলমারি খুলিয়া তাহার গহনার বাক্সটা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শঙ্কর হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। সাহিত্যের স্বপ্ন তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর সে থাকিতে পারিবে না।

৪০

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে উৎপলের সহিত দেখা করিল। বলিল যে, সে তাহার সহিত গ্রামেই ফিরিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টাতে সে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটি শর্তে।

শর্তটা কি?

আমি তোমার অধীনে চাকরি করব।

বেশ, আমার কোনও আপত্তি নেই তাতে। একজন ভাল লোক তো আমি খুঁজছিই।

কিন্তু আসল শর্তটা হচ্ছে, কথাটা গোপন রাখতে হবে। তুমি এবং আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানবে না।

তা হ'লেই তো মুশকিলে ফেললে দেখছি। তৃতীয় একটি ব্যক্তির নিকট আমি ইতিপূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তার কাছে কোন কিছুই গোপন রাখব না।

উৎপল মুচকি হাসিল।

সুরমা। ওর কাছে আমি সব বলি, এমন কি নিজের দুষ্কৃতি পর্যন্ত। তবে ও একটি লোহার সিন্দুকবিশেষ, একবার যা প্রবেশ করবে, তা আর সহজে বেরুবে না। যদি ইচ্ছে কর, ওকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার।

শঙ্কর ক্ষণকাল ভাবিল। তাহার পর বলিল, বেশ। এইবার আমি উঠি তা হ'লে, ওই ঠিক রইল।

মাইনে কত নেবে, তা বললে না?

সে তুমি ঠিক কর। যা দেবে, তাতেই আমি রাজী। তবে আর একটা কথা আছে, সেটাও ব'লে রাখা ভাল। মাইনে আমি কম নিতেও রাজী আছি, কিন্তু আমার কাজে তুমি যখন-তখন বাধা দিতে পারবে না। তা হ'লে কিন্তু বনবে না ভাই।

উৎপল হাসিয়া বলিল, বাধা দিতে হ'লে যে উদ্যম প্রয়োজন, তা যদি আমার থাকত, তা হ'লে আমি অন্য লোক খুঁজতাম না, নিজেই সব করতাম। সুতরাং সে বিষয়েও তুমি নির্ভয় থাকতে পার।

৪১

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ছাড়িতেছিল।

জিনিসপত্রসহ অমিয়াকে একটা গাড়িতে চড়াইয়া দিয়া শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছিল। গতকল্য উৎপল সপরিবারে চলিয়া গিয়াছে, আজ সে যাইতেছে। সকলের সঙ্গেই তাহার প্রায় দেখা হইয়াছে, কেবল ভন্টুর সঙ্গে হয় নাই। বউদিদি ভন্টুকে যাহা বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনুক্ত রহিয়াছে। কাল ভন্টুকে তাহার আপিসে ফোন করিয়া জানাইয়াছে যে, সে বোধ হয় চিরদিনের মত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে; বাড়িতে গিয়া তাহার সহিত দেখা হয় নাই, বউদিদিকেও সে বলিয়া আসে নাই যে, হঠাৎ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সে গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে, কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল, বলিতে পারিল না। অথচ ইহাই বলিতে সে গিয়াছিল। ভন্টু যদি স্টেশনে আসিয়া তাহার সহিত দেখা না করে, তাহা হইলে হয়তো আর দেখাই হইবে না। আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে তাহার সঙ্গে। শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ভন্টুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।···সিগারেট পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল, কিন্তু ভন্টু আসিল না। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে চুনচুন আসিয়া হাজির হইল। চুনচুনের সহিতও সে দেখা করিয়া আসে নাই। শঙ্কর প্রত্যাশা করিতে লাগিল যে, চুনচুনই আসিয়া প্রথমে কথা কহিবে, কিন্তু চুনচুন সেসব কিছুই করিল না। অন্য দিকে চাহিতে চাহিতে, যেন সে শঙ্করকে দেখিতেই পায় নাই এমনই ভাবে, প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গেল। শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ডাকিল। মনে হইল, চুনচুন যেন ডাকটাও শুনিতে পাইল না। সামনের প্ল্যাটফর্মে আর একটা প্রায়-খালি প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল—বোধ হয় কোন লোকাল ট্রেন—তাহারই একটা কামরায় গিয়া চুনচুন উঠিয়া পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, হয়তো কোথাও যাইবে, আমাকে দেখিতে পাইল না। আগাইয়া গিয়া আলাপ করিবে কি না, ভাবিতেছে, এমন সময় ভন্টুর ভাইপো শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভন্‌টু কোথায় ?

কাকা এখানে আসবেন ব'লেই বেরিয়েছিলেন বাইক ক'রে। রাস্তায় হঠাৎ একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি প'ড়ে গেছেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে খবরটা দিতে।

খুব বেশি লেগেছে নাকি ?

পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।

ও।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাবার সময় তার সঙ্গে আর দেখাটা হ'ল না দেখছি। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি গিয়েই চিঠি লিখব, কেমন থাকে খবরটা দিও আমাকে।

আচ্ছা।

প্রণাম করিয়া শন্‌টু চলিয়া গেল। শঙ্কর হাতঘড়িটা একবার দেখিল, ট্রেন ছাড়িতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। অমিয়াকে বলিল, তুমি ব'স, আমি আসছি। শঙ্কর দ্রুতপদে চলিয়া গেল। স্টেশনে সকলের ব্যবহারের জন্য যে ফোন আছে, তাহারই সহায়তায় মেডিকেল কলেজ ইমার্জেন্সি রুমের একটি ডাক্তারের সহিত সে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

ভন্‌টু নামে আমার একজন বন্ধু এখুনি বাইক থেকে প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙে আপনাদের ওখানে গেছে। তাঁকে যদি দয়া ক'রে একটু ব'লে দেন যে, শঙ্করবাবু ফোন করেছিলেন। নিতান্ত দরকারে আমাকে আজ চ'লে যেতে হচ্ছে, জিনিসপত্র সব ট্রেনে তুলে দিয়েছি, তা না হ'লে আমি এখনি তাকে দেখতে যেতাম। ব'লে দিন যে, আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ফোন করছি। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি যদি ব'লে দেন, বড় ভাল হয়। মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে ? ও, আচ্ছা, উঠলে বলবেন। আচ্ছা, থ্যাঙ্ক্‌স্‌।

ফোনটা করিয়া শঙ্কর যেন খানিকটা তৃপ্তি লাভ করিল। কিছু করিতে না পারিয়া সে যেন অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই শঙ্কর একরূপ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে চুনচুন দাঁড়াইয়া

আছে। শঙ্কর কিছু বলিবার পূর্বেই সে হেঁট হইয়া শঙ্করকে প্রণাম করিল। ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে, আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর তোমার? ভাল আছ তো?

চুনচুন স্মিতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না, ট্রেন চলিয়া গেল।

৪২

গ্রামে যখন শঙ্কর পৌঁছিল, তখন প্রভাত হইতেছে। সে পূর্বে কোনও খবর দেয় নাই। সব জিনিসপত্র লইয়া এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল কেন, তাহা শঙ্করের মা বুঝিতে পারিলেন না; সবিস্ময়ে শুষ্কমুখে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

তুই হঠাৎ এসে পড়লি যে?

শহর আর ভাল লাগছে না, তোমার কাছেই থাকব এবার ঠিক করেছি।

আমার কাছে থাকবি?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা তিনি আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমি রাক্ষসী, তোর ভাইকে খেয়েছি, বাপকে খেয়েছি, তোকেও খেয়ে ফেলব—পালা, পালা, পালা আমার কাছ থেকে।

সেই দিন রাত্রেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আবার পাগল হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, এখানে ঠিক সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়, রাঁচি পাঠানো উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

প্রভাত হইতেছে, বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে। শঙ্করের ঘুম এখনও ভাঙে নাই, কিন্তু দুই বৎসরের শিশু-কন্যাটির ঘুম ভাঙিয়াছে এবং সে বুকের উপর চড়িয়া চোখের ভিতর ছোট ছোট আঙুল ঢুকাইয়া ডাকিতেছে, বাবা, ওত, ও বাবা, ওত।

শঙ্কর হাসিয়া চোখ খুলিল। অমিয়া আগেই উঠিয়া রান্নাঘরে আঁচ দিতে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিল। মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, মেয়ের বেলায় হাসা হচ্ছে, আর আমি ওঠাতে গেলে ধমক খেয়ে মরি।

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া চোখ বুঝিয়া আবার পাশ ফিরিল।

পাশ ফিরে শুচ্ছ যে, তোমার আজ ছবিগঞ্জে যাবার কথা নয়?

মনে আছে।

কন্যা ডাকিল, বাবা, ওত।

শঙ্কর উঠিয়া বসিল। সত্যই তাহার অনেক কাজ, শুইয়া থাকিলে চলিবে না। ছবিগঞ্জে আজ একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা। তা ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে। বাহিরের ঘরে হয়তো ইতিমধ্যেই জনসমাগম হইয়াছে। কন্যা গলা জড়াইয়া গালে গাল রাখিয়া শুইল। অমিয়া চা করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

ছাড়, এবার আমাকে উঠতে হবে।

না।

ভারি আদুরে দুষ্টু হয়েছ তুমি।

তুমি দুত্তু।

আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্করের মনে হইল, এমনভাবে তাহাকে আর কেহ বোধ হয় কখনও বাঁধে নাই। জীবনে অনেকের বাহুপাশে সে বাঁধা পড়িয়াছে, কিন্তু এ নিগড়ের নিকট সেসব অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহারই নিজের অন্তরের নিগূঢ় কামনা, যাহা বারম্বার বহু নরনারীকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পারে নাই, তাহাই যেন তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল, বাহিরের ঘরে কেনারামবাবু কয়েকজন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন।

চল, যাচ্ছি। একে নাও।

না, দাব না।

যাও, লক্ষ্মীটি।

না—না—না।

জোর করিয়া চাকরের কোলে তাহাকে দিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে কেনারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে আসিয়াছিল ফরিদ এবং কারু। উভয়েরই উদ্দেশ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করা। কেনারাম চক্রবর্তী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি, সুপারিশ করিতে আসিয়াছেন। উৎপলের এবং কয়েকজন বর্ধিষ্ণু প্রজার টাকায় গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। গভর্মেণ্টও কিছু টাকা তাহাতে দিয়াছেন—ঋণস্বরূপই দিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য—মহাজনদের হাত হইতে গরিব প্রজাদের রক্ষা করা। গরিব প্রজারা মহাজনদের নিকট হইতে অতিশয় চড়া সুদে টাকা কর্জ করিয়া সর্বস্বান্ত হয়। এই ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দেয় এবং ফসল উঠিলে কিস্তিতে কিস্তিতে তাহা শোধ করিয়া লয়। কেনারাম চক্রবর্তীর কর্তব্য—অনুসন্ধান করিয়া দেখা, যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা মারা না পড়ে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, ঋণপ্রার্থীর বিষয়সম্পত্তি এমন আছে কি না, যাহা হইতে টাকা উদ্ধার হইতে পারে এবং লোকটা বিশ্বাসযোগ্য কি না, টাকা লইয়া সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না! কেনারামবাবু ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের নায়েব, এ অঞ্চলে সমস্ত প্রজার প্রকৃত অবস্থা তাঁহার জানিবার কথা, সুতরাং তাঁহাকেই

সেক্রেটারি করা হইয়াছে। শঙ্কর অবশ্য সর্বময় কর্তা। তাহার অনুমতি ছাড়া কিছুই হইবে না, ইহা কেনারামবাবুর সম্মতিক্রমেই উৎপল নির্ধারিত করিয়াছে।

কেনারাম চক্রবর্তী যদিও সারাজীবন নায়েবি করিয়া কাটাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে নায়েব বলিয়া মনে হয় না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া মনে হয়। হাব-ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদে কথায়-বার্তায় তাঁহার যে মার্জিত রূপটি বিচ্ছুরিত হয়, তাহা সম্ভ্রম-উদ্রেককারী। তাঁহার ঢিলা-হাতা এণ্ডির পাঞ্জাবি, ধবধবে সাদা বাঁধানো দাঁত, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে বুদ্ধিদীপ্ত গাম্ভীর্য, অতি-আধুনিক বুকনি-সমন্বিত আলাপ—সমস্ত মিলিয়া এমন একটা সুষ্ঠু প্রকাশ যে, ভিতরের আসল মানুষটিকে চিনিতে দেরি লাগে, অনেক সময় চেনাই যায় না। কেনারামবাবু শঙ্করের পিতৃবন্ধু, সুতরাং শঙ্কর তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। উৎপলও দূর হইতে তাঁহাকে যতটা তুচ্ছ করিয়াছিল, নিকটে আসিয়া দেখিল, তিনি ততটা উপেক্ষণীয় নহেন ; এমন কি এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার এই পল্লী-উন্নয়ন-চেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং একটা বড় বিভাগের শীর্ষদেশে তাঁহাকে স্থাপন করিতে সে ইতস্তত করিল না। কেনারামবাবু এ ব্যাপারে প্রথমে কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম লইতে স্বীকৃতই হন নাই। তাঁহার ভাবটা ছিল, তোমরা ছেলে-ছোকরার দল, দেশের কাজ করিতে চাহিতেছে, এ তো বেশ ভাল কথা, তোমরা নিজেদের নিয়মে নিজেদের বুদ্ধি অনুসারেই চল না—আমাদের মত বুড়াকে আবার ওসবের মধ্যে টানিতে চাও কেন? উৎপলের অনুরোধেই তিনি যেন অবশেষে খানিকটা অনিচ্ছাসহকারে এবং খানিকটা আবদারের খাতিরে শঙ্করের অধীনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি হইতে রাজী হইয়াছেন।

শঙ্কর বাহিরে আসিতেই কেনারামবাবু বলিলেন, দুটো গরিব প্রজাকে টাকা ধার দিতে হবে, তারা এসেছে, তোমার যা জিজ্ঞেস করবার করতে পার।

আমি আর কি জিজ্ঞেস করব? আপনি যখন এনেছেন—

কেনারাম স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার এটা কর্তব্য ব'লেই বলছি।

আমি কি আর আপনার চেয়ে ভাল বুঝি? কত টাকা চায়?

প্রত্যেকেই চায় হাজার খানেক ক'রে। দেবে কি না ভেবে দেখ। ফরিদের দশ বিঘে জমি আছে, কাল্লুর আছে আট বিঘে। এ ছাড়া বাস্তুভিটেও আছে অবশ্য দুজনের।

বেশ তো, আপনি যদি ভাল বোঝেন—

ভালমন্দ বোঝবার ভার তোমার, তুমিই ফাইনাল অথরিটি—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। কেনারামবাবুও চুপ করিয়া রহিলেন, কেবল তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে কৌতুকপূর্ণ একটা নীরব হাস্য যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। চতুর দাবা-খেলোয়াড় চাল আগাইয়া দিয়া যেমনভাবে বিপক্ষের মুখের দিকে চায় অনেকটা তেমনিভাবে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, বেশ তো, দেওয়া যাক। গরিব প্রজাদের উপকারের জন্যেই তো ব্যাঙ্ক।

কথাটা লুফিয়া লইয়া কেনারাম বলিলেন, উপকার কথাটাই যদি ব্যবহার করছ, তা হ'লে বেশি কড়াক্কড়ি করাটা অনুচিত। করলে তোমাদের সঙ্গে নেকিরামের অথবা রাজীববাবুর কোনও তফাত থাকে না।

তা তো বটেই। প্রজাদের উপকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে টাকাটা যাতে মারা না যায়, সেটা যথাসম্ভব দেখতে হবে।

সে তো একশো বার। তবে 'যথাসম্ভব' কথাটা মনে রেখো। নেকিরাম-রাজীববাবুর টাকাও মারা যায়, এমন কি কাবুলীওয়ালারাও সব সময়ে টাকা আদায় করতে পারে না, তাই ওদের সুদ অত চড়া—

আপনি যদি ভাল মনে করেন, ওদের টাকা দিন না, আমার আপত্তি নেই।

বেশ।

পকেট হইতে কেনারামবাবু একটি ছাপানো অনুমতি-পত্র বাহির করিলেন।

সই ক'রে দাও তা হ'লে।

শঙ্কর সহি করিয়া দিল। কেনারামবাবু উঠিয়া পড়িলেন, শঙ্করও, উঠিয়া তাঁহার সহিত বারান্দা পর্যন্ত আসিল। বারান্দায় ফরিদ ও কান্থ জোড়হস্তে বসিয়া ছিল। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। উভয়ের মধ্যে কিন্তু কোনও তফাত নাই। উভয়েরই অনাহারক্লিষ্ট মূর্তি, পরিধানে শতছিন্ন মলিন বসন, উভয়েরই দৃষ্টি ম্লান ভীত-চকিত, উভয়েই ঋণে জর্জরিত, রোগে জীর্ণ, নানা অভাবে নিষ্পিষ্ট দরিদ্র চাষী।

২

আহারাদির পর শঙ্কর ছবিগঞ্জের দিকে গরুর গাড়ি চাপিয়া রওনা হইল। সেখানে মুকুন্দরাম পোদ্দারের বৈঠকখানায় নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। মুকুন্দরাম একজন ধনী মহাজন, ছবিগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নূতন জমিদার উৎপলের এই সকল জনহিতকর কার্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন, শঙ্করের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল। ছবিগঞ্জে কিছুদিন পূর্বে যে নূতন পাঠশালাটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ঘরটিও তিনি দিয়াছেন। হয়তো অদূরভবিষ্যতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় করিবার সহায়তাও তিনি করিবেন।

কলিকাতা পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে বইকি। দশটি পাঠশালা, একটি বালিকা-বিদ্যালয়, গোটা দুই দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র চাষীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে নূতন ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছে, পুরাতন কূপগুলির সংস্কার-সাধন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সহজ প্রতিষেধ্য সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতির জন্যও চেষ্টার ত্রুটি নাই।

এই শেষোক্ত কার্য দুইটির ভার সে নিপুদাকে দিয়াছে। মাস ছয়েক

পূর্বে নিপুদা নিজের নিতান্ত দুরবস্থার সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়া শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল যে, আত্মীয়স্বজন কাহারও সহিত তাহার বনিতেছে না। কাকা-কাকীর অনুগ্রহপ্রদত্ত অন্ন এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত উপদেশ আর সে হজম করিতে পারিতেছে না। যে কেরানীগিরি সে কিছুকাল পূর্বে যোগাড় করিয়াছিল, তাহাতে সে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। টিকিয়া থাকিতে পারিলে হয়তো জীবনের শেষে মাসিক পঁচাত্তর টাকার গ্রেডে উন্নীত হইতে পারিত; কিন্তু তাহার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ হীনতা স্বীকার করিতে হইত, তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে চাকুরি গিয়াছে। প্রাইভেট টিউশনি করিয়া কিছুদিন চলিয়াছিল, একটি ভাল ছাত্রও জুটিয়াছিল। ছাত্রের অভিভাবকেরাও ভদ্রলোক ছিলেন অর্থাৎ সামান্য কারণে প্রাইভেট টিউটারকে কড়া কথা শুনাইয়া কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। বেতনও ভাল দিতেন। কিন্তু সে চাকরি বেশিদিন রহিল না, কারণ ছাত্রটি এক বারেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিয়া ফেলিল। আরও দুই-এক স্থানে টিউশনি জুটিয়াছিল, কিন্তু অভিভাবকদের অভদ্রতা অথবা অতিশয় কম বেতন অথবা ছাত্রের ধৈর্যচ্যুতিকর নির্বুদ্ধিতা—একটা না একটা কারণের জন্য তাহাকে সেসব ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শূন্য বখরাদার হইয়া অর্থাৎ নিজের পরিশ্রম এবং বুদ্ধি ক্যাপিটাল স্বরূপ দান করিয়া সে একজন বন্ধুর সহিত ব্যবসায়ে যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে ব্যবসায়টি ফেল করিয়াছে। এই সব বর্ণনা করিয়া অবশেষে সে লিখিয়াছিল যে, দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দেশে এমন সময়ে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কিছুতেই ভদ্রভাবে এক মুঠা অন্ন জুটিতেছে না, অথচ সে কাজ করিতে প্রস্তুত, তাহার বুদ্ধির অভাব নাই, বিদ্যাও যৎকিঞ্চিৎ আছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এমন দুর্দশা নিশ্চয়ই হইত না। সাহিত্য-পথেও সে চেষ্টা কম করে নাই। ইংরেজী বাংলা কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়া সে নামজাদা সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে। কিন্তু কোথাও সেগুলি ছাপা হয় নাই। সর্বত্রই

কটা না একটা দল নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসিয়া াছে, কিছুতেই বাহিরের লোককে সেখানে ঢুকিতে দিবে না। যদিই বা কষ্টে কোথাও প্রবেশাধিকার মেলে, প্রবন্ধের ন্যায্য পারিশ্রমিক মিলিবে । 'মজদুর-দর্পণ' কাগজের এমন আয় নাই যে, বেশি মূল্য দিয়া তাহার প্রবন্ধ কিনিতে পারে। কাকা-কাকীর সংস্রব সে ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং এখন হয় অনাহারে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া তাহাকে মরিতে হইবে। ঙ্কর নাকি তাহার এক উদার বন্ধুর অর্থে পল্লী-উন্নয়ন করিতেছে, সে যদি তাহাকে কোন একটি—ইত্যাদি।

শঙ্করের সহিত নিপুদা যদিও ভাল ব্যবহার করে নাই, তবু শঙ্কর তাহাকে আহ্বান করিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও স্যানিটেশনের কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। নিজেও সে একদিন অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, এ অবস্থার দুঃখটা যে কত গভীর ও শোচনীয়, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। যে হিরণদার অনুগ্রহে উদ্ধারলাভ করিয়াছিল, সেই হিরণদারই বন্ধু নিপুদা। চক্ষুলজ্জাবশতই ঙ্কর প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। উৎপলও আপত্তি করে নাই। ানও বিষয়ে সে আপত্তি করে না। সে টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত, শঙ্করকেই সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ মালিক করিয়া দিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সে কেবল হিসাব-নিকাশ লইবে, কার্য কতদূর অগ্রসর হইল! ইতিমধ্যে শঙ্কর যা ভাল ঝে করুক, সে কোন কথা বলিবে না।

বালিকা-বিদ্যালয়টির জন্য শঙ্কর কলিকাতা হইতে হাসিকে আনাইয়াছে। াধারণত সেই সব শিক্ষিতা মহিলারা বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী-পদে াহাল হন, যাঁহারা কুরূপের জন্য অথবা অর্থাভাবে সমাজে স্বামী সংগ্রহ করিতে পারেন না। হতাশ প্রণয়িনীও মাঝে মাঝে আসিয়া জোটেন। ঙ্করের ধারণা—শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ইঁহারা অযোগ্য। শিক্ষয়িত্রী হইতে হইলে মনের যে সমতা ও প্রসন্নতা থাকা উচিত, তাহা ইঁহাদের না থাকিবারই কথা। ইঁহারা বঞ্চিত ক্ষুধিত, ইঁহাদের সমস্ত মনপ্রাণ পড়িয়া থাকে সেই সব ভাগৈশ্বর্যের দিকে—যাহা তাঁহারা পান নাই, অথচ যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের রাগ্যও জন্মে নাই। মাতৃত্বই নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি। তাহা লাভ না

করিলে চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। তাই হাসিকে সে আনিয়াছে হাসির শুধু যে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা আছে তাহাই নয়, স্বামী-চ বৃহৎ আদর্শের সংস্পর্শে আসাতে সে অভিজ্ঞতা মহত্ত্বপূর্ণ। তাহার নারী অবলম্বনস্বরূপ একটি পুত্রও আছে। হাসি প্রথমে আসিতে চায় নাই অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে সে আনিয়াছে এবং বালিকা-বিদ্যাল সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

গরুর গাড়ি চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে চাষের জমি। দূরে দূ চাষারা টোকা মাথায় দিয়া লাঙল চষিতেছে। কত দরিদ্র অথচ কত মহ উহারা! উহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া শঙ্কর মনে-প্রাণে ইহাই বুঝিয়া যে, মানব-চরিত্রে যেসব গুণকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, তাহা উহাদে চরিত্রেই প্রচুর পরিমাণে আছে। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের 'চরি বলিয়া এমন কোন কিছু নাই, যাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়; যাহা আছে, তাহ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল একটা হীন-ধরনের চতুরতা মাত্র। এই শিক্ষি ভদ্রলোকেরা সত্যই বড় দুর্দশাপন্ন। ইহারা ভাল করিয়া ভোগও করি পারে না, ত্যাগও করিতে পারে না। ইহারা আর পাঁচজনকে দেখাই ভোগের একটা অভিনয় করে মাত্র, এবং সেই লেফাপা বজায় রাখিবার জ আজীবন প্রাণপণ করে। সত্যকার ত্যাগের নাম শুনিলে ইহারা ভয় পায় তবে ত্যাগের অভিনয় করিয়াও অনেক সময় লেফাপা বজায় রাখিতে হ সে রকম ত্যাগ ইহারা করে মাঝে মাঝে। কিন্তু মুখোশ কিছুদিন পরে খসিয়া যায়, এবং তখন ইহাদের কদর্য স্বরূপ দেখিয়া সকলে আতঙ্কি হইয়া উঠে।

সহসা তাহার মনে হইল, এই সব লইয়া একটা উপন্যাস লিখিলে কেম হয়? ম্যাক্‌সিম গোর্কির 'মাদারে'র মত উপন্যাস সে কি লিখিতে পা না? না, সময় নাই, তাহার অনেক কাজ। অনেক কাজ সত্ত্বেও কি তাহার মন সাহিত্যবিমুখ হয় নাই। সাহিত্যকে সে ত্যাগ করিতে পা নাই। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু, তাহাকে ত্যাগ করিবে কি করিয়া সময় পাইলেই, এমন কি সময় নষ্ট করিয়া এখনও সে সাহিত্যচর্চা করে

ট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এখনও সে মাঝে মাঝে লেখে বইকি, সাময়িক ত্রিকাদিতে সেসব প্রকাশিতও হয়। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সঙ্গে অবশ্য এখন হার পূর্বের সে সম্বন্ধ নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সে লোকনাথবাবুকে দান রিয়া দিয়াছে—লোকনাথ স্বেচ্ছায় যাচিয়া স্বয়ং সে ভার লইয়াছেন। সে ত্রিকার কাজ এখন—লোকনাথবাবুরই সাহিত্যিক মতামত লিপিবদ্ধ করা।

র কোন লেখকের নিকট তিনি লেখা ভিক্ষা করেন না, বিজ্ঞাপন-গণের মুখ চাহিয়া আত্মমর্যাদা নষ্ট করেন না, কোন বড়লোকের খাতিরে জের সাহিত্যবুদ্ধিকে এক চুলও বিচলিত করেন না। তাঁহার সারস্বত-ধনার ত্রিসীমানায় তিনি লক্ষ্মী অথবা লক্ষ্মীর বাহনদের সামান্য ছায়াপাতও হ্য করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং 'ক্ষত্রিয়' কাগজের চাহিদা নাই। বিক্রয়ের ন্য সজ্জিত হইয়া স্টলে স্টলে তাহা খরিদ্দারের আশায় মাসে মাসে পথ াহিয়াও থাকে না। তাহা মাঝে মাঝে বাহির হয়—ঠিক মাসে মাসে নয়, বং সাহিত্য-রসিকদের নিকট বিনামূল্যে বিতরিত হয়। লোকনাথ ঘোষালের অর্থসামর্থ্য কতটা তাহা শঙ্কর ঠিক জানে না; শুধু জানে যে, তিনি লে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকরা সাধারণত দরিদ্র, লোকনাথবাবু কি করিয়া নিজ ব্যয়ে 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইয়া বিতরণ করেন, তাহা ভাবিয়া শঙ্কর বিস্মিত

তাঁহাকে চিঠিতে এ সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কানও উত্তর দেন নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় শঙ্কর এখনও মাঝে মাঝে লেখে, কিন্তু সে লেখা লোকনাথ ঘোষালের অনুমোদন লাভ করিলে তবে প্রকাশিত । বাজে লেখা লোকনাথ ঘোষাল ছাপেন না, শঙ্করের অনেক লেখা নি ফেরত দিয়াছেন। লোকনাথ ঘোষালকে শঙ্কর একটি বিদ্যালয়ের ভার য়া তাহার পল্লী-উন্নয়ন-কার্যে সাহায্য করিবার জন্যও আমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি নিজের যে মাইনর স্কুলে তদিন কাটাইয়াছেন, প্রথম যৌবনে চেষ্টা-চরিত্র করিয়া যাহা তিনি নিজেই কদিন স্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্কুল ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইবেন না।

'সংস্কারক' পত্রিকাতেও শঙ্কর মাঝে মাঝে লেখে। এ পত্রিকাটিও স্তান্তরিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আজকাল হীরালাল

মজুমদার অথবা নিলয়কুমার নাই, কুমার পলাশকান্তিই বর্তমান স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ অনিল এবং নীরাই বর্তমান 'সংস্কারক' পত্রিকার কর্ণধার। কুমার পলাশকান্তির উপন্যাস, অনিল সান্যালের বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক সামাজিক প্রবন্ধ এবং নীরার গল্প-কবিতাই এখন 'সংস্কারকে'র অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতেছে। নিলয়কুমারের কবিপত্নী রেণুকা দেবীও 'সংস্কারক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই প্রেমের কবিতা লেখেন এবং তাহা 'সংস্কারকে'র প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়। নীরার অনুরোধে শঙ্করও মাঝে মাঝে লেখে।

হীরালাল মজুমদারের 'সংস্কারক' কি করিয়া কুমার পলাশকান্তির হইয়া গেল, সে ইতিহাস বড় করুণ। একদা ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যভাষণের জন্য নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য, সততা ও সাহিত্যিক নিষ্ঠার জন্য 'সংস্কারক' পত্রিকার যে সুনাম ছিল, সেই সুনামের সুবিধা লইয়া ভাগিনেয় নিলয়কুমার বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিতে করিতে পত্রিকাখানিকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাহার গৌরবময় অগ্রগতি আর সম্ভব ছিল না। ভাল পত্রিকায় ভাল লেখকমাত্রেই লিখিতে চায়। আরও প্রলোভন ছিল 'সংস্কারকে'র বিজ্ঞাপনে লেখা থাকিত—ভাল লেখা সমুচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং রচনানির্বাচনে সাহিত্যিক মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও প্রকার মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় না। এই উচ্চাদর্শে উৎসাহিত হইয়া অনেক ভাল লেখক তাঁহাদের রচনা 'সংস্কারক' পত্রিকায় প্রেরণ করিতেন। ক্রমশ কিন্তু এই কথাটাই সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বিজ্ঞাপনে যাহাই লেখা থাক্‌, লেখার মূল্য সহজে কেহ পাইবেন না এবং লেখার মূল্য লইয়া বেশি কড়াকড়ি করিলে সে লেখা ছাপা হইবে না। ইহাও বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, 'সাহিত্যিক মানদণ্ড'ও বিজ্ঞাপনের বুলি-মাত্র, চালিয়াত নিলয়কুমারের স্বকীয় মানদণ্ডই আসল মাপকাঠি এবং সে মাপকাঠির স্থূল কথা—অর্থ, মানে সেই অর্থ যাহা দিয়া মোটর কেনা যায় অথবা ঋণ শোধ হয়। পত্রিকার কর্মচারীগণও সময়ে বেতন পাইতেন না। শুধু লেখক এবং কর্মচারীগণই নয়, একটা পত্রিকার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্যান্য যেসব ব্যক্তি জড়িত

থাকেন, তাঁহারাও 'সংস্কারকে'র সুনামে আস্থা স্থাপন করিয়া শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। কাগজওয়ালা, টাইপ-সরবরাহকারী, কালির দোকানদার, ব্লক-প্রস্তুতকারক কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, 'সংস্কারক' পত্রিকার টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাদের আদালত পর্যন্ত ছুটিতে হইবে। হীরালাল মজুমদার সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে গেলে তিনি সত্য কথাই বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছুই দেখতে শুনতে পারি না, আপনারা নিলয়ের কাছে যান, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। নিলয়ের কাছে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, গিয়াছিলেনও। কিন্তু সাহেবী-প্রকৃতির নিলয়কুমারের দেখা পাওয়াই শক্ত, তিনি প্রায় সর্বদাই 'নট অ্যাট হোম'। অনেক হাঁটাহাঁটির পর দৈবাৎ তাঁহার দর্শন মিলিলে টাকার পরিবর্তে তিনি তারিখ দিতেন এবং প্রায়ই সে তারিখের মর্যাদা রক্ষা করিতেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলে আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কুমার পলাশকান্তি উদ্ধার না করিলে হয়তো 'সংস্কারক' পত্রিকা অবলুপ্ত হইয়া যাইত। কুমার পলাশকান্তির এবম্বিধ হিতৈষণা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়; যদিও দুষ্টলোকে রটাইয়াছে যে, সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা নিলয়কুমারের পত্নী রেণুকার জন্যই তিনি নাকি এই জনহিতকর কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। রেণুকার ন্যায় জনৈকা বিদুষী কবি অর্থাভাবে কষ্ট পাইবেন, তাহা পলাশকান্তির ন্যায় মহাপ্রাণ নাকি সহ্য করিতে অক্ষম। পাওনাদারদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া 'সংস্কারক' পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব কিনিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, হীরালাল মজুমদার এবং নিলয়কুমারকে মাসে মাসে মাসোহারাও দিয়া থাকেন। রেণুকা দেবীর মধ্যে তিনি অসাধারণ কবি-প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহাকে নাকি 'পুশ' করিতেছেন।

দেখিয়ে হুজুর।

গাড়োয়ান মুশাই হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল। গাড়িটাও হঠাৎ একটু একপেশে হইয়া পড়িল।

কি ?

বয়েলকো বদমাশি।

শঙ্কর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বাঁ ধারের কালো গরুটা জোয়াল খুলিয়া ফেলিয়া রাস্তার পাশ হইতে দুর্বা ছিঁড়িয়া খাইতে শুরু করিয়াছে। ডান ধারের সাদা গরুটা বোকার মত দাঁড়াইয়া আছে।

কহাথা না ?

তাই তো।

গরু জোড়া সম্প্রতি কেনা হইয়াছে। মুশাই গাড়োয়ান কয়েক দিন হইতে শঙ্করকে বলিতেছে যে, ইহাদের জোড় ঠিক মিলে নাই। কালো গরুটা বেশি চালাক এবং বেশি পেটুক, সাদাটা কিঞ্চিৎ নির্বোধ এবং স্বল্পাহারী। মুশাইয়ের অভিপ্রায় এবং উপদেশ—কালো গরুটাকে বিক্রয় করিয়া তাহার স্থানে মুশাইয়েরই বাদামী রঙের গরুটাকে নিযুক্ত করা। কারণ মুশাইয়ের মতে তাহার এই বাদামী গরুটির স্বভাবও উক্ত সাদা গরুটিরই অনুরূপ—বেশি চালাকি নাই এবং খুব কম খায়। বাবু যদি অনুমতি করেন, মুশাই বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহার জোড়াটা মরিয়া গিয়াছে, একটা গরু লইয়া সে আর কি করিবে, তাহা ছাড়া তাহার ক্ষেত এখন চষিবেই বা কে, ছেলেটা তো কলে চাকরি লইয়া চলিয়া গেল, গরুটা বেচিয়াই ফেলিতে হইবে। হাটে লইয়া গেলে ভাল দামেই সে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বাবু যদি কেনেন, তাহা হইলে সে—ইত্যাদি।

বেচ দিজিয়ে শালেকো।

কালো গরুটাকে জোয়ালে বাঁধিতে বাঁধিতে মুশাই পুনরায় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিল।

এখন তাড়াতাড়ি নে, ছবিগঞ্জে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে দেখছি। অনেক কাজ সেখানে আমার।

হো গিয়া।

গরুটাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া মুশাই তড়াক করিয়া স্বস্থানে উঠিয়া বসিল এবং দ্রুতবেগে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। শঙ্কর মুশাইয়ের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দিয়া তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ফ্যাক্টরিতে তাহার পুত্র বিষুণের চাকরি

করিয়া দিয়াছে; তবু তাহার অভাব মেটে না। তাহার এই গোচরিত্র-বিশ্লেষণের মূলে যে অর্থাভাব, তাহা শঙ্করের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, কেন, এত অভাব কেন ইহাদের? আর কি করিলে ইহাদের দুঃখ দূর হয়?

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা হীরাপুর গ্রামে ঢুকিল।

হীরাপুরে নিমাই ঘটক থাকে। হীরাপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলের হেড-পণ্ডিত সে। গ্রামেরই ছেলে, আই. এ. ফেল করিয়া বসিয়া ছিল, শঙ্কর তাহাকে স্কুলের হেড-পণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। হেড-পণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা ছেলেটির নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ঠিক ওই জন্যই যে শঙ্কর তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে তাহা নয়, আসল কারণ—শঙ্কর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আকর্ষণের প্রধান কারণ রূপ। রূপ জিনিসটার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, স্ত্রী-পুরুষ ফল-পুষ্প জন্তু-জানোয়ার আকাশ-সমুদ্র যেখানেই তাহার আবির্ভাব ঘটুক না, তাহা মানুষকে মুগ্ধ করে। রূপ দেখিয়াই শঙ্কর প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পর আরও মুগ্ধ হইয়াছে তাহার সাহিত্য-প্রীতি এবং সাহিত্য-বিষয়ে চিন্তার অভিনবত্ব দেখিয়া। শঙ্কর আজকাল যাহা কিছু লেখে, তাহা সর্বাগ্রে নিমাই ঘটকের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার অভিমত গ্রাহ্য করে। নিমাই ঘটক সাহিত্য-স্রষ্টা নয় বটে, কিন্তু উঁচুদরের রসিক সমঝদার—অন্তত শঙ্করের তাহাই বিশ্বাস।

হীরাপুর গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্করের মনে পড়িল, তাহার "জাতীয় সাহিত্য" নামক প্রবন্ধটা ঘটকের কাছে অনেকদিন পড়িয়া আছে। প্রবন্ধটি লিখিবার অব্যবহিত পরেই ঘটকের সহিত দেখা হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি পড়িবে বলিয়া লইয়া গিয়াছিল, এখনও ফেরত দেয় নাই। যদিও ছবিগঞ্জে তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন, তবু সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল। প্রবন্ধটি নিমাই ঘটকের কেমন লাগিয়াছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল, না। সে সাহিত্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সাহিত্য তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনের প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে যে ভাবনা তাহার অন্তরতম সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তাহা সাহিত্য-ভাবনা। ওই

ভাবনাই সে সর্বদা করিতেছে, উহা ছাড়া অন্য কোনও ভাবনায় তাহার সুখ নাই। ইহার জন্য তাহার কর্তব্যকর্মে ত্রুটি ঘটিতেছে ইহা সে বোঝে, সেবার যে কাঁটাপোখর গ্রামের স্কুলটা গবর্মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইল না, তাহার কারণ, সে সময়মত স্কুল-ইন্স্পেক্টরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তোয়াজ করিতে পারে নাই। দেখা না করিতে পারার কারণ, সে তখন প্রকাণ্ড একটা কবিতা লইয়া এমন তন্ময় হইয়া ছিল যে, ইন্স্পেক্টরের কথা তাহার মনেই ছিল না। অনুরূপ ঘটনা আরও কতবার ঘটিয়াছে। আজও ছবিগঞ্জে যাইবার পথে সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল।

নিমাই ঘটক বাড়িতেই ছিল।

স্মিতহাস্যে নিমাই তাহাকে সম্বর্ধনা করিল। নিমাইয়ের দোহারা চেহারা, বর্ণ যে খুব টকটকে ফরসা তাহা নয়, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চোখ-মুখের গড়নে, মৃদু হাস্যে এমন একটা রূপ আছে, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। নিমাইয়ের একমাত্র পার্থিব বন্ধন ছিলেন মা, তিনি বছর খানেক পূর্বে মারা গিয়াছেন। এখন নিমাই একা। নিজেই রাঁধিয়া খায়, ঘরের একটি গাই আছে, সেটির পরিচর্যা করে, নিজের কাজকর্ম নিজেই করিয়া লয়। তাহার খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরটি বেশ পরিষ্কার করিয়া নিকানো, তকতকে ঝকঝকে। কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়া নিমাই বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া ছিল, শঙ্করের গাড়ি থামিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আসুন, স্কুল আজ বন্ধ।

স্কুল দেখতে আসি নি, তোমার কাছে এসেছি।

নিমাই তাড়াতাড়ি একটি কম্বলের আসন বিছাইয়া দিল। শঙ্কর উপবেশন করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। নিমাইয়ের মত নিমাইয়ের ঘরটিরও বেশ একটি নিরাভরণ সৌন্দর্য আছে। চমকপ্রদ নয়, কিন্তু দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একটি অতি সাধারণ চৌকি এবং বই রাখিবার শেল্ফ ছাড়া ঘরে অন্য কোন প্রকার আসবাবই নাই, তাহার সামান্য কাপড় জামা দড়ির আলনাতে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। শেল্ফগুলি কেরোসিন কাঠের, প্রত্যেকটিতে বই ঠাসা, প্রত্যেকটি বই মলাট দেওয়া।

ছবিগঞ্জে মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি যাচ্ছি। ভাবলাম, অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, একবার নেবে যাই। একটু স্বার্থও যে নেই তা নয়, আমার সেই প্রবন্ধটা—

হ্যাঁ, আমার পড়া হয়ে গেছে।

উঠিয়া একটি খাতার ভিতর হইতে একটি লম্বা খাম বাহির করিল এবং খামের ভিতর হইতে প্রবন্ধটি বাহির করিয়া শঙ্করকে দিল। বেশ যত্নসহকারেই প্রবন্ধটি রাখিয়াছিল, বোঝা গেল।

কোন বক্তব্য আছে এ সম্বন্ধে ?

আমার বেশ ভালই লেগেছে। তবে—

স্মিতমুখে নিমাই চুপ করিয়া গেল।

তবে কি ?

কেবল একটু, মানে—

অত ইতস্তত করবার দরকার কি, ব'লেই ফেল না।

সাহিত্যের পূর্বে কোনরকম বিশেষণ বসাতে আমার যেন কেমন একটু গে। এমন কি জাতীয়, স্বদেশী—এই সব বিশেষণও।

প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে যখন এক-একটি ক'রে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তখন অস্বীকার করি কি ক'রে, বল ?

আমার অবশ্য বেশি বিদ্যে নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রত্যেক সাহিত্যেরই াসল বৈশিষ্ট্য—তা চিরন্তন মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহৃদয় ালোচনা, কোন বিশেষ দেশের মানুষের নয়।

তা ঠিকই। ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মানুষের সুখ-ঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূলত এক হ'লেও বাইরে সে সবের প্রকাশ দেশে দেশে কটু ভিন্ন নয় ? এই যেমন ধর, আমাদের দেশের একজন নারী আর াশ্চাত্য দেশের একজন নারী। উভয়েই নারী বটে ; কিন্তু একজনের কালো প, মাথায় খোঁপা, পায়ে আলতা, পরনে শাড়ি, নাকে নাকছাবি, মুখে পান, াখের কালো তারায় সভয় সলজ্জ দৃষ্টি ; আর একজনের ধপধপে সাদা রঙ, থার চুল ছাঁটা, পায়ে জুতো, পরনে স্কার্ট, নাকে পাউডারের গুঁড়ো, ঠোঁটে

লিপ্‌স্টিক, চোখের নীল তারায় নির্ভয় কৌতূহল-দৃষ্টি। দুজনেরই মন বিশ্লেষণ করলে উভয় ক্ষেত্রেই হয়তো চিরন্তনী নারীকে দেখা যাবে; কিন্তু দুজনের বাইরের রূপ আলাদা। সাহিত্যেরও তেমনই একটি বাইরের রূপ আছে। তা ছাড়া, যে মানুষ সাহিত্যের প্রধান উপাদান, সেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ সব দেশে সমান নয়, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার রূপ নানা দেশে নানা রকম, তাই—

আপনি বাংলার জাতীয় সাহিত্যের এমন কি রূপ দেখতে পেয়েছেন, যা অন্য দেশের সাহিত্যে নেই? আপনি মধুর রসের কথা বলেছেন, তা কি অন্য সাহিত্যে বিরল?

মধুর রস আমাদের সাহিত্যের বিশেষ রস। ওইটেই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা বীর রস চাই না, অদ্ভুত রস চাই না, বীভৎস রস চাই না—যদি মধুর রসও তার সঙ্গে সঙ্গে না থাকে। ওই মধুর রসটাই আমরা ভালবাসি। বৈষ্ণব-সাহিত্যে, বৈষ্ণব-ধর্মে যে মাধুর্য একদিন আপামরভদ্র সকলের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাই এখনও আমাদের সাহিত্যের মূল সুর। শুধু রাধা-কৃষ্ণ নয়, যশোদা-গোপাল, সুবল-কানাই, বৃন্দা-চন্দ্রাবলী, এমন কি জটিলা-কুটিলা-আয়ানঘোষও আমাদের প্রিয়—মানবপ্রেমের নানা রস-রূপের সাধনাতেই আমরা তন্ময়। ও ছাড়া আমরা আর কিছুতে আনন্দ পাই না। কালীর মতন ভীষণাও আমাদের আদরে আবদারে বিগলিতা, মহাদেবের মতন সন্ন্যাসীকেও আমরা জামাই সাজিয়েছি, দুর্গার যে রূপে আমরা মুগ্ধ তা তাঁর মহিষমর্দিনী রূপ নয়, তা তাঁর কন্যা-রূপ। দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে। মধুর-রস-সমুদ্রেই সোনার তরী ভাসিয়েছিলেন ব'লে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি, রাবণকে রিয়ালিস্টিক রাক্ষস-রূপ দিলে মাইকেলের কাব্য এতটা আদর পেত কি না সন্দেহ। রাবণ শুধু যে মানুষ তা নয়, সে রীতিমত বাঙালী—

নিমাই হাসিয়া বলিল, কিন্তু এত সব উদাহরণ আপনি আপনার প্রবন্ধে দেন নি—

উদাহরণ না দিলেও যা বলেছি, তাতে—। আচ্ছা, উদাহরণ দিয়ে দেব—বড় হয়ে যাবে ব'লে দিই নি।

সহসা এই রস-আলোচনার মাঝে একটা বেসুর বাজিল। মলিন-বসন-পরিহিত জীর্ণ-শীর্ণ একটা লোক আসিয়া শঙ্করকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

এ আবার কে?

নিমাই ঘটক চিনিত—গ্রামেরই একজন কৃষক। উহাদের পল্লীতে শঙ্করের ব্যবস্থাতেই কিছুদিন পূর্বে একটি ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছিল, কিন্তু ইঁদারাটি ইহারই মধ্যে অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে, পুনরায় সংস্কার করা প্রয়োজন।

কতদিন আগে ইঁদারা হয়েছিল?

মাস ছয়েক আগে।

পাকা ইঁদারা?

হ্যাঁ।

ছ মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল কি ক'রে? হয়েছে কি?

বাঁধানো পাড় ধ'সে ধ'সে প'ড়ে যাচ্ছে।

এ রকম হবার মানে?

মানে যে কি, তাহা নিমাই ঘটক জানিত, কিন্তু সে কিছু বলিল না। সে নির্বিবাদী লোক, কাহারও নামে লাগানো তাহার স্বভাব নয়। সে চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র চাষাও সভয়ে করজোড়ে চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করব। মাটির পাড় দিয়েই বাঁধিয়ে দেওয়া যাবে আপাতত। তোমরাও কিছু চাঁদা তুলতে পার যদি, ভাল হয়। আমরা তো একবার ক'রে দিয়েছি, মেরামতটা অন্তত তোমাদের নিজেদের করা উচিত। আরও কয়েক জায়গা থেকে ইঁদারা ভাঙার খবর এসেছে, আমরা কত আর করি, বল?

চাষা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বাঙালী না হইলেও বাংলা বোঝে। পুরুষানুক্রমে হাতজোড় করিয়া থাকাই তাহাদের অভ্যাস। বহু কটূক্তি, বহু উপহাস, বহু প্রহার, বহু অত্যাচার সত্ত্বেও তাহারা হাতজোড় করিয়া থাকে। উহা করা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় তাহাদের নাই।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, যাও তুমি, আমি ব্যবস্থা করব।

খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। শঙ্কর পকেট হইতে ডায়েরি বাহির করিয়া ইঁদারার কথাটা লিখিয়া লইল।

ইহার পর রস-সাহিত্যের আলোচনা আর জমিল না।

শঙ্কর উঠিবার উপক্রম করিল।

আমাকে এক গ্লাস জল দাও দিকি, খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।

নিমাই উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ছোট একখানি চকচকে কাঁসার রেকাবিতে চারটি গুড়ের বাতাসা ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিল।

এ আবার কেন?

ঈষৎ হাসিয়া নিমাই বলিল, কুন্তলাদিদি বলেছেন, শুধু জল কাউকে দিতে নেই।

কুন্তলাদিদিটি কে?

আমাদের হরিদার স্ত্রী। কুন্তলাদিদির কথা শোনেন নি?

খুব শুনেছি। তাঁর শিষ্য হয়েছ নাকি?

স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, শিষ্য না হয়ে উপায় নেই। বড় ভাল লাগে তাঁকে, সত্যিই ভক্তি হয়।

কেন, কি দেখলে তাঁর মধ্যে?

তিনি সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর এম.এ., অথচ তাঁর জীবন এত সরল অনাড়ম্বর যে এমন আর আমি দেখি নি, কল্পনাও করি নি।

উৎপলের স্ত্রী সুরমাও খুব সরল অনাড়ম্বর, সেও লেখাপড়া কিছু কম জানে না।

তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তাঁর কথা ছেড়ে দিন।

কেন, বড়লোক ব'লে অপরাধটা কি হ'ল?

অপরাধ নয়। বড়লোকের পক্ষে অহমিকাটা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু দারিদ্র্যের অহমিকা ত্যাগ করা সত্যিই বড় শক্ত, কারণ ওইটুকু অবলম্বন ক'রেই দরিদ্রেরা মাথা উঁচু ক'রে থাকে। আমার মনে হয়, কুন্তলাদির সেটুকুও বোধ হয় নেই। অথচ তাঁর যা গুণ, তাতে অহঙ্কারী হ'লে বেমানান হ'ত না।

কি গুণ? এম.এ. ডিগ্রীটা?

তা তো আছেই। কিন্তু ডিগ্রী সত্ত্বেও তিনি সংসারের সব কাজ হাসিমুখে করেন—রাঁধেন, বাসন মাজেন, বড়ি দেন, চরকা কাটেন, পিসীমার সেবা করেন, আবার ওর মধ্যে একটু লেখাপড়াও করেন।

তা যদি হয়, তা হ'লে তো—

সত্যিই অদ্ভুত। আলাপ নেই আপনার সঙ্গে?

আলাপ করতে সাহস করি নি।

নিমাই আবার খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চলুন একদিন আমার সঙ্গে। তাঁর পরদা নেই, আর হরিদাকে তো চেনেনই!

আচ্ছা, পরে দেখা যাবে, এখন চলি।

শঙ্কর আর দেরি করিল না, ছবিগঞ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

ছবিগঞ্জের মুকুন্দ পোদ্দার একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন। বেশ বিস্তৃত তেজারতি কারবার আছে। দরিদ্র বিপন্ন চাষীদের চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায়। উৎপল ও শঙ্করের এই সব জনহিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার সহানুভূতি না থাকিবারই কথা, কিন্তু বাহির হইতে মনে হয়, তিনি যেন এসব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মনোভাবটি—সম্ভবত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই—তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। মুখে তিনি অতি-বিনয়ী। শঙ্করের সহিত দেখা হইবামাত্র গদগদ স্বাগত-সম্ভাষণের আতিশয্যে তাহাকে অস্থির করিয়া তোলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যাহা ব্যক্ত করে, তাহা মোটেই সম্মানজ্ঞাপক নহে। সে দৃষ্টিকে ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়—থাম্ ব্যাটা, তোকে দেখাচ্ছি! দেশ উদ্ধার করতে এসেছেন, ইস্, ভারি আমার লায়েক!

যদি ইহাই মুকুন্দ পোদ্দারের মনের কথা হয়, তাহা হইলে বাহিরের

আচরণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায় এ কথা যাঁহারা ভাবিবেন, তাঁহারা মুকুন্দ পোদ্দার জাতীয় লোকদের সম্যকরূপে চেনেন না। চিনিলে ইহা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিত না যে, ইঁহাদের মনের কথার সহিত বাহিরের আচরণের প্রায়ই গরমিল থাকে। শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য সৎ অসৎ কোনপ্রকার কার্য করিতেই ইঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এ ক্ষেত্রে মুকুন্দ পোদ্দারের মনোভাব অনেকটা এই রকম—ও, তোমরা মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া আমাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিবে ভাবিয়াছ—দেখা যাক, কে কাহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে—টাকা আমারও কিছু কম নাই—টাকা দিয়া স্কুল পাঠশালা আমিও করিয়া দিতে পারি এবং করিয়া দিবও। তোমরাই যে উদারতার অভিনয় করিয়া সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করিবে—আর আমি পিছনে পড়িয়া থাকিব, তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। দেখাই যাক না তোমাদের দৌড়টা কতদুর!

মুকুন্দ পোদ্দার নাতিস্থূল পুষ্টকান্তি ব্যক্তি। বেশ কুচকুচে কালো রঙ, মাথায় এককালে ঢেউ-খেলানো অ্যালবার্ট টেড়ি ছিল, এখন টাক পড়িয়াছে। গলায় সোনার হার, বাহুমূলে সোনার তাবিজ, অনামিকায় নীলা-বসানো সোনার আংটি, এমন কি সামনের কয়েকটি দাঁতেও সোনা-লাগানো।

শঙ্কর যখন ছবিগঞ্জে পৌছিল, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। মুকুন্দ তাকিয়া ঠেস দিয়া নিত্যসঙ্গী কাঠের হাতবাক্সটির নিকট বসিয়া ছিলেন। শঙ্করকে দেখিবামাত্র সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিলেন।

আসুন দেবতা, আসুন আসুন, সকাল থেকে আপনার কথাই ভাবছি ব'সে ব'সে। ওরে, গোবরাকে খবর দে—বল্‌, বাবু এসেছেন, চা-টা আনুক।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

এমন আর কি দেরি হয়েছে দেবতা! আপনারা পাচ কাজের মানুষ, আমাদের মত নিষ্কর্মা তো নন—হে হে হে হে—পাঁচ জায়গায় ঘুরতে গেলেই দেরি একটু আধটু হয়েই থাকে।

মুকুন্দর চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, মুখে বিনীত হাস্য।

আপনাদের পাঠশালা কেমন চলছে, বলুন?

চলছে। ভালই চলছে—বলতে হবে, গতকাল গুটি দশেক ছাত্তর জুটেছিল, না হে ভজহরি ?

পাশের ঘর হইতে ভজহরি উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জুটেছিল।

মাত্র দশজন ?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

এতেই অবাক হচ্ছেন' দেবতা ! আমার বিবেচনায় ওই দশজনই যথেষ্ট আপাতক্—ওই শেষ পর্যন্ত টেকে কি না দেখুন।

এখানে এত কম ছেলে হবার কারণ কি, অন্য অন্য গ্রামে তো এত কম হয় নি ?

এটা যে চাষার গ্রাম দেবতা, এ বেটা ছাতুখোর চাষারা লেখাপড়ার মর্ম কি বুঝবে বলুন ? বলে কি জানেন, বলে যে, ছেলেকে যদি পাঠশালায় পাঠাই, তা হ'লে আমাদের গরু চরাবে কে ?—এই যাদের মতিগতি, তাদের আর কতদুর কি হবে বলুন ?

মুকুন্দ পোদ্দারের মুখে হাসি এবং চোখে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল।

তবু চেষ্টা করতে হবে বইকি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—চেষ্টা করব বইকি—চেষ্টা তো করছিই। নাইট-স্কুল খোলবার ঘর সব সাফ-সুতরো করিয়ে রেঁখেছি। মাস্টারের জন্যে একটা মোড়া, ছাত্তরদের জন্যে মাদুর শতরঞ্জি—সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। কথা দিয়েছি যখন, তখন সে কথার নড়চড় করব না। আসুন না, দেখবেন।

এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কথাবার্তায় বাধা পড়িয়া গেল। পিছনের বারান্দায় কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিল শোনা গেল, আরে মোলো, রোতা কাহে ?

কাঁদছে নাকি মাগী ? এ তো আচ্ছা এক ফৈজৎ হ'ল দেখছি !

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া মুকুন্দ বলিলেন, গরিব চাষাদের উদ্ধার করবার জন্যে আপনারা ব্যাঙ্ক খুললেন, কিন্তু এ ব্যাটারা আমাদের পাছ ছাড়বে না। আমাদের সুদ বেশি, সোনা রূপো বন্ধকি না রেখে আমরা ধার দিই না, তবু আমাদের ছাড়বে না। ওদের যত বুঝিয়ে বলি—তুম

লোগকা উদ্ধারকা বাস্তে উৎপলবাবু ব্যাংক খুলা হ্যা, ছুঁয়াই যাও ; কিছুতে যাবে না।

মুকুন্দ পোদ্দারের চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুনের হলকা ছুটিতে লাগিল।

যায় না কেন ?

যাবে কি ক'রে ? আপনারা তো জমিজরাৎ না থাকলে টাকা দেবেন না। এ মাগীর না আছে জমি, না আছে জরাৎ। জন খেটে খায়।

স্বামী নেই ?

স্বামীটিকে পূর্বেই খেয়েছেন। সে দিকে সৌভাগ্যবতী। একটি কাঠ-ব্যাটা ছিল, তিনি বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে সরেছেন শহরে।

কাঠ-ব্যাটা কি ?

সৎছেলে। এতদিন এ দেশে আছেন, কাঠ-ব্যাটা কাকে বলে জানেন না, অথচ আপনারা এ দেশ উদ্ধার করতে চান !

শঙ্কর একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মনের কথা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে মুকুন্দও ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি পাকা লোক, তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনারা তো সেদিন এসেছেন, আপনাদের আর কি দোষ দোব ! আমি সারা জীবনটাই এ অঞ্চলে কাটালাম, 'খাবুনি' কাকে বলে আমিই জানতাম না, সেদিন শিখলাম ভজহরির কাছে—ছট পরবের সময় ওরা ময়দা আর চালের গুঁড়ি দিয়ে যে 'ঠেকুয়া' তৈরি করে, তাকে বলে 'খাবুনি'। জানতেন ?

শঙ্করকে স্বীকার করিতে হইল যে, সে জানিত না। ভজহরি আবার পাশের ঘরে ক্রন্দমানা রমণীটিকে সান্ত্বনা দিল, রোও মৎ, রোকে কি হোগা। জেবর জোগাড় কর, তব রুপিয়া মিলে গা।

জেবর কথাটা শঙ্কর জানিত, জেবর মানে—গহনা। জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্যে ও টাকা চায় ?

একটা ন্যাংনেঙে ছেলে আছে, তার বিয়ে দেবে, সেইজন্যে হাঁসুলি বাঁধা দিয়ে টাকা নেবার জন্যে দমাদ্দমি করছে। এদের উদ্ধার করা কি সহজ আপনি ভেবেছেন ? হারামজাদীরা বিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয় কে

তাও তো বুঝি না! বিয়ে দিলেই তো ছেলে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ওর কাঠ-ব্যাটা বেশ ছিল এতদিন, আমারই এখানে খাটত-খুটত। যেই গওনা ক'রে বউটি নিয়ে এসেছে—বাস্, অমনই উধাও। গওনা মানে বোঝেন তো? দ্বিরাগমন। হাঁসুলিটা ওজন ক'রে দেখেছ ভজহরি?

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, বিশ ভরি সাড়ে ন আনা।

গোটা দশেক টাকার বেশি দেওয়া যায় না। মাসে টাকা পিছু দু আনা ক'রে সুদ দিতে হবে।

ভজহরি বলিল, সুদ দিতে ও রাজী আছে, কিন্তু কুড়িটা টাকা চায়।

চাইলেই কি দেওয়া যায়? আমার পোষানো চাই তো!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুকুন্দ বলিলেন, টাকায় তিন আনা ক'রে সুদ দিতে রাজী আছে?

আছে।

তা হ'লে দাও। কিন্তু তিন মাস যদি সুদ না দেয়, তা হ'লে হাঁসুলি আর ফেরত পাবে না। বাকি টাকাটা খেটে শোধ করতে হবে। রাজী যদি হয় দাও—ছাড়বে না যখন, উপায় কি?

বুঝা?

ভজহরি তাহার নিজস্ব হিন্দীতে মেয়েটিকে মুকুন্দর প্রস্তাব বুঝাইতে শুরু করিল।

মুকুন্দ বলিল, চলুন, আমরা ততক্ষণ ঘরটা দেখে আসি। একটা লণ্ঠন দরকার হবে, সেটা এখনও যোগাড় হয়ে ওঠে নি। আপাতক তেলের ডিব্রিই জ্বলুক একটা—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি?

লণ্ঠন আমি কালই পাঠিয়ে দেব।

মহত্ত্ব-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইবার লোক মুকুন্দ নন।

পাঠিয়ে দেবার দরকার নেই। এতই যখন করতে পেরেছি, একটা লণ্ঠনও দিতে পারব। ও ভজহরি, লণ্ঠন একটা চাই, বুঝলে?

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, যে আজ্ঞে।

উভয়ে উঠিয়া নৈশ-বিদ্যালয়ের ঘরটি দেখিতে গেলেন।

৪

কয়েক দিন পরে শঙ্কর মুরারিপুর নামে আর এক গ্রাম হইতে ফিরিতেছিল। সেখানে শঙ্করের স্থাপিত ডিস্পেন্সারির নূতন ডাক্তারবাবুটির সহিত স্থানীয় কয়েকজন বেহারীর মনোমালিন্য হইয়াছিল। বেহারীদের ইচ্ছা ছিল, একজন বেহারীই নিযুক্ত করা। বাঙালী ডাক্তারবাবুটির সহিত নানা ছুতায় তাই তাহারা কলহ করিতেছে। ডাক্তারবাবুটিও কলহপ্রবণ এবং বেহারীদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত, সুতরাং কিছুতেই নিজেকে তাহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। মুরারিপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছে। শঙ্কর তাহারই তদন্ত করিতে গিয়াছিল। সাময়িকভাবে মিটমাট হইয়া গেল বটে। আসল সমস্যার সমাধান হইল না।

রাত্রি হইয়াছে। শুক্লা অষ্টমীর চন্দ্র পশ্চিমদিগন্তে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছে দুই-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রও জ্বলিতেছে। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মত দেখাইতেছে, মেঠো সুরে কোথায় যেন একটা বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে! মুশাই নীরবে গাড়ি হাঁকাইতেছে। শঙ্কর ভাবিতেছে।

ভাবিতেছে, এই বেহারে তাহার এবং উৎপলের বাবা বহুকাল পূর্বে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। বেহারই তাহাদের জন্মভূমি এবং তাহারাও নানা দেশ ঘুরিয়া অবশেষে বেহারে আসিয়াই পুনরায় নিজেদের জীবন আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কি বাংলা দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত ছিল? অনেক হিতৈষী তাহাকে এবং উৎপলকে উপদেশ দিয়াছিলেন, দেশের উপকার করিতে হইলে বাংলা দেশের উপকার কর গিয়া। এ দেশে জনহিতকর কিছু করা ভস্মে ঘি ঢালার মতই নিরর্থক। বেহারের প্রতি শহরে শহরে, প্রতি গ্রামে গ্রামে খোঁজ করিয়া দেখ, যেখানেই বাঙালী গিয়াছে, সেখানেই তাহারা কিছু না কিছু জনহিতকর কার্য করিয়াছে। কিন্তু বেহারীরা কি তজ্জন্য বাঙালীদের প্রতি কৃতজ্ঞ? মোটেই না। "বাঙালী-বেহারী ফীলিং" নামক

বিষটি ক্রমশ উগ্রতর হইয়া বরং প্রবাসী-বাঙালীদের জীবন দিন দিন দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতে আরও তুলিবে। সুতরাং এখানে নূতন করিয়া জীবন পত্তন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শঙ্কর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-বেহারী, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভৃতি নানা বিভাগে জাতিকে বিভক্ত করিয়া খণ্ড-কলহ করিলে আমাদের কোন দিনই মঙ্গল নাই। যাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে-প্রাণে বুঝিয়াছি, তাহাকে কেন প্রশ্রয় দিব? বেহারে বাঙালী-বেহারী 'ফীলিং' আছে বলিয়াই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কর্তব্য সেই ফীলিং-সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা। তলপি-তলপা গুটাইয়া প্রস্থান করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না, কাপুরুষতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। প্রতিশোধ বাসনায় যদি বঙ্গদেশ হইতে বেহারী বিদূরিত করিবার আন্দোলন করা যায়, তাহাতে এই 'ফীলিং' বৃদ্ধিই পাইবে, কমিবে না। ভাবিয়া দেখা উচিত, কি করিয়া এই ফীলিং' দূর করা যায়। ইহার উত্তর, ভালবাসিয়া। তুমি যদি সত্যই ইহাদের ভালবাসিতে পার, তাহা হইলে এ 'ফীলিং' আর থাকিবে না। উপকার করিলেই লোক কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবে—ইহা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ বটে, কিন্তু মানুষ সব সময় নীতিশাস্ত্র মানিয়া চলে না; সে মানিয়া চলে নিজের হৃদয়কে। সেই হৃদয় যদি জয় করিতে পার, তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে। হৃদয় জয় করিবার মন্ত্র ধর্মনীতি নহে, রাজনীতি নহে—ভালবাসা। এই 'ফীলিং' প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বিবেচ্য। এই ফীলিং কাহাদের মধ্যে? চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাহারাই এই বিষ চতুর্দিকে ছড়াইতেছে। আমরা—বাঙালীরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমরা কেহ চাকুরি করিব না, তাহা হইলে বোধ হয় আপাতত অবিলম্বে এ সমস্যার মূল ছিন্ন হয়। চাকুরি জীবিকা-অর্জনের একটা উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়,—প্রশস্ত উপায় তো নয়ই। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সিন্ধী, কচ্ছী, গুজরাটী, ইহারা তো নানা প্রদেশে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে, বেহারী-মাড়োয়ারী অথবা বেহারী-কচ্ছী 'ফীলিং' তো কোথাও হয় নাই।

চাকর হইবার জন্য যে সব তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী-বেহারী রাজদরবারে ভিড় করে, এই ফীলিং তাহাদের মধ্যে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, চাকুরি না করিলে বাঙালীর ছেলে করিবে কি? চাকরি ছাড়া আর কোন্ কর্ম করিবার তাহারা উপযুক্ত? তাহা ছাড়া, অন্যায়ভাবে (এমন কি কংগ্রেস-মিনিস্ট্রির সময় বিশেষ করিয়া) তাহারা চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইবে কেন? চাকুরির স্বপক্ষে তাঁহাদের আরও যুক্তি আছে। তাঁহারা মনে করেন, চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না এবং তাহা না থাকিলে যে কাল্‌চারের গর্বে আমরা স্ফীত তাহার চাকচিক্যও ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে। এমন কি তাঁহারা এ আশঙ্কাও করেন যে, আমাদের সাহিত্য, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, সংস্কার সমস্তই নাকি বিনষ্ট হইবে, যদি আমাদের চাকুরি না থাকে।

বাঙালী-সন্তান চাকুরি ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাজ করিতে অপারক, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা হয় এবং সম্ভবত সে কথা সত্যও নহে। জীবিকা-অর্জনের ভিন্ন পন্থায় এখনও তাহারা চলিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সে সব পথে চলিবার জন্য যে ধরনের চরিত্র প্রয়োজন, বর্তমানে হয়তো তাহাদের সে চরিত্র নাই। কিন্তু সেজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। কেরানীগিরি করিবার মত চরিত্রও যে বাঙালীর ছিল না, ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সাধনার দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট কেরানী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। সাধনা করিলে আবার তাহারাই উৎকৃষ্ট বণিক অথবা চাষী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি! বণিক অথবা চাষীর কাজ যে ঘৃণ্য নয়, বরং দাসত্ব অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক, এই সুস্থ মনোবৃত্তি শুধু ছেলেদের নয়, ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যেও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যস্ত হইলে চলিবে না, হয়তো দুই এক পুরুষকেই এজন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ইহাই একমাত্র সদুপায়। বাঙালীর ছেলে চাকুরি ছাড়া আর কিছু করিতে পারিবে না, অতএব চাকুরি-লাভ করিবার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা সহ্য কর, সকলের সঙ্গে কলহ কর, নানাপ্রকার জাল-জুয়াচুরির আশ্রয় লও—এ মনোভাব মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাঙালীর

ছেলে অন্যায়ভাবে চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে? সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পার, কিন্তু চাকুরি ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে আমরা অক্ষম—এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হও। বরং অন্য ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের সামর্থ্য যদি তোমার থাকে, তাহা হইলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের আন্দোলন সফল হইবার আশা আছে। হীনমনোবৃত্তি চাকরের কোন আন্দোলনকেই কেহ কখনও গ্রাহ্য করে না। যাঁহারা এই অন্যায়কে মূলধন করিয়া আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছেন, তাঁহারা শক্তিকেই খাতির করেন, অন্য কিছুকে নয়। সুতরাং স্বদেশবাসীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া শক্তি সংগ্রহে মন দাও। হয়তো স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের পথেও ভবিষ্যতে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সে বিঘ্নও শক্তির সহায়তাতেই উৎপাটন করিতে হইবে। কিন্তু সে সব দূরভবিষ্যতের কথা! এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের নিমিত্ত নিজেদের প্রস্তুত করা। পারতপক্ষে চাকুরি আমরা করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিলে মনে স্বতই শক্তি আসিবে। এই সুস্থ সবল মনোভাবই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। যাঁহারা মনে করেন যে, চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আজকাল সমাজে অর্থেরই প্রতিপত্তি, চাকুরেদের নয়। যে কালচার লোপ হইবার ভয়ে তাঁহারা অস্থির, সেই সোফা-সেটি-মোটর-রেডিও-সমন্বিত পোশাক-পরিচ্ছদ-সর্বস্ব ঝুটা কালচার আমাদের কালচার নয়। ওই বিদেশী বস্তু সত্যই যদি লোপ পায়, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। ওই বাহ্যিক কালচার আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াই আমরা আমাদের আন্তরিক কালচার হারাইতে বসিয়াছি। আতিথেয়তা, দয়া, উদারতা, আন্তরিকতা, বিনয়, শিক্ষা, সাধনা, গুণের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিকতা প্রভৃতি যে সব মহৎ গুণাবলী আমাদের ভারতীয় কালচারের অঙ্গ, তাহা কি এই চাকুরিপ্রার্থী অথবা চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের আছে? স্বার্থ ছাড়া আর কি বোঝেন তাঁহারা? তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তুষ্ট বলিয়া সকলেই স্বার্থপর; যাঁহারা চাকুরি করেন, তাঁহাদের

স্বার্থপরতা অধীনতা-দুষ্ট বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। আমাদের চাকুরি না থাকিলে আমাদের সাহিত্য পর্যন্ত নষ্ট হইবে, এমন আশঙ্কাও অনেকে করেন। সাহিত্য প্রতিভাবান গুণীদের সৃষ্টি। প্রতিভাবান ব্যক্তি কখন্ সমাজের কোন্ স্তরে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যই অনেক সময় বহু প্রতিভাবানের প্রতিভাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিভাকে লালন করা অবশ্য সমাজের কর্তব্য। কিন্তু চাকুরিজীবীরা কি আমাদের দেশের প্রতিভাবানদের সত্যই লালন করেন?

কয়জন চাকুরিয়া বই কিনিয়া পড়েন? কয়জনের সামর্থ্য আছে? কয়জনের বুদ্ধি আছে? বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কয়জন স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এই গর্বে তির্যকপথে আপন অহঙ্কারের রসদ সংগ্রহ করা ছাড়া চাকুরিয়া বাঙালী বাংলা সাহিত্যের সহিত আর কি ভাবে যে সম্পৃক্ত, তাহা শঙ্করের বুদ্ধির অগম্য।

বেহারের উপর রাগ করিয়া যাঁহারা বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের কি ধারণা যে, বাংলা দেশে চাকুরি অফুরন্ত? সেখানেও তো হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। সেখানেও তো চাকুরির জন্য লাঠালাঠি ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং অবশেষে অপমান। না, চাকুরির মোহ পরিত্যাগ না করিলে বাঙালীর মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষের যে প্রদেশেই সে থাকুক, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মানুষের মত যদি থাকিতে পারে, তবে আর কোন সমস্যাই আপাতত থাকিবে না। এতদিন সে যেখানে গিয়াছে, চাকুরিয়া-বেশে গিয়াছে, শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে হাকিমি চালে হুকুম চালাইয়াছে, লোকে তাহাদের ভয় করিয়াছে, কিন্তু ভালবাসে নাই; তাহারা যে উপকার করিয়াছে, সে উপকারকেও কেহ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ভালবাসা না থাকিলে কিছুই হৃদয়গ্রাহ্য হয় না।

শঙ্করের নটবর ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। লোকটা পাস-করা ডাক্তারও নয়। চরিত্রে অনেক দোষ আছে। মদ খায়, চরিত্র খারাপ। চরিত্রহীনতার জন্য বহুবার বহুস্থানে লাঞ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু সকলে তাহাকে ভালবাসে।

পামর ভদ্র সকলেই তাহার প্রিয়, কেহ তাহার পর নয়। এই ভালবাসার যে কতখানি, তাহা সেবার নির্বাচনদ্বন্দ্বে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া হ। প্রতিপত্তিশালী 'ফীলিং'-ওয়ালা অনেক বেহারী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, হারা চেষ্টাও কম করে নাই, কিন্তু নটবর ডাক্তারের সহিত কেহ পারিল নটবর ডাক্তার দাঁড়াইয়াছেন—এ কথা প্রচারিত হইবামাত্র সকলে াকেই ভোট দিতে উদ্যত হইল। কয়েকজন বেহারী-বন্ধুকে সন্তুষ্ট িবার জন্য শঙ্করকে অবশেষে গিয়া অনেক তোষামোদ করিয়া নটবরকে ই দ্বন্দ্ব হইতে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছে। উইথ্‌ড্র না করিলে সে-ই র্বাচিত হইত। কই, বেহারী-বাঙালী 'ফীলিং' তো নটবরকে স্পর্শ করিতে রে নাই!

সহসা মুশাই কথা কহিল।

বিশঠো রূপিয়াকা বড়া জরুরৎ পড়লো ছে—

কি জরুরৎ?

মুশাই চুপ করিয়া রহিল।

কিসের জরুরৎ রে?

মুশাই এবারও কোন উত্তর দিল না, জিহ্বা ও তালু সহযোগে টকটক শব্দ তে করিতে গরু হাঁকাইতে লাগিল।

শঙ্কর বুঝিল, প্রকৃত কারণটা বলিতে মুশাই রাজী নয়, বিশ্বাসযোগ্য একটা থাও সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই চুপ করিয়া আছে।

শঙ্করও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোকে নিয়ে তো মুশকিল দেখছি, রোজ রোজ টাকা পাব কোথায়?

মুশাই নিরুত্তর। সে জানে, বাবু টাকা দিবেই; এবং শঙ্করও জানে টাকা যখন চাহিয়াছে তখন না দিয়া উপায় নাই, দিতেই হইবে। না লেই কামাই করিতে শুরু করিবে। হঠাৎ এমন আত্মগোপন করিবে যে, ছুতেই ধরা-ছোঁয়া যাইবে না। একবার তো অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিয়া নিতে হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে যে অশ্বত্থ-গাছটাকে সকলে উপদেবতার শ্রয়স্থল ভাবিয়া ভয় করে, সেই গাছটারই মগডালে মুশাই উঠিয়া বসিয়াছিল,

সেইখানেই নাকি দিবারাত্রি বসিয়া থাকিত, কেবল রাত্রে যখন তাহার বউ যমুনিয়া তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইত, তখনই সে একবার খাইবার জন্য নামিত। যমুনিয়াকে খোশামোদ করিয়াই শঙ্কর তাহার নাগাল পাইয়াছিল। মুশাইয়ের সহিত সম্পর্ক এরূপ যে, তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। মুশাই না থাকিলে তাহার কাজকর্ম সব অচল, সে-ই তাহার দক্ষিণহস্ত। নিরক্ষর হইলে কি হয়, এমন তাহার বুদ্ধি এবং শঙ্করের পছন্দ অপছন্দ সে এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছে যে, শিক্ষিত কোন ভদ্রলোকের পক্ষেও তাহার স্থান পূরণ করা অসম্ভব। সে একাধারে গাড়োয়ান, খানসামা, পাচক, ম্যানেজার এবং হিতৈষী। তা ছাড়া শঙ্করকে সে ছেলেবেলায় খেলাইয়াছিল, অর্থাৎ তাহার রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য ছিল, কোলে করিয়া বেড়াইত। তখন তাহার বয়স বোধ হয় বছর দশেক ছিল এবং শঙ্কর ছিল বছর খানেকের। এখন উভয়ের বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু সম্পর্ক বদলায় নাই। এখনও সে যেন শঙ্করের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য, এবং শঙ্কর যেন দুরন্ত দামাল শিশু।

গাড়ি আসিয়া বাড়ির নিকট থামিল।

অমিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, খুকী ঘুমাইয়াছে।

ভাগ্যে আজ তোমার আসতে দেরি হ'ল, আমি এইমাত্র রান্নাঘর থেকে আসছি।

এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলে! কেন?

খুকীকে ঘুম পাড়াতে দিয়ে তরকারিটা পুড়ে গিয়েছিল। বড্ড বায়নাদার হয়েছে বাপু, কিছুতে কি ঘুমুতে চায়! চাপড়ে চাপড়ে হাত ব্যথা হয়ে যাবে তবু ঘুমুবে না। চাপড়ানো বন্ধ করলেই বলবে—চাপলাও।

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

এই তাহার ঘর। এখানে বাঙালী-বেহারী সমস্যা নাই, দেশোদ্ধারের দুশ্চিন্তা নাই। এখানে আছে কেবল অমিয়া এবং তাহার কন্যা। কোন উগ্রতা নাই, কোন উন্মাদনা নাই, কোন অভিনবত্ব নাই। ইহাই তাহ

নির্ভরযোগ্য আশ্রয়-নীড়, বাহিরের সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করে, সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া পরিচর্যা করে, সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করে। খিল লাগাইয়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেল, বাহিরের পৃথিবী তাহার কলরব-কোলাহল লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, ভিতরে রহিল সহজ সরল অনাড়ম্বর শান্তি। সহসা তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল, মা রাঁচিতে কেমন আছেন কে জানে?

ঝুম্‌ঝুর আসিয়া বসিয়া ছিল।

ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে হাঁকিতেছিল, এ খোখিদিদি—

অমিয়া পূজার ঘরে ছিল, জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, ঝুমঝুর, আজ যে মানুষের ভাষায় কথা কইছ বড়?

ঝাপসা কণ্ঠে ঝুম্‌ঝুর উত্তর দিল, গলুলা বঝি গেলছে মাইজী।

অর্থাৎ গলা ধরিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে সে তাহার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কুকুর, বিড়াল, মহিষ, মুরগি, না হয় অন্য কোন প্রকার জানোয়ারের ডাক ডাকিয়া তাহার আগমনবার্তা ঘোষণা করিত। আজ তাহার গলা ধরিয়া গিয়াছে বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেছে না। মুখ দেখিয়া মনে হইল, এ জন্য যেন সে লজ্জিত।

ঝুম্‌ঝুর ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। বেঁটে লোকটি, ছোট মুখখানি। পাতলা একজোড়া গোঁফ তৈলাভাবে রুক্ষ। থুতনির কাছে কাঁচাপাকা ছাগলদাড়ি, তাহাও তৈলাভাবে শ্রীহীন। গালের লোলচর্মে বলিরেখা। ছোট ছোট চক্ষু দুইটি কোটরগত এবং পীতাভ। একটি পা কাটা। নিজেই এখান ওখান হইতে কাঠের টুকরা, চামড়ার বেল্‌ট প্রভৃতি যোগাড় করিয়া লইয়া একটি কাঠের পা বানাইয়া লইয়াছে। তাহারই উপর ভর দিয়া একটি লাঠির সাহায্যে সে চলা-ফেরা করে। মাথায় একটি টিনের বাটি—সম্ভবত কোকোজেমের খালি টিন, টুপির মত করিয়া পরিয়াছে। তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলে, সে সংক্ষেপে নিজের জীবনের যে পরিচয় দেয়, তাহা এই—

দক্ষিণে তাহার বাড়ি। সেইখানেই এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে সে চাষবাসের কাজ করিত। লাঙল চষিত, 'কামৌনি' 'দৌনি' সব করিত। তাহার বিবাহও হইয়াছিল। তিনটি পুত্র আছে। একটি বেশ সাবালক আর দুইটি ছোট ছোট। প্রভুর জন্য কাষ্ঠসংগ্রহার্থে সে একদিন একটা বড় গাছে উঠে। সেখান হইতে পা ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া তাহার পা-টি ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রভু অবশ্য তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন, নিজের গরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে সরকারী হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট খারাপ, পা কিছুতেই বাঁচিল না। হাঁটুর উপর হইতে কাটিয়া না দিলে ডাক্তারবাবু বলিলেন, তাহার প্রাণও নাকি বাঁচিত না। পা-টি সুতরাং কাটিয়া ফেলিতে হইল। কাটা পা লইয়া চাষের কাজ চলে না, সুতরাং ন্যায্যভাবেই প্রভু তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। খঞ্জ বেকার স্বামীর সহিত থাকা নিরর্থক বুঝিয়া স্ত্রীও আর একটি সমর্থ লোকের সহিত 'চুমানা' করিল। তাহার এই আচরণকেও ঝুম্‌মর অন্যায় বলিয়া মনে করে না। প্রভুর নিকট ঋণ করিয়া সে জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবাহ দিয়াছিল, পুত্র খাটিয়া সেই ঋণ শোধ করিতেছে। নাবালক ছেলে দুইটি তাহার সঙ্গেই আছে। স্ত্রী তাহাদের নাকি বড় মারধোর করে, তাই তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারাও ভিক্ষা করে, তাহাদেরও সে জানোয়ারের ডাক ডাকিতে শিখাইতেছে। ভাগ্যে ছেলেবেলায় একজন ওস্তাদের কাছে এই বিদ্যাটা শিখিয়াছিল, তাই বাবু-ভেইয়াদের মনোরঞ্জন করিয়া কোনরূপে দিনগুজরান করিতেছে। অমনি ভিক্ষা চাহিলে রোজ রোজ লোকে দিবে কেন? অন্ন সংস্থানের এই উপায়টিও সম্প্রতি কিন্তু বন্ধ হইবায় উপক্রম হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা বসিয়া গিয়াছে।

ঝুম্‌মর অমিয়ার একজন পোষ্য। প্রায়ই আসে। অমিয়ার আর একজন পোষ্যও আছে—সুরদাস। সে জন্মান্ধ। ভজন গায়। দাইটিও কিছুদিন হইতে চারিটি ছেলে-মেয়ে লইয়া অমিয়ার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মাসখানেক হইতে ক্রমাগত আমাশয়ে ভুগিতেছে, ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে, কাজ করিতে পারে না। অমিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাড়াইয়া দিলে চারিটি শিশুসহ রোগে অন্নাভাবে হয়তো রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। স্বামীটা পাগল, কোথায় কখন থাকে ঠিক নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হয়, খিড়কির দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীর উপর তম্বী করে। ভাবার্থ—খবরদার, যেন সে কোনক্রমে বেচাল না হয়, সতীত্বই আসল ধর্ম, ইজ্জৎ যেন ষোল আনা বজায় থাকে—ইত্যাদি। ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া চুমাও খায়। আবার কোথায় উধাও হইয়া যায়। এককালে শঙ্করের বাবার গাড়ি ঘোড়া ছিল, এখন সে সব কিছু নাই, আস্তাবলটা খালি পড়িয়া আছে। তাহাতেই দাইটা সন্তান-সন্ততি লইয়া থাকে।

এতগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া অমিয়া এতটুকু বিরক্ত নয়। শঙ্কর সাহিত্য লইয়া যখন মাতিয়া ছিল, তখন অমিয়া যথাসাধ্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সেই সাহিত্যেরই রসগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহার মনে হইত, সাহিত্যরসিক না হইতে পারিলে শঙ্করের মন পাওয়া যাইবে না। কিছু রস যে সে না পাইত তাহা নয়, কিন্তু তাহা তাহার প্রাণ-মনকে তেমন নাড়া দিত না। অনেকটা যেন কর্তব্যবোধেই সে শঙ্করের এবং সাময়িক লেখক-লেখিকাদের রচনার সহিত পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করিত। এখন সে সব দিন গিয়াছে। শঙ্কর মাতিয়াছে পল্লী-উন্নয়ন লইয়া। গরিব-দুঃখীদের কিসে ভাল হয়, ইহাই এখন তাহার ধ্যান-জ্ঞান। অমিয়াও তাই যথাসাধ্য গরিব-দুঃখীদের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করে। তাহার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু, ততটুকুই করে। স্বামীকে সুখী করাই তাহার উদ্দেশ্য। সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা এসব করিয়া ঢের বেশি আনন্দও পায়। আনন্দের আর একটা গোপন কারণও আছে। কলিকাতায় শঙ্কর যেমন ছিল, এখানে আসিয়া আর তেমনটি নাই। তাহার স্বভাব অনেক বদলাইয়াছে। মুখে অবশ্য সে শঙ্করকে কখনও কিছু বলে না। কলিকাতায় যখন সে মদ খাইয়া অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরিত, তখনও যেমন সে নীরব ছিল এখনও তেমনই নীরব আছে। কিন্তু সে সব বোঝে। শঙ্কর তাহাকে যতটা নির্বোধ মনে করে, ঠিক

ততটা নির্বোধ সে নয়। উৎপলবাবুর স্ত্রী সুরমার মত হয়তো সে বিদুষী নয়, কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে তাহার মন কখনও ভুল করে না। শঙ্কর যখন কুপথে যায়, তখন সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ না পাইলেও তাহার অন্তর্যামী মন যেমন আসল সত্যটি বুঝিতে পারে, কুপথ হইতে সুপথে যখন ফিরিয়া আসে তখনও তেমনই পারে। কিছুই তাহার মনের অগোচরে থাকে না। কলিকাতায় শঙ্কর যখন বিপথগামী হইয়াছিল, তখন তাহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি, কিন্তু খুব বেশি বিচলিত সে হয় নাই ; তাহার কারণ শঙ্করের মহত্ত্বের প্রতি তাহার গভীর আস্থা ছিল। সে জানিত, সোনাতে কখনও কলঙ্ক লাগিবে না। সাময়িকভাবে একটু ছাই বা ধুলা যদি লাগেও, তাহা যথাকালে আপনি উড়িয়া যাইবে। উহা লইয়া বেশি হৈ-চৈ করিলে সুবর্ণ-অধিকারীর সুবর্ণ-চরিত্রে জ্ঞানের অভাবই সূচিত করে। এখন আবার স্বর্ণের স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সব দীন-দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ দিয়া তাহার স্বামীর স্বাভাবিক মহত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সব দীন-দরিদ্রের সেও সেবা করিতে উৎসুক। তাহার এই মনোভাব যদিও কলিকাতায় সাহিত্যচর্চা করিবার মত শুষ্ক কর্তব্যবোধ-মাত্রই নয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের প্রেরণার মত আবেগপূর্ণও নয়। অমিয়ার প্রধান লক্ষ্য—শঙ্কর, অন্য কিছু নয়।

খোখিদিদি—এ খোখিদিদি—আব—

দাত্‌তি।

খোখিদিদি উঠানে বাঘা কুকুরটার ঘাড়ে চড়িয়া তাহার কান মোচড়াইতেছিল। বলিষ্ঠ বাঘা অস্ফুট কুঁ-কুঁ শব্দ করিতে করিতে তাহার এই স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। ঝুম্‌মরের প্রতি খোখিদিদির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে সে নিস্তার পাইয়া বাঁচিল। দাত্‌তি।—বলিয়া খোখিদিদি প্রবীণ গিন্নীর মত ঝুম্‌মরের দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া তাহার হুঁশ হইল যে, রিক্তহস্তে যাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। তখন সে ফিরিয়া মাকে ডাকিল।

মা, ঝম্‌মু—তাল দাও।

যাচ্ছি।

অমিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটু তাড়াতাড়িই সিল, তাহার ভয়—পাছে খুকী ঝুম্‌মরকে ছুঁইয়া ফেলে। মেয়ের তো র সঙ্গে ভাব, এখনই হয়তো উহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বাঘাকে ছুঁয়েছ ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া খুকী বলিল, না।

'হাঁ'কে খুকী 'না' বলে।

তবে দাঁড়াও গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিই মাথায়।

অমিয়া পুনরায় পূজার ঘরে ঢুকিল এবং গঙ্গাজল আনিয়া মেয়ের মাথায় ছিটাইয়া দিল।

গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা।

খুকী মাথা পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া বলিল, গগ্‌গা গগ্‌গা—এবং হাসিল।

সর্দিতে নাক বন্ধ, 'গঙ্গা' উচ্চারণ হয় না।

আলো দাও।

জলের ছিটা চোখে মুখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চমৎকার লাগে।

না, আর দিতে হবে না।

তাহার পর ঝুম্‌মরের দিকে ফিরিয়া অমিয়া বলিল, তুই আর চাল নিয়ে কি করবি ? দুপুরে বরং ছেলে দুটোকে নিয়ে এখানেই খাস।

ঝুম্‌মর সেলাম করিল। তাহার পর সসঙ্কোচে হাসিয়া ধরা-গলায় পুনরায় আবেদন জানাইল, এক টুকরা পাঁওরোটি মিলতিয়ে মাইজী, রাতিসে ভুখলো ছি—

গ্রামের দুইটি বেকার বাঙালী যুবককে উৎসাহিত করিয়া শঙ্কর এখানে একটি বেকারি স্থাপন করাইয়াছে। শঙ্কর সেখান হইতে রোজ পাঁউরুটি লয়। ঝুম্‌মর শঙ্করেরই উচ্ছিষ্ট পাঁউরুটি মাঝে মাঝে দুই-এক টুকরা খাইয়া দেখিয়াছে। চমৎকার খাইতে। একটু চা দিয়া ভিজাইয়া লইলে তো আরও চমৎকার, চিবাইতে হয় না, ভিজিবামাত্র নরম তুলতুল করে।

গরিব মানুষের আবার পাঁউরুটি খাওয়ার শখ কেন রোজ রোজ ? মুড়ি খাও না চারটি।

ঝুম্‌মর একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

খুকী বলিল, পালুটি কাবে? পালুটি? দিত্‌তি।

খুকী ভাণ্ডারঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মীট-সেফে কোথায় পাঁউরুটি থাকে, তাহা তাহার অজানা নাই।

বাবা বাবা, মেয়ের কত্তাত্তির জ্বালায় গেলাম!

মেয়ের পিছু পিছু অমিয়াও ভাণ্ডারঘরে ঢুকিল এবং ঝুম্‌মরের জন্য এক টুকরা রুটি তাহার হাতে দিল।

আল্‌গোছে দিও, ছুঁয়ো না যেন।

আত্‌তা।

শঙ্কর এতক্ষণ বাহিরের ঘরে নানাবিধ লোকপরিবৃত হইয়া নানারূপ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিল। একটু ফাঁক পাইয়া সে ভিতরে আসিল একটু চায়ের আশায়। পূজা সারিয়া অমিয়া এই সময় একটু চা পান করে, শঙ্করও প্রায়ই এ সুযোগ ছাড়ে না। আসিবামাত্র খুকু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

মানে—কোলে কর। কোলে তুলিয়া লইতে হইল।

তোমার চা খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

না। এস না।

হাময়ো এক জরা দিও মাইজী।

মুখপোড়ার পাঁউরুটি চাই, চা-ও চাই! সুখ আর ধরছে না!

হাসিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া অমিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

গল্‌লা বঝি গেলছে মাইজী।

হাসপাতাল থেকে ওষুধ নাওগে যাও না। তোমাদের জন্যে তো হাসপাতাল করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝুম্‌মর বলিল যে, হাসপাতালে সে গিয়াছিল, তাহার গলায় কি একটা ঔষধ তাহারা লাগাইয়াও দিয়াছিল, কিন্তু কোন উপকারই হয় নাই, বরং আরও বেশি বসিয়া গিয়াছে।

অমিয়া শঙ্করকে বলিল, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুটি তেমন সুবিধের নয়। হয় কিছু জানে না, নয়, গরিবদের ভাল ক'রে দেখে না। আমাদের দাইটার আমাশা তো মাসখানেক থেকে কিছুতেই সারছে না, অথচ রোজ ওষুধ খাচ্ছে।

কি করি বল, শিক্ষিত লোক দেখেই তো রাখা হয়েছে। এখুনি বেরুব একবার, তখন খোঁজ করব।

ঝুম্মরকে বলিল, চা পিকে হামারা সাথ তুম চলো, দাবাকা ইন্‌তিজাম কর দেঙ্গে।

শঙ্কর হিন্দী ভাল জানে না। হিন্দী, ভাঙা উর্দু, মোচড়ানো বাংলা প্রভৃতি মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় যা-হোক করিয়া কাজ চালাইয়া লয়।

'ইন্‌তিজাম' শব্দটা ঝুম্মর ভাল বুঝিল না, কিন্তু শঙ্করের কথার সারমর্ম বুঝিতে তাহার বিঘ্ন হইল না। সে বসিয়া রহিল।

ঝুম্মরকে সঙ্গে লইয়া শঙ্কর হাসপাতালে গিয়া দেখিল, সেখানে অনেক রোগী ভিড় করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু নাই। তিনি উৎপলকে দেখিতে গিয়াছেন। উৎপলের নাকি পরশু হইতে শরীর খারাপ। শঙ্করও তিন-চারদিন উৎপলের খবর পায় নাই, উৎপলের বাড়িতে যায় নাই। সে ঝুম্মরকে হাসপাতালে বসাইয়া উৎপলের বাড়ি চলিয়া গেল।

৬

নিজের বাড়ির সম্মুখের প্রশস্ত গোলাপ-বাগানে দাঁড়াইয়া উৎপল কয়েকটি সদ্য-ক্রীত মূল্যবান গোলাপ-চারার বিষয়ে মালীকে উপদেশ দিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

তোমার কথাই ভাবছিলাম। এত লোকের এত উপকার ক'রে বেড়াচ্ছ, আমার একটু কর না!

হয়েছে কি তোর?

সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ, ও-ধারের স্নো-কুইনটার কি দশা, এ দিকে এভারেস্টও যায়-যায়, ডিউক অব ওয়েলিংটন পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

শঙ্করকে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া উৎপল বলিল, অমন ভ্রূকুটি করবার দরকার নেই, খুব সাংঘাতিক কিছু নয়—উই ভার্সাস we। তামাকের জল দিয়ে দিয়ে পরিশ্রান্ত হয়েছি, তোমার যদি কিছু জানা থাকে বল।

সহসা থামিয়া বলিল, অনেকক্ষণ সিগারেট খাও নি মনে হচ্ছে।

পকেট হইতে সোনার সিগারেট-কেস বাহির করিয়া উৎপল সেটি শঙ্করের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া শঙ্কর বলিল, তোমাকে তখনি বলেছিলাম, ওই প্রমথ ডাক্তারকে রেখো না, লোকটা বড় বেশি কথা বলে আর একের নম্বর ফাঁকিবাজ।

কেন, কি করেছে ?

এখনই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বহু রোগী ব'সে আছে, অথচ তার পাত্তা নেই। হাসপাতালে ব'লে এসেছে যে, তোমার নাকি অসুখ, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ। তোমার যে কিছু হয় নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

উৎপল অপ্রতিভ হইল।

I stand rebuked, আমিই ডেকে পাঠিয়েছি—ভদ্রলোক এখানেই আছেন।

কি হয়েছে তোর ?—শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

চলতি ভাষায় সর্দি, ডাক্তারি ভাষায় ইনফ্লুয়েঞ্জা।

এতেই এত ভয় ?

ভয় অসুখকে নয়, সুরমাকে। আয়, ভেতরে আয়।

ভিতরের সুবিস্তৃত দালানে প্রমথ ডাক্তার ও বীরু খানসামা ছিল। প্রমথ ডাক্তার বীরু খানসামার অন্তরে সম্ভ্রম উদ্রেক করিবার মানসেই সম্ভবত তাহাকে সবিস্তারে বুঝাইতেছিলেন, ব্রংকাইটিস-কেট্‌ল কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, ফুটবাথ দিতে হইলে জলের উত্তাপ ঠিক কতটা হওয়া প্রয়োজন, অ্যাস্‌পিরিন নামক ঔষধের ডোজ কি, দোষ কি কি, অ্যাস্‌পিরিন না দিয়া তিনি ভেরামন কেন ব্যবহার করিতেছেন, উৎপলের চিকিৎসার জন্য

কি কি 'প্রিকশান' তিনি লইবেন, এমন সময় উৎপল ও শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। বীরু পাশের দরজা দিয়া স্যুট করিয়া সরিয়া পড়িল, প্রমথ ডাক্তার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এটা কি ?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

ওটা হচ্ছে সার্ ব্রংকাইটিস-কেট্‌ল। বেশি কাশি হ'লে কিংবা লাংসে কোন অ্যান্‌টিসেপ্‌টিক দিতে হ'লে আমরা এটা ব্যবহার করি।

বুক-খোলা জামা গায়ে মালকোঁচা-মারা প্রমথ ডাক্তার বেশ সপ্রতিভ ব্যক্তি।

উৎপল প্রমথ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি হাসপাতাল ফেলে চ'লে এসেছেন, শঙ্করের কাছে আমাকে বকুনি খেতে হ'ল।

হাসপাতালে আপনি গিয়েছিলেন নাকি সার্, কোনও দরকার ছিল ?

একটা রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম।

ও, চলুন, যাচ্ছি। কি রোগী ?

ঝুম্‌মরকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর কাশি কিছুতেই সারছে না, গলাটা ভেঙেই আছে, ও-ই বেচারার উপজীবিকা—

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন।

ঝুম্‌মর ? কই চিনতে পারছি না।

ওই যে কাঠের পা প'রে বেড়ায়, সব রকম জানোয়ারের ডাক ডাকে—

বুঝেছি, বুঝেছি। ওর গলায় তো রোজ থ্রোট-পেণ্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সার্, মেণ্ডেল্‌স পিগ্‌মেণ্ট দিচ্ছি—

কমছে না কিন্তু।

গলার ভেতরটা একবার 'এক্স্‌প্লোর' করা দরকার। করিই বা কি ক'রে ? আমাদের ল্যারিংগোস্কোপ যে নেই।

উৎপল এতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সবিস্ময়ে ব্রংকাইটিস-কেট্‌লটাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এটা কি আমার জন্যেই এনেছেন ?

হ্যাঁ, সার্।

হাসপাতাল থেকে ?

হ্যাঁ. সার্। রাত্রে যদি কোন ফীট অব কাফ-টাফ হয়, দরকার লাগতে পারে।

উৎপলকে নীরব দেখিয়া এবং তাহার নীরবতার কারণ অনুমান করিয়া লইয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলবে—ব্র্যাণ্ড নিউ আছে।

আছে নাকি ? আচ্ছা। আপনি আপনার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ডিরেক্‌শন সব লিখে রেখে যান।

সার্‌টেন্‌লি।

ডাক্তারবাবু পটাং করিয়া বুক-পকেট হইতে ফাউণ্টেন-পেন বাহির করিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, ল্যারিংগোস্কোপ আনা যদি দরকার মনে করেন, আনিয়ে নিন না। বলেন তো আজই অর্ডার প্লেস ক'রে দি।

প্রমথ ডাক্তার লিখিতে লিখিতে উত্তর দিলেন, দিন।

আয়, ওপরে আয়।

উৎপল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

যাচ্ছি।

প্রমথ ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া শঙ্কর বলিল, ঝুম্‌ঝুমরটাকে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি তা হ'লে গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।

সার্‌টেন্‌লি। একটা গার্গারিস্‌মা দিয়ে দেখি আজ। পরে না হয় লিংটাস দেব যদি না কমে।

উৎপল উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, শঙ্করও অনুগমন করিল। ডাক্তারবাবু প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ও ডিরেক্‌শন লিখিতে লাগিলেন।

সুরমা স্পিরিট-স্টোভে দুধ গরম করিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইতেই উৎপল সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার জন্যে শঙ্করের কাছে বকুনি খেতে হ'ল।

সুরমা কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে চাহিল ও স্পিরিট-স্টোভ হইতে দুধটা নামাইয়া নিপুণভাবে একটি সুদৃশ্য পেয়ালায় ঢালিল, এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না, এবং নীরবে বাহির হইয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া উৎপল বলিল, দশটা বাজল।

তা হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। দুধ গরম ক'রে কাপে ঢালা হয়ে গেছে যখন—

পাশের ঘরের একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

ওই শোন। এখন সমস্যা ওইটি গলাধঃকরণ করতে হবে। কি মুশকিল!

ক্ষিধে না থাকলে জোর ক'রে খাওয়াবে নাকি?

ওই তো মজা, জোর করে না কখনও। ঠিক সময়ে দুধটি গরম ক'রে পাশে রেখে যাবে, হয়তো একবার বলবে—খাও। যদি না খাও, কিছু বলবে না, মুখও যে ভার ক'রে থাকবে তা নয়; কিন্তু কেমন যেন সর্বদা মনে হতে থাকবে, নেপথ্যে ও চটেছে। সে এক ভারি অস্বস্তি, তার চেয়ে খাওয়াই ভাল।

এ সময়ে রোজ দুধ খাস নাকি?

তোমার ওই ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তারের বাক্য সুরমার কাছে বেদবাক্য।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র উৎপল থামিয়া গেল এবং নিতান্ত ভালমানুষের মত মুখ-চোখ করিয়া বলিল, শঙ্করকে বলছিলাম—সুরমা হয়তো তোমাকে কফি না খাইয়ে ছাড়বে না।

কফির কথা বলতেই গিয়াছিলাম।

শঙ্কর বলিল, আমাকে কিন্তু এখনই উঠতে হবে। বেশি দেরি করতে পারব না।

উৎপল গম্ভীর মুখে সুরমার দিকে চাহিয়া ছদ্ম আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, না, দেরি করিয়ে দিও না, দেশের কাজে বাধা দেওয়া অন্যায়। একেই তো তুমি সকালবেলা ডাক্তারকে ডেকে গরিবদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছ।

আমরা গরিব নই ব'লে বিনা চিকিৎসায় মারা যাব নাকি?

এই বলিয়া স্থরমা কোণ হইতে একটি চৌকো ফ্রেম বাহির করিল এবং স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া অর্ধ-সমাপ্ত কার্পেটের আসনটিতে মন দিল।

কেন, আপনারা তো চরণবাবুকে ডাকতেন! তিনি ডাক্তারও ভাল, লোকও ভাল, কারও চাকরি করেন না, তিনিই তো বেশ ছিলেন, তাঁকে ছাড়লেন কেন?

তাঁকেই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম, তিনি এলেন কই? তাঁকে পাওয়া শক্ত। পরশু বললেন, দুটোর সময় যাব; কাল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে বীরুকে পাঠালাম সাইকেল ক'রে। তিনি বললেন, আমার এখনও কয়েকটা গরিব রোগী দেখতে বাকি আছে, তাদের দেখে তবে যাব। আমরা যেন বড়লোক হয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

স্থরমা কার্পেটের আসন বুনিতে শুরু করিয়া দিল। উৎপল দুধের কাপটা তুলিয়া এক চুমুক পান করিয়া নীরবে আবার তাহা নামাইয়া রাখিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়া গেল। আসনের ফুলগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, বাঃ, আসন তো বেশ চমৎকার হচ্ছে আপনার!

উৎপল বলিল, তা হচ্ছে। কিন্তু ওতে তোমার বা আমার কোন লাভ নেই।

কেন?

আমরা পাব না। প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতের বসবার জন্যে একটি ক'রে দান করবেন উনি ঠিক করেছেন।

বেশ ভালই তো।

ও! কুন্তলা দেবীর সঙ্গে তোমারও আলাপ হয়েছে নাকি?

না। তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

তিনিই এই সদিচ্ছাটি ওঁর অন্তরে—তোমরা সাহিত্যিকেরা যাকে বল উদ্বুদ্ধ, তাই করেছেন। তোমারও সহানুভূতি দেখে মনে হচ্ছে যে, হয়তো তোমার সঙ্গেও—

না, আলাপ হয় নি; কিন্তু আলাপ করতে হবে। ওঁর সম্বন্ধে যা শুনি,

তাতে মনে হয় চেষ্টা করলে ওঁকে হয়তো আমাদের কাজে লাগাতে পারা যায়।

সুরমা আপনার মনে বুনিতেছিল। এই কথায় বলিল, আপনাদের এই ধরনের পল্লীসংস্কার ওর পছন্দসই নয়।

তাই নাকি? বলছিলেন কিছু?

একদিন কথা হয়েছিল, তাতেই আভাসে বুঝলাম।

'আভাস' কথাটা শুনিয়া উৎপল ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় দুধের কাপটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিল।

আভাসে বুঝেছেন মানে?

এ নিয়ে তর্ক করলে হয়তো ওর মনের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যেত, কিন্তু তা আর আমি করি নি। কি হবে বাজে তর্ক ক'রে ওর সঙ্গে?

বিশেষত হেরে যাবার সম্ভাবনাটাই যখন বেশি।

উৎপল ফোড়ন কাটিল।

ইহাতে সুরমা চটিল না, মুচকি হাসিয়া বলিল, তাও ঠিক। ভয় করে ওর সঙ্গে তর্ক করতে।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খুব মুখরা নাকি?

না। খুব কম কথা বলে। দারুণ সংস্কৃত জানে ব'লে ভয় হয়।

উৎপল দুধের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিল এবং বলিল, সুরমার কাছে ওঁর সঠিক চিত্রটি পাবে না।

কেন?—শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

দুজনে বন্ধুত্ব হয়েছে।

সুরমা হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

উৎপল বলিল, পাশের ঘর থেকে সেদিন আমি যতদূর আন্দাজ করেছিলাম, তাতে ওঁর সম্বন্ধে একটি উপমাই আমার মনে হয়েছিল, সুরমা যদি রাগ না করে বলতে পারি।

সুরমা সহাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। কোন প্রকার মন্তব্য করিল না।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, কি উপমা, শুনিই না ?

কামান। কামানও বেশি কথা বলে না, কিন্তু যখন বলে, তখন একেবারে কন্‌ভিন্‌সিং।

কফির সরঞ্জাম লইয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং ছোট একটি টেবিলে সেগুলি রাখিয়া টেবিলটি আগাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আর কিছু খাবেন ?

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

না।

সহসা শঙ্করের অনাহারক্লিষ্ট ঝুম্‌ঝুমরের কথা মনে পড়িল। সে হয়তো তাহার অপেক্ষায় এখনও হাসপাতালে বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবু এবার তাহাকে ঠিকমত ঔষধ দিয়াছেন কি না কে জানে!

প্রমথ ডাক্তার বেশ করিৎকর্মা ব্যক্তি। বছর তিনেকের মধ্যে উৎপলদেব এই প্রাইভেট ডাক্তারখানাটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজের বেশ একটি 'ফিল্‌ড' 'ক্রিয়েট' করিয়া লইয়াছেন। যে সম্প্রদায় ডাক্তারের মধ্যে কেবল চিকিৎসকই নয়, ধূর্ত ফন্দীবাজ বন্ধু কামনা করেন (যিনি আইনজ্ঞ অথচ নিরঙ্কুশ), সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমথ ডাক্তার বেশ পশার জমাইতে পারিয়াছেন। মিথ্যা সার্টিফিকেট লিখিয়া, দারোগাকে তোয়াজ করিয়া, জেলার গবর্মেণ্ট অফিসারদের সহিত ভাব-সাব রাখিয়া, উৎপল এবং শঙ্করের তোষামোদ করিয়া তিনি নিজের আসনটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইন্‌জেক্‌শন-বিশারদ বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার একটা বিশেষ খ্যাতি হইয়াছে। 'জকৃসন' দিয়া তিনি বহু দুঃসাধ্য ব্যাধি নাকি সারাইয়াছেন।

গুলাব সিং আসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি শহর হইতে ইন্‌জেক্‌শনের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া ফিরিয়াছেন। গোঁফ চুমরাইতে চুমরাইতে সালঙ্কারে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন।

হড়বড়মে থে হুজুর, ভুখভি লগা থা, হালওয়াইকো কহা—জলদি করো ভাই। উ ভুজতে চলা, মঁ্যয় খাতে চলে। কুছ দেরমে খেয়াল পড়া ই তো গলৃতি কাম কর রহেঁ হেঁ, ই শালা তো কাচ্চা পুড়ি খিলা রহা হ্যা। খেয়াল হোনেকা সাথহি খানা বন্দ কর দিয়া—মগর তবভি ভোগনা পড়া ডাকৃটারবাবু।

ক্যা হুয়া ?

কাচ্চা আঁটা পেটমে লসক্ গিয়া।

লসক্ গিয়া ?

লসক্ গিয়া। দো রোজ দস্ত নহি উতৃরা, বাই তক ভি গায়েব—ঠসম্-ঠাস্। এক ডাকৃটরকো বোলায়েঁ। উ আ কর এক সুই দিহিন, এক পুরিয়া দিহিন, পাঁচ রুপিয়া ফিস লিহিন। নেহি উৎরা। দুসরা এক ডাকৃটর বোলায়েঁ ইস ডাকৃটরনে দো সুই দিহিন, এক শিশি দাবাই দিহিন, ফিস লিহিন আাট রুপিয়া। কুছ নেহি হুয়া। পেট বেশি ফুলা দিহিস্। মঁ্যয় আর দেবি নেহি কিয়া, তড়াক শহর চলে গ্যয়ে। ডাকৃটার চৌধুরীকো বোলায়েঁ। ডাকৃটার চৌধুরী আচ্ছাহ তরেসে দেখিন্, পেটমে যন্তর বৈঠাইন, বাঁমে ফিতা লপ্টাকে প্রিসার দেখিন্, পেসাব জামিন কিহিন্,—পাঁচ রুপিয়া ফিস দেনে পড়া পেসাব জামিন-কা বাস্তে। দেখ শুন কর ডাকৃটর চৌধুরী কহিন্, দেখো ভাই, ইসকা দো তরেকা জকৃসন্ হ্যা মেরা পাস, এক বড়া, এক ছোটা। বড়া জকৃসন্ দেনেসে চার ঘণ্টাকা অন্দর পাথানা উতর যায়ে গা, ছোটামে দো রোজ লাগে গা। বড় জকৃসন্‌কা কিমৎ ষোল রুপেয়া, ছোটকা পাঁচ রুপেয়া, অব তুমহারা ক্যা খাঁইস কহো ? মঁ্যয় কহা, বড় জকৃসন্‌ই দিজিয়ে হুজুর, জান যা রহা হ্যায়। ইয়া বড়া এক জকৃসন্ চুতড়্‌মে ঘোঁৎ দিহিন, আউর মিশ্‌রিকে লায়েক এক দাবা ছ চাম্মচ লেকে গরম পানিমে ঘোরকে পিলা দিহিন। জহরকা লায়েক তিতা। মগর হ্যাঁ—

উদ্ভাসিত মুখে গুলাব সিং চুপ করিলেন।

হো গিয়া ?

একদম সাফ—দোহি ঘণ্টে মে।

ইহা শুনিয়া প্রমথ ডাক্তার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করত মাথা নাড়িয়া

ভাঙা হিন্দীতে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার ঠিক ঔষধটি নির্বাচন করিয়া যদি জক্‌সন্‌ দেন ফল তো হইবেই।

বেশক্‌।

গুলাব সিং গোঁফ চুমরাইয়া অতঃপর তাঁহার আগমনের কারণটি ব্যক্ত করিলেন।

আজ্ঞে হুজুর, মেরা ঘর পর তশরিপ লাইয়ে।

কাহে?

মেরা জানানাকো এক জক্‌সন্‌ দেনা পড়ে গা।

ক্যা হুয়া উনকো?

উ যব চলতি ফিরতি হ্যায়, তব তো ঠিক হ্যায়, কোই তক্‌লিফ নহি। মগর যবহিউ বাচ্চেকো গোদমে লে কর বৈঠি, যব তক সিধা রহি, তব তক তো ঠিক রহি, মগর যবহি দুধ পিলানো কো লিয়ে সাম্‌নেহ ঝুকি, কচ—

গুলাব সিং কোমরে হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন কচ করিয়া ব্যথাটা কোথায় লাগে।

এক ঘণ্টা বাদ আওয়েঙ্গে।

একঠো কড়া জক্‌শন্‌ দেনে পড়ে গা।

আচ্ছা।

বাত তব পাক্কা?

পাক্কা।

পাকা কথা কহিয়া গুলাব সিংহের মনে হইল, দর্শনীটা অগ্রিম দিয়া দিলে ব্যাপারটা আরও পাকা হইয়া যাইবে। ন্যায্য খরচ করিতে তিনি কোন কালেই পশ্চাৎপদ নহেন। ট্যাঁক হইতে ডাক্তারবাবুর দক্ষিণাটি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং জোড়হস্তে কহিলেন, উঠা লিয়া যায় হুজুর।

ডাক্তারবাবু টাকা চারিটি লইয়া নমস্কার করিলেন। গুলাব সিংহও প্রতি-নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু একাই থাকেন, পরিবার দেশে। কিছুক্ষণ পূর্বেই কল সারিয়া ফিরিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ছিলেন। ভাবিলেন, এক চটকা ঘুমাইয়া

লইয়া তাহার পর গুলাব সিংহের স্ত্রীকে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়া আসিবেন। ইন্‌জেক্‌শন একটা দিতেই হইবে, না দিলে গুলাব সিংহের তৃপ্তি হইবে না। ঘুমাইতে যাইবেন, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তারবাবু, বিরজু ম'রে গেল না কি?

বিরজু কে? কি হয়েছে?

আপনি কিছু জানেন না? বিরজু কাঠ কাটছিল, হঠাৎ কুড়ুলটা ফসকে তার পায়ে লাগে। রক্ত কিছুতে বন্ধ হচ্ছিল না দেখে তাকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম যে।

কতক্ষণ আগে?

তা প্রায় ঘণ্টা দুই হবে।

আমি ছিলাম না। কলে বাইরে গিয়েছিলাম।

লোকটা বিনা চিকিৎসাতেই ম'ল তা হ'লে?

না, আমাদের কম্পাউণ্ডার খুব এক্‌স্‌পার্ট লোক, যা করবার করেছে ঠিক, চলুন দেখি, কি ব্যাপার!

হাসপাতালে গিয়া দেখা গেল, বিরজুর মৃতদেহের পাশে বসিয়া তাহার যুবতী স্ত্রী বুক-ফাটা হাহাকার করিতেছে। এক্‌স্‌পার্ট কম্পাউণ্ডারবাবু তাঁহার যথাসাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিরজু মারা গিয়াছে। কম্পাউণ্ডার-বাবুর যথাসাধ্য যে কতদূর তাহা ডাক্তারবাবুর অবিদিত ছিল না অবশ্য, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন, সবই তো করা হয়েছে দেখছি, সিরাম একটা দিলে ভাল হ'ত অবশ্য, কিন্তু তা তো আমাদের হাসপাতালে নেই।

শঙ্কর এসব কিছুই শুনিতেছিল না। ওই শোকার্ত বিধবাটার গগনবিদারী ক্রন্দনে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, আহা, অমন জোয়ান লোকটা অপঘাতে মারা গেল! ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন, কিছুই শঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। হঠাৎ তাহার কানে গেল, আমাদের একটা বড় সিরিন্‌জ্‌ পর্যন্ত নেই সার্,

গ্লুকোজ-টুকোজ দিতে এমন অসুবিধে হয়,—টেন সি. সি. সিরিন্‌জ্‌ দিয়ে, মানে, বার বার খুলে খুলে দিলে—

শঙ্কর বলিল, কি কি জিনিস আপনাদের দরকার তা তো আপনারাই ঠিক ক'রে দেন, আমরা টাকা দিয়েই খালাস। যা যা দরকার, তা তো আপনাকেই আনতে দিতে হবে।

সাব্‌টেন্‌লি। দিয়েছিলামও, কিন্তু সিবিল সার্জন ঘচাঘচ কেটে দিলে সব, এমন কি অ্যাক্রিক্লেবিন পর্যন্ত কেটে দিয়েছে সার্‌।

টাকা আমরা দিচ্ছি, সিবিল সার্জন কেটে দেবার কে?

প্রমথ ডাক্তার হাত উলটাইয়া এমন একটা সহাস্য মুখভাব করিলেন, যাহার অর্থ—ওই তো! আর বলেন কেন! ও লোকগুলার সব জায়গাতেই ফফরদালালি করা স্বভাব।

আমি ভাবছি—

কথাটা বলিয়াই শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেল।

কি ভাবছেন?

ভাবছি, ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস বন্ধ করতে না পারলে, হাসপাতালের কাজ ভাল হওয়া সম্ভব নয়।

সাব্‌টেন্‌লি। কিন্তু তা হ'লে মাইনেও বেশি দিতে হবে, পঁচাত্তর টাকায় কুলোবে না।

কত টাকা হ'লে কুলোয়?

অন্তত শ পাঁচেক।

শ পাঁচেক!

মৃদু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, তার কমে কি ক'রে হয়, বলুন?

অত আমাদের বাজেটে কুলোনো শক্ত।

সাব্‌টেন্‌লি। বাজেট নিয়েই তো যত গোলমাল। সিবিল সার্জন যে ঘচাঘচ কেটে দেন, তাঁরও ওজুহাত ওই বাজেট। আপনারা ওষুধ-পত্তরের জন্যে যত টাকা দেন—

আচ্ছা, চললাম।

হঠাৎ শঙ্কর হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর কম্পাউণ্ডারের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এ সব কবি-টবি নিয়ে চলাই দুষ্কর বাবা।

কম্পাউণ্ডার একটু হাসিল।

ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানায় আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিলেন না, গুলাব সিংহের স্ত্রীকে ইন্‌জেক্‌শন দিতে যাইতে হইবে। ক্যাল্‌সিয়াম বা ভিটামিন বা ওই জাতীয় কিছু একটা দিতেই হইবে। লোকটা ডবল ফী দিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার অপেক্ষায় একটি লোক এক হাঁড়ি দই, কিছু ভাল চিঁড়া এবং কয়েক ছড়া চমৎকার রম্ভা লইয়া বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল এবং দেহাতি হিন্দীভাষায় যাহা নিবেদন করিল, তাহার সারমর্ম এই—গুলাব সিংহের পত্নী ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাইয়া এই ভেটগুলি উপহার পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ডবল ফী-ও পাঠাইয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ইন্‌জেক্‌শন দিবার জন্য না আসেন, কারণ তিনি কিছুতেই ইন্‌জেক্‌শন লইবেন না। স্বামী কিন্তু না-ছোড়, তাই তিনি লুকাইয়া ডাক্তারবাবুকে এই অনুরোধটি জানাইতেছেন, ডাক্তারবাবু যেন টাল-বেটাল করিয়া কোনরকমে ব্যাপারটা গোলমাল করিয়া দেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে ভেটসহ ফীসটি হস্তগত করিয়া বাম গুম্ফপ্রান্তে মৃদু মৃদু তা দিতে দিতে সমস্ত ব্যাপারটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, মাইজীকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিও, ইন্‌জেক্‌শন আমি দিব না। কিন্তু গুলাব সিংকে ফাঁকি দিবার জন্য ইন্‌জেক্‌শন দিবার একটা অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহার গায়ে ছুঁচ ফুটাইব না, কিন্তু মাইজীকে এমন একটা ভাব করিতে হইবে যেন ফুটাইলাম। এইরূপ না করিলে গুলাব সিং হয়তো অন্য ডাক্তার ডাকিবে এবং সে ডাক্তার হয়তো মাইজীর এ অনুরোধ না-ও রক্ষা করিতে পারেন

এই বার্তা লইয়া লোকটি প্রসন্ন মনে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবুও অনুগমন করিলেন।

৮

বাড়ি ফিরিয়া শঙ্কর দেখিল, স্যুট-পরিহিত একটি তরুণকান্তি যুবক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। পদশব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শঙ্করকে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল, মুখভাবে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শঙ্করও কম অবাক হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোন বাক্যবিনিময় হইবার পূর্বেই যুবকটি পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে দিল এবং বলিল, আমি এই কোম্পানিকে রেপ্রেজেণ্ট করছি। আপনার হাতে অনেকগুলো ডাক্তারখানা. আমাদের যদি অর্ডার দেন, ভারি উপকৃত হব। হাসপাতালের জন্যে আমাদের স্পেশাল রেট আছে, এই দেখুন—

হেঁট হইয়া চামড়ার ব্যাগ হইতে কাগজপত্র বাহির করিতে লাগিল। শঙ্কর সবিস্ময়ে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল, তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। নিজের চক্ষুকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ চেহারা তো ভুল হইবার নয়! যুবকটি খুব অপ্রতিভভাবে নিজের কাগজপত্র দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু একবারও সে শঙ্করের চোখের দিকে চাহে নাই। নিজের কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কথাবার্তা চালাইতেছিল। ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল, প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচে। শঙ্কর একটিও কথা বলে নাই, কেবল সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া যুবকটি একগোছা কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গেও একটু দেখা ক'রে যেতে। অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন আমাদের কথা। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

কোথায় যাবেন?

স্টেশনে।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে বলিল, কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন আপনাকে করব।

কি, বলুন?

বেলা মল্লিক ব'লে কি আপনার কোন যমজ ভগ্নী ছিলেন?

ভ্রূভঙ্গীসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া যুবক বলিল, না। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

বারান্দার নীচেই বাইক ছিল। দ্রুতপদে নামিয়া যুবক তাহাতে চাপিয়া বসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিস্মিত শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বেলা মল্লিককে চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। বেলা মল্লিক? বেলা অবশেষে তাহার নারীত্বকেই অবলুপ্ত করিয়া দিল! প্রাক্-জীবনের এক ঝাঁক স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বেশিক্ষণ কিন্তু সেসব লইয়া বসিয়া থাকিতে সে পারিল না।

বাবা, তল, তা তান্‌দা হত তে।

খুকী আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহার পর আসিল স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী এবং বলিল, দশ পাউণ্ড কুইনিন অবিলম্বে দরকার। সেদিন তো অত কুইনিন দিল, আবার কুইদিন চাই! শঙ্করের সন্দেহ হইল, কুইনিন বোধ হয় চুরি হইতেছে। কিন্তু ভদ্রসন্তানকে সে কথা বলা যায় না। তাহা ছাড়া অমিয়ার সহিত উহার স্ত্রীর বন্ধুত্ব হইয়াছে। শঙ্কর কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল, কাল আসবেন।

৯

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে।

নিজের ঘরে ঝকঝকে পিতলের পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া নিবিষ্টমনে চরকা কাটিতে কাটিতে হাসি পুত্রটিকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছিল।

হাসির পরিধানে শুভ্র খদ্দরের থান, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখর জ্যোতি। সে যেন ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে। জ্বালা যে কেন, তাহা সে নিজেও জানে না। যাহা উচিত, যাহা বিবেক-সম্মত, সমস্তই সে করিতেছে, তবু সমস্ত অন্তর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গেল।

ছেলেটি ঠিক বাপের মত হইয়াছে। মৃন্ময়ই যেন শিশুরূপে আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তেমনই ধপধপে রঙ, তেমনই লাল চুল, তেমনই চোখ-মুখ সব। হাসি তাহার নাম রাখিয়াছে, তুমি।

কই, বলছ না, বল আবার।—

"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি।"

দুই-একবার ভুল করিয়া 'তুমি' অবশেষে ঠিক করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিল। চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাসি বলিয়া চলিল—

"সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজী দিল তুলে
বন্দার এক ছেলে।
কহিল, ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"

এই ভাবে রোজ চলে। হাসি সকালে রাঁধে, নিজে পড়ে, ছেলেকে পড়ায়, মৃন্ময়ের একটা ছবি সম্মুখে রাখিয়া ফুল-চন্দন দিয়া পূজাও করে। দুপুরে স্কুল। বৈকালে ছেলের সঙ্গে থাকে। তাহার সহিত খেলাও করে। বাহিরে কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। এমন কি শঙ্করও যে তাহার নিকট বার বার আসে, ইহাও সে পছন্দ করে না। ইহাই তাহার বর্তমান জীবন। নিঃসঙ্গ এবং কর্তব্যময়।

ব্যাঙ্কে আজ ধার লইবার দিন। অসম্ভব ভিড় হইয়াছে। কেবল সহি করিতে করিতেই শঙ্কর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কাহার ধার পাওয়া উচিত, কাহার উচিত নয়, কাহার ধার শোধ করিবার সংস্থান আছে, কাহার নাই, এসব বিচার করিতে গেলে শুধু যে বিলম্ব হইয়া যায় তাহা নয়, কেনারাম চক্রবর্তীকেও অসন্তুষ্ট করিতে হয়। তিনি যাহাকে যাহাকে সুপারিশ করিয়াছেন, শঙ্কর তাহারই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেছে। কেনারামবাবু অবশ্য প্রত্যেক দরখাস্তেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন যে, শঙ্কর নিজে ভাল করিয়া খোঁজ-খবর করিয়া যদি ধার দেওয়া নিরাপদ মনে করে, তবেই যেন ধার দেয়। কিন্তু তাহা শঙ্করের পক্ষে করা অসম্ভব। সে নির্বিচারে সহি করিয়া চলিয়াছে। মাথা-পিছু টাকা অবশ্য বেশি নয়, কেহ দশ, কেহ বিশ, কেহ পচিশ, কিন্তু মাথা অনেকগুলি, প্রায় দুই শত। ইহাদের প্রত্যেকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লওয়া শঙ্করের সাধ্যাতীত।

কাল ছট পরব। প্রত্যেকেরই টাকার দরকার এবং টাকার দরকার পড়িলে ধার করা ছাড়া অন্য কোন সদুপায় ইহাদের জানা নাই। উৎপলও বলিয়াছে, পর্বের সময় কাহাকেও যেন নিরাশ করা না হয়। আদেশের ভঙ্গীতে বলে নাই, অনুরোধ করিয়াছে।

সকলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। পথে হঠাৎ নেকিরাম মাড়োয়ারীর সহিত দেখা হইল।

রাম রাম, সোংকোরবাবু, রাম রাম। হাঁ, খুব কিয়া আপ দোনো, সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে।

হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত অদ্ভুত ভাষায় নেকিরাম দন্ত বিকশিত করিয়া সোল্লাসে উৎপলের এবং শঙ্করের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গরিব লোক সব কাঁহাসে রূপিয়া লানবে! হামি লোগ তো সব চোষ লিয়া। আপনেরা খুব করলেন। সামনে ছট পরব, কাঁহাসে রূপিয়া মিলবে বেচারাদের! খুব কিয়া, যশ হো গিয়া, সব কোই ধন ধন্ বোলছে, বা বা বা বা বা!

খানিকক্ষণ এই জাতীয় বক্তৃতার পর 'রাম রাম' কহিয়া নেকিরাম পাশের গলিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। শঙ্কর মনে মনে বেশ একটু পুলকিত হইল। নেকিরাম কাপড়ের দোকান ছাড়া মহাজনী কারবারও করে। এই ছুট পরবের মরশুমে গরিব চাষীদের বেশ চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ কিছু বাণিজ্য করিত, এবার বেচারার সে গুড়ে বালি পড়িল। সত্যই ইহারা গরিবদের রক্ত শোষণ করে। নিজের মুখেই আবার বলা হইতেছে, হামি লোগ সব চোষ লিয়া! ইহারা না গেলে দেশের উন্নতি নাই। নিপু ঠিকই বলে। এই ক্যাপিটালিস্টরাই দেশের শত্রু, ইহাদের সর্বগ্রাসী লোভ দেশের সর্বস্বই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। অথচ ইহাদের বাদ দিয়া চলিবারও উপায় নাই। অর্থবানদের অর্থেই দেশের যত কিছু সৎকার্য হয়। ধনীদের বদান্যতাতেই গরিবদের উপকারের আশা। ক্যাপিটালিস্ট উৎপল যদি টাকা না দিত, তাহা হইলে তো এসব কিছুই হইত না। কমিউনিস্টদের মতে, এই উৎপলই কিন্তু উচ্ছেদযোগ্য। অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতেছিল। কমিউনিস্টদের মতে ভক্তিপরায়ণা অমিয়াও উপহাসাস্পদ।

প্রণতা অমিয়ার পাশে খুকীও হেঁট হইয়া বলিতেছে, নমো—নমো।

নিকার-বোকার পরানো থাকাতে ভাল করিয়া হেঁট হইতে পারিতেছে না, কিন্তু বেচারার চেষ্টার ত্রুটি নাই। কুঁথাইয়া কুঁথাইয়া যথাসম্ভব পিঠ বাঁকাইয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া মাথাটা নত করিয়াছে।

শঙ্করের পদধ্বনি শুনিয়া তাহার প্রণাম করা ঘুচিয়া গেল। ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, তে? মানে, কে?

তাহার পর শঙ্করকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহার হাঁটু দুইটি জাপটাইয়া ধরিয়া উদ্ভাসিত মুখে বলিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর বলিল, কিচ্ছু হ'ল না।

কিত্তু ওলো না?

না।

খুকী পুনরায় চেষ্টা করিল। চোখ বড় বড় করিয়া দুইবার আবৃত্তি করিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে, ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া বলিল, কিচ্ছু হচ্ছে না।

আজ সকালে নিমাই আসিয়াছিল এবং সে খুকীকে ভারতচন্দ্রের ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে লেখা দুই লাইন কবিতা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

খুকী কেবল শিখিয়াছে—'ভম্ ভম্ ভম্ বাদে' এবং তাহাই সমস্ত দিন যখন তখন আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। কোলে উঠিয়াই খুকী শঙ্করের বুক-পকেটে হাত চালাইয়া সিগারেট-কেস ও ফাউণ্টেন-পেনটি হস্তগত করিয়া ফেলিল এবং সতৃষ্ণ নয়নে হাতঘড়িটার পানে চাহিল। বাবার এই জিনিসগুলির উপর তাহার টান সবচেয়ে বেশি। চকচকে সেলুলয়েডের পুতুল অথবা দম-দেওয়া মোটরের উপর তাহার তাদৃশ মমতা নাই; প্রথম প্রথম যে মোহ ছিল, এখন আর তাহাও নাই। মোটরের চাবিও খারাপ হইয়া গিয়াছে, পুতুলটাও খুব সুস্থ নয়। বাঘা কুকুরটা চিবাইয়া তাহার একটা পা শেষ করিয়া দিয়াছে এবং দুইটা জিনিসই বারান্দার কোণে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। খুকুর টান বাবার এই জিনিসগুলির প্রতি। সিগারেট হোল্ডারটা তো দখলই করিয়া লইয়াছিল, এখন অবশ্য সেটা হারাইয়া গিয়াছে, তাহার কথা মনেও নাই।

দাও, ওগুলো দাও।

খুকী মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিল।

দাও তো, লক্ষ্মী। ও বাবা, তোমার কি সুন্দর কোট হয়েছে, দেখি দেখি!

কোটের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেই কোট সম্বন্ধে তাহার সত্য মতামত সে অকপটে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

কোত কুলে দাও।

অমিয়ার জেদাজেদিতেই ওগুলা পরিতে হয়। কোট-পাজামা পরিয়া থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা করে না।

বাবা, কুলে দাও।

আরো সুন্থ, ইধার আবো ?

উঠানের অন্ধকার কোণ হইতে কে কথা কহিয়া উঠিল। খুকী সঙ্গে সঙ্গে কোল হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর।

যমুনিয়া নাকি ?

অমিয়া ভাঁড়ারঘরে ধুনা দিতেছিল, বাহির হইয়া বলিল, আবার কে, কাল ছুট, টাকা দাও।

মুশাই গাড়োয়ানের বউ যমুনিয়া।

এখুনি তো মুশাই কুড়ি টাকা ধার নিয়ে গেল !

ওক্‌রসে একো পয়সা কি হামরো মিলতে। পঁদ্রে রূপিয়া লেতেই নেকি মাড়বারিয়া আর পাঁচ রূপিয়া লেতেই ওহি মুসহরনি ছৌঁড়ি।

কি রকম ?—ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

যমুনিয়া সবিস্তারে যাহা বর্ণনা করিল, তাহাতে শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। নেকি মাড়োয়ারী, রাজীব দত্ত এবং মুকুন্দ—এ অঞ্চলের এই তিনজন মহাজন নাকি তাহাদের সমস্ত খাতকদের ডাকাইয়া শাসাইয়াছেন যে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি সকলে তাহাদের ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ না করে, তাহা হইলে প্রত্যেকের নামে নালিশ করা হইবে এবং বন্ধকী জিনিস কাহাকেও আর ফেরত দেওয়া হইবে না। সত্যই নালিশ করিলে আদালতের বিচারে কি হইবে তাহা যদিও ঠিক জানা নাই ; কিন্তু নালিশের নামেই গরিব লোকেরা ভয় পায়। তাহারা ভাল করিয়াই জানে যে, যাহার প্রচুর অর্থ আছে, আদালতে শেষ পর্যন্ত তাহারই জয় হয়। তাহারা আজ সকলে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছে, উহাদেরই ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত। সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করিলে ছটের জন্য আবার তাহারা নূতন ঋণ পাইবে এ আশ্বাসও মহাজনরা অবশ্য দিয়াছে। কিন্তু যমুনিয়া অত চড়া সুদে আর টাকা ধার করিতে পারিবে না, কারণ বন্ধক দিবার মত তাহার আর কিছুই নাই। তাহার যাহা কিছু ছিল, সব উহাদের গর্ভেই গিয়াছে। যমুনিয়া মলিন বস্ত্রাঞ্চল চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুশাই আজকাল তাহাকে দেখে না, আজকাল রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত যায় না, ওই

মুসহরনি ছুড়ীটার কাছে পড়িয়া থাকে, ছুঁড়ী তাহার স্বামীকে ‘গুণ’ করিয়াছে। ও মানুষ নয়, ডাইনী। তাহার পর সহসা চক্ষু হইতে বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া শঙ্করের দিকে সে আগাইয়া গেল এবং একটু ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোঁহি তো রূপিয়া দে দে করিকে ওকৃর এইসন্ হালত্ করলি।

ছট করবি তুই কার জন্যে?

ওক্‌রে বাস্তে।

ওই স্বামীর মঙ্গলার্থেই সে উপবাস করিয়া ছটপূজা করিবে।

ক টাকা চাই?

দশঠো।

শঙ্কর বিনাবাক্যব্যয়ে দশটা টাকা বাহির করিয়া দিল।

অমিয়া কিছু বলিল না, মুচকি হাসিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন আনন্দে গর্বে ভরিয়া উঠিল। পূর্বে শঙ্করের যথেচ্ছ খরচ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইত, এখন আর হয় না। এই লোকটির মনের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া চলিতে পারিলেই আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা সে বুঝিয়াছে।

যমুনিয়া চলিয়া গেল না। টাকাটা খুঁটে বাঁধিয়া খুকীকে কোলে লইয়া হিন্দী ছড়া বলিতে বলিতে ঘুম পাড়াইতে লাগিল, চান্দু মামু চান্দু মামু, আরে আবো বারে আবো, নদীয়া কিনারে আবো, সোনাকা কটোরামে দুধু ভাতু নেনে আবো।

শঙ্কর বাহিরের আরাম-কেদারাটায় অন্ধকারে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহাদের ব্যাঙ্কের এতগুলা টাকা ওই রক্তশোষক মহাজনদের সিন্দুকে গিয়া ঢুকিল! গরিব প্রজারা এক পয়সা পাইল না!

সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে। খুব কিয়া আপলোগ।—নেকি মাড়োয়ারীর বিকশিতদন্ত মুখচ্ছবিটা তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল।

অন্ধকার রাত্রি, চতুর্দিক নির্জন। নিপু আপন ঘরে বসিয়া একমনে ডায়েরি লিখিতেছিল—

একটা কালো কুক্কুরী আমার অস্থি-মাংস চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে। স্নায়ু-শিরা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর-মন আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার নাই, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না, কিছুতেই সে আমাকে শান্তি দিবে না। অর্থ, সামর্থ্য, ভয়-প্রদর্শন, যুক্তি—সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। কিছুতেই তাহার মন পাইতেছি না। কুক্কুরী, ঘৃণিতা কুক্কুরী, কালো, কুৎসিত, কদর্য, কিন্তু তবু, ওঃ—না, নিজেকে সম্বরণ করিতে হইবে, এ জ্বালাময় অপমান আর সহ্য করিতে পারি না, আর সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কেন? কেন আত্মসম্বরণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিতেছে? এ দুর্বলতার অর্থ কি? অর্থ সেই সনাতন সংস্কার, মনের সেই অন্ধ গোঁড়ামি, যাহা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া নিষেধকে মানে, যাহা প্রত্যক্ষ যুক্তিকে বিদলিত করিয়া অযৌক্তিক মানস-বিলাসে আত্মহারা হয়, যাহা কাল্পনিক পরলোকের আশ্বাসে অতি বাস্তব ইহলোককে তুচ্ছ করে। না, এ দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সকলকে বায়োলজির মূল তত্ত্ব শিখাইতে হইবে, যে বায়োলজি জীবধর্মের স্থূল রূপটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, যাহা জীবকে জীব হিসাবেই গণ্য করে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতার কুয়াশা সৃষ্টি করিয়া যাহা জীবনের বৃহৎ সত্য আবৃত করিয়া ফেলে না। আগে জীবন, তাহার পর জীবনদর্শন। বল্‌শেভিক রাশিয়া সহজ সুস্থ যৌন-মিলনের সমস্ত কৃত্রিম বাধা দূর করিয়া দিয়াছে। সে দেশে ভালবাসা ছাড়া আর কোনও নিগড় নাই। ও-মেয়েটা কি আমাকে ভালবাসে না? হয়তো বাসে, কিন্তু বাসিলেও প্রকাশ্যত তাহা স্বীকার করিতে পারে না, সমাজের নিষ্ঠুর আইন আছে। সে পারিলেও আমি পারি না, আমার একটা ঝুটা আত্মসম্মানের বুর্জোয়া মুখোশ আছে, আমি কিছুতেই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে পারি না যে, আমি একটা নীচজাতীয়া অস্পৃশ্যার

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। বল্‌শেভিক রাশিয়ায় হয়তো এই অবৈজ্ঞানিক চক্ষুলজ্জা থাকিত না, হয়তো ওই মেয়েটাও ওই নাক-বসা সর্বাঙ্গে-ঘা লোকটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইত না, হয়তো—

চিন্তা-স্রোতে সহসা বাধা পড়িল। অদূরে হাড়ী-টোলায় একটা কলরব উঠিল। মনে হইল, যেন মারামারি বাধিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি কলম রাখিয়া ডায়েরি বন্ধ করিয়া ফেলিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ শুনিল, তাহার পর আলোটি কমাইয়া বালিশের তলা হইতে টর্চটি লইয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল। অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, অস্পৃশ্যদের উন্নতি-সাধন তাহার কাজ, অস্পৃশ্যদের মধ্যেই তাই সে বাসা বাঁধিয়াছে। একেবারে ঠিক মধ্যে নয়, কাছাকাছি। হাড়ী-পাড়ার একটু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাহার পরিচ্ছন্ন ছোট বাসাটি। উৎপলই বাসাটি করাইয়া দিয়াছে। অস্পৃশ্য বালক-বালিকাদের পাঠশালাটি এই বাসারই প্রশস্ত বারান্দায় রোজ বসে। নিপুই তাহাদের পড়ায়। ইহাদের কাছে সে 'গুরুজী' বলিয়া পরিচিত। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে অন্ধকারে নিপু আগাইয়া গেল। অকুস্থলে পৌঁছিয়া তাহাকে কিন্তু গতিবেগ সম্বরণ করিতে হইল। আর অগ্রসর নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। এ কি কাণ্ড! সুরা-উন্মত্ত একদল হাড়ী অশ্রাব্য ভাষায় চীৎকার করিতেছে। ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া মুশকিল। ভিড়ের ভিতর হইতে একটা আর্তনাদও উঠিতেছে—ভিতরে কে যেন কাহাকে প্রহার করিতেছে। নিকটেই ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা না জ্বলিলেও ক্ষতি ছিল না। একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিপু ইতস্তত করিতে লাগিল—কি করা যায়! কিছু একটা অবিলম্বেই করা উচিত, আর্তনাদটা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কি যে ঠিক হইতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন—সকলেই অসংলগ্ন ভাষায় চীৎকার করিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না, কেহই থামিবেও না। উহাদের ভিতর গিয়া হাতাহাতি করিতে পারিলে তবে হয়তো উহাদের থামানো যায়; কিন্তু তাহা করা নিপুর পক্ষে অসম্ভব। সে দূর হইতেই দুই-একবার টর্চ ফেলিয়া 'এই এই, কিয়া হুয়া' জাতীয় দুই-একটা উক্তি করিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ভিড়ের ভিতরে

আর্তনাদটা প্রবলতর হইয়া উঠিল। কেহ কাহাকেও খুন করিয়া ফেলিতে না তো! অসম্ভব নয়। নিপুর স্মরণ হইল, জারের যুগে রাশিয়ান শ্রমিক ভড্‌কা পান করিয়া আপনজনকে হত্যা করিয়া ফেলিতেছে, এ কাহিনী বহুবার বহু পুস্তকে পাঠ করিয়াছে। আর একটু আগাইয়া গিয়া আর একবার টর্চ ফেলিল! এবার সে দেখিতে পাইল এবং যাহা দেখি তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মোটা কালো একটা হাড়ি একটা রোগা ছোঁড়ার বুকের উপর বসিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চড়াইতেছে এবং ক্রুদ্ধ কর্কশকণ্ঠে বলিতে এইসে, এইসে, এইসে—। ছোঁড়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, বাপ বাপ রে, বাপ রে—

মোটা হাড়িনী শুধু মোটা নয়, মোটা এবং কালো। তাহার রুক্ষ চু আলুলায়িত, কাপড় ছিন্নভিন্ন, মুখে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা। আর একবার ফেলিয়া নিপু ইহাকে চিনিতে পারিল। এই মাগীই তো (মাগী কথা তাহার মনে হইল) চুপড়ি, কুলো, মোড়া বুনিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় কি বেড়ায়। দিনের আলোকে নিপু ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। তখন ইহার বেশ শান্তশিষ্ট সলজ্জ মূর্তি, মুখের আধখানা ঘোমটা দিয়া ঢাকা থাকে ভদ্রলোক দেখিলে একটু তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ফিসফিস করিয়া কথা বলে সেই ব্যক্তির এখন এই মূর্তি এবং প্রতাপ! ছোঁড়াটা নিদারুণ চীৎক করিতেছে। নিপু আর একবার ক্ষীণভাবে চেষ্টা করিল, আরে, এই, কি করতা হ্যায় তুমলোগ? ছোড়ো, ছোড়ো, উঠো।

মহিষমর্দিনী তাহার কথায় দৃক্‌পাত পর্যন্ত করিল না। কিন্তু বার ব টর্চের আলো ফেলাতে ভিড়ের অন্য দুই-একজন যে বিচলিত হইয়াছে, তাহ প্রমাণ মিলিল। একটা রোগা লম্বা-গোছের হাড়ী আগাইয়া আসি আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, কোওন হ্যায় রে?

নিপু আমতা আমতা করিয়া বলিল, আরে, শুনো—শুনো—

ভা-গো শালা।

একটা বুড়া আগাইয়া আসিল। তাহারও পা টলিতেছিল, কিন্তু,

একেবারে সম্বিৎ হারায় নাই। নিপুকে সে চিনিতে পারিল। আরে শালা ডূপ র, গুরুজী আইলো ছে। সেলাম গুরুজী।

তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ইহার প্রত্যুত্তরে খুব একটা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিল, গোলি মারো গুরুজীকো।

চতুর্থ একজন জড়িতকণ্ঠে মন্তব্য করিল, গুরুজী ফুলশরিয়াকা পিছোমে পড়লো ছে—

ইহাতে পঞ্চম একজন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মোটা কালো হাড়িনীটা ছোঁড়াটাকে সমানে মারিয়া চলিয়াছে। কাহারও সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন অতিশয় স্বাভাবিক এবং সঙ্গত একটা ব্যাপার ঘটিতেছে, বিচলিত হইবার কিছু নাই। কেবল সেই বুড়াটা একবার মাত্র বলিল, হে গে, আব ছোড়ি দে, ঢের ভেলো।

নিপু নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিল, এখন কি করা যায়! বাইক করিয়া অবিলম্বে থানায় গিয়া খবর দেওয়া উচিত, না, শঙ্করের কাছে যাওয়া উচিত! এমন ভাবে চলিলে তো—

অপ্রত্যাশিতভাবে কিন্তু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। নটবর ডাক্তার সহসা অশ্বপৃষ্ঠে ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইয়া গেলেন এবং ঘোড়ার লাগাম টানিয়া প্রশ্ন করিলেন, এত্‌না হাল্লা কাহেঁ রে?

মন্ত্রবলে সমস্ত যেন ঠিক হইয়া গেল। যে যেখানে ছিল, সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নটবর ডাক্তারকে সেলাম করিল। মোটা হাড়িনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিজের প্রায়-উলঙ্গ কলেবরকে লুকাইবার জন্য কুঁড়ে-ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়াটা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছোঁড়া অপর কেহ নয়, উহারই তৃতীয় পক্ষের স্বামী, ন্যায়সঙ্গতভাবেই মার খাইতেছিল। ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়াটাকে বেড়ার খুঁটায় বাঁধিলেন এবং সহাস্যমুখে উহাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইলেন।

তাড়ি, তাড়ি, খালি তাড়ি! শালা লোগ তাড়ি পিতে পিতেই জাহান্নমমে যাগা। দেখে কেইসে তাড়ি, লে আও। ইতিমধ্যে একজন ঘরের ভিতর হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া আনিয়াছিল। নটবর ডাক্তার তাহার

উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। সসম্ভ্রমে একজন মাটির খুরিতে ভরিয়া তাড়ি আগাইয়া দিল, ডাক্তারবাবু একবার শুঁকিয়া দেখিলেন, তাহার পর এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন।

ছি ছি ছি ছি, যেত্তা রদ্দি মাল পিতে হো শালে লোগ। যাও, পাঁচ বোতল আচ্ছা মাল লে আও।

পকেট হইতে পাঁচটা টাকা ঝনাৎ করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। টাকা কুড়াইয়া লইয়া একজন বলিল, কালালি কি আভি খুললো হোতৈ?

যা করকে বোলো—ডাক্‌টারবাবু মাংতে হেঁ।

একজন টিপ্পনী কাটিল, ওকর বাপ দেতেই।

যাহার বাড়িতে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন, সে ব্যক্তি ঔষধের বাক্স মাথায় লইয়া পিছু পিছু আসিতেছিল, সে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে নটবর ডাক্তার আদেশ করিলেন, তুম আগু বঢ়ো, হম আতে হেঁ।

লোকটি তাড়ির আড্ডায় ডাক্তারবাবুকে সমাসীন দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস করিল না। এমনিতে ডাক্তারবাবু কোন না কোন সময়ে গিয়া ঠিক পৌঁছিবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিলে বাঁকিয়া বসিতে পারেন এবং একবার বাঁকিয়া বসিলে নটবর ডাক্তারকে সিধা করা শক্ত। কিছু না বলিয়া সে ব্যক্তি নীরবে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ নিপুকে লক্ষ্য করেন নাই। নিপুর সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল না, মুখ চিনিতেন, কিন্তু স্বল্পালোকে তাহাও চিনিতে পারিলেন না।

কোন্ হ্যায়?

আমি।

নিপু আগাইয়া আসিল।

ও, মাস্টার মশাই! কি বিপদ! আসুন আসুন। আর একঠো মোড়া লে আও। আসুন। চলবে নাকি এক-আধ পাত্তর?

আজ্ঞে না, আমি ওসব 'টাচ' করি না।

টাচ করেন না? ও! আপনিই না untouchability দূর করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন? বসতে তো দোষ নেই, বসুন না।

আর একটা মোড়া আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু নিপু বসিল না। হাড়ীদের তাড়ির আড্ডায় বসিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নটবরের উপর তাহার রাগও হইল। কোথায় ইহাদের সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করিবে, না, আরও পাঁচ বোতল আনিতে দিল! শঙ্করকে বলিয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

আমার একটু কাজ আছে, চললাম—এখন আর বসব না।

বাসায় আসিয়া বাইক করিয়া সে শঙ্করের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। শঙ্কর কিন্তু তখন দ্বিতলে বসিয়া কবিতার ছন্দ মিলাইতেছিল। চাকরের মুখে নিপুদার আগমনবার্তা শুনিয়া পুলকিত হইল না।

বল গিয়ে, বাবু শুয়ে পড়েছেন, এখন দেখা হবে না।

নিপু চাকরের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতলের আলোকিত বাতায়নটার দিকে একবার চাহিয়া আবার বাইকে সওয়ার হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত রাত্রে ছয় মাইল রাস্তা বাইক করিয়া আসিলাম, শঙ্কর তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করিল না! এ কিছু নয়, টাকার গরম। ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির লক্ষণ। উৎপল আসিলে তাহাকে শঙ্কর এমনভাবে ফিরাইয়া দিতে পারিত কি?

নির্জন মাঠের ভিতর দিয়া নিপু বাইক করিয়া চলিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিতেছে, কি একটা অজানা ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত। নিপুর মনে কিন্তু এতটুকু আনন্দ নাই। মাতাল হাড়ীগুলা পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিল, অথচ তাহাদের মঙ্গলের জন্য সে কি না করিতেছে! নটবর ডাক্তারটারও স্পর্ধা কম নয়, তাহাকে ওই স্থানে বসিয়া তাড়ি খাইতে অনুরোধ করিতেছিল! ছোটলোকগুলাকে মদ ঘুষ দিয়া তাহাদের দলপতি সাজিয়াছে! স্কাউণ্ড্রেল! আবার তাহার মনে হইল, ক্যাপিটালিজ্‌ম—

ক্যাপিটালিজ্‌মের এই আর এক রূপ, ইহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি নাই।

১২

ছট পরব লাগিয়াছে।

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ রঙিন কাপড় পরিয়া নদীতীরে চলিয়াছে। হলুদ এবং গোলাপী রঙের প্রাধান্যই বেশি। গরিব লোকেরা সাধারণ কাপড়ই রঙাইয়া লইয়াছে। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাহাদের কেহ কেহ রেশম পরিয়াছে। বেশির ভাগই স্ত্রীলোক, শাড়ি এবং ওড়নারই আধিক্য। যাহার যেটুকু জুটিয়াছে, তাহাতেই সে বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হইয়াছে। সকলেরই মুখে একটা শান্ত সৌম্য নিষ্ঠার ভাব। যাহারা 'ছট' করে, তাহারা সকলেই উপবাসী থাকে, প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নিকট মানত করিয়া আন্তরিক নিষ্ঠাভরেই সেই মানত শোধ করিতে যায়।

ছট পরবের নিয়ম অনেক। কালীপূজার পর হইতে ছয় দিন নিয়ম করিয়া থাকিতে হয়। কালীঠাকুরের ভাসানের পর পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া নূতন হাঁড়িতে পাক করিয়া প্রথম তিন দিন খুব শুদ্ধাচারে নিরামিষ আহারাদি করা নিয়ম, কোন দিন কদ্দূ ভাত, কোন দিন মটর-ডাল ভাত। চতুর্থ দিনে 'খর্ণা', অর্থাৎ সেই দিনই আসল পূজার আরম্ভ। উঠানেই পূজা হয়। কাঁচা মাটির সরায় ও হাঁড়িতে পূজার উপকরণ সজ্জিত করাই বিধি, পোড়া মাটির বাসন চলে না। কাঁচা মাটির বাসনগুলিকে সিন্দূর দিয়া অলঙ্কৃত করিয়া তাহাতে ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি প্রভৃতি রাখা থাকে। একটি বাসনে কাঁচা দুধে পাঁচ রকম ফলের রস দিয়া পঞ্চামৃত তৈয়ারি হয়, আর একটি পাত্রে দুধে আলোচাল সিদ্ধ করিয়া পূর্ব হইতেই 'আরোয়াইন' প্রস্তুত করা থাকে। যে ছট করিবে, সে পূজা করিয়া একনিশ্বাসে যতটা পারে ততটা দুধ পান করিয়া লয়। দুগ্ধ পান করিবার সময় যদি কেহ 'টোকে' অর্থাৎ নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেয়, কিংবা যদি কোন রকম শব্দ হইয়া বা

গোলমাল হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর খাওয়া হয় না। ছটের প্রথম দিন হইতেই 'সুপে' অর্থাৎ কুলাতে নানারূপ ফল সাজাইতে হয়, যাহার যেমন সামর্থ্য সে সেইরূপ করে। বড়লোকেরা দেয় আঙুর আপেল কিসমিস—গরিবেরা দেয় পেয়ারা খেজুর আতা নারিকেল। ইহা ছাড়া সকলকেই দিতে হয় 'খাবুনি'—আটা এবং ঘি দিয়া প্রস্তুত পিষ্টকজাতীয় একরূপ খাবার। চতুর্থ দিন সকালে একনিশ্বাসে দুগ্ধ-পান, রাত্রে 'আরোয়াইন'। পঞ্চম দিন উপবাস। ডালায় 'সুপ' সাজাইয়া সেটি মাথায় লইয়া একবার সকালে, একবার বিকালে নদীতীরে যাইতে হয়, আকাশের দিকে হাত তুলিয়া সূর্যপূজা করিতে হয়। পঞ্চম দিন অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসের পর ষষ্ঠ দিনে নদীতীরে গিয়া সূর্যপূজা করিয়া তবে উপবাস ভঙ্গ করিতে হয়। ছট পরবে এ দেশের জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস—সকলেই জানে, নিষ্ঠাভরে করিলে নিশ্চয়ই দেবতা মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। উপবাস ছাড়াও কেহ কেহ আবার কঠোরতর মানত করে। নিজের বাড়ি হইতে নদীর তীর পর্যন্ত হয়তো সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে যায়, এই কৃচ্ছ্রসাধনই তাহার মানত। কেহ হয়তো ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে, এই দীনতাস্বীকারই তাহার মানতের অঙ্গ। একবার মানত করিয়া ফেলিলে তাহা শোধ করিতেই হয়, মানত করিয়া যদি কেহ অসুস্থতাবশত তাহা পালন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হইয়া অপর কাহাকেও তাহা করিয়া দিতে হয়। করিয়া দিবার লোকাভাবও হয় না। ছট বড় জাগ্রত দেবতা, কোনও অনিয়ম সহ্য করেন না। দাইয়ের স্বামীটা যে পাগল হইয়া গিয়াছে, মুশাইয়ের মামার সর্বাঙ্গে যে ধবল হইয়াছে, সকলের বিশ্বাস ছটপূজায় অনিয়ম করাই নাকি সেসবের আসল কারণ। একজন নাকি উপবাসের সময় লুকাইয়া খাইয়াছিল, আর একজনের নাকি 'সুপে' পা ঠেকিয়া গিয়াছিল, সেই পদস্পৃষ্ট 'সুপ' লইয়াই সে নাকি দেবতার পূজা চড়াইয়াছিল, তাই এই শাস্তি।

ডালা মাথায় লইয়া দলে দলে নরনারী চলিয়াছে। যে একটু অবস্থাপন্ন, সে সঙ্গে বাজনাও লইয়াছে। বাজনা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়—একটা ঢোল,

একটা কাঁসি এবং একটা সানাই। কিন্তু উহাতেই উৎসব জমিয়া উঠিয়াছে।

শঙ্কর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া এই জনস্রোত দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, আমরা এতদিন ইহাদের ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, ইহাদের পূজা-পার্বণকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়াছি। কিন্তু এই যে দলে দলে নরনারী উপবাস করিয়া প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইতে চলিয়াছে, তাহা কি সত্যই উপহাস করিবার মত জিনিস? নব-বৎসরে ছাপানো-হরফে ডাকযোগে 'শুভকামনা' জানানো অপেক্ষা কি ইহা বেশি হাস্যকর? ইহাদের মত আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাস কি আমাদের আছে? আছে বইকি। আমরা ইংরেজী অক্ষরে লেখা অথবা বিদেশী-মুখ-নিঃসৃত যে কোন অসম্ভব তথ্য নির্বিচারে বিশ্বাস করি। নাসা কুঞ্চিত করি কেবল দেশী জিনিসের বেলায়। কেরোর 'বুক অব নাম্বার্স' আমরা অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত পড়ি, আমাদের যত অবিশ্বাস দেশী গণক-ঠাকুরকে। ফ্রী-ম্যাশনের আংটি পরিতে আমাদের আপত্তি নাই, মাদুলি পরিতেই যত আপত্তি। উপবীতগুচ্ছ গলায় ঝুলাইয়া রাখা অযৌক্তিক মনে করি, টাই ঝুলাইবার বেলায় কিন্তু যুক্তির কথা মনে পড়ে না, বারম্বার মনে হয়, নট্‌টা ঠিকমত হইয়াছে কি না, রঙটা ঠিক ম্যাচ করিয়াছে কি না! রাশিয়ার সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র লইয়া আমরা উন্মত্ত, কিন্তু হিন্দু সভ্যতায় যে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীতি আছে, তাহা প্রণিধান করিবার মত ধৈর্য আমাদের নাই। উদ্দীপ্ত হইলেই শঙ্করের চা পান করিবার বাসনা হয়। চেয়ারে শুইয়াই হাঁকিল, অমিয়া!

অমিয়া একটু দিবানিদ্রা উপভোগ করিবে বলিয়া শুইয়া ছিল, সবে বেচারীর তন্দ্রাটি আসিয়াছিল, উঠিয়া আসিতে হইল।

কি?

একটু চা কর না।

অমিয়া চলিয়া গেল।

সহসা শঙ্করের চোখে পড়িল, ডালা মাথায় করিয়া যমুনিয়া যাইতেছে।

াহার পিছু পিছু ভাল মানুষের মত মুশাইও চলিয়াছে। যমুনিয়ার মাতৃমূর্তি। ই যেন দুষ্ট অবাধ্য ছেলে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ভালমানুষ সাজিয়া কর্তব্য করিতেছে। মুশাই একবার আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিয়া হাসিল। শঙ্করের সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে মুগ্ধনেত্রে বসিয়া ছট পরবের শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

অমিয়া চা করিয়া আনিল।

এইবার খাতা-কলম চাই নাকি?

চাই।

অমিয়া গনগন করিয়া বলিল, খালি ফরমাশের ওপর ফরমাশ! ভাবলুম, একটু ঘুমুব—

খুকী ঘুমিয়েছে?

তাকে যতুয়া ছটের মেলা দেখাতে নিয়ে গেছে।

অমিয়া খাতা ও ফাউণ্টেন-পেন দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শঙ্কর আবার ডাকিল।

সিগারেট দেশলাই।

বাবা বাবা!

শঙ্কর যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, অমিয়াকে ফরমাশে ফরমাশে অস্থির করিয়া তোলে। অনেক সভ্য স্বামী স্ত্রীর সহিত লৌকিকতা করেন, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহাদের নানারূপ 'কন্‌সিডারেশন' আছে। শঙ্করের সে সব কিছুই নাই। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত সে যেমন লৌকিকতা করে না, স্ত্রীর সহিতও করে না; অমিয়াকে সে সত্যই অর্ধাঙ্গিনী মনে করে। অমিয়াকে ঘিরিয়া কোন রকম রোমান্স তাহার মনে জাগে নাই, অমিয়ার সহিত কোন রকম ভণ্ডামি করাও সে প্রয়োজন মনে করে না, এমন কি অমিয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে সর্বক্ষণ সজাগভাবে সচেতন নয়, কিন্তু অমিয়া না হইলে তাহার জীবনযাত্রা অচল। অতিশয় অপ্রত্যক্ষভাবে নিশ্বাসবায়ুর মত অমিয়া সঙ্গোপনে তাহার জীবনের সহিত কখন যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানে না।

সিগারেট দেশলাই দিয়া অমিয়া বলিল, এবার যাই ?

যাও।

চা শেষ করিয়া শঙ্কর সিগারেট ধরাইল এবং প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিল। পল্লী-উন্নয়নের আবর্তে পড়িয়াও তাহার অন্তরবাসী কবি বিপর্যস্ত হয় নাই, সে সদা জাগ্রত, সদা উৎকর্ণ, কেবল দেখিতেছে, শুনিতেছে এবং মনে সুর লাগিলেই গান গাহিয়া উঠিতেছে। কোন অজুহাতেই তাহাকে থামানো যায় না। শঙ্কর তন্ময় হইয়া লিখিতে লাগিল, যদিও তাহার এখন স্যানিটেশন-বিভাগ পরিদর্শন করিতে যাওয়া উচিত ছিল।

১৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মেঠো পথ বাহিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। গ্রামের বাহিরে কৃষকদের চাষের নিমিত্ত গত বৎসর যে ইঁদারাটি প্রস্তুত করানো হইয়াছিল, সেটি ধসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই পরিদর্শন করিতে শঙ্কর গিয়াছিল। পরিদর্শন করিয়া চিত্ত আনন্দিত হয় নাই, অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা আনন্দজনক নহে। জীবন চক্রবর্তী পুরা টাকা লইয়া কাজে ফাঁকি দিয়াছে। সে-ই এ অঞ্চলের সমস্ত ইঁদারার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিল। যে পরিমাণ চুন সুরকি প্রভৃতি দিলে পাকা ইঁদারা সত্যই পাকা হয়, সে পরিমাণ চুন সুরকি দেওয়া হয় নাই, ইহাই সকলে বলিল। এ অঞ্চলের সব ইঁদারাই ভাঙিয়া পড়িতেছে। জীবন গ্রামেরই ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী, তাহার ন্যায্য মজুরি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তবু সে অন্যায়ভাবে চুরি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। উৎপল বলিয়াছিল, কোন সাহেব কোম্পানিকে কণ্ট্রাক্ট দিতে, কিন্তু শঙ্করের কোন কথার উপর সে কথা কহিবে না প্রতিশ্রুত ছিল, তাই শঙ্কর যখন তাহাতে সায় দিল না, সে চুপ করিয়া গেল। শঙ্কর ভাবিয়াছিল, কি হইবে বিদেশী লোক ডাকিয়া, এই সামান্য কাজ কি আর দেশের লোকেরা করিতে পারিবে না ? বিশেষত কেনারাম

চক্রবর্তীর পুত্র জীবন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সোৎসাহে ইঁদারাগুলির ভার লইল, তখন শঙ্করের আর কোন সংশয় রহিল না। এখনও কোন সংশয় নাই, কেবল তাহার মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। নিতান্ত আপনজন যদি নিঃসংশয়ে চোর প্রতিপন্ন হয়, তখন যেমন জ্বালা করে, তেমনই জ্বালা করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এমন কেন হয়? কোন সাহেবের আপিসে চাকরি করিতে পাইলে এই জীবন উপরওয়ালার চাবুকের ভয়ে অতিশয় দক্ষতার সহিত কাজ করিত, চুরি করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু চাবুকভয়শূন্য জীবন কিছুতেই স্বাধীনভাবে স্বকর্তব্য সুষ্ঠুভাবে করিবে না। তাহার শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রতা কোন কিছুরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার উপায় নাই, করিলেই ঠকিতে হইবে। চাবুক না মারিলে কাজ করিবে না, দেশের কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তো করিবেই না, মজুরি পাইলেও করিবে না। অথচ বাহিরে কি অপরূপ ছদ্মবেশ! বি. এ. পাস করিয়াছে, দেশের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে, বর্তমান যুদ্ধের প্রগতি ও পরিণাম বিষয়ে বিজ্ঞের মতন বচন বিস্তার করে, লেনিন-স্টালিন-গান্ধী সকলের চরিত্র নখদর্পণে, দেশের বেকার-সমস্যা লইয়া ক্ষোভের অন্ত নাই, অথচ নিজে চোর। এই ছোকরাই সেদিন সামান্য লাউ-চুরির অপরাধে নিজেদের চাকরটাকে পুলিসে দিয়াছে। হঠাৎ শঙ্করের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে হইল। দেশের শিক্ষিত যুবকরাই তো দেশের আশা-ভরসা, তাহাদের উপর যদি আস্থা স্থাপন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে উপায় কি! শঙ্কর বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাপারটাকে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কেন এমন হয়? ইহারা শিক্ষিত, ইহাদের সমস্ত শিক্ষা এমনভাবে নিষ্ফল হইয়া গেল কেন? যে শিক্ষার চাকচিক্য ইহাদের রসনার তুণ্ডাগ্রে ক্ষণে ক্ষণে ঝলমল করিয়া উঠে, তাহার সামান্যতম দীপ্তিও ইহাদের চরিত্রে প্রতিভাত হয় না কেন? গলদটা কোথায়?

বাবু!

মৃদু নারীকণ্ঠের ডাক শুনিয়া শঙ্কর সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল।

• কে?

ফুলশরিয়া।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল।

এই অস্পৃশ্য মেয়েটার সহিত নিপুদার নাম যুক্ত করিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা শঙ্করের অবিদিত ছিল না। এ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে নিপুদাকে কিছু বলিতেও পারে নাই। উচিত হইলেও ইহা লইয়া নীতিগর্ভ বক্তৃতা দিবার অধিকার আর যাহারই থাক্, তাহার যে নাই, ইহা সে সসঙ্কোচে অনুভব করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের হিতার্থে এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নয় তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি করিয়া যে কথাটা পাড়িবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখন সহসা নির্জন গ্রামপ্রান্তে সেই মেয়েটার সহিতই মুখামুখি হওয়াতে সে ভয় পাইয়া গেল। নিপুদার নামে নালিশ করিতে আসিয়াছে নাকি! তাহা হইলে তো অতিশয় অস্বস্তিকর 'পরিস্থিতি'।

কি চাই?

ফুলশরিয়া কিছু বলিল না, নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করের মনে হইল, কাঁদিতেছে।

কি চাই?—শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল।

ফুলশরিয়া মৃদুকণ্ঠে যাহা বলিল, তাহাতে শঙ্কর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিপুদার সম্বন্ধে কিছু নয়, স্বামীর অসুখের কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার স্বামী নাকি বহুদিন হইতে অসুস্থ, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তিন মাস ধরিয়া 'দাবাই পানি' করিয়াছেন, কিছুই হয় নাই। সেদিন নট্টুবাবু আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চরণবাবুকেও একবার ডাকিয়া দেখানো উচিত, কারণ একা তিনি এ রোগ সামলাইতে পারিবেন না। নট্টুবাবু গরিবের 'মাই বাপ', তাঁহাকে বিনা ফীসে ডাকা যায়, কিন্তু চরণবাবুকে ডাকিতে তাহাদের সঙ্কোচ হইতেছে। এ গ্রামে আসিলে সাধারণত তিনি আট টাকা ফীস নেন, কিন্তু আট টাকা দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত, বাবু যদি একটা চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে হয়তো তিনি কমে আসিতে রাজী হইতে পারেন। রূপার চুড়ি বন্ধক দিয়া সে গোটা চারেক টাকা কোনক্রমে যোগাড় করিয়াছে।

সহসা ফুলশরিয়া বসিয়া পড়িল এবং শঙ্করের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, দয়া করো বাবু।

হয়েছে কি তোর স্বামীর?

ঘা।

ঘা?

ফুলশরিয়া যে নিপুদার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া তাহাকে বিপন্ন করে নাই, ইহাতেই শঙ্কর মেয়েটার প্রতি মনে মনে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল।

চল্, দেখে আসি কি হয়েছে!

ফুলশরিয়ার সঙ্গে যাইতে যাইতে একটা কথা সহসা শঙ্করের মনে পড়িল। ফুলশরিয়ার আবার স্বামী কি? সে তো পতিতা। পতিতারও একটা লোক-দেখানো স্বামী থাকা অসম্ভব নয়—মনকে এই বলিয়া সে প্রবোধ দিল। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া একটি মাটির ছোট কুঁড়েঘরে উপস্থিত হইয়া সে যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। ঘরের কোণে খাটিয়ায় হরিয়া শুইয়া আছে। হরিয়া জাতিতে কুর্মী, সামাজিকভাবে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইতে পারে

হরিয়া এককালে তাহাদের ভৃত্য ছিল। শুধু তাহাদের নয়, অনেকের বাড়িতেই সে চাকরি করিয়াছে, কিন্তু কোথাও টিকিয়া থাকে নাই। কোথাও টিকিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। কিছুদিন আসামে পলাইয়া গিয়া চা-বাগানে কুলিগিরি করিয়াছিল, একটা পাটের কলেও নাকি কিছুদিন মজুর খাটিয়াছে। এই পর্যন্ত ইতিহাস শঙ্কর জানিত, তাহার পর কিছুদিন তাহার কোন পাত্তাই ছিল না। কবে সে ফিরিয়াছে এবং কিরূপে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা শঙ্কর জানিতে পারে নাই। হঠাৎ এতদিন পরে তাহাকে ফুলশরিয়ার ঘরে রোগশয্যায় শয়ান দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। সর্বাঙ্গে বড় বড় ঘা, নাকটা বসিয়া গিয়াছে, বীভৎস চেহারা! দেখিয়া মনে হয়, কুষ্ঠ হইয়াছে।

হরিয়া উত্থানশক্তি-রহিত। শুইয়া শুইয়াই হাত তুলিয়া প্রাক্তন মনিব শঙ্করকে সেলাম করিল। সে-ই ফুলশরিয়াকে শঙ্করের কাছে পাঠাইয়াছিল।

তোর স্বামী?

ফুলশরিয়া নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে মেয়েটাকে ভাল করিয়া দেখে নাই।

কেরোসিনের স্বল্পালোকে আজ প্রথম ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। রূপসী নয়, রঙ কালো। বয়সও খুব কম নয়, ত্রিশের উপর হইবে। স্বাস্থ্য কিন্তু নিটোল এবং অটুট। চোখের দৃষ্টিতে, পুষ্ট অধরে, গর্বিত গ্রীবাভঙ্গিমায় আকর্ষণী শক্তি আছে।

শঙ্কর পুনরায় হরিয়াকে প্রশ্ন করিল, তুই একে বিয়ে করেছিস নাকি?

ফুলশরিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

খোনা স্বরে হিন্দীভাষায় হরিয়া বলিল, না বাবু, ওকে আমি 'সাধি' করি নাই। কিন্তু ও-ই আমার সব। আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভাইরা আমাকে দেখে না, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। ও-ই কেবল আমাকে ছাড়ে নাই। আমি পাজি, বদমাশ, লুচ্চা—ও সব জানে, তবু আমাকে ছাড়ে না। আমি রোজ উহাকে কত বলি, তুই কেন এ মুর্দার কাছে পড়িয়া আছিস, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি মরিয়া পচিয়া শেষ হইয়া যাই, তুইও আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করিস কেন? রাস্তায় ফেলিয়া দিতে না পারিস, হাসপাতালে দিয়া আয়। ও কিন্তু কিছুতে আমার কথা শোনে না বাবু, নিজের জেবর শাড়ি বেচিয়া ডাক্তার ডাকিতেছে, রোজ নিজের হাতে আমার এই পচা ঘা সাফ করে—

হরিয়ার চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ফুলশরিয়া হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল, চুপ চুপ, ঢের ভেলো—

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দেখিতেছিল। দেখিতেছিল বিছানার চাদর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ব্যাণ্ডেজের ন্যাকড়াগুলি ধপধপ করিতেছে, এই কুঁড়েঘরেও হরিয়া রাজার হালে রহিয়াছে।

হরিয়া আবার শুরু করিতেছিল, বাবু—

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমি যতদূর পারি ব্যবস্থা করব। চরণবাবুকে খবর দেব কালই। এখন চললাম। ভাল হয়ে যাবি, ভয় কি?

হরিয়া দুর্বল কম্পিত হস্ত তুলিয়া পুনরায় সেলাম করিল।

শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়াও বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, একে হাসপাতালে দিতে এত আপত্তি কেন?

ওহঁা অচ্ছা দবাই নেই দেইছে।

শঙ্করের কৌতূহল হইল। সর্বাঙ্গে-ঘা অসমর্থ দরিদ্র হরিয়াকে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার নিগূঢ় মনস্তত্ত্বটা কি? প্রেম? তাহার মন পরীক্ষা করিবার জন্য শঙ্কর বলিল, ও যখন তোর স্বামী নয়, তখন শুধু শুধু ওর জন্যে খরচ ক'রে মরছিস কেন? হাসপাতালেই দে।

ফুলশরিয়া মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। তাহার পর নিজস্ব হিন্দীতে বলিল, ও যদি সুস্থ হইত, উহাকে অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারিতাম। এখন কিন্তু পারি না। আমিই উহাকে ওই রোগ দিয়াছি। রোগের জন্যই ওর এই দশা, আমি সময়মত 'জক্‌সন্‌' লইয়া ভাল হইয়া গিয়াছি, ও প্রথমে রোগটাকে গ্রাহ্যই করে নাই, নানারকম দেশী জড়িবুটি করিয়াছিল, এখন একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগের জন্যই ওর আত্মীয়-স্বজন উহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু আমি কি করিয়া ত্যাগ করি? আমার জন্যই যে ওর রোগ।

তাহার পর আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল, উপরে মালিক আছেন, তিনি সব দেখিতেছেন, আমি বেইমানি করিতে পারিব না, আমি জান দিয়া উহাকে ভাল করিয়া তুলিব।

আচ্ছা, কাল চরণ ডাক্তারকে খবর পাঠাব তা হ'লে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিপু আসিয়া হাজির হইল।

হরিয়া আজ কেইসা হ্যায়?

আচ্ছা।

ফুলশরিয়ার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে আড়চোখে

একবার চাহিয়া নিপু বলিল, উস্‌কা দবাইকা বাস্তে দাইকা মারফৎ রুপিয়া ভেজা থা, মিলা ?

কোন উত্তর না দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং দুইখানি দশ টাকার নোট আনিয়া নিপুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, যাইয়ে।

ইস্‌কা মানে ?

ঝপাৎ করিয়া ঝাঁপটা ফেলিয়া দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল।

নিপু বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নীচের পড়িবার ঘরে একটি সুদৃশ্য আলো জ্বালিয়া উৎপল তন্ময় হইয়া ইংরেজী ভাষায় লিখিত চীন দেশের রূপকথা পড়িতেছিল।

শঙ্কর হনহন করিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

শিক্ষা মানে কি বলতে পার ? আসল শিক্ষা কাকে বল তুমি ? এ কি করছি আমরা ?

তার মানে ?

বিস্মিত উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

আনুপূর্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, এখন বল, কে শিক্ষিত ? জীবন চক্রবর্তী, নিপুদা, না, ফুলশরিয়া ?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব দিল না, কেবল গম্ভীরভাবে বাম-গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল। কিছুদিন হইতে সে গোঁফ রাখিতে শুরু করিয়াছে।

উত্তর দিচ্ছ না যে ?

মনের মত উত্তর যদি শুনতে চাও, ওপরে চল, কুন্তলা দেবী এসেছেন।

এমন সময় তিনি হঠাৎ ?

হরিহরদা এই পাড়ায় এসেছেন কোন একটা কাজে, তাঁরই সঙ্গে এসেছেন।

আমার সঙ্গে আলাপ নেই যে !

তার জন্যে আটকাবে না, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, চল। চীনে-পরীদের

গল্প গিলে গিলে মুখটাও মেরে গেছে আমার সন্ধ্যে থেকে। মুখটা একটু বদলানো যাক, চল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি বেশ ঝাঁজালো গোছের একটা উত্তর দেবেন।

তোমার উত্তরটা কি শুনি?

আমি উত্তর দিতে পারব না। তবে যদি আপত্তি না থাকে, পরামর্শ দিতে পারি।

কি পরামর্শ?

একজন এক্‌স্‌পার্ট ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ভাঙা ইঁদারাগুলো পরীক্ষা করাও, তিনি যদি বলেন যে, জীবন সত্যিই জোচ্চুরি করেছে, তা হ'লে তার নামে কেস ঠুকে দাও। আর তোমার ওই নিপুদা, যদি সত্যিই অপরিহার্য রকম কাজের লোক হন, তা হ'লে তাঁকে অপদস্থ করা ঠিক হবে না। তাঁকে বরং কিছু টাকা আর ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, একটু ঝরঝরে হয়ে ফিরে আসুন ভদ্রলোক। হাসছ যে? এ রকম ক'রে পারে নাকি মানুষ!

হাসছি বটে, কিন্তু আমি কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ছি।

হতাশ হবার কি আছে? পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,—ধাবিত হওয়াই আমাদের কাজ, থামলে চলবে না। চল, ওপরে চল।

কুন্তলা দেবীর সহিত সহজেই আলাপ হইয়া গেল।

উৎপল পরিচয় করাইয়া দিতেই শঙ্কর বলিল, অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে। কিন্তু সুযোগ হয় নি এতদিন।

কুন্তলা বসিয়া পান সাজিতেছিল, এই কথায় হাসিমুখে শঙ্করের দিকে একবার চোখ তুলিয়া পানই সাজিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না। উৎপল পরিচয় করাইয়া দিয়া গম্ভীরভাবে কোণের ক্যাম্প-চেয়ারটায় গিয়া বসিল এবং একটি সিগারেট ধরাইল। কি ভাবে আলাপ চালানো যায়, শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রতই বোধ করিতেছিল, এমন সময় সুরমা পাশের ঘর হইতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আপনি এসে গেছেন দেখছি ঠিক সময়ে, এক্ষুনি আপনার বিষয়েই কথা হচ্ছিল কুন্তলার সঙ্গে। ও আপনার "কুসংস্কার" লেখাটি প'ড়ে চটেছে।

কুন্তলা আর একবার হাসিভরা দৃষ্টি তুলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, তাহার পর সুরমাকে বলিল, প্রথম পরিচয়ের মুখেই একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করিয়ে দিয়ে ভাল করলে না তুমি। উনি লেখক মানুষ, লেখার নিন্দে করলে ওঁর সমস্ত মন সজারুর মত কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

শঙ্করবাবু সে রকম পরমুখাপেক্ষী লেখক নন। তুমি সত্যিই যখন চটেছ, তখন বলতে বাধা কি ?

চটি নি। শঙ্করবাবুর মত প্রতিভাবান লেখককেও গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসতে দেখে দুঃখ হচ্ছিল। কুসংস্কার সম্বন্ধে ওসব কথা ক্রিশ্চান আর ব্রাহ্ম মিশনরিদের মুখে অনেকবার শুনেছি আমরা। ওঁর কাছ থেকে নতুন কথা শুনব আশা করেছিলাম।

উৎপলের চক্ষু দুইটি আরও কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল। সিগারেটে সন্তর্পণে টান দিতে দিতে সে পা দোলাইতে লাগিল।

হঠাৎ এমন কথা কুন্তলার মুখে শুনিবে, শঙ্কর আশা করে নাই। "কুসংস্কার" প্রবন্ধটা সে অনেক দিন পূর্বে লিখিয়াছিল, যদিও সেটা সম্প্রতি 'সংস্কারক' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। 'কুসংস্কার' সম্বন্ধে তাহার নিজের মত বদলাইয়াছে। ছট পরবের পর যে প্রবন্ধটি সে লিখিয়াছে, তাহাতে তাহার পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় আছে। কিন্তু এই নতমুখী বধূটির মুখে এ কথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই এ বিষয়ে মেয়েটি কতদূর চিন্তা করিয়াছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না; ঠিক করিল, তর্ক করিবে।

সুরমা বলিল, কিন্তু ওঁর ভাষা আর উপমাগুলো যে চমৎকার, সেটা তোমাকে মানতেই হবে।

মানছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলছি যে, ভাষা আর উপমা চমৎকার ব'লেই ও প্রবন্ধ আরও ভয়ঙ্কর। যে পড়বে, সে-ই মুগ্ধ চিত্তে ওর প্রতি কথাটি বিশ্বাস করবে।

করলেই বা ক্ষতি কি?

গম্ভীরভাবে শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

আপনারা তা হ'লে তর্ক করুন, আমি ট্যাঁপারির জেলিটা চড়িয়ে এসেছি, দেখি, যদি কুন্তলা থাকতে থাকতেই নামাতে পারি। সঙ্গেই দিয়ে দেব তা হ'লে। শঙ্করবাবু নেবেন নাকি একটু?

না। ট্যাঁপারির গন্ধ পছন্দ নয় আমার।

অমিয়া কিন্তু ভালবাসে, তাকেই পাঠিয়ে দেব।

সুরমা চলিয়া গেল। কুন্তলা নীরবে পানগুলি লবঙ্গ দিয়া মুড়িতে লাগিল। শঙ্করই পুনরায় কথা কহিল, আমার প্রবন্ধে আপত্তি আপনার কোন্‌খানটায়?

সবটাতেই। আপনি যা বলেছেন তা সত্যি নয়, কুসংস্কার আমাদের পঙ্গু করে নি। আপনি মুখস্থ বুলি আউড়েছেন মাত্র।

আমি যেসব কুসংস্কারের উল্লেখ করেছি, আপনি সেগুলো সমর্থন করেন, এই কি আমাকে বুঝতে হবে?

এতক্ষণ কুন্তলা ধীরকণ্ঠে কথা কহিতেছিল, শঙ্করের এই কথায় যেন আহত ফণিনীর মত তর্জন করিয়া উঠিল।

দেখুন, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত বর্বর, বিদেশী অনাত্মীয়দের মুখে এসব কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন তলিয়ে বোঝবার সময় এসেছে যে, কথাগুলো সত্যি কি না!

আপনার মতে তা হ'লে ওগুলো কুসংস্কার নয়?

কোন্‌টা কু, কোন্‌টা সু, তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে, যাদের আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লে ঘৃণা করতে শিখেছি, মানুষ হিসেবে তারা আজকালকার সংস্কারমুক্ত স্বার্থপর নাস্তিকগুলোর চেয়ে ঢের বড়। ওরাই দেশের মেরুদণ্ড।

শঙ্করের ফুলশরিয়ার কথা মনে পড়িল। বলিল, তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি যদি বলি, কুসংস্কারবর্জিত হ'লে ওরা আরও বড় হবে!

যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে তা তো মনে হয় না। পাশ্চাত্য

শিক্ষার কল্যাণে আমরা অনেকেই অনেক রকম কুসংস্কার ত্যাগ করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যিই বড় হয়েছি কি?

হই নি স্বীকার করছি। কিন্তু তার অন্য কারণও থাকতে পারে। কতকগুলো যুক্তিহীন কুসংস্কার আঁকড়ে থাকলেই কি আমাদের মহত্ত্ব বাড়বে?

হ্যাঁ, বাড়বে। সমাজ-জীবনের একটা স্তরে ওর প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। এ যুদ্ধের বাজারে প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাবে না, মিলিটারি ট্রেনিং আপনি ভাল মনে করেন, না, খারাপ মনে করেন?

নিশ্চয়ই ভাল মনে করি।

কেন? কতকগুলো লোক ক্যাপ্টেনের হুকুম পাওয়ামাত্র কোন একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে দমাদ্দম গুলি ছুড়ছে, 'মার্চ' কথাটা উচ্চারিত হতে না হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, কখনও এগুচ্ছে কখনও পেছুচ্ছে, একটা বিশেষ ধরনের পোশাক প'রে বিশেষ রকম কায়দায় হাত পা ছুঁড়ে ড্রিল করছে, এগুলো কুসংস্কার নয়? যাকে নিরীহ ব'লে জানে, তাকে নির্বিচারে হত্যা করার মধ্যে কি যুক্তি আছে? প্রত্যেক সৈনিক যদি ওপরওলার প্রত্যেক আদেশটি নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়, তা হ'লে কি রকম হয় সেটা?

মিলিটারি ট্রেনিং মিলিটারি ডিসিপ্লিন শেখায়, ওতে চরিত্র দৃঢ় হয়, এইটেই ওর সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি।

ওপরওলা অফিসারকে দেখামাত্র খটাং ক'রে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে স্যালিউট করা তা হ'লে আপনি কুসংস্কার মনে করেন না? আপনার যত আপত্তি দিশী কুসংস্কারের বেলায়? আমি যদি বলি, ওগুলোর উদ্দেশ্যও চরিত্র দৃঢ় করা? একাদশীর দিন উপবাস করা, একটা বিশেষ বারে বেগুন না খাওয়া, পূজো-পার্বণে নিষ্ঠা-নিয়ম অনুসারে চলা, এসবের প্রত্যেকটির মধ্যেই এমন একটি সংযত আত্মসম্বরণের ভাব আছে, যা মেনে চলতে পারলে চরিত্র সত্যিই উন্নত হয়?

তাই যদি হয়, তা হ'লে সেটা স্পষ্ট ক'রে বলা নেই কেন?

মিলিটারি স্ট্র্যাটিজিও সব সময়ে স্পষ্ট ক'রে বলা হয় না। মিলিটারি আইন হচ্ছে—You are not to reason why—

কিন্তু কুসংস্কারের সঙ্গে যে কতকগুলো জিনিস স্পষ্টভাবেই জড়ানো আছে দেখা যাচ্ছে, যথা—ভগবান, পরলোক, পাপপুণ্য—

না জড়ালে লোকে মানত না, কোর্ট মার্শালের ভয় না থাকলে সাধারণ সৈনিক যেমন মিলিটারি আইন মানে না। ওগুলো আমাদের অদৃশ্য কোর্ট মার্শাল। সাধারণ মানুষকে সৎপথে রাখবার আর কোন উপায় নেই।

আমি কুসংস্কার না মেনেও সৎপথে থাকতে পারি।

আপনি অসাধারণ মানুষ। আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। সাধারণ লোক যদি অসাধারণত্বের ভাণ করে তা হ'লে যা কাণ্ড হয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকাল। অঙ্কশাস্ত্রে যার কিছুমাত্র অধিকার নেই, সেই অর্বাচীনটা নামতা মুখস্থ করা জ্যামিতি পড়াকে কুসংস্কার ব'লে উড়িয়ে দিয়ে উচ্চস্তরের গণিতশাস্ত্রের বুলি কপচাচ্ছে সস্তা ছাপাখানার দৌলতে, আর আপনারা তাই দেখে বাহবা করছেন।

আমি অন্তত করছি না। আমাদের কুসংস্কারগুলো যুক্তিসহ কি না, তাই ওই প্রবন্ধটায় বিচার করবার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। ওটা আমার অনেকদিন আগের লেখা। এখন আমারও মত অনেকটা বঁদলেছে, কিন্তু তবু আমি নির্বিচারে অন্ধ কুসংস্কার মানবার পক্ষপাতী হই নি এখনও।

ভাল ক'রে ভেবে দেখলে হবেন।

দেখি।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিতেই উৎপল বলিয়া উঠিল, শঙ্কর হেরে গেছে তোমার বন্ধুর কাছে, প্রায় স্বীকার ক'রে ফেলেছে যে, কুসংস্কারগুলোর একটা সার্থকতা আছে।

কুন্তলা হাসিল। সুরমা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমি কিন্তু তোমার মতে মত দিয়ে পাঁজি দেখে চলতে পারব না। আমার যেদিন খুশি আমি অলাবু ভক্ষণ করব।

তা ক'রো। জেলি কতদূর?

ঠাণ্ডা করতে দিয়েছি।

উৎপল বলিল, শঙ্করের পরাজয় উপলক্ষ্যে একটু চা খেলে কেমন হয়?

এত রাত্রে আবার চা কেন?—সুরমা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল।

উৎপল ক্যাম্প-চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

কই, চল এবার, রাত হয়ে গেল।

কুন্তলার স্বামী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন।

মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া কুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সভা ভঙ্গ হইল।

১৪

পাড়ায় 'রাম-লীলা' হইতেছে। খুকীকে লইয়া অমিয়া শুনিতে গিয়াছে। শঙ্কর নিজে যদিও এই 'রাম-লীলা'র একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু শরীর তেমন ভাল নাই বলিয়া যায় নাই, বারান্দায় আরাম-কেদারায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার অভাবে 'রাম-লীলা' উৎসবের এতটুকু অঙ্গহানি যে হইবে না, তাহা সে জানে। ক্রমশই এই কথাটা সে উপলব্ধি করিতেছে যে, যাহাদের আমরা 'মাস' অর্থাৎ জনসাধারণ বলি, তাহাদের সহিত অন্তরের যোগ রক্ষা করা কত কঠিন! আমাদের অন্তরে উহাদের স্থান নাই, উহাদের অন্তরেও আমাদের স্থান নাই। আমরা উহাদের অনুগ্রহ করি, উহারা আমাদের সেলাম করে। সম্পর্ক শুধু এইটুকু। উহাদের উৎসব আমাদের অনুপস্থিতিতে অঙ্গহীন হয় না, আমাদের উৎসব উহাদের যোগদানের অপেক্ষা রাখে না। আমরা ভিন্ন জাতের লোক, আমরা পর। আমরা যে উহাদের হিতার্থে এত করি, তাহা কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, আন্তরিক আবেগবশত নহে।

সহসা কুন্তলার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সেদিন যদিও তাহার সহিত মতের কিছুমাত্র অমিল হয় নাই, তবু কেমন যেন খটকা লাগিয়াছিল। কেমন অদ্ভুত যেন মেয়েটি! ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়া উলটা কথা বলিবার ঝোঁকটা যেন বড় বেশি রকম উগ্র। কথাবার্তা যেন

তীক্ষ্ণ তীরের মত। তীরন্দাজের লক্ষ্যভেদ-শক্তি দেখিয়া চিত্ত কিন্তু আনন্দিত হয় না, তীরের ফলাটা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া মর্মস্থল বিদ্ধ করে। উহার যুক্তি মানিলেও উহার কথাবার্তার ধরন, উহার দলিতা-ফণিনী মূর্তি দেখিয়া উহাকে আপন লোক বলিয়া মানিতে মন ইতস্তত করে। কুন্তলার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোল আছে, ইংরেজী ভাষায় যাহাকে 'কম্‌প্লেক্স' বলে। বেলা মল্লিকের কথাও মনে পড়িল। মেয়েটা পুরুষ-বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিলাতে কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে কে জানে! নারীবেশে সমাজে থাকিতে পারিল না? কেন পারিল না? পাছে পুরুষের সংস্পর্শে আত্মসম্মান আহত হয়? পুরুষের বাহুপাশে কিছুতেই ধরা দিব না, এ অসম্ভব প্রতিজ্ঞার দুর্গে অস্বাভাবিক একটা আত্মসম্মানকে বাঁচাইয়া রাখার অর্থ কি? কোন একজন পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেই তো হইত! এত অহঙ্কার কিসের? মনোমত পুরুষ জুটিল না! মনোমত আহার না জুটিলে কি অনাহারে থাক, মনোমত শয্যা না জুটিলে কি অনিদ্রায় কাটাও, বিবাহের বেলাতেই বা এত বিচার কেন? শঙ্করের মনে হইল, আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে সকলেই একটা অস্বাভাবিক আদর্শের পিছনে ছুটিতেছে। কুন্তলা পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু তাহার বিরোধিতাটাই কেমন যেন প্রতিক্রিয়াক্লিষ্ট হিংস্র মূর্তি ধরিয়াছে। ইহার অন্তরালে ক্ষোভের একটা গ্লানি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যেন। একজন মাতালের কথা মনে পড়িল। সে হুইস্কি পান করিয়া যতক্ষণ নেশা থাকিত, ততক্ষণ কুৎসিত ভাষায় হুইস্কিকেই গালাগালি দিত। উদরস্থ বিলাতী সুরাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, ওরে শালা হুইস্কি, তুই কি ভেবেছিস, তুই মস্ত বড় একটা কিছু? তুই তো ছেলেমানুষ রে ব্যাটা! সোমরসের নাম শুনেছিস? মাধ্বী, গৌড়ী পৈষ্ঠীর কথা জানিস? এদের কাছে তুই তো একটা অপোগণ্ড নাবালক রে! কুন্তলারও বোধ হয় সেই দশা। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সে সর্বান্তঃকরণে সেই শিক্ষারই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই জাতীয়তা-বোধ আমরা কোথা হইতে পাইলাম? সহসা শঙ্করের মনে হইল, এই জাতীয়তা-বোধ জিনিসটা যে ভাবে আমরা চর্চা করিতে শিখিয়াছি, তাহা সত্যই কি ভাল? এই

জিনিসটাকে কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক মানবের নীচতা হীনতা হিংস্রতা সহস্র বীভৎস রূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। একটা বড় নামের আড়ালে ইহা কি স্বার্থপরতারই জঘন্যতম রূপ নয়? ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্রাহ্মণত্বে। সে ব্রাহ্মণত্ব এখন অবলুপ্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? বর্বরসুলভ এই হানাহানির আদর্শে ভারতীয় প্রতিভা কি স্বচ্ছন্দে স্ফূর্তি পাইবে? ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কি, শঙ্কর চিন্তা করিতে লাগিল। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—ইহাই কি ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের শেষ কথা? কিছুই কিছু নয়, সবই মায়া, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত এই সংসার ত্যাগ কর, এষণা-মুক্ত হও—ইহাই যদি ভারতীয় ঋষির নির্দেশ হয়, জাতীয় পতাকা আস্ফালন করিয়া তাহা হইলে এসব পণ্ডশ্রম কেন? পল্লী-সংস্কারেরই বা প্রয়োজন কি? যাহা মন্দ তাহা কালক্রমে আপনিই ভাল হইবে, সত্য-শিব-সুন্দর যথাস্থানে যথাসময়ে নিজেকে প্রস্ফুটিত করিবেন, অলীক অবিদ্যা মিথ্যা মরীচিকাবৎ আপনি বিলুপ্ত হইবে। আমি ছটফট করিয়া মরিতেছি কেন? আমি কে? কি ক্ষমতা আছে আমার? পরক্ষণেই শঙ্করের মনে হইল, সংসারটা যে মায়া-মরীচিকা ইহা আমাদের জীবনের মূল-মন্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মন্ত্রে বিহ্বল হইয়া হিন্দু-সভ্যতা জড়ত্বকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সত্য সত্যই যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা সংসারের নশ্বরত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই তপস্বী মহাপুরুষ হিন্দুসমাজের শিরোমণি, কিন্তু সকলেই শিরোমণি হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, সকলের সে অধিকারও নাই। সমাজের অধিকাংশ লোকই সাধারণ লোক। তাহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণেরাই করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণ-সমন্বিত হিন্দুসমাজে গুণানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য সুনির্দিষ্ট আছে। দ্রোণাচার্য ও পরশুরামের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। উঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপস্যাও করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের সময় অস্ত্রচালনা করিয়া শত্রু হনন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। শঙ্কর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভারতীয় আদর্শ

তাহা হইলে নিছক মায়াসর্বস্ব নির্বেদ নয়! উহাতে বলিষ্ঠ পুরুষকারেরও স্থান আছে। উহাতে স্থান নাই কেবল মূঢ় আসক্তির, যে আসক্তি মানুষের হিতাহিত-জ্ঞান অবলুপ্ত করে। সংসারকে মায়াময় জানিয়াও নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত চিত্তে সমাজের হিতার্থে প্রত্যেককে স্বকর্তব্য করিতে হইবে, ইহাই আমাদের জাতীয়তা। বর্তমান যুগের স্বার্থপঙ্কিল পরস্বলোলুপ ন্যাশনালিজ্‌ম আমাদের ন্যাশনালিজ্‌ম নহে। আমাদের সঙ্কীর্ণতা নাই, কারণ আমরা জানি, সংসার মায়াময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রত্যেকেই জানে, সংসার মায়াময়; অথচ প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, স্বকর্তব্য সাধন না করিলে এই মায়াপাশ ছিন্ন করা যাইবে না। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। ইহাই আমাদের সনাতন আদর্শ, ইহাই আমাদের কর্তব্য; অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ও বিশ্বাস করিবে, সংসার অনিত্য, তবু সে যুদ্ধ করিবে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, আদর্শ ও কর্তব্যের জন্য, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে।

স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতামুক্ত নিরাসক্তচিত্ত নিষ্কাম কর্তব্যপরায়ণ সমাজ এ যুগে স্থাপন করা কি সম্ভব? কেন সম্ভব নয়? শিক্ষা দ্বারা সবই সম্ভব। শিক্ষাই গোড়ার কথা। সমস্ত দেশের চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূখে দিতে হবে ভাষা,—রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। ভারতের সনাতন আদর্শকে নূতন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়া তাহার সমস্ত সত্তা যেন চরিতার্থ হইয়া গেল। শান্ত শুভ্র উদাত্ত বিরাট একটা অনুভূতি তাহার দেহমনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমন সময় বাইসিক্লের ঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

কে?

কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর আসিল, আমি নিমাই।

ও, নিমাই, এস। এত রাত্রে হঠাৎ কি মনে ক'রে?

কোন খবর না দিয়ে মোটরে ক'রে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এসেছেন একটু আগে।

কাল আমাদের স্কুল দেখবেন। আপনাদের অ্যালুমিনিয়মের ডেকচিটা একবার চাই।

কেন, কি হবে ?

মুরগী রাঁধতে হবে তাঁর জন্যে।

একটু ইতস্তত করিয়া নিম্নকণ্ঠে নিমাই বলিল, মদও চাইছেন। এত রাত্রে মদ কি পাওয়া যাবে ?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্রথমেই মুরগী ও মদের ফরমাশ করিয়াছেন ! দেশের শিক্ষার আদর্শ-নিয়ন্ত্রণের ভার ইঁহার উপর। আদর্শ চুলায় যাক, লোকটার চক্ষুলজ্জাও কি নাই ! টুর করিবার জন্য উচ্চহারে ভাতা পান, অথচ গরিব শিক্ষকের বাড়িতে আসিয়া চড়াও হইয়াছেন !

কোথায় উঠেছেন ?

হেডমাস্টারবাবুর বাসায়।

শঙ্করের ইচ্ছা হইল, এখনই গিয়া লোকটাকে কড়া কড়া দুই-চারি কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু এ আবেগ তাহাকে সম্বরণ করিতে হইল। এই লোকটাকেই তোয়াজ করা হয় নাই বলিয়া কাঁটাপোখর স্কুলটা গভর্মেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এবারও যদি ইহাকে তোয়াজ না করা হয়, হীরাপুর স্কুলটার হয়তো সর্বনাশ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া নিমাই ঘটকের মুখ চাহিয়াই তাঁহাকে খুশি করা প্রয়োজন। সে আই.এ.ফেল অথচ হেডপণ্ডিতি করিতেছে। শঙ্করই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। হেডপণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে, কিন্তু ব্যাপারটা আইনসঙ্গত নয়। ইন্স্পেক্টর রুষ্ট হইলে কলমের এক খোঁচায় তাহার চাকরি চলিয়া যাইতে পারে।

এ তো এক আচ্ছা মুশকিল দেখছি !

এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি প্রথমে কেনারামবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও আজ মাংস রান্না হচ্ছে হৃদয়বল্লভবাবু এসেছেন কিনা কলকাতা থেকে।

যদিও অন্ধকারে শঙ্কর নিমাই ঘটকের মুখ দেখিতে পাইতেছিল না, তবু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইতেছিল, নিজের চাকরির জন্য সকলকে বিরক্ত করিতে হইতেছে বলিয়া বেচারা যেন সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া রাত-দুপুরে মদ মাংস দাবি করিয়াছে, ইহা যেন তাহারই অপরাধ। ভারতীয় আদর্শে প্রত্যেক নরনারীর মন শিক্ষাসমৃদ্ধ করিতে পারিলে দেশের যে জাগরণ হইবে, এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে শঙ্কর তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। আদর্শের তুঙ্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া নিমাইকে আশ্বাস দিতে হইল, তার জন্যে কি হয়েছে, তুমি যাও, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

নিমাই তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

তুমি যাও, মুশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

নিমাই চলিয়া গেল।

মুশাই!

মুশাই পাশেই কোথাও ছিল, ছায়ামূর্তির মত আসিয়া দাঁড়াইল।

দুটো মুরগী রেঁধে হীরাপুরে এখুনি দিয়ে আসতে হবে। আর এক বোতল মদ। যোগাড় করতে পারবি?

হাঁ হুজুর।

শঙ্কর টাকা বাহির করিয়া দিল।

হীরাপুরে হেডমাস্টারবাবুর বাসায় দিয়ে আসতে হবে।

মুশাই চলিয়া গেল। শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া ঈজি-চেয়ারে পড়িয়া রহিল।

১৫

অলক্ষ্যে আর একটা মেঘও ঘনাইতেছিল।

কেনারাম চক্রবর্তী, ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের একমাত্র পুত্র হৃদয়বল্লভ এবং বিখ্যাত মহাজন রাজীব দত্ত কেনারাম চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন।

জমিদারি বিক্রয় হইয়া যাইবার পর হৃদয়বল্লভ কলিকাতা হইতে অদ্য প্রথম আসিয়া গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাও গোপনে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার আগমনবার্তা জানে না। রাত্রিবাস মাত্র করিয়া কাল পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। প্রাক্তন নায়েব বন্ধুপ্রতিম কেনারাম চক্রবর্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছেন। এতদিন কেনারাম চক্রবর্তী এবং কেনারাম চক্রবর্তীর মারফৎ রাজীব দত্তের সহিত পত্রযোগে তাঁহার যেসব নিগূঢ় মন্ত্রণা চলিতেছিল, সাক্ষাতে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় নানা ঘাটের নানা জল আস্বাদন করিয়া, শেয়ার-মার্কেটে লোকসান দিয়া এবং চিকিৎসা-ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত হইয়া হৃদয়বল্লভ অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, কলিকাতায় থাকা তাঁহার পোষাইবে না। তাঁহাকে গ্রামেই পুনরায় ফিরিতে হইবে। কিন্তু যে গ্রামে এতদিন তিনি জমিদার ছিলেন, সে গ্রামে প্রজারূপে—বিশেষ করিয়া সেদিনকার ছোঁড়া উৎপল এবং শঙ্করের আধিপত্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গ্রামে ফিরিতে হইলে জমিদাররূপেই ফিরিতে হইবে। কিন্তু তাহাও প্রায় অসম্ভব। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহারই জল্পনা-কল্পনা পত্রযোগে এতকাল চলিতেছিল; কিন্তু এমন ঢিমা চালে চলিতেছিল যে, হৃদয়বল্লভ আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; অবিলম্বে ইহার একটা 'ফয়সালা' করিয়া ফেলিবার জন্য সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যেই কেনারাম, রাজীব দত্ত এবং প্রমথ ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।

রাজীব দত্তই প্রধান ভরসা। হৃদয়বল্লভ নিজে প্রায় কপর্দকহীন। কেনারামের প্ররোচনায় রাজীব দত্ত সম্পূর্ণ জমিদারিটি মরগেজ রাখিয়া শত-করা পাঁচ টাকা সুদে আড়াই লক্ষ টাকা কর্জ দিতে রাজী হইয়াছেন। তিনজনেই পাকা লোক, তিনজনেরই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। হৃদয়বল্লভ অপুত্রক এবং বিপত্নীক। পত্নী পুত্র উভয়েই কিছুকাল পূর্বে যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছেন।

তিনি নিজেও যক্ষ্মাগ্রস্ত, আর বেশিদিন বাঁচিবার আশা নাই। যে কয়দিন বাঁচিবেন, পরের টাকায় জমিদারিটি ক্রয় করিয়া ভোগ করিতে চান। যদি ঋণশোধ করিতে না পারেন, জমিদারি না হয় রাজীবলোচনের হস্তগত হইবে, তাহাতে তাঁহার কি আসে-যায়, উত্তরাধিকারী তো কেহ নাই। নিজের জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিলেই যথেষ্ট।

কেনারামের উদ্দেশ্য—কমিশন। চার বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ যখন দেনার দায়ে জমিদারিটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন রাজবল্লভ এবং উৎপল উভয়েরই হিতৈষী সাজিয়া তিনি উভয় পক্ষের নিকট হইতে একুনে প্রায় হাজার দশেক টাকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এসব বিষয়ে সত্যই তিনি ক্ষমতাবান পুরুষ। হিতৈষী সাজিতে অদ্বিতীয়। হিতাকাঙ্ক্ষায় কখনও কড়া কথা বলিয়া কখনও স্পষ্টভাষণ করিয়া কখনও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কখনও সান্ত্বনা দিয়া তিনি এমন একটা অভিনয় করিতে পারেন যে, তাঁহার ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোভাব সব সময়ে সকলে বুঝিতেও পারে না। বুঝিলেও রাগ করিতে পারে না, রাগ করিলেও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার উপায় থাকে না, এমন পরিচ্ছন্ন তাঁহার কার্যবিধি। কোন কিছুতেই কখনও নিজেকে এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলেন না, যাহাতে আইনত তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়। জমিদারি পুনঃক্রয়ের বাসনাটি আভাসে ইঙ্গিতে তিনিই একদা হৃদয়বল্লভের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ভাষাটি ছিল এইরূপ—তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয় জমিদারিটা তুমি যদি আবার ফিরে পাও, ফিরে পাওয়া শক্ত অবশ্য, কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো—। এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে স্ফুলিঙ্গটি যখন হৃদয়বল্লভের অন্তরে শিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যখন হৃদয়বল্লভ জমিদারি ফিরিয়া পাইবার জন্য কেনারামকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন, তখন অনেকটা যেন বিপন্ন হইয়াই প্রাক্তন সম্বন্ধের খাতিরে তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু চেষ্টাটা এমন মন্দগতিতে করিতে লাগিলেন যে, হৃদয়বল্লভ অবশেষে স্পষ্ট করিয়া লেখা সমীচীন মনে করিলেন, তুমি চেষ্টা করিয়া জমিদারিটি যদি উৎপলের কবল হইতে নির্বিঘ্নে পুনরুদ্ধার করিতে পার,

তোমার ন্যায্য পারিশ্রমিক তোমাকে আমি দিব। জমিদারির মূল্য এবং তোমার পারিশ্রমিক, এই সমস্ত টাকাটাই তুমি রাজীব দত্তের নিকট হইতে কর্জ কর—। কেনারাম উত্তরে লিখিলেন, পারিশ্রমিকের জন্য কিছু আসিয়া যায় না, পরিশ্রম করিলে অবশ্য কিছু পারিশ্রমিক লইতেই হয়, তবে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। তোমার ক্ষেত্রে টাকাটাই বড় নয়। দেখি, কত দূর কি করিতে পারি।

বলা বাহুল্য, কেনারাম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়া খানিকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। আর কিছু না হউক, রাজীবলোচন তো রাজী হইয়াছেন।

কুসীদজীবী রাজীবলোচনের উদ্দেশ্য কুসীদ। কুসীদের লোভেই তিনি এই রাত্রে অসুস্থ শরীর লইয়াও কেনারামের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন এবং ইঁহাদের আগড়ম-বাগড়ম আলোচনা শুনিতেছেন। রাজীবলোচন প্রিয়দর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো, বেঁটে, শীর্ণকায় লোক তিনি। যখন চলেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকেন, যখন বসেন উবু হইয়া বসেন। তাঁহার চোয়াল সর্বদাই নড়ে, মনে হয়, সুপারি-জাতীয় কি যেন একটা চিবাইতেছেন। মুখে এক-আধ টুকরা সুপারি লবঙ্গ বা হরীতকী কখনও হয়তো বা থাকে, কিন্তু তাহার জন্য অত ঘন ঘন মুখ নাড়ার প্রয়োজন হয় না। ওটা তাঁহার মুদ্রাদোষ। মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক, সামান্য একটু কাঁচা-পাকা গোঁফ, মুখভাবে বিশেষ কিছুই অসামান্যতা নাই। মুখের মধ্যে চক্ষু দুইটিই, ছোট ছোট হইলেও, বেশ জীবন্ত। কিন্তু প্রায় তাহা অর্ধমুদ্রিত থাকে, ক্বচিৎ কখনও কাহারও দিকে যদি চোখ খুলিয়া তাকান, সে চোখের মর্মভেদী দৃষ্টি তাহার মনে ভীতি সঞ্চার করে। পারতপক্ষে কেহ সে দৃষ্টির সম্মুখবর্তী হইতে চায় না, এমন কি তাঁহার একমাত্র পুত্রও নয়। সুদের লোভেই তিনি কেনারামের প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। বিশ্বাসযোগ্য ব্যাঙ্কে আজকাল সুদের হার অতিশয় কম। টাকাগুলা কেবল পচিতেছে। কেনারামটাকে কিছু উপুড়হস্ত করিলে কিছু টাকার যদি সদ্গতি হয়, মন্দ কি? টাকা অবশ্য ও-ছোকরা শোধ করিতে পারিবে না, জমিদারিটাই শেষ পর্যন্ত লইতে হইবে, তাহাই বা মন্দ কি?

আড়াই লক্ষ টাকার পরিবর্তে বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি লাভ করা এ বাজারে নিন্দনীয় নয়। আজকাল ওই আড়াই লক্ষ টাকার সুদ বছরে চার হাজারও হয় না। জমিদারিতে অবশ্য হাজা শুকা আছে, নানা হাঙ্গামা, কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে মা-লক্ষ্মী কবেই বা কাহার গৃহে আসিয়াছেন? তাহা ছাড়া আর একটা কথা, উৎপল এবং এবং শঙ্কর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাহারা তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তাঁহার খাতক-সংখ্যা আগে যেমন ছিল এখনও যদিও প্রায় সেইরূপই আছে, কিন্তু উহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা যেরূপ বাড়িতেছে, (জনসাধারণ দূরের কথা, তাঁহার নিজেরই শ্রদ্ধা বাড়িতেছে!) ভবিষ্যতে হয়তো তাঁহার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই উপলক্ষ্যে ওই দুইজনকেও যদি গ্রাম হইতে উৎখাত করা যায়, মন্দ কি? শত্রুকে অঙ্কুরে বিনাশ করাই তো ভাল। কিন্তু এই বিনাশ করা ব্যাপারে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ খটকা আছে। অসঙ্কোচে কাহাকেও বিনাশ করিতে চিরকালই তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি নিরীহ হয়। দীর্ঘনিশ্বাসকে তাঁহার বড় ভয়। কুসীদজীবী হইলেও তিনি ধর্মভীরু ব্যক্তি, পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক আশীর্বাদ-অভিশাপ প্রভৃতিতে আস্থাবান। বিনা দোষে শঙ্কর এবং উৎপলকে বিপন্ন করাটা কি ঠিক হইবে? বহু অনুসন্ধান করিয়াও তো তিনি উৎপল অথবা শঙ্করের চরিত্রে এমন কোন দোষ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, যাহার অজুহাতে তাহাদের উচ্ছেদসাধন সমর্থন করা যায়। অম্বিকা রায়ের ব্যাটা শঙ্করকে তো ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে। নিজের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র গদাধরের সহিত তুলনা করিয়া এ কল্পনাও তিনি মাঝে মাঝে করিয়াছেন, শঙ্কর আমারই ছেলে হইলে মন্দ কি হইত? কেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে, কোনরূপ নষ্টামি নাই, লোকের বিপদে-আপদে বুক দিয়া করে, কথায়-বার্তায় কেমন বিনয়ী, অথচ চালাক-চতুর, সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত কেমন গড়গড় করিয়া আলাপ করিল! অথচ গদাধরটা কি যেন! ঠিক যেন একটা কানা কুলি-বেগুন, বেঁটে কুরকুট্টে, পেঁচার মতন স্বভাব, ভদ্রসমাজে মুখ দেখায় না, বদমাইসের ধাড়ি, যত আড্ডা ছোটলোকের সঙ্গে, এই বয়সেই গাঁজা ধরিয়াছে

নাকি, তুরীটোলার ছুঁড়িগুলা তো তাহার পয়সায় বড়লোক বনিয়া গেল শাড়ি-চুড়ির কি বাহার হারামজাদীদের!

সহসা রাজীবলোচনের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল।

কেনারাম মূল সমস্যাটা লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

আমাদের যতই না কেন গরজ থাক্, উৎপল শুধু শুধু জমিদারি বিক্রি করতে রাজী হবে কেন? তার তো কোন অভাব নেই।

রাজীব দত্তের চোয়াল নড়িয়া উঠিল।

হৃদয়বল্লভ বলিলেন, তা নেই স্বীকার করছি। কিন্তু ওদের অতিষ্ঠ ক'রে তোল। তা হ'লেই পালাবে।

কেনারাম বাহিরে সভ্য-ভব্য মিতভাষী মার্জিতরুচি ব্যক্তি, চট করিয়া এমন কিছু বলেন না যাহার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে। অতিষ্ঠ করিবার আয়োজন তিনি করিয়াছেন, হৃদয়বল্লভের আগ্রহাতিশয্য ছাড়া ব্যক্তিগত একটা কারণও সম্প্রতি ঘটিয়াছে। উৎপলের পরামর্শ-অনুযায়ী শঙ্কর তাঁহার পুত্র জীবনকে সত্যই উকিলের চিঠি দিয়াছে। কিন্তু এত কথা হৃদয়বল্লভকে বলার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, দেখি!

না না, উঠে প'ড়ে লাগ ভাই, 'দেখি দেখি' তুমি অনেকদিন থেকে করছ। তুমি চুপ ক'রে থাকবার লোক নও, নিশ্চয় কোন আয়োজন করেছ একা চুপিচুপি, বলই না ভেঙে, শুনি।

শীর্ণকান্তি হৃদয়বল্লভের সমস্ত প্রাণশক্তি তাহার ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটিতে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। সর্বগ্রাসী দৃষ্টি সে চক্ষুর।

আয়োজন? না, তেমন কিছু করি নি এখনও। তবে মণি বাঁড়ুজ্জে লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটা যদি বেশি দূর গড়ায়, তা হ'লে হয়তো কিছু হতে পারবে। হয়তো—

হয়তো কথাটার উপর জোর দিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

হৃদয়বল্লভ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বল না ভাই, মণি বাঁড়ুজ্জে কে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কেনারাম অবশেষে ব্যাপারটা খুলিয়া বলাই মনস্থ করিলেন।

আমাদের হরিহর বাঁড়ুজ্জের খুড়তুতো ভাই মণি লক্ষ্মীবাগে প্রায় হাজার বিঘে জমি নিয়ে মহা ধুমধাম ক'রে চাষ করেছে। আশপাশের কয়েকজন বেহারীদের, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত বেহারীদের, চোখ টাটাচ্ছে তাই দেখে। জনকয়েক বেহারী জমিদার গুলাব সিং তাহার মধ্যে প্রধান, জনকয়েক বেহারী উকিলও সেই নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। শঙ্করের দক্ষিণ হস্ত নিপুবাবুও ইন্ধন যোগাচ্ছেন তাতে। মণি যেসব চাষীর কাছ থেকে টাকা দিয়ে জমি কিনে নিয়েছিল, নিপুবাবু সেই সব চাষীদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ব'লে যে, মণি ক্যাপিটালিস্ট, ঠকিয়ে তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিয়েছে, যে চাষ করে জমি তারই, সমবায়-কৃষি-সমিতি ক'রেই রুশদেশে নাকি চাষীরা সুখে আছে, মণির ন্যায়ত কোন অধিকার নেই একা অতখানি জমি ভোগ করবার। মোট কথা, এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা।

কেনারাম চুপ করিলেন।

তার সঙ্গে উৎপল আর শঙ্করের সম্বন্ধ কি ?

হাঙ্গামা যদি বাধে আর ওরা যদি যোগ দেয় তাতে, দেওয়াই সম্ভব, ওরা আদর্শবাদী লোক, মণির পক্ষ নিশ্চয়ই নেবে, তা'হ'লে ও-অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু বেহারীদের সঙ্গে আর চাষীদেব সঙ্গে শত্রুতা হবে ওদের, আর তা হ'লেই—মানে—

মৃদু হাসিয়া কেনারাম পুনরায় চুপ করিলেন।

মানে ?

মানে—একখানা টিকে একবার একটু ধরলে বাকিগুলোও ধ'রে উঠতে দেরি লাগবে না।

উপমাটা রাজীব দত্তের ভালই লাগিল।

তিনি একবার চোয়াল নাড়িলেন।

কিন্তু ফুঁ দেওয়া চাই, ফুঁটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে—

হৃদয়বল্লভ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। প্রমথ ডাক্তার আসিয়া

প্রবেশ করিলেন। গুলাব সিংহের উপর প্রমথ ডাক্তারের অসীম প্রভাব আছে বলিয়া কেনারাম প্রমথ ডাক্তারকে দলে টানিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার আসিয়াছেন শঙ্করের উপর মনে মনে রাগ আছে বলিয়া। বিশেষত সেদিনকার প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস বন্ধ করিয়া দিবার কথাটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। লোকটা যেন হাতে মাথা কাটিয়া বেড়াইতেছে। উৎপলবাবু ভালমানুষ লোক, কিছু বলেন না, যা-তা করিয়া বেড়াইতেছে একেবারে। ভদ্রলোককে একটু কড়কাইয়া দেওয়া উচিত বই কি। সারূটেন্‌লি।

প্রমথ ডাক্তারের অভ্যাগমে পরামর্শ-সভা আরও জাঁকিয়া উঠিল।

১৬

শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল।

পল্লীজীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ-খচিত দিনগুলি। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অতি তুচ্ছ দিনগুলির হয়তো কোন চিহ্ন থাকে না, পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসে কিন্তু ইহাদের মূল্য কম নয়। ডান্‌কার্কে কে পরাজিত হইল কোন্ পক্ষ যুদ্ধনৈপুণ্যের কি পরিচয় দিল, চীনবাসীদের প্রতি বল্‌শেভিক রুশিয়ার আসল মনোভাব কি, জার্মানির নূতনতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা ববরতার কোন্ কাহিনী কাগজে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, কোন্ পক্ষের কোন্ সেনানায়কের যুদ্ধকৌশল কিরূপ, বিমানবহর কে কত বেগে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এসব খবর শিক্ষিত শহরবাসীকে যতটা চঞ্চল করিয়া তোলে, অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে ততটা তোলে না। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের অত্যাশ্চর্য কাহিনী তাহারা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখে অত্যাশ্চর্য কাহিনীর মতই শোনে, যেন রূপকথা শুনিতেছে। ঘর্ঘর শব্দ করিয়া আকাশ-পথে যখন বিমান-পোত উড়িয়া যায়, বিস্ফারিত নয়নে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে—যুদ্ধের সঙ্গে ওইটুকুই তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মহাযুদ্ধের খবর তাহাদিগকে বিস্মিত করে, কিন্তু তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-

আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, অন্তত তখনও পর্যন্ত করে নাই। যুদ্ধের খবর তাহাদের নিকট খবরই নয়।

তাহাদের নিকট আসল খবর—নিমাই পণ্ডিতের গাই একটি চমৎকার বকনা প্রসব করিয়াছে। কুচকুচে কালো রঙ, কপালের মাঝখানে চন্দনের ফোঁটার মত সাদা একটি টিপ। চমৎকার দেখিতে। হকরু গোয়ালা গাইটি সস্তায় কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়া একটা ব্যক্তিগত গর্ব অনুভব করিতেছে। বানারসি গাড়োয়ান, নৈমুদ্দিন দরজী, ইস্কুলের চাকর পরমেশ্বরা—সকলেই ইহাতে উল্লসিত, সকলেই নিমাইকে নানারূপ পরামর্শ অযাচিতভাবেই দিয়া যাইতেছে। এই সময় গাইকে কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়ানো উচিত তাহা লইয়া রামু ও বিষুণের কলহই হইয়া গেল। রামু সরিষার খোলের পক্ষপাতী, বিষুণের মতে তিসির খোলই সর্বশ্রেষ্ঠ। খড় ভুষি কোথায় সস্তায় পাওয়া যাইবে সে পরামর্শ অনেকেই দিয়া গেল, খ'ড়ো চালাটা আগামী বর্ষায় চলিবে কি না তাহা লইয়াও অনেকে মাথা ঘামাইল। মুকুন্দ পোদ্দার কি একটা কাজে হীরাপুরে আসিয়াছিলেন, বকনাটি দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। তিনি যাচিয়া নিমাইয়ের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া গেলেন যে, নিমাই ভবিষ্যতে কখনও যদি বকনাটি বিক্রয় করে তিনিই কিনিবেন, এমন কি এখনই তিনি ইহার জন্য নগদ পাঁচ টাকা বায়না দিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, নিমাই সম্মত হইল না।

কয়লার সদ্যোজাত শিশুটা নাকি শৃগালের কবলে গিয়াছে। কয়লার বউ তাহাকে আঙিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর রান্না করিতেছিল। দিন-দুপুরে এই কাণ্ড। খুকীর জন্য অমিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মাঝে একদিন শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। আমের মুকুল যদিও এখনও তেমন হয় নাই, তবুও যা হইয়াছিল নষ্ট হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধের শোচনীয় পরিবেশ অপেক্ষা এই পরিবেশ সকলকে বেশি আকুল করিয়া তুলিল। অতীতে কে কত ভীষণ শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে, তাহা লইয়া পাল্লা দিয়া গল্পও চলিল দুই-চারিজন বৃদ্ধের মধ্যে।

আর একটা বিস্ময়কর ঘটনায় সব চাপা পড়িয়া গেল। গ্রামপ্রান্তে

শিবমন্দিরের পাশে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক-দম্পতি বাস করিত। বেচারারা সত্যই অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এ অঞ্চলের বৃদ্ধতম লোকও নাকি তাহাদের ওই একই রকম দেখিতেছে। যম যেন তাহাদের ভুলিয়া আছে। কত ঝঞ্ঝাবাত মহামারী দুর্ভিক্ষে কত শক্ত সমর্থ লোক অকালে মরিল, কিন্তু উহাদের মৃত্যু নাই। কুব্জপৃষ্ঠে ন্যুব্জদেহে লাঠি ধরিয়া ধরিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং চিরকাল হয়তো বেড়াইত, যদি না রাজীব দত্ত দয়া করিতেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ঠেকিলেও কুসীদজীবী রাজীব দত্তই দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেচারাদের আর ভিক্ষা করিতে হইত না। বেশ ছিল। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষণ্ডা ষণ্ডা দুইজন কালো লোক তাহাদের কুঁড়েঘরে ঢুকিয়া বুড়া অন্ধ ভিখারীটাকে কাঁধে তুলিয়া লইল এবং নিমেষমধ্যে অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। বুড়ীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীরা সমবেত হইল। লণ্ঠন লইয়া, মশাল জ্বালিয়া, অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। কিন্তু জীবন্ত বা মৃত বুড়ার কোন সন্ধানই মিলিল না। থানায় খবর দেওয়া হইল, কোন ফল ফলিল না। সম্ভব অসম্ভব নানারূপ গবেষণার পর যে ধারণা ক্রমশ অধিকাংশ লোকের মনে বদ্ধমূল হইল তাহা এই যে, যমরাজকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। বুড়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল, কিছুতেই মরিবে না। যমরাজ তাহা শুনিবেন কেন? দূত পাঠাইয়া জীবন্তই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়েকদিন পরে বুড়ীও মরিয়া গেল।

রহিমের ভেড়া মটরা সকলকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। ফসল খাইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কিছু বলিতে গেলেই ছুটিয়া আসিয়া ঢুঁ মারিয়া ফেলিয়া দেয়। এ অঞ্চলের ছেলেরা তো ওটাকে যমের মত ভয় করে। সর্বাঙ্গে কোঁকড়ানো কালো লোম, প্রকাণ্ড পাকানো শিঙ দুইটা বিশাল 'ৎ'এর মত বলিষ্ঠ গর্দানার উপর যেন ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। মটরার জ্বালায় সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু মটরার প্রতি সকলের স্নেহেরও অন্ত নাই। হইবে না? সেবার রসুলগঞ্জে যখন ভেড়ার লড়াই হয়, তখন এই মটরা

সমাগত সমস্ত ভেড়াকে পরাস্ত করিয়া গ্রামের মুখরক্ষা করিয়াছিল। সেই হইতে মটরা গ্রামবাসী সকলেরই আদরের পাত্র। ইহার বাড়ি ফ্যান খাইয়া, উহার বাড়ি ভুষি খাইয়া, কাহারও বাগান ভাঙিয়া, কাহারও ফসল চরিয়া মটরা দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি শুরু করিয়াছে। ভাগিয়ার ছেলে নন্‌কুকে এমন মারিয়াছে যে, সে হাতের হাড় ভাঙিয়া হাসপাতালে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগিয়া শঙ্করের নিকট আসিয়া মটরার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইল।

শঙ্কর বলিল, আমি কি করব তার? রহিমকেই বল গিয়ে।

আপ থোড়া বোল দিজিয়ে হুজুর।

আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।

রহিম আসিয়া বলিল যে, মটরার জ্বালায় নিজেই সে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে।—কত দড়ি আর কিনি হুজুর, রোজ রোজ দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। নারিকেলের শক্ত মোটা দড়িও এক ঝটকায় পট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। আমি আর উহাকে লইয়া পারি না, নাচার হইয়া পড়িয়াছি; আপনারা বরং ওটাকে কাটিয়া খাইয়া ফেলুন, আপদ চুকিয়া যাক।

এই কথায় ভাগিয়াই জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল, আরে, ছি ছি ছি, ই কেমন বাত!

শঙ্কর বলিল, একটা মোটা লোহার শেকল কিনে গলায় বক্‌লস দিয়ে বেঁধে রাখ্ ব্যাটাকে।

ইহার উত্তরে রহিম যাহা ব্যক্ত করিল, তাহাও সঙ্গত। এই যুদ্ধের সময় বক্‌লস এবং লোহার শিকলের যা দাম, তাহা জুটাইবার সঙ্গতি তাহার নাই। অবশেষে শঙ্করকে বলিতে হইল যে, দামটা সে-ই দিবে।

ভাগিয়া রহিম উভয়েই খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

নেকি মাড়োয়ারী শীঘ্রই নাকি একটি মাখন-তোলা কল বসাইবে।

নটবর এবং চরণ ডাক্তারের চিকিৎসায় হরিয়া ক্রমশ সারিয়া উঠিতেছে।

টিপু মাঝে একদিন হীরাপুর হাটে দাঁড়াইয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে

বল্‌শেভিজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিয়া নাকি হাঙ্গামা হইয়াছে।

কর্পূরা গোয়ালার মেয়ে শুকৃরি মাঝে একদিন হৈ-চৈ বাধাইয়া বসিল। এ দেশের সব মেয়েরই যেমন হয়, তাহারও অতি বাল্যকালেই, দুই বৎসর বয়সেই, বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত সে বাপের বাড়িতেই ছিল। মাসখানেক পূর্বে তাহার 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হইয়াছে। 'গওনা' উপলক্ষ্যে গরিব কর্পূরা বেচারা এই দুর্দিনেও যথাসাধ্য সমারোহ করিয়া মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠাইয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরে ঝপ্‌টি গ্রামে তাহার শ্বশুর-বাড়ি। মেয়েটা হঠাৎ সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। রাতারাতি হাঁটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শ্বশুর-বাড়ির লোকেরাও দুই-একদিন পরে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া উপস্থিত। পলাতকা বধূকে যেমন করিয়া হোক তাহারা লইয়া যাইবেই।

শুকৃরি আসিয়া অমিয়ার শরণাপন্ন হইল। বলিল, তাহার স্বামীর শ্বেতী (ধবল) হইয়াছে, কিছুতেই ও-স্বামীর ঘর সে করিবে না। ঝপ্‌টি গ্রামের কাছেই শঙ্করদের স্থাপিত একটি ডিস্‌পেন্সারি আছে। তাহার স্বামীর যাহাতে সুচিকিৎসা হয়, সে ব্যবস্থা শঙ্কর করিয়া দিবে আশ্বাস দিল। প্রমথ ডাক্তার বলিলেন, ধবল আর কুষ্ঠ এক জিনিস নয়, সংক্রামকও নয়, সুচিকিৎসায় সারিয়া যাইতে পারে। তবু শুকৃরি যাইতে চায় না। অবশেষে শঙ্করকে গ্রামের দোহাই দিতে হইল। সে যদি না যায়, গ্রামেরই একটা বদনাম হইয়া যাইবে যে! এ গ্রামের মেয়েকে কেহ বিবাহই করিতে চাহিবে না হয়তো। তা ছাড়া এমন ভাবে পলাইয়া আসিলে লোকে অন্যরকম বদনামও দিতে পারে। শুকৃরির মত ভাল মেয়ের নামে এ রকম কুৎসা রটা কি ঠিক?

পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নতমুখী শুকৃরি বলিল, এখন গেলে আমাকে উহারা মারিবে। বাহিরের বারান্দায় শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা বসিয়া ছিল, তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল যে, বধূর উপর কোন রকম অত্যাচার করা হইবে না। তখন শুকৃরি আর এক বাহানা তুলিল। ...

ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পায়ে ভয়ানক ব্যথা হইয়াছে, সে আবার অতটা পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না। কর্পূরা গোয়ালা নিকটে বসিয়া সব শুনিতেছিল, তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। মহিষের শিঙের মত উচ্চাগ্র বাঁকা গোঁফ চুমরাইয়া সে সগর্জনে বৈবাহিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঝোঁটি পকাড়িকে ঘিশিয়াকে লে যা। বৈবাহিকটি বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি, শালপ্রাংশু মহাভুজ যাহাকে বলে। পুত্রবধূর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার মত শারীরিক ক্ষমতা তাহার আছে। লোকটি কিন্তু ধীরপ্রকৃতির। কর্পূরার কথায় তাহার মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুত্রবধূর আপত্তির যৌক্তিকতাও সে বোধ হয় উপলব্ধি করিল। বটুয়া হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া সেটির প্রতি সে একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ইতস্তত করিয়া বলিল, আট আনামে বয়েল গাড়ি কি ডোলি হোতেই ?

অসম্ভব। আজকালকার দিনে মাত্র আট আনায় কোন গরুর গাড়ি বা ডুলি দশ ক্রোশ পথ যাইতে রাজী হইবে না। অন্তত চার টাকা লাগিবে। কর্পূরা 'গওনা'তে সম্প্রতি ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, আবার এই চার টাকাও তাহাকে দিতে হইবে নাকি ? তাহার ভয়ানক রাগ হইল। আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়া সে বোধ হয় পুনরায় ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাবটাই করিতেছিল, কিন্তু শঙ্কর বাধা দিল।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমার গাড়িটাই পৌছে দিয়ে আসুক ওকে, মুশাইকে ব'লে দিচ্ছি।

মুশাই মনে মনে খুব চটিল, ছুঁড়ীটার দেমাক তো কম নয়! কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল। শঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার সাধ্যাতীত। শুকরির আর আপত্তি করিবার উপায় রহিল না, বরং তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

শঙ্করের 'শিশা'-লাগানো 'টপ্‌পর'-দেওয়া গাড়িতে চড়িবার সুযোগ পাইয়া সত্যই সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অমিয়া তাহাকে একটি রঙিন শাড়ি কিনিয়া দিল। সে কিন্তু আরও বেশি খুশি হইল অমিয়ার অর্ধেক খালি তরল আলতার শিশিটা পাইয়া, হাতে যেন স্বর্গ পাইল। আর কোন আপত্তি করিল না, শ্বশুর-বাড়ি চলিয়া গেল।

পল্লীজীবনের এই সব অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল। ঠিক নিরুদ্বিগ্ন না হইলেও, শান্তিপূর্ণ।

১৭

কুন্তলা গৃহকর্মে নিমগ্ন ছিল।

উঠানে বসিয়া নিজের হাতেই গরুর জাব কাটিতেছিল। বাংলা দেশ হইতে জাব কাটিবার একটা বঁটি সে আনাইয়া লইয়াছে। এ দেশের 'গড়াসা' তাহার পছন্দ নয়। বর্তমানে তাহার দৈনন্দিন জীবন সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে যে, ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহার কোন অবসর নাই। ইচ্ছা করিয়াই কোন অবসর সে রাখে নাই। ভোর পাঁচটায় সে উঠে। উঠিয়াই প্রথমে ঘর বারান্দা উঠান স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করে। প্রতি ঘরের চৌকাঠে জল ছিটায়, গোবর দিয়া রান্নাঘরটা নিকাইয়া ফেলে। তাহার পর গোয়াল পরিষ্কার করিয়া, গরুকে খাইতে দিয়া, বাসনগুলি মাজে। এতদিন একটা বুড়ী ঝি ছিল, কিন্তু সে এখন নিতান্তই বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে, চোখে দেখিতে পর্যন্ত পায় না। ইচ্ছা করিয়াই কুন্তলা নূতন কোন ঝি রাখে নাই। সে নিজেই সব করিবে। বাসন মাজা হইয়া গেলে সে স্নান করে। স্নানান্তে পূজার ঘরে ঢোকে। পূজা সারিয়া রান্না শুরু করে। বেলা বারোটার পূর্বে হরিহরের খাইবার অবসর হয় না। স্নান, আহ্নিক, পৌরোহিত্য, সামান্য বৈষয়িক কাজ-কর্ম প্রভৃতি দৈনিক কর্তব্যগুলি করিতে বারোটাই বাজিয়া যায়। সুতরাং রান্না খাওয়া শেষ করিতে কুন্তলার প্রায় একটা বাজে। ইহার পর ঘণ্টাখানেক সে বিশ্রাম করে। বিশ্রামের পর খানিকক্ষণ পড়াশোনা, খানিকক্ষণ চরকা। পাঁচটার সময় গরুর জাব কাটে। গরু চরিয়া ফিরিয়া আসিলে স্বহস্তে তাহার জাব পর্যন্ত সে মাখিয়া দেয়। ঝাণ্ডু নামক যে বালকটি গরু চরায়, সে অবশ্য খানিকটা সাহায্য করে, না করিলেও কিছু ক্ষতি হইত না। কুন্তলা কিছুতেই দমিত না। গরুর সেবা করিয়া আবার ঠাকুর-ঘর, আবার রান্নার আয়োজন। বৈকালের দিকে রান্নাটাকে

সে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে। সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সব শেষ করিয়া ফেলে। আটটার পর বাহিরের বারান্দায় পাড়ার অনেকে সমবেত হন, হরিহর ভাগবত পাঠ করেন। কুন্তলাও কিছুদিন হইতে রোজ সেখানে বসিতেছে। পিসীমা যতদিন ছিলেন, ততদিন অবশ্য এসব কিছু ছিল না। তখন হরিহর পাড়ার মুন্সীজীর সহিত দাবা খেলিতেন। কুন্তলা পিসীমার খুঁটিনাটি কাজ করিয়া দিত এবং পিসীমার সঙ্গেই গল্প-গুজব করিত। পিসীমার গল্পের প্রধান বিষয় ছিল হরিহরের পিতা ত্রিপুরেশ্বর এবং হরিহর। হরিহরের বাল্য-জীবনের কথা, ত্রিপুরেশ্বরের জীবনের অলৌকিক নানা কাহিনী পিসীমা সবিস্তারে বলিয়া যাইতেন, বার বার বলিয়াও যেন শেষ করিতে পারিতেন না, শেষ করিয়াও যেন তৃপ্তি হইত না। কুন্তলা ময়দা মাখিতে মাখিতে বা ক্ষীরের ছাঁচ তুলিতে তুলিতে স্মিতমুখে সেসব গল্প শুনিত। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত বটে, কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে অন্যমনস্ক না হয়। পিসীমা সম্প্রতি কাশীবাস করিয়াছেন। তাঁহার এক বোনপো কাশীতে বাড়ি করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই পিসীমা এখন কিছুকাল থাকিবেন। যে হরিহরকে বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু নারীর মনে যে ভাব শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়, তাহা তাঁহার মনেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মায়া তো একদিন কাটাইতেই হইবে, পরকালের কাজটাও তো করা দরকার, কতদিন আর সংসারের ঝঞ্ঝাটে জড়াইয়া থাকিবেন তিনি? বাবা বিশ্বেশ্বরে এমন একটা সুযোগ যখন ঘটাইয়া দিয়াছেন, তখন তাহা ত্যাগ করা কি উচিত? তবু তাঁহার মনে কিছু খুঁতখুঁতানি ছিল, বউমা একা সংসার চালাইতে পারিবে কি, হাজার এম.এ. পাস করুক, ছেলেমানুষ তো, সংসারের কতটুকু বোঝে! কুন্তলা চুপ করিয়া থাকিত। কাশী যাওয়ার সপক্ষে কিছু বলিলে পাছে পিসীমা ভাবেন, বউ তাঁহাকে কাশীতে বিদায় করিয়া দিয়া নিজেই সংসারের কর্ত্রী হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল দোটানার মধ্যে থাকিয়া পিসীমা নিজেই অবশেষে মনস্থির করিয়া

ফেলিয়াছিলেন। হিন্দু বিধবার পক্ষে কাশীবাসের প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। পিসীমা কাশী চলিয়া গেলে সন্ধ্যার পর কুন্তলার বড় একা একা বোধ হইত। পাড়া-বেড়ানো স্বভাব তাহার নয়। পড়িতেও ইচ্ছা করে না একা একা। তাই সে হরিহরকে বলিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবতপাঠের আয়োজন করিয়াছে। এ প্রস্তাবে মুন্শীজীও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করাতে হরিহর রাজী হইয়াছেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ভাগবতপাঠ হয়। তাহার পর আহারাদি করিয়া কুন্তলা শুইয়া পড়ে। এই তাহার বর্তমান দৈনন্দিন জীবন। একেবারে নিশ্চিদ্র। ইচ্ছা করিয়াই সে কোন ছিদ্র রাখে নাই। ছিদ্র থাকিলেই নানা ভাবনা আসিয়া জোটে। অসংখ্য আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা মনের নিম্নস্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন রচনা করে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যে জীবনকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে, সে জীবনের মহিমায় যেন সন্দেহের ছায়াপাত হয়। না, কোনরূপ অশান্তিজনক স্বপ্ন-বিলাসের সুযোগ নিজেকে সে কিছুতেই দিবে না। যে জীবন সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই হিন্দু নারীর আদর্শ জীবন। সর্বতোভাবে সে আদর্শের উপযুক্ত তাহাকে হইতে হইবে, কায়মনোবাক্যে সে আদর্শ-জীবনের মহত্ত্বকে স্বীকার করিতে হইবে, কোনরূপ অনুশোচনার অবসর সে দিবে না, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। আচরণ দ্বারা তো নহেই, মনে মনেও সে স্বীকার করিবে না যে, ভুল করিয়াছে। ভুল সে করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষীয় নারীর আদর্শ। এই আদর্শের উপযুক্ত হইতে হইবে, কষ্ট হয় হোক। যে কোন মহৎ সাধনা করিতে হইলেই কষ্ট করিতে হয়।

তবু মাঝে মাঝে সুধাংশুকে মনে পড়ে। কলেজ-জীবনে সুধাংশুকে সত্যই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। যেমন তাহার সৌম্য মূর্তি, তেমনই আচরণ, তেমনই বিদ্যাবত্তা। দূর হইতেই সে তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল, উপযাচিকা হইয়া অন্য মেয়েদের মত ছলে ছুতায় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সহিত একটা কথা পর্যন্ত বলে নাই। তাহার সহপাঠিনীদের মর্যাদাবোধের অভাব চিরকাল তাহাকে পীড়া দিয়াছে। কাপড়, গহনা, সিনেমা, পুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপারই যেন তাহাদের নিকট

বড়। আত্মসম্মানের যেন কোন মূল্য নাই। অতি তুচ্ছ মূল্যেই নিজেকে বিকাইয়া দিতে সকলে প্রস্তুত। পাশ্চাত্য শিক্ষাটাই আমাদের কেমন যেন আত্মগৌরবশূন্য করিয়া তুলিয়াছে—এই কথাই কলেজে পড়িবার সময় বার বার তাহার মনে হইত। আমাদের যেন কিছু নাই! আমাদের ধর্ম পৌত্তলিকতাময়, আমাদের সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আমাদের সমস্ত সামাজিক নীতি সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণদের কারসাজি মাত্র! বিদেশী ধর্মকে, বিদেশী সমাজকে, বিদেশী নীতিকে, বিদেশী বুলিকে নকল করিতে না পারিলে আমাদের যেন আর মুক্তি নাই! নোবেল প্রাইজ না পাইলে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিব না, বিলাত-ফেরত না হইলে কৌলীন্য-মর্যাদা দিব না, বিলাতী নজির না থাকিলে দেশী কোন কিছু বিশ্বাস করিব না—এই হেয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সে চিরকাল উদ্যত-প্রহরণ। এইজন্যই সে সুধাংশুর নামোল্লেখ পর্যন্ত কাহারও কাছে করে নাই। সুধাংশু জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাদের পালটি ঘরও, চেষ্টা করিলে অনায়াসেই তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু 'চেষ্টা' করিয়া বিবাহ করা ব্যাপারটায় একটা বিদেশী গন্ধ আছে বলিয়া সে চেষ্টাই সে করে নাই। সত্য বটে, এই ভারতবর্ষে পূর্বে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল। সীতা, সাবিত্রী, উষা, দময়ন্তী—সকলে পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আচরণে এমন শিকারী-মনোবৃত্তি ছিল না। আজকাল মেয়েরা যাহা করে, তাহা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরার মত মর্যাদাহীন ব্যাপার। ধৃত মৎস্যটি যদি রুই কাতলা না হয়, তাহা হইলে সেটিকে ছাড়িয়া দিয়া অভিজাত মৎস্যের উদ্দেশ্যে আবার নূতন টোপ ফেলা হয়। বর্তমান যুগের অর্থশাসিত বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রেমের সে মহিমা আর নাই। কেবলমাত্র প্রেমের জন্যই আজকাল কেহ প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিতে রাজী হয় না, যদি না তাহার সহিত একটি সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত থাকে। সুধাংশুর সহিতও একটি সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত ছিল। বিশেষ করিয়া এইজন্যই কুন্তলা তাহাকে এড়াইয়া চলিত, পাছে কেহ মনে করে যে, ধনীসন্তান সুধাংশুকে সে রূপের টোপ ফেলিয়া গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছে। সুধাংশু যদি দরিদ্র হইত, যদি সে বিলাতী ডিগ্রী অর্জন করিয়া

বড় চাকুরি করিবার স্বপ্ন না দেখিত, যদি সে ব্রাহ্মণোচিত নিরাসক্তিতে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের কর্তব্যকেই জীবনে প্রাধান্য দিত, তাহা হইলে কুন্তলা হয়তো তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ব্রাহ্মণ-কন্যা সে, পছন্দ করিয়া যদি বিবাহ করিতে হয় সত্যকার ব্রাহ্মণকেই সে পছন্দ করিবে। কিন্তু সে রকম ব্রাহ্মণ একজনও তো তাহার চোখে পড়িল না। সকলেই অর্থগৃধ্নু। কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের মুখোশ পরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে কেহই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। প্রেমের অঞ্জলি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কাহার চরণে দিবে সে? ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া টাকার লোভে একটা বৈশ্যকে ভুলাইতে যাইবে? ইহা করা অপেক্ষা বর্তমান যুগের সম্প্রদান-প্রথায় আত্মসমর্পণ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ঢের বেশি আত্মসম্মানজনক। সম্প্রদান-প্রথার অন্তর্নিহিত ভাব সত্যই মহত্ত্বপূর্ণ। যে কন্যা সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নের সঙ্গে উপমিত, সেই কন্যাকে লালনপালন করিয়া স-দক্ষিণা সৎপাত্রে দান করার মধ্যে যে আভিজাত্য আছে, তাহা কি তুচ্ছ করিবার মত? বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় (যে আবহাওয়ায় অর্থই পরমার্থ) পণপ্রথা-দুষ্ট হইয়া সে উদারতা চর্চা করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তবু তাহা যে মহত্ত্বপূর্ণ, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? এখনও আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ এত কষ্টে পড়িয়াও এই উদার প্রথাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, কন্যা-বিক্রয়ের হীনতা স্বীকার করে নাই। তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজেই কন্যারা আজকাল নিতান্ত দেহের তাগিদে এবং বিলাস-লালসায় মত্ত হইয়া বৈশ্যের কামবহ্নিতে নিজেদের ইন্ধন দিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে পাশ্চাত্য সমাজের নকল করিয়া। কুন্তলা এ হীনতা স্বীকার করে নাই। পিতার হস্তেই বিবাহের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল।...তবু সুধাংশুর মুখখানা মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। পড়ুক। সুধাংশু তাহার কেহ নয়। হরিহরের সহিত তাহার তুলনা পর্যন্ত সে করিবে না। হরিহর তাহার স্বামী, আরাধ্য দেবতা, শুধু ইহকালের নয় পরকালেরও সম্বল।

কুন্তলার সহিত হরিহরের বিবাহের ইতিহাসটিও ঈষৎ অদ্ভুত। কুন্তলার

উগ্র আত্মমর্যাদাবোধের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। হরিহরের পিতা স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এ অঞ্চলে 'ঠাকুর-বাবা' নামে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরের পুরোহিত অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পর প্রাক্তন জমিদার রাজবল্লভ রায় স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বর্ধমান জিলার এক গ্রাম হইতে সন্ধান করিয়া লইয়া আসেন এবং হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরে পুরোহিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঠাকুর-বাবা একমাত্র মাতৃহীন পুত্র হরিহর ও বিধবা ভগ্নীটিকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং জমিদার-প্রদত্ত নিষ্কর জমিজমার সাহায্যে হীরাপুরে বসবাস করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-বাবার বিষয়ে অনেক অলৌকিক গল্প এ দেশে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি ভূতপ্রেতের সহিত কথাবার্তা কহিতেন, শীতকালে পাকা আম-কাঁঠাল আনাইয়া দিতে পারিতেন। অনেক পরী নাকি তাঁহার বাধ্য ছিল। অনেকে স্বচক্ষেই নাকি দেখিয়াছে, স্বচ্ছ-বসনা জ্যোৎস্না-বরনা পরী মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে। লোহাকে সোনা করার ক্ষমতাও নাকি তাঁহাব ছিল। কিন্তু এ বিদ্যা একটিবার ছাড়া কখনও তিনি কাজে লাগান নাই। তিনি সত্যই সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বর্ণ এবং লৌহ তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য ছিল। একবার কেবল একটি দরিদ্র বৃদ্ধার লোহার খন্তিটিকে তিনি সোনার করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা অর্থাভাবে তাহার একমাত্র পুত্রের চিকিৎসা করাইতে পারিতেছিল না এবং ঠাকুর-বাবাকে আসিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে নিরাময় করিয়া দিবার জন্য। ঠাকুর-বাবা বলিয়াছিলেন, নিয়তি কাহারও বাধ্য নয়, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা ঘটিবেই, তুমি কর্তব্য কর, পুত্রের চিকিৎসা করাও, তাহার পর জগজ্জননীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। বৃদ্ধা অর্থাভাবের কথা জানাইলে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোর যদি কোন লোহার বাসন থাকে, পরিষ্কার করিয়া মায়ের পায়ের তলায় রাখিয়া যা, মায়ের যদি দয়া হয় লোহাকে সোনা করিয়া দিবেন। বুড়ীর প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়া ছিল, সেইটা পরিষ্কার করিয়া দিলেই হইত, কিন্তু বোকা বুড়ী তাহা না করিয়া খন্তিটা দিয়া আসিয়াছিল। বুড়ী বোধ হয় ঠাকুর-বাবার

কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই। পরদিন কিন্তু বুড়ীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, মায়ের পদস্পর্শে লোহা সত্যই সোনা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর-বাবা বুড়ীকে এ কথা প্রকাশ করিতে মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুড়ী কি এত বড় একটা সংবাদ চাপিয়া রাখিতে পারে! বেশি লোককে সে অবশ্য বলে নাই। কেবল নিজের ভোজাইকে, পিতিয়াকে এবং তেতরিকে বলিয়াছিল। তাহার এই অবাধ্যতার ফলও অবশ্য ফলিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচে নাই। এই সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ঠাকুর-বাবার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর-বাবা কাহাকেও আর আমল দেন নাই। সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, যায় নাই কেবল ঝকৃস্থ। বলিষ্ঠ দুর্দান্ত ঝকৃস্থ জাতিতে লোহার। স্বচক্ষে সে সুবর্ণময় খন্তিটি দেখিয়াছিল। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন ঠাকুর-বাবার নিকট হইতে সে সোনা করিবার মন্ত্রটি আদায় করিতে পারিল না, তখন কি যে তাহার মনে হইল, ঠাকুর-বাবার আশ্রয় সে আর ত্যাগ করিল না। আজীবন তাঁহার আশ্রয়েই থাকিয়া গেল। দুর্দান্ত মাতাল দুর্দান্ত কর্মীতে পরিণত হইল। ঝকৃস্থ তাহার মোটা বুদ্ধি দিয়া এইটুকুই বোধ হয় বুঝিয়াছিল যে, ফাঁকি দিয়া অর্থোপার্জন করা পাপ। তাহা না হইলে ঠাকুর-বাবা নিজেই ঐশ্বর্যবান হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা হন নাই। তিনি নিজের কয় বিঘা জমি হইতে উৎপন্ন শস্য এবং শিষ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামান্য দক্ষিণা লইয়াই তো সন্তুষ্টচিত্তে মায়ের সেবা করিতেছেন।

এই ঠাকুর-বাবার পুত্র হরিহর স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়িয়াছিলেন। কাজ-চলা-গোছ ইংরেজী বিদ্যা লাভ করিয়া পিতার নির্দেশে তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোযোগ করিতে হইয়াছিল। খাঁটি স্বদেশী ছাঁচে ঠাকুর-বাবা পুত্রটিকে মানুষ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, টানা চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে শুচিতা যেন মূর্ত হইয়া আছে। নগ্ন গাত্রে এক গোছা শুভ্র উপবীত, মস্তকে গোক্ষুর পরিমাণ শিখা বিদেশাগত আধুনিকতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত বিরাজ করিতেছে। অথচ লোকটি রবীন্দ্রনাথের গোরার মত উগ্র নয়, কথায় কথায় বক্তৃতা দিবার আবেগ তাঁহার জাগে না। অতিশয় স্বল্পভাষী মৃদুপ্রকৃতির লোক। নিজেকে

লোকচক্ষু হইতে যথাসম্ভব অবলুপ্ত করিয়া রাখাই যেন তাঁহার সাধনা। অধিকাংশ সময়ই মন্দিরে থাকেন, পূজা এবং পড়াশোনা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। শিষ্যবাড়ির আহ্বানে অথবা কোথাও কথকতা করিবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচ সহকারে কাঁধে চাদরটি ফেলিয়া ক্বচিৎ কখনও তিনি বাহির হন। ফসল উঠিবার সময়ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে বাহির হইতে হইত, কিন্তু কুন্তলা আসিবার পর হইতে বৈষয়িক সমস্ত ব্যাপারের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই নিরীহ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সহিত এম.এ.-পাস কুন্তলার বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল ত্রিপুরেশ্বরের সহিত কুন্তলার পিতার আলাপ ছিল বলিয়া। শুধু আলাপ নয়, কুন্তলার পিতা ইংরেজী-শিক্ষিত অধ্যাপক হইলেও ত্রিপুরেশ্বরের একজন ভক্ত ছিলেন। কুন্তলার মাও ত্রিপুরেশ্বরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন। ত্রিপুরেশ্বরই নাকি একবার বালিকা কুন্তলাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি খুব সুলক্ষণা, আমার হরুর সঙ্গে এর বিয়ে দাও তো বড় খুশি হই। কুন্তলার পিতা মাতা উভয়েই তখন এ প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, কুন্তলাও কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটা স্বপ্ন-রচনা করিয়াছিল। কিন্তু কথাটা তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে ত্রিপুরেশ্বর পত্রযোগে আবার এ প্রস্তাব করেন। কুন্তলার পিতা পত্রের উত্তরে লেখেন, কুন্তলা হরিহর উভয়েই এখন পড়িতেছে, উহাদের পড়াশোনা শেষ হইলে শুভকর্ম সমাধা করা যাইবে। বিবাহ ঠিক করাই রহিল। কিন্তু কুন্তলা এমন ভালভাবে পড়াশোনা এবং পাস করিতে লাগিল যে, তাহার বাবা পড়া বন্ধ করিতে পারিলেন না। কুন্তলা যখন আই. এ. পড়িতেছে, তখন তাহাকে একদিন বলিলেন, হরিহরের সঙ্গে কিন্তু তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা আছে, বিয়ে করবি তো? কুন্তলার মন তখনও পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহে মুগ্ধ। সবাই যেমন বলে তেমনই বলিল, পড়াশোনা শেষ ক'রে তারপর বিয়ের কথা। ইতিমধ্যে ত্রিপুরেশ্বর মারা গেলেন। হরিহরকে ত্রিপুরেশ্বর বিবাহের কোন কথাই বলিয়া যান নাই, বিবাহ সম্বন্ধে হরিহরেরও বিশেষ তেমন কোন আগ্রহ ছিল না, পিসীমাই মাঝে মাঝে কেবল ব্যগ্র হইতেন। এদিকে কুন্তলা যখন এম. এ পাস করিয়া ফেলিল, তখন

তাহাকে একটা গ্রাম্য পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিতে কুন্তলার বাবা একটু যেন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কুন্তলার মায়েরও কেমন যেন অনিচ্ছা দেখা যাইতে লাগিল। কুন্তলার আত্মমর্যাদাবোধ তখন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, ওঁদের সঙ্গে যখন কথা হয়ে আছে, সে কথার নড়চড় করা অভদ্রতা হবে। ওঁদের একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, ওঁরা যদি আপত্তি করেন, আমাদের তা হ'লে আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না।

কুন্তলার মা বলিলেন, ছেলেটি তো মোটে ম্যাট্রিক-পাস শুনছি। ওর সঙ্গে তোর মানাবে কেন?

কুন্তলা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, বাবা এম.এ.পি.এইচ-ডি, আর তুমি তো একেবারে নিরক্ষর, তোমাদের কি মানায় নি? আমি এম.এ. পাস করেছি ব'লে কি তোমাকে মা ব'লে সম্মান করব না? পাস করাতে কি এসে-যায়।

কুন্তলার বাবা বলিলেন, ইংরেজী তেমন না জানলেও ছেলেটি সংস্কৃতে বেশ পণ্ডিত। ঘরে খেতে-পরতেও আছে। একশো বিঘের ওপর ভাল জমি, দেশেও ধেনো জমি আছে। সেদিকে কিছু খারাপ নয়, অত বড় বংশ, ছেলেটিও বেশ সুস্থ সচ্চরিত্র। আমি কেবল তোর কথা ভেবেই একটু দোনোমোনো করছিলাম।

আমার কোনও আপত্তি নেই।

পত্র পাইয়া হরিহর অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। মেয়ে এম.এ.-পাস শুনিয়া পিসীমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ও মা, তা হ'লে সে তো মেয়ে নয়, মেমসাহেব! চশমা গাউন প'রে রুজ পাউডার মেখে বাহার দিয়ে জুতো খটখটিয়ে বেড়াবে খালি। একবার কলকাতায় দেখেছিলাম এক এম.এ.-পাস মেয়েকে, বাবা রে বাবা, সে কি ছিরি তার! হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতো, চোখে চশমা, ঘাগরা ক'রে কাপড় পরা! মুখখানি কিন্তু শুকনো আমসির মত, তার ওপর আবার রুজ পাউডার!

ভীত হরিহর অসহায়ভাবে বলিলেন, বাবা কিন্তু এরই সঙ্গে কথা দিয়ে গেছেন যে!

কথা দিয়ে গেছেন? কি ক'রে জানাল তুই?

বাবার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

এ যুক্তি অকাট্য। উভয়েই চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে পিসীমা অবশেষে বলিলেন, এক কাজ কর্ না হয় তুই, গুরুঠাকুরকে চিঠি লেখ্। তিনি জ্যোতিষীও বটেন, তোর কুষ্ঠিবিচার ক'রে সৎপরামর্শ দেবেন। এ তো এক মহা মুশকিলে পড়া গেল বাপু!

হরিহর তাহাই করিলেন। কয়েকদিন পরে কুলগুরু শিবকিঙ্কর শর্মার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তোমার পিতা যদি যথার্থই বাগ্‌দান করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে সত্যই অধর্ম হইবে জানিও। তোমার কোষ্ঠী-বিচার করিয়া তোমার বধূর যে বর্ণনা উদ্ধার করিলাম, তাহা জানাইতেছি। বাগ্‌দত্তা কন্যাটির সহিত যদি মিলিয়া যায়, তুমি নির্ভয়ে বিবাহ করিতে পার। বুঝিও, ইনিই তোমার বিধি-নির্দিষ্টা সহধর্মিণী। কন্যাটি গৌরবর্ণা, নাতি-দীর্ঘাঙ্গী, বিদুষী ও অচপলা হইবে। চরিত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রখরতা থাকিতে পারে, কিন্তু স্থিরপ্রজ্ঞাশালিনী ও চারিত্রিক শক্তিসম্পন্না হওয়াতে তাহা দুঃখের হেতু না হইয়া আনন্দেরই কারণ হইবে। কন্যার নামের আদ্যক্ষর 'ক' হওয়া উচিত। কন্যার পিতা সম্ভবত অধ্যাপক। তোমার একটা অপমৃত্যু-যোগ আছে দেখিতেছি, কন্যার কোষ্ঠীতে ইহার কোনও কাটান আছে কি না জানি না। যাই হোক, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়, অদৃষ্টও দুরতিক্রম্য। আমার মতে পিতৃ-আদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য।

বর্ণনার সহিত অনেকটা যখন মিলিয়া গেল, তখন হরিহর এবং হরিহরের পিসীমা বুঝিলেন, গত্যন্তর নাই, ভবিতব্যকে মানিতেই হইবে।

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ করিয়া হরিহর যেদিন গ্রামে আসেন, সেদিন হরিহরের পিসীমা কম্পিতবক্ষে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পালকির ভিতর হইতে শেমিজ-কামিজ-জুতা-পরা কি অদ্ভুত জীবই না জানি বাহির হইবে, হয়তো প্রণাম না করিয়া শেকহ্যাণ্ড করিতে যাইবে, হয়তো বাড়িতে পা দিতে না দিতেই হরিহরের

হাত ধরিয়া বলিবে, চল, ফাঁকা মাঠে হাওয়া খাইয়া আসি, বিকালে বেড়ানো আমার অভ্যাস! কিন্তু পালকির ভিতর হইতে যখন চেলী-পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী নতমুখী সিঁথি-মউর-শোভিতা অলক্তকচরণা কুন্তলা সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল, তখন আনন্দে বিস্ময়ে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন। যতদিন সংসারে ছিলেন, তাঁহার সে বিস্ময় এবং আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কুন্তলার প্রশংসায় তিনি শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বউ শুধু এম.এ.-পাসই নয়, শাক চচ্চড়ি সুক্তো হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম রান্না করিতে জানে, বড়ি দিতে পারে, চমৎকার আলপনা দেয়, চরকা কাটে, এমন কি ইতুপূজা পর্যন্ত জানে। হরিহরের মনেও যে ভয় হইয়াছিল, তাহা অল্প পরিচয়েই কাটিয়া গেল। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণ-গৃহিণী হইবার যোগ্যতা কুন্তলার আছে। ইহা লইয়া বেশি উচ্ছ্বসিত অবশ্য তিনি হন নাই, বিবাহরূপ কর্তব্যকর্ম সমাপন করিয়া নিজের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় সহজভাবেই চলিতেছিলেন। ইহাই কুন্তলার বিবাহের ইতিহাস।

কুন্তলা জাব কাটিতেছিল।

ঝকৃস্থর পুত্র রামলাল একটি খাতা ও বই লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল বেশ কায়দা-দুরস্ত করিয়া ছাঁটা। গায়ের হাফশার্ট এবং হাফশার্টের হাতা হইতে আধুনিক রীতিতে ছোট একটা ত্রিভুজাকৃতি অংশ বাদ দেওয়া। পায়ে বক্‌লস-শোভিত জুতা। সে যে ঝকৃস্থর পুত্র, তাহা না জানিলে বোঝা শক্ত। এবারে সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। বহুমাঈজীর নিকট পড়া বলিয়া লইতে আসিয়াছে। রোজ আসে। সে বারান্দায় উঠিয়া বসিল এবং গতকল্য কুন্তলা যে যে অংশগুলি অনুবাদ করিতে দিয়াছিল, তাহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বিরক্তিতে কুন্তলার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অজস্র ভুল। রামলালকে লইয়া আর পারা গেল না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষণেরও যে লিঙ্গ আছে, এই সামান্য

কথাটা কিছুতেই ইহার মাথায় ঢুকিবে না। জাব কাটিতে কাটিতেই কুন্তলা সংশোধন করিতে লাগিল।

১৮

মাঘ মাসের শীত। সকাল হইতে একটা প্রখর পশ্চিমে হাওয়া উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল, রৌদ্রকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছে, তবু কনকনে শীত, হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। আঙুলের ডগাগুলি বরফ-শীতল। গায়ে গেঞ্জি, সার্জের পাঞ্জাবি, মোটা সোয়েটার, তবু শীত করিতেছে। শঙ্কর উঠিয়া ওভারকোটটা গায়ে দিল।

ছিত করচে ?

খুকী মন্তব্য করিল। খুকীর শীত নাই। একটা সাধারণ জুট ফ্ল্যানেলের ফ্রক তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের কোণে একটি টুলের উপর বসিয়া এবং আর একটি উচ্চতর টুলের উপর খাতা রাখিয়া একটি পেন্সিল সহযোগে সে হিজিবিজি কাটিতেছিল। লিখিবার সময় শঙ্কর যেমনভাবে বসে ঠিক তেমনিভাবে একটু ঝুঁকিয়া টুলের উপর বাম কনুইয়ের ভর দিয়া বসিয়াছে। যদিও আজকাল কাগজ পেন্সিল দুর্মূল্য, তবু তাহাকে একটা ছোট পেন্সিল এবং পুরাতন খাতা দিতে হইয়াছে। সে চিঠি লেখে। বাবা যাহা যাহা করে, সব তাহার করা চাই। এমন কি, পোড়া সিগারেটের টুকরা কুড়াইয়া সে বাবার মত 'ছিগ্‌লেট'ও খায়।

বড্ড শীত করছে।

তা কাবে ?

খাব।

মাকে ব'লে আতি।

পাকা গৃহিণীর মত মুখ করিয়া খুকী রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

শঙ্কর খবরের কাগজটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। এতক্ষণ সে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। জাপান ও জার্মানির যুদ্ধোদ্যম আশঙ্কাজনক। ভারতবর্ষের

যুদ্ধে যোগদান করা উচিত কি না, ইহা লইয়া নেতাদের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। উচিত কি? শঙ্কর ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ক্ষণপরেই মনে হইল, আদার ব্যাপারী শুধু শুধু জাহাজের ভাবনা ভাবিয়া মরিতেছি কেন? যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানও যেমন তাহার অসম্পূর্ণ, সম্পর্কও তেমনই অসংলগ্ন। বহু সহস্র মাইল দূরে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, এ দেশের উলুখড়দেরও আপাতত চিন্তিত হইবার কোন হেতু নাই। যুদ্ধ এ দেশে উপস্থিত হইলে যথাকর্তব্য চিন্তা করা যাইবে। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন প্রেরণা তাহার মনে জাগিল না।

কট কট কট কট কট…

'তাসা' বাজিতেছে। মহরম আসিয়া পড়িল নাকি? এইবার দলে দলে মুসলমান প্রজারা আসিয়া ধারের জন্য দ্বারে ধরনা দিবে। যে উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। স্থির হইয়াছিল যে, চাষের জন্যই চাষীদের ধার দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা ভাল বীজ, ভাল সার, ভাল গরু কিনিয়া ভালভাবে চাষ করিতে পারে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। কাযকালে কিন্তু দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি চাষা ধার চায়—হয় বিবাহের জন্য, না হয় মহাজনদের ধার শোধ করিবার জন্য, কিংবা কোন পর্ব উপলক্ষ্যে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিবার দিকে তাহাদের তত উৎসাহ নাই। তাহারা জানে যে, যত ভাল ফসলই তাহারা উৎপন্ন করুক না কেন, সে ফসল তাহাদের ভোগে কখনও লাগিবে না। তাহা মহাজনে গ্রাস করিবে। যে ঋণজালে তাহারা জড়িত, প্রত্যেক বছর ফসল দিয়াই সে ঋণের খানিকটা পরিশোধ করিতে হয়, অনেক সময় মহাজন মাঠ হইতেই ফসল কাটাইয়া লইয়া যায় এবং নিজের খুশিমত একটা মূল্য ধার্য করিয়া দেয়। তাহারা জানে যে, ফসল যত ভাল হোক, ঋণ কখনও পরিশোধ হইবে না। মহাজন ফসলের দাম যাহা দিবে তাহাই তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ ওই মহাজনরাই বিপদে-আপদে টাকা ধার দেয়, মহাজনদের দ্বারে

তে পাতিয়া জীবন-ধারণ করিতে হয়, মহাজনরাই মালিক। বহু যুগ ধরিয়া কার্যত ওই মহাজনদেরই ক্রীতদাস তাহারা। মহাজনদের ঘরে দশ মণের জায়গায় বিশ মণ ফসল পৌঁছাইয়া দিলে যদি সত্যই তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারিত, সে চেষ্টা তাহারা নিশ্চয়ই করিত। কিন্তু অধিকাংশ চাষারই জমি সামান্য, কিন্তু ঋণ প্রচুর। সুদের চক্রবৃদ্ধিতে সে ঋণ পর্বতপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। সে পর্বত ধূলিসাৎ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দেশের আইন তাহাদের অনুকূল নয়, চাষের উন্নতি করিয়া ঋণ-শোধ করিবার আশাও তাহারা করে না। ভাল সার, ভাল গরু, ভাল বীজ লইয়া কি করিবে তাহারা? ঋণমুক্ত হইবে? অসম্ভব। বংশপরম্পরা ধরিয়া এই সত্য তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে যে, ঋণ আছে এবং থাকিবে। তাই বলিয়া কি বিবাহ করিতে হইবে না? হোলি, ছট, দশমীতে ন্তন নূতন কাপড় পরিতে হইবে না? কোন সামাজিক অপরাধে হুক্কাপানি বন্ধ হইলে গোতিয়াদের আহারে তুষ্ট করিয়া জাতে উঠিতে হইবে না? ইহাই তো তাহাদের জীবন। চাষের উন্নতির জন্য নয়, এই জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্যই তাহাদের টাকার দরকার। এই জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তই তাহারা তাড়ি মদ গাঁজা আফিং খায়। এসব বাদ দিয়া তাহারা বাঁচিবে কিসের আশায়! তাই তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত নৈতিক বক্তৃতা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ করে না। তোমাদের মত তাহারাও জীবনকে ভোগ করিতে চায়। শঙ্কর ইহা বোঝে, তাই আর আপত্তি করিতে পারে না। লিখিত আইন অমান্য করিয়াও ধার দিয়া ফেলে। মহরমের বাজনা শুনিয়া তাই সে মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল। চাষের মিথ্যা অজুহাতে আবার একদল লোককে একগাদা টাকা দিতে হইবে। অথচ না দিয়াও উপায় নাই। এ এক মহাসমস্যা। এবার কিন্তু সে টাকা দিবে না ঠিক করিয়াছে। সেবার অত টাকা মহাজনদের সিন্দুকে ঢুকিয়াছিল। এবার সে টাকা দিবে না, জিনিস কিনিয়া দিবে। নিপুদা আর নিমাই ঘটক যদি সাহায্য করে, অনায়াসেই উহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনিয়া দেওয়া যায়। মেয়েদের জিনিস

হাসি কিনিতে পারে। হাসিও এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। হাসির তত্ত্বাবধানে ও কার্যকুশলতায় মেয়ে-স্কুলটার বেশ উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু জন-কয়েক শিক্ষিত বেহারী-ভদ্রলোক একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। হাসি 'হিন্দী-নোইং' নয়। কাজ-চলা-গোছ হিন্দী সে অবশ্য শিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দী পরীক্ষা পাস না করিলে গভর্মেণ্টের চক্ষে 'হিন্দী-নোইং' হওয়া যায় না। পরীক্ষা পাস করিতে হইবে। হাসি পরীক্ষা দিতে রাজী নয়। যাঁহারা 'হিন্দী-নোইং' শিক্ষয়িত্রীর জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা যে হিন্দী ভাষার প্রতি অথবা বেহারী সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিবশত করিতেছেন, তাহা নয়। তাঁহাদের সর্ববিষয়ে বাঙালীদের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া এ ধারণা হয় না যে, স্বকীয় বেহারী বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহারা খুব বেশি অবহিত। এই শিক্ষিত বেহারীগণ বাঙালীদেরই মত চাকরিলোলুপ, বাঙালী পোশাক পরেন, ছেলেমেয়েদের বাঙালী নাম রাখেন, বাঙালী আহার পছন্দ করেন, বাঙালীদের সাহিত্য হইতে চুরি করেন; কিন্তু বাঙালীদের ভাল দেখিতে পারেন না। ইংরেজ সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের মনোভাব ছিল, বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সম্পর্কে ইহাদের ঠিক সেই মনোভাব। হাসি যে স্কুলের উন্নতির জন্য এত পরিশ্রম করিতেছে, তাহা ইঁহাদের নিকট অবান্তর ব্যাপার, আসল কথা—হাসি 'বাঙালিনী,' তাহাই তাহার চরম অপরাধ। কোন একটা ছুতা করিয়া তাহাকে তাই তাড়াইতে হইবে। মেষশাবককে বধ করিবার জন্য নেকড়ে বাঘের ছুতার অভাব কোন কালে হয় না। শিক্ষা-বিভাগের আইনও তাঁহাদের সপক্ষে আছে।

যাহারা ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত তাহাদেরই এই মনোভাব। অশিক্ষিত জনসাধারণ হাসিকে ভালবাসে, ভক্তি করে। শঙ্কর বারম্বার এই সত্যটি নানারূপে উপলব্ধি করিতেছে, যত গলদ যত কলহ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই। শিক্ষা-বিভাগের আইনের কবলে নিমাই বেচারাও কবলিত। এই সব কারণে তাহার স্কুলগুলি গভর্মেণ্ট-সম্পর্করহিত করিবার ইচ্ছা শঙ্করের কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল। গভর্মেণ্ট যে টাকা সাহায্য করেন তা যৎসামান্য, সে সাহায্য না লইয়াও শঙ্কর স্কুলগুলি চালাইতে পারে। কিন্তু

অন্য মুশকিল আছে। ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের কলমের খোঁচায় কাঁটাপোখর স্কুলটি যখন গভর্মেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল, তখন স্কুলটা উঠিয়াই গেল। অর্থাভাবে নয়, ছাত্র জুটিল না। যে স্কুল হইতে পাস করিয়া গভর্মেণ্টের 'নোকৃরি' মিলিবে না, সে স্কুলে কেহ পড়িতে চায় না। কেহই 'শিক্ষা' চায় না, সকলেরই উদ্দেশ্য 'নোকৃরি'। গভর্মেণ্ট-অননুমোদিত 'জাতীয়' স্কুলে ছাত্র জুটিবে না। এ মনোভাব যদিও প্রশংসনীয় নয়, তবু শঙ্কর ভাবিয়া দেখিয়াছে, 'নোকৃরি'র লোভে তবু খানিকটা শিক্ষা তো হয়, তাহাই মন্দের ভাল। নিমাই আইনত নিজেকে 'কোয়ালিফাই' করিতেছে। মুরগী-মদ-পরিতুষ্ট ইন্‌স্পেক্টর দয়া করিয়া তাহাকে 'টাইম' দিয়াছেন। হাসিকেও রাজী করাইতে হইবে। হাসি দিন দিন কেমন যেন গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে। মুখে হাসি নাই, প্রসন্নতা নাই,—চোখে কেমন যেন একটা দৃষ্টি। কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। নিজের ছেলেকেও কাহারও সহিত মিশিতে দেয় না। নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যটুকু করিয়া নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অমিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিল, আলাপ জমে নাই। খুব কম কথা বলে, মনে হয়, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক সেইটুকুরই উত্তর দিয়া চুপ করিয়া যায়। ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া করিয়া আলাপ জমানো যায় না। অমিয়ার আর হাসির কাছে যাইবার উৎসাহ নাই। সুরমা কিন্তু মাঝে মাঝে যায়। কারণ সুরমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী আছে, তদনুসারে সে নিয়মিতভাবে সামাজিক কর্তব্যগুলি করিয়া যায়। কবে কাহার বাড়ি যাইতে হইবে, কাহার বাড়িতে কবে কোন্ খাবারটি পাঠাইতে হইবে, কোন্ মেয়েটিকে কবে কোন্ গানটি শিখাইতে হইবে, কবে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—এ সমস্তই সুরমা বাঁধা-নিয়ম অনুসারে করে। ঠিক নিয়মিতভাবে আসন বুনিয়া চলিয়াছে। অথচ উৎপলের সম্বন্ধেও সে উদাসীন নয়, উৎপলের জন্য অন্তত একটি খাবার তাহার নিজের হাতে করা চাই, উৎপলের অনেক চিঠির জবাব সে-ই লেখে। পড়াশোনাও করে। পাড়ার কয়েকজন বাঙালী ও বেহারী মেয়েকে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলাতেও উৎসাহিত করিয়াছে। কুন্তলার সহিত

তর্ক করিবারও অবসর পায়। তুমুল তর্ক করিয়া বন্ধুত্বও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। অদ্ভুত রকম ছন্দোময় তাহার জীবন। অদ্ভুত রকম মাত্রাজ্ঞান আছে। অমিয়ার সহিত যখন কথা কয়, মনে হয়, শিক্ষায় দীক্ষায় সে অমিয়ারই সমান। ঠিক সমান স্বচ্ছন্দতার সহিত সে সেদিন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মেমসাহেবের সহিতও আলাপ করিল। কোথাও কখনও বেসুরা হয় না। সুরমার কর্মতৎপরতায় শঙ্কর মুগ্ধ। বহুকাল পূর্বে এই সুরমাকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে মোহ জাগিয়াছিল, সে মোহ এখন কিন্তু আর নাই। নিজের স্ত্রীরূপে অমিয়ার স্থানে সুরমাকে সে কল্পনাই করিতে পারে না। সুরমা কারুকার্যমণ্ডিত পালঙ্ক, অমিয়া হয়তো অতি সাধারণ তক্তাপোশ। কিন্তু সুনিদ্রার জন্য শঙ্করের পালঙ্কের আর প্রয়োজন নাই, তক্তাপোশই যথেষ্ট। বস্তুত পালঙ্কে হয়তো মোটেই নিদ্রা আসিবে না, এ আশঙ্কাও আছে। না, সুরমাকে ঘিরিয়া সে মোহ তাহার আর নাই। তবু সুরমা-চরিত্রে সে মুগ্ধ।

বাবুজী!

দ্বারপ্রান্তে রহিম দেখা দিল। তাহার সহিত পুরণও আসিয়াছে। মহরমে কি কি জিনিস লাগে, তাহারই আলোচনা করিবার জন্য শঙ্কর রহিমকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। শঙ্কর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতেই রহিম এবং পুরণ উভয়েই সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুরণের কি খবর?

পুরণ কোন উত্তর না দিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর তখন রহিমকে বলিল, মহরমে তোদের কি কি হয়, বল্ তো? এবার আর টাকা পাবি না কেউ, জিনিস কিনে দেব ভাবছি। মহরমে কি কি করবি বল্?

রহিম নিজের ভাষায় মহরম-পর্ব বর্ণনা করিতে লাগিল।

আমরা যেমন পূজা-পার্বণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করি, উহারাও তেমনই একজন 'মোজাবর' নিযুক্ত করে। 'মোজাবর'কেই সব করিতে হয়। আমাদের দুর্গাপূজায় যেমন ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী আছে, মহরমেও তেমনই আছে। 'ছট্‌মী'র দিন দুইটি কর্তব্য। প্রথম—'কেলা কাটুটি'।

কালে কলার গাছ কাটিতে হয়। তাহার পর পাড়ার লোক দল বাঁধিয়া গিয়া 'ইমামবাড়া'তে সমবেত হইয়া সেই কলাগাছ পুঁতিয়া আসে। বৈকালে দ্বিতীয় কর্তব্যটি করা হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য—নদী হইতে মাটি আনা। পরিষ্কার মাটির গামলায় সে মাটি রাখিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া তাহা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই হইল 'ছটুমী'র কাজ। সপ্তমীর দিন 'সুনসান', অর্থাৎ চুপ, বিশেষ কিছু করিবার থাকে না। 'অঠ্মী'র দিন কিন্তু অনেক কাজ। সেদিন ইমামবাড়াতে শরবত এবং তিল-চৌরি লইয়া যাইতে হয়। 'তিল-চৌরি' চাল চিনি এবং তিল দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্ন, প্রত্যেকে বাড়ীতেই তৈয়ারি করে। শরবত এবং তিল-চৌরি ইমামবাড়াতে লইয়া যাইবার পর 'মোজাবর' নেমাজ পড়েন। সেই নেমাজ-পূত শরবত তিল-চৌরি ঘরে আনিয়া রাখা হয়। তাহার পর 'মলিদা' বানাইয়া কিছু বুঁদিয়া এবং লাল পাতা উহার উপর দিয়া মূরতজ আলির পাঞ্জার নিকট লইয়া গিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার পর সেগুলি ঘরে আনিয়া সকলে মিলিয়া খায়। সেই 'অঠ্মী'তেই রাত দুইটার সময় 'তাসা' বাজিয়া উঠে। মাটির কড়ার উপর চামড়া দিয়া এই বাদ্যটি প্রস্তুত, কোমরের কাছে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠি দিয়া বাজাইতে হয়। 'তাসা' বাজিলেই সকলে নিজেদের নিশান-তাজিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাজিয়ানিশানসমন্বিত এক-একটা দলকে 'আখাড়া' বলে। আপন আপন আখাড়া লইয়া তাসা বাজাইতে বাজাইতে লাঠি খেলিতে খেলিতে সকলে মূরতজ আলির বাজারে যায়। সেখানে নিশান নামাইয়া ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'নউমী'র দিন দিনে কিছু হয় না, রাত্রে একটু ভালো আহারের ব্যবস্থা থাকে সেদিন; পোলাও হয়। রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ পোলাও লইয়া মোজাবর-সহ সকলে ইমামবাড়াতে যায়। সেখানে 'ফতেহা' হয়। মোজাবর 'দোয়া' মানে, অর্থাৎ সকলের জন্য ভগবানের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে সেই পোলাও আহার করে। ইহার সঙ্গে মাংসও থাকে। রাত্রি দুইটার সময় আবার 'তাসা' বাজিয়া উঠে। আবার সকলে 'আখাড়া' লইয়া বাহির হয়, পূর্বদিনের মত

মুরতজ আলির বাজারে যায়, সেখানে নিশান-তাজিয়া নামাইয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, ভোর হইতে না হইতে আবার বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'দশমী'র সকালবেলাটা স্নানাদি করিয়া গত রাত্রির শ্রম অপনোদন করিতেই কাটিয়া যায়। অপরাহ্ণে বেলা দুইটা নাগাদ আবার আখাড়া বাহির হয়। সেদিন চতুর্দিক হইতে 'আখাড়া' আসিয়া রাস্তার চৌমাথায় জমিতে থাকে। সেখান হইতে সকলে 'কারবালা'য় যায়। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী যাহার আখড়া আগে যাইবার আগে যায়, যাহার পিছনে যাইবার কথা সে পিছনে থাকে। আগে-পিছে যাওয়া লইয়া অনেক সময় দাঙ্গাও বাধে। কারবালায় পৌঁছিয়া 'দফ্‌না' দিতে হয়। নিশানে নিশানে কাগজের যে ফুল থাকে, সেই ফুলগুলিকে ছোট ছোট পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় বাঁধিয়া কবর দেওয়া হয়, কবরের ভিতর 'কফন' থাকে। এই কাগজের ফুল কবর দেওয়াই দফ্‌না দেওয়া। দফ্‌না দিবার পর নিশানগুলির সম্মুখে 'শির্নি' দিয়া সকলে আপন আপন বাড়ি ফিরিয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে কারবালার কাছে মেলা বসে, অনেকে সেখানে জিনিসপত্র কেনে। দশমীর পর চার দিন কাটিয়া গেলে 'ফুল-পান' হয়। সকলে পানের সহিত এক টুকরা ফুল চিবাইয়া খায়। ইহা হাসান-হোসেনের মৃত্যুদিবস পালন। চল্লিশ দিন পরে 'চলিশ মা' হয়। আবার 'আখাড়া' লইয়া মুরতজের কাছে সকলে যায়। ইহাকে 'চেহেললুম'ও বলে অনেকে।

বর্ণনা শেষ করিয়া রহিম বলিল যে, সে এবার মানত করিয়াছে নিশান চড়াইবে।

তোরাও হিন্দুদের মত মানত করিস নাকি?

শঙ্করের অজ্ঞতা দেখিয়া রহিম হাসিল। তাহারা মানত করে বইকি। কেহ নিশান চড়ায়, কেহ হাত বাঁধে, কেহ ডুল পরে। অনেক হিন্দুও মহরমে মানত করে, এই পুরণই তো এবার হাত বাঁধিয়াছে।

তাই নাকি?

পুরণ সসঙ্কোচে একটু হাসিল।

ইতিপূর্বে শঙ্করের অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার মনে হইল,

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা লইয়া জিন্না-সাভারকরের যে দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক গজকচ্ছপ যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, সে দ্বন্দ্ব ইহাদের মধ্যে নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে মংলার বউটা একটা সদ্যোজাত শিশু রাখিয়া মারা গিয়াছে। প্রায় একই সময়ে আলিজানেরও ছেলে হইয়াছিল। আলিজানের বউ মংলার ছেলেকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করিতেছে। যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা খবরের কাগজের পাতায়, শিক্ষিত-সমাজের বক্তৃতা-মঞ্চে, রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে বিষ উদ্গীরণ করে, সে সমস্যা ইহাদের মধ্যে নাই। সে সমস্যা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের, ইহাদের নয়। ইহাদের একটি সমস্যাই আছে, তাহা দারিদ্র্য। সেই নিদারুণ সমস্যার প্রবল চাপে ইহারা সকলেই এক জাত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বিপন্ন। বাহিরের ধর্ম যাহাই হউক, অন্তরে সকলে এক। ইহারা মহরমই করুক আর 'ছট'ই করুক, সকলেই দেবতার কাছে মানত করে, একই ভাষায় একই প্রার্থনা জানায়—ভগবান, আমাদের বাঁচাও।

রহিম পুরণ উভয়েই টাকা ধার চাহিল। চাহিলে এ লোকটি যে 'না' বলিতে পারে না—এ খবর ইহারা জানিয়াছে, তাই ইহারই কাছে বার বার ছুটিয়া আসে। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে এমনভাবে কত টাকা সে দিতে পারে? জিনিস কিনিয়া দিলেই বা কি সুবিধা হইবে? জিনিস কিনিতেও টাকা লাগিবে, অথচ ইহারা সুখী হইবে না। নিজেদের উৎসবে নিজেরা জিনিস কিনিলে যে আনন্দ হয়, পরের দেওয়া জিনিসে ঠিক সে আনন্দ হয় না। সে আনন্দে ইহাদের বঞ্চিত করার কি অধিকার আছে তাহার?

টাকা নিয়ে যে মহাজনদের ধার শোধ করবে, তা হবে না।

নেই বাবু নেই, কিরিয়া খিলা লিজিয়ে।

উভয়েই সমস্বরে শপথ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ইহাদের শপথও যে সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা শঙ্কর বলিতে যাইতেছিল; হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, এই নিদারুণ শীতে উভয়েই অতি জীর্ণ সুতির চাদর জড়াইয়া আছে, পরিধানেও অতি মলিন ছিন্ন বসন, হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে নাই। অথচ সে কোটের উপর ওভারকোট চড়াইয়াছে!

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আর সে তুলিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, কাল আসিস, দেব।

উভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আবার শঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগিল, ব্যাঙ্কের টাকা এমনভাবে খরচ করা কি ঠিক হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ব্যাঙ্কের যদি কিছু ক্ষতি হয়, আমিই না হয় তাহা নিজের টাকা হইতে পূরণ করিয়া দিব। নিজের টাকা! নিজের কত টাকা আছে তাহার! উৎপল তাহাকে যে বেতন দেয়, তাহার সমস্তই তো খরচ হইয়া যায়। পৈতৃক কিছু টাকা অবশ্য রাজীবলোচনের কাছে জমা আছে, (অম্বিকাবাবুর রাজীবলোচনের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল) কিন্তু সে টাকার পরিমাণ কত শঙ্করের জানা নাই। পিতা যে উইল করিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, এই অভিমানে সে এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধানই করে নাই এতদিন। রাজীবলোচনের কাছে যত টাকাই থাক, তাহা ধর্মত অমিয়ার। উইল সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু টাকা খরচ করিবার অধিকার তাহার নাই।

তোমার আদুরে মেয়েকে নিয়ে আর পারি না বাপু, সমস্ত দেশলাই-কাঠিগুলো বাক্স থেকে বার ক'রে মেঝেময় ছড়িয়েছে।

অমিয়া খুকীকে ধুম করিয়া বসাইয়া চলিয়া গেল।

খুকী কাঁদিল না। তাহার সমস্ত মুখে যেন আহত আত্মসম্মান মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চক্ষুর কোণে অশ্রুর আভাস, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

মা দুষ্টু, এস তুমি আমার কাছে।

মুহূর্তে সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইল, হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, বাবা বালো।

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

চায়ের কথা ঠিক বলেছে গিয়ে তা হ'লে!

তক্ষুনি। উনুন জোড়া ছিল ব'লে দেরি হয়ে গেল।

খুকী শঙ্করের বুকের উপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

যা আদুরে করছ মেয়েটিকে, বুঝবে মজা। দুধ খাবি চল্।

আমি ভুড কাব না। বাবার তন্দে তা কাব।

শঙ্কর হাসিয়া উঠিল।

দেখেছ আস্পর্ধা! চল্।

অমিয়া জোর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

না না না।

আচ্ছা, একটু চা দিচ্ছি, দুধ খাও গিয়ে। লক্ষ্মী তো—

ডিসে একটু চা ঢালিয়া দিতে হইল। খুকী অমিয়ার কোল হইতে ঝুঁকিয়া তাহা পান করিতেছে, এমন সময় বাড়ির উঠানে কোঁকর-কোঁ শব্দে মুরগী ডাকিয়া উঠিল।

ঝম্মু।

হ্যাঁ, ঝম্রু এসেছে, চল্।

খুকী আর যাইতে আপত্তি করিল না।

চা-পান শেষ করিয়া শঙ্কর আবার ঈজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িল। নানা চিন্তার আলো-ছায়ায় তাহার মনটা বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কাছে দূরে সবত্র মহরমের বাজনা বাজিতেছে। কিন্তু এই বাজনার অন্তরালে অপরিশোধ্য ঋণের যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই কাহিনীটাই শঙ্করের অন্তরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত করিয়াও কিছু হইতেছে না। ইহারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। সকলেরই অর্থাভাব। কাহারও সচ্ছলতা নাই। এমন কি, তাহার নিজেরও। টাকা টাকা টাকা—সকলেরই ওই এক চিন্তা।

১৯

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পাইয়া শঙ্করকে কলিকাতা চলিয়া যাইতে হইল। যে অ্যাড্ভোকেট জীবন চক্রবর্তীকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাইয়া চিঠি দিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতাবাসী। তিনিই শঙ্করকে অবিলম্বে কলিকাতা যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কলিকাতার লোককে দিয়া কাজ

করানোর নানারূপ অসুবিধা আছে। তথাপি দুইটি কারণে এই ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। প্রথমত, ইনি উৎপলের বন্ধু। দ্বিতীয়ত, এ অঞ্চলের কোন ভাল উকিল কেনারাম চক্রবর্তীর পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে রাজী নহেন। মনে মনে কেনারাম চক্রবর্তীর উপরে সকলেই চটা, কিন্তু খোলাখুলিভাবে তাহা প্রকাশ করিতে সকলেই অনিচ্ছুক। লোকটাকে সবাই ভয় করে। জীবন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার ইচ্ছা শঙ্করের তেমন ছিল না, কিন্তু উৎপল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন কথাটা তুলিয়াছে এবং সমস্ত টাকা যখন উৎপলেরই, তখন না করিবার আর সঙ্গত উপায় রহিল না। মকদ্দমা করিতে অস্বীকার করিলে উৎপল হয়তো আপত্তি করিত না, কিন্তু ওই 'হয়তো' জিনিসটা বড়ই অনিশ্চিত, বিশেষত টাকাকড়ির ব্যাপারে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করাই নিরাপদ। উৎপল যদিও তাহাকেই সর্বময় কর্তা করিয়া রাখিয়াছে, তবু সে যেন স্বাধীন নয়, একটা অদৃশ্য পরাধীনতার বন্ধন তাহাকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কিছুতেই সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। নেপথ্যবাসী উৎপল নীরবে থাকিয়াও যেন তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। কেন এমন হয়? ট্রেনে বসিয়া শঙ্কর এই কথাটাই ভাবিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। অনেকদিন পরে অমিয়াকে, বিশেষত খুকীকে, ছাড়িয়া আসিয়া সে কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। আসিবার সময় মেয়েটা বড় কাঁদিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়ে পড়িয়া তাহাকে যাইতে হইতেছে। কি দরকার ছিল এই কলহ করিবার? সে কেন সোজাসুজি উৎপলের প্রস্তাবে আপত্তি করিল না? কেন তাহার এই দীনতা?

ট্রেন চলিতেছে। দুই ধারে চাষের জমি। কৃষিপ্রধান দেশ। জমিই এ দেশের সব। চাষের উন্নতি হইলেই এ দেশের উন্নতি। চাষের উন্নতির জন্যই ইঁদারা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই ইঁদারাকে কেন্দ্র করিয়াই মকদ্দমা বাধিয়াছে। সহসা শঙ্করের একটা কথা মনে হইল, ইঁদারা করাইয়া লাভ কি? মকদ্দমায় জিতিয়া জীবন চক্রবর্তীর নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করিয়া পুনরায় পঁচিশটি ইঁদারা করাইয়া দেওয়া যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলেই কি চাষীদের দুঃখমোচন হইবে? যে অঞ্চলে জলকষ্ট নাই, সে

অঞ্চলের চাষীরাই কি সুখী? তাহা তো নয়। সকলেই দুঃখী, সকলেই ঋণগ্রস্ত, সকলেরই টাকার অভাব। টাকা রোজগার করিবার জন্যই প্রত্যহ দলে দলে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে, কলিয়ারিতে, চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। সকলেরই টাকার দরকার। টাকা না থাকিলে জমিদারের খাজনা দেওয়া যায় না, মহাজনের ধার শোধ হয় না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যায় না, এমন কি বিবাহ পর্যন্ত করা যায় না। প্রতি পদক্ষেপে নগদ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু টাকা তাহারা কিছুতেই পায় না। যে টাকার লোভে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ছুটিয়া যায়, সে টাকা তাহারা শহরেও সংগ্রহ করিতে পারে না। শহরে বাড়িভাড়া আছে, কাবুলিওয়ালা আছে, ঘুষ আছে, মদের দোকান আছে। শহরের টাকা শহরেই রাখিয়া আসিতে হয়। শহরে বাস করিয়া তাহারা কেবল শহুরে হয়। বিলাসিতার নেশায় কুসংসর্গে জর্জরিত হইয়া পশুর মতই অবশেষে মরিয়া যায়। কয়েকটা ইঁদারা করাইয়া দিলেই কি ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে? এক সময় ছিল, যখন তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়েই প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস পাইত। দেশের রাজা খাজনা হিসাবে উৎপন্ন শস্যেরই অংশ লইতেন, টাকা চাহিতেন না। শস্যের বদলেই তাঁতি কাপড় দিত, নাপিত ক্ষৌরকার্য করিত, ধোপা কাপড় কাচিত, কুম্ভকার বাসন প্রস্তুত করিত, পুরোহিত পূজা করিতেন, অধ্যাপক টোল চালাইতেন। আজকাল কিন্তু সকলেই টাকা চায়। চাষীরা টাকা পাইবে কোথায়? তাহারা টাকা উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে শস্য। যে শস্য না হইলে পৃথিবীর কাহারও চলে না, সেই শস্য যাহারা রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া উৎপান্ন করে, তাহারাই আজ টাকার ফেরে পড়িয়া নিরন্ন বিবস্ত্র, আর আমরা তাহাদের আসল দুঃখটা না বুঝিয়া কেবল কতকগুলা বাঁধা বুলি কপচাইয়া মরিতেছি। আমরা তাহাদের নিকট টাকার দাবি করি বলিয়াই তাহারা তাহাদের কষ্টার্জিত শস্য লইয়া রক্ত-শোষক মহাজনদের দ্বারস্থ হয় এবং যে কোন মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে। সারা বছরের খাইবার সংস্থানও অনেকের থাকে না, বীজের শস্যও অনেককে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। এই যেখানে

চাষের পরিণাম, সেখানে চাষের জন্ত জল সরবরাহ করিলে কতটুকু সুবিধা হইবে, যদি উৎপন্ন শস্তের পরিবর্তে তাহারা জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি না পায়? এ চাষ করিয়া লাভ কি তাহাদের? যত শস্তই হোক না, তাহা বিক্রয় করিয়া টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে, এবং তাহার দর ঠিক করিবে মহাজন, যে মহাজন পূর্বে টাকা ধার দিয়া সুদের সুদ কষিয়া বসিয়া আছে। মহাজনরাও নিরুপায়। কারণ তাহারাও মহত্তর জনের নির্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল। চাষীদের নয়, খুকীকে নয়, অমিয়াকে নয়,—শৈলকে। সেই ফলসাগাছটার তলায় শৈল যেন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। কোঁচড়ে মিত্তিরদের বাড়ির পেয়ারা। কোঁচড় হইতে একটা ডাঁশা পেয়ারা বাহির করিয়া শঙ্করকে দেখাইয়া ভুরু নাচাইয়া ঘাড় নাড়িল, তাহার পর তাহাতে কামড় দিল। সমস্ত মুখখানাতে দুষ্টামি মাখানো। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল, শঙ্করদা, শিগগির এস, এটা পেয়ারা নয়, ওল, মুখ কুটকুট করছে আমার, শিগগির এস তুমি, এস না—। ছুটিয়া যাইতে গিয়া শঙ্কর হোঁচট খাইল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। হঠাৎ এতদিন পরে শৈল আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিল কেন? শৈলর কথা তো সে বহুদিন ভাবে নাই। শঙ্কর উঠিয়া বসিল। শৈলর মুখখানাই চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। সত্যই পরলোক বলিয়া কিছু আছে নাকি? প্রায় চার বৎসর হইল, শৈল মারা গিয়াছে। যে সন্তানের জন্য তাহার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তানটিও বাঁচে নাই। মিস্টার এল. কে. বোস আবার বিবাহ করিয়াছেন। অন্যমনস্ক হইয়া শঙ্কর শৈলর কথাই ভাবিতে লাগিল। ঠিক করিল, কলিকাতায় গিয়া তাহার নামে তর্পণ করিবে। হয়তো তাহার তৃষিত আত্মা এখনও কোথাও একবিন্দু জলের জন্য আশা করিয়া আছে। হয়তো—

ট্রেন একটা বড় স্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল। 'চা-গ্রম' 'গোশ্‌ত-রোটি' 'চাই কমলালেবু', যাত্রীদের কলরব, কুলীর চীৎকার, ট্রলির ঘড়ঘড়ানি,

হুড়মুড় করিয়া একটা প্রচণ্ড কোলাহল মনের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শৈল কোথায় হারাইয়া গেল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

চার বৎসর পরে এই তাহার কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ। সেই যে গিয়াছিল, আর আসে নাই। কলিকাতার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে 'বিফল' দেওয়াল, রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ। রাত্রে ব্ল্যাক-আউট। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিতেছে। মাথার ওপর এরোপ্লেন ঘুরিতেছে। চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায়, ট্রামে বাসে সবত্রই যুদ্ধের আলোচনা।—জাপান ক্রমশ আগাইয়া আসিতেছে, জওহরলাল কোন্ বক্তৃতায় কি বলিয়াছেন, মহাত্মাজীর স্বল্প দুই-চারিটি উক্তি হইতে কি আভাসিত হইতেছে, সে সবের সহিত বর্তমান যুদ্ধ-'পরিস্থিতি'র কি সম্পর্ক, এই সব লইয়াই কথা আলোচনা তর্ক। দীর্ঘ চার বৎসর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া সে সত্যই যেন গেঁয়ো হইয়া গিয়াছে। বর্তমান জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিবার প্রয়োজনই সে অনুভব করে নাই, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহই নাই তাহার। একটা মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে বটে, তাহার আঁচ গৌণভাবে আমাদের গায়েও লাগিতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা ইতিপূর্বে এমন প্রত্যক্ষভাবে তাহার অন্তরকে বিচলিত করে নাই। সত্যই একটা কিছু হইবে নাকি? সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। আর এক মুশকিল, পুরাতন পরিচিত দলের কাহারও সহিত দেখা হইল না। সকলেই হয় অনুপস্থিত, না হয় অসুস্থ। কাহারও সহিত যে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবে, তাহার উপায় নাই। নীরা, অনিল, পলাশকান্তি, রেণুকা, নিলয়কুমারের দল পলাশকান্তির সহিত আসাম-পরিভ্রমণে গিয়াছেন। প্রফেসর গুপ্ত পক্ষাঘাতে শয্যাগত, কাহারও সহিত দেখা করেন না। ভন্টু সে ঠিকানায় নাই। চুনচুনও ঠিকানা বদলাইয়াছে। খুঁজিলে হয়তো চুনচুনকে বাহির করা যায়, কিন্তু কি দরকার? চুনচুনের যে ছবিটি মনে আঁকা আছে, তাহাই তো চমৎকার। তাহার রূপ-পরিবর্তন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে, হয়তো সে সন্তান-সম্ভবা,

কিংবা হয়তো— না, দরকার নাই। বর্তমানের চুন্‌চুন আপন কক্ষ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে যাইবার চলিয়া যাক। যে চুন্‌চুন একদা তাহার হৃদয়-হরণ করিয়াছিল, তাহার ছবিটাই অমর হইয়া থাক্ শুধু। চুন্‌চুন সম্বন্ধে মনের গহনে যে দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, এতদিন পরে সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর নিজের কাছেই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল: না, চুন্‌চুনের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা সে আর করিবে না।

সেকালে আর কে কে তাহার পরিচিত ছিল, ভাবিতে গিয়া অনেকের মুখ একে একে মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, মুক্তো, মুক্তোর সগোত্রবর্গ, ভন্‌টু, ভন্‌টুদের পরিবার, অরিজিনাল, প্রোটোটাইপ, নিবারণবাবু, আস্‌মি, দার্জি, অপূর্বকৃষ্ণ, বেলা মল্লিক, প্রফেসার গুপ্ত, মুকুজ্জেমশাই, মৃন্ময়, মিসেস শ্যানিয়াল, হিরণদার দল, 'সংস্কার' পত্রিকার পূর্বতন কর্মচারীবৃন্দ, করালীচরণ, লোকনাথ ঘোষাল, ছোট বড় আরও কত লোক মনের পরদায় যেন মিছিল করিয়া আসিল এবং মিলাইয়া গেল কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেহ অস্পষ্ট। ছায়া-ছবির মিছিল। কাহারও সম্বন্ধে কিন্তু মনের সে আগ্রহ আর নাই। এমন কি তাহার নিজের শ্বশুর-বাড়ির সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ অতিশয় কম। বিবাহের পর হইতে সে শ্বশুর-বাড়ি যায় নাই বলিলেও চলে। শিরীষবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন, মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া অমিয়াকে লইয়া যান। পূজার সময়, জামাইষষ্ঠীতে কখনও কিছু টাকা, কখনও কিছু কাপড়-জামা পাঠান। ইহার অধিক কোনও সম্পর্ক নাই। শ্বশুর-বাড়ি দূরের কথা, নিজের মায়ের সহিতই বা তাহার নিবিড় সম্পর্ক কতটুকু? মা পাগলা-গারদে আছেন, মাসে মাসে তাঁহার জন্য সে টাকা পাঠাইয়া দেয়। মাঝে একবার রাঁচি গিয়াছিল, কর্তব্যবোধেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মায়ের পাগলামি আরও যেন বাড়িয়া গেল। ডাক্তারেরা দেখা করিতে মানা করিলেন। প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া তাই সে নিশ্চিন্ত আছে। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক থাকিলে সে কি ডাক্তারদের মানা শুনিত? সে কি মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত? না, সত্য কথা বলিতে হইলে

বলিতে হয়, মায়ের সহিতও তাহার প্রাণের গভীর সম্পর্ক নাই। যাহা আছে, তাহা কর্তব্যের সম্পর্ক মাত্র। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা বড় কঠিন। মনে যে সুর বাজে, সেই সুরের যাহারা সমঝদার তাহাদেরই সহিত কেবল অন্তরঙ্গতা হয়, বাকি সকলে পর। মনে চিরকাল এক সুর বাজে না। আপনজনও চিরকাল এক থাকে না। নূতন সুরের নূতন সমঝদার আসিয়া জোটে, সে-ই তখন অন্তরতম হয়। পুরাতন আপনজনেরা স্মৃতির ফলকে কখনও বা সামান্য চিহ্ন রাখিয়া, কখনও বা না রাখিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যায়।

ট্রামের এক কোণে বসিয়া শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। ট্রামটা প্রায় খালি, সামনের দিকে আর একজন মাত্র যাত্রী বসিয়া আছেন। শঙ্কর একটা হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সে কতক্ষণই বা থাকিতে পায়! সমস্ত দিনই ট্রামে-বাসে কাটিতেছে। মফস্বলের লোক অনেক দিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছে, বহু লোকের বহু ফরমাশ আছে। কোনটা চাঁদনিতে পাওয়া যায়, কোনটা বড়বাজারে, কোনটা শ্যামবাজারে, কোনটা মিউনিসিপাল মার্কেটে। চরকির মত ঘুরিতে হইতেছে। অ্যাড্‌ভোকেট মহাশয়ের সহিতও পরামর্শটা সমাধা হয় নাই। সম্মুখে উপবিষ্ট যাত্রীটি শঙ্করের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিল।

আরে কে, শঙ্কর নাকি! অ্যাঁ, ছ্যা-ছ্যা, চিনতেই পারি নি! ভাবছিলুম, কে না কে—অ্যাঁ!

শঙ্করও এতক্ষণ চিনিতে পারে নাই। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল। ভন্টুর মেজকাকা, ওরফে বাবাজী, ওরফে মুক্তানন্দ। সেকালের গোঁফদাড়ি কিছুই নাই, সমস্ত কামাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই সহসা চেনা আরও কঠিন।

অনেক দিন পরে দেখা হ'ল। তারপর, ভাল তো সব?

বাবাজী নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

চ'লে যাচ্ছে এক রকম।

ভন্টুর কাছে শুনেছিলাম, তুমি দেশে ফিরে গেছ। তা ভালই করেছ

এক রকম। কলকাতা ভদ্রলোকের বাস করবার অযোগ্য হয়ে পড়ছে ক্রমে। জাপান যদি অ্যাটাক করে, সকলকেই পালাতে হবে।

ভন্টুর খবর কি?

ভন্টুর চিঠিপত্র পাও না?

গোড়ায় গোড়ায় পেয়েছিলাম দু-একখানা। তারপর আর পাই নি।

তাহার ঠিকানাটা কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় বাবাজী সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, আপিঙ খেলেই মানুষ জন্তু হয়ে যায়, ইন্‌জেক্‌শন নিলে কি আর রক্ষে আছে তার!

কে ইন্‌জেক্‌শন নেয়?

তোমার ভন্টু গো।

আপিঙের ইন্‌জেক্‌শন? মানে, মর্ফিয়া?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম কি একটা যেন নাম তার।

মর্ফিয়া নেয়! কেন?

কেন আবার, নেশা। পায়ের হাড় ভেঙে মেডিকেল কলেজে যখন প'ড়েছিল, তখন সেখানকার ডাক্তাররা ওই ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দিয়ে ওর সর্বনাশটি ক'রে দিয়েছেন। এখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বেলা ও-বেলা ইন্‌জেক্‌শন না হ'লে চলে না; নিজেই পট পট ছুঁচ ফুটিয়ে নেয়।

অত মর্ফিয়া পায় কোথা?

পায় কোথা! শোন কথা একবার! পায় ডাক্তারদের মারফৎ। আজকালকার লক্ষীছাড়া ডাক্তারগুলো পয়সা পেলে না করতে পারে হেন কাজ তো নেই। ফী পেলেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দিচ্ছে।

বাবাজী হাত উলটাইয়া মুখভঙ্গী করিলেন।

ঘেন্না ধ'রে গেছে, বুঝলে, সমস্ত সংসারের ওপর ঘেন্না ধ'রে গেছে।

ভন্টুর ঠিকানাটা কি?

সে তো এখানে নেই। তার আপিস দিল্লীতে উঠে গেছে। সে এখন দিল্লীতে।

বউদিরা? বউদিরাও সেখানে নাকি?

ওরা তো বহুকাল হ'ল ভিন্ন হয়ে গেছে, এ খবর জান না বুঝি তুমি?

না।

শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিল না।

বাবাজী কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া পকেট হাতড়াইয়া একটা পকেট-বুক বাহির করিলেন। সেটা একবার খুলিয়া কি দেখিয়া আবার সেটা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

ওদের খবর কতদিন জান না?

ভন্টুর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম, তারপর আর জানি না।

দাদা বেঁচে থাকতে কিছু হয় নি, তারপরই এই কাণ্ড।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বাবাজী পুনরায় বলিলেন, ভন্টুর বউ বড়লোকের মেয়ে, কাঁহাতক সে আর আঁস্তাকুড়ে হাঁটু গেড়ে বাসন মাজতে পারে, বল?

বাবাজীর চোখে যেন একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলিয়া গেল। শঙ্কর যেন বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল। যে ভন্টুকে সে চিনিত, সে যে স্ত্রীর পরিশ্রম-লাঘবের জন্য বউদিদির সহিত মনোমালিন্য করিয়া পৃথক হইয়া যাইতে পারে, এ কল্পনাও কোনদিন সে করে নাই।

বউকে বাসন-মাজা থেকে রেহাই দেবার জন্যে অবশ্য ভন্টু আলাদা হয় নি। আলাদা হ'ল একটা তুচ্ছ কারণে, আর তোমার ওই বউদির জেদে। ভয়ঙ্কর লোক তোমার ওই বউদিটি। আমি পট ক'রে মাঝ থেকে খামকা জড়িয়ে পড়লাম।

এমনভাবে শঙ্করের দিকে চাহিলেন, যেন শঙ্করই এজন্য অপরাধী। তাহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ট্রাম আসিয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

আসল কারণটা তা হ'লে কি?

আসল কারণ হ'ল—ভন্টুর ছেলেটা। ছেলেটা হয়ে উঠেছিল ভয়ানক আদুরে। কারণও ছিল। ভন্টু গ্রাহ্য করত না যদিও, কিন্তু ভন্টুর স্ত্রীর মনে একটা ক্ষোভ হ'তই যে, তার ছেলের ঠিক যত্ন হচ্ছে না। দুধ পেত না, খাবার পেত না, খেলনা পেত না, ভাল পোশাক পেত না; দিতে হ'লে সব ছেলেকেই

দিতে হয়, পয়সায় কুলোত না ভন্‌টুর। এ সমস্তর অভাব ভন্‌টুর স্ত্রী পূরণ করত আদর দিয়ে দিয়ে। ভন্‌টুর বউদি ছেলেটাকে সমীহ করত। ভয়ানক আদুরে ক'রে তুলেছিল ছেলেটাকে। যা হাতের কাছে পেত ভাঙত, বই পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলত, কেউ কিছু বলত না। হাতে কাঁচি পেলে তো রক্ষেই নেই, যা পাবে কেটে ফেলবে। ভন্‌টুর বই-খাতা কাগজ-পত্তর, এমন কি ভন্‌টুর একটা দামী স্যুট পর্যন্ত কাঁচি চালিয়ে দিলে একদিন সাবড়ে। দুপুরে সবাই ঘুমুত, ভন্‌টু আপিসে, বড় ছেলে দুটো স্কুলে, কর্তা সেই অবসরে সব জিনিস নষ্ট করতেন ব'সে ব'সে। রাগলে ভন্‌টুর চেহারা কি রকম হয়, তা নিশ্চয় তোমার অজানা নেই। আপিস থেকে ফিরে এসে রোজ সে অনর্থ করত। অথচ আসল অপরাধীর নাম বলতে কারও সাহস হ'ত না, ভন্‌টুর স্ত্রীর তো হ'তই না, তোমার বউদিরও হ'ত না, ছেলেগুলোও ভয়ে চুপ ক'রে থাকত। কারণ নাম বললেই ভন্‌টু নির্দয় ঠেঙাবে।

বাবাজী চুপ করিলেন।

তারপর?

ভন্‌টু কিন্তু ঠেঙানো বন্ধ করলে না। সে ভুল ক'রে মনে করত যে, তার ভাইপোরাই বোধ হয় এসব করছে। তারা যত বলত—আমরা করি নি, তত তার রাগ চ'ড়ে যেত, মনে হ'ত, ওরা মিছে কথা বলছে। তার নিজের ওইটুকু ছেলে যে কাঁচি চালাতে পারে, এ সন্দেহও তার মনে হ'ত না। তবে এ ভুল ভাঙিয়েও কেউ দিত না, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য। ভাইপো তিনটে রোজ মার খেয়ে মরত, তবু সত্যি কথাটা বলত না। না, ভুল করছি, একদিন একজন বোধ হয় বলেছিল; কিন্তু সে আরও বেশি মার খেয়ে ম'ল, ভন্‌টু বিশ্বাসই করলে না তার কথা। ভন্‌টুর মার যে কি মার, তা তো জানই, মারতে মারতে বেত ফেটে ছ্যাতরা ছ্যাতরা হয়ে যেত। শেষকালে তোমার বউদি একদিন এক কাণ্ড ক'রে বসল। একটা খোলার বাড়ি দেখে সেইখানে একদিন উঠে গেল দুপুরে, ভন্‌টু তখন আপিসে।

বাবাজী পুনরায় নীরব হইলেন।

তারপর?

তারপর আর কি! সেই থেকেই ভিন্ন। ভন্‌টু অনেক সাধ্যসাধনা করলে, কিন্তু বউদি আর কিছুতেই ফিরল না। কেন আলাদা হয়ে গেল, তাও ঘুণাক্ষরে বললে না, মানে—সত্যি কথাটা বললে না; শুধু বললে—তোমার দাদার বেশি ঝামেলা সহ্য হয় না, তাই স'রে এসেছি।

ভন্‌টুর দাদা ফিরে এসেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, অনেক দিন। সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেশ মুটিয়ে ফিরেছে। চাকরি করছে আবার।

তারপর?

তারপর আর কি! কিছুদিন পরেই ভন্‌টু দিল্লীতে বদলি হয়ে গেল। ওরাও কলকাতার খরচ চালাতে না পেরে নৈহাটিতে গিয়ে বাসা বাঁধল। সেখানেই এখন আছে। আমি মাঝ থেকে কেবল বিপদে প'ড়ে গেছি।

আপনার কি হ'ল?

জড়িয়ে পড়েছি। ঠাকুরের আদেশ অমান্য তো করতে পারি না!

ঠাকুরের আদেশ মানে? মুকুজ্জেমশাইয়ের?

বাবাজী বিস্মিত হইলেন।

ঠাকুরকে তুমি চিনলে কি ক'রে?

আমার শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল যে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ। চমৎকার লোক! ও-রকম পরোপকারী লোক আমি আর দেখি নি।

ওই! ওই পরোপকারের ঠেলাতে আমিও অথৈ জলে পড়েছি।

কি রকম?

গুজরাটে গিয়েছিলাম প্রভাসতীর্থ করতে। মন বসল না। ফিরে এলাম। এসে শুনলাম, ওরা সব নৈহাটিতে। কর্তব্যের খাতিরেই গেলাম একদিন দেখা করতে। সেখানে গিয়ে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড! ফন্‌তির হয়েছে টাইফয়েড, আর ঠাকুর সেখানে রয়েছেন। আমি তো অবাক। শুনলাম, বিষ্ণুচরণের সঙ্গে ওঁর পুরীতে আলাপ হয়েছিল নাকি।

দেখলামও, খুবই স্নেহ করেন বিষ্ণুচরণকে। ফন্তির চিকিৎসা উনিই চালাচ্ছেন। বড় ডাক্তার আসছে, বরফ লেবু আঙুর সমস্ত ওঁরই খরচে। এত টাকা যে উনি কোথা থেকে পান, ভগবানই জানেন। আমি প্রণাম করতেই বললেন—আরে, তুমি কোথা থেকে এখানে! আমি যে বিষ্ণুচরণের কাকা, এ খবর ঠাকুর জানতেন না। শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন—বাঃ, বেশ ভালই হ'ল, এখন কি করছ তুমি? বললাম—প্রভাসতীর্থটা সেরে এলাম। বললেন—তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আর কি হবে, তুমি এদের কাছেই থাক। আমি তো শুনে অবাক! এদের কাছে থাকব! কিন্তু ঠাকুরের মুখের ওপর কিছু বলতে ভরসা করলাম না। রাত জেগে ফন্তির সেবায় লেগে পড়তে হ'ল। কি করি, ঠাকুর নিজে রাত জাগছেন, আমি কি ক'রে ঘুমোই? একদিন ঠাকুরকে আড়ালে পেয়ে বললাম—ঠাকুর, নামজপ ক'রে মন ভরছে না, আমাকে একটা মন্তর দিন আপনি। ঠাকুর হেসে ফেললেন, বললেন—পাগল নাকি! আমি কি মন্তর দেব তোমাকে! আমি জোর ক'রে চেপে ধরতে বললেন—আচ্ছা, আমি যা বলব, তা সত্যি সত্যি করবে? আমি বললাম—নিশ্চয়। ঠাকুর কি বললেন শুনবে?

বাবাজীর চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

কি বললেন?

তুমি বিষ্ণুচরণদের সেবার ভার নাও। এরা বড় দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। এদের সেবা করলে তোমার পুণ্য হবে। কর্মযোগও মুক্তিলাভের একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা। তুমি কায়মনোবাক্যে এদের সেবা কর দিকি, আনন্দ পাবে, মুক্তিও পাবে। কোনও মন্ত্রের দরকার নেই। বিশ বাঁও জলে প'ড়ে গেলুম, বুঝলে? বললাম—আপনি যা বলছেন, তা করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখন এদের এই দুরবস্থা, বিষ্ণুচরণের আয় যৎসামান্য, এর ওপর আমার নিজের ভার ওদের কাঁধে চাপালে ওরা সেটা ঠিক সেবার স্পিরিটে নেবে কি? আমার নিজের যা বিষয়-আশয় ছিল, তা তো সব ফুটকড়াই হয়ে গেছে। ভন্টুকে দিতে চেয়েছিলাম, সে নেয় নি, বন্ধুর গর্ভেই গেল শেষকালে সব

ঠাকুর বললেন—না, গলগ্রহ হতে বলছি না। ওদের সাহায্য করতে বলছি। তোমাকে রোজগার করতে হবে। যা রোজগার করবে, সব এনে বউমার হাতে দেবে। চাও তো এক্ষুনি তোমার একটা চাকরির যোগাড় ক'রে দিতে পারি! আমার চেনা একজন রেশমের কারবারী বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমার আর কিছু বলবার উপায় রইল না। কিছুদিন পরে সত্যিই ঠাকুর চাকরিটি জুটিয়ে দিলেন এবং তার কিছুদিন পরে ফন্তি যেই একটু সেরে উঠল, অমনি অন্তর্ধান করলেন, তাঁর যা চিরকাল স্বভাব।

তারপর?

তারপর আর কি! সেই চাকরি করছি। নৈহাটি থেকে রোজ ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝ একবার।

বাবাজীর চোখের দৃষ্টিতে পুনরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

শঙ্কর বুঝিল, বাবাজী সেবাটা কায়মনোবাক্যে হয়তো করিতেছেন, কিন্তু সে বিষয়ে নির্বিকার নন।

ভন্টু কিছু সাহায্য করে না?

আগে আগে করত কিছু কিছু। এখন আর পারে না। পারবে কি ক'রে? একে দিল্লীর ভীষণ খরচ, তার ওপর ওই ইন্‌জেকশন কিনতে হচ্ছে অগ্নিমূল্যে।

ইন্‌জেকশন রোজ নেয়?

রোজ, দু বেলা। রেশমের ক্যান্‌ভাসিং করতে মাঝে আমি একবার দিল্লী গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, তার বউ বেশ ছিমছাম ক'রে, মানে—নিজের মনের মত ক'রে সংসারটি গুছিয়ে নিয়েছে। ছেলের ট্রাইসাইকেল, বাইরের ঘরে সোফা, রেডিও কিনেছে একটা।

আর ভন্টু?

ভন্টু ঊর্ধ্বশ্বাসে চাকরি করছে। সন্ধ্যের পর আপিস থেকে ফিরে ইন্‌জেকশন নেয়, আর ছাতে ব'সে ব'সে হেঁড়ে গলায় গান গায়। আর মাঝে মাঝে হা-হা ক'রে হাসে—মর্মান্তিক সে হাসি, বুঝলে?

কি গান গায়?

নিজে তৈরি করেছে গান হে। টুকে এনেছি আমি, দেখবে? বাবাজী পকেট হইতে পকেট-বুকটি বাহির করিলেন এবং একটি পাতা খুলিয়া শঙ্করকে দিলেন।

শঙ্কর পড়িল—

লদ্‌কোলদ্‌কি করতে করতে হিল্লী-দিল্লী হলাম পার।
নৈহাটিতে রান্নাঘরে বেগুন ভাজছে বিড়্‌ডিকার
খজবুজ, খজবুজ, খজবুজ—
ফাটকা-খেলায় আটকে গেয়ে পড়লাম বিষম আড্ডায়
চুনোপুঁটি স্মোকিং হুক্কা তিমি-মাছের আড্ডায়

দাও, এবার আমাকে নাবতে হবে। এই, রোক্‌কে।

ট্রাম থামিল। পকেট-বুক লইয়া বাবাজী নামিয়া গেলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ সে যেন তন্ময় হইয়া একটা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। ট্রামে অনেক যাত্রী উঠিয়াছে, সে লক্ষ্যই করে নাই। তাহার যেখানে নামিবার কথা, সে স্থান বহুক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। অ্যাড্‌ভোকেট ভদ্রলোক আবার বাহির হইয়া না যান! সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্যা এখন ভন্টু নয়, তাহার সমস্যা এখন উকিল এবং ইঁদারা। অনেক জিনিসও কিনিতে বাকি আছে। সহসা মনে পড়িল, কুমোরটুলিতেও একবার যাইতে হইবে।

চলন্ত ট্রাম হইতে সে লাফাইয়া পড়িল।

২০

দিবা দ্বিপ্রহর।

খোলা মাঠে হু-হু করিয়া একটা হাওয়া বহিতেছে। কাছে দূরে গরু চরিতেছে। মাঠের প্রান্তে যে কুলগাছটা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা রাখাল-বালক ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িয়া চলিয়াছে। আরও দূরে চাষের জমি।

কোথাও সরিষা, কোথাও গম, কোথাও যব, কোথাও মটর, কোথাও ছোলা—হলুদ সবুজ-নীলের মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে যেন। যমুনিয়ার কিন্তু এ সব দিকে লক্ষ্য নাই, সে আপন মনে কাঠ ও গোবর কুড়াইতেছে। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ইহাই তাহার কাজ। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে শুকনা ডালপালা ও গোবর সংগ্রহ করে। প্রকৃতির এই ঐশ্বর্যের মাঝখানে তাহাকে কিন্তু মোটেই মানায় নাই, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মাঝে খানিকটা সচল আবর্জনা যেন। মাথায় রুক্ষ তৈলহীন চুল, পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, রোগে খাদ্যাভাবে শীর্ণ শ্রীহীন বিগত-যৌবন দেহ। বলিষ্ঠ মুশাইকে ভুলাইবার মত তাহার কিছুই নাই। অথচ কতই বা তাহার বয়স! ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে বুড়ী হইয়া গিয়াছে। মুশাইকে ভুলাইবার মত কিছু না থাকিলেও মুশাইকে ভুলাইবার আগ্রহ তাহার কম নয়। বস্তুত উহাই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া, তাহার জন্য পূজা করিয়া, তাহার পছন্দমত রান্না করিয়া, রাত্রে কোমরে তেল মালিশ করিয়া, সকালে চা প্রস্তুত করিয়া, তাহার কাপড়-জামা-পাগড়ি ক্ষার দিয়া পরিষ্কার করিয়া নানা উপায়ে সে মুশাইকে আগলাইয়া রাখিয়াছে। মুশাই যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার গতি কি হইবে! কাহাকে লইয়া থাকিবে সে! নিজের পেটের ছেলে জোয়ান বউ লইয়া শহরে চলিয়া গেল, তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্যন্ত। কলে 'নোকৃরি' করিতেছে। যমুনিয়া অমন নোক্‌রির মুখে প্রত্যহ হাজারবার ঝাড়ু মারে। নোকৃরি নয়, আসল কথা 'জরু'। জোয়ান জরু লইয়া মজা করিয়া আলাদা থাকিতে চায়। তাহার কথা একবার ভাবিল না পর্যন্ত, জরু লইয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়া গেল। কমবয়সী ছুঁড়ী দেখিলে পুরুষগুলার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায় যেন। 'পুতহু'র যৌবনের কথা ভাবিতে গিয়া সহসা তাহার নিজের যৌবনের কথা মনে পড়িল। তাহাকেও কি কম নাকাল হইতে হইয়াছিল! জমিদারের গোমস্তা কুঞ্জবাবু, পীরু গাড়োয়ান, জমিরুদ্দিন সিপাহী, কত লোকই যে তাহার পিছনে লাগিয়াছিল! থানার নাক-কাটা চৌকিদারটা তো তাহাকে ধরিয়া একদিন জঙ্গলের মধ্যে টানিয়াই লইয়া গিয়াছিল। বিগত যৌবনের

বিস্মৃতপ্রায় নানা কাহিনী মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। কয়দিনই বা ছিল সে যৌবন! চকিতে আসিল এবং চলিয়া গেল। মুশাইয়ের সহিত কবে কোন্ বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ভাল করিয়া মনেও পড়ে না। মনে পড়ে, যখন সে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিল, সেই দিনগুলি। মুশাই তখন তাহাকে লইয়া বিভোর হইয়া থাকিত, পাগল হইয়া গিয়াছিল যেন। কাহারও দিকে তাকাইলে ক্ষেপিয়া যাইত, কোন বেচালের খবর কানে গেলে মারিয়া ধুনিয়া দিত। গুণ্ডাটা চিরকালই একরকম, কথায় কথায় কেবল মারপিট। কিছুদিন পরে বিষুণের জন্ম হইল, দেখিতে দেখিতে তাহার যৌবন চলিয়া গেল। শুধু যৌবন কেন. কত দিনই কাটিল তাহার পর। মুশাই তাড়ি ধরিল, মদ ধরিল, কত ছুঁড়ীর পিছনে ঘুরিল, এক সাহেবের কাছে কিছুদিন নোকরি করিল, তাহা ছাড়িয়া আবার কিছুদিন মজুরি খাটিল। এক দারোগাবাবুর বিবদৃষ্টিতে পড়িয়া দুই মাস জেল পর্যন্ত খাটিয়া আসিল। এখন শঙ্করবাবুর কাছে বাহাল হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শঙ্করবাবুর কাছেই ও জব্দ থাকে। তবু মুসহরণীটাকে লইয়া সেদিন পর্যন্ত কি কাণ্ড! পাপটা বিদায় হইয়াছে, বাঁচা গিয়াছে। মুশাই তাহার, আর কাহারও নয়। আর কাহাকেও কাছে ঘেঁষিতে দিবে না সে। মুশাইয়ের জন্যই যমুনিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। শীতকাল। ঘর একটু গরম না করিলে মুশাই ঘুমাইতে পারে না। এইগুলি দিয়া ঘরে 'বোরশি', উঠানে 'ঘুর' জ্বালাইতে হইবে। ঘুরের পাশে বসিয়া মুশাই গল্প করিতে ভালবাসে, বার বার বিড়ি খাওয়াও আছে, কত 'শালা'ই কিনিবে সে!

নির্জন মাঠে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জীর্ণবসনা শীর্ণকান্তি যমুনিয়া শুকনা ডালপালা কুড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

২১

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

সমস্ত গ্রাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার

অবিশ্রান্ত ঝিল্লী-ধ্বনি। হুঁম্হুঁ। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের অন্ধকার ভেদ করিয়া শব্দ হইল, দূরের আর এক বৃক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, হুঁম্হুঁ, হুঁম্হুঁ, হুঁম্হুঁ। নির্জন নিশীথে নিশাচর পক্ষীমিথুন গম্ভীর কণ্ঠে আলাপ করিতেছে। শীতের বাতাস প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের শাখাপ্রশাখা দুলাইয়া, বাঁশবনে শিহরণ জাগাইয়া, মাঠের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। ঝিল্লীধ্বনির সহিত হিল্লোলিত বৃক্ষপল্লবের মর্মরধ্বনি মিশিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অপরূপ ছন্দে রনিয়া রনিয়া উঠিতেছে। সহসা পাশের ঝোপে একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ তীব্র একটিমাত্র ডাক। তাহার পর সব চুপচাপ। অন্ধকারের নিবিড়তা ঘনতর হইয়া উঠিল, সমস্ত শব্দ মুহূর্তের জন্য যেন থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকার বিদীর্ণ হইল, কে যেন শিস দিতেছে। ঝোপটি নড়িয়া উঠিল, ঝোপের ভিতর হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিল—শৃগাল নয়, মানুষ। কারু। যে দিকে শিস বাজিয়াছিল, সেই দিকে সে দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। শ্যাওড়াগাছের অন্ধকারে কম্বল গায়ে দিয়া ফরিদ দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে নিঃশব্দ গতিতে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। চুরি করিতে চলিয়াছে।

মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচর পক্ষীদম্পতি উড়িয়া গেল।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি আবার নিবিড় হইয়া উঠিল।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—

মহিষের গলার ঘণ্টা বাজিতেছে। মাঠের পথ ধরিয়া গুলাব সিংহের শতাধিক মহিষ ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। চলিয়াছে লক্ষ্মীবাগের উদ্দেশে। মণি বাঁড়ুজ্জের জমিতে এবার নাকি চমৎকার ফসল হইয়াছে, আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত চরাইয়া দিতে হইবে, ইহাই গুলাব সিংহের হুকুম। চারিজন বলিষ্ঠ পশ্চিমা গোয়ালা প্রকাণ্ড লাঠি কাঁধে করিয়া মহিষ-বাহিনীর পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

হুঁম্হুঁ, হুঁম্হুঁ—

দূর আম্রকাননে নিশাচর পক্ষীদম্পতি পুনরায় আলাপ শুরু করিল।

নিকল্‌, নিকল্‌, নিকল্‌ হম্‌রা ঘর্‌সে।

ফুলশরিয়ার চোখে আগুন, ঠোঁট কাঁপিতেছে। পদাহত কুকুরের মত হরিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়া তাহার কাপড়ের পুঁটুলি এবং বিছানাটাও বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর লণ্ঠনের আলোটা আর একটু উসকাইয়া দিয়া বঁটিটা টানিয়া পেঁয়াজ কুটিতে বসিল।—একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে যেন! ঘা কবে সারিয়া গিয়াছে, অথচ নড়িবার নাম নাই! এক পয়সা রোজগার করিবে না জোয়ান মরদ বসিয়া বসিয়া আমার অন্ন ধ্বংস করিবে রোজ রোজ! আমি কত যোগাই! ঘায়ের চিকিৎসা করিতে গিয়া তো যা কিছু সঞ্চিত ছিল সব গিয়াছে, কিছু 'জেবর' পর্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে! ও কি আর সে টাকা শোধ দিবে? 'মুরদা' আবার 'আশনাই' করিতে চায়, একবার 'আশনাই' করিতে গিয়া তো মরিতে বসিয়াছিল, লজ্জাও করে না 'বেহুদ্দা'টার! আমার কাছে আর কোন 'মরদ' আসিতে দিবে না, কাল তো রাজীববাবুর ব্যাটাকে অপমানই করিয়া বসিল। ইস্‌, 'সাধি' করা 'জরু' বানাইয়া তুলিতে চায় আমাকে! 'সাধি' করা 'জরু' তো ঘরে আছে একজন, সেইখানেই যা না এখানে মরিতে পড়িয়া আসিছ কেন? এক কড়ার সামর্থ্য নাই, 'আশনাই' জমাইতে চায়!—এই জাতীয় স্বগতোক্তি করিতে করিতে ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে লাগিল। পেঁয়াজের তরকারিটা বানাইয়া এক বোতল 'শরাব' আনিতে হইবে। আজও গদাইবাবুর আসিবার কথা আছে। রাজীবলোচনের পুত্র গদাইবাবুর মুখটা মনে পড়িতে তাহার হাসি পাইল। কি বেহায়া আত্মসম্মানহীন এ লোকটা! কাল হরিয়ার নিকট অপমানিত হইয়াও আজ আবার আসিবে, খবর পাঠাইয়াছে। আজ আসিবার অন্য একটা কারণ আছে অবশ্য। ফরিদ কারু নিশ্চয়ই খবর দিয়াছে যে, গহনাগুলি ফুলশরিয়ার জিম্মায় তাহারা রাখিয়া গিয়াছে। সেইগুলি হস্তগত করিবার জন্যই গদাইবাবু আজ বিশেষ করিয়া আসিতেছেন। উৎপলবাবুর ঘরে সিঁধ দিয়া উহারা আর কি কি পাইল, কে জানে! মাইজীর দামী শাড়িগুলা নিশ্চয়

নেকি মাড়োয়ারীর ঘরে গিয়াছে। জেবরগুলা রাজীববাবুর ঘরে গিয়া ঢুকিবে। চোরাই গহনা আত্মসাৎ করিবার জন্য রাজীববাবু একজন স্যাকরাকেই নিজের বৈঠকখানার বাহিরের ঘরটাতে আশ্রয় দিয়াছেন, লোককে অবশ্য বলেন—ভাড়া দিয়াছেন। চোরাই গহনা গালানোই ওই স্যাকরাটার একমাত্র কাজ। ভাড়া না আর কিছু! ফুলশরিয়ার অজানা কিছুই নাই। 'চোট্টা' সব। শুধু 'চোট্টা' নয়, ভীতুও। চোরের হাত হইতে সোজাসুজি গহনা লইবারও হিম্মৎ নাই হুজুরদের, পাছে ধরা পড়েন। ফুলশরিয়া গহনাগুলি কয়েকদিন লুকাইয়া রাখিবে, তাহার পর চুপিচুপি গদাইবাবু আসিয়া একদিন লইয়া যাইবেন। বিশেষ করিয়া এইজন্যই আরও হরিয়াকে তাড়াইয়া দিতে হইল। সেদিন শেষরাত্রে গহনার পুঁটুলি লইয়া কারু আসিয়া যখন ডাক দিল, তখন কি মুশকিলেই না সে পড়িয়াছিল! পুঁটুলিটা সারারাত বাড়ির পিছনে ছাইগাদায় লুকাইয়া রাখিতে হইল। হরিয়াকে এসব কথা বলা যায় না। বিশ্বাস করিবার মত লোক সে নয়। কারুকেও ফিরাইয়া দিতে পারে না। নিজের স্বার্থের জন্যই পারে না। এসব ব্যাপারে তাহার বেশ মোটা রকম পাওনা আছে। দুই দফা পাওনা—একবার কারুরা দিবে, আর একবার গদাইবাবু। নানা রকম 'দুধ ধান্দা' করিয়া তাহাকে রোজগার করিতে হইবে তো! না করিলে তাহার চলিবে কেমন করিয়া! সহসা ফরিদ এবং কারুর জন্য তাহার দুঃখ হইল। চুরির সমস্ত ঝুঁকিটা তাহাদের। ধরা পড়িলে তাহাদেরই জেল হইবে। অথচ কয়টা টাকাই বা বেচারারা পাইবে! রাজীবলোচন এবং নেকিরাম দয়া করিয়া যাহা দিবে, তাহাই। কারুর ভীত চকিত মুখখানা তাহার মনে পড়িল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, কারু এবং ফরিদের নিকট হইতে সে এবার আর কমিশন লইবে না।

চনাচুর গরম পেয়ারে ম্যয় লায়া হুঁজি চনাচুর গরম—চানাচুরওয়ালা রামু আসিতেছে। রোজই প্রায় আসে। ফুলশরিয়া ঘাড়টা একটু উঁচু করিয়া দেখিল, তাকে বিড়ির বাণ্ডিলটা আছে কি না! এদিকে আসিলে রামুর ফুলশরিয়ার আঙিনায় একবার ঢোকা চাই। পুরাতন আলাপ। ফুলশরিয়ার প্রথম প্রণয় রামুর সহিতই। প্রণয়ের নেশা অনন্ত রামুর বহুদিন

পূর্বে ছুটিয়া গিয়াছে। এখন তাহার ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে এবং মারমুখী খাণ্ডার বউ। তবু রামু এখনও আসে। আসে, একটু বসে, বিড়ি খায়, দুই-একটা অশ্লীল রসিকতা করে, তাহার পর চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে দুই-এক দোনা চানাচুর উপহার দেয়, দাম দিতে গেলে লয় না। বলে—হুঁ তোরা সুদ ছে। বলে আর অপ্রতিভ হাসি হাসে একটা।

চানাচুরের ব্যবসা করিবার জন্য ফুলশরিয়াই তাহাকে কুড়িটা টাকা দিয়াছিল কিছুকাল পূর্বে। সে ভাল করিয়াই জানে যে, রামু ও-টাকা কখনও শোধ দিবে না। রামু কিন্তু রোজই বলে যে, পরের মাসেই সে সব শোধ করিয়া দিবে। বহু 'পরের মাস' আসিল এবং চলিয়া গেল, টাকা আজও শোধ হয় নাই। ফুলশরিয়া মনে মনে হাসে। যদিও সে জানে যে, ও-টাকা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তবু সে মুখ ফুটিয়া কখনও বলে না যে, টাকাটা তোমায় দান করিলাম। রামু বড় আত্মসম্মানী লোক, তাহার দান সে লইবে না। তা ছাড়া সে মুখ ফুটিয়া বলিতেই বা যাইবে কেন, লোকটাকে হাতে রাখাই তো ভাল। ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে কুটিতে রামুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রামু চলিয়া গেলে গদাইবাবু আসিবেন, তাহার পর জমাদার সাহেব। হঠাৎ ফুলশরিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। জমাদার সাহেবের কি ভীষণ গালপাট্টা, বাহিরে কি তর্জন-গর্জন, হঠাৎ মনে হয়, দুর্ধর্ষ সিংহ একটা যেন, অথচ—। ফুলশরিয়া আবার হাসিল।

২৩

নিপুদা ডায়েরি লিখিতেছিল—

"যাহাদের গৃহের কোন বন্ধন নাই, যাহারা ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি স্বীকার করে না, সতীত্বের যূপকাষ্ঠে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক প্রজনন-প্রবৃত্তিকে যাহারা বলিদান দিবার পক্ষপাতী নয়, কর্ম ছাড়া যাহাদের অন্য কোন ধর্ম নাই, এমন কি ভগবানকে পর্যন্ত যাহারা মানে না, আমি সেই দলের। আমি নির্ভীক। কোন কিছুর খাতিরে আমি সত্যপথ-ভ্রষ্ট হইব

না। শঙ্কর আমাকে চাকরি করিয়া দিয়াছে, এই অজুহাতে শঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য অথবা উৎপলকে পুষ্ট করিবার জন্য আমি আমার জীবনের নীতি বিসর্জন দিব না, দিতে পারিব না। আমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোই আমার কাজ। প্রতি শ্রমিকের, প্রতি কৃষকের প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগাইতে হইবে, তাহা যদি শঙ্কর-উৎপলের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। কৃতজ্ঞতা! কিসের কৃতজ্ঞতা! আমার কাজের পরিবর্তে উহারা আমাকে বেতন দেয়। অমনই দেয় না। যাহা দেয়, তাহাও যথেষ্ট নয়। আমার মত একজন কর্মী রুশ দেশে ইহার অপেক্ষা ঢের বেশি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। আমিই বা থাকিব না কেন? অতিশয় স্থূল দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি পর্যন্ত আমার নাই। প্রায়ই ধার করিতে হয়। ভজহরি হয়তো আজই তাগাদা করিতে আসিবে। কেন আমি ধার করিব? শঙ্কর-উৎপল 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট' সিগারেট খাইবে, আমিই বা কেন বিড়ি ফুঁকিয়া মরিব? শঙ্কর-উৎপল শাল-দোশালা উড়াইবে, আমিই বা দারুণ শীতে একটা সস্তা র‍্যাপার জড়াইয়া কাঁপিয়া মরিব কেন? আমি কি মানুষ নই? আমি কি উহাদের অপেক্ষা কম বিদ্বান, কম বুদ্ধিমান? আমার ক্ষুধা কি উহাদের ক্ষুধা অপেক্ষা কম প্রবল? সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিলাসিতার অনুকূল না হয়, সকলে মিলিয়া সমানভাবে দুঃখ ভোগ করিব, সকলে মিলিয়া ব্ল্যাক্-ব্রেড আহার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু একজন পোলাও খাইবে, আর একজন পান্তা-ভাত—এ অবিচার সহ্য করা শক্ত। এ অসাম্য দূর করিতেই হইবে। আমারই যখন এই অবস্থা, তখন দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের অবস্থা যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। দারিদ্র্যের চাপে তাহাদের সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছে, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতেও পারে না। প্রতি শ্রমিককে, প্রতি কৃষককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, যাহারা তোমাদের পেশীর শক্তি অন্যায়ভাবে অপহরণ করিয়া ক্রমাগত নিজেদের শক্তি বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহাদের লোভের অন্ত নাই, তোমাদের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া জোঁকের মত স্ফীতকায় হইতে যাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না,

তাহাদের ওই গগনস্পর্শী প্রাসাদটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ কর। ওই পুঁজিতন্ত্রী ধনীরাই তোমাদের শত্রু। তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লও।..."

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। ভজহরি আসিল বোধ হয়। ঘাড় ফিরাইয়া নিপু দেখিল, ভজহরি নয়, ঢুলকি। একটু বিব্রত বোধ করিল। মেয়েটাকে আজই টাকা দিবার কথা। ঢুলকি কিছু না বলিয়া দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই স্তব্ধতা অস্বস্তিকর। নিপু যতটুকু দেখিয়াছে, তাহাতে অদ্যাবধি কোন উচ্ছলতা সে ঢুলকির মধ্যে লক্ষ্য করে নাই। নির্ঝরের চাপল্য কিংবা অগ্নির প্রদাহ, মান অভিমান, সোহাগ আবদার— অর্থাৎ ইহার অন্তরের কোন পরিচয় আজ পর্যন্ত নিপু পায় নাই। ঢুলকি শুধুই যেন দেহ, কেবল মাংস খানিকটা, আর কিছু নয়। কিন্তু অপরূপ সে দেহের গঠন। ক্ষীণকটি কুচভরনমিতাঙ্গী নিবিড়নিতম্বিনী ঢুলকি যেন জীবন্ত অজন্তা-চিত্র। কোন শিল্পীর কল্পনা যেন মূর্ত হইয়াছে। কিন্তু এ মূর্তির মধ্যে প্রাণ নাই, থাকিলেও নিপু তাহার কোন স্পর্শ পায় নাই। নিপুর কাছে ঢুলকি পাথরের মতই স্থির কঠিন নীরব। নিপু বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল। ঢুলকি লাল ফুটকি দেওয়া হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। অবগুণ্ঠন নাই। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা নাই, লজ্জা নাই, আগ্রহ নাই, প্রেম নাই, এমন কি দীপ্তিও নাই। স্থির অপলক দৃষ্টি যেন অনুচ্ছ্বসিত নীরব ভাষায় বলিতেছে, আমার পাওনাটা দিয়া দাও, আমি চলিয়া যাই।

ঢুলকি জাতে মুসহর; এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে মধু বিক্রয় করিতে আসে। মাথায় মধুর হাঁড়ি লইয়া 'মধু-উ-উ-উ, মধু লিবে গো' বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়ায়। সঙ্গে একজন পুরুষও থাকে। ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা ভীষণদর্শন লোকটা, তাহারও শরীর যেন পাথরে কোঁদা, কোমরে সর্বদা একটা ছোরা গোঁজা, চক্ষুর দৃষ্টি সামান্য উত্তেজনাতেই হিংস্র হইয়া উঠে। স্বামী বলিতে সভ্য-সমাজে যে সম্পর্ক বুঝায়, এ ব্যক্তির সহিত ঢুলকির ঠিক সে সম্পর্ক আছে কি না, তাহা জানা কঠিন; কিন্তু সে যে ঢুলকির মালিক, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। ঢুলকি তাহার পদানত। এই আত্মসমর্পণের

লে কি আছে, ছোরা, না, প্রেম, না, সামাজিক বন্ধন, তাহাও কেহ জানে না। এইটুকু শুধু সকলে জানে যে, সে ঢুলকির মালিক। ঢুলকির এই সব ...-অভিযান সে-ই নিয়ন্ত্রিত করে, উপার্জনের সমস্ত টাকা সে-ই লয়। কিছুকাল আগে মুশাই এই ঢুলকির কবলে পড়িয়াছিল। অর্থাভাবেই হোক ... যমুনিয়ার ছটপরবের জোরেই হোক, মুশাই এখন ঢুলকিকে ছাড়িয়াছে। ঢুলকি এখন নিপুর। ফুলশরিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিপু কিছুদিন ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়ও তাহার কম হয় নাই, যখন সে আবিষ্কার করিল যে, ওই ঘেয়ো লোকটা তাহার স্বামী নয়। সামান্য পণ্যরমণী হইয়াও ওই লোকটাকে সে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে! কেন? যে বস্তুতান্ত্রিক মানদণ্ড দিয়া সে জীবনের সমস্ত রহস্য নিরূপণ করিতে অভ্যস্ত, তাহা দিয়া সে ফুলশরিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারিল না। কাব্যের ...স্থ বুলি আওড়াইয়া অবশেষে সে মনকে স্তোক দিল, প্রেমের বিচিত্র নিয়ম বোধ হয়। ইহা লইয়া বেশিদিন সে মাথাও ঘামাইল না, ঢুলকিকে পাইয়া ফুলশরিয়াকে ভুলিয়া গেল। সে বায়োলজিকালি বাঁচিতে চায়,—ঢুলকি ফুলশরিয়া যে কেহ একটা জুটিলেই হইল। এখন কিন্তু ঢুলকিকে দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিল। হাতে মাত্র পাঁচটি টাকা আছে। পাঁচ টাকাই উহাকে দিয়া দিলে হাত যে একেবারে খালি হইয়া যাইবে! কিন্তু ঢুলকির অপলক নীরব দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা শক্ত। একটু ইতস্তত করিয়া নিপু অবশেষে পাঁচ টাকার নোটটা বাহির করিল এবং সেটা টেবিলে রাখিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল, বৈঠো।

ঢুলকি বসিল না।

পাঁচ টাকার নোটটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, পাঁচ টাকায় হোবে না বাবু, পঁচাশ টাকা লাগবে।

মুসহরদের নিজেদের ভাষা একরূপ অদ্ভুত হিন্দী। কিন্তু বাঙালী বাবুদের সহিত ইহারা বাঁকা বাংলায় কথা বলে।

নিপু আকাশ হইতে পড়িল। বলে কি! পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে! কাহে?

ঢুলকি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরেই যাহা ঘটিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। নিপু চমকাইয়া উঠিল। হঠাৎ পিছনের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল ঢুলকির মালিক এবং খাঁউখাঁউ করিয়া নিজস্ব ভাষায় যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম এই :—আপনিই তো, হুজুর, সেদিন হাটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, মজুরদের বেতন দশ গুণ হওয়া উচিত, বাবু-ভেইয়ারা তাহাদের ঠকাইয়া তাহাদের ন্যায্য মজুরি চুরি করিয়া নিজেরা বাবুয়ানি করে। কথাটা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আশা করিয়াছিলাম যে আপনি অন্তত মজুরদের প্রতি সুবিচার করিবেন। আপনিও আর সকলের মত কম মজুরি দিতে চাহিতেছেন, এ তো বড় তাজ্জবকি বাত!

শাণিত দন্ত বিকশিত করিয়া লোকটা হাসিল। নিপু যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। লোকটার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতেও পারিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। এই মূর্খটাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে যে সকলে যদি সমাজতন্ত্রী না হয়, সে একা কি করিয়া হইবে, অর্থনৈতিক আইন অনুসারে তাহা যে কিছুতে হওয়া যায় না। তাহার মনে হইল, অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি সহজ ভাষায় ইহাদের মধ্যে প্রচার করা উচিত, তাহা না হইলে বক্তৃতার সহিত আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমি নিজেও যে কত অসহায়, তাহা ইহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে—

চল্।

নিপু চকিতে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, লোকটা ঢুলকির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, চোখ দুইটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়টা টাকার জন্য মেয়েটা নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে নাকি?

আরে, ঠহরো ঠহরো, যাও মৎ।

উভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যদিও এতদিন ধরিয়া সে সাম্যবাদের মন্ত্র জপ করিয়াছে, কার্যকালে কিন্তু তাহার সুপ্ত বুর্জোয়া মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, টাকা দিয়া এই ছোটলোকগুলাকে কিনিয়া রাখিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া যাইবে! আস্পর্ধা

তো কম নয়! ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াড়ির যে রকম অযৌক্তিক রোখ চাপিয়া যায়, বৈজ্ঞানিক নিপুরও ঠিক তাহাই হইল। সে অশুদ্ধ হিন্দীতে বলিয়া বসিল যে, সে পঞ্চাশ টাকাই দিবে, আজ হাতে অত টাকা নাই, দুলকি কাল আসিয়া যেন টাকা লইয়া যায়।

বহুৎ খুব।

দুইজনেই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

নিপু খোলা দ্বারটার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। আরও অবাক হইয়া যাইত, যদি দেখিতে পাইত, অন্ধকারে কেমন দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত গলা-ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। দেহের শুচিতা ইঁহাদের কাছে তত বড় নয়, মনের শুচিতা যতটা। প্রাণ-ধারণ করিবার জন্য যেমন মধু-বিক্রয় করিতে হয়, তেমনই দরকার পড়িলে দেহ-বিক্রয়ও করিতে হয়। নারী-মাংসলোলুপ কুত্তার অভাব নাই পৃথিবীতে। তাহাদের লোভের খোরাক যোগাইয়া অর্থ-উপার্জন করিতে হয় বইকি মাঝে মাঝে। অর্থটা যে অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস, না থাকিলে চলে না এবং মধু-বিক্রয় করিয়া সব সময়ে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহও করা যায় না। উপরি রোজকার করিতে দোষ কি? ইহাদের নীতি কমিউনিস্টিক নয়, একেবারে মহাভারতীয়। মন যদি একনিষ্ঠ থাকে, দেহ লইয়া ইহারা মাথা ঘামায় না। সমুদ্রাভিমুখিনী স্রোতস্বতীর বুকে সাময়িক খড়-কুটা-জঞ্জালের মত এসব নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার, আসে এবং ভাসিয়া যায়।...কেকার ধ্বনির ন্যায় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। নিপুর মনে হইল, আকাশে বোধ হয় হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। এ অঞ্চলের খালে-বিলে এ সময় হাঁস আসে। এ কিন্তু হাঁস নয়, দুলকি। স্বামীর কি একটা রসিকতায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়াছে। নিপু বুঝিতে পারিল না, কারণ নিপুর কাছে দুলকি কখনও হাসে নাই।...উন্মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া নিপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের মধ্যে অতৃপ্ত লালসা, দারিদ্র্যজনিত ক্ষোভ, আদর্শনিষ্ঠা, আদর্শচ্যুতি, আহত আত্ম-অভিমান, ব্যর্থ আক্রোশ, সমস্ত যেন একটা তিক্ত বীভৎস রসের ফেনিল আবর্তে টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা করিতে

লাগিল, যে সমাজবিধান তাহাকে এমন ক্ষুধিত অসমর্থ অসহায় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতে, ভীম যেমন করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিল।

দেবতা, বাড়ি আছেন নাকি?

তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া নিপু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মুকুন্দ পোদ্দারের কণ্ঠস্বর।

এবার ভজহরিকে না পাঠাইয়া স্বয়ং আসিবার মানে? ভজহরিই তো প্রতি মাসে সুদ লইয়া যায়। দ্বারপ্রান্তে মুকুন্দ পোদ্দার আবির্ভূত হইলেন।

এই যে, দেবতা আছেন দেখছি!

চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পোদ্দার মহাশয় পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া চটিজুতা হইতে ধূলি অপসারণ করিলেন, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া তৈলপক্ক বেঁটে বাঁশের লাঠিটি কোণে সন্তর্পণে রাখিয়া চৌকিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিপুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। দন্তলগ্ন স্বর্ণখণ্ডগুলি বাতির আলোকে চকমক করিয়া উঠিল।

আপনি নিজেই এলেন যে আজ?

কেন, দেবদর্শনে দোষ কি আছে?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, ভজহরির শরীরটা খারাপ। বুড়ো লোক সে, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই কাবু হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডার দিনে আমি কিন্তু হাঁটলেই ভাল থাকি, তাই ভাবলুম, বেড়িয়েই আসি একটু।

ক্ষণকাল থামিয়া মুকুন্দ পুনরায় বলিলেন, আঃ, সেদিন হাটের বক্তৃতাটি আপনার চমৎকার হয়েছিল, অমন হক কথা বহুকাল শোনা যায় নি।

তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল, মুখে হাসি।

নিপু হাসিয়া বলিল, আপনারও ভাল লেগেছিল? আমার বক্তৃতা শুনে ওরা যদি জাগে, তা হ'লে তো আপনাদেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি।

তা হ'লেও হক কথা হক কথাই। তা ছাড়া আমরা আর কদিন? আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন দেবতা?—এই।

মুকুন্দ পোদ্দার ললাটের মধ্যস্থলে তর্জনী স্থাপন করিয়া হাসিলেন।

এটি যতক্ষণ আমার সপক্ষে আছে, ততক্ষণ, দেবতা, কোন বক্তৃতাকেই আমি কেয়ার করি না। এমন কি আপনার প্যাম্‌ফেলেট না কি বললেন সেদিন, তাও ছাপিয়ে দিতে আমি রাজী আছি।

রাজী আছেন?

আপত্তি কি?

নিপু যেন অকূলে কূল পাইল। কলিকাতায় যে কমিউনিস্টিক দলের সহিত সে এখন নামেমাত্র সংশ্লিষ্ট আছে এবং যে দলের হরেন তালুকদার তাহার চাকরি-করা লইয়া খুব একটা ব্যঙ্গাত্মক পত্র লিখিয়াছে, হাজার কয়েক গরম প্যামফ্লেট ছাপাইয়া যদি সেই দলে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার শুধু যে মুখরক্ষা হইবে তাহাই নয়, নীরব কর্মী হিসাবে হয়তো দলের মধ্যে একটা জয়জয়কারও পড়িয়া যাইতে পারে। ইহা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত জিনিস নয়। এমন কি প্যাম্‌ফ্লেটের ভাষায় সে যে আগুন ছুটাইবে, তাহা যদি পুলিস-বিভাগের রোষ উৎপাদন করিয়া তাহাকে কারাবরণ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে তো কথাই নাই, তাহার প্রতিপত্তির অন্ত থাকিবে না। উত্তেজনাপূর্ণ কোন একটা কিছু করিতে না পারিলে তৃপ্তি নাই। এই অখ্যাত পল্লীগ্রামে একটা ক্যাপিটালিস্ট জমিদারের অধীনে হাড়ি-ডোমদের মধ্যে বাস করিয়া সহস্র বিরুদ্ধতার মধ্যে কাজ করা কি সম্ভব? কেহ তাহার একটা কথা বোঝে না। ইহাদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নাই, কোন উৎসাহ নাই, কেহ একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পর্যন্ত করে না। উত্তেজনার সন্ধানেই সেদিন সে হাটে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, উত্তেজনার সন্ধানেই লক্ষীবাগে মণির বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি নাই। সমস্ত দেশকে মাতাইবে—ইহাই তাহার স্বপ্ন। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকিলে তাহার স্বপ্ন সফল হইবে কি? মুকুন্দ পোদ্দারের কথায় তাহার অন্তরের সুপ্ত বহ্নি যেন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুখে কিন্তু বিশেষ আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না, সে বিষয়ে সে খুব চালাক, অত্যন্ত নিরীহভাবেই বলিল, বেশ তো, দিন না। তা হ'লে তো একটা ভাল কাজ হয়।

ভাল কাজ করতে কোন কালে পেছ-পা নই আমি। শঙ্করবাবু ইস্কুল

করতে চাইলেন, দিলাম ক'রে। এখন সে ইস্কুলে ছাত্তোর জুটছে না, তা তো আর আমার দোষ নয়।

ছাত্র জুটছে না নাকি?

জুটবে কি ক'রে? যা এক মাস্টার পাঠিয়েছেন শঙ্করবাবু—লোকটার নাক সর্বদা কুঁচকেই আছে, এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই—নিত্যি একটা না একটা বায়নাক্কা লেগেই আছে। তা ছাড়া বলে কি, শুনবেন? বলে—ছোটলোকের ছেলেদের গায়ে বড্ড গন্ধ, কাছে বসা যায় না। ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেন্সওলা রুমাল নাকের কাছে ধ'রে পড়ান। এ রকম হর্তচ্ছেদ্দা করলে ছাত্তোর ওর কাছে ঘেঁষবে কেন— অ্যাঁ, কি বলেন আপনি? ছোটলোক হ'লেও ওরা মানুষ তো! এখন প্রতিটি ছাত্তোরকে যদি সাবান মাথাতে পারি, তা হ'লে হয়তো ওঁর মনঃপূত হয়, কিন্তু অত পয়সা আমার নেই মশাই, অমন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েও কাজ নেই, আর লেখাপড়া শিখে হবে তো কচু, ইস্কুল করার চেয়ে এ দেশে অন্নছত্র খোলা ভাল। ছোটখাটো একটা খুলেওছি, গুটি দশেক লোককে খেতে দিই, তার বেশি আর পারি না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুকুন্দ পোদ্দার পুনরায় বলিলেন, ইস্কুল-ফিস্কুল চলবে না।

স্কুল সম্বন্ধে নিপুর নিকট হইতে কোন মন্তব্য না শুনিয়া পোদ্দার মহাশয় ও-বিষয়ে আর আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কি জানি, শঙ্করকে গিয়া যদি লাগায়! উৎপলের দক্ষিণহস্ত শঙ্করকে চটাইবার সাহস তাঁহার নাই। স্কুল সম্বন্ধে এতক্ষণ তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য খানিকটা সত্য। কিন্তু স্কুল না চলিবার আসল কারণ শিক্ষকের ফিনফিনে পাঞ্জাবি অথবা তাঁহার সদ্গন্ধ-প্রিয়তা নয়। আসল কারণ তিনি নিজেই। ভজহরির মারফৎ তিনিই পাকে-প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্র যাহাতে না জোটে। ভজহরি গ্রামের চাষীদের গোপনে "টিপিয়া" দিয়াছে যে, স্কুলে যেন তাহারা ছেলে না পাঠায়, পাঠাইলে পোদ্দারজী চটিয়া যাইবেন। ছাত্র না জুটিবার ইহাই যথেষ্ট কারণ এবং আসল কারণ।

প্যাম্‌প্লেট লিখি তা হ'লে?

লিখুন। পাঁচজনের যদি উপকার হয়, দেব না হয় ছাপিয়ে। কিন্তু কটি শর্তে।

কি, বলুন?

একটি নয়, দুটি শর্ত আছে। প্রথম—আমার নাম কারুর কাছে প্রকাশ রতে পারবেন না। দ্বিতীয় শর্তটি একটু ইয়ে-গোছের—বুঝিয়ে বলি হ'লে, শুনুন। আচ্ছা, ছোটলোকদের মধ্যে আন্দোলন চালাতে পারবেন পনি?—মানে, স্ট্রাইক, ধর্মঘট এই সব?

তা চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়।

বহুৎ আচ্ছা। একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। শুনেছেন বোধ য়, হৃদয়বল্লভ উৎপলের কাছ থেকে জমিদারিটা ফিরে কিনে নেবার চেষ্টা রছে, রাজীব দিচ্ছে টাকা। এর মানেটা বুঝছেন?

নিপু কিছুই শোনে নাই। মনে মনে আশ্চর্য হইল। বাহিরে কিন্তু নে ভাব করিল, যেন সে সব জানে।

বুঝছেন কিছু?

না।

এর মানে, ওই চশমখোর কঞ্জুস রাজীবই শেষ পর্যন্ত জমিদার হবে। আর া হ'লে দুর্গতির অন্ত থাকবে না ভদ্দরলোকদের। উৎপল জমিদারি বিক্রি রুক, হৃদয়বল্লভ তা কিনুক—এ ওয়াজিব ব্যাপার, আমার কোনও আপত্তি নই; কিন্তু রাজীবকে মাথা গলাতে দোব না আমি তার মধ্যে। হৃদয়বল্লভ াদি চায়, আমিই টাকা দিতে পারি।

বিহ্বল নিপু বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

কিছু নয়, হৃদয়বল্লভকে এই কথাটি শুধু জানিয়ে দিতে হবে যে, রাজীবের টাকা নিয়ে আপনি যদি জমিদারি কেনেন, তা হ'লে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আমরা ধর্মঘট করব, প্রজারা যাতে খাজনা না দেয় তার চেষ্টা করব, গান্ধীর দলকে ডেকে আনিয়ে ছারখার ক'রে দেব সব। জমিদারি

আপনি কিনুন, কিন্তু রাজীবের টাকা দিয়ে নয়। আমি টাকা দিতে রাজী আছি, নিতে হ'লে আমার টাকাই নিক।

মানে, আপনি নিজেই জমিদার হতে চান?

মুকুন্দ পোদ্দার হাসিলেন। তাঁহার দাঁতের সোনা আবার চকচক করিয়া উঠিল।

আমি জমিদার হ'লে দেখবেন, কি করি। নিজের মুখে আগে থাকতে বলতে চাই না কিছু, দেখবেন। প্রজার ভাল কি ক'রে করতে হয়, তা দেখিয়ে দোব আমি।

নিপু সহসা অনুভব করিল, এই ধনী মহাজনটিকে খুশি রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহার অনেক সুবিধা হইতে পারে। আজ শঙ্কর যেমন উৎপলের সহায়তায় প্রতাপান্বিত হইয়াছে, সেও একদিন জমিদার মুকুন্দ পোদ্দারের সহায়তায় বহু লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। নিজের আদর্শ প্রচার করিবার সুবিধাই তাহাতে। তাহার এতদিনকার মহাজন-বিদ্বেষ সহসা যেন কুয়াসার মত মিলাইয়া গেল। এই পুঁজিবাদী লোকটার স্বার্থরক্ষা করিতে তাহার আর দ্বিধা হইল না। বলিল, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখব।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই কিন্তু মুকুন্দ পোদ্দারের আসল কথাটি মনে পড়িয়া গেল।

আজ কিছু দেবেন নাকি?

হাতে এ মাসে একদম কিচ্ছু নেই। আরও গোটাপঞ্চাশেক টাকার জরুরি দরকার। কি যে করব ভাবছি! দেবেন আপনি?

দিতে পারি অবশ্য, যদি—

একটু ইতস্তত করিয়া মুকুন্দ বলিলেন, আচ্ছা থাক্, আপনার সঙ্গে আর ব্যবসাদারি নাই করলাম, বন্ধকি দিতে হবে না আপনাকে, এমনিই দেব। কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবেন। আপনার সোনার হাতঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দোব। আপনার সঙ্গে বন্ধকী কারবার আর নাই করলাম—অ্যাঁ, কি বলেন?

সহাস্যদৃষ্টিতে মুকুন্দ নিপুর দিকে চাহিলেন।

নিপু শুধু একটু মুচকি হাসিল।

রাত হ'ল, এবার ওঠা যাক।

ঘরের কোণ হইতে লাঠিটি লইয়া মুকুন্দ চৌকাঠের উপর সেটি অভ্যাসমত বার দুই ঠুকিলেন।

শীতকালের একটি সুখ কি জানেন, সাপ-খোপের ভয় থাকে না। ওই জিনিসটিকে বড় ডরাই দেবতা।

নিপু আবার মুচকি হাসিল।

মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলেন। মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলে নিপু আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মনে হইল, সে যেন নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এতদিন যে বিত্ত সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ যেন তাহা ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। না না না, সে মুকুন্দ রাজীব শঙ্কর উৎপল—কাহাকেও সাহায্য করিবে না, শত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একক সে সগর্বে বিদ্রোহ-পতাকা তুলিয়া যুদ্ধ করিবে, ক্যাপিটালিজ্‌মের সহিত কোন শর্তেই রফা করা চলিবে না। মুকুন্দ পোদ্দারকে এখনই সে কথাটা বলিয়া দেওয়া ভাল। সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

পোদ্দার মশাই!

কোন উত্তর আসিল না। পোদ্দার মশাই অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলেন। একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

২৮

গ্রামের ছোট স্টেশনটিতে শঙ্কর ট্রেন হইতে যখন নামিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে যেন তাহার পরিচিত বিছানায় আবার জাগিয়া উঠিল। এতদিন একটা কদর্য ঘূর্ণাবর্তে সে যেন হাবুডুবু খাইতেছিল। দেঁতো হাসি, ছেঁদো কথা, অনান্তরিক আলাপ, সবজান্তা উন্নাসিকতা, স্বার্থসর্বস্ব মনোভাব, যুদ্ধের হিড়িক, তা ছাড়া দোকান—দোকান—দোকান। এই অল্প কয়েক দিনে কলিকাতার আবহাওয়া তাহার মনে যে গ্লানি জমাইয়া

তুলিয়াছিল, কুৎসিত-দর্শন স্টেশন-মাস্টারের আকর্ণবিস্তৃত আন্তরিক হাসির স্পর্শে তাহার অনেকখানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আমার জিনিস এনেছেন ?—হাসিয়া মাস্টার মহাশয় আগাইয়া আসিলেন।

এনেছি।

ঝুড়ির ভিতর হইতে রবিন্‌সনের বার্লির কৌটাটি শঙ্কর বাহির করিয়া দিল।

বিস্তর জিনিস এনেছেন দেখছি। আরে, বা বা বা—চমৎকার, কুমরটুলির নিশ্চয় ?

হ্যাঁ। সমস্ত রাস্তা আগলে আগলে আসছি। পাছে কেউ ধাক্কা মেরে দেয়।

সরস্বতী-প্রতিমাটিকে শঙ্কর সস্নেহে একধারে সরাইয়া রাখিল। ছোট প্রতিমাটি, কিন্তু নিখুঁত একেবারে।

আপনার আনা চারেক ফিরেছে। এই নিন।

ঘাড় ফিরাইয়া শঙ্কর দেখিল, মাস্টার মহাশয় নিজ প্রকোষ্ঠে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ক্ষণপরেই তিনি থার্মোফ্লাস্ক হইতে কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

একটু ইষ্টিম ক'রে নিন, যা শীত।

কোথা পেলেন এই ভোরে ?

আমার জন্যে এসেছিল বাড়ি থেকে। আমি আবার আনিয়ে নিচ্ছি।

না না, সেটা ঠিক হয় না।

খুব ঠিক হয়। আমি আনিয়ে নিচ্ছি এখুনি। আপনি যা জিনিস এনেছেন, গিন্নী দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে এখন আপনাকে।

বাড়িতে কারও অসুখ নাকি ?

তিন-তিনটে মেয়ে পেটের অসুখে ভুগছে মশাই। গাঁদালপাতার ঝোল আর খেতে পারে না বেচারীরা। নটবর বার্লি খাওয়াতে বলেছে, কিন্তু এ অঞ্চলে ও-বস্তু পাবার জো নেই। ভাগ্যে আপনি কলকাতা গেলেন—ও ইয়েস, আপনার সব জিনিস নেবেছে তো, ও ইয়েস, অল রাইট, অল রাইট।

মাস্টার মহাশয়ের সমর্থন পাইয়া গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া সবুজ পতাকা আন্দোলিত করিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

চা খুব খারাপ, তবু শঙ্করের অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। চা পান করিয়া শঙ্কর পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিল। ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার মনে হইয়াছে—এখন আবার মনে হইল, এই কেরানীরাই প্রকৃত ভদ্রলোক। ইহারা হয়তো 'এডুকেটেড' নয়, কিন্তু ইহারাই ভদ্রলোক। ছাপোষা বেচারীরা তথাকথিত কাল্চারের ধার ধারে না, কিন্তু স্বল্প আয় সত্ত্বেও ইহারাই সামাজিক সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। থলি হাতে বাজারে যায়, ঋণগ্রস্ত হইয়া ছেলে পড়ায়, মেয়ের বিবাহ দেয়, অসমর্থ আত্মীয়কে প্রতিপালন করে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখে, চাঁদা করিয়া দুর্গাপূজা কালীপূজা করে, রাত জাগিয়া যাত্রা-থিয়েটার শোনে। অথচ কোন অহমিকা নাই, সবদাই যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদী ড্রইংরুম-বিহারী আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যে আন্তরিকতার অভাব, ইহাদের মধ্যে বাঙালী জাতির সেই সহৃদয় আন্তরিকতা এখনও জীবন্ত হইয়া আছে, ওষ্ঠ-চটক অন্তঃসারশূন্য আপ্যায়নমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

আপনার চার আনা ফিরেছে, এই নিন।

সস্তায় পেয়েছেন তা হ'লে। ওরে বজ্‌রঙ্গি, পেয়ালাটা তুলে রাখ্‌ বাবা, পা লেগে ভেঙে গেলেই গেল। আচ্ছা, আমি এবার চলি, ঘানি কামাই দেবার জো নেই তো।

হাসিয়া মাস্টার মহাশয় নিজ অফিসে প্রবেশ করিলেন।

মুশাই গরুর গাড়ি আনিয়াছিল। কুলির সাহায্যে সে জিনিসপত্র গরুর গাড়িতে তুলিতে লাগিল। কাপড়-চোপড়, বই খাতা, এক ঝুড়ি কমলালেবু, এক ঝুড়ি নারকুলে কুল, বাসনপত্র, গোটা দুই কোদাল, বাংলা দেশের কুলো ধুচুনি, এক বাক্স গ্রামোফোন রেকর্ড, তা ছাড়া সুটকেস, বিছানা—গাড়িতে বসিবার স্থান আর রহিল না। শঙ্কর ঠিক করিল, হাঁটিয়াই যাইবে। সরস্বতী-প্রতিমাটা লইয়া যাওয়াই সমস্যা। স্কুলের ছেলেদের ফরমাশ, অনেক কষ্টে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া এতদূর আনিয়াছে। ছোট প্রতিমা, একটা কুলি মাথায়

করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না? পারা তো উচিত। মুশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, চেটিয়া সেনি আইলোছে, ওহি লোগ লে যাইতে—

ওরা এসেছে? কই, কোথায়?

মুশাইয়ের অঙ্গুলিনির্দেশে শঙ্কর দেখিল, স্টেশন হইতে একটু দূরে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে, তাহার নীচে একদল ছাত্র সত্যই বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে এখনও দেখিতে পায় নাই বোধ হয়। এই ভোরে এতটা পথ তাহারা হাঁটিয়া আসিয়াছে! তাহার নিজের ছাত্রজীবন মনে পড়িল। সরস্বতীপূজাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রজীবনে কি উৎসাহই না হইত! সরস্বতী-পূজার আগের দিন রাত্রে চোখে ঘুমই আসিত না। দুবেজীকে মনে পড়িল। তিনি স্বহস্তে প্রতিমা নির্মাণ করিতেন। খড় দেওয়া হইতে শুরু করিয়া রং দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ দুবেজীর বাড়িতে ধরনা দিয়া বসিয়া থাকিত সে। দুবেজীর চেহারাটা স্পষ্ট মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ হইয়া একটু কুঁজো হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে একটি দাঁত ছিল না, কপালের মাঝখানে একটি চন্দনের ফোঁটা পরিতেন। বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাণ দিয়া ঠাকুরটি গড়িতেন, প্রাণ দিয়া পূজাও করিতেন। ছাত্রজীবনের সেই অতীত দিনগুলি শঙ্করের মনে সজীব হইয়া উঠিল। দেবদারুপাতা আর রঙিন কাগজের শিকল দিয়া স্কুল সাজানো, নিষ্ঠাভরে কুল না খাওয়া, পূজার দিন ভোরে উঠিয়া যবের শিষ সংগ্রহের জন্য মাঠে যাওয়া, অঞ্জলি না দেওয়া পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকা···। ছাত্রদল আসিয়া শঙ্করকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের চোখে মুখে কি প্রদীপ্ত উৎসাহ! তাহারা আশাই করিতে পারে নাই যে, শঙ্করবাবু সত্য সত্যই তাহাদের জন্য প্রতিমা লইয়া আসিবেন। যদির উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। কুলির দরকার কি? প্রতিমা তাহারাই বহিয়া লইয়া যাইবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন বালক সোৎসাহে আগাইয়া আসিল। মুশাই গরুর গাড়ি লইয়া আগাইয়া চলিয়া গেল। ছাত্রদের সহিত শঙ্কর পথ হাঁটিতে লাগিল।

প্রভাত হইতেছে। দুই পাশে চাষের জমি। সরিষা কাটা হইতেছে। গম এবং যবের শিষ ধরিয়াছে। চতুর্দিকেই স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী। ফুলে পাতায়

শিশিরবিন্দু টলমল করিতেছে। কোথায় যেন একটা শ্যামা পাখি শিস দিতেছে। বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে। একটা ক্ষেতের মাঝখানে বসিয়া কয়েকটা কাক কলরব তুলিয়াছে। কোথাও যেন কোন অভাব নাই, নীচতা নাই, কলহ নাই, সমস্তই যেন প্রাচুর্যে, দাক্ষিণ্যে, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। শঙ্করের মনে হইল, এই তো আমার দেশমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, সদাহাস্যময়ী জননী। মুগ্ধনেত্রে শঙ্কর সম্মুখের দিকে চাহিল। ছাত্রের দল সরস্বতী-প্রতিমাকে মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যে সরস্বতী কুন্দেন্দুতুষারধবলা, পুস্তক-শ্রী, বীণাপাণি, সংশয়-অন্ধকার-বিনাশিনী, জ্যোতির্ময়ী বাণী। তাহার মনে হইল, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট রূপটি আজ যেন এই প্রভাত-আলোকে অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল মাঠের বুক চিরিয়া সরু একটি পায়ে-চলার পথ, সেই পথ দিয়া বিদ্যার্থীর দল বাণীমূর্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছে, কত রাজ্যের কত উত্থান-পতন হইল, ভারতবর্ষের এই মূর্তিটি কিন্তু এখনও শাশ্বত হইয়া আছে।

২৫

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড হল-ঘরে প্রকাণ্ড টেবিলে প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বিস্তৃত করিয়া উৎপল তন্ময়চিত্তে কি যেন দেখিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল।

ও কি?

তাহার স্বরটা যেন রুক্ষ। উৎপল চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় ম্যাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল এবং বলিল, আধুনিক কুরুক্ষেত্র।

ম্যাপ দেখে খবরের কাগজ পড়ছ! যুদ্ধ নিয়ে খুব উন্মত্ত হয়ে উঠেছ তা হ'লে?

খুব। মানব-সভ্যতার এতবড় একটা উৎক্ষেপে তোমরা যে কি ক'রে অবিচলিত আছ, আমি বুঝতে পারছি না।

আমরা তো উদ্ভিদ মাত্র। মানব-সভ্যতার হর্ষ-বিষাদের সঙ্গে আমাদের

সম্পর্ক কি? যাদের তুমি মানব বলছ, তাদের সঙ্গে আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। তুমি হয়তো মানব, কিন্তু আমি নই।

উৎপল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর টেবিল হইতে সিগারেট-কেসটা তুলিয়া স্মিতমুখে খুলিয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ সিগারেট খাও নি মনে হচ্ছে।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ এ তুষ্ণী ভাব?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

ব্যাপার কি? ব'স্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

শঙ্কর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। সিগারেট-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়, যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই বলিয়া ফেলিল।

নিজে জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কাদের!

ফরিদ কারু পূরণ আর হরিয়াকে?

কে তারা?

তোমার প্রজা। দারোগা সাহেব তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে মারধোর করছিলেন, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই।

ওঃ।

উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটি টান দিল এবং ব্যাপারটা এইবার হৃদয়ঙ্গম করিল। এতক্ষণ সে সত্যই কিছু বুঝিতে পারে নাই। সিগারেটে মৃদু-গোছের আর একটা টান দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্কর আর কোন কথা বলিল না, তাহার রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। উৎপল ম্যাপটার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা বলিল, ওরা যে নির্দোষ, তা আশা করি তুমি ঠিক জান।

না, জানি না।

অথচ ওদের জন্যে জামিন হ'লে?

ওরা দোষী কি নির্দোষ তা জানি না বটে, কিন্তু আসল কথাটা জানি।

কি সেটা?

ওরা নিরুপায়।

বাই জোভ!

ওরা চুরি করে কেন, জান?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

জানি এবং এর পর তোমার কি বক্তৃতা যে আসন্ন, তাও জানি।

সব জেনেও ওদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিস করতে ইচ্ছে হ'ল তোমার?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মের খাতিরে অনেক জিনিস করতে হয়। বিশেষ ক'রে ওদের বিরুদ্ধেই আমি কিছু করি নি, চুরি হ'লে থানায় খবর দেওয়া উচিত ব'লেই দিয়েছিলাম।

থানায় খবর দিলেই চোর ঠিক ধরা পড়বে, এটা তুমি বিশ্বাস কর?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না। চুরি হ'লেই থানায় খবর দেওয়াই প্রতিকারের একমাত্র উপায়। সভ্য-সমাজে এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কি উপায় আছে, বল?

সভ্য-সমাজের কথা জানি না, নিজেদের সমাজের কথা জানি।

সেটা কি খুলেই বল না?

ওই তো বললাম, আমরা নিরুপায়।

উৎপল স্মিতমুখে ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কি করতে বল তা হ'লে তুমি? চুরি হ'লে সহ্য করব?

তোমার নিজের ভাই চুরি করলে থানায় খবর দিতে? ধর, যদি তোমার একটা চোর ভাই থাকত।

তা হয়তো দিতাম না। কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ সকলকে নিজের সহোদর ব'লে স্বীকার করতে হবে? কার্যকালে তা পারি না, কাব্য করবার সময় পারি অবশ্য।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ হ'ল কি তোর, ছাড়িয়ে এনেছিস, বেশ করেছিস, আমার ওপর তম্বি কেন? আমি কি আপত্তি করছি?

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা চালাতে দেব না তোমাকে আমি।

হঠাৎ তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। সে আর বসিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া উৎপল অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিল, বাই জোভ!

শঙ্কর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের যুক্তিহীন ক্ষোভকে অকস্মাৎ ভাষায় প্রকাশ করিয়া সে যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। এলোমেলো নানা কথা মনে হইতেছিল। কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না—কি করা উচিত, কোথায় পথ, অসংখ্য অসহায় পল্লীবাসীদের কি করিলে উপকার হইবে? মনে হইতেছিল, সে কিছুই জানে না, অথচ পল্লী-সংস্কার করিতে নামিয়াছে। নিজের অক্ষমতায় সে মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উৎপলের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর-মুহূর্ত হইতেই একটা নিদারুণ সঙ্কোচে সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। এমন কি বাড়ি ফিরিয়া যাইতেও তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল। একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, ভাবপ্রবণতার আধিক্যবশত সে হয়তো অমিয়ার প্রতি অবিচার করিতেছে। এই তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করিয়া হয়তো ঝড় উঠিবে এবং সে ঝড়ে অমিয়ার ক্ষুদ্র নীড়খানি হয়তো ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। নিজের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। হঠাৎ কখন যে কি করিয়া বসিবে, অতর্কিতে কি হইয়া যাইবে, তাহা নিজেও সে জানে না। অন্তরের অন্তস্তল হইতে মাঝে মাঝে কিসের যেন একটা ঘূর্ণন জাগে, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে অবিন্যস্ত করিয়া দেয়, সাজানো বাগান ছারখার হইয়া যায়। হঠাৎ খুকীর মুখটা মনে পড়িল—কচি দুষ্টু মুখটা। না না, উৎপলের সহিত ঝগড়া করা চলিবে না। কিন্তু

উৎপল কেন তাহার মনের কথা বুঝিবে না? কেন সে এমন নির্বিকারভাবে দূরে হইতে মজা দেখিবে কেবল? সভ্য-সমাজের আইন মানিয়া চলাটাই কি জীবনের একমাত্র নীতি? কিন্তু উৎপলই বা করিবে কি? আইন মানিয়া চলা ছাড়া যে উপায় নাই। চুরি হইলে থানায় খবর দেওয়াই উচিত।...পরক্ষণেই ফরিদ-কাল্লু-হরিয়ার মুখগুলি মনের উপর একে একে ভাসিয়া উঠিল, তাহাদের পিঠের বেতের দাগগুলিও। নিরীহ নিরুপায় বেচারারা, সুরমার শাড়ি গহনা উহারা যদি লইয়াই থাকে, নিতান্ত পেটের দায়েই...সহসা মনে হইল, সুরমা হয়তো উৎপলের নিকট সব শুনিয়াছে, হয়তো তাহার কথা লইয়া দুইজনে এতক্ষণ হাসাহাসি করিতেছে।...হঠাৎ তাহার রাগ হইল, আবার পরক্ষণে লজ্জা হইল।...

শঙ্কর নাকি?

কে?

শঙ্কর হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল।

আমি নিপু।

ও, নিপুদা। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

না। আমি মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি থেকে ফিরছি। তোমার সঙ্গেও একটু দরকার ছিল, একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

কি, বলুন? চলুন, বাড়ির দিকেই ফেরা যাক।

চল।

নিপুদার সান্নিধ্যে শঙ্কর যেন আত্মস্থ হইল। যে দ্বন্দ্ব এতক্ষণ তাঁহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। উৎপলের জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজার জনৈক কর্মচারীর প্রয়োজনীয় আলাপ শুনিবার জন্য সহসা অতিশয় স্বাভাবিকভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুই যেন হয় নাই।

কি বলবেন, বলুন?

মুকুন্দ পোদ্দারকে যে কথা বলবার জন্যে গিয়েছিলাম, তোমাকেও সেই কথাই বলতে চাই। আমি তোমাদের শত্রু।

শক্র !

শঙ্কর বিস্মিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মন অজ্ঞাতসারেই যেন শক্র বিরুদ্ধে বর্মাবৃত হইয়া গেল। কমিউনিস্ট নিপুদা।

আপনি আমাদের শক্র! বলেন কি ?

হ্যাঁ, শক্র। আমি কমিউনিস্ট, তোমরা ক্যাপিটালিস্ট, তোমাদের উচ্ছেদ করাই আমার ধর্ম। তোমাদের সঙ্গে আপোস ক'রে চলতে পারব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমার ধারণা ছিল, আমরা সবাই এক দলের।

ভুল ধারণা ছিল। আমি অন্য জাতের লোক।

অন্য জাত মানে ? অ-ভারতীয় ?

না, কমিউনিস্ট।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, একটা নামের লেবেল লাগিয়ে দিলেই যে জাত বদলে যায়, তা তো জানতুম না। যে লেবেলই লাগান নিপুদা, একটা কথা ভুলে যাবেন না, আমরা সকলেই নিরুপায় পরাধীন ভারতবাসী, এখন ওই আমাদের একমাত্র পরিচয় জগতের কাছে।

ভুলব কেন ? মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না সে কথা। ভুলি না ব'লেই ... ক্যাপিটালিজ্‌ম এই পরাধীনতার কারণ, যে ক্যাপিটালিজ্‌মের তোমরা পৃষ্ঠপোষক, সেই ক্যাপিটালিজ্‌মকে ধ্বংস করতে চাই আমরা। আমরা চাই সাম্য।

কে না চায় ? পৃথিবীতে যুগে যুগে সভ্য মানুষের ওই তো আদর্শ, ওই তো স্বপ্ন।

স্বপ্ন কিন্তু এখন আর স্বপ্নমাত্র নেই, রাশিয়ায় তা সফল হয়েছে। আমরা যদি তাদের পন্থা অনুসরণ করি—

রাশিয়ায় কি সর্বজনীন সাম্য হয়েছে ব'লে আপনার বিশ্বাস ? আমার মনে হয়, সেখানে চাকাটা ঘুরে গেছে শুধু। সেখানেও হিংস্র বর্বর অসহায় দুর্বলকে পেষণ করছে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রমিকরা নির্যাতন করছে

ক্ষমতাচ্যুত ধনিকদের। একে আপনি সাম্য বলেন? সাদা চামড়া যেমন অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে কালো চামড়াকে, সোভিয়েটও তেমনই অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে 'কুলাক'দের।

কালা আদমি আর 'কুলাক' এক জাতীয় নয়। উপমাটা ঠিক হ'ল না তোমার।

বিশেষ তফাত কি? কালো হয়ে জন্মানোটা যদি অপরাধ ব'লে না ধরেন, ধনী হয়ে জন্মানোটাই বা অপরাধ ব'লে ধরবেন কেন?

ধনী হয়ে কেউ জন্মায় না, গরিবের রক্ত শোষণ ক'রে তবে লোকে ধনী হয়।

সত্যি সত্যি গরিবের রক্ত শোষণ যারা করে নি, ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছে—এই মাত্র যাদের অপরাধ, তাদেরও আপনারা নিস্তার দেন নি।

রক্তবীজের বংশ নির্মূল করাই উচিত।

ওটা আপনাদের রাগের ভাষা। একটু তলিয়ে দেখেন যদি, কালা আদমি আর ধনীদের উপমাটা নেহাত খেলো মনে হবে না। একটা বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যেমন কালো হয়, তেমনই একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবেশে বুদ্ধিমানও ধনী হয়। গরিব হয় বোকারা। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই এসব হয়, এর জন্যে ন্যায়ত কাউকে অপরাধী করা যায় না। শক্তি অথবা বুদ্ধি থাকা পাপ নয়।

ডাকাতকেও তা হ'লে অপরাধী করা যায় না তোমার মতে, তার শক্তি বুদ্ধি দুইই আছে।

শক্তি আর বুদ্ধির যুদ্ধে সে যদি জয়ী হয়, বিজ্ঞানের চোখে নিশ্চয়ই সে অপরাধী নয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই বাহবা দেবে, বিজয়ী সোভিয়েটকে এখন আপনারা যেমন দিচ্ছেন।

অসহায় দুর্বলরা তাদের প্রাপ্য ফিরে পেয়েছে ব'লে দিচ্ছি, অন্য কোন হেতু নেই। আমরা অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে—

অসহায় উদ্ভিদ গরু ছাগল মুরগী মাছ—এদের দিক দিয়ে ভেবে দেখলে সমস্ত মানব-জাতিটাকেই তা হ'লে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়।

তোমার মত ক্যাপিটালিস্ট-সুলভ কল্পনাশক্তি আমার নেই। আমি মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই ভাবি। গরু-ছাগলের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বাজে কবিত্ব আমার নেই। মানুষের মধ্যে যারা বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারা, যাদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে তোমরা বড়লোক হয়েছ, আমি তাদের দলে, তুমি যতই না কবিত্ব কর।

কবিত্ব নয়, বায়োলজি। বায়োলজিস্টের চোখে জীবজগতে দুটি মাত্র দল আছে—বিজিত এবং বিজেতা। উদ্ভিদ গরু ছাগল মুরগী মাছ এবং আপনার ওই বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারারা বায়োলজিস্টের বিচারে একশ্রেণীভুক্ত, জীবন-যুদ্ধে সক্ষম লোকের কাছে ওরা হেরে গেছে কিংবা যাচ্ছে।

যারা মানুষকে মুরগী-মাছের সামিল ক'রে দেখে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। আমরা বঞ্চিতদের দলে, ওরাও যাতে পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করব আমি।

আমরাও তো সেই চেষ্টাই করছি। সেইজন্যেই তো আপনাকেও ডেকে এনেছি, আপনি আমাদের শত্রু ভাবছেন কেন ?

নিপুদা চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ পথ চলিয়া শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, হঠাৎ আপনার আজ এ কথা মনে হচ্ছে কেন ?

হঠাৎ হয় নি, বরাবর এই আমার মত। এতদিন সে কথা বলবার সাহস ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, দু নৌকোয় পা দিয়ে আমি চলতে পারব না।

সত্যিই কি নৌকো দুটো ? আমরা সবাই কি এক নৌকোতেই ভাসছি না ?

না। কবিত্ব ক'রে আসল সত্যটা কিছুতেই ঢাকা দিতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক তফাত। তোমরা সুখী। অন্তত দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা মেটাবার সঙ্গতি তোমাদের আছে, আমার নেই। কোনক্রমে কদন্ন খেয়ে, ভয়ে ভয়ে কুৎসিত নারীসঙ্গ ক'রে, দেঁতো হাসি হেসে আমাকে যে দুর্বহ জীবন যাপন করতে হয়, তার সঙ্গে তোমাদের জীবনের কিছুমাত্র মিল নেই। তোমাদের অধীনে থেকে তোমাদের অনুগ্রহ-প্রদত্ত যৎসামান্য বেতন নিয়ে হাড়ি-পাড়ার কদর্যতার মধ্যে বাস ক'রে এ কথা

কিছুতেই আমি মানতে পারব না যে, আমরা এক নৌকোতে ভাসছি। আমাদের জাত আলাদা,—আমরা বঞ্চিত, তোমরা বঞ্চক। মিথ্যা অভিনয় করতে পারব না আমি।

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে এবং ক্ষণকাল পরে সংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি করবেন তা হ'লে?

আজই কলকাতা চ'লে যাব। মিথ্যার মুখোশ প'রে তোমাদের অধীনে কাজ করা পোষাল না আমার।

বেশ।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে।

নিপুদা হঠাৎ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিস্মিত শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। উদীয়মান ক্রোধ কোথায় বিলীন হইয়া গেল, নিপুদার কাতর অন্তরটা, সহসা যেন অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল সে। শুধু নিপুদার নয়, দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকদের করুণ মর্মকথা নূতন করিয়া তাহার চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সত্যই বঞ্চিত বেচারারা। লেখাপড়া শিখিবার সময় আদর্শ-জীবনের যে স্বপ্ন তাহারা দেখে, লেখাপড়া শেষ করিয়া কিছুতেই তাহারা বাস্তব জীবনে সে স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারে না। মরীচিকার মত কেবলই তাহা দূর হইতে প্রলুব্ধ করে, কিছুতেই নাগালের মধ্যে ধরা দেয় না। আদর্শ জীবন দূরে থাক্, স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবারই সুযোগ মেলে না, অতিশয় স্থূল আধিভৌতিক ক্ষুধা মিটাইবারও সঙ্গতি নাই। ঘরের পরের—সকলের অবজ্ঞা উপহাস শুনিয়া চাকরির চেষ্টায় আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, মুক্তির চেষ্টায় অবশেষে হয় স্বদেশী, না হয় সাহিত্যিক হয়। শঙ্কর আবার পথ চলিতে শুরু করিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ফরিদ কাক হরিয়া পূরণই কেবল নয়, নিপুদা, এমন কি, সে নিজেও একদলভুক্ত, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত। নিপুদাদের দুঃখটা আরও বেশি মর্মান্তিক। কল্পনায় তাহারা যে মহত্তর জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, বাস্তবে কিছুতেই তাহাকে মূর্ত করিয়া

তুলিতে পারিতেছে না। পিপাসা জাগিয়াছে, কিন্তু পানীয় নাই, আছে শুধু স্বপ্ন। আলো কি তাহা জানে, মিলিয়াছে কিন্তু আলেয়া। ফরিদ-কারু-হরিয়াদের অভাব আছে, কিন্তু স্বপ্ন নাই। তাই তাহারা অভাবের মধ্যেও সুখী। স্বপ্নই পাগল করিয়া তোলে। পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, এই কথাগুলাই বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল। বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল, সুমহৎ হিন্দুসভ্যতার ঐতিহাসিক আস্ফালনে মাতিয়া যত বাগাড়ম্বরই আমরা করি না কেন, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না যে, আমরা হারিয়া গিয়াছি। বিজয়ী প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর প্রহারে আমরা মরণোন্মুখ, কেবলমাত্র হিন্দুসভ্যতার জয়গান করিয়া গীতাউপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত আওড়াইয়া কিছুতেই সে মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে না। সহসা তাহার মনে হইল, সনাতন আর্যসভ্যতা সত্যই যদি এত মহৎ ছিল, তবে তাহা সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না কেন? বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কেন সম্ভবপর হইল? মুসলমানই বা আসিল কেন? তাহা ছাড়া আর্যসভ্যতার যাহা লইয়া আমরা গর্ব করি, তাহার সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় যোগ কতটুকু? যাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-উপনিষদ্ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং আমরা কি একজাতের লোক? রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র কি আমাদের চরিত্র? কিছুমাত্র কি মিল আছে? মিল আছে বরং ইউরোপের। যে আর্যরা এখন ইউরোপে রাজত্ব করিতেছে, সেই আর্যদেরই একটা অংশ ভারতবর্ষে একদা আসিয়াছিল, তাহাদেরই কীর্তিকলাপ, তাহাদেরই সভ্যতা বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, ইউরোপের ইতিহাসে কাব্যে বিজ্ঞানে যেমন লিপিবদ্ধ আছে ইউরোপীয় আর্যসভ্যতার কাহিনী। আমরা কি আর্য? মোটেই নয়। ওসব লইয়া আমরা বৃথা গর্ব করিয়া মরি। আমরা পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, শোষিত, পদদলিত—এইটুকুই ঐতিহাসিক সত্য, এই সত্যটা যদি কাঁটার মত মর্মে বিঁধিয়া থাকে, তবেই হয়তো উদ্ধারের উপায় আছে। সহসা তাহার মনে হইল, মর্মে কি বিঁধিয়া নাই? প্রতি পদে প্রতি কশাঘাতের সহিত কি মনে পড়িতেছে না, আমরা অক্ষম অশক্ত

অপটু নির্বীর্য স্বপ্নবিলাসীর দল? কিন্তু কই, উদ্ধারের উপায় তো দেখা যাইতেছে না? আমাদের অপটুতা লইয়া আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছি, আমাদের দুঃখ-দৈন্য লইয়া কবিত্ব করিতেছি, রাজনীতির নামে হয় খোশামোদ, না হয় দলাদলি করিতেছি, উদ্ধারের উপায় সন্ধান করিতেছি কই? আমাদের শক্তি বাড়িতেছে কই? তাহা ছাড়া আমরা মানে কাহারা? এই গ্রামের লোক? বেহারীরা? বাঙালীরা? ভারতবাসীরা, না, এশিয়াবাসীরা? না, পৃথিবীর যেখানে যত দুর্গত দুর্ভাগা আছে সকলে?...হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল, নিপুদাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিপুদার বাসায় গিয়া যখন সে হাজির হইল, তখন নিপুদা তোরঙ্গ গোছানো শেষ করিয়া বিছানা বাঁধিতেছেন। বাহিরে একটা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে।

নিপুদা, আপনার যাওয়া হবে না।

নিপুদা শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। যদিও সে যাইবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, তবু শঙ্করের কথায় মনে মনে যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করিল। মুখে বাঁকা হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

আমি থাকতে পারব না ভাই, মাপ কর। যে কাজের ভার তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি তার উপযুক্ত নই। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে মতেরও মিল নেই আমার।

আমার মত যে ঠিক কি, আমিই তা জানি না। অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি কেবল। আপনি চ'লে যাবেন না নিপুদা।

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে এমন একটা মিনতি ফুটিয়া উঠিল যে, নিপুদা অবাক হইয়া গেল। অন্ধকারে অসহায় পথভ্রান্ত পথিক যেন সাহায্য চাহিতেছে!

তোমার মতের ঠিক নেই, অথচ তুমি দেশের কাজে নেবেছ? তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়?

দেশের ভাল হোক—সর্বান্তঃকরণে এই আমি চাই, এর বেশি আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

ভাল মানে কি? মাড়োয়ারীরা বেশি বড়লোক হোক?

সে সব আলোচনা পরে হবে, আপনি এখন বিছানা খুলুন।

পরস্পর উভয়ের দিকে নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিপুদা বলিল, আচ্ছা, তুমি এত ক'রে বলছ যখন, আজকে অন্তত যাওয়াটা স্থগিত রাখলুম, পরে কি করব বলতে পারি না।

শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ্মীবাগের মণি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। মণি স্বাস্থ্যবান যুবক। শুধু দেহ নয়, মনও তাহার বলিষ্ঠ। কলেজে পড়াশোনা শেষ করিয়া চাষ করিতেছে, চাকরি পাইয়াও চাকরি করে নাই। খুব ভাল শিকারী, কলেজে নাম-করা স্পোর্টস্‌ম্যান ছিল।

কি হে, কি খবর?

গুলাব সিং রোজ মোষ পাঠিয়ে আমার গমের ক্ষেতে চরিয়ে দিচ্ছিল। আমি দু দিন লোক পাঠিয়ে ভদ্রভাবে তাকে মানা করেছিলাম, তবু কাল আবার তার মোষ এসেছিল—

এই পর্যন্ত বলিয়া মণি চুপ করিল।

তারপর?

আমি গোটা দুই মোষ গুলি ক'রে মেরেছি কাল।

মেরেছ!

না মেরে উপায় কি, ভদ্রভাবে বললে যখন শুনবে না? আমার এক শো বিঘে গম কি ভাবে নষ্ট করেছে, আপনি যদি দেখেন গিয়ে—

তাহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

আমাকে কি করতে হবে?

গুলাব সিং দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে শুনে উৎপলবাবুর কাছে এসেছিলাম। তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, তুমি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি ক'রে দাও আপাতত।—বলিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই থানা লইয়াই কিছুক্ষণ আগে উৎপলের সহিত তাহার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা

ছাড়া কি-ই বা করিবার আছে এখন? ওই ঘুষখোর দারোগাটার কাছেই প্রতিকারের জন্য ছুটিতে হইবে।

মণি উঠিয়া দাঁড়াইল।

আপনি বলছেন যখন, যাচ্ছি আমি থানায়, কিন্তু ওতে কিছু হবে না। আমি এসেছিলাম গোটা কয়েক লাঠিয়াল সিপাহী চাইতে, বেশি নয়, গোটা দশেক সিপাহী যদি আমাকে দেন, মেরে পস্তা উড়িয়ে দিতে পারি আমি ব্যাটাদের।

আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আগে আইনত চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।

মণি উঠিয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্করের ব্যবস্থাটা তাহার মনঃপূত হইল না।

রহিম আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

হুজুর, দশঠো রূপিয়াকা বড়া—

শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত তাহাকে শান্তি দিবে না ইহারা!

হিঁয়া কি রূপিয়াকা গাছ হ্যায়? ভাগো হিঁয়াসে।

কণ্ঠস্বর অতটা উচ্চ করিতে সে চাহে নাই, কিন্তু উচ্চ হইয়া পড়িল।

রহিম সভয়ে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। তাহার ভীত চকিত দৃষ্টি শঙ্করকে কশাঘাত করিল যেন।

শুনো।

রহিম ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্যা করেগা রূপিয়া লেকে?

তিন দিনসে বালবাচ্চা সব ভুখা হ্যায় হুজুর। কুছ নেই খায়া। মোদীকা দোকানমে দশ রূপিয়া বাকি হ্যায়, ই রূপিয়া নেহি দেনেসে আর উধার নেহি মিলেগা।

সসঙ্কোচে সে থামিয়া গেল। আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চকিতে শঙ্করের মুখের দিকে একবার চাহিল। নিরুপায় শঙ্কর পকেট হইতে ব্যাগটা

বাহির করিল। দেখিল, পাঁচটা টাকা আছে। ঘরে ঢুকিয়া ড্রয়ার হইতে আরও পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া আনিল। টাকা লইয়া রহিম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর বাড়ির ভিতর গেল না। বারান্দার ক্যাম্প-চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। মনে হইল, সে যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পা দুইটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। অমিয়াকে ডাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া কোন স্বর বাহির হইল না। পাথরের মত কি একটা যেন কণ্ঠরোধ করিয়া আছে। আর একদিন ঠিক এমনই হইয়াছিল, যেদিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ আসে।...একা অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সহসা তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

২৬

শঙ্করের সহিত তর্ক করিবার পর হইতে কুন্তলা মনে মনে কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের কাছেই যেন সে ছোট হইয়া গিয়াছে। কলেজের ডিবেটিং-ক্লাবে সে তর্ক করিত, সেই অভ্যাসবশেই সেদিন সে নিজেকে সংযত করিতে পারে নাই। ভুলিয়াই গিয়াছিল, কলেজের ডিবেটিং-ক্লাবে যাহা শোভন, শ্বশুর-বাড়িতে তাহা শোভন নহে। তা ছাড়া তর্ক করিয়া লাভ কি? তর্ক করিয়া কখনও কাহারও স্বভাব বা মত পরিবর্তন করা যায় না। মুখে স্বীকার করিলেও মনে মনে যে যাহা তাহাই থাকিয়া যায়। তর্ক করিয়া সময় নষ্ট হয়, নিজের মর্যাদাও নষ্ট হয়। কুন্তলা তর্ক করা ছাড়িয়া দিয়াছে। সুরমার সঙ্গেও আর সে তর্ক করে না। সে অনুভব করিয়াছে, সুরমা তর্ক করে সত্য-উদ্‌ঘাটনের জন্য নয়, তাহার গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য। সুরমা অবশ্য কোন অভদ্রতা করে না, কোন অপ্রিয় কথা বলে না। তাহার সভ্য শিক্ষিত আচরণে এমন কিছুই প্রকাশ পায় না, যাহা লইয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে রাগ করা চলে। কুন্তলার গোঁড়ামিতে সুরমা বিস্ময় প্রকাশ করে, প্রতিবাদ করিলেও এমন সুষ্ঠু সহাস্য ভঙ্গীতে করে যে,

তাহাতে সোজাসুজি অসন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, হাসির টুকরায়, বিস্মিত ব্যাজস্তুতিতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গই তাহা বুঝিতে কুন্তলার বিলম্ব হয় না। অনেক সময় সুরমা কুন্তলার কথায় সায়ও দেয়, কিন্তু তাহা যেন বয়স্ক ব্যক্তির শিশুর অসঙ্গত কথায় সায় দেওয়ার মত। কুন্তলা তাই আর তর্ক করে না। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু, যাহাকে সে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাও সে সহ্য করিতে পারে না, তাহা লইয়া এই মূঢ়দের সহিত সে আর বচসায় প্রবৃত্ত হইবে না। টেনিস-বল লইয়া লোফালুফি করা যায়, অন্তরের বেদনা লইয়া যায় না। আজকাল সুরমার সঙ্গ তাই সে এড়াইয়া চলিতেছে। তাহার ভয় হয়, হয়তো কথায় কথায় এমন কিছু বলিয়া ফেলিবে, যাহা তাহার আদর্শের পক্ষে গ্লানিকর। ইহাদের চক্ষে নিজের আদর্শকে সে কিছুতেই কোন কারণেই খাটো করিবে না। যে স্বার্থসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোশ পরিয়া ইহারা নাচিয়া বেড়াইতেছে, সে সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতে যাওয়াটাও গ্লানিকর। ক্ষুদ্রকে ব্যঙ্গ করিতে গেলে নিজেকেও ক্ষুদ্রের পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে হয়। একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার যে অগ্রগতির প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ, সেই অগ্রগতির স্বরূপটা বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে। ও-দেশের মনীষা নানা রকম আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে সন্দেহ নাই, চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আরও চমৎকৃত হইতে হয় সে যন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া। ওই সব অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য যন্ত্র লইয়া সকলে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহা না করিলে অগ্রগতি হইবে কি করিয়া! কিন্তু প্রবন্ধ রচনা করিবার বাসনাও সে ত্যাগ করিয়াছে। সে কিছুই করিবে না, কাহারও কথায় থাকিবে না, কাহারও সহিত মিশিবে না। অনাড়ম্বরে নিজের আদর্শকে অনুসরণ করিবে কেবল, আস্ফালন করিবার প্রয়োজন কি? সে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবে থাকিবে। হরিহর পর্যন্ত কুন্তলার পরিবর্তিত আচরণে বিস্মিত। তাহার স্বামীভক্তি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান করে। হরিহর প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি টেকে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কুন্তলা

নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া নিপুণভাবে ছুরি দিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়্‌কে প্রস্তুত করিতেছিল। দুই বেলা আহারের পর হরিহরের খড়্‌কে না হইলে চলে না। এতদিন ন্যাংড়াই খড়্‌কে প্রস্তুত করিত, কোনটা বেশি সরু, কোনটা বেশি মোটা হইত। হরিহরের খুব যে একটা অসুবিধা হইত তাহা নয়, কোনদিন এ বিষয়ে কিছু বলেও নাই সে, তবু স্বামীর এতটুকু অসুবিধাই বা কুন্তলা হইতে দিবে কেন?

হরিহর আসিয়া প্রবেশ করিল।

তোমাকে নেবার জন্যে উৎপলের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে।

আমি আর এখন যাব না।

ওগুলো তো ন্যাংড়াও করতে পারে, তুমি ঘুরে এস না।

কুন্তলা কোন কথা বলিল না, কেবল, যেমন তাহার স্বভাব, হাসিভরা চোখ তুলিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

২৭

উৎপলের আজ জন্মতিথি। সমস্ত দিন শঙ্কর বাড়ি ছিল না। তাহাকে যাইতে হইয়াছিল লক্ষ্মীবাগে, মণির ব্যাপার তদন্তের জন্য। তাই দুপুরবেলা সে আসিতে পারে নাই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সুরমার চিঠি লইয়া একজন চাকর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চিঠিতে তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। সাধারণ কাগজে সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণলিপি।—

শঙ্করবাবু,

আজ আপনার বন্ধুর জন্মদিন। দুপুরে তো আপনাকে পাওয়াই গেল না। অমিয়া একা মেয়ে নিয়ে এসেছিল। আপনি সন্ধ্যায় এখানে নিশ্চয়ই আসবেন। রাত্রে আমাদের এখানেই খেয়ে যাবেন। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়। আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমরা। ইতি

সুরমা

সেদিনের পর হইতে শঙ্কর আর উৎপলের কাছে যায় নাই। উৎপলের আজ যে জন্মদিন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না। চিঠিটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া এ সঙ্কল্পও সে একবার করিল যে, যাইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না গেলে ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিবে। তা ছাড়া না যাইবার কোন সঙ্গত কারণ তো নাই। একা একা বাড়িতে বসিয়া কি করিবে এখন? অমিয়া বাড়ি নাই। দাইটা বলিল, খুকীকে লইয়া স্যানিটেশন-বিভাগের চৌধুরীদের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছে সে। চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, প্রায়ই সেখানে যায়। সুরমা কুন্তলা অথবা হাসির সহিত তাহার তেমন ভাব নাই, যত ভাব চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত। শঙ্কর বাড়ির ভিতরে জামা বদলাইবার জন্য একবার ঢুকিল। ঘরে তালা বন্ধ, সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। সমস্ত বাড়িটাই যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ছোট্ট দুইটি প্রাণী, কিন্তু সমস্ত বাড়িটাকে যেন পূর্ণ করিয়া রাখে। মুশাই বাহিরের ঘরে স্টোভ জ্বালিয়া চা করিয়া দিল। চা পান করিয়া শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল, যাইবে। মনটা তবু একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। সেদিনের ওই হাস্যজনক কাণ্ডের পর সহজভাবে উহাদের সম্মুখে সে যাইবে কি করিয়া! সেদিন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যাহা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা যুক্তির আলোকে আজ তাহার নিকটও হাস্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে।

সূর্যালোকস্পর্শে কুয়াসা যেমন বিলুপ্ত হয়, সুরমার হাসির স্পর্শে শঙ্করের মনের সমস্ত গ্লানি তেমনই নিমেষে মুছিয়া গেল যেন। অতিশয় তুচ্ছ কারণে সহসা-উদ্দীপ্ত উত্তেজনায় উৎপলের সহিত তাহার যে মনোমালিন্য ঘটিয়া গেল বলিয়া শঙ্করের ধারণা হইয়াছিল এবং যে ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন অস্বস্তিতে আশঙ্কায় বিতৃষ্ণায় ক্ষোভে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাল্পনিক বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছিল, নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া গেল স্মিতমুখী সুরমার সানন্দ অভ্যর্থনায়।

আসুন।

একটি কথা মাত্রই সুরমা বলিল। কিন্তু তাহার আলোকিত দৃষ্টি, হাস্যোজ্জ্বল অধর, অভ্যর্থনার প্রসন্ন ভঙ্গিমায় যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাতে

তাহার মনের গ্লানিই শুধু মুছিয়া গেল না, মনে রঙও ধরিয়া গেল। যে বীণার তার বহুকাল অনাহত ছিল, তাহা সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল যেন। শঙ্কর স্পন্দিত বক্ষে বিস্মিত মুগ্ধ নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া রহিল। বহুকাল পূর্বে যে সুরমা তাহাকে স্বপ্নলোকের পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সুরমাই সহসা যেন আজ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ডাক দিল, আসুন।

সেই সুরমা! দীর্ঘ দিনের ব্যবধান চকিতে অতিক্রম করিয়া পরিবর্তনের বাধাপুঞ্জ নিমেষে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া সহসা তাহার এ কি অপ্রত্যাশিত অপূর্ব আবির্ভাব! শঙ্করের বয়স সহসা যেন কমিয়া গেল। সেকালের সুরমা স্বপ্নবিহ্বল শঙ্কর পুনর্জীবন লাভ করিয়া সেকালের মোহে, সেকালের বিস্ময়ে, সেকালের আকুলতায় আত্মহারা হইয়া ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রবলে যেন রূপকথার দেশে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্যই।

লোকগুলোর কাণ্ড দেখেছ!

উৎপলের কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ চুরমার হইয়া গেল সব। উৎপলকে সে দেখিতে পায় নাই, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই এতক্ষণ সচেতন ছিল না সে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, প্রশস্ত হলটার কোণে একটা সোফায় ঠেস দিয়া উৎপল বসিয়া আছে। গায়ে কারুকার্যমণ্ডিত দামী একখানা শাল, হাতে লাল রঙের ছোট একখানা বই, চোখে মুখে চাপা হাসি। শিয়রের দিকে টেবিলের উপর সুদৃশ্য একটা বাতিও জ্বলিতেছে।

আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি।

সুরমা চলিয়া গেল।

কি কাণ্ডর কথা বলছ?

শঙ্কর আগাইয়া গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

এই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের—

লাল বইখানা তুলিয়া দেখাইল সে। পেঙ্গুইন সিরিজের বই, 'সায়েন্স ইন ওয়ার'। শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

কি কাণ্ড! কোথায় আধ্যাত্মিক চিন্তা করবে, তা না কাঠ থেকে চিনি করছে, বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে নাইট্রেট তৈরি ক'রে ও

দিয়ে বোমা বানাচ্ছে! সিন্‌থেটিক রবারই বানিয়ে ফেললে। সিন্‌থেটিক সিল্ক।

উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং টেবিল হইতে সিগারেট-কেসটা তুলিয়া বলিল, যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা ব্যাটাদের। এই নাও।

সিগারেট-কেসটা আগাইয়া দিল। পরক্ষণেই সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার।

ও, আই অ্যাম সরি, মনেই ছিল না।

নিজে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইল, তাহার পর চোখের দৃষ্টিতে হাসি বিকিরণ করিয়া বলিল, কতদিন এ কৃচ্ছ্রসাধন চলবে তোমার?

যতদিন চালাতে পারি।

উৎপল ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া আবার নামাইয়া লইল, কোন কথা বলিল না। শঙ্করও চুপ করিয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না, সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল।

কুন্তলা এ বেলাও এল না।

ও।—উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটা টান দিল।

আর একটা কথা শুনেছ? শঙ্কর সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে।

ভালই তো।

উৎপল শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চোখে মুখে ছদ্ম-উদ্বেগ ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল, মাছ মাংস খাচ্ছিস তো?

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। সুরমার সম্মুখে উৎপলের এ ব্যঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে। কোন উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল শুধু।

চা খাবেন?—সুরমা প্রশ্ন করিল।

না, এইমাত্র খেয়ে আসছি।

উৎপলের চোখের দৃষ্টি পুনরায় কৌতুক-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টির

অর্থ—ও, চা-টা ছাড় নি তা হ'লে? ভাল। শঙ্করও সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, মনে মনে আরও একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

সুরমার দিকে চাহিয়া উৎপল বলিল, অকূল সমুদ্রে প'ড়ে ও একটা ভেলা খুঁজছে, উদ্ধার কর ওকে।

শঙ্করবাবু সমর্থ লোক, সমুদ্রে যদি প'ড়েই থাকেন, সাঁতরে পার হয়ে যাবার শক্তি আছে ওঁর। ভেলার দরকার হবে না।

আহা, তবু একটা ছুঁড়ে দিতে ক্ষতি কি! বিশেষ কিছু করতে হবে না, একটা গান কর শুধু। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হবে। তোমার চেয়ে ওকে আমি বেশি চিনি।

স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিয়া শঙ্করও হাসিয়া বলিল, গান শুনতে আপত্তি নেই। করুন না একটা গান, অনেক দিন গান শুনি নি আপনার।

উৎপল ফরমাশ করিল, কাল রবিবাবুর যে গানটা শিখলে সেইটে ধর। উৎরেছে গানটা।

সুরমার চোখে মুখে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। পরদা সরাইয়া সে পাশের ঘরে গেল এবং অর্গ্যানের ডালাটা তুলিয়া বসিল। একটু বাজাইয়া ধরিল।—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন পড়ে মনে, ভুলো না।
ভুলো না ভুলো না ভুলো না…

অন্ধকার রাত্রে শঙ্কর হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। সুরমার কণ্ঠস্বর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তাহার অন্তরের গভীরতম স্তরে যে ছন্দ-স্পন্দন তুলিয়াছিল, তাহারই আবেশে আত্মহারা হইয়া সে পথ চলিতেছিল। একের পর এক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানই আজ সুরমা গাহিয়াছে, সকলগুলিরই নিগূঢ় আবেদন এক। হে প্রিয়, হে দয়িত, কোথা তুমি, কত আয়োজন করিয়া যুগ-যুগান্ত যে তোমার জন্যই বসিয়া আছি। জানি

বিজন ঘরে আঁধার রাতে একদিন তুমি আসিবে, সকল কাঁটা ধন্য করিয়া গোলাপ হইয়া একদিন তুমি ফুটিবে, তোমার পায়ের শব্দ, তোমার গন্ধ পাইতেছি, তোমার জন্যই যে আকাশ ভরিয়া নক্ষত্রের দীপালী তাহা জানি, বনে বনে কুসুম-কিশলয়ের উৎসব তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, শুক্লা একাদশীর মধ্যরাত্রে নিদ্রাহারা শশী তোমার পথ চাহিয়াই স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া বাহিতেছে, কিন্তু হে প্রিয়, আভাসে-ইঙ্গিতে স্বপ্ন-কল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আর কতকাল লুকাইয়া থাকিবে তুমি? আগ্রহে অধীর হইয়া আর কতকাল অপেক্ষা করিব? মূর্ত হও, হে জীবনবল্লভ, দেখা দাও, ধরা দাও। তোমাকে পাইয়াও যে পাই না। একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, সেইটুকু লইয়া আর কতদিন ফাল্গুনী-স্বপ্ন রচনা করিব? কোথায় তুমি, কবে আসিবে? হয়তো নিশীথ-রাতের বাদলধারার সুরে আমার একলা ঘরে চুপে চুপে তুমি আস, কিন্তু তখন চোখে আমার ঘুম, চারিদিকে অন্ধকার, তোমাকে কাছে পাইয়াও পাই না। যখন জাগিয়া উঠি তখন দেখি, তুমি নাই, দখিন হাওয়াকে পাগল করিয়া আঁধার ভরিয়া তোমার গন্ধ কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তুমি চলিয়া গিয়াছ। আকুল চিত্তে কল্পনা করি, তোমার মালার পরশ আমার বুকে লাগিয়াছিল কি···

রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুর, সুরমার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সুরমা বিশেষ করিয়া এই গানগুলিই গাহিল কেন? তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই গাহিল কি? সুরমার অন্তরের অন্তস্তলে মন কোন কথা কি লুকানো আছে যাহা সহজ ভাষায় সে বলিতে পারে ..যাহা সহজ ভাষায় বলা যায় না, যাহার রূপ-রস-নিবিড়তা একমাত্র গানের সুরেই প্রকাশ করিতে পারে? আশ্চর্য কি! হয়তো আছে। কিন্তু···। কিন্তু'-ভাব কিন্তু বেশিক্ষণ রহিল না। ঈষৎ জাগ্রত বিবেককে সম্মোহিত করিয়া তাহার মন চিরন্তন পুরুষোচিত সেই স্বপ্ন সৃজন করিতে লাগিল, যে স্বপ্নে সামাজিক নীতির ভেজাল নাই, সংস্কারকের সংযম যাহাকে কুণ্ঠিত করিতে পারে না, অবিমিশ্র আবেগে যাহা চিরকাল সুস্থ পুরুষের মর্মমূলে বিষ উৎসারিত করিয়া আসিয়াছে, আদিম উদ্দাম প্রেরণায় স্বকীয়া-পরকীয়ার

কৃত্রিম গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা নরনারীর আপাত-সামাজিক বন্ধনকে যুগে যুগে শিথিল করিতেছে, চিরকাল করিবে। বহুকাল পরে অকস্মাৎ শঙ্করের চিত্ত সুরমাকে ঘিরিয়া স্বপ্নমধুর হইয়া উঠিল। শুধু মধুর নয়, মদিরও। সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করিল, তাহার অন্তরতম সত্তা দেশের দুঃখে এতটুকু ম্রিয়মাণ নয়। বাহিরে সে একটা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে শুধু। তাহার সংস্কারকের কর্তব্যবোধ মাত্র, অন্তরতম সত্তার সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। যে নিগূঢ় বেদনা আজ বহুকাল পরে সত্যই তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারিয়াছে তাহা পল্লীবাসীর দুঃখজনিত বেদনা নয়, তাহা বিরহ-বেদনা। সুরমার গান শুনিয়া তাহার অন্তর বেতসপত্রের ন্যায় আজ যে আকুলতায় কম্পিত হইতেছে, সুরমার মনের কথাটি জানিবার জন্য অবুঝের মত যে আগ্রহে সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, সে আকুলতা সে আগ্রহ কি তাহার দেশসেবায় ফুটিয়াছে কখনও? দেশকে ঘিরিয়া এমন তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি জাগিয়াছে? সুরমার সান্নিধ্যে আজ তাহার অন্তর যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইল, এমন কি দেশের কাজে কোনদিন হইয়াছে? সত্যটা আবিষ্কার করিয়া মনে মনে সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং পর-মুহূর্তে তাহার রাগ হইল। সে শুধু নিজের উপর নয়, দেশের শিক্ষা-দীক্ষার উপর, এমন কি রবীন্দ্রনাথের উপরও।

তাহার মনে হইল, তাহার চিত্তকে এমন উন্মনা স্বপ্নবিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথই। কবিই দেশের চিত্ত-গঠন করেন। এ কি করিয়াছেন তিনি! পেলব মধুর ভাষায়, মর্মস্পর্শী ছন্দে সুরে মানব-মনের প্রেম-বিহ্বলতাকে না-পাওয়ার আকুলতাকে, সুদূরের পিপাসাকে রূপে রসে রঙে এমন মনোহারিণী করিয়া গিয়াছেন যে, দেশের সমস্ত যুবক-যুবতী ভাবাকুললোচনে কল্পনার কুঞ্জকুটিরে আজ কেবল স্বপ্ন দেখিতেছে। বলিষ্ঠতা কোথাও নাই, কেবল স্বপ্ন। অর্জুন একজনও নাই, ঘরে ঘরে কেবল রাধা। একটা তূর্যধ্বনি শোনা যায় না, চারিদিকে কেবল বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-সঙ্গীত লিখিয়াছেন, 'নৈবেদ্য' রচনা করিয়াছেন, নানা প্রবন্ধে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন, "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সে সব রচনা দেশের মনে প্রেরণা দিতে পারিল কই? দেশ যত আবেগভরে "মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি—সখি জাগো" গাহিল, ঠিক তত আবেগভরে কি "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গাহিতে পারিল? হুজুকে মাতিয়া দুই-চারিদিন হয়তো গাহিয়াছিল, কিন্তু সে গান তাহাদের মর্মে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মর্মে প্রবেশ করিয়াছে "কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া নামে"। কেন? শঙ্করের সন্দেহ হইল, হয়তো রবীন্দ্রনাথই ঠিক তেমন প্রাণ ঢালিয়া ওই দেশাত্মবোধক রচনাগুলি লেখেন নাই, ওগুলি সুললিত সুন্দর রচনা, কিন্তু ওগুলিতে ঠিক যেন তাঁহার প্রাণের সুর বাজে নাই, তাই দেশের কর্ণে প্রবেশ করিলেও দেশের মর্মে উহারা প্রবেশ করিতে পারিল না। তিনি অচিন পথের উন্মনা পথিক ছিলেন, বাউল সুফি মরমিয়া। দেশকে নয়, প্রিয়কে সুন্দরকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন, ধ্যান করিয়াছেন। পচা পানাপুকুরের পঙ্কোদ্ধারের কথা তিনি মাঝে মাঝে চিন্তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে 'সোনার তরী ভাসাতেই' তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কালিদাসের ভাববিলাস অথবা বৈষ্ণব কবিদের কান্ত কোমলতা ভারতে যে স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে স্বাস্থ্যকর ছিল,—পরাধীন নিরন্ন ভারতের পক্ষে তাহা যে মারাত্মক, সে খেয়াল থাকিলেও তাহার প্রতিবিধান করিবার উপায় তাঁহার হাতে ছিল না; কারণ নিজের সংস্কারকে, নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না—কোন কবিই পারেন না। কোকিলের গান যদি কোন কারণে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হয়, কোকিল কি নিজের সুর বা স্বর পরিবর্তন করিতে পারে?...

সমস্ত দোষটা রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া নিপুণভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া শঙ্কর যেন নিজের কাছেই জবাবদিহি করিল। পতনের কারণ নির্ণয় করিয়া পতনের গ্লানি হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাইল,—একটুও অনুতপ্ত হইল না। সুরমার হাসি, গান, মার্জিত আলাপ, তন্বী দেহশ্রী, শাড়ির রঙ, অলকের কম্পন, অপাঙ্গের মাধুর্য ঘিরিয়া যে কল্পলোকে তাহার মুগ্ধ মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল, সে কল্পলোকে কল্পনাই

সম্রাজ্ঞী, যুক্তির স্থান সেখানে নাই। পুলকিত চিত্তে শঙ্কর আবিষ্কার করিল, তাহার যৌবন এখনও সজীব আছে, যে ভয়ে সে কলিকাতায় চুন্‌চুনের সহিত দেখা করে নাই, তাহা তাহার লুব্ধ বাসনারই ভীত রূপ। তাহার কবি-মানসে সে মানসী-লিপ্সা চিরকাল চিরন্তনী প্রিয়ার স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে, তাহা মরে নাই—প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সহসা সুরমাকে ঘিরিয়া তাহা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। মুগ্ধ মদির হৃদয়ে সে পথ চলিতে লাগিল। শীতের আকাশে শীর্ণ চাঁদ উঠিয়াছে; দূর রাস্তায় ক্যাঁচক্যাঁচ করিয়া গরুর গাড়ি চলিয়াছে, সমস্ত পল্লী ধূম ও কুয়াসায় আচ্ছন্ন, শিউলিফুলের এক ঝলক গন্ধ যেন কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল। "আজি মম অন্তর-মাঝে কোন্ পথিকের পদধ্বনি বাজে"—মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতেছে সুরমার গানের সুর। একটা নিদারুণ চীৎকারে সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনের সুরটা কাটিয়া গেল। বিরক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠিল। কে এমন বেসুরা চীৎকার করিতেছে? চাহিয়া দেখিল, পাশেই মুশাইয়ের বাড়ি, চীৎকারটা সেখান হইতেই আসিতেছে। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া ডাকিল। হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিল যমুনিয়া। তাহার রুক্ষ চুল, ছিন্ন বসন অসম্বৃত। এমন সময় এখানে শঙ্করকে দেখিতে পাইবে, সে প্রত্যাশা করে নাই। শঙ্করকে দেখিয়া তাহার দুঃখ যেন আরও উথলাইয়া উঠিল। কাপড় সামলাইবার কথা পর্যন্ত তাহার মনে রহিল না, অসম্বৃত বসনেই সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুশাই তাহাকে মারিতেছে, এইমাত্র কোথা হইতে সে 'পিইয়া' আসিয়াছে। ম্লান জ্যোৎস্নার স্বল্পালোকেও শঙ্কর দেখিতে পাইল, যমুনিয়ার পাঁজর গোনা যায়, জীর্ণ বুকে হাড়গুলা উঁচু হইয়া রহিয়াছে, স্তনযুগল শুষ্ক বিশীর্ণ—যেন রুগ্ন পুরুষমানুষের বুক। নিজের ভাষায় যমুনিয়া বকিয়া চলিয়াছিল। অত দাম দিয়া মুশাইকে সেদিন একটা ''মোটিয়া' কিনিয়া দিল, কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে—কোনও ছুঁড়ীকে দিয়া আসিয়াছে কি না, তাহারই বা ঠিক কি! ইহার জন্য সে কিন্তু কোন অনুযোগ করে নাই, সে 'কিরিয়া খাইতে' (শপথ করিতে) প্রস্তুত আছে, বরং নিজের গায়ের চাদরখানা তাহাকে দিতে গিয়াছিল, তখন অবশ্য

বলিয়াছিল, নে, এটাও নে, আমার যথাসর্বস্ব গ্রাস কর্‌ তুই। এই কথাতেই তাহাকে মারিতে শুরু করিয়া দিল, চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মুক্কা, থাপ্পর, লাত (কিল, চড়, লাথি)।···শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝখানে 'ঘুর' জ্বলিতেছে, তাহার পাশে মুশাই দাঁড়াইয়া আছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, আরক্ত চক্ষু।

যমুনিয়াকে কেন মেরেছিস?

মুশাই সাধারণত নীরবপ্রকৃতির। কিন্তু মদের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, হমারা খুশি।

খুশি?

ঠাস করিয়া তাহার গালে শঙ্কর প্রচণ্ড একটা চড় বসাইয়া দিল। মুশাই পড়িয়া গেল।

ওঠ্, ওঠ্ শিগগির, খুন ক'রে ফেলব তোকে আজ।

মুশাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং নতমস্তকে বসিয়াই রহিল। উঠানের এক কোণে শুষ্ক মুখে যমুনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, আব ছোড়ি দে বুমু, পিলোছে (এবার ছেড়ে দে বাবা, মদ খেয়ে ও-রকম করছে)।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, যমুনিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, শুধু ভয়ে নয়, শীতেও। গায়ে কাপড় নাই, নিজের একমাত্র গায়ের কাপড়খানি মাতাল চরিত্রহীন স্বামীকে দিয়াছে। শঙ্কর নিজের গায়ের র‍্যাপারটা খুলিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। চেঁচামেচিতে যে দুই-চারিজন পাড়ার লোক বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ফুলশরিয়া একজন। শঙ্কর কাহারও দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। ফুলশরিয়া অবাক হইয়া গেল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, অমিয়াও তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া আছে। খুকীকে ঘাড়ের উপর শোয়াইয়া পায়চারি করিতেছে। আসন্নপ্রসবা সে, নিশ্চয়ই কষ্ট হইতেছে।

এখনও ঘুমোও নি?

খুকীর পেটব্যথা করছে, কিছুতে ঘুমুচ্ছে না। পারুলের বাড়িতে পানফল-টল খেলে কতকগুলো যা-তা—

শঙ্করের সাড়া পাইয়া খুকী মাথা তুলিল এবং ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, পেত ব্যাতা কত্‌তে।

এস আমার কাছে।

সমস্ত দিন একটিবারও আজ সে বাবাকে পায় নাই, একমুখ হাসিয়া ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল।

সুরমার মোহ স্বপ্নের মত ভাঙিয়া গেল!

সে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামিল, না, মর্ত্য হইতে স্বর্গে উঠিল, বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে যখন উঠিল, তখন দেখিল, মনের আকাশ নির্মেঘ। কম্প দিয়া যে জ্বরটা সহসা আসিয়াছিল, তাহা সহসাই ছাড়িয়া গিয়াছে। মুশাই আসিয়া প্রবেশ করিল এবং অন্য দিনের মত টেবিল ঝাড়িতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই।

২৮

'তুমি' অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিনিদ্র-নয়নে হাসি একা জাগিয়া আছে। ভাবিতেছে। রোজই ভাবে। ভাবে, কোথায় সে ভাসিয়া চলিয়াছে, কি তাহার জীবনের পরিণাম? বিহার-পল্লীর একটা তুচ্ছ স্কুলের নগণ্য শিক্ষয়িত্রীরূপেই কি তাহার জীবনের অবসান হইবে? শঙ্করবাবুর আগ্রহাতিশয্যে সে আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে এতদিন কাটিয়াও গেল, ফল কি হইল? কিছুই না। শিক্ষার যে আদর্শ লইয়া সে আসিয়াছিল, সে আদর্শে মনের মত করিয়া একটা মেয়েকেও সে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না, শিখাইবার উপায় নাই। একপাল মেয়ে সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসে যেন তাহারই মাথা কিনিবার জন্য। পড়াশোনায় কাহারও মন নাই। মেয়েদের অভিভাবকরাও এ বিষয়ে খুব সচেতন নন। দুই দিন পরে তো বিবাহ হইয়া যাইবে, লেখাপড়া কত আর শিখিবে! শঙ্করবাবুর খাতিরে, অনেকটা চক্ষুলজ্জাবশত, যেন তাঁহারা মেয়েদের স্কুলে পাঠান। খানিকটা ফ্যাশানের

প্রতিরেও বটে। আজকাল সভ্য-সমাজে টর্চ, হাতকাটা কামিজ, বাটারফ্লাই গোঁফের মত মেয়েদের 'লিখাপঢ়ি' শেখানোটাও একটা ফ্যাশান হইয়াছে। 'বংগালী' বাবুরা তাঁহাদের 'লেড়কি'দের লেখাপড়া শিখাইতেছেন, তাহাদের লেড়কিরাও শিখুক যতটা পারে—ক্ষতি কি? ইহাই অধিকাংশ লোকের মনোভাব। আমরাই বা কম কিসে, এ মনোভাবও কয়েকজন শিক্ষিত 'ফীলিংওয়ালা' বিহারীর আছে। কিন্তু ওই ফীলিং-দুষ্ট মনোভাবটুকুই আছে, যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে হইলে যে আগ্রহ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা নাই। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বাড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টরের কাছে বাহাদুরি লইবার জন্যই তাঁহারা ব্যগ্র। স্কুল-কমিটীর কে মেম্বার হইবে এবং মেম্বারদের মধ্যে কে সেক্রেটারি হইবে, তাহা লইয়াই সকলে ঝগড়া করিয়া মরিতেছে আর এস.ডি.ও.র খোশামোদ করিতেছে। তাহারা যে স্কুল এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন, তাহা প্রমাণ করিবার একটিমাত্র উপায় তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, স্কুলের নানা খুঁত ধরিয়া গোপনে ইন্‌স্পেক্টরের নিকট দরখাস্ত করা। খুঁতও সব অদ্ভুত ধরনের। সেদিন কে একজন লিখিয়াছে, বিদ্যালয়ের হাতায় ঘাস গজাইয়াছে, পরিষ্কার করানো হয় নাই, শিক্ষয়িত্রীর গাভীটিকে চরিবার সুবিধাদান করিবার জন্য কি স্কুলের হাতাটিকে জঙ্গলে পরিণত করা উচিত? মাসিক পনেরো টাকা কন্‌টিন্‌জেন্সির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য একজন মোক্তার মেম্বার বদ্ধপরিকর। খড়ি, কাগজ, কলম, দোয়াত, নিব প্রত্যেকটি কবে কেনা হইয়াছে, কেন কেনা হইয়াছে, নির্ভরযোগ্য রসিদ আছে কি না, থাকিলেও এত ঘন ঘন কেনা হইয়াছে কেন—এই সব লইয়া তিনি তাঁহার শাণিত আইনজ্ঞানের এমন সুতীব্র পরিচয় দিতেছেন যে, হাসি উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে ভাল বই আনাইবার উপায় নাই। বিহারী লেখকের লেখা বিহারী প্রকাশকের প্রকাশিত বই সর্বাগ্রে আনাইতে হইবে। তাহা কিনিতেই টাকা ফুরাইয়া যায়, ভাল বই কেনা হয় না। হাসি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিরক্ত হইয়াছে, শুধু বিরক্ত নয়, অপমানিতও বোধ করিয়াছে তাহার প্রতি সকলের অনুকম্পা প্রদর্শনে। সকলের ভাবটা যেন, আহা, স্কুলটা চলুক, আর কিছু না হোক, একজন গরিব বিধবার

অন্নসংস্থান হইতেছে তো, বেচারীর একটা ছেলেও আছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য নয়, তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেও নয়, তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সকলে স্কুলটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। শিক্ষিত বিহারী মেম্বারগণ আবার আইনের কষ্টিপাথরে বারম্বার যাচাই করিয়া দেখিতেছেন, মহিলাটি প্রকৃতই তাঁহাদের, অর্থাৎ বিহারীদের, দয়া পাইবার উপযুক্ত কি না! 'পাব্লিক মানি' লইয়া ছিনিমিনি খেলা তো উচিত নয়। খুঁত ধরা পড়িয়াছে, সে 'হিন্দী-নোইং' নয়। শঙ্করবাবু তাহাকে হিন্দী পরীক্ষা পাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। পরীক্ষা পাস করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সে পরীক্ষা দিবে না। এই তুচ্ছ কাজের জন্য সে আর একবিন্দু শক্তি ক্ষয় করিবে না। মৃন্ময়ের সহধর্মিণীর এই কি উপযুক্ত কাজ? তাহার সঙ্কল্প—মৃন্ময়ের সহধর্মিণী হইবে সে, মৃন্ময়ের আদর্শকেই জীবনে সফল করিয়া তুলিয়া ধরিবে। কি সে আদর্শ? ত্যাগ। ন্যায়ের সমর্থন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি জীবনও। এই ত্যাগের স্বপ্ন দেখিয়াই সে এই অপরিচিত পল্লীগ্রামে শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছিল। শঙ্কর তাহাকে বুঝাইয়াছিল, নারীত্বের যে লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে গিয়া মৃন্ময় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, সে লাঞ্ছনার সত্যকার প্রতিকার স্ত্রী-শিক্ষায়। এই স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে হাসি যদি সাহায্য করে, ইহার জন্য সে যদি সুখ সুবিধা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলেই মৃন্ময়ের আত্মা তৃপ্ত হইবে। স্বার্থত্যাগ করিতেই হাসি আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে এতদিন কাটাইয়া সে অনুভব করিতেছে যে, দেশের সমস্ত জনসাধারণকে মনুষ্যত্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে অবমানিত নারীত্বকে উন্নত করা যায় না। শঙ্করবাবু একা কি করিবেন? গদাই দত্ত, নেকি মাড়োয়ারী, গুলাব সিং, প্রমথ ডাক্তার, সুখদেও মোক্তার যে স্কুলের পরিচালকবর্গ, সে স্কুলের হাজার স্বার্থত্যাগ করিয়াও কিছু করা যাইবে না। পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিলে যদি ভাঙিয়া পড়িত, মাথা কুটিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাসি বুঝিয়াছে, মাথা কুটিয়া মাথা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেও এ অনড় প্রাচীর নড়িবে না, তাহার কাণ্ড দেখিয়া লোকে শুধু হাসিবে। শুধু স্কুল-কমিটির দোষ নয়, গভর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের

আইনও প্রকৃত শিক্ষার অনুকূল নয়। ভিতরে 'পলিসি' আছে। হাসির স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার নামে কতকগুলা বর্বরের খোশামোদ করা কি ত্যাগ? ইহাতে কি মহত্ত্ব আছে? ইহা তো ভণ্ডামির নামান্তর, ত্যাগের অজুহাতে নিজেকে খর্ব করিয়াও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকা। ত্যাগ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ সে এক দিনের জন্যও পায় নাই। সমস্ত অন্তর ভরিয়া কেবল গ্লানি, ক্ষোভ আর হতাশাই তো হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে শান্তি পাইবে? স্বার্থত্যাগ করিয়া, আত্মত্যাগ করিয়া, বৃহৎ একটা কিছু করিয়া স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে, প্রয়োজন হইলে সে ছেলের দিকেও ফিরিয়া চাহিবে না। প্রতিদিন রাত্রে মৃত মৃন্ময়ের উদ্দেশ্যে এই একই কথা সে রোজ লেখে, আজও লিখিয়াছে, আজও সে তাহাকে আশ্বাস দিয়াছে—তুমি অপেক্ষা কর, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমিও তোমার অনুপযুক্ত ছিলাম না, যে সিংহাসনে স্বর্ণলতাকে বসাইয়াছিলে, সেখানে আমারও কিছু অধিকার আমি দাবি করিতে পারিতাম। কিন্তু কি করিয়া প্রমাণ করিবে? কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে, কে তাহাকে সেই মহাদেবীর মন্দিরে লইয়া যাইবে, যে মহাদেবীর পূজাবেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিলে অশান্ত হৃদয় শান্তিলাভ করে, অধন্য ধন্য হয়, অপূর্ণ পূর্ণতা লাভ করে? ধাত্রী পান্না, জোয়ান অব আর্ক যে পথে চলিয়াছিল, কোথায় সে পথ?

বিনিদ্র-নয়নে হাসি ভাবিতেছিল। রোজই ভাবে।

২৯

এই, নাও লে আও।

খেয়াঘাটের নৌকাটা ঘাট ছাড়িয়া প্রায় নদীর মাঝামাঝি চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে নটবর ডাক্তার নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য সময় হইলে জানকী মাঝি অবিলম্বে নৌকা তীরে ভিড়াইয়া নটবর

ডাক্তারকে তুলিয়া লইত, আজ কিন্তু সে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। প্রথমত নৌকায় নেকি মাড়োয়ারীর একটা 'বরিয়াত' রহিয়াছে, দ্বিতীয়ত রহিয়াছেন স্বয়ং দারোগা সাহেব। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চটানো গরিব জানকীর পক্ষে শক্ত। নেকি মাড়োয়ারীর কাছে আপদে বিপদে হাত পাতিতে হয়, তা ছাড়া সুশৃঙ্খলায় 'বরিয়াত'টা পার করিয়া দিলে হয়তো কিছু বকশিশও আজ মিলিতে পারে। আর দারোগা সাহেব তো স্বয়ং সম্রাটেরই প্রতিনিধি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজদ্রোহেরই সামিল। অথচ নটুটুবাবুকে ফেলিয়া যাওয়াও যে অসম্ভব। গরিবের 'মাই-বাপ' তিনি। জানকী বেচারা একটু বিপদে পড়িয়া গেল। অনুমতির প্রত্যাশায় সে একবার নেকি মাড়োয়ারীর দিকে, একবার দারোগা সাহেবের দিকে চাহিল। নেকি মাড়োয়ারী চতুর লোক, সহসা 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিল না। দারোগাজীর সহিত নটবর ডাক্তারের ঠিক কি সম্পর্ক আছে জানা তো নাই, চট করিয়া কিছু একটা বলিয়া শেষে ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবার মত বোকা লোক সে নয়। তাহার স্থূলকায় পুত্র 'কানাহাইয়া' চোখ পাকাইয়া জানকীকে নৌকা ভিড়াইতে মানা করিতে যাইতেছিল, নেকি গোপনে পুত্রের গা টিপিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। নেকি মাড়োয়ারীর মনের ইচ্ছাটা অবশ্য নটবর ডাক্তারকে না লওয়া, লোকটা ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকাতে উঠিবে, বরিয়াত জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বমুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার মত সাহস সে সংগ্রহ করিতে পারিল না। দারোগা সাহেব কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সোৎসুক বিপন্ন দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দারোগা সাহেব ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিলেন।

চলো তুম। ডাক্‌টরবাবু দেরি করকে আয়েঙ্গে, পিছে যায়েঙ্গে।

এই, নাও ঘুরাও।

বজ্রনির্ঘোষে নটবর আবার হাঁক দিলেন।

জানকী লগি ঠেলিতে ঠেলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ডাক্তারবাবুর পাহাড়ী ঘোড়াটা ঘাটে অধীরভাবে পরিক্রমণ করিতেছে। ঘোড়াটা দেখিয়া সহসা জানকীর মনে দুই বৎসর আগেকার একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল

অন্ধকার গভীর রাত্রি, আকাশে ঘন-ঘটা, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে, ঝড় উঠিয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। দুর্যোগ মাথায় করিয়া দুর্গম পথে এই পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া নটবর ডাক্তার ছুটিয়া চলিয়াছেন—তাঁহারই বাড়ির উদ্দেশে চলিয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র জ্বরে অচৈতন্য। গরিব শুনিয়া হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিতে রাজী হন নাই, কবিরাজজীও আসিলেন না, নটুটুবাবু কিন্তু শুনিবামাত্র ঘোড়ায় সওয়ার হইলেন, 'ঝড়-ঝাপটি' কিছু মানিলেন না, আসিয়া বিনা পয়সায় 'জকসন' দিলেন, ঔষধ খাওয়াইলেন—ছেলে তাহার বাঁচিয়া গেল।

আরে, নাও ঘুরাতা হ্যায় কাহে ফের?

জানকী আইনসঙ্গত অজুহাত একটা খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, নৌকায় জল জমিয়া গিয়াছে, জল তুলিয়া ফেলিবার পাত্রটা সে ঘাটে ফেলিয়া আসিয়াছে, সেটা না লইলে যদি জল বেশি জমিয়া যায়, মাঝ-দরিয়ায় তাহা হইলে—। কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না। নেকি শশব্যস্ত হইয়া বলিল, নেহি নেহি, লে লেও ভাই, দো-পাঁচ মিনিটমে কেয়া হর্জা হোয়েগা।

দারোগা সাহেব কিছু বলিলেন না। স্বল্পভাষী লোক তিনি। নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। নটবর ডাক্তার ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন এবং জানকীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ক্যা রে, কানমে আজকাল কম শুনতা হ্যায়? জানকী একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসিল। নৌকায় চড়িয়াও ঘোড়ার পিঠ হইতে নটবর নামিলেন না। জানকী জল তুলিবার পাত্রটা লইয়া আসিল।

রাম রাম ডাক্টারবাবু।

দন্ত বিকশিত করিয়া নেকি মাড়োয়ারী অভিবাদন করিল।

রাম রাম, শেঠজীর খবর কি, ছেলের বিয়ে নাকি?

আপলোককা কিরপা।

দারোগা সাহেবও নটবরকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতি-নমস্কারান্তে নটবর বলিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই

হ'ল। আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম, হরিয়াটার নামে কি আপনি বি.এল. কেস করেছেন ?

হ্যাঁ। ও-ব্যাটা তো একের নম্বর লুচ্চা গুণ্ডা। শঙ্করবাবু জামিন হয়ে ছাড়িয়ে দিলেন, তা না হ'লে ওই থেফ্‌ট চার্জেই ফাঁসাতাম ওকে।

নটবর ডাক্তারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং অনেকক্ষণ কুঞ্চিত হইয়াই রহিল।

বি.এল. কেস প্রমাণ করতে পারবেন ওর বিরুদ্ধে ?

নিশ্চয়।

দারোগাবাবুর আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া নটবর মনে মনে হাসিলেন, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। চোখের দৃষ্টি যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ও বাবা! হরিয়াটা কাল গিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। যদিও নবাগত দারোগা সাহেবের সঙ্গে তেমন আলাপ নাই, তবু ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে একবার বলিলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে বোধ হয়। এখন দেখিতেছেন, লোকটির কর্তব্যজ্ঞান বেশ টনটনে। এ ধরনের জীবরা ভদ্রলোকের মর্যাদা বোঝে না। ইহাদের কাছে কোন অনুরোধ করা বৃথা। আর কিছু বলিলেন না, ঘাড় ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একটু হাসিও পাইল। হরিয়া লুচ্চা এবং গুণ্ডা! ছুঁচ এবং চালুনির গল্পটা মনে পড়িল।

৩০

উত্তেজিতভাবে নিপুদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমাকে তুমি মিছিমিছি আটক রাখলে শঙ্কর, এখানে কোন কাজ করা অসম্ভব।

আবার কি হ'ল ?

রামলাল পড়বে না!

কেন ?

বহুমাইজী মানা করেছে।

নিপুদা ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল।

বহুমাইজী মানে কুন্তলা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার কে? এম.এ. পাস করলে কি হবে, সেকেলে বুর্জোয়া সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি এখনও। হাজার হোক, বামুনের মেয়ে তো, কামারের ছেলে লেখাপড়া শিখছে—বরদাস্ত করতে পারছেন না সেটা।

নিপুদা কায়স্থ-সন্তান, ব্রাহ্মণদের উপর ভীষণ রাগ, সুযোগ পাইলে ছোবল দিতে ছাড়েন না। নিপুদার কথায় ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্করের কান ঈষৎ গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছু বলিল না সে। নিপুদার চালচলন কথাবার্তা কিছুই তাহার ভাল লাগে না, তবু তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই। তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ একরূপ খোশামোদ করিয়াই আবার তাহাকে রাখিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে, নিপুদা না থাকিলে অনুন্নতদের উন্নত করিবার ভার কে লইবে? পল্লী-উন্নয়নের উহাই যে একটা প্রধান অঙ্গ। নিপুদার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না। এ পল্লীগ্রামে কেহ আসিতেই চাহিবে না। আসলে অসহায় নিপুদার প্রতি অনুকম্পাবশতই যে তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই, এ কথা নিজের কাছেও শঙ্কর স্বীকার করিতে চায় না। নিপুদা সত্যই উপযুক্ত লোক, অভাবের চাপেই মনটা বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোক যে, তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা যুক্তি দিয়া নিজের মনকে বুঝাইয়াছে যে, এ দেশের স্বার্থের জন্যই নিপুদার থাকা প্রয়োজন। যদি মন দিয়া কাজ করেন, সত্যই অনুন্নত শ্রেণীর অনেক উপকার হইবে। ডোমপাড়ার নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পাঠশালা খাড়া তো করিয়াছেন। অনুন্নতদের উন্নত করিতে না পারিলে যে দেশের উন্নতি অসম্ভব, তাহা শঙ্করের অনেক দিনের বদ্ধমূল ধারণা। তাহাদের জন্যই সে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা করিয়াছে। স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের বাসস্থানের চতুর্দিক পরিষ্কার করাইয়াছে, ভ্যাক্‌সিন দেওয়াইবার জন্য, কুইনিন বিতরণ করিবার জন্য চৌধুরীকে নিযুক্ত করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর একটি

বালকের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি-স্থাপনও করিয়াছে। কামার কুমোর তেলী অথবা নিম্নতর কোন বর্ণের বালক যদি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে এম.এ. পর্যন্ত পড়িবার খরচ উৎপলের এস্টেট হইতে দেওয়া হইবে। বালকটির সহিত একটি শর্ত থাকিবে কেবল—উপার্জনক্ষম হইলে টাকাটা তাহাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে, সেই টাকায় ভবিষ্যতে যাহাতে আর একটি ছেলের পড়া হয়। নিম্নশ্রেণীর কোন বালক এতদিন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাই দেয় নাই। এই বৎসর ঝকৃসু কামারের পুত্র রামলাল ম্যাট্রিকুলেশন দিবে, পাস করিতে পারিবে কি না তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু তবু সে নিপুদা কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া 'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া বৃত্তিটি দাবি করিয়াছে। নিপুদার উদ্দেশ্য—ক্যাপিটালিস্ট উৎপল সত্য সত্যই টাকাটা দেয় কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখা এবং উৎপল সত্যই যদি টাকাটা দিয়া ফেলে (সে বিষয়ে নিপুদার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল), তাহা হইলে তাহা লইয়া ছোটলোক-মহলে নিজের বেশ একটা প্রতিপত্তি বিস্তার করা। উৎপল বিনা দ্বিধায় রামলালের দাবি মঞ্জুর করিয়াছে। সমস্তই ঠিকঠাক, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া উপস্থিত। রামলালের পিতা ঝকৃসু হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছে। পুত্রকে সে আর 'অংরেজি' পড়াইবে না, বহুমাইজী বারণ করিয়াছেন। বহুমাইজীর কথা তাহার নিকট বেদবাক্য।

কুন্তলার এই বিরুদ্ধতায় শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল। শিক্ষিতা মহিলার নিকট এ আচরণ সে প্রত্যাশা করে নাই।

কুন্তলা মানা করলে ? কেন বুঝতে পারছি না তো!

আমিও প্রথমটা পারি নি, তাই জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম।

কি বললে ?

দেখা পর্যন্ত করলে না আমার সঙ্গে হে।

নিপুদার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

ভাবলে বোধ হয়, যেহেতু আমি এম.এ.-পাস নই, সেই হেতু ওর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবারও যোগ্য নই বোধ হয়। দি ইনসোলেণ্ট স্লাট—

ইংরেজী গালাগালিটা অর্ধস্বগত উচ্চারণ করিয়া নিপুদা চুপ করিল, এবং যেমন তাহার স্বভাব, মুখে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। কুন্তলার সম্বন্ধে নিপুদার অপমানসূচক ভাষাটা শঙ্করের নিজের আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করিল। কিন্তু তবু সে কিছু বলিতে পারিল না। কুন্তলার সপক্ষে কোন যুক্তিই সে খুঁজিয়া পাইল না। নিপুদার সহিত সে কলহ করিতে চায় না, পল্লী-উন্নয়নের বিঘ্ন-হিসাবে কুন্তলার এই আচরণ তাহার নিকট বিরক্তিকর, তবু তাহার ভদ্র মন তাহার অজ্ঞাতসারেই কুন্তলার সপক্ষে একটা যুক্তি আহরণ করিতে ব্যস্ত হইল। নিপুদাকে মুখের মত একটা জবাব দিতে পারিলে সে যেন আরাম বোধ করিত। লোকটা ভারি অভদ্র। কিন্তু কুন্তলা—

কি ভাবছ? ওঠ, চল, যাওয়া যাক।

কোথা?

ঝকৃসুর কাছে। তাকে রাজী করাতে হবে। যদি নেহাত রাজী না হয়, তা হ'লে রামলালকে তার বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব। ও যদি পাস করতে পারে, ওকে কলেজে ভরতি করবই আমরা, দেখি, কে আটকায়!

সেটা কি ঠিক হবে, মানে—বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাটা?

তুমি তোমার প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরে বাপের বিরুদ্ধে যাও নি? রাশিয়াতে অ্যান্টি-রিভলিউশনারি বাপ-মাকে হরদম বর্জন করছে সেখানকার ছেলে-মেয়েরা, এবং বায়োলজিকালি—আত্মরক্ষার জন্য তা করা ছাড়া উপায় নেই।

সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সহিত কথাগুলি বলিয়া নিপুদা হাসিল।

শঙ্কর আর থাকিতে পারিল না।

আত্মরক্ষা মানে?

আত্মরক্ষা মানে আত্মরক্ষা, আবার কি?

কার আত্মরক্ষা? আমাদের, না, রামলালদের?

আমাদের সকলের।

বল্‌শেভিক রাশিয়ায় কিন্তু সকলে রক্ষা পায় নি। 'কুলাক' এবং

'নেপ্‌ম্যান'দের দুর্গতির অন্ত ছিল না সেখানে। এখানেও যদি সবাই বল্‌শেভিক হয়ে ওঠে, আপনি আমি বাঁচব না। বল্‌শেভিক শাস্ত্রমতে—আমরা, শোষকের দলে। বায়োলজিকালি আত্মরক্ষা করতে হ'লে রামলালদের বাড়তে না দেওয়াই উচিত। সে হিসেবে কুন্তলা দেবীর যুক্তি ঠিক।

কুন্তলা দেবীর যুক্তি স্বার্থপর পশুর যুক্তি।

বায়োলজিতে পরার্থ ব'লে কিছু নেই, স্বার্থ ই সেখানে মূলমন্ত্র।

মানলাম। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে হবে।

মানে—সোজা ভাষায় আমার স্বার্থ, আপনার স্বার্থ, আপনাদের বংশধরদের স্বার্থ সব বলিদান দিতে হবে। শ্রমিকদের বড় ক'রে নিজেদের অবলুপ্ত ক'রে ফেলতে হবে।

বাঁকা হাসি হাসিয়া নিপুদা বলিল, একদিন তা হবেই। শ্রমিকদের প্রাধান্যকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গত্যন্তর থাকবে না যখন, তখন নেব। আগে থাকতে যেচে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি কেন?

যুক্তির পথে না গিয়া নিপুদা চটিয়া উঠিল।

তা হ'লে কি বুঝতে হবে তুমিও কুন্তলার দলে? তোমার এ পল্লী-উন্নয়ন-টুন্নয়ন একটা 'শো' মাত্র। আমাকে তা হ'লে মিছিমিছি কেন—

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আহা, চটছেন কেন? ব্যাপারটা বায়োলজির দিক থেকে ভেবে দেখছি একটু, সেদিন যেমন দেখছিলাম।

এ বায়োলজি নয়, এ তোমার কবিত্ব।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, কবিত্বই তো সত্য নিপুদা। ডারবিনও কবিই ছিলেন, struggle for existence, survival of the fittest—আসলে বোধ হয় কাব্য-কথাই। আমরা কি নিজেদের একজিস্‌টেন্সের জন্যে স্ট্রাগল করছি? যদি নিছক পশু-প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হতাম, তা হ'লে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবার জন্যে এমন ক'রে উঠে-প'ড়ে লাগতাম

না। এটা ঠিক জানবেন, যাদের জাগাবার আমরা চেষ্টা করছি, তারা জাগলে আমরা কেউ বাঁচব না। বৃহত্তর মানব-সমাজ হয়তো রক্ষা পাবে—

তুমি ঝক্‌সুর ওখানে যাবে, না, বাজে তর্ক করবে ব'সে ব'সে?

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। পরিহাস-ছলে তর্ক করিতে গিয়া শঙ্কর যেন একটা সত্য আবিষ্কার করিল এবং মনে মনে চমৎকৃত হইয়া গেল। বায়োলজির দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে পতিতোদ্ধারের চেষ্টা করা, মানে—সত্যই তো আত্মবিলোপের আয়োজন করা। কোনও জীব কি সজ্ঞানে আত্মবিলোপের আয়োজন করে? বায়োলজিকালি রামলালদের হয়তো উপকার হইবে, কিন্তু আমরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি কিসের প্রেরণায়? আমরাই তো উহাদের চোখ ফুটাইতেছি। নিজেদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত জানিয়াও কিসের প্রেরণায় আমরা নিজেদের মারণাস্ত্র উহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি? ইহা জৈবিক নয়, ইহা জীবোত্তর প্রেরণা, ইহাই মনুষ্যত্ব, ইহাই মহত্ত্ব। এই প্রেরণাবশেই দধীচি বজ্র নির্মাণের জন্য নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ আত্মনিধনযজ্ঞে পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নিজের কল্পনায় মশগুল হইয়া শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল।

হুঁঃ, ক্যাপিটালিস্টদের লেখা কতকগুলো বাজে প্রোপাগাণ্ডা প'ড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।—নিপুদা খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল এবং আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিল। শঙ্কর কোনও উত্তর দিল না। তাহার মন তখন আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

· · ·

মুখময় বসন্তর দাগ, কাঁচা পাকা ঝাঁকড়া গোঁফ, কালো রঙ, এক-মাথা অবিন্যস্ত চুল, বিরাটকায় ঝক্‌সু বিশাল হাতুড়িটা তুলিয়া চতুর্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করিতে করিতে তপ্ত লোহা পিটিতেছিল। শঙ্করের শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ক বক্তৃতা অথবা নিপুদার কমিউনিস্টিক বচন সে শুনিতেছিল কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা শক্ত। রামলালও একটু দূরে দাঁড়াইয়া রোদ পোয়াইতেছিল এবং সব শুনিতেছিল।

শঙ্করের এবং নিপুদার বক্তব্য যখন শেষ হইয়া গেল, তখনও ঝকৃস্থু কিছু বলিল না, লোহাই পিটিতে লাগিল।

কি রে, কিছু বলছিস না যে? তোর এক পয়সা খরচ লাগবে না, খরচ যা লাগে, আমরাই দেব সব।

হাতুড়ি পেটা বন্ধ করিয়া বাম হাত দিয়া ঝকৃস্থু মাথার ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঠাকুর-বাবার শিষ্যকে ইহারা পয়সার লোভ দেখাইতে আসিয়াছে! এ সম্বন্ধে সে অবশ্য মুখে কিছু বলিল না। গলা-খাঁকারি দিয়া বাগ্‌যন্ত্রটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া সংক্ষেপে কেবল বলিল, বহুমাইজীকা বাতো সে হাম্ বাহার নেই হোবে পারব, অংরেজি উ আর নেহি পঢ়তে।

ওই এক বুলি ধরেছে।

নিপুদা হতাশভাবে হাত উলটাইল।

অংরেজি পঢ়তে দোষটা কি?—শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

ঝকৃস্থু হাতুড়ি তুলিয়া কাজ শুরু করিতে যাইতেছিল, এই কথায় হাতুড়ি নামাইয়া রামলালের দিকে নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুটা প্রসারিত করিয়া সক্ষোভে বলিল, অংরেজি পঢ়ি কর্ শালারো হালত্ কি ভেলোছে দেখে তোঁ আপনে আঁখিসে দেখো।

পুত্রকে শালা সম্বোধন করাতে নিপুদা শঙ্করের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। শঙ্কর হাসিতে সায় দিল না, রামলালের দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। রামলালকে সে ইতিপূর্বে বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকে সে যেন রামলালকে নবরূপে আবিষ্কার করিল। এই ঝকৃস্থুর পুত্র এই রামলাল! লিক্‌লিকে চেহারা, দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গায়ে শৌখিন কামিজ, গলায় রেশমের গলাবন্ধ, পায়ে গ্রীসিয়ান স্লিপার, গোঁফ কামানো! তাহাদের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। পুরুষ নয়, যেন মেয়েমানুষ! একটা বটের চারা অস্বাভাবিক আওতায় পড়িয়া কেমন যেন লতানে-গোছের হইয়া গিয়াছে।

হোপ্‌লেস! চল, হরিহরবাবুর কাছে যাওয়া যাক, এর কাছে বকবক ক'রে কোন লাভ নেই। কি হে, গুম মেরে গেলে যে?

শঙ্কর কোনও উত্তর দিল না। ঝকসু আবার লোহা পিটিতে শুরু করিয়াছিল। বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, আমরা ভুল পথে চলিতেছি না তো?

৩১

সমস্ত রাত শঙ্করের ঘুম হয় নাই। নিপুদা, কুন্তলা, ঝকসু, রামলাল, সুরমা, উৎপল—সকলের সম্মিলিত প্রভাব একটা পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। সে যেন স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও লইতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কমানো বাতিটার স্বল্পালোকে চোখে পড়িল, অমিয়া এবং খুকী অঘোরে ঘুমাইতেছে। খুকীর গায়ে লেপ নাই, অমিয়ার খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছে। খুকীর গায়ের লেপটা সন্তর্পণে ঠিক করিয়া দিয়া সে মশারি হইতে চুপিচুপি বাহির হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় আসিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ কোথায় আসিল সে! এ যে রূপকথার রাজ্য! তাহারই ঘরের বারান্দায় এই অপরূপ স্বপ্ন কতক্ষণ হইতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে! মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় চতুর্দিক স্বপ্নাকুল। কিছু দূরে রাস্তায় যে অস্ফুট কলরব উঠিতেছিল, তাহা তাহার জ্যোৎস্না-অভিভূত মন প্রথমটা শুনিতেই পাইল না। একটু পরেই কিন্তু পাইল এবং উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কিসের কলরব? রাস্তায় ভিড় কিসের? বারান্দা হইতে নামিয়া দেখিল, দলে দলে লোক চলিয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ মাঘী-পূর্ণিমা। গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়াছে সব। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড উৎসব আজ। মেলা বসিবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তীব্র হাওয়া উঠিয়াছে একটা, মাঘের কনকনে শীত। কিন্তু কিছুই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে নাই। দলে দলে চলিয়াছে সব। দূরদূরান্ত হইতে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে 'টপ্পর'-দেওয়া গরুর গাড়ি,

তাহাতেও লোক ঠাসা। কি উৎসাহ! মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের উচ্চ হাস্য যাইতেছে, মাঝে মাঝে শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনও। 'জয় গঙ্গাময়ীকী জয়' বলিয়া এক-একটা দল মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিতেছে, কেহ ভজন গাহিতেছে, কেহ ঢোল খঞ্জনি বাজাইয়া কেহ কেহ কীর্তন ধরিয়াছে। মেঘ-মেদুর জ্যোৎস্নায় শঙ্কর স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইতেছিল না, কিন্তু সে অনুভব করিতেছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চলিয়াছে আজ। অন্ধ-খঞ্জ, সুস্থ-অসুস্থ, ধনী-দরিদ্র, কৃপণ-দাতা, চোর-সাধু, পাপী-পুণ্যবান কেহ বাদ নাই। তাহার মনে হইল, আমাদের মত 'কালচার্ড' কুসংস্কারমুক্ত ইংরেজী-পড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সকলেই আজ গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। কিসের টানে চলিয়াছে? কোন্ অদৃশ্য আইন ইহাদের এই শীতের ভোরে হাঁটিতে বাধ্য করিতেছে? পুণ্যের লোভ? পরলোকের সদ্গতি? সে কিন্তু লোভ দেখাইয়া ইহাদের সৎপথে আনিতে পারিতেছে না তো! পাস করিলে চাকরি পাইবে, হাকিম হইবে—এসব লোভ দেখানো সত্ত্বেও তাহার অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র কই জুটিল! আর একটা ঘটনাও মনে পড়িয়া গেল। রাজীব দত্ত একবার মাতৃশ্রাদ্ধে গরিব-দুঃখীদের পোলাও খাওয়াইবেন বলিয়া ঢ্যাঁটরা দিয়াছিলেন। কয়েকজন অস্পৃশ্য ভিখারী ছাড়া তেমন বেশি লোক জোটে নাই। এই নিরন্ন বুভুক্ষু দেশে পোলাও খাইবার লোভে দলে দলে লোক ছুটিয়া গেল না তো! রাজীব দত্তের ঢ্যাঁটরা দিয়া পোলাও-খাওয়ানোর অশোভন অহমিকাকে এ দেশের গরিব-দুঃখীরাও প্রশ্রয় দিল না। না না, ঠিক লোভ নয়। বিশ্বাস, তৃপ্তি, নিগূঢ় সংস্কার বা ওই জাতীয় একটা কিছু ইহাদের অন্তরে এখনও আছে, যাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারা যাহা বিশ্বাস করে, আমাদের তাহাতে বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাসের জোরে ইহারা বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারে, আমরা পারি না, নিরুৎসব আমরা নাক সিঁটকাইয়া দূরে বসিয়া থাকি শুধু। মনে করি, যদি এই অসভ্যগুলোকে ধরিয়া সাবান-পাউডার মাখাইয়া ফিটফাট কেতা-দুরস্ত করিয়া মুখে বিদেশী বুলি এবং মনে বিলাতী সভ্যতার রঙটা ধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই বুঝি ইহারা শান্তি পাইবে। কিন্তু

তাহাতে ইহারা বোধ হয় শান্তি পায় না। আমরাই কি পাইয়াছি? শীতের ভোরে খালি পায়ে হাঁটিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিয়াই বোধ হয় ইহারা শান্তি পায়।...প্রত্যুষের অস্ফুট আলোকে তীর্থযাত্রী এই জনস্রোতের দিকে শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন বিদেশী, ইহাদের চেনে না, ইহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক যেন তাহার নাই।

এই বিদেশীর জন্যই কিন্তু যমুনিয়া লুকাইয়া মুকুন্দ পোদ্দারের দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং কিছু টাকা কর্জ করিয়া 'ঝানড়া' উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। বাজু জোড়া বাঁধা দিতে হইল। কিন্তু উপায় কি, মানত শোধ করিতে হইবে তো! মানত শোধের জন্য এত খরচ অবশ্য না করিলেও চলিত, কম পূজা দিলেও 'দেওতা' অসন্তুষ্ট হইতেন না; কিন্তু শঙ্করবাবুকে ভাল মাংস খাওয়াইবার সাধ তাহার অনেক দিন হইতে। সেদিন এক কথায় অমন একটা দামী পশমী দোশালা তাহাকে দিয়া দিলেন! সামান্য কিছু একটু প্রতিদান না দিলে কি ভাল দেখায়! সুতরাং মাঘী-পূর্ণিমার দিন 'দেও'স্থানে 'ঝানড়া' উঠাইবার অজুহাতে সে একটা পাঁঠা, একটা পাখী এবং পাঁচটা কবুতর চড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মেথরপাড়ার এই 'দেও'স্থানটি বড় জাগ্রত স্থান। ডাইনীর 'আঁখ লাগিয়া' কেহ যদি অসুস্থ হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি যদি কাহারও না সারে, কাহারও যদি বার বার ছেলে হইয়া মরিয়া যায়, বিদেশী পুত্রের সংবাদ না পাইয়া কেহ যদি ব্যাকুল হয়, এই 'দেও'স্থানে আসিয়া সে মানত করে এবং মাঘী-পূর্ণিমার দিন পূজা চড়ায়। বিষুণের অনেক দিন কোনও খবর নাই, কলিকাতায় সেই যে সে গিয়াছে আর আসে নাই। চিঠিও লেখে না। চিঠি লিখিলে উত্তরও আসে না। ছেলের জন্যই যমুনিয়া মানত করিয়াছিল। মুশাই আপত্তি করে নাই, বরং খুশিই হইয়াছিল। অন্য কোন কারণে নয়, ন্যায়সঙ্গতভাবে মদ খাইতে পারা যাইবে বলিয়া। আজ যমুনিয়া আপত্তি করিবে না। একটা বিষয়ে সে কিন্তু যমুনিয়াকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, ধারের কথা বাবু যেন না জানিতে পারে। ইহা লইয়া বাবু যদি

তাহাকে 'বক্‌ঝক্‌' করে, তাহা হইলে কিন্তু সে মারিয়া ধুনিয়া দিবে। যমুনিয়াও ধারের ব্যাপারটা যথাসাধ্য গোপন রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

৩২

পরম শ্রদ্ধাবিষ্ট কণ্ঠে হরিহর জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার সম্মুখে মন্ত্রপাঠ করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন—

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্‌
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্‌।
শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্‌
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তী চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্কসদৃশী তনুম্‌
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাম্‌ ভবসুন্দরীম্‌
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্‌
রত্ন-দ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভব-গেহিনীম্‌।

ধ্যানান্তে ভক্তিভরে তিনি প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ প্রণত হইয়াই রহিলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, ত্রিভুবন-পালিনী, জগজ্জননী, সকলের মঙ্গল কর মা, সকলকে শান্তি দাও। সকলের জন্যই প্রার্থনা করিলেন তিনি, কেবল নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইল। কিন্তু নিজের জন্যও প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল তাঁহার। কিছুদিন হইতে তিনি কেমন যেন একটা অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন। অশান্তিটা যে ঠিক কি এবং কেন, তাহাও তাঁহার অগোচর ছিল। স্পষ্ট কোন কারণ তো চোখে পড়ে না! তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি, অস্পষ্ট কিসের যেন একটা ছায়া তাঁহার মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছিল। কিসের একটা অভাব যেন তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন। এই অভাব-বোধটা কি কুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়াই? মাঝে মাঝে এ কথা তাঁহার মনে হয়, আবার তখনই ভাবেন—না, কুন্তলার

আচরণ তো নিখুঁত। তাহার পতিভক্তি, গৃহকর্মনিপুণতা, দেবসেবা, কর্মশৃঙ্খলা সমস্তই তো অনিন্দনীয়। কেবল সে বড় বেশি গম্ভীর এবং আন্তরিক। একবার যাহা ভাল বলিয়া মনে করিবে, প্রাণপণে তাহা করিবেই। কলেজে-পড়া মেয়ে একটু যদি বিলাসিতা করিতই, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? তাঁহার জন্যই হয়তো সে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে, এ সন্দেহ মাঝে মাঝে মনে জাগে এবং জাগিলেই তাঁহাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাঁহার জন্য কেহ কষ্ট পাইতেছে, এ চিন্তা অতিশয় পীড়াদায়ক। তাঁহার জন্যই কি কুন্তলা এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে? জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। তুমি বিলাসী হও—এ কথাও মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। অথচ…। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এতটা সনাতন মনোবৃত্তি কি ভাল? কে জানে! রামলাল যদি ম্যাট্রিক পাস করিয়া জমিদারদের খরচে আই.এ. পড়িত, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? ইহা লইয়া অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নিপুবাবু সেদিন যা মুখে আসিল বলিয়া গেলেন। কি দরকার ছিল এসবের? কুন্তলা কিন্তু কিছুতেই নিজের মত পরিবর্তন করিবে না। ঝকুও কুন্তলার মতের বিরুদ্ধে কিছুতে যাইবে না। কুন্তলা যাহা বলিতেছে, এক হিসাবে তাহা ঠিকই। সংস্কৃত-লজিক মুখস্থ করিয়া অবশেষে একটা অকর্মণ্য জীবে পরিণত হওয়া অপেক্ষা কুলকর্ম করাই রামলালের পক্ষে শ্রেয়…। কিন্তু কি দরকার আমাদের এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়ার? জগদম্বার চরণাশ্রয়ে যে শান্ত শুভ্র আনন্দিত জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এসবের কোন স্থান ছিল না এতদিন। সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া সকলকেই স্বীয় নিয়তি-নির্ধারিত পথে চলিতে দেওয়াই বিবেকসম্মত মনে হইত। কিন্তু কুন্তলাও হয়তো নিজের বিবেককেই অনুসরণ করিতেছে। স্বামিত্বের জোরে তাহাকে বাধা দিতে যাওয়াটাও কি ঠিক? তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে তাঁহার নিজেরও একটা খটকা লাগিয়াছে। সকলেই স্বীয় নিয়তি-নির্ধারিত পথে চলিতেছে—এই বলিয়া নির্বিকারভাবে বসিয়া থাকা কি ব্রাহ্মণোচিত? শস্যশ্যামলা দেশ আমাদের শ্মশান হইয়া উঠিল যে! সবই নিয়তি-নির্ধারিত? অসংখ্য লোকের অসংখ্য দুর্দশা এবং নিজেদের ক্লৈব্য মনকে পীড়িত করিয়া

তোলে। ভিখারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমার কি করিবার আছে, আমি কি বলিতে পারি—বলিয়া বসিয়া থাকা কি উচিত? পুনরায় তিনি জগদ্ধাত্রী-চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, জগদ্ধাত্রী জননী সকলের মঙ্গল কর মা—সকলকে শান্তি দাও।

প্রণামান্তে বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, কাঠের-পা-পরা সেই ভিখারীটা দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্গে একটি শিশু। প্রাণপণে কি একটা জানোয়ারের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। গলা একেবারে বসিয়া গিয়াছে। বড় ছেলেটা মহিষের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিল। কিছুই হইল না। এখনও ভাল শিখিতে পারে নাই।

হরিহর ভিতরে ঢুকিয়া চাল-কলা-ফল যাহা কিছু সব বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। ঝম্রু চলিয়া গেল। হরিহর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

৩৩

শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সম্বন্ধে সুরমা অচেতন ছিল না। নিগূঢ় উপায়ে সে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়াও কিন্তু নিজের সহজ আচরণকে সে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বিশেষ বিব্রত বা কুণ্ঠিতও সে হয় নাই। অন্তরের অন্তস্তলে সে বরং একটা সূক্ষ্ম গর্বই অনুভব করিতেছিল। অজ্ঞাতসারে নয় জ্ঞাতসারেই সে এই মুগ্ধ ভৃঙ্গটিকে মনে মনে যে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহা সতীসুলভ নহে, বিজয়িনী-সুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিগলিত কিংবা বিচলিত সে হয় নাই। বাক্যে বা আচরণে এমন কিছু সে প্রকাশ করে নাই, যাহা অশোভন। সে যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার সুমার্জিত ব্যবহারের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় এতটুকু ছন্দপতন হয় নাই, তাহা ঠিক আগের মতই সংযত অথচ অনাড়ষ্ট ছিল। কিন্তু শঙ্করের স্পন্দিত হৃদয়ের উন্মুখ প্রণয়োৎকণ্ঠা তাহার মনের নিভৃততম প্রদেশে যে সূক্ষ্ম আনন্দ অদৃশ্য পুষ্পসুরভির মত

সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাতে সে ঈষৎ আবিষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সে মনে মনে বর্মাবৃতও হইতেছিল। ধরা দেওয়া হইবে না, লঘু ললিত-গতিতে স্থূলতাকে এড়াইতে হইবে, এমন আচরণ করিতে হইবে, যাহাতে এই অকথিত প্রণয়-আকুতি কথ্য প্রেমালাপের ইতরতায় পরিণত হইবার সুযোগ না পায়। নেপথ্য মানস-বিলাসকে নেপথ্যেই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু স্থূলতা এড়াইবার এই চেষ্টাও আবার স্থূলভাবে প্রকট হইয়া না পড়ে, সে দিকেও তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নিজের কৃতিত্ব মনে মনে উপভোগ করিতে করিতে নিপুণা সার্কাস-অভিনেত্রী যেমন ছাতা-হাতে সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, সুরমাও মনে মনে অনেকটা সেই জাতীয় ক্রীড়ায় লিপ্ত ছিল। একটু তফাত অবশ্য ছিল। মানসলোকের প্রত্যন্তদেশে অতিশয় সঙ্গোপনে যে খেলা চলিতেছিল, তাহাতে ক্রীড়ক এবং দর্শক—উভয়েরই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সে নিজেই। বাহিরের কোনও দর্শক সেখানে ছিল না।

৩৪

ভজহরি-প্রমুখাৎ বার্তা শুনিয়া মুকুন্দ পোদ্দার শুধু বিস্মিত নয়, কিঞ্চিৎ বিচলিতও হইলেন। অঙ্কে ভুল করিয়া ফেলিলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়, তেমনই অপ্রস্তুতও হইলেন তিনি একটু মনে মনে। সেদিন নিপুর ব্যবহারে তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই। বস্তুত আজকালকার এই ডেঁপো ছোকরাদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার সপক্ষে আর একটা প্রমাণ পাইয়া মনে মনে বরং তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। ছোকরা বাড়ি বহিয়া তাঁহাকে বলিতে আসিয়াছিল, আমি আপনার শত্রু, এ জেনেও যদি আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান করুন। ময়নাকে রসগোল্লা চিনাইতে আসিয়াছে! অ্যাঁ! তাহা উজবুক না হইলে এতটা পথ হাঁটিয়া এ কথা বলিতে আসে কেহ? লোক চরাইতে চরাইতে মাথায় টাক পড়িয়া গেল, কে শত্রু, কে মিত্র তাহা তাঁহার এখনও চিনিতে বাকি আছে যেন! মিত্র কে? সব ব্যাটাই তো শত্রু। ঘাড় মটকাইবার সুযোগ পাইলে কোন্ দেবতা

তাহা ছাড়েন? তুই যে শত্রু, তা ভাল করিয়াই জানি; কিন্তু সেদিনকার ছোঁড়া তুই, তোর নাক টিপিলে এখনও বোধ হয় দুধ বাহির হইবে, আমার সঙ্গে কি শত্রুতা করিবি তুই? তোর মুরোদ কত? বাহাদুরি করিয়া এ কথা বলিতে আসিবার মানে কি? ডাহা উজবুক না হইলে এ কাজ করে কেহ? নিপুর প্রতি পোদ্দার মহাশয়ের সেদিন সস্নেহ অনুকম্পাই হইয়াছিল একটু। নেহাত গাড়োল একটা। একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বেশ বেশ, আপনি যে শত্রু, তা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু শত্রুরও উপকার যদি করি আমি, কার কি বল্‌বার আছে তাতে? আপনি মানুষ তো, ভারতবাসী তো, হিন্দু তো, আপনি বিপন্ন হয়েছেন এইই যথেষ্ট নয় কি, অত শত্রু-মিত্র বিচার করার কি দরকার? গোটাকয়েক টাকা দিয়ে যদি আমি সাহায্যই করি আপনার, কার চণ্ডী অশুদ্ধ হবে তাতে, অ্যাঁ, কি বল ভজহরি? দাও, ওঁকে পঞ্চাশটা টাকা দাও, নোট নেবেন না, খুচরো, আর হাত-ঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দাও। কথার নড়চড় করবার লোক নই আমি।

নিপু বলিয়াছিল, আপনার কাজ কিন্তু আমি করব না।

আপনার ধর্ম আপনার কাছে।—বলিয়া তিনি হাসিয়াছিলেন। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলি চকচক করিয়া উঠিয়াছিল। কেবল নিপুর উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া থাকিবেন, এমন কাঁচা লোক তিনি নন। ইতিমধ্যে আরও দুই-তিনজন লোক মারফৎ তিনি হৃদয়বল্লভকে খবর পাঠাইয়াছেন। কেনারাম চক্রবর্তীকেই হাত করিবার ফিকিরে আছেন তিনি। আরও হাজার খানেক টাকা কবুল করিলেই লোকটি তাঁহার দিকে ঢলিয়া পড়িবে; বেশ বোঝা যাইতেছে। কেবলমাত্র নিপুর মত চ্যাংড়ার সাহায্যেই তিনি যে এত বড় জমিদারিটা কিনিয়া ফেলিবেন, এ হাস্যকর আশা তাঁহার কোনদিনই ছিল না। তবে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও যখন কাঠবিড়ালীকে উপেক্ষা করেন নাই, তখন তাঁহার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা করিবে কোন্ সাহসে? স্পষ্ট ভাষায় শত্রুতা ঘোষণা করিলেও তাই তিনি কাঠবিড়ালীটার হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। এত লম্ফঝম্ফ তো, টাকা ও ঘড়িটা কিন্তু বেশ হাত পাতিয়াই লইল। তাহার পর অবশ্য আর কোনও খোঁজখবর পান নাই ছোকরার।

রাখেনও নাই। ভাবিয়াছিলেন, টাকা কয়টা বোধ হয় জলেই গেল। এই ভাবিয়া কেবল সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন যে, ছোকরা আর যাই করুক, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ অন্তত করিবে না। যে ছিদ্র দিয়া বুড়বুড়ি কাটিবার সম্ভাবনা ছিল, চাঁদির চাকতি দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া গেল। ভজহরির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিবার পর কিন্তু এ বিশ্বাস টিকাইয়া রাখা শক্ত হইল। ছোটলোকদের মধ্যে এ অঞ্চলে তাঁহার যত খাতক ছিল, সকলেই সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে যে, আর এক পয়সাও সুদ তাহারা দিবে না। দশ কিস্তিতে আসলটা তাহারা পাঁচ বৎসরে ক্রমশ শোধ করিয়া দিবে। তাহাতে যদি পোদ্দার মহাশয় সম্মত না থাকেন, মকদ্দমা করিতে পারেন। সকলের মুখেই এক বুলি এবং বুলিটি নিপুবাবুই নাকি সকলকে মুখস্থ করাইতেছেন!

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, অন্নছত্রে আজকাল লোক খাচ্ছে কত?

দশ জন খাবার কথা, খায় কিন্তু বারো-তেরো জন, মানা করলে শোনে না, এসে ব'সে পড়ে।

কাল থেকে এক শো জনের আয়োজন কর। একটা তরকারিও বাড়িয়ে দাও। কি তরকারি দিচ্ছ আজকাল? কদিন যেতেই পারি নি।

শাক বেগুন মুলো দিয়ে একটা ঘণ্ট হয়েছিল আজ।

লাউ সস্তা আজকাল, লাউয়ের তরকারি কর একটা কাল থেকে।

যে আজ্ঞে।

আর যারা যারা সুদ মাপ চায়, তাদের ব'লো—আমার সঙ্গে যেন দেখা করে তারা। ব'লো যে, তাদের বিপদে আপদে আমরাই চিরকাল করেছি, চিরকাল করবও। আজ হঠাৎ নিপুবাবুর কথায় নেচে মরছিস কেন তোরা? ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লো, বুঝলে? দুটো মিষ্টি কথা বলতে শেখো।

যে আজ্ঞে।

ভজহরি চলিয়া গেল। পোদ্দার মহাশয় স্মিতমুখে বসিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার চোখে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

ফাল্গুনের কৃষ্ণা-চতুর্দশী।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। অতিশয় অসহায়ভাবে শঙ্কর গরুর গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। মন্থরগতিতে গ্রাম্যপথে গাড়ি চলিয়াছে, মুশাই গাড়ি হাঁকাইতেছে, শঙ্কর ভাল করিয়া ভাবিতেও পারিতেছে না, এখন কি করা উচিত! কিছুক্ষণ পূর্বে লক্ষ্মীবাগে স্বচক্ষে সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল, তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাহার মনন-শক্তিই যেন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য সত্যই কিন্তু দিবা-দ্বিপ্রহরে একদল উন্মত্ত জনতা আসিয়া মারপিট লুটতরাজ করিয়া মণিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে। মণির মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় সে এখন সদর-হাসপাতালে। তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুলাব সিং দখল করিয়া বসিয়াছে। মণির ঘরে মণিরই বিছানায় বসিয়া লোকটা সদলবলে আসর জমাইয়াছে। দলে আছে কেনারামের পুত্র জীবন, রাজীবের পুত্র গদাই, প্রমথ ডাক্তার ও স্থানীয় বেহারী উকিল দুইজন। ফুলশরিয়া মদ পরিবেশন করিতেছে। প্রাঙ্গণে জনতার মধ্যে ছিল ফরিদ, কারু, হরিয়া, রহিম, কর্পূরা, পুরণ—চেনা-শোনা আরও কত লোক, সকলেই তাহাদের প্রজা। সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া চোরের মত লুকাইয়া পড়িল সব। লুকাইল না কেবল গুলাব সিং এবং ফুলশরিয়া। গুলাব সিং গোঁফে চাড়া দিয়া একপাত্র মদ আগাইয়া দিয়া বরং সম্বর্ধনাই করিল তাহাকে। স্বয়ং দারোগা সাহেবকে সে হাত করিয়াছে। শঙ্করবাবুকে তাহার কি ভয়? ফুলশরিয়া এক পাশে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। ফুলশরিয়া! এই ফুলশরিয়া নিপুদাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, নিজের গহনা বেচিয়া অসুস্থ হরিয়ার চিকিৎসা করিয়াছিল, এখন ডাকাতের দলে মদ পরিবেশন করিতেছে! পরিধানে চমৎকার একটি ছাপা বোম্বাই শাড়ি। একদিন তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া যে যেখানে পারিল আত্মগোপন করিল,

সে-ই কেবল কোথাও গেল না। এক ধারে একটু সরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল রহিল।

ফরিদ কারু রহিম কর্পূরা—প্রত্যেকের মুখ একে একে আবার তাহার মনে পড়িল। বিশেষ করিয়া ইহাদের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রত্যেককে আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে সে।...সেদিন নিজে জামিন হইয়া ছাড়াইয়া আনিল, দুই দিন যাইতে না যাইতে ডাকাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! দিনে-দুপুরে! কেবল অভাবের তাড়নাতেই তাহারা এসব করিতেছে—এ অজুহাতে আর মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। অভাব নয়, ইহাই উহাদের স্বভাব। স্বভাব! স্বভাবই যদি হয়, তাহার জন্যও কি উহাদের দায়ী করা যায়? বহু যুগের নানা অভাবই কি উহাদের স্বভাব গঠন করে নাই? শুধু অন্নাভাব বস্ত্রাভাব নয়, শিক্ষার অভাব। তখনই আবার মনে হইল, জীবন চক্রবর্তী, গদাই দত্ত, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন বেহারী উকিল, গুলাব সিং—ইহাদের কিসের অভাব আছে? ইহারাই তো আসল ডাকাত, কারু-ফরিদরা তো উহাদের চালিত যন্ত্র মাত্র। শিক্ষা? জীবন চক্রবর্তী, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন উকিল—ইঁহাদের কি শিক্ষার অভাব ছিল? ইঁহারা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, সে শিক্ষা পাইলে ফরিদ-কারুদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইত কি? রামলাল কি উন্নত হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়িয়া গেল। কাকের ঠোঁট সোনা দিয়া, পা মাণিক দিয়া এবং ডানা মুক্তা দিয়া অলঙ্কৃত করিলেও কাক কাকই থাকে, রাজহংস হয় না। কাককে রাজহংস করিবার তাহার এ আগ্রহ কেন? নিমগাছের তলায় দুধ ঢালিলেই তাহাতে আম ফলিবে, এ দুরাশা সে কেন করিতেছে? কেন করিতেছে—চিন্তা করিতে গিয়া অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইল, করিতেছে নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য, করিতেছে তাহার আর কিছু করিবার নাই বলিয়া। যে শিক্ষার অন্তঃ-সারশূন্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ, সেই শিক্ষাই অপরকে জোর করিয়া গিলাইবার এই সাড়ম্বর আয়োজনের অন্য অর্থ আর কি হইতে পারে?—তাহা ছাড়া তাহার নিজের কি এমন যোগ্যতা আছে, কি এমন চরিত্রবল আছে, যাহার জোরে সে সমাজ-সংস্কার করিবার স্পর্ধা করে? বাহাদুরি

করিয়া সেদিন উৎপলের দেওয়া সিগারেটটা প্রত্যাখ্যান করিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার স্ত্রীকে কামনা করিতে তো তাহার বাধিল না? সে নিজেও কি কম পরস্ব-লোলুপ? যে শিক্ষা তাহার নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে নাই, সেই শিক্ষা দিয়া সে সমাজ-সংস্কার করিবে! সে নিজেই তে ভণ্ড।

মুশাই!

কি বাবু?

এখানে কাছাকাছি কোন দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে?

কোশিস্ করলে সে মিলতে জরুর।

দেখ্ তো।

মুশাই গাড়ি থামাইয়া নামিয়া গেল। শঙ্কর শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে। একা একা তাহার কেমন যেন গা-ছমছম করিতে লাগিল। চারিদিক নির্জন, কোথাও আলোর লেশমাত্র নাই। গরুর গাড়ির আলোটাও নিবিয়া গিয়াছে। মুশাইটা গেল কোথায়? এখানে সিগারেট কোথা পাইবে? না পাঠাইলেই হইত। শঙ্কর মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিতে পাইল, দূরে একটা আলো আসিতেছে। আলো, না, আলেয়া? না, আলোই বোধ হয়। কাছাকাছি তো কোন জলাভূমি নাই! শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটু কাছাকাছি হইলে প্রশ্ন করিল, কে?

কোন উত্তর নাই। আর একটু কাছে আসিলে শঙ্কর দেখিতে পাইল, একজন স্ত্রীলোক, সঙ্গে কেহ নাই। এত রাত্রে একা এই নির্জন মাঠের মধ্যে কে এ!

কোন্ হ্যায়, কাঁহা যায়েগা?

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া পড়িল। আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, কে, শঙ্করবাবু নাকি?

শঙ্কর চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কুন্তলা!

এত রাত্রে একা কোথা চলেছেন?

শিবমন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছি।

এত রাত্রে শিবমন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন!

হ্যাঁ। আজ শিবরাত্রি৻

একা কেন?

মণি-ঠাকুরপোর খবর পেয়ে উনি হাসপাতালে চ'লে গেলেন, চাকরটারও অসুখ করেছে, তাই একাই যাচ্ছি। কি আর হবে!

আর কোন সঙ্গী পেলেন না?

কই আর পেলুম!

কুন্তলা একটু হাসিল। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। শঙ্করের মনে হইল, সে হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে, থিয়েটার সিনেমা হইলে অনেক সঙ্গী মিলিত, কিন্তু এই শীতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবপূজা করিতে যাইবে কে?

বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

না, থাক্।

কুন্তলা চলিয়া গেল। শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ওই মেয়েটার তুলনায় নিজেকে কেমন যেন ছেলো বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পর-মুহূর্তেই সে নিজের সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল।. নূতন যুগের নূতন পারিপার্শ্বিকে যাহারা পুরাতন প্রথাকে অবুঝের মত আঁকড়াইয়া আছে, তাহারা কি সত্যই শ্রদ্ধেয়? কুন্তলা রামলালের শিক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিষ্ঠাভরে শিবরাত্রি করিতেছে! মনে মনে কথাটি বলিয়াই সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নিজেই তো সে এতক্ষণ এই শিক্ষার তুচ্ছতার কথা ভাবিতেছিল। চিন্তার সূত্রটা কেমন যেন হারাইয়া গেল। নিজেরই অন্তরের পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আবর্ত ফেনাইয়া তুলিল। একবার মনে হইল, শিবরাত্রি করায় কি এমন মহত্ত্ব আছে? আছে শুধু দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমের অন্তঃসারশূন্য দম্ভ এবং তাহা বজায় রাখিবার জেদ। পর-মুহূর্তেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তঃসারশূন্য? সত্যই কি ইহা অন্তঃসারশূন্য? নূতন যুগের নূতন ঢেউয়ের মুখে যে হালকা শোলাটা নাচিয়া

বেড়াইতেছে তাহারই অন্তর পরিপূর্ণ, আর যে পর্বত সমস্ত ঢেউ সত্ত্বেও অটল হইয়া আছে সে-ই অন্তরঃসারশূন্য? সহসা ইহার কোন সদুত্তর মাথায় আসিল না, তবু কিন্তু নূতন যুগের নূতন দাবি যে একটা আছে তাহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। নূতন যুগের সে অভিনব দাবিটা কি? কমিউনিজ্‌ম? তাহাও কি পুরাতন মনোবৃত্তিরই পুনরাবর্তন নয়? শক্তিমান শ্রমিক জরাগ্রস্ত ধনিকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, ইহাতে অভিনবত্ব কোথায়? শক্তিমান চিরকালই অশক্তের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। তবে? নূতন যুগের নূতন দাবিটা যে কি, তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। একটু পরেই মুশাই আসিয়া হাজির হইল। দেখা গেল, তাহার অসাধ্য কিছু নাই, ঠিক এক প্যাকেট সিগারেট কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়াছে। কুন্তলার নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গভরে অবজ্ঞা করিবার জন্যই শঙ্কর যেন সাড়ম্বরে একটা সিগারেট ধরাইল এবং অপ্রস্তুত মুখে ফসফস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

৩৬

ভিতরে উত্তেজিত হইলে উৎপল বাহিরে খুব শান্ত হইয়া পড়ে। ভ্রূ উত্তোলন করা, পা দোলানো, গোঁফে তা দেওয়া প্রভৃতি মুদ্রাদোষগুলি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়, এমন কি তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিও অচঞ্চল হইয়া পড়ে। শঙ্কর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এইরূপ তুরীয় অবস্থায় সে নীচের ঘরে বসিয়া রেডিও শুনিতেছিল। শঙ্কর ঢুকিতেই সে রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিল। প্রবেশ করিয়াই শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খবর জান?

খুব জানি। জাপানীরা সিটাং নদী পেরিয়ে আঠারো মাইল এগিয়েছে। রেঙ্গুন যায়-যায়।

সে খবরের কথা বলছি না। মণির কথা বলছি। মণির খবর জান?

মণির খবর তোমার জানবার কথা, আমার নয়।

জমিদারি কিন্তু তোমার, এবং মণি তোমারই প্রজা।

সেটা কাগজে কলমে, আসল মালিক তুমি।—বলিয়া সে হাসিল।

...রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, উৎপলের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া একটা ঝাঁকানি ... দিতে, ছেলেবেলায় চটিয়া গেলে যেমন মাঝে মাঝে দিত। কিন্তু সে ...বেলা আর নাই, উৎপলের সে ঝুঁটি নাই, সে উৎপলও আর নাই বোধ ...। তাই সেসব কিছু না করিয়া কেবল বলিল, ননসেন্স।

একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

শঙ্করের আগমনে এবং কথাবার্তায় উৎপলের উত্তেজনা কমিয়া গিয়াছিল। ...র চোখের স্বাভাবিক কৌতুকদীপ্তিও ফিরিয়া আসিয়াছিল। শালটা ...ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিল, তা হ'লে ভণ, শ্রবণ করি।

তুই কিছুই শুনিস নি ?

বৈশম্পায়ন না বললে তো জন্মেজয়ের শোনবার কথা নয়। মহাভারতের ...শন ওলটাই কি ক'রে, বল ?

...র আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, উৎপল বলিল, দাঁড়াও।

সিগারেট-কেস হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে উৎপল চকিত ...ইতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিল।

আমাকেও দে একটা।

উৎপল ভ্রূ উত্তোলন করিল এবং একটু হাসিল। শঙ্করও হাসিতে যোগ ... বটে, কিন্তু মনে মনে সে যেন মরিয়া গেল।

...নির ব্যাপার সমস্ত শুনিয়া উৎপল বলিল, আমাকে কি করতে বল ?

ব্যবস্থা কর।

আমার ব্যবস্থা কি তোমার পছন্দ হবে ?

দেখ্, ফের যদি ও-রকম ক'রে কথা বলিস, এক ঘুসি মারব তোকে।

উৎপল হাসিল।

শঙ্কর বলিল, ও-রকম ক'রে গা বাঁচিয়ে থাকলে চলবে না। অবিলম্বে ...টা ব্যবস্থা করতে হবে।

তোমার যদি আপত্তি না থাকে, অর্থাৎ হঠাৎ ভাবগ্রস্ত হয়ে তুমি যদি ... না দাও, খুব ভাল ব্যবস্থা হতে পারে।

আমার আপত্তি হবে কেন?

উৎপল নীরবে বাম গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল।

কি ব্যবস্থা করতে চাও?

বিকট রকম, অর্থাৎ স্ট্রিংস্ট্রিগ।

মানে?

উৎপল কিছুক্ষণ নীরবে গোঁফে তা দিল, তাহার পর বলিল, শোন তা হ'লে। প্রথমেই ওই দারোগাটাকে টাকা দিয়ে হাত করতে হবে। গুলাব সিং যা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি দিয়ে আমাদের সপক্ষে আনতে হবে ওকে। দ্বিতীয়, জীবন চক্রবর্তীর নামে কেসটা তুমি 'উইথড্র' করবে ভাবছিলে, তা না ক'রে 'ফুল ফোর্সে' চালাতে হবে সেটা। তৃতীয়, ও দত্তর ধানের গোলা আর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে এক দিন—পরের সম্পত্তি নষ্ট করার মজাটা বুঝুন একবার ভদ্রলোক, তার আগে একটা ওয়ার্নিং দিতে পার, খেসারৎ স্বরূপ যদি হাজার টাকা দেন, মাপ করতে পার এবারকার মত। চতুর্থ, তোমার ওই নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে আজই জবাব দিয়ে দাও। আজই যেন তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ করেন। জবাব দেবার আগে থামে বেঁধে চাবকে দিলেও মন্দ হয় না। পঞ্চম, এ গুলাব সিংকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। মণির হয়ে কেউ ওর নামে থানায় গিয়ে নালিশ ক'রে আসুক, আমাদের এলাকায় ওর যত মহিষ আছে সব আড়গড়া দিয়ে দাও, আর মুখে মুখে প্রচার ক'রে দাও (অর্থাৎ কথাটা যেন ওর কানে গিয়ে পৌঁছয়) যে, ওর মাথাটা কেউ যদি কেটে এনে দিতে পারে, তাকে হাজার টাকা বকশিশ দেব আমরা। ষষ্ঠ, তোমার ও 'লেম ডাক্স্'দের—ফরিদ কারু আর কি কি নাম বলছিলে সেদিন, ওদের প্রত্যেককে ডেকে এনে বেশ ক'রে চাবকাও, তারপর ব'লে দাও যে, ওরা যদি সব মণির সপক্ষে সাক্ষী না দেয়, সর্বনাশ ক'রে দেব ওদের। সপ্তম, এ অঞ্চলের বেহারী বাঙালী যত উকিল মোক্তার আছে, সবাইকে মণির তরফে নিযুক্ত ক'রে ফেল; যে দুজন ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা যদি আমাদের পক্ষে আসতে রাজী না থাকেন, তাঁদেরও আসামী ক'রে ফেল

আসামী করাই ভাল বোধ হয়। অষ্টম, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহায়তায় পুলিস ফোর্স নিয়ে মণির সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল।

এত না করলে হবে না?

হবে না। হবে না—হবে না—খোল তলোয়ার, এসব দৈত্য নহে তেমন। অবশ্য তোমার যদি মনে হয়, বাঘের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলে ফল হবে, ক'রে দেখতে পার, আমি কিন্তু সে সবের মধ্যে থাকব না।

সিগারেটটা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সেটা ফেলিয়া দিয়া উৎপল আর একটি ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তুমি আর একটি ধরিয়ে ব্যাপারটাকে প্রণিধান কর। আমি বাথ-রুম থেকে ঘুরে আসছি একটু।

উৎপল চলিয়া গেল। শঙ্কর আর সিগারেট ধরাইল না। নীরবে বসিয়া রহিল। সে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। উৎপল কি ঠাট্টা করিতেছে? না, তাহা তো মনে হইল না। প্রয়োজন হইলে সত্যই সে যে এমন বীভৎস রকম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এ ধারণা তো শঙ্করের ছিল না কখনও। তাহার ধারণা ছিল, উৎপল খামখেয়ালী এাপকিউরিয়ান মাত্র। তাহার আপাত-সৌম্য পেলব মূর্তির অন্তরালে যে এমন একটা রাক্ষস প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কে ভাবিয়াছিল! মণি এবং গুলাব সিংয়ের কথা ভুলিয়া শঙ্কর উৎপলের কথাই ভাবিতে লাগিল। আবাল্যপরিচিত উৎপলের মধ্যে এই অপরিচিত ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ দেখিয়া মানব-চরিত্রের বিবিধ সম্ভাবনা বিষয়েই আর একবার সে সচেতন হইল যেন। কিছুক্ষণ আগে ফুলশরিয়াকে দেখিয়া যেমন হইয়াছিল। এতগুলি ভয়ানক অনুষ্ঠানের তালিকা বেশ নির্বিকারভাবে দিয়া গেল তো! শক্তি আছে বলিতে হইবে। তখনই মনে হইল, শক্তি যে আছে, তাহা তো তাহার আগেই বোঝা উচিত ছিল। শক্তি না থাকিলে কেহ কি নিজের স্ত্রীর জবানিতে প্রেমপত্র লিখিয়া বন্ধুর নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারে? শক্তি না থাকিলে কেহ কি এত টাকা এমন অবহেলাভরে খরচ করিতে পারে? এত বড় সম্পত্তির সমস্ত ভার তাহার

উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আজ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন করে নাই, কোনও জবাবদিহি চাহে নাই। শক্তি আছে বইকি। এ শক্তির সম্মুখে কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বসিয়া রহিল। প্রতিকারস্বরূপ উৎপল যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে সায় দিবার শক্তি তাহার যে নাই। প্রতিশোধের কথা সেও যে ভাবিয়া দেখে নাই তাহা নয়, কিন্তু সাদীর কবিতাটা মনে পড়িতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কুকুর কামড়াইয়াছে বলিয়া কুকুরকে কামড়াইতে হইবে? তোমার যদি মনে হয়, বাঘের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পড়লে ফল হবে, ক'রে দেখতে পার···উৎপলের কথাগুলি মনে পড়িল। সত্যিই কি উহারা বাঘ? সত্যই কি এ উপমা খাটে? পর-মুহূর্তেই মনে হইল, এখনই তো সে নিজেই উহাদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিতেছিল। উহারা সত্যই যে পশু ছাড়া আর কিছু নয়, অন্তরের অন্তস্তলে নিজেই কি সে এ কথা বিশ্বাস করে না? উহাদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে যে কোন ফল হইবে না, ইহা কি সে নিজেই অনুভব করিতেছে না? তবে এই পশুসমাজে তাহার কি করিবার আছে? নখদন্ত বিস্তার করিয়া উহাদের সহিত কলহ করিবে, না, দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের পশুত্ব লইয়া নৈতিক হাহাকার করিবে? এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া অন্য আর কি করিবার আছে? পশুকে মানুষ করা? তাহার তো কোন সম্ভাবনাই নাই। যাহা করিলে পশু সত্য সত্যই মানুষ হয়, তাহা করিবার সুযোগ এই পরাধীন দেশে কোথায়? এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় রাজনৈতিক আইনের নিক্তিতে ওজন করিয়া। হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-বেহারী প্রত্যেকের মন রাখিয়া ধর্ম-রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়, তাহার ফলে মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হয় না, পশু ছদ্মবেশী হয় মাত্র। তবে? কি কর্তব্য এখন? সে কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। মনে হইল, একটা বিপুল অরণ্যে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কি ঠিক হ'ল?

উৎপল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না।

আর একটা সিগারেট ধরাও না।

সিগারেট-কেসটা আগাইয়া দিল। শঙ্করের মনে হইল, তাহার চক্ষু দুইটি যেন কৌতুকে নাচিতেছে। মনে হইবামাত্র তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। অযৌক্তিকভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া বসিল, তোমার জমিদারিতে তুমি যা ইচ্ছে করতে পার, যেখানে খুশি আগুন দিতে পার, যাকে ইচ্ছে চাবকাতে পার; কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব কি না ঠিক করতে পারি নি এখনও।

উৎপল কিছু বলিল না। নীরবে একটি সিগারেট তুলিয়া লইল।

শঙ্কর বলিয়া চলিল, কতগুলো অসহায় লোককে ধ'রে চাবকানো, অশিক্ষিত লোকের বাড়িতে আগুন দেওয়া, গরিব কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার করার মধ্যে সত্যিকার পৌরুষের কোনও লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি হয়তো পাচ্ছ।

আমিও পাচ্ছি না।

তবে?

আমি মণির কথা ভাবছি। কতকগুলো হিংস্র জন্তু তাকে আক্রমণ করেছে—এই কথাই মনে হচ্ছে খালি। ঠিক কি ক'রে জগতের সম্মুখে নিজের পৌরুষ প্রদর্শন নিখুঁত হবে, সে চিন্তা আমার মাথায় আসে নি।

বেশ, তা হ'লে যা ভাল বোঝ, কর।

আমার কথা শেষ করতে দে আগে। একটা কথা জানিস?

কি?

বাথ-রুম নামক স্থানটি অতি উত্তম স্থান। ওখানে গেলে চ-চ ক'রে অনেক ভাল ভাল চিন্তা মাথায় আসে, বোঁ-বোঁ ক'রে বড় বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ আমি খুব ভাল একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি হঠাৎ।

কি সেটা?

আমি এ বিষয়ে কিছুই করব না, যা করবার তুমিই কর।

রাগে শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে লইয়া

খেলা করে, তাহার সন্দেহ হইল, উৎপলও তাহার সহিত তেমনই খেলা করিতেছে।

তুমি কিছুই করবে না কেন?

ভাবছি শুধু শুধু তোমার মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

আমার ব্যক্তিগত কষ্টের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক আছে বইকি। তুমিই তো সব, ব্যক্তিই তো আসল ভাই।

উৎপলের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে, বিড়াল-ইঁদুরের উপমাটা নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সহসা তাহার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িল। স্কুলের ফুটবল-ম্যাচে সে একবার খেলিতে চাহে নাই। উৎপল সেবার ক্যাপ্টেন ছিল। আসিয়া ধরিয়া পড়িল, খেলিতেই হইবে। তুই-ই তো সব, তুই না খেললে আমরা দাঁড়াতেই পারব না।—বহু বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উৎপলের কথাগুলি সহসা যেন ভাসিয়া আসিল। সেই উৎপল কি এখনও আছে?

ভুরু কুঁচকে দেখছিস কি?

তোমার কাণ্ডটা। বিপদে প'ড়ে তোমার পরামর্শ চাইতে এলুম, তুমি তা না দিয়ে কতকগুলো আজগুবি কসরৎ দেখাচ্ছ কেবল।

পরামর্শ তো দিয়েছি, এখন তদনুসারে চলা না-চলা তোমার ইচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যা করবে, তাই হবে।

প্রতিশোধ না নিলে এর প্রতিকার হবে না?

আর কি উপায় আছে, বল?

শঙ্কর বলিতে পারিল না। বস্তুত সেও আর কোন উপায় ভাবিয়া পাইতেছিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

অত দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। তুমি ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে যা হয় ক'রো। আপাতত আর একটা কাজ করা যেতে পারে বরং।

কি?

এই অসময়ে সুরমার কাছ থেকে এক কাপ ক'রে 'কফি' আদায় করবার

চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। আমি বঙ্গাতে ফ্ল্যাটলি 'না' ব'লে দিলে। তুমি কি চাও—

আমারও এখন খেতে ইচ্ছে করছে না ভাই।

বাই জোভ!

উৎপল অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিতে লাগিল।

আমি ছুটি চাইছি ভাই। আমি এখান থেকে কয়েক দিনের জন্যে পালাতে চাই। ও-সমস্যার সমাধান তুমিই যা ভাল বোঝ, কর।

হোয়াট্'স নট শঙ্কর-লাইক। পালাবি!

শঙ্করকে কে যেন কশাঘাত করিল। যদিও সে অবিলম্বে ঠিক করিয়া ফেলিল যে, পলাইবে না; তবু বলিল, কিছুদিন ছুটি নিতে ইচ্ছে করছে?

কেন?

এ সব নোংরামির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

পল্লীসংস্কার মানেই তো আবর্জনা সাফ করা।

দেশের লোক খুন করা নয়।

দেশের লোকই যদি আবর্জনা হয়ে ওঠে, তা হ'লে তাও করতে হবে বইকি।

কিন্তু যে দেশের লোক এককালে মনুষ্যত্বের জন্যে বিখ্যাত ছিল, সে দেশের লোক যে কারণে আবর্জনায় পরিণত হচ্ছে, সেই কারণটা দূর করবার চেষ্টাই কি সংস্কার নয়?

কে অস্বীকার করছে তা? রিসার্চ ক'রে রোগের কারণটা বার করবার চেষ্টা কর। কিন্তু রোগাক্রান্ত যে ব্যক্তিটি সত্যি মারা গেছেন, দেশের লোক হ'লেও তাঁকে পুড়িয়ে ফেলাই তো আমি উচিত মনে করি।

রিসার্চ করবার দরকার নেই। রোগের কারণ অনেক দিন আগেই ধরা পড়েছে, আর মারা আমরা সবাই গেছি, পোড়াতে হ'লে দেশসুদ্ধ সবাইকে পোড়াতে হয়,—তোমাকে আমাকে সবাইকে।

যদি দরকার হয়, তাই করতে হবে।

আমার মতে কিন্তু তার দরকার নেই। দস্যু রত্নাকরকে পুড়িয়ে ফেলে বাল্মীকিকে পাওয়া যেত না। হাজার খারাপ হ'লেও মানুষ আবর্জনা নয়। আজকের বিলাসী মিস্টার গান্ধী কাল মহাত্মা গান্ধীতে বিবর্তিত হয়ে যেতে পারেন; আজ যে দুর্বল জীর্ণ-শীর্ণ, কাল সে স্যাণ্ডো। মানুষের ইতিহাসে এ সব উদাহরণ মোটেই বিরল নয়।

নারদ সেজে তা হ'লে গুলাব সিংয়ের কাছে যাওয়া যাক, চল। কিছুই বলা যায় না, লোকটা সত্যিই হয়তো মহাকাব্য লিখে ফেলতে পারে। অন্ততঃ সম্ভাবনা যে আছে, তর্কের খাতিরে সে কথা মানতেই হবে।

উৎপলের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল। শঙ্কর কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল না। নিজেরই আলোচনার সূত্র ধরিয়া সে এক ভিন্ন লোকে উপনীত হইয়াছিল, যেখানে দীন দরিদ্র বালক প্রতিভাবান ফ্যারাডেতে পরিণত হয়, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তপস্বী বুদ্ধে রূপান্তরিত হন, সামান্য সৈনিক দেখিতে দেখিতে নেপোলিয়নের শৌর্যে বীর্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন—

বাই জোভ! সহসা এত দয়া!

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুরমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পিছনে বেয়ারা কফির সরঞ্জাম বহন করিয়া আনিতেছে।

কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সুরমার আবির্ভাবে নূতন ধরনের একটা উত্তেজনা তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একটা আলো নিবিয়া গিয়া আর একটা রঙিন আলো যেন জ্বলিয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, নিমেষমধ্যে সে নিজের সহিত সেই পুরাতন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। বারম্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অন্যায় করিতেছ, ভুল করিতেছ, পাপ করিতেছ, চুরি করিতেছ। বন্ধুপত্নীকে দেখিয়া মনে মনে মুগ্ধ হইবার অধিকারও তোমার নাই; নির্বিকার থাক। প্রাণপণে সে নির্বিকার থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনার কাছে একবার যাব ভাবছিলাম।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সুরমার শুভ্র কপোলে কয়েকটি চূর্ণ অলক কাঁপিতেছে। শুভ্র নির্মল কপোল, আরক্তিম নয়।

কেন ?

গুলাব সিং লোকটাকে শিক্ষা দিয়ে দিন, সব শুনেছেন তো ? আমি আজ দুপুরে কুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে কথা দিয়ে এসেছি, এর প্রতিকার আমরা করবই।

কি বললেন তিনি ?

বিশেষ কিছু বললে না, আজকাল বেশি কথা বলে না সে আর। শুধু বললে—অরাজক দেশে বাস করছি, মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হবে। আমি কিন্তু সহ্য করব না, এর একটা প্রতিবিধান করুন।

এতক্ষণ তুমি আমাকে কিছু বল নি তো ?—বিস্মিত উৎপল প্রশ্ন করিল।

জানি, তোমাকে বলা বৃথা।

উৎপল ভ্রূ-যুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইল।

শেষ পর্যন্ত শঙ্করবাবুকেই সব করতে হবে। রেডিও আর যুদ্ধ নিয়ে যা মেতেছ তুমি আজকাল !

না মেতে উপায় কি ? শত্রুবাহিনী দ্বারে হানা দিয়েছে।

এ কথায় কোন মন্তব্য না করিয়া সুরমা শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল, ওই মেড়ো জমিদারটাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, আমরা, মানে বাঙালীরা, সত্যিই ভেতো নই। পারবেন তো ?

নিশ্চয়ই।

অতর্কিতে কথাটা শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া বলিল, উৎপলের সঙ্গে এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। উৎপল তো একেবারে সপ্তমে চড়তে চায়।

চড়াই উচিত।—এই বলিয়া সুরমা কফির কাপটা উৎপলের দিকে আগাইয়া দিল। শঙ্করও এক কাপ লইল, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। কফিতে এক চুমুক দিয়া উৎপল বলিল, শঙ্করের কিন্তু ইচ্ছে—

না, আমি ভেবে দেখলাম, তুমি যা বলছ তাই ঠিক। ও ছাড়া উপায় নেই।

শঙ্করবাবুর কি ইচ্ছে ?—সুরমা প্রশ্ন করিল।

ও বলছিল—

উৎপলের কথায় বাধা দিয়া শঙ্কর বলিল, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ—এই বর্বর নীতিকে মানতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ভদ্রতর কোন উপায়ে এ সমস্তার সমাধান হয় কি না আলোচনা করছিলাম।

আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আপনাকে বর্বর নীতিই মানতে হবে, তার কারণ আসলে আমরা এখনও বর্বরই আছি। যীশুখ্রীষ্ট বা বুদ্ধের বাণী আজও আমাদের মুখের বুলি মাত্র। তদনুসারে কোনদিন আমরা চলি না। এখন চলতে চেষ্টা করলে, সেটা ভীরুতা বা ভণ্ডামির নামান্তর হবে। নয় কি?

অনুত্তেজিত কণ্ঠে হাসিমুখে সুরমা কথাগুলি বলিল। শঙ্কর নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিরাট একটা বীরত্ব করিয়া সুরমার চোখে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার প্রবল বাসনা সহসা তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠিতে লাগিল। উৎপলের মুখে যে কথা শুনিয়া সে এতক্ষণ তাহাকে হৃদয়হীন ভাবিতেছিল, সুরমার মুখে ঠিক সেই একই কথা শুনিয়া সুরমাকে অতিশয় হৃদয়বতী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা সে নিজেই নিজেকে মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, নারীস্তাবক পশুটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কোন যুক্তি আর টিকিবে না। ব্যঙ্গ করিল, কিন্তু বিহ্বলতা কমিল না। কফি পান করিয়া সোৎসাহে সে উৎপলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কি উপায়ে গুলাব সিং এবং তাহার দলকে বিদলিত করা যায়?

শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল।

ভাবিতেছিল, ক্ষতি কি? বিশেষ একটা যুক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অসুখী হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? সুখে বাঁচিয়া থাকাটাই আসল জিনিস। আনন্দই কাম্য, যুক্তি নয়। যত বড় যুক্তিই হোক না, তাহা যদি পারিপার্শ্বিককে শেষ পর্যন্ত নিরানন্দময় করিয়া তোলে, তাহা হইলে সে যুক্তি মানিবার সার্থকতা কি? আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানোই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কি হইবে একটা বিশেষ মতবাদ লইয়া? সুরমাকে

একটু খুশি করিতে গিয়া সে যদি আগেকার মত পরিবর্তনই করিয়া থাকে, কি এমন ক্ষতি তাহাতে? সুরমাকে খুশি করিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাই তো মত-পরিবর্তনের সপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি। উৎপলের বিপক্ষেও সে যুক্তি খাড়া করিয়াছিল স্বীয় চিত্তকে আনন্দিত করিবার জন্যই। আনন্দহীন যুক্তির মূল্য কি? বিবেক? বিবেকও একটা সংস্কার, তাহাকেও বারম্বার ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া যায়। মরিয়া হইয়া শঙ্কর নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, মত-পরিবর্তন করিয়া সে অন্যায় কিছু করে নাই। পরস্ত্রীকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইবার কি অধিকার আছে তাহার—এই পুরাতন প্রশ্নটারও একটা উত্তর সে খাড়া করিয়াছিল। বারম্বার নিজেকে বলিতেছিল, মুগ্ধ করে, তাই মুগ্ধ হই। সন্ধ্যা উষা জ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হই, সুরমাকে দেখিয়াও তেমনই মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার মতে মত দিয়া আনন্দ পাইতেছি। মুগ্ধ হইতে ক্ষতি কি? আর তো কিছুই করিতেছি না।...অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে পথ হাঁটিতে লাগিল। বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটা পালকি রহিয়াছে। পালকি করিয়া কে আসিল? বেয়ারারা বারান্দার এক ধারে বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু গুলাব সিংয়ের জেনানা রুক্মিনী দেবী আসিয়াছেন এবং তাঁহার অপেক্ষায় অন্দরে অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ? ভিতরে গিয়া দেখিল, রুক্মিনী দেবী অমিয়ার সহিত গল্প করিতেছেন। শঙ্করকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নমস্কারান্তে অবগুণ্ঠনটি একটু টানিয়া দিয়া নতনেত্রে নতমস্তকে দাঁড়াইয়াই রহিলেন। রুক্মিনী দেবীর রূপ দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। স্বর্ণাভ গৌরবর্ণ, নিটোল নিখুঁত মুখশ্রী, আয়ত ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দুইটি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরিধানে কালো-পাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি। শঙ্করের মনে হইল, স্বয়ং বৈদেহী যেন তাহার ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ম্যয় মাফি মাংনে আয়ি হুঁ।

মৃদুকণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া তিনি অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপহি সব কহিয়ে।

অমিয়া বলিল, ইনি গুলাব সিংয়ের স্ত্রী, লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার সম্পর্কে এসেছেন। স্বামীর হয়ে মাফ চাইতে এসেছেন উনি। বলছেন, এ ঘটনার জন্য উনি মর্মান্তিক দুঃখিত। মণিবাবুর চিকিৎসার যা খরচ লাগে তা উনি দেবেন, স্বামীকেও লক্ষ্মীবাগ ছেড়ে আসতে বাধ্য করবেন। স্বামী যদি ওঁর কথা না শোনেন, তা হ'লে স্বামীর বিরুদ্ধে উনি নিজে গিয়ে কোর্টে এজাহার দেবেন বলছেন, তোমরা যদি মকদ্দমা কর। কিন্তু তার বোধ হয় দরকার হবে না, কারণ ওঁর বিশ্বাস—স্বামী ওঁর কথা রাখবেন। উনি অনুরোধ করতে এসেছেন,—তোমরা আগে থাকতে ওঁর নামে কোন কেস ক'রো না। কারণ মকদ্দমা করা ওঁর স্বামীর একটা নেশা, একবার যদি শুরু হয়ে যায়, ওঁকে থামানো শক্ত হবে। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস, স্বামী ওঁর কথা রাখবেন, মকদ্দমা করতে হবে না।

অমিয়া যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। এই পর্যন্ত বলিয়া রুক্মিনী দেবীর দিকে চাহিল। রুক্মিনী দেবী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে তাঁহার বক্তব্য যথাযথ উক্ত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আঁচল হইতে একখানি হাজার টাকার নোট খুলিয়া অমিয়ার হাতে দিতে গেলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি ও?

উনি মণিবাবুর ক্ষতিপূরণস্বরূপ হাজার টাকা দিতে চাইছেন।

শঙ্কর বলিল, আমরা তা নিই কি ক'রে? মণিবাবুর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তিনি ভাল হয়ে আসুন, তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন। তিনি যদি নিতে চান নেবেন।

রুক্মিনী দেবী নোটটা ক্ষণকাল ধরিয়া থাকিয়া আনতমস্তকে শঙ্করের কথাগুলি প্রণিধান করিলেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে সেটি আবার আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, আপনি যে এখানে এসেছেন, তা কি গুলাব সিং জানেন?

রুক্মিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, জানেন না। তাহার পর অমিয়া

কানে কানে কি বলিলেন। অমিয়া শঙ্করকে জানাইল, উঁর স্বামী অন্ত আর একটি মকদ্দমার তদ্বির করতে সদরে গেছেন, এখানে নেই তিনি।

ও।

রুক্মিনী দেবী আবার অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন।

অমিয়া বলিল, উনি জিজ্ঞেস করছেন, তা হ'লে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন তো? তোমরা কিছু করবে না তো?

শঙ্করকে বলিতেই হইল যে, ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটিয়া গেলে তাহারা আর কিছুই করিবে না। বলিয়াই কিন্তু দুঃখিত হইল, সুরমার মুখটা মনে

রুক্মিনী দেবী নমস্কারান্তে চলিয়া গেলেন।

অমিয়া বলিল, দই ক্ষীর কলা সন্দেশ কত কি এনেছে দেখবে এস।

খুকী কোথা?

যমুনিয়া পারুলদের বাড়ি নিয়ে গেছে তাকে।

এত রাত্রে সেখানে কেন?

সমস্ত দিন ঘুমিয়েছে, চোখে ঘুম নেই, কেবল আমাকে বিরক্ত করছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে কি জান? মাথাতে রঙ মাখিয়ে লজেনচুষ ক'রে দাও। এত দুষ্টু হয়েছে!

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও একটু হাসিল।

তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? অমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

শঙ্করের শুষ্ক মুখ ও প্রাণহীন হাসি অমিয়ার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

অমিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর আর একটু হাসিল।

কি যে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ এ কদিন মণিবাবুর ব্যাপার নিয়ে! নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত ঠিক নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

উৎপলের বাড়িতে। খিদে পেয়েছে, খাবার ঠিক কর।

খিদে পাবে না? সেই কোন্ কালে দুটি খেয়ে বেরিয়েছ! বেগুনগুলো ভেজে ফেলি, কুটে রেখে এসেছি।

অমিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। শঙ্কর ইহাই চাহিতে-

ছিল। সত্যই তাহার ক্ষুধা পায় নাই। তাহার মনে হইতেছিল, অমিয়ার মনোযোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে। নির্জনে বসিয়া সে নিজের সহিত বোঝাপড়া করিতে চায়। সিগারেট ধরাইয়া বাহিরের ঘরটাতে গিয়া সে বসিল। বসিয়াই মনে হইল, সে অন্যায় করিতেছে— ঘোরতর অন্যায়। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবার সপক্ষে যেসব যুক্তি সে এতক্ষণ খাড়া করিয়াছিল, মনে হইল, তাহা অর্থহীন, দুর্বল মনের মূঢ় লোলুপতা মাত্র। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া মানে বৃহত্তর সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাহা করা কি উচিত? তা ছাড়া মনের এই কাঙালপনা আত্মসম্মান-হানিকর নয় কি? সুরমা না হয় খুবই সুন্দর, কিন্তু যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখিবে, অমনই তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতে হইবে? সেদিন তো সে নিজেই এক বিলাত-প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তির বিলাত-ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, লোকটা বিলাতে গিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গিয়াছে যেন! সেখানকার চাকরাণী হইতে শুরু করিয়া রাজরাণী পর্যন্ত সমস্তই তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি পদেই এদেশের সহিত ওদেশের তুলনা করিয়া গদগদ পঞ্চমুখে ওদেশের স্তুতি এবং এদেশের নিন্দা করিতে করিতে ভদ্রলোক বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছে যেন! একটা গ্রাম্য বর্বর যেন সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসিয়া কৃতার্থ নয়নে হাইকোর্ট দর্শন করিতেছে। ভারতীয় বলিয়া তাহার মনে যেন কিছুমাত্র গর্ব নাই, বিলাতী ঐশ্বর্য দেখিয়া আত্মসম্মানশূন্য লোকটা লোভে ক্ষোভে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিজের আচরণও কি ঠিক অনুরূপ নয়? সুরমা সুন্দর, কিন্তু অমিয়াও কি কম সুন্দর? এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তাহার মনের গ্লানি যেন কাটিয়া গেল। সে বারম্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অমিয়াও সুন্দর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সুন্দর বইকি।

কোথা তুমি?

এই যে, বাইরের ঘরে।

অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করবে, আজ তোমার একখানা চিঠি এসেছিল, দিতে ভুলে গেছি।

কার চিঠি ?

খামের চিঠি, খুলি নি, মেয়েলী হাতের লেখা।

মুচকি হাসিয়া অমিয়া ড্রয়ার হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া দিল।

বেগুন-ভাজা হয়ে গেছে, রুটি সেঁকছি, এস তুমি।

অমিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল।—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি আমাকে চেনেন না। আমরা পলাশপুরে থাকি, আমার স্বামীর নাম লোকনাথ ঘোষাল। অত্যন্ত বিপদে প'ড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। ইতিপূর্বে ওঁর মুখে আপনার যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে বিশ্বাস আছে যে, আপনি নিশ্চয় এ বিপদে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। পলাশপুর আপনার ওখান থেকে বেশি দূর নয়, দয়া ক'রে যদি একবার আসেন, স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবেন। চিঠিতে আমার বিপদের কথা লেখা যাবে না। আসুন একবার। বেশি বিপদে না পড়লে আপনাকে এ অনুরোধ আমি করতাম না। ওঁকে না জানিয়ে গোপনে আপনাকে চিঠি লিখলাম, দেখবেন—উনি যেন না জানতে পারেন। আশা করি, যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আসবেন। ইতি

বিনীতা—শ্রীমতী স্বরমা দেবী

পত্রটি পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইল, কিন্তু বাহিরে যাইবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে উৎপলকে সমস্ত কথা একটি পত্রযোগে জানাইয়া সে পলাশপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। উৎপলের সহিত দেখা করিল না। কারণ তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেই স্নুরমার সহিতও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। এ লোভনীয় সম্ভাবনার সুযোগ লইতে তাহার সাহস হইল না।

শঙ্করের পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া উৎপলের মুখে মৃদু হাসি এবং ভ্রূযুগলে কুঞ্চন জাগিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া পত্রখানি তৃতীয়বার সে পাঠ করিল।—

ভাই উৎপল,

লোকনাথবাবুর স্ত্রী খুব বিপন্ন হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল ভোরেই তাই আমাকে পলাশপুর যেতে হচ্ছে। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না, কারণ বিপদটা যে ঠিক কি জাতীয়, তা তিনি লেখেন নি। তুমি ইতিমধ্যে লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটার একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল। যা ভাল বোঝ, তাই কর। যদিও প্রথমে আমার মনে একটু খুঁতখুঁতানি ছিল (এবং সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আছে); কিন্তু ভেবে দেখলাম, তোমার এবং সুরমার মতটাই ঠিক। এ অপমান হজম করা উচিত নয়। গুলাব সিংয়ের নামে এখন কিছু ক'রো না, কারণ কাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি, তাঁর স্ত্রী রুক্‌মিনী দেবী আমার বাড়িতে ব'সে আছেন। তিনি তাঁর স্বামীর হয়ে মাপ চাইলেন এবং ব'লে গেলেন যে, মণির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করবেন তাঁরা, আমরা যেন এই নিয়ে কোর্টে না যাই। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রমথ ডাক্তার, নিপুদা, গদাই, কেনারাম এবং আর সকলের সম্বন্ধে তোমার যা খুশি ক'রো, আমি আপত্তি করব না। ইতি

শঙ্কর

কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া উৎপল কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। যদিও সে ইংরেজীনবিস লোক, তবু দুইটি প্রচলিত সংস্কৃত প্রবচন পর পর তাহার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমটি—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহ', দ্বিতীয়টি—'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'। সে কেনারাম চক্রবর্তীকে ডাকিতে পাঠাইল। লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার পর কেনারাম একটা আহ্বান প্রত্যাশাই করিতেছিলেন। খুব একটা ক্ষুব্ধ মুখভাব লইয়া তিনি উৎপলের নিকট গেলেন। নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল।

বিনা ভূমিকায় উৎপল বলিল, শঙ্কর এখানে নেই। আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ ?

লক্ষ্মীবাগে মণির সম্পত্তি লুঠ করা ব্যাপারে যারা লিপ্ত ছিল, তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। কে কে ছিল, খবর পেয়েছি আমি।

কেনারামের মুখের উপর নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীরভাবে বলিল, সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে না। আপনি ফরিদ কারু হবিবা রহিম কপূরা—এই কজনের নাম থানায় পাঠিয়ে দিন ; লিখে দিন যে, ওরা যে ডাকাতের দলে ছিল, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনার দ্বিতীয় কাজ, নিপুঁদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে নোটিস দেওয়া। এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে তাঁদের ব'লে দিন যে, যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ না করেন, অপমানিত হবেন। তৃতীয় কাজ, রাজীব দত্ত। তাঁর ছেলে গদাইকেও শঙ্কর ওদের মধ্যে দেখে এসেছে। আপনি রাজীব দত্তকে গিয়ে বলুন যে, অবিলম্বে তিনি খেসারৎস্বরূপ যদি এক হাজার টাকা দিতে রাজী না হন, আমরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করব।

কেনারাম মনে মনে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়। রাজীব-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা কয়টি বলিলেন, রাজীব এখানে নেই, কলকাতা গেছে।

গদাইকে গিয়ে বলুন তা হ'লে।

বেশ। কিন্তু গদাই যদি বলে যে, সে ওদের সঙ্গে ছিল না ?

অবিচলিতকণ্ঠে উৎপল মিথ্যাভাষণ করিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই। শঙ্করের কাছে ছোট্ট একটা পকেট-ক্যামেরা ছিল, সমস্ত দলটার ফোটো সে তুলে এনেছে।

এই সংবাদে কেনারাম চক্রবর্তী মনে মনে একটু অশান্ত হইয়া উঠিলেন। জীবনও সেখানে ছিল যে !

উৎপল চকিতে একবার কেনারামের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার

পর বলিল, জীবনও সেখানে ছিল। কিন্তু জীবনের কথা আমরা প্রকাশ করব না, আপনি নিজেই তাকে ধমকে দিন।

নিশ্চয়—নিশ্চয় ধমকে দেব। এ কথা তো আমার কানেই যায় নি!

উৎপল এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। কেবল বলিল, হ্যাঁ, ও ছিল। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এটা মগের মুলুক নয়। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকেও চিঠি লিখছি আজ।

নতুন যিনি ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন, তিনি বড় বদমেজাজী লোক শুনেছি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান না বড়। সেদিন—

আমার সঙ্গে হয়তো দুর্ব্যবহার না-ও করতে পারে, একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলাম।

ও!

কেনারাম মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখন আপাতত উৎপলের বিরুদ্ধাচরণ করা চলিবে না। তাঁহার মুখভাব সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অভিভাবকী ভঙ্গীতে বলিলেন, নিশ্চয়ই, এর একটা বিহিত করা দরকার বইকি। যা যা বললে, এখুনি আমি করছি সব। তুমি নিজে এসব ব্যাপারে মন দিয়েছ দেখে ভারি সুখী হলাম। এই তো চাই। শঙ্কর অবশ্য খুবই করে। তবু—। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তবু তোমার নিজের সব দেখা চাই। কারণ জমিদারি তোমার।—এই কথা বলিবার পরই প্রসঙ্গত আর একটা কথাও যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, পাঁচ বছর পরে একটা যে হিসেবনিকেশ নেবার কথা ছিল, তারও সময় হয়ে এল প্রায়। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসেব আমি আপ-টু-ডেট ক'রে রেখেছি। অন্য অন্য ব্যাপারগুলোও শঙ্করকে ঠিক ক'রে রাখতে বলব, রেখেছে আশা করি, বেশ কেপেব্‌ল ছোকরা ও, তবু তুমি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিও সব। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, নিজের সম্পত্তি নিজে না দেখলে থাকে না, মা-লক্ষ্মীর আইনই ওই রকম। রাজবল্লভবাবু নিজে কিছু দেখতেন না ব'লেই তো সব গেল। কেনারাম আবার একটু হাসিলেন। উৎপল গম্ভীরভাবে আনত নয়নে ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত

করিয়া গোঁফই পাকাইতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। তাহার মনোভাব যে কি, তাহা ঠিক টের না পাইলেও কেনারাম প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলিতেও ছাড়িলেন না।

সেদিন হৃদয়বল্লভ এসেছিল। সে জমিদারিটা আবার ফিরে কিনে নিতে চায়। ভাল দামই দিতে চাইছিল। আমি অবশ্য তাকে ব'লে দিয়েছি যে, জমিদারি বেচবার কোনও কথাই ওঠে নি এখনও।

উৎপল ইহারও কোন উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কেনারাম অবশেষে বলিলেন, এখন উঠি তা হ'লে। প্রমথ ডাক্তার আর নিপুকে কি আজই নোটিস দেবে?

আজই।

বেশ। তা হ'লে ড্রাফ্‌ট ক'রে টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই ক'রে দিও।

দিন।

কেনারামবাবু চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবামাত্র উৎপলের মুখভাব পরিবর্তিত হইল। প্রচ্ছন্ন হাস্যে মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

৩৮

শঙ্করের সম্বন্ধে ফুলশরিয়ার অনেক দিন হইতেই একটা খটকা ছিল। হরিয়ার মুখে খবর শুনিয়া তাহা আরও বাড়িয়া গেল। কি রকম ধরনের লোকটা যেন! মণিবাবুর 'কানতে' যাহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সকলের নামে নাকি থানায় নালিশ হইয়া গিয়াছে! শঙ্করবাবুই নিশ্চয় ইহার মূলে আছেন, কারণ সব জিনিসের মূলে তিনিই থাকেন। এতদিন ধারণা ছিল, লোকটা সত্যই বোধ হয় দেবতা। কেন যে এমন অসম্ভব একটা ধারণা তাহার হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া নিজেরই উপর রাগ হইতে লাগিল। তাহার পতিতা-জীবনে অনেক লোকের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু 'দেওতা' তো একজনও চোখে পড়ে নাই, শঙ্করবাবুকেই বা শুধু

শুধু দেবতা ভাবিতে গেল কেন সে? লোকটাকে দেখিয়া 'তাজ্জব' লাগে, কিন্তু। হাব-ভাব-ইঙ্গিতে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করে না, মাথা উঁচু করিয়া কেবল পরোপকার করিয়া বেড়ায়। এ যে আশ্চর্য ব্যাপার! নটুটুবাবু ডাকৃটারও কম পরোপকারী নন, কিন্তু 'সরাব' পান করিয়া রাত-দুপুরে তাহার দরজা ঠেলাঠেলি করিতে তিনি কোনদিন ইতস্তত করেন না। এ লোকটা কিন্তু সে সবের ধার দিয়াও যায় না। পাথরের নয়, রক্তমাংসেরই শরীর নিশ্চয়, কিন্তু কোনরূপ বেচাল নাই। এমন নিখুঁত রকম 'বরহম্‌চারী' তো দেখা যায় না বড়। কিন্তু না, ফুলশরিয়া ওসব বিশ্বাস করে না। শঙ্করবাবু একদিন তাহার উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তাহাতে হইয়াছে কি? বাবু-ভেইয়াদের পায়ে পড়িলে অনেকেই অমন উপকার করিয়া থাকে। গরিব-দুঃখীদের কাকুতি-মিনতিতে গলিয়া পড়া অনেকের ঢঙ, অনেকের শখ; 'চুহা মুহা' নিপুবাবুও সকলের উপকার করিবার জন্য লালায়িত; উপকার করিয়াছেন বলিয়াই শঙ্করবাবুকে 'মহাৎমাজী' মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহা করিলে মানুষের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার ধারণাই যে বদলাইয়া ফেলিতে হয়। না, সে বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই আর সকলের মত এ লোকটারও গলদ আছে। কিন্তু কোথায় সে গলদ? সেদিন লছমীবাগে গুলাব সিংজীর দরবারে হঠাৎ গিয়া হাজির। তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না পর্যন্ত। অথচ গুলাব সিংয়ের মত লোক তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে। আর একদিন কোথাও কিছু নাই, রাত-দুপুরে যমুনিয়ার বাড়ি গিয়া উপস্থিত। চীৎকার চেচামেচি শুনিয়া সে ভাবিল, এইবার হুজুর বোধ হয় ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোথায় কি! পরে শোনা গেল, মুশাইকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছেন, ওই 'ডোক হুর'-মার্কা যমুনিয়াকে গায়ের দামী শালটি বকশিশ করিয়া গেলেন। দরদ দেখাইবার আর লোক পাইলেন না! গরিবদের প্রতি দরদ যে কত, তাহার নমুনা তো এইবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিজেদের লেজে যেই পা পড়িয়াছে, অমনই ফোঁস করিয়া উঠিয়াছেন। মণিবাবুর 'কামৎ' যেই লুঠ হইয়াছে, অমনই যত গরিব-দুখীয়াদের নামে থানায় নালিশ হইয়া গেল।

আসল ডাকাত গুলাব সিংয়ের নামে নাকি নালিশ হয় নাই। যত দোষ ইহাদের। অথচ ইহাদের জন্য শঙ্করবাবুর দয়া একদিন উথলাইয়া উঠিয়াছিল। সকলের 'মাইবাপ' সাজিয়া বসিয়াছিলেন। নিজে জামিন হইয়া থানা হইতে ছাড়াইয়া পর্যন্ত আনিয়াছিলেন। কেন যে আনিয়াছিলেন, কে জানে! কিছু নয়, ও-সমস্ত লোক-দেখানো ঢঙ।...

ঘুঁটের উনুনে হাওয়া করিতে করিতে ফুলশরিয়া মনে মনে গজরাইতেছিল। সেদিন লক্ষ্মীবাগে শঙ্কর যে তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় বার আর দেখে নাই, ইহাতে সে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিল। শঙ্কর যদি তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বকিয়া দিত, যদি বলিত—ফুলশরিয়া, তুই এখানে? তোকে এখানে দেখব আশা করি নি তো। তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইত সে। বুঝাইয়া বলিতে পারিত যে, তাহারা অসহায় জনমজুর মাত্র, ধনীদের ডাকে সাড়া না দিলে তাহাদের দিন চলা ভার। ভাল কাজ মন্দ কাজের বিচার করিয়া চলিবার উপায় আছে কি তাহাদের? যাহাতে বেশি মজুরি, তাহাই তাহাদের কাছে ভাল কাজ; যাহাতে কম মজুরি, তাহাই মন্দ। তাহারা অন্নহীন বস্ত্রহীন সহায়সম্পদহীন দীন দরিদ্র যে। গুলাব সিংয়ের অত মজুরির লোভ তাহারা কি সামলাইতে পারে? এত কথা ঠিক এমনভাবে মনে জাগে নাই, কিন্তু এমনই ধরনের কিছু একটা সে শঙ্করকে বুঝাইয়া বলিতে পারিত। কিন্তু শঙ্করবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না পর্যন্ত। সে যেন মানুষ নয়, ডাকিয়া কথা বলিবার উপযুক্ত নয়, পোকামাকড় যেন। মাঝে মাঝে দয়া করিয়া কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করেন, কখনও আবার পায়ে দলিয়া চলিয়া যান। ইস্, ভারি বড়লোক আমার! অমন বড়লোক সে ঢের দেখিয়াছে। সজোরে আবার সে উনুনে হাওয়া করিতে লাগিল। হরিয়াটা আবার আসিয়া জুটিয়াছে। এত রাত্রে তাহার জন্য আবার রাঁধিতে হইবে। ঘরে চাল নাই, কিন্তু হরিয়া সে কথা শুনিবে না, ভাত সে খাইবেই। পয়সা লইয়া দোকানে চাল কিনিতে গিয়াছে। বলিল, উপর্যুপরি কয়েক দিন ভাত খাইতে পায় নাই, চুড়া মুড়ি কিংবা ছাতু খাইয়া কাটাইয়াছে। কে তাহাকে রাঁধিয়া দিবে! বউ

তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না, সে নাকি আর একটা 'চুমানা' করিয়াছে। থানায় দারোগা ব্যাগার ধরিয়া তাহাকে দিয়া কয়েক দিন 'বরতন' মলাইয়াছিলেন, বেতন চাওয়াতে দূর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার নামে বি.এল. কেস করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। হরিয়ার মুখেই ফুলশরিয়া শুনিল যে, লক্ষীবাগ লুঠ উপলক্ষ্যে সকলের নামে নালিশ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে এইবার কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হইবে। নালিশটা যে উৎপল করিয়াছে, শঙ্করের ইহাতে যে কোন হাত নাই, তাহা হরিয়া জানিত না।

হরিয়া চাল লইয়া প্রবেশ করিল এবং খবর দিল, শঙ্করবাবু পলাশপুরে চলিয়া গিয়াছেন। নটবরবাবু তাহার জন্য শঙ্করবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, দেখা হইল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন। 'বদ্‌নসীব' বলিয়া হতাশ হরিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

বদ্‌নসীব তো হাম্ কি করবো? য়ঁহা কি ছে?

হরিয়া কিছু বলিল না, ফুলশরিয়া প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দে, চাউল দে।

চাল লইয়া সে ধুইতে বসিল। সহসা নটবর ডাক্তারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল!

পলাশপুর অভিমুখে যাইতে যাইতে শঙ্কর নিজের মনের আধুনিকতম সমস্যার কথাটাই ভাবিতেছিল। তাহা পল্লীসংস্কার নয়, গুলাব সিং নয়, সুরমা। সুরমাকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না। এজন্য সে লজ্জিত হইতেছিল, নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল; কিন্তু কিছুতেই মনকে সুরমা-মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এই অশুদ্ধ অশান্ত চিত্ত লইয়া দেশের কাজ করিবার সত্যই কি কোন অধিকার আছে তাহার? কোনও কালে কি ছিল? বাষ্পে স্ফীত রবারের

বেলুনের মত এক-একটা ভাবে মাতিয়া কিছুকাল সে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এত দুর্বল কেন সে? নারীর সান্নিধ্যে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না, সমস্ত আদর্শ সমস্ত শিক্ষা নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কেন এমন হয়? সে তো প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখে, তবু কেন তাহার অন্তরবীণার সমস্ত তার আচম্বিতে অকস্মাৎ এমনভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে? জীবনে এমন বহুবার হইয়াছে। কেন এমন হয়? অমিয়াকে ঘিরিয়া তাহার এ আকুলতা জাগে না তো! চুনচুন, সুরমা, বেলা, নীরা তাহার মনে যে ঢেউ তোলে, অমিয়া তাহা পারে না কেন? মনকে সহস্র প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর মেলে না, মন কেবল স্বপ্ন দেখিতে থাকে। সে ভাবিয়াছিল, তাহার মনের এই স্বপ্নসাধ বুঝি মিটিয়া গিয়াছে। পল্লীসংস্কারের প্রেরণায় আদর্শবাদের কঠোরতায় তাহার চঞ্চল যৌবনচিত্ত বুঝি শান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু না, আজ সে সবিস্ময়ে দেখিতেছে, মনের এই প্রিয়প্রবণতা প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র, বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহা এতদিন পরে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল কেন? এই সুরমাকে তো সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, এতদিন তো কিছু হয় নাই! এতদিন পরে সুরমাকে ঘিরিয়াই আবার স্বপ্ন জাগে কেন? সহসা সে অনুভব করিল, তাহার মন যেন ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক অংশ অপরাধী, এক অংশ বিচারক এবং আর এক অংশ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা অংশ উভয় পক্ষেরই কথা শুনিতেছে, উভয় পক্ষের প্রতিই সে সহানুভূতিসম্পন্ন। মনের এই অংশই যেন নিগূঢ়ভাবে শঙ্করের প্রশ্নের উত্তর দিল। বলিল, তোমার কবি-চিত্ত যে প্রিয়া কামনা করে, অমিয়ার মধ্যে সে প্রিয়া নাই। অমিয়া তোমার প্রিয়া নয়, প্রয়োজন। প্রিয়াকেই তুমি মনে মনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ এবং যে নারীর মধ্যে তাহার আভাস পাইতেছ, তাহাকে ঘিরিয়াই তোমার মন স্বপ্ন-রচনা করিতেছে। স্বপ্ন-রচনা করাই তোমার স্বভাব। এতদিন পল্লীসংস্কারের স্বপ্নে মগ্ন ছিলে, বাস্তবের কঠ আঘাতে সে স্বপ্ন ক্রমশ ভাঙিতেছে, প্রাক্তন স্বপ্ন তাই ফিরিয়া আসিতেছে আবার। তাই কি?

লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। যে লোকটি তাহাকে লোকনাথের বাড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, সে বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে চাহিল না। আকারে ইঙ্গিতে সে এমন ভাব প্রকাশ করিল, যেন একটা বাঘের গুহা অথবা সাপের বিবর। দূর হইতে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। শঙ্করের প্রতিও লোকটা এমনভাবে দুই-একবার চাহিল, যাহার ভাবটা—আচ্ছা অসমসাহসিক ভদ্রলোক তো, ওখানে কি দরকার? তাহারই মুখে শঙ্কর শুনিল যে, লোকনাথবাবু স্কুলে আর চাকরি করেন না, স্কুল হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা দাঁড়াইল না। চলিয়া গেল। শঙ্কর একা দাঁড়াইয়া রহিল।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যা আসন্ন। লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল। লোকনাথবাবুর সহিত বহুদিন তাহার কোন যোগ নাই। কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে দেখা তো হয়ই নাই, বছর দুই হইতে পত্রালাপও বন্ধ আছে। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাতেও আর সে লেখে না। লোকনাথবাবু উপর্যুপরি কয়েকবার তাহার লেখা প্রত্যাখ্যান করায় আর লেখাও পাঠায় নাই। বস্তুত লোকনাথবাবুর সহিত কার্যত কোন যোগ তাহার আর নাই। তবু সে হঠাৎ—মাত্র একখানি পত্র পাইয়াই—আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের এই আচরণে নিজেই সে বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল। আসিয়াছে বলিয়া বিস্ময় নয়। এতদিনের অদর্শন এবং এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও লোকনাথবাবুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এখনও অটুট আছে, ইহা আবিষ্কার করিয়াই সে বিস্মিত হইল। লোকনাথবাবুর প্রতি এ অহেতুক শ্রদ্ধা কেন? কি আছে লোকটার মধ্যে?

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

ভাঙা পুরুষকণ্ঠে কে যেন ধমকাইয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করিয়া একটা গুরুভার পতনের শব্দ এবং নারীকণ্ঠের আর্ত করুণ একটা চীৎকার। শঙ্কর আর আত্মবিশ্লেষণ করিবার অবসর পাইল না, ভদ্রতার রীতি লঙ্ঘন করিয়া সামনের দরজা ঠেলিয়া সোজা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই যাহা তাহার চোখে পড়িল, তাহা অপ্রত্যাশিত। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার

একটি রমণী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। শঙ্করকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া বসিলেন। শঙ্কর দেখিল, তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। লোকনাথবাবু একটা তক্তাপোশের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, চতুর্দিকে বই খাতা ছড়ানো। তাঁহার রক্তচক্ষু কপালে উঠিয়াছে, দৃষ্টি দিয়া আগুনের হলকা বাহির হইতেছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, ঠোঁট কাঁপিতেছে, বাহু উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, সমস্ত দেহটাই যেন আক্ষিপ্ত। সর্ব-অবয়বে যেন ক্রোধ এবং ঘৃণা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, গলার চারিদিকে ঘা। পূর্বে গণ্ডমালা ছিল, এখন সেগুলি ঘায়ে পরিণত হইয়াছে। তৈলাভাবে মাথার চুল রুক্ষ অবিন্যস্ত। কপালে ঠোঁটের আশেপাশে কালো দাগ। শঙ্করের সহসা মনে হইল, লোকটা দগ্ধ হইতেছে।

কে—কে আপনি?

লোকনাথবাবু শঙ্করকে চিনিতেই পারিলেন না।

আমি শঙ্কর।

শঙ্করবাবু! ও। আসুন আসুন, আপনি এখানে এমন হঠাৎ?

বাঁচান আমাকে, বাঁচান।—ভব্যতা লজ্জা সমস্ত ভুলিয়া হররমা শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

ভেতরে যাও, ভেতরে যাও বলছি, ভেতরে যাও বলছি।

লোকনাথবাবু এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, শঙ্করের ভয় হইল, হয়তো আবার কি করিয়া বসিবেন! তাড়াতাড়ি নিজের পা ছাড়াইয়া লইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভেতরে যা—ও।

হররমা আর বসিয়া থাকিতে সাহস করিলেন না। মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবামাত্র লোকনাথবাবুর মুখভাব পরিবর্তিত হইল। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই, প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে?

বহুদিন পরে প্রিয়সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন উৎফুল্ল হইয়া

ডা

আসল সত্য গোপন করিয়া শঙ্কর বলিল, এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যাই।

বেশ করেছেন। আসুন, বসুন। ভালই হ'ল এসেছেন, আপনাকে শোনানো যাক তা হ'লে। সময় আছে তো আপনার?

আছে।

বসুন তা হ'লে। একটা প্রবন্ধ লিখেছি, শুনবেন?

বেশ তো।

নিকটেই একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার ছিল, শঙ্কর তাহাতে উপবেশন করিল। লোকনাথবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিয়া দিলেন। পড়িতে পড়িতে আবেগভরে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। প্রবন্ধের নাম—'বাঙালীত্ব'। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা আবিষ্কার করিল যে, সে প্রবন্ধ শুনিতেছে না, এই অদ্ভুতপ্রকৃতির লোকটিকে অদৃশ্য একটা নিক্তিতে চড়াইয়া মনে মনে ওজন করিতেছে এবং তাহা লইয়া নিজের সহিত নানা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। একটা জিনিস যাহা ইতিপূর্বে ইঁহার সম্বন্ধে কখনও মনে হয় নাই, তাহাই সহসা যেন অতি স্পষ্ট এবং কষ্টদায়ক রূপে মনে প্রতিভাত হইল এবং চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। অজামিত হররমা-সম্পর্কিত ব্যাপার বাদ দিয়াও, শুধু তাঁহার সাহিত্যিক প্রকৃতি হইতে বিচার করিলেই অনিবার্যভাবে মনে হয়, অতিশয় সঙ্কীর্ণমনা লোকটা, এতটুকু উদারতা নাই। জগতের সহিত দূরের কথা, সমগ্র ভারতের সহিতই তাঁহার অন্তরের আত্মীয়তা নাই। নিরতিশয় স্বল্পপরিসর গণ্ডির মধ্যে নিজের 'বাঙালীত্ব' লইয়া তিনি আস্ফালন করিতেছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ লইয়াও তাঁহার গর্ব নয়। তাঁহার ধারণা, পদ্মার ওপারে যাহারা থাকে, তাহারা সকলেই অসভ্য বর্বর, তাঁহার মতে বাঁকুড়া-মানভূমও প্রকৃষ্টরূপে মার্জিত নয়, তাঁহার যত গর্ব ভাগীরথীতীর-সন্নিহিত রাঢ় প্রদেশ লইয়া। শুধু তাহাই নয়, সাহিত্যের একটা বিশেষ নীতি, সীমাবদ্ধ মতবাদ, বিশিষ্ট ভঙ্গী ছাড়া আর কিছুই তাঁহার চিত্তকে উদ্বোধিত করে না। সেই সীমার মধ্যে তাঁহার স্বকীয় সাহিত্য-চর্চা অবশ্য শক্তির পরিচায়ক, কিন্তু তাহা চর্চা মাত্র,

সৃষ্টি নয়,—সঙ্কীর্ণ মন লইয়া বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না। বিদ্যাবত্তা এবং মনীষার সমন্বয়ে তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, বিদগ্ধ চিত্তকে তাহা পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিমিত বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। মনে হয়, দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে, মুক্তি পাইলে বাঁচি। তাঁহার শুচিবায়ুগ্রস্ত সাবধানী মন নিজ বক্তব্যকে নিখুঁতরূপে সুস্পষ্ট করিবার প্রয়াসে শব্দবিন্যাসের এত নিপুণতা এত পাণ্ডিত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে এত দম্ভ এত বক্রোক্তি প্রকাশ করিয়াছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা কাব্য না হইয়া একটা জটিল গ্রন্থিসঙ্কুল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। তাহাতে স্বচ্ছতা নাই, স্নিগ্ধতা নাই, মনে হয়, বকবকানি ছাড়া যেন আর কিছুই নাই। সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠে। কেহ তাই তাঁহার লেখা পড়ে না। শ্রোতা পাইলে তাই তিনি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। এই যে এতকাল পরে আসিলাম, আমাকে একটা কুশলপ্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না, আহারাদি হইয়াছে কি না খোঁজ লইলেন না, নিজের কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য একেবারে হড়হড় করিয়া প্রবন্ধ পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন। লোকটার সঙ্কীর্ণতা, আত্মম্ভরিতা এবং কাঙালপনা শঙ্করকে পীড়িত করিতে লাগিল। আবার তখনই মনে হইল, একটা বিশেষ পন্থায় বিশেষ দেবতার সাধনা মানেই সঙ্কীর্ণতা নয়। একসঙ্গে তেত্রিশ কোটির পূজা করা কি সম্ভব? একনিষ্ঠ পূজা মানেই কি নিজের বিশেষ দেবতাটি ছাড়া বাকি সকলের প্রতি ঔদাসীন্য নয়? এবং সেই ঔদাসীন্যের সহিত গোপনভাবেও কি ঈষৎ বিতৃষ্ণা মিশ্রিত থাকে না? থাকাটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষ একটি দেবতা বাছিয়া বরণ করার অর্থই তো অন্য দেবতার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। যাঁহারা সমদৃষ্টি অথবা উদারদৃষ্টির বড়াই করেন, হয় তাঁহারা কোন দেবতারই উপাসক নন, না হয় তাঁহারা ভণ্ড। দেবতা সম্বন্ধে যাহা সত্য, সাহিত্যবুদ্ধি সম্বন্ধে বা রাজনীতি সম্বন্ধেই বা তাহা সত্য নহে কেন?

লোকনাথবাবু পড়িয়া চলিয়াছেন, "জীবনে কাহারও কৃপা, করুণা অথবা ক্রোধের তোয়াক্কা না রাখিয়া এ দেশের বিরজ্জনমণ্ডলীর আশীর্বাদ অভিশাপ উপেক্ষা করিয়া আমি যে ধরনের সাহিত্যচর্চা করিয়াছি, তাহাও এক হিসাবে আমার বাঙালীত্বেরই পরিচয় বহন করিতেছে। বাঙালী জাতির একটা

বৈশিষ্ট্য আছে। পরানুকৃতি তাহার একটা মজ্জাগত স্বভাব বটে, কিন্তু সকলে যখন অনুকরণের সুরায় বুঁদ হইয়া রহিয়াছে, তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও উলটা কথা বলিবার শক্তি এই বাঙালীরই আছে। নেশা করিয়াও সে নেশার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতে পারে; তাই আজ যখন সকলের চিত্ত বিশ্বমুখী, কেহ যখন চীনের দুঃখে কাতর, কেহ যখন কমিউনিস্ট, কেহ যখন ইউরোপীয় ডেমোক্রেসির অধঃপতনে বিগতনিদ্র, তখন আমিই কেবল তারস্বরে বলিতেছি—আগে ঘর সামলাও; বিশ্বকে জানিবার পূর্বে নিজেকে জানো। নিজের বৈশিষ্ট্য-বিভবকে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের পবিত্র যজ্ঞাগ্নির মত রক্ষা করিতে শেখো; নিজের বৈশিষ্ট্যে যদি পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পার, তবেই তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক। পরের কথায় সায় দিয়া পরের সুরে সুর মিলাইয়া পরের হুজুকে মাতিয়া নাচিলে ইতঃ ভ্রষ্ট ততো নষ্ট হইবে মাত্র। ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি—সকলেই আগে নিজের ঘর সামলাইয়াছে, বস্তুত উহাই তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য। নিজের ঘর সামলাইয়া তাহার পর তাহারা বিশ্বের দিকে নজর দিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বনজরের প্রকৃত তাৎপর্যও আজ সুধী সমাজে অবিদিত নাই। সুতরাং—"

লোকনাথবাবু আবেগভবে পড়িয়া চলিয়াছেন, শঙ্কর হঠাৎ বাধা দিল। বস্তুত তাহার মনে হইল, এই আহত রমণীটির সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ না করিলে তাহার আচরণ শুধু যে ভণ্ডামির নামান্তর হইতেছে তাহাই নয়, অস্বাভাবিকও হইতেছে। ভূপতিত রক্তাক্ত একটি নারীকে স্বচক্ষে এমন অবস্থায় দেখিবার পর সে সম্বন্ধে নীরব থাকা খুবই অশোভন। উনিই যে হররমা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু উনিই যদি হররমা হন, তাহা হইলে লোকনাথবাবুর এ কি রকম আচরণ!

মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, একটা কথা—

কি বলুন?

আমি এসে যাকে দেখলাম, উনি—

শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল।

উনি আমার স্ত্রী।

লোকনাথবাবু শঙ্করের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, উনি আমার সাহিত্যিক জীবনের বাধা, অভিশাপ।

শঙ্কর সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বুঝতে পারছি না ঠিক।

পারতেন, যদি আপনিও একনিষ্ঠ সাহিত্যিক হতেন।

কেন, উনি করেছেন কি?

আমাকে সাহিত্য-পথভ্রষ্ট করবার জন্যে না করেছেন হেন কাজ নেই। আমার লণ্ঠনের পলতে ফেলে দিয়েছেন, দোয়াতের কালিতে জল মিশিয়েছেন, আমার খাতা কুঁচি কুঁচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ওঁর ইচ্ছে, ভারতীর নয়, ওঁরই আরতি আমি সারাজীবন ধ'রে করি।

লোকনাথবাবুর মুখভার কঠোর হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই বাজা মাগীটা জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছে আমার।

তিনি আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া হররমা পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

আমি তোমার জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছি? শুনুন তা হ'লে আপনি—

যাও, ভেতরে যাও।

আমার বিছে ফেরত দাও, এখুনি চ'লে যাচ্ছি।

দেব না। চ'লে যাও বলছি।

লোকনাথবাবুর চোখ দুইটা ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি একখানা বই চাপিয়া ধরিলেন। শঙ্করের ভয় হইল, হয়তো ছুঁড়িয়া মারিবেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং হররমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

আমার যা কিছু গয়না কাপড় ছিল, সব বেচে বেচে ওই 'ক্ষত্রিয়' ছাপা হচ্ছে। খাট বিছানা আলমারি দেরাজ সব ওইতে গেছে। ওই বিছেটুকু লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাও জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে আজ। ওটুকু উদ্ধার ক'রে দিন আমাকে, আপনার পায়ে পড়ছি আমি।

বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও বলছি—

চুপ করুন আপনি।

ধৈর্যচ্যুত শঙ্কর হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল। গর্জন শুনিয়া লোকনাথবাবুও চমকাইয়া উঠিলেন। শঙ্করের এই রুদ্র রূপ তিনি কখনও দেখেন নাই; তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সহসা তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

৪০

শঙ্কর পলাশপুর হইতে ফিরিতেছিল।

হররমার বিছা উদ্ধার করিয়া সে প্রত্যর্পণ করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে। লোকনাথবাবুকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে, 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইবার সমস্ত ব্যয়ভার সে বহন করিবে। 'ক্ষত্রিয়ের' প্রবন্ধাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে লোকনাথবাবু তাহা শঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং শঙ্কর নিজে কলিকাতায় গিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তাহা ছাপাইয়া যথাস্থানে সেগুলি বিতরণ করিবে। আজকাল মূল্য দিয়া কেহ 'ক্ষত্রিয়' কেনে না। লোকনাথবাবুর বিচারে যাঁহারা সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা বিনামূল্যে 'ক্ষত্রিয়' উপহার পাইয়া থাকেন। ইহা করিতে গিয়াই লোকনাথবাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না, শঙ্কর তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু শক্তি এবং আমার ঘরে একখণ্ড কপর্দক অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আমি থামব না। আমার স্ত্রী আমারই অর্থে তাঁর বোনপো-বউকে শাড়ি পাঠাবেন, আর অর্থাভাবে আমার কাগজ উঠে যাবে—এ কখনও হতে পারে না। এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।...লোকনাথবাবুর কথাগুলি শঙ্করের মনে পড়িল। লাঞ্ছিতা হররমার কাতর অশ্রুসিক্ত মুখখানিও মনে পড়িল। কাহারও দাবি সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

আজকাল 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইতে কত খরচ পড়িতে পারে, মনে মনে তাহাই সে হিসাব করিতেছিল। শুধু তাহাই নয়, যে 'ক্ষত্রিয়'কে একদিন সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, যাহা একদিন তাহার দিবসের চিন্তা এবং রাত্রির স্বপ্ন

ছিল, সেই 'ক্ষত্রিয়' অদ্ভুতভাবে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে—এই চিন্তায় সে বিভোর হইয়াছিল। সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া যাহাকে সে একদা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিল! 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাটাকে একটা জীবন্ত প্রাণবান কিছু বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল, মায়া কাটাইতে না পারিয়া পথ চিনিয়া আবার যেন ফিরিয়াছে। বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়িল। ছেলেবেলায় সে একটা কুকুর পুষিয়াছিল। যদিও অতি সাধারণ দেশী কুকুর, কিন্তু তাহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, শোয়ানো, কসরৎ শেখানো ছাড়া আর কোন কাজ বা চিন্তা ছিল না। কিন্তু সে কুকুরকে ছাড়িতে হইল। মায়ের শুচিবায়ু প্রবল ছিল। কুকুরটাকে দেখিলেই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন। শঙ্কর ওটাকে লইয়া মাথামাখি করিতেছে—এ চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। বাধ্য হইয়া কুকুরটাকে ছাড়িতে হইল। না ছাড়িলে মা হয়তো পাগলই হইয়া যাইতেন। সহপাঠী অবিনাশের কুকুরটার প্রতি লোভ ছিল, তাহাকেই সে কুকুরটা দান করিয়া দিল। অবিনাশ কুকুর লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। তাহার বাড়ি দশ ক্রোশ দূরে। মাস দুই পরে একদিন মনে হইল, কে যেন কপাট আঁচড়াইতেছে, কুঁই-কুঁই শব্দও শোনা গেল। দ্বার খুলিয়া শঙ্কর দেখে, টম ফিরিয়া আসিয়াছে। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার উৎসুক দৃষ্টি, আন্দোলিত পুচ্ছ—চোখের উপর ছবিটা আবার যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'ক্ষত্রিয়ে'র মলাটটা এবার নূতন ধরনের করিতে হইবে, কতই বা খরচ পড়িবে?

স্টেশনে গাড়ি ছিল না, শঙ্কর হাঁটিয়াই ফিরিতেছিল। হঠাৎ একটা কোলাহল কানে আসিল। চাহিয়া দেখিল, একদল লোক হাল্লা করিতে করিতে আসিতেছে। কিসের হাল্লা? কে ইহারা? ভ্যারা-রা-রা-রা—। ও, হোলির দল! সকলের মাথায় ফাগ, জামা-কাপড়ে রঙ, বুকের বাঙ্গে ভাল লাল রঙ জোটে নাই, সবুজ হলুদ বেগুনী যে যাহা পাইয়াছে মাখিয়াছে, অনেকের মুখে তেল-কালি মাখানো, খচমচ করিয়া একটা বাজনা বাজিতেছে, সঙ্গে গোটা কয়েক ঢোলও আছে, দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে হোলিতে

মাতিয়াছে সব। ছ্যারা-রা-রা-রা—। শঙ্কর একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহার মনে হইল, কে ইহারা? ইহারাই কি তাহার স্বদেশবাসী? ইহাদের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল কি আছে? এই ইহাদের উৎসব? এভাবে উৎসব করিবার কল্পনাও সে কি করিতে পারে? সভ্যতা ভব্যতা, শ্লীলতা শোভনতা, মানসিক যে সব উৎকর্ষকে আয়ত্ত করিবার জন্য সে এতদিন সাধনা করিয়াছে, এই জনতা কি তাহার মূর্ত প্রতিবাদ নয়? কিছুকাল পূর্বে "ভারতীয় সংস্কৃতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার মনে যে গর্ব হইয়াছিল, তাহা সহসা যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ইহাই কি ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ? বসন্তোৎসবের সহিত যে মদনিকা-মালবিকা, আবীর-কুঙ্কুম, ঝারি-পিচকারি, যে রঙ ও রসের মধুর ছবি তাহার কল্পলোকে রঙিন হইয়া আছে, এই উন্মত্ত অসভ্য দেহসর্বস্ব জনতার মধ্যে তাহার কিছুমাত্র আভাস তো নাই। ইহারা কি সত্যই ভারতীয়? সত্যই তাহার আপন লোক? ইহাদের উদ্ধার করিবার জন্যই কি সে জীবন পণ করিয়াছে? ইহাদের এই মূঢ় বর্বরদের উদ্ধার করিবার সত্যই কি উপায় আছে কোন? নির্বাক বিস্ময়ে নূতন দৃষ্টিতে সে এই জনতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে একটা নারী মূর্তি দেখা গেল। একটু কাছে আসিতেই দলের মধ্যে একজন আগাইয়া গিয়া অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীসহকারে মেয়েটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া অশ্লীল একটা ছড়া মুখে মুখে বানাইয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিল। জনতা গর্জন করিয়া উঠিল, হো-হো-হো-হো ছ্যারা-রা-রা-রা—। খচমচ খচমচ বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। মেয়েটা লজ্জায় মরিয়া গেল না, সরিয়া গেল না। ছদ্ম রোষভরে সে বরং আগাইয়া আসিল এবং রাস্তা হইতে এক আঁজলা ধুলা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। শঙ্কর হঠাৎ চিনিতে পারিল। মেয়েটা অপর কেহ নয়, ফুলশরিয়া। তাহাকে দেখিয়া যে লোকটা গান ধরিয়াছিল, সে চানাচুরওয়ালা রামু। রামুর চোখে বোধ হয় ধুলা পড়িয়া ছিল। তবু সে চোখমুখ কুচকাইয়া হাসিতে হাসিতে আগাইয়া গেল এবং ফুলশরিয়াকে ধরিয়া তাহার সমস্ত মুখখানাতে 'বাঁদুরে রঙ' মাখাইয়া দিল। আর একজন ঢালিয়া দিল পাতলা খানিকটা গোলাপী রঙ। বিস্রস্তকেশা ফুলশরিয়া এক মুঠা ধুলা

ছুঁড়িয়া মারিল। সর্বাঙ্গ তাহার রঙে ভিজাইয়া দিল 'ছোঁড়াপুতারা'! খচমচ খচমচ করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। হো-হো-হো-হো—হ্যারা-রা-রা-রা—উন্নত জনতা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। সহসা তাহারা শঙ্করকে দেখিতে পাইল এবং থামিয়া গেল। হঠাৎ ভিড়ের ভিতর হইতে ঈষৎ টলিতে টলিতে নটবর ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আসুন, আজকের দিনে একটু ফাগ নিন। অমন টিপ-টপ হয়ে থাকা মানায় না আজকের দিনে।

দিন

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও কপালটা না বাড়াইয়া দিয়া সে পারিল না। নটবর তাহার কপালে ফাগ লাগাইয়া দিলেন।

সেদিন আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছি আমি।

কেন, কিছু দরকার ছিল?

ছিল বইকি। হরিয়াটার নামে দারোগা সাহেব বি.এল. কেস চালাতে চান। এ গ্রাম থেকে একটি সাক্ষী যাতে না জোটে, তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

হরিয়া এবং অন্যান্য অনেকের নামে পুনরায় থানায় নালিশ হইয়াছে—এ কথা তিনি হরিয়ার মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া শঙ্করকে এ বিষয়ে কিছু বলাটা তাঁহার অনুচিত বোধ হইল। কেবল বলিলেন, কথা যখন দিয়েছি, তখন ও-ব্যাটাকে বাঁচাতেই হবে। আপনাকে সাহায্য করতে হবে একটু। ওরে হরিয়া!

ভিড়ের ভিতর হইতে রঙ-মাখা হরিয়া কুণ্ঠিতমুখে বাহির হইয়া আসিল।

কাল যাবি বাবুর বাড়িতে, গিয়ে একবার মনে করিয়ে দিবি। উনি পাঁচ কাজের মানুষ।

আচ্ছা, চলি তবে এখন আমরা। হৈ-হৈ করা যাক আজকের দিনটা—বছরে একটি দিন বই তো নয়।

দল আগাইয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, দলের ভিতর শুধু হরিয়া নয়, কারু,

ফকিয়া, কপূর্রা, মধু, বেচু—সকলেই রহিয়াছে। রঙে নাহিয়া ফুলশরিয়া একটু দূরে আগে আগে চলিতেছিল। শঙ্কর তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

হঠাৎ আর একটা দল আবিভূর্ত হইল। ইহাদের ধরনটা অন্যরূপ। একজনকে মড়া সাজাইয়া খাটের উপর শোয়াইয়াছে এবং শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। শোভাযাত্রার আগে একজন এবং পিছনে একজন গাধার পিঠে চড়িয়া আসিতেছে। সকলে, এমন কি মড়া এবং গাধা দুইটা পর্যন্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত। যে মড়া সাজিয়াছে, সে মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে এবং বাকি সকলে জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে। হোলির দিনে মৃত্যুকেও তাহারা রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে! হাসির হর্‌রা তুলিয়া মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতেছে, রাম নাম সৎ হ্যায়!

ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর উভয়েই রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। তাহাদের কেহ কিন্তু লক্ষ্যই করিল না, নিজেদের আনন্দেই সকলে মশগুল হইয়া রহিয়াছে।

ইহাদের পিছনে আর একটা তৃতীয় দলও দেখা দিল। ইহারা একটু প্রবীণ গোছের, পক্ককেশ বৃদ্ধও আছে। সকলেই ফাগ-মাখা, সকলেরই গায়ে রঙ। ঢোল এবং খঞ্জনি বাজাইয়া সমস্বরে গান গাহিতেছে—

সীতারাম সীতারাম, জয় জয় সীতারামকি—
রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম জয় জয় রাধেশ্যামকি—

গাহিতেছে ও নাচিতেছে। দুই হাত তুলিয়া উদ্দাম নৃত্য। ইহারাও চলিয়া গেল। ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর তখন পথে উঠিল। ফুলশরিয়া আগাইয়া চলিতে লাগিল। শঙ্কর গতিবেগ একটু মন্থর করিয়া দিল। ভাবিল, মেয়েটা আগাইয়া যাক। যে চিন্তাটা কিছুক্ষণ আগে তাহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল, তাহাই মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল। আমরা সত্যই কি একজাতের? ফুলশরিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং একমুখ হাসিয়া বলিল, তু হাম সেনিসে ঘিন করইছ, নেই বাবু?

প্রশ্নটা শুনিয়া শঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার মনের কথা মেয়েটা টের পাইল কি করিয়া! উহাদের সম্বন্ধে ঘৃণা, বড় জোর অনুকম্পা ছাড়া অন্য কোন ভাব যে সে পোষণ করে না, তাহা নিজেই সে এতদিন স্পষ্ট করিয়া জানিত না। ইহাদের সহিত সত্যই তো তাহার কোন আন্তরিক যোগ নাই। শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে চিন্তায় কর্মে সত্যই সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের লোক। গায়ের রঙ এবং মুখের ভাষা ছাড়া বিলাতী মিশনরিদের সহিত তাহার যে বিশেষ কোন তফাত নাই, সহসা এই সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ইহাদের সকলকে বর্বর মনে করিয়াই তো সে ইহাদের উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু ইহারা সত্যই কি বর্বর নয়? হঠাৎ নজরে পড়িল, ফুলশরিয়া তাহার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া আছে। মুখময় কালচে সবুজ রঙ, মাঝে মাঝে আবীর লাগিয়াছে, বিস্রস্ত অলকগুচ্ছ কপালের দুই পাশে দুলিতেছে, হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক রকম সাদা, রঙে ভিজিয়া শাড়িটা সর্বাঙ্গে সাঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে। একটা ডাকিনী যেন। এই কি ভারতীয় রমণীর প্রতীক? এই কি শত-করা পঁচানব্বই জনের একজন? চকিতের মধ্যে কয়েকটা মুখ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। অমিয়া, সুরমা, কুন্তলা, চুনচুন, বেলা, বউদিদি, মিষ্টিদিদি, রিনি, মুক্তো—ইহাদের মধ্যে কে ভারতীয়? সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কস্তুরবাই গান্ধী—ইহাদের মধ্যেই কি ভারতীয় রমণীর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে? এইমাত্র যে হররমার গহনা-সমস্যা সে সমাধান করিয়া আসিল, সে-ই কি ভারতীয়? না, এই ফুলশরিয়ারা? যমুনিয়ার শীর্ণ শুষ্ক মুখটাও মনে পড়িয়া গেল। ইহারাই তো সংখ্যায় বেশি। ইহাদেরও একটা জীবনযাপন নীতি আছে, কিন্তু আমাদের মানদণ্ড অনুসারে তাহা অসভ্য। সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহাদের সে সব বালাই নাই। ইহারাও চাষ করে, চাকরি করে, ব্যবসা করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, উপবাস করে, উৎসব করে। কিন্তু বিশেষ একটা কোন সভ্যতার আদর্শে সবাই চলে না। অথচ খুঁজিলে ইহাদের মধ্যে সবই

মিলিবে। অনার্য-আর্য-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সব রকম সভ্যতার উচ্ছিষ্ট আসিয়া ইহাদের মধ্যে জমা হইয়াছে। যেন একটা ডাস্টবিন!

ডাস্টবিনটা সহসা আবার কথা কহিয়া উঠিল, কহ না বাবু, তু হাম সেনি সে নফ্‌রত্‌ করইছ?

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ফুলশরিয়ার কথায় আবার আত্মস্থ হইল। অপ্রস্তুত মুখে ভুল হিন্দীতে আমতা আমতা করিয়া বলিতে হইল, না না, সে কি কথা, তোমাদের ঘৃণা করি না তো! আর কিন্তু সে ফুলশরিয়ার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। ফুলশরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিছন ফিরিয়া তাকাইলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, ফুলশরিয়া তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতেছে, যেন বাঘিনীর চোখ!

শঙ্কর কিন্তু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল এবং তাহাতে পল্লী-সংস্কার, লোকনাথ ঘোষাল, 'ক্ষত্রিয়', হররমা, অমিয়া, সুরমা, নিজের জীবনের আদর্শ, ভারতের ইতিহাস, ভবিষ্যৎ কর্তব্য— সমস্তই যেন অসংলগ্নভাবে আবর্তিত হইতেছিল। নতমস্তকে দ্রুতবেগে সে হাঁটিতে লাগিল, যেন একটা বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয়া চোখ বুজিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

৪১

উৎপল নিবিষ্টচিত্তে রেডিও শুনিতেছিল। কি সর্বনাশ, রেঙ্গুন যে যায় যায়! কেনারাম চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন।

নিপুবাবু আর প্রমথবাবু চ'লে গেলেন। কিন্তু—

কেনারাম ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া উৎপল যে আবার কি মূর্তি ধরিবে, তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারিতেছিলেন না।

আবার 'কিন্তু' কি?

উৎপল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

গদাই দত্ত জরিমানা দিতে চাইছে না।

কি বলছে?

বলছে—দেব না, আপনারা যা করতে পারেন করুন।

উৎপল রেডিওর ডায়ালটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনি এখন যান।

কেনারাম কতকগুলি কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেগুলি টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, ব্যাঙ্কের হিসেব এটা। আমি আপ-টু-ডেট ক'রে রেখেছি। হাজার দশেক টাকা লোকসান হয়েছে।

ওসব শঙ্করকে দেবেন। আমি তার সঙ্গেই কথাবার্তা কইব।

কেনারাম চলিয়া গেলেন।

উৎপল ক্ষণকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে তাহার অধরে হাসি ফুটিল। রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। সুরমার সহিতই পরামর্শটা করা যাক। ছোটখাটো একটা প্রলয় করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির সাহায্য লইলে নেহাত অশোভন হইবে না।

৪২

গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্কর দেখিল, গ্রামে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন লাগিয়াছে। পাটের গুদাম এবং ধানের গোলা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। রাজীব দত্তের বাড়ির চতুর্দিকে ভীড় এবং কোলাহল। দূর হইতে আকাশবিসর্পী লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উৎপল কথাকে কাজে পরিণত করিতে পারিয়াছে তাহা হইলে! রাগে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ যে কাহার উপর, ক্ষোভ ও দুঃখ যে কিসের জন্য, তাহা সে নির্ণয় করিতে পারিল না বলিয়াই সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বেদনায় আরও

টনটন করিতে লাগিল। দুষ্ট শাস্তি পাইয়াছে এবং সে শাস্তির আয়োজন তাহার অভিমত অনুসারেই হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই; সুরমাও ইহাতে খুশি হইবে—এ সব যুক্তি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল। হারিয়া গেলাম, নামিয়া গেলাম, সব নষ্ট হইয়া গেল। যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা হইল না। সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া চুপে চুপে সে বাড়ি ফিরিল। ফিরিবার পথে বারম্বার তাহার মনে হইতে লাগিল, ছাত্রজীবনে কোথাও আগুন লাগিয়াছে শুনিলে সে-ই সর্বাগ্রে ছুটিত আগুন নিবাইতে, এখন চোরের মত পলাইতেছে। কোন্ মুখ লইয়া সে এখন উহাদের কাছে যাইবে? ছি ছি, কি শোচনীয় অধঃপতন! কিন্তু কেন? কে সে নিজের আদর্শকে ছোট করিতেছে? সনাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ ছাড়িয়া কোথায় কিসের লোভে চলিয়াছে সে? নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতা সমস্ত ভুলিয়া তাহার মন সহসা এক নিষ্কলুষ স্বপ্নরাজ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওই স্বপ্নরাজ্যই তো তাহার লক্ষ্য। অপথে বিপথে কোথায় সে ঘুরিয়া মরিতেছে?

বাড়ি ফিরিতেই খুকী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বাড়ির সামনেই ফাঁক মাঠটায় সে দুইটি সমবয়সীর সঙ্গে সঙ্গে ধুলা মাখিয়া খেলা করিতেছিল তাহার ফ্রকে কে খানিকটা রঙ দিয়াছে। শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

বাবা, তুমি কোতা দেতলে?

পলাশপুর।

আমি পলাচপুর যাব।

এরা কে?

ছামিয়া বুদিয়া। কাও।

আধখানা-কামড়ানো একটা কুল সে শঙ্করের মুখে গুঁজিয়া দিল।

মুছাই এতো দুতু হয়েতে বাবা, কুল পেলে দিতে বললে দেয় না তাকে ব'কে দিও তো।

আচ্ছা।

বারান্দায় উঠিয়া সে খুকীকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খুকী ছুটিল মাকে খবর দিতে। বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই শঙ্করের চোখে পড়িল, টেবিলের উপর কয়েক দিনের ডাক জমিয়া রহিয়াছে। উপরের পোস্টকার্ডখানা শ্বশুরের। তুলিয়া পড়িতে লাগিল—আসন্নপ্রসবা অমিয়াকে তিনি লইয়া যাইতে চান। অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাপড় নানা রঙে বিচিত্র এবং সিক্ত।

এমন অসময়ে রঙ দিলে কে?

রঙ সকালে দিয়েছে। আমি এখন আমাদের খ'ড়ো চালে জল ঢালছিলাম। রাজীববাবুর গোলায় আগুন ধরেছে, দেখলে না?

হ্যাঁ, দেখলাম আসতে আসতে।

আহা, বেচারীর সব পুড়ে গেল! কি ক'রে যে লাগল আগুন!

শঙ্কর পোস্টকার্ডেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন দিল না।

একদিনের নাম ক'রে গেলে, এই বুঝি তোমার একদিন?

এ কথারও জবাব না দিয়া শঙ্কর বলিল, তোমার বাবা চিঠি লিখেছেন, দেখেছ?

দেখেছি।

যাচ্ছ কবে?

আমার আবার যাওয়া! আরও তিনজন পোষ্য জুটেছে—দাইয়ের ছেলেমেয়েরা তো আছেই।

আবার কে জুটল?

ঝমরু তার ছেলেদের নিয়ে হাজির হয়েছে এসে। তার গলা দিয়ে আর স্বর বেরোয় না, কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে রোজ। কাল দেখি, খিড়কি দরজার পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে। ছেলে দুটো পাশে ব'সে আছে চুপ ক'রে। দুদিন খেতে পায় নি বললে। ডেকে এনে খেতে দিলাম। আর নড়তে চাইছে না।

অমিয়া হাসিল। শঙ্করও হাসিল।

দীনদুঃখীদের প্রতি অমিয়ার একটা স্বাভাবিক করুণা অবশ্য আছে; কিন্তু কেবল এই জন্যই সে যে বাপের বাড়ি যাইতে চাহিতেছে না, তাহা সত্য নহে। আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে। শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সেও টের পাইয়াছিল। মুখে সে কিছু বলে নাই, কোনদিন বলিবেও না, কিন্তু শঙ্করকে ছাড়িয়া এ সময় সে কোথাও যাইবে না।

দুই হাতে দুই মুঠা মটরশুঁটি লইয়া খুকী ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া পাশ কাটাইয়া বাহিরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দেখেছ মেয়ের কাণ্ড? রেখে আয় মটরশুটি।—বলিয়া অমিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। খুকী চোখ দুইটি বড় করিয়া নীরবে শঙ্করের পানে চাহিল। ভাবটা, মায়ের ব্যবহারটা দেখ একবার!

শঙ্কর বলিল, দাও, দাও, ছেড়ে দাও।

ছাড়িয়া দিতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এমন দস্যি হয়েছে! ওরা এসে থেকে পর্যন্ত দিনরাত ওদের সঙ্গে আছে। কাল সন্ধ্যেবেলা ওদের কাছে গিয়ে শুয়েছিল পর্যন্ত।

ওরা শুচ্ছে কোথা?

ভাঁড়ার-ঘরের পাশের গলিটায়।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া শঙ্কর কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইল না। বাহিরের ঘরে লোকের পর লোক আসিতে লাগিল। স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়া দুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গেলেন। বিরিপুরের একজন শিক্ষক আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, লছমন গোয়ালার পুত্রকে ক্লাস প্রমোশন দেওয়া হয় নাই বলিয়া লছমন তাহাকে শাসাইতেছে, মারিবে বলিতেছে। লছমন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বিরিপুরে তাহার প্রতিপত্তিও আছে। শিক্ষক মহাশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার ব্যবস্থা না করিলে কার্যে ইস্তফা দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কাল্লু ফরিদ রহিম কর্পূরা ফকিরার দল এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আসিয়া পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল, দরোগার কবল হইতে বাঁচাইতে হইবে। কেনারামবাবু তাহাদের নামে থানায় নালিশ করিয়া

আসিয়াছেন। জমিরগঞ্জে উল্টা-মহরমের দিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জমিরগঞ্জ মুসলমান-প্রধান স্থান। একজন মৌলভী আসিয়া সমস্ত মুসলমানদের মন হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিয়াছে। সেখানকার হিন্দু-প্রজাদের মুখপাত্র গুলজার সিং আসিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। প্রতিকারের উপায়ও বলিয়া দিল। শঙ্করবাবু এবং গুলাব সিং আসিয়া যদি 'মদৎ' করেন, তাহা হইলে সে—গুলজার সিং—একাই উহাদের 'বীজ' পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিতে পারে। বদমায়েসগুলা একটা কচি বাছুরের গলায় মালা পরাইয়া সেটাকে হিন্দুদের বাড়ির সামনে দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গিয়া প্রকাশ্য স্থানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। গুলজার সিং আর একটা উপায়ও বলিল। রাজীব দত্ত ওই মুসলমানগুলার মহাজন। তিনিও ইচ্ছা করিলে প্রতিশোধ লইতে পারেন এবং শঙ্করবাবু অনুরোধ করিলে তিনি যে অস্বীকার করিবেন তাহা মনে হয় না। গুলাব সিং ও শঙ্করবাবুর অনুরোধ সে ঠেলিতে পারিবে না। চক্রবর্তী মহাশয় আসিয়া নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারের বিতাড়নবার্তা জানাইয়া গেলেন। প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলিলেন, পাঁচ বছর পুরে গেছে, উৎপল হিসেব চাইছিল। আমি ব্যাঙ্কের হিসেব ঠিক ক'রে রেখেছি। দশটি হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। তুমি বাকি সব ডিপার্টমেণ্টগুলোর হিসেব ঠিক রেখো। উৎপল বাইরে দেখতে ও-রকম হ'লে কি হবে, ভেতরে ভেতরে বেশ স্ট্রিক্ট আছে। খু—ব। চক্রবর্তী মহাশয় চলিয়া যাইবার পর ঝকসু আসিল এবং বলিল যে, নিপুবাবুর সহিত তাহার পুত্র রামলালও অন্তর্ধান করিয়াছে। ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার একজন চৌকিদারকে দিয়া খবর পাঠাইলেন, আশপাশের গ্রামে এই অসময়ে (খুব সম্ভবত হোলির জন্য) কলেরা লাগিয়াছে। পাশের গ্রামেই দশজন মারা গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়াছিলেন, তিনি তো কিছুই বলিলেন না, সম্ভবত কোন খবরই রাখেন না। অথচ প্রতি মাসে এই জন্য বেতন পান।

শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় অমিয়াকে

বলিয়া গেল, কেহ যদি খুঁজিতে আসে, তাহাকে যেন বলিয়া দেওয়া হয় যে, সে বাড়ি নাই। রাত্রি দশটার সময় অমিয়া যখন তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেল তখনও নিস্তব্ধ হইয়াই বসিয়া ছিল।

চল, খাবে চল।

চল।

অমন চুপ ক'রে মন-মরা হয়ে ব'সে আছ যে! কি হয়েছে?

কিছু না।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলবে না?

অমিয়াও পাশে বসিয়া পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। টাকাটা পুরিয়ে দিতে না পারলে উৎপলের কাছে মান থাকবে না।

অত টাকা লোকসান হ'ল কি ক'রে?

সবাই ধার নিয়েছে আর শোধ দেয় নি, মানে—দিতে পারে নি। আমি ভাবছি—

বলিতে গিয়া শঙ্কর হঠাৎ থামিয়া গেল।

কি ভাবছ?

একটা কথা তুমি জান—বাবা উইল ক'রে তাঁর সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে গেছেন?

জানি তো।

কি ক'রে জানলে?

তাঁর উইল তো ওই কাঠের আলমারির দেরাজে রয়েছে, দাদা সেবার এসে বার করলে যে। কেন, তাতে কি হয়েছে?

অমিয়া জানিত! জানিয়াও তাহাকে এতদিন কিছু বলে নাই! অমিয়া-চরিত্রের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ সহসা যেন তাহার চোখে পড়িয়া গেল।

কি ভাবছ, বললে না?

ভাবছি— না থাক, তোমার টাকাগুলো নষ্ট ক'রে ফেলা ঠিক হবে না।

আমার টাকা তোমার টাকা ব'লে আলাদা কিছু আছে নাকি? কালই তুমি টাকা তুলে ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দাও। তোমার মানের চেয়ে তো আর টাকা বড় নয়।

বাবা যে কত টাকা রেখে গেছেন, তাও তো ঠিক জানি না। ও-টাকাতে যদি না কুলোয়—

যদি না কুলোয় তা হ'লে আমার গয়না বিক্রি ক'রে দাও। ওর জন্মে আর ভাবনা কি? চল, খাবে চল। রাত হয়েছে।

শ্রদ্ধায় শঙ্করের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায়, অমিয়া তো তাহা নয়, তবু সে এত মহৎ! এত সহজে এত অনাড়ম্বরে এতগুলা টাকার অধিকার এমন অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া দিল! অনিবার্যভাবে একটা কথা তাহার মনে পড়িল। অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে সুরমা কি ঠিক এই রকম পারিত?

৪৩

হাসি অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে বসিয়া জবাবদিহি লিখিতেছিল।

গত পরীক্ষায় এত কম সংখ্যক ছাত্রী পাস করিয়াছে কেন—স্কুল-কমিটী জানিতে চাহিয়াছেন। হাসি সত্য কথাই লিখিতেছিল। লিখিতেছিল, এই অল্প কয়েকজন ছাত্রীই যে পাস করিতে পারিয়াছে, এজন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। পিতামাতারা যদি নিজেদের কন্যাদের লেখাপড়া বিষয়ে অবহিত না হন, বাড়িতে যদি তাহারা পড়াশোনা না করে, তাহা হইলে কেবলমাত্র সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসিলেই তাহারা কোনকালে পাস করিতে পারিবে না। স্কুলেও তাহারা নিয়মিত আসে না। যখন আসে, তখনও পড়ায় মন দেয় না। অমনোযোগী হইবার জন্য সামান্য শাস্তি দিলেও কান্নাকাটি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসে যে, কিছু বলিতে ভয় করে। অনেক অভিভাবক এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ শাস্তি দেওয়া পছন্দ করেন না। এ

অবস্থায় বেশি মেয়ে পাস করিলেই আমি বিস্মিত হইতাম। লেখাপড়ায় মেয়েদের এবং তাহার অভিভাবকদের যদি আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকে—

এ পর্যন্ত লিখিয়া সে থামিয়া গেল। বারান্দায় কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে। বিছানায় বসিয়া হেঁট হইয়া লিখিতেছিল সে, কলম ছাড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল।

দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল।

কে?

কোন্ উত্তর নাই।

কে?

খোলই না।

গলার স্বরটা যেন চেনা মনে হইল; কিন্তু কাহার, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইল এবং আগাইয়া গিয়া খিলটা খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিল একজন লাল-পাগড়ি কন্স্টেব্‌ল।

চিনতে পারছ?

লোকটার সামনের দাঁত একটাও নাই। এক মুখ গোঁফদাড়ি। তবু চোখের দিকে চাহিয়া হাসি চিন্ময়কে চিনিতে পারিল এবং বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠাকুরপো!

ওষ্ঠে তর্জনী স্থাপন করিয়া চিন্ময় বলিল, চুপ, আস্তে। জেল থেকে পালিয়ে এসেছি।

পুলিসের পোশাক কেন?

ছদ্মবেশ।

হাসি আরও খানিকক্ষণ চিন্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি যে এখানে আছি, সে খবর কে দিলে তোমাকে?

বেলা মল্লিক।

সে আবার কে?

তুমি তাকে চেন না, আলাপ হবে, ভয় নেই।

চিন্ময় হাসিল। হাসিতেই তাহার মুখের বীভৎসতা আরও প্রকট হইয়া পড়িল। সামনের দাঁত একটাও নাই, ঠোঁটগুলা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো—সমভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হয় না।

তোমার দাঁত কি হ'ল?

মেরে ভেঙে দিয়েছে। লোহার নাল বসানো বুটের লাথি—। বলিয়া সে আবার হাসিল।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হাসি চাহিয়া রহিল।

চিন্ময় বলিল, গোঁফ-দাড়ি দিয়েও এ হাসি ঢাকা যাবে না। ধরা পড়তে হবেই। তার আগে একটা দল গ'ড়ে দিয়ে যেতে চাই।

কিসের দল?

সব বলছি।

৪৪

অর্ধনিমীলিত লোচনে শঙ্করের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাজীবলোচনের অন্তরে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। ছোঁড়ার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিলে কেমন হয়! পুণ্য যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলে কি! পিতার সঞ্চিত অর্থ হইতে নির্বিকারভাবে দশ হাজার টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ করিবে! দেবতা, না, পাগল—কি এ!

বক্তব্য শেষ করিয়া শঙ্কর কুণ্ঠিতমুখে বলিল, আপনার কাছে অবশ্য বাবার কত টাকা জমা আছে, তা আমি জানি না ঠিক। কিন্তু দশ হাজার টাকা আমার চাই।

রাজীব অর্ধনিমীলিত লোচনেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চোয়ালটা বার দুই নড়িল।

আমার কাছে কত টাকা আছে, তা তোমার না-জানবার কথা নয়। টাকা নিয়ে তোমার বাবাকে আমি রসিদ দিয়েছি?

সে কোথায় আছে আমি খুঁজে দেখি নি।

রাজীবলোচনের ভাবলেশহীন মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির একটা আভাস যেন ফুটিয়া উঠিল।

আমার কাছে টাকা আছে, তা হ'লে জানলে কি ক'রে?

ছেলেবেলা থেকেই জানি। বাবা আর তো কোথাও টাকা রাখতেন না।

এই বুদ্ধি লইয়া ছোকরা উৎপলের জমিদারি চালাইতেছে নাকি? মনে মনে মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, ছেলেবেলা থেকেই জানি! আরে বাপু, তার প্রমাণ কি? আমি যদি এখন অস্বীকার করি, একটি আধলা যদি না দিই? গাড়োল কোথাকার! তাঁহার চোয়াল আরও বার দুই নড়িল, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, এ বছরের সুদটা এখনও হিসেব করি নি। গত বছর পর্যন্ত কুড়ি হাজার টাকা ছিল। এ বছরের সুদ নিয়ে বেশি হবে আরও কিছু।

তা হ'লে দশ হাজার টাকা দিন আমাকে।

হঠাৎ রাজীবলোচন ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া তাকাইলেন এবং তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, একটি কপর্দক দেব না।

দেবেন না! কেন?

তোমার বাবা আমার বন্ধু-লোক ছিলেন। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে বরবাদ করতে দেব না আমি। বিশ্বাস ক'রে তিনি আমার হাতে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শঙ্কর ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

একটু সসঙ্কোচে বলিল, কিন্তু আমার দরকার যে।

ও দরকার কোনও দরকারই নয়। ও টাকা কেনারাম দিক—ওই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল, ওই খেয়েছে টাকাটা, ওকে চেপে ধর।

আমার হুকুমেই টাকাটা খরচ হয়েছে, আইনত আমিই দায়ী।

আমার কাছ থেকে কিছু পাবে না।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এ কি রকম কথা বলছেন আপনি! আমার টাকা আমি পাব না!

টাকা তোমার নয়, তোমার স্ত্রীর। উইলের কপি আমার কাছেও দিয়ে গেছে অম্বিক।

বেশ, তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসছি আমি।

চিঠি নিয়ে এলেও হবে না, সাক্সেশন সার্টিফিকেট চাই, করালীচরণ বক্শিরও ফ্যাচাং আছে একটা।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রাজীবলোচনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এ সব সত্ত্বেও দিতাম যদি বুঝতাম, টাকাটা ন্যায্য খরচ হবে। তা যখন বুঝছি না, তখন বাগড়া দেব। বিশেষত তোমার কাছে যখন কোন প্রমাণ নেই যে, টাকাটা আমার কাছে আছে তখন তো কিছুই করতে পার না তুমি। আগে রসিদ বার কর।

রাজীবলোচনের চক্ষু দুইটি পুনরায় অর্ধনিমীলিত হইল। শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার কানের পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পিতৃবন্ধুকে কোন অসম্মানজনক কথা সে বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রাজীবলোচন পুনরায় চোখ খুলিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

অতিশয় নির্বোধ তোমরা। অগ্রপশ্চাৎ কিছু চিন্তা কর না, হটাম্ ক'রে একটা কিছু ক'রে বসাটাই স্বভাব তোমাদের। গদাটাই যে অতি নচ্ছার তা আমি জানি, ওকে শাসন করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ওকে ধ'রে চড়টা চাপড়টা দিলে পারতে, আমার গোলায় আগুন দিতে গেলে কেন বাপু? আমার কি ক্ষতি হ'ল তাতে, লাভই হ'ল বরং, ইন্সিওর করা ছিল সব। মরতে ম'ল কতকগুলো গরিব। ঠিক পাশের একটা ঘরে গরিব চাষীদের পাটের বাণ্ডিলগুলো ছিল, কোথাও রাখতে জায়গা পায় না, রেখে গিয়েছিল ওখানে, সেগুলো পুড়ে গিয়ে তাদেরই লোকসান হ'ল। আমার আর কি হ'ল?

আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না।

শঙ্কর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি চললাম এখন তা হ'লে।

টাকার জন্য চিন্তা ক'রো না, দরকারের সময় ঠিক পাবে, কিন্তু ববরাদ করতে দেব না আমি।

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রাজীব দত্ত একটু মুচকি হাসিলেন।

অন্ধকারে শঙ্কর গ্রামের পথে পথে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবিলম্বে দশ হাজার টাকা কোথায় কি উপায়ে পাওয়া যায়? রাজীব দত্ত সত্যই টাকাটা দিবে না কি···নিপুদা গেলেন কোথায়···কলেরা ক্রমশ বাড়িতেছে···হরিয়া কারু ফরিদকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব কি···সুরমা আর তো তাহার কোন খোঁজ করিল না···ডাকিতে না পাঠাইলে আর সে যাইবে না···নানা অসংলগ্ন চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতেছিল।

অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন অমিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার পদশব্দ শুনিবামাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

ছি ছি, কত রাত করলে তুমি!

বেশি রাত তো হয় নি, সাড়ে দশটা।

ও।

অমিয়ার চোখে ঘুম ছিল, তাই সে শঙ্করের চিন্তাচ্ছন্ন মুখটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল না। তাড়াতাড়ি আহারাদি চুকাইয়া শুইয়া পড়িল। শঙ্করও শুইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়াও যখন কিছু হইল না, তখন সে উঠিয়া বসিল। অমিয়া খুকী উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দচরণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল পাশের ঘরেই আলমারিটা আছে। বাবার বিরাট আলমারিটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সে। বহুকাল এটাকে খোলা হয় নাই। ইহার চাবি

যে কোন্‌টা, তাহার মনে নাই। চাবির গোছাটা আনিয়া একটার পর একটা লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। রসিদটা খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

চিঠির বাণ্ডিল খাতা ডায়েরি বই ফাইলের স্তূপের ভিতর বসিয়া শঙ্কর রসিদ খুঁজিতেছিল। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সহসা শব্দ হইল।

রাম নাম সৎ হ্যায়—

সে চমকাইয়া উঠিল। কে মারা গেল? ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, ভোর হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেছে। সমস্ত রাত খুঁজিয়াও কোন রসিদ বা পাস-বই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল সে। কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিতেই চোখে পড়িল, লেটার-বক্সে একখানা চিঠি রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল, খামের উপর তাহারই নাম লেখা। কাহার চিঠি? খুলিয়া পড়িল—

শ্রীচরণেষু,

আমি আর থাকতে পারলাম না, চললাম। কেন বা কোথায়, তা বলব না। বৃহত্তর যে আহ্বানের অপেক্ষা করছিলাম, তা এসেছে। আমাকে খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। 'তুমি' আপনার কাছে রইল। ওর ভার আপনাকে দিয়ে গেলাম। কোন্ অধিকারে যে এত বড় ভার স্বচ্ছন্দে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, তা জানি না। মনে হচ্ছে কিন্তু, অধিকার আছে। কোনও সঙ্কোচ হচ্ছে না। আর একটা কথা। যে দশ হাজার টাকার জন্যে আপনার বন্ধুর জেল হয়েছিল, তা আমার কাছেই ছিল এতদিন। টাকাটা আমাকেই এনে দিয়েছিলেন তিনি, আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। সে টাকা আমার ট্রাঙ্কের তলায় আছে। টাকাটা আপনিই নিন, আমি আর কি করব ও নিয়ে! এতবড় গোপনীয় চিঠিটা আপনার খোলা লেটার-বক্সে রেখে যেতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কি? একটা ভরসার কথা, খোলা জায়গাতেই গোপনীয় জিনিস সবচেয়ে নিরাপদে থাকে। সন্দেহ জাগে না কারও। আশা করি, আমার জন্যে বিপদে পড়বেন না। চিঠিটা প'ড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনাকে একটা প্রণাম ক'রে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না।

না, দূর থেকেই তাই প্রণাম জানাচ্ছি। আমার সম্বন্ধে যাহোক একটা বানিয়ে প্রচার ক'রে দেবেন। যদি কোনদিন ফিরি, আবার দেখা হবে আর না যদি ফিরি, তা হ'লে এই শেষ। ইতি

প্রণতা হাসি

শঙ্কর নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হাসি কোথায় গেল? কেন গেল? তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সে। হাসির কোয়ার্টার্সে গিয়া দেখিল, হাসি নাই। চাকরটা কিছুই বলিতে পারিল না। 'তুমি' উঠিয়াছে এবং গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ছোট মৃন্ময় যেন।

মা কোথায়?

জানি না।

আমাদের বাড়ি যাবে? চল।

'তুমি' গম্ভীরভাবে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইল।

তাহার পর বলিল, চলুন।

কোন আপত্তি করিল না, জামাটি গায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের সম্বন্ধেও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিল না। শঙ্কর স্কুলের চাকরটাকে ডাকিয়া যখন তাহার মাথায় ট্রাঙ্কটা তুলিয়া দিল, তখনও সে কোন প্রশ্ন করিল না।

চল।

শঙ্করের পিছু পিছু সে চলিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, তোমার মা একটা কাজে গেছেন। কিছুদিন পরে আবার আসবেন। ততদিন আমাদের কাছে থাক।

আচ্ছা।

হাসির ব্যবহারে শঙ্কর অবাক হইয়া গিয়াছিল। আরও অবাক হইয়া গেল 'তুমি'র ব্যবহারে। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'তুমি' যেন সব জানে, কেবল আত্মসম্মানে বাধিতেছে বলিয়া কিছু বলিতেছে না।

শঙ্কর অমিয়াকে সত্য কথাটা বলিল না। বলিল, হাসি স্কুলের কাজে

কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে। যতদিন না ফেরে, ততদিন 'তুমি' তাহার নিকট থাকিবে।

অমিয়া বলিল, বেশ তো।

সবচেয়ে খুশি হইয়া উঠিল খুকী। সে তাড়াতাড়ি 'তুমি'র হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে নিজের ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখাইতে বসিল।

এইতে হাতি, এইতে খুকু, এইতে মোতল—

শঙ্কর পুনরায় আসিয়া আলমারির সম্মুখে বসিয়া ছিল। খাতাপত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তুলিয়া রাখিতে রাখিতে হাসির কথাই ভাবিতে লাগিল। বৃহত্তর আহ্বান কি হইতে পারে? হাসিকে সে কোনদিনই বুঝিতে পারে নাই। তখনই আবার মনে হইল, কাহাকেই বা আমরা বুঝি? যাহাকে বুঝি বলিয়া মনে করি, তাহাকে হয়তো ভুল বুঝি। চকিতে সুরমার কথাটা মনে পড়িল। সুরমার কথাই ভাবিতে লাগিল সে। কিছুক্ষণ পরে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। রসিদ খুঁজিবার আগ্রহ তাহার তো আর নাই। হাসির অপ্রত্যাশিত চিঠিটা পাইয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও এখন ট্রাঙ্ক খুলিয়া—সহসা মনে হইল, ট্রাঙ্কের চাবি তো আমার কাছে নাই! বাসায় নিশ্চয়ই আছে কোথাও। পরে গিয়া লইয়া আসিলেই হইবে। টাকাটা আছে নিশ্চয়। হাসি শুধু শুধু মিথ্যা কথা লিখিবে কেন? তখনই আবার মনে হইল, ও-টাকা এমন ভাবে খরচ করাটা কি ঠিক হইবে? দেখা যাক।

চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়—

আবার? শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল, মুশাই আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনিল, গ্রামে খুব কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে।

সাইকেলে চড়িয়া শঙ্কর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিল। এমন অসময়ে যে এত কলেরা হইতে পারে, তাহা তাহার স্যানিটেশন বিভাগ কল্পনা করে নাই। চৌধুরী বলিলেন যে, প্রথমটা যদিও তিনি খবর পান নাই, এখন কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কূপে কূপে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া হইয়াছে, গরিবদের পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট বিতরিত হইয়াছে, নূতন রোগী হইলেই স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হইতেছে, কিছু কিছু ভ্যাক্‌সিনও দেওয়া হইয়াছে; তথাপি কেন যে ফলোদয় হইতেছে না, সে জবাবদিহি করিতে তিনি অপারগ। তিনি যথাকর্তব্য যথাসাধ্যই তো করিয়া চলিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িল। বহু লোক মরিতেছে। একটা ডাক-বাংলোয় গভর্মেণ্ট-নিয়োজিত একজন হেল্‌থ অফিসারের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। ভদ্রলোক খাকী হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট পরিয়া মাথায় শোলার হ্যাট চড়াইয়া শঙ্করের মতই সাইকেল-যোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কলেরা কেন থামিতেছে না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি ফস্‌ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া সক্ষোভে উত্তর দিলেন, কি ক'রে বলব বলুন? কলেরা থামানো তো আমার কাজ নয়, আমার কাজ ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করা। তাই ক'রে যাচ্ছি প্রাণপণে। কলেরা থামল কি থামল না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ইচ্ছেও নেই নাকি? দিন একটা আমাকে—আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

এই যে আসুন। ইচ্ছে থাকবে না কেন মশাই, ইচ্ছে খুব আছে, উপায়ও জানা আছে, কিন্তু কিছু করা যাবে না।

করা যাবে না কেন?

বলি তা হ'লে শুনুন। কলেরার বিষ শুধু যে জল দিয়েই সংক্রামিত হয় তা নয়, যে কোন খাদ্যদ্রব্য দিয়েই তা হয়। কিন্তু আমাদের যত আক্রোশ কেবল জলের ওপর, অন্য সব বিষয়ে আমরা উদাসীন। এই গয়লানীগুলো

দুধ বেচছে, এই যে সবাই পেয়ারা চিবুচ্ছে, এদের ওপর আমাদের কোন কন্‌ট্রোল নেই। আমরা শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়েই খালাস—সব ফুটাকে খাও। আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করে না।

না করবার কারণটা কি?

আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, ভেবেছেন? নট এ সিংগ্‌ল সোল। খাকী হ্যাট-কোট দেখলেই ভাবে পুলিসজাতীয় কেউ হবে বোধ হয় একজন—আমাদের হ্যারাস করতে এসেছে। আর আমরা পুলিসের হেল্‌প নিয়ে কাজও করি যে। সেইজন্যে লোকে আমাদের ভয় করে, বিশ্বাস করে না। ওদের যত বিশ্বাস বৈদ্য কবরেজ গোঁসাই এই সবের উপর। কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট পর্যন্ত দিতে দেয় না মশাই। একটা কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট দিয়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। ভাগ্যে বাইক ছিল, চোঁ-চোঁ দৌড়ে তবে প্রাণটা বাঁচে। আর একটু হ'লেই পশ্চিমে গোয়ালার লাঠিতে মাথাটি ফাটত আমার সেদিন। ডাক্তারবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সবিস্তারে গল্পটি বলিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ অবিশ্বাসের হেতু কি?

তা জানি না মশাই, তবে এইটে বুঝেছি যে, ফরসা-জামা-কাপড়-ওলা সো-কল্‌ড ভদ্রলোক মাত্রকেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। ফরসা কাপড় জামার ওপর ওদের ঘোর সন্দেহ। ওদের নিজেদের মধ্যেও কেউ যদি বেশ ফরসা কাপড় জামা প'রে একটু ফিটফাট হয়, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে নেয় যে, তার চরিত্র খারাপ হয়েছে। মেয়েরা তো এই ভয়ে ফরসা কাপড় পরতেই চায় না। আর সত্যিই দেখা যায় যে, যারা বেশি ফিটফাট, তাদের চরিত্র খারাপ। আমাদের সম্বন্ধেও ওদের ধারণা যে, আমরা ভাল করবার ছুতোয় এসে ঠিক পকেট মেরে নিয়ে যাব।

একটু হাসিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, আর পকেট মারিও আমরা। নেহাৎ মিথ্যে কথাও নয়।

পকেট মারেন?

মারি না? আজই তো এক পাউণ্ড পার্মাঙ্গানেট, এক পাউণ্ড কুইনিন

বেচলুম।' কিন্তু খরচ দেখিয়ে দিলুম। শুধু যে বেচি তা নয়, দানও করি। বন্ধু-বান্ধবদের স্পিরিট, টিঞ্চার আইয়োডিন, কুইনিন তো হরদম দিচ্ছি। কি করি, চাইলে 'না' বলতে পারি না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

না বেচে কি করি বলুন, আমাদের ওপর তো জাস্টিস হয় না। দশ বচ্ছরের ওপর চাকরি করছি, এখনও পর্যন্ত একটা ডিস্‌পেন্সারি পেলাম না। অথচ আমার চেয়ে কত জুনিয়র ঢুকল আর পটাপট ডিস্‌পেন্সারি পেলে। আমার অপরাধ আমি বাঙালী আর হিন্দু। এই কংগ্রেস মিনিস্ট্রি আরও ডোবালে আমাদের মশাই। এতগুলো চোর যে কি ক'রে একসঙ্গে জুটল এত অল্প সময়ের মধ্যে! এর চেয়ে সাহেব মনিব ঢের ভাল ছিল মশাই, সাহেব জাত গুণের কদর বোঝে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

ডাক্তারবাবুও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, লাক্ লাক্, সবই লাক্ মশাই। যখন আই.এস-সি. পাস করলুম, বাবা বললেন—যা, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়্‌গে যা। তখন কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল, ডাক্তারিটা নোব্‌ল প্রফেশন, ডাক্তারই হতে হবে। মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, কোথাও ঢুকতে না পেয়ে শেষে দুর্গা ব'লে কটক মেডিকেল স্কুলেই ঢুকলাম, তা-ও অনেক ঘুস-ঘাস দিয়ে। বার তিনেক ফেলও করলাম। শেষে অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে বেরিয়ে প্র্যাক্‌টিস করতে বসলাম দিনকতক। কিছু হ'ল না। আমাকে ডাকবে কে! ঢুকলাম শেষে চাকরিতে। বৃহৎ পরিবার ঘাড়ে, কি করি বলুন? কিন্তু চাকরির তো এই দশা—

বৃহৎ পরিবার বুঝি আপনার?

রাবণের গুষ্টি। আর সব এই শম্মার ঘাড়ে। গঙ্গাতে দিলে না মশাই, অনেক কষ্টে যেই ছুটি একুটি পাতা ছাড়ছি, অমনি কেউ না কেউ এসে মুড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে। আজ ভাগনে, কাল ভাইপো, পরশু বেয়াই, তরশু

বউ—একটা না একটা লেগেই আছে। শুধু মাইনেটি সম্বল ক'রে কি চলে মশাই? চলে না।

আপনাদের উপরি কিছু নেই বুঝি?

ওই যা অ্যালাউন্স পাই, তাও যৎসামান্য। আর এই চুরি-চামারি ক'রে যা দু-চার টাকা হয়। কলেরা থামবে কি ক'রে? আমরা কেউ কি উইলিং ওয়ার্কার? কেউ না। উইলিং হব কি ক'রে, বলুন? আমাদের হাতে ক্ষমতাও দেয় না, পয়সাও দেয় না, আমাদের ওপর সুবিচারও হয় না। আমাদের কেবল I have the honour to be sir, your most odedient servant পর্যন্ত দৌড়। তাই ক'রে যাচ্ছি। কেউ প্রাণ দিয়ে কাজ করে না। সব চোর। আমাদের কাজ হচ্ছে গ্রামের গুরুদের কাছে কুইনিন, পটাশিয়ম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া। উদ্দেশ্য—তারা গ্রামের গরিবদের বিনা পয়সায় বিতরণ করবে। কেউ তা করে, ভেবেছেন? সব বিক্রি করে। আর এই যে আপনারা সব ছ টাকা আট টাকা মাইনে দিয়ে গুরু নিযুক্ত করেছেন, এরা কেউ কি পড়ায় ভেবেছেন ভাল ক'রে? পাজির পা-ঝাড়া ব্যাটারা। কারও বারান্দায়, কারও আটচালায়, থিয়োরেটিক্যালি এক-একটা পাঠশালা খুলে রেখেছে খালি, কতকগুলো ছোঁড়া সেখানে ব'সে গুলতানি করে মাঝে মাঝে, পড়াশোনা কিচ্ছু হয় না। অনেক গুরু আবার অন্য জায়গায় চাকরিও করেন। অথচ কাগজে কলমে দেখুন এত টাকা spent for education! এডুকেশন তো হচ্ছে কচু!

বলেন কি!

শুধু কচু নয়, কচু-পোড়া! এ দেশের উদ্ধার নেই মশাই। এই আপনারাই যে পল্লীসংস্কারের জন্যে এত টাকা ঢালছেন, তা কি হচ্ছে জানেন? আমার মতে দেশের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে কেবল। অধিকাংশ টাকাই পাঁচজনে লুটে-পুটে খেয়ে ফেলছে, দেশ কিছুই পাচ্ছে না। কাজ করছে মিশনারিরা, দেখে আসুন গিয়ে।

কিন্তু আমাদের উপায় কি?

উপায়? উপায় ভগবান।

বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ওই যে আপনাদের চৌধুরী, যাকে আপনারা স্যানিটেশন বিভাগের কর্তা ক'রে রেখেছেন, একের নম্বর চোর ব্যাটা। চরণ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার মাঝে মাঝে কুইনিন নেয় আমার কাছে, হাফ প্রাইসে দিই তাকে আমি, এবারও তার জন্যে রেখেছিলাম কিছু, কিন্তু এবার সে নিলে না, বললে, চৌধুরীর কাছে পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছে ওয়ান ফোর্থ দামে। চৌধুরী পাঁচ পাউণ্ড কুইনিন পায় কোথা থেকে মশাই?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। কয়েকদিন আগেই চৌধুরী তাহার নিকট হইতে দুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গিয়াছে।

ডাক-বাংলার চৌকিদারটা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারই আত্মীয় একটি শিশুর কলেরা হইয়াছে। বলিল, চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। স্থানীয় কূপে 'দাবাই' দেওয়া হইয়াছে, ছেলেটিকে 'জক্‌সন'ও দেওয়া হইয়াছিল, একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া 'পানি'ও চড়াইয়া গিয়াছেন, তবু ছেলেটির অবস্থা শোচনীয়। সাহেব যদি মেহেরবানি করিয়া একবার—

তোমার বাড়ি কতদূর?

নগিচে হুজুর।

যাবেন নাকি; চলুন না দেখে আসা যাক, কাছেই বলছে।

চলুন।

যাইতে যাইতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাক্‌সিনের কি অভিজ্ঞতা আপনার?

সময়মত হিসেবমত দিলে খাসা কাজ করে। কাজেও বেশ উপকার হয়। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, ঠিক সময়ে ঠিকমত সব হয়ে ওঠে না। এরা সব সময়ে ইন্‌জেক্‌শন নিতেই চায় না। কাঁহাতক সাধ্যসাধনা ক'রে বেড়াই ব্যাটাদের।

রোগীর বাড়িতে গিয়া দেখা গেল, রোগী মুমূর্ষ। তিন-চারি বৎসরের একটি শিশু। শঙ্করদের ডিস্‌পেন্সারির ডাক্তারবাবু 'স্যালাইন সাব কিউটেনিয়াস' দিয়া গিয়াছেন। বগলের নীচেটা ফুলিয়া আছে। ফা

ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা খাওয়ানা হইতেছে। গোপনে গোপনে বৈদ্যদের 'দাবাই'ও চলিতেছে। গলায় একটা মাদুলিও পরানো হইয়াছে। তবু অবস্থা শোচনীয়। চোখের কোণ বসা, মাথার চুল রুক্ষ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শুষ্ক অধর। অন্ধকার ঘরের ভিতর পচা ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ। বমি ও বিষ্ঠার উপর মাছি ভনভন করিতেছে। কাল ইহার বড়টি মারা গিয়াছে, আজ এটিও যায় যায়। নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মৃত—ক্ষীণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও থামিয়া যায় নাই কেবল। ডাক্তারবাবু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিলেন, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া শঙ্করের পানে চাহিলেন।

মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, মাই গে!

মা পাশেই বসিয়া ছিল। ঝুঁকিয়া বলিল, কি বেটা?

মেয়েটা দুই শীর্ণ হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। ভয় পাইয়াছে।

ডর নেই বেটা, ডাক্‌টরবাবু আইলোছে, ঘুর দেখে দ।

মেয়ে কিন্তু মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

মা তখন তাকে চুমু খাইয়া খাইয়া ভুলাইতে লাগিল, লাল্ মেরা, সুগা মেরা, ঘুর ঘুর দেখে দ।

ডাক্তারবাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

আর দেখবার দরকার নেই। যা দেখবার দেখে নিয়েছি। চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি হবে? আরে, ওইসে করকে চুম মৎ খাও। ফিন তুমরাভি হোগা।

মা কিন্তু চুমু খাইতে লাগিল, বারণ শুনিল না।

ডিস্‌গাস্টিং! আসুন।

ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু শঙ্করও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু চৌকিদারটিকে বলিলেন যে, চিকিৎসা ঠিক মতই চলিতেছে, আর নূতন কিছু করিবার নাই। ফাজটা ঘন ঘন যেন খাওয়ানো হয়। চৌকিদার 'জি হুজুর' বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চলুন, যাওয়া যাক।

নির্বাক শঙ্কর ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু যেন যন্ত্রচালিতবৎ চলিতে লাগিল।

ওকে বললুম বটে, চিকিৎসা ঠিকমত চলছে, কিন্তু ঠিকমত চলছে না। অধিকাংশ ডাক্তারই মনে করে, কলেরা হ'লেই স্যালাইন দিতে হবে। কোন রকমে পানি চড়াতে পারলেই যেন চিকিৎসার চরম হয়ে গেল।… ও কি! আপনি অমন গুম মেরে গেলেন কেন?

শঙ্কর তবু কিছু বলিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল।

আপনার কি মনে হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি। I respect your feeling—আপনার মনে হচ্ছে এত ক'রে কিছু হচ্ছে না। হবে কি ক'রে? স্বচক্ষেই তো দেখলেন, মা-টা ওর মুখে মুখ লাগিয়ে চুম খাচ্ছে, চতুর্দিকে মাছি ভনভন করছে, পাশেই সরাতে পান্তা ভাত বাসি ডাল রয়েছে, তাতে মাছি বসছে, একটু পরেই মাগী গিলবে ওগুলো গপগপ ক'রে। আমরা জলে পার্মাঙ্গানেট দিয়ে আর কি করব, বলুন?

ম্লান হেসে শঙ্কর বলিল, সব বুঝেও কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। আমি আর ডাক-বাংলোয় ফিরব না, আপনি যান।

আপনি কোথা যাবেন?

আমি আমাদের ডিস্‌পেন্সারির দিকেই যাই একবার।

আচ্ছা, তা হ'লে নমস্কার।

নমস্কার।

এক ছেলে মারা গিয়াছে, আশেপাশে সকলে মারা যাইতেছে, রোগটা কত ভীষণ তাহা অজানা নাই, কি করিলে রোগের হাত হইতে বাঁচা যায় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বারম্বার তাহা বলিয়া দিতেছেন, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া তবু মা সন্তানকে চুম খাইতেছে। শঙ্করের নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারই অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার সান্নিধ্য তিনি এড়াইতে চান।…অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ডিস্‌পেন্সারির দিকে না গিয়া অন্য দিকে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঠে ফসল উঠিতেছে কলাই মুগ কুরথি কাটা হইয়াছে, এখন গরু দিয়া তাহা মাড়ানো হইতেছে—

এ দেশে 'দৌনি' বলে। পাশাপাশি আট-দশটা গরু মাঝখানে পোতা একটা বাঁশের খুঁটাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক গরুর মুখে একটা করিয়া দড়ির জাল না দিলে ফসল খাইয়া ফেলিবে। গরুগুলা অনাহার-ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। যে লোকটা গরু হাঁকাইতেছে, সেও অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। মাথায় একটা মলিন পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, ছেঁড়া ময়লা কাপড় হাঁটুর উপর উঠিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার আনন্দের সীমা নাই। আশেপাশে যে এত লোক কলেরায় মরিতেছে, তাহা যেন সে জানেই না। আনন্দে গান ধরিয়া দিয়াছে। নিকটেই 'ওসৌনি' হইতেছে। একদল মেয়ে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, প্রত্যেকেই এক-একটি করিয়া কুলা হাত দিয়া মাথার কাছে তুলিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছে। কুলায় আছে মাড়ানো ফসল। ফসল পায়ের কাছে পড়িতেছে, খোসাগুলি উড়িয়া যাইতেছে। মেয়েগুলিও সমস্বরে গান ধরিয়াছে। একটি যুবক ফসলগুলি মেয়েদের পায়ের নিকট হইতে সরাইয়া এক জায়গায় জমা করিতেছিল, সে একটি যুবতীর পায়ের নিকট আসিয়া কি একটা রসিকতাই করিল বোধ হয়, মেয়েটি সকোপকটাক্ষে ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাকে ছোট্ট একটি লাথি মারিল। সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরুগুলি দ্রুততর বেগে ছুটিয়া যেন এ আনন্দে যোগ দিল। শঙ্করের মনের মেঘও সহসা যেন কাটিয়া গেল। এত দুঃখেও ইহাদের প্রাণের উৎসব থামিয়া যায় নাই তো! খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কলেরায় মরে, তবু এত আনন্দ! দুঃখে হাহাকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সুখের দিনে উৎসব করিতেও ইহাদের বাধে না। কোন 'পরব' বাদ দেয় না, একটা কিছু হইলেই হইল। উপার্জন করিয়া, ধার করিয়া, চুরি করিয়া, যেমন করিয়া হোক দলে দলে রঙিন কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইবে—মিঠাই কিনিবে, পুতুল কিনিবে, নাচিবে, গাহিবে। সে মিঠাই, সে পুতুল, সে নাচ, সে গান হয়তো উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু তাহাতেই উহারা আনন্দে বিহ্বল। আমরা উহাদের ঠিক চিনি না, উহারাও আমাদের ঠিক চেনে না, মাঝখানে কি একটা যেন বাধা সৃষ্টি করিয়াছে! কি সেটা?···হঠাৎ অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শুনিয়া শঙ্কর পিছু ফিরিয়া চাহিল। একরাশ ধুলা উড়াইয়া নটবর

ডাক্তার বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেলেন। মনে হইল, গ্রামের ভিতরই গেলেন। ওই মেয়েটাকেই দেখিতে গেলেন নাকি? শঙ্করও ফিরিল, সেই চৌকিদারের বাড়ির দিকেই আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। গিয়া দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক। চৌকিদারের বাড়ির সামনের বেঁটে খেজুরগাছটায় নটবর ডাক্তারের ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। আর একটু কাছে গিয়া শঙ্কর শুনিতে পাইল, নটবর তারস্বরে গালাগালি শুরু করিয়াছেন।

এতনা দের তক্ কেয়া করতা থা রে শালা সব? পুটুর পুটুর তাকে হ্যায়। আগিন্ বানাও জলদি—ফুকো জোরসে উল্লু কাঁহাকা। হট্।

শঙ্কর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। উঁকি দিয়া দেখিল, নটবর নিজেই উবু হইয়া বসিয়া একটা উনুনে ফুঁ দিতেছেন। তাঁহার বড় বড় লাল চোখ ধোঁয়ায় আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ ফুঁ দিয়া তিনি বলিলেন, ফুঁক আচ্ছা করকে, এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইতেই শঙ্করের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

আরে, আপনাকেও ডেকে এনেছে নাকি ব্যাটা?

না, আমি এমনিই এসেছি।

চলুন, বাইরে চলুন, এখানে বড্ড ধোঁয়া। শালারা উনুনটা পর্যন্ত ভাল ক'রে ধরিয়ে রাখে নি। অথচ ঘণ্টা দুই আগে আমাকে যখন ডাকতে গিয়েছিল, তখন পই পই ক'রে ব'লে দিলাম, চরণ ডাক্তারকে খবর দিয়ে বিকেল নাগাদ আমি ঠিক পৌঁছব। তোরা উনুনে এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে রাখ্‌গে যা, গরম জল চাই। কিচ্ছু করে নি শালা, কেবল ডাক্তার চেখে চেখে বেড়াচ্ছে, হেলথ অফিসারটাকে পর্যন্ত ডেকে এনে দেখিয়েছে বলছে। আর যার যা খুশি ওষুধ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে গেছে। এখন তুই শালা সামলা। আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথাও আছে। এ ব্যাটাদের শতরঞ্চি মাদুর কিচ্ছু নেই যে বিছিয়ে বসি, সব শুয়ে মুতে একশা হয়ে আছে। আঃ! আসুন, এইখানেই বসা যাক।

বাড়ির সামনে গোটা কয়েক ইঁট পড়িয়া ছিল। একটা ইঁট শঙ্করের দিকে

আগাইয়া দিয়া আর একটাতে নটবর উপবেশন করিলেন এবং হুকুম করিলেন, বেগ লে আও।

ত্রস্ত চৌকিদার তাড়াতাড়ি ঔষধের ব্যাগটি আনিয়া সম্মুখে রাখিল। নটবর ব্যাগ খুলিয়া কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শনের ঔষধ বাহির করিয়া দেখিলেন; তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, এই মরেছে, কিছুই শালার মনে থাকে না, আঃ!

কি হ'ল?

পি.ডি.র পিটুইট্রিনটা আনতে ভুলেছি, অথচ ওটা দরকার এখুনি। যাই, টপ ক'রে গিয়ে নিয়ে আসি। জলটা ততক্ষণ গরম হোক। আপনি বসবেন? আমি যাব আর আসব। ঘোড়ার পিঠে দু কোশ যেতে আর কতক্ষণ লাগবে! আপনার সঙ্গে দরকার ছিল একটু, হনিয়ার সেই ব্যাপারটা— আচ্ছা সে পরে হবে না হয়, ওষুধটা আগে দরকার, যাই।

এখানে আমাদের ডিস্‌পেন্সারিতে ওষুধটা কি পাওয়া যাবে না?

যাওয়া তো উচিত।—বলিয়াই মুচকি হাসিয়া নটবর বলিলেন, কিন্তু আমার নাম শুনলে আপনাদের ডাক্তার দেবে কি না সন্দেহ। সেদিন মদের ঝোঁকে লোকটাকে জুতো নিয়ে তাড়া করেছিলুম।

এক মুখ হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিলেন।

কেন, কি হয়েছিল?

সেদিন এই পাশের গ্রামেই ভোজু গোয়ালার বাড়িতে রুগী দেখতে গেছি। গিয়ে শুনলাম, ভোজু ওঁকেও খবর দিয়েছে। ব'সে রইলাম ওঁর অপেক্ষায়। খানিকক্ষণ পরে উনি সুট চড়িয়ে গটমট ক'রে এলেন, রুগী দেখলেন, আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত কইলেন না। আমি নিজেই তখন উপযাচক হয়ে বললাম, পিঠের ডান দিকে নীচে 'ক্রিপিটেশান' আছে ব'লে মনে হচ্ছে, দেখেছেন সেটা কি? ব্যাটা বললে কি শুনবেন?

নটবরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

কি?

বললে, কোয়াকের সঙ্গে আমি কন্‌সাল্ট করি না। শুনুন কথা একবার।

বললাম, তবে রে শালা, তোর পাসের নিকুচি করেছে, বেরোও এখান থেকে। এ ভোজুর বাড়ি নয়, আমার বাড়ি। আমিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এই ফী নাও, বেরোও এখান থেকে এখ্‌খুনি। তোমাদের নোট মুখস্থ ক'রে চুরি ক'রে ঘুস দিয়ে পাস করার যে মুরোদ কত, তা আমার জানা আছে। তেল দিতে পারলে আমিও একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারতাম। নিকালো শালা—। টং টং ক'রে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে দূর ক'রে দিলাম। শালা হেঁট হয়ে টাকা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল। চিকিৎসার 'চ' জানে না, এটিকেট মারাতে এসেছেন! খুব সম্ভব, চুরি ক'রে পাস করেছে ছোকরা।

নটবরের হস্তে নিজেদের ডাক্তারের এই লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া শঙ্কর আহত হইল।

বলিল, তা হতে পারে। কিন্তু তাঁকে এমনভাবে অপমান করাটা ঠিক হয় নি আপনার।

নিশ্চয় হয় নি। কিন্তু একটি বোতল 'খাঁটি' তখন আমার মগজে চ'ড়ে আছে, বাজে 'ফর্‌ম্যালিটি' করতে দেবে কেন সে? সাদা চোখে একদিন অ্যাপলজি চেয়ে আসব ভেবেছি, কিন্তু ফুরসৎই পাচ্ছি না।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্করও হাসিয়া ফেলিল ও উঠিয়া দাঁড়াইল।

কি ওষুধ বললেন? পিটুইট্রিন?

হ্যাঁ, পি.-ডি.র।

দেখি, যদি আনতে পারি!

আপনি গেলে তো 'বাপ বাপ' ক'রে দেবে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

ডিস্‌পেন্সারি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। গিয়া দেখিল, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কেহ নাই। কলেরার মরশুম, দুইজনেই 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছেন। ড্রেসার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার কাছে চাবিও ছিল। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া সে ঔষধটা বাহির করিয়া দিল। শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া

দেখিল, উন্মুন ধরিয়া উঠিয়াছে, জলও গরম হইয়াছে, নটবর ডাক্তার নিজেই মেয়েটির হাতে পায়ে শেঁক দিতেছেন। মেয়েটি অনেকটা যেন চাঙ্গা হইয়াছে। নটবর ইন্‌জেক্‌শনটা দিলেন, ব্র্যাণ্ডি দিয়া এক দাগ ঔষধ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন, তাহার পর বলিলেন, এইবার স্যালাইনটার ব্যবস্থা করা যাক।

শঙ্কর বলিল, একবার দেওয়া হয়েছে শুনলাম।

আর একটু দেওয়া দরকার। আমি পেট ফুঁড়ে দেব। এঁদের ভয় হয়। কেউ বলেন, ইন্‌টেস্টাইন ছ্যাদা হয়ে যাবে; কেউ বলেন, পেরিটোনাইটিস হবে। আমি কিন্তু বহুৎ দিয়ে দেখেছি, কিছু হয় না, খুব ভালফল হয়। আর কত সহজে টপ টপ দেওয়া যায়। ব্যবস্থা ক'রে ফেলা যাক। চরণ ডাক্তারের আশায় কতক্ষণ আর থাকি! তিনি তাঁর প্রত্যেক রুগীর প্রত্যেক কথার উত্তর দিয়ে প্রত্যেকের পথ্যের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা ক'রে সকলের সব রকম আবদার মিটিয়ে তবে আসবেন। আশ্চর্য লোক! অথচ ওঁকে ছাড়া আর কারকে বিশ্বাস নেই আমার।

চরণ ডাক্তারকে এরাই ডেকেছে নাকি?

এরা ডাকবে কেন, আমি ডেকেছি। দায় কি এদের? দায় এই শালার। চরণবাবু বোধ হয় ফী নিতে চাইবেন না, কিন্তু দিতে হবে কিছু। ব'লে রাখি। এই, শুনতা হ্যায়, চরণবাবুকো বোলায়েঁ হেঁ। আঠ রুপিয়া ফিস লাগে গা।

হুজুর মাই বাপ, জো বোলিয়ে।

নটবর মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, জো বোলিয়ে! জো বোলিয়ে কি রে! রুপিয়া হ্যায়?

মেয়ের মা অশ্রু মুছিয়া সজলকণ্ঠে বলিল, থারি লোটা বন্ধক দে করিকে রুপিয়া আনব বাবু, বেটীকে মেরা বচাই দে—

এই গাইতে শুরু করেছে!—তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, যা দেখছি, শেষকালে I shall have to pay from my own pocket—এই ব্যাটারাই ফতুর করবে আমাকে। মেথরপাড়ায় এক মিশনারি সাহেব

সেবা ক'রে বেড়াচ্ছে দেখলাম, তাকেও কতকগুলো কাজ দিয়ে আসতে হ'ল। চাইলে 'না' বলতে পারলাম না। আর সত্যিই কাজ করছে লোকটা।

মেথরপাড়াতেও কলেরা হয়েছে নাকি?

চারটে মরেছে, দশটা ভুগছে।

তা হ'লে আমার তো একবার যাওয়া দরকার সেখানে।

নিশ্চয়। যান। যদি পারেন, কিছু সাহায্যও করুন। হ্যাঁ, আপনাকে সেই কথাটা ব'লে নিই। হরিয়ার নামে শুনলাম উৎপলবাবু নালিশ করেছেন। দারোগাও তার নামে বি.এল. কেস আগেই দায়ের করেছে। আমি কিন্তু ব'লে রাখছি, হরিয়ার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না আপনারা। তার বিরুদ্ধে একটি সাক্ষী পাবেন না। মিছিমিছি অপ্রস্তুত হবেন শুধু। হরিয়া, বিষুণ, কারু, ফরিদ—সকলের হয়ে লড়ব আমি। এই জেলার সেরা উকিলরা বিনা পয়সায় আমার হয়ে খেটে দিয়ে যাবে। উৎপলবাবুকে ব'লে দেবেন কথাটা। তিনি সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করলেন না, কিন্তু একদিন তাঁকে এই শম্মার কাছে আসতে হবে, তা ব'লে দিচ্ছি। তাঁকে ব'লে দেবেন, শুধু যে সাক্ষী পাবেন না তা নয়, ধোপা পাবেন না, নাপিত পাবেন না, গোয়ালা পাবেন না, কিচ্ছু পাবেন না। এই গরিবরাই আপনাদের হাত পা, এদের পীড়ন ক'রে কোনও সুখ পাবেন না আপনারা। এ কলকাতা নয়, মফস্বল। এখানে পয়সা ফেললেই সব জিনিস পাওয়া যায় না। এদের কাছে হুকুম হাকিম নয়, ভালবাসাই হাকিম। এই অবস্থায় দরিদ্রদের পীড়ন করতে ইচ্ছেও হয় আপনাদের? আশ্চর্য!

শঙ্কর একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

আমি তো কিছুই করি নি। উৎপল করেছে। পলাশপুর থেকে আসার পর তার সঙ্গে দেখাও হয় নি আমার। কলেরা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে। তাকে বলব আপনার কথা।

বলবেন।

নটবর স্যালাইন দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বাহির হইয়া চলিতে শুরু করিল। পলাশপুর হইতে আসিয়া সত্যই সে উৎপলের সহিত

দেখা করে নাই। কলেরার অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। সুরমার সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিতেছিল। ও-ফাঁদে সে আর পা দিবে না। কথাটা যে তাহার মনেই, এ খেয়াল তাহার ছিল না। নিপুদাকে, প্রমথ ডাক্তারকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এতগুলা গরিব লোকের নামে নালিশ করা হইয়াছে, রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন দেওয়া হইয়াছে, দুষ্ট দমনের এত আয়োজন উৎপল সাড়ম্বরে করিয়াছে, তাহার সহিত দেখা হইলেই নিশ্চয়ই সোৎসাহে সে এই সব আলোচনা করিবে। শঙ্করকে চুপ করিয়া সব শুনিতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। উৎপল তাহার উপরই সব ভার দিতে চাহিয়াছিল, সে লয় নাই, লইতে পারে নাই, সমস্যার সমাধান করিবার কোন সদুপায় তাহার মাথায় আসে নাই; সুরমার প্রলোভনায় প্রতিবাদ করিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া উৎপলের কথাতেই অবশেষে সায় দিয়া সামান্য একটা ছুতায় ভীরুর মত সে পলাশপুরে পলাইয়া গিয়াছিল।

মেথরপাড়ায় গিয়া সে দেখিল, মিশনারি সাহেব মলমূত্রসিক্ত কতকগুলি কাপড় জামা বাখারি করিয়া তুলিয়া প্রকাণ্ড একটি গামলায় ফেলিতেছেন। গামলায় ফিনাইল-মেশানো সাদা জল রহিয়াছে। সারি সারি অনেকগুলি গামলা। সাহেবের সঙ্গে শঙ্করের আলাপ ছিল।

গুড আফ্‌টারনুন মিস্টার রয়।—তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌টিং সয়েল্‌ড্‌ ক্লোদ্‌স্‌।

শঙ্কর প্রত্যভিবাদন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বাংলাও জানেন। বলিলেন, আপনিও সেবাকার্য করছেন!

শঙ্কর ঘাড় নাড়িল।

উত্তম, খুব উত্তম। আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি?

নিশ্চয়, কি করতে হবে, বলুন?

আসুন।

সাহেবের পিছু পিছু শঙ্কর ছোট একটা কুঁড়েঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে এত অন্ধকার যে, সে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না, কিছু শুনিতেও

পাইল না। মৃত্যুর স্তব্ধতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন যেন। একটা নিদারুণ দুর্গন্ধ কেবল তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সহসা সাহেব টর্চ জ্বালিলেন। তীব্র আলোকে প্রথমেই চোখে পড়িল, ঘরের এক কোণে গোটা দুই প্রকাণ্ড শূকর বাঁধা রহিয়াছে। তাহার পর দেখিতে পাইল, আর একধারে সারি সারি তিনজন শুইয়া আছে। দুইজনের মুখ ঢাকা, একজনের মুখ খোলা। যাহার মুখ খোলা, মনে হইল, সে যেন দুই চোখে কালো কালো ঠুলি পরিয়া আছে। সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপর নাড়িতেই ভনভন করিয়া অসংখ্য মাছি উড়িয়া গেল। চক্ষুকোটর বাহির হইয়া পড়িল। চক্ষু দেখা যায় না, খালি কোটর। ঠুলি নয়, মাছির স্তূপ। হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সামর্থ্য নাই।

সাহেব ঝুঁকিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, নাড়ী নাই, তবু এ বোধ হয় বাঁচিয়া আছে। এ লোকটাকে আমি হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি যদি এ দুজনের ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করেন, বড় ভাল হয়।

শঙ্করের মুখে কথা সরিতেছিল না।

বাক্যস্ফূর্তি হইলে দুইটি মাত্র কথা সে বলিল, এ কি!

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এই আপনার দেশ! Your country lives in huts, not in palaces,—lives like this and dies like this—

শঙ্করের আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বলিয়া ফেলিল, I have read about Black Plague of your country too।

No offence please—চলুন, কাজ করা যাক। Let us be up and doing।

সাহেব বাহিরে আসিয়া ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌টিঙে মন দিলেন।

শঙ্কর অকূল পাথারে পড়িল। একটি লোক নাই, কি করিয়া মড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা করিবে সে? এ পাড়ার সকলে পলাইয়াছে। অন্য কোন জাত মেথরের মড়া স্পর্শ করিবে না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে একটিমাত্র

লোকের নাগাল পাইল। ফুলশরিয়া। ফুলশরিয়ারই শরণাপন্ন হইল। সে যদি কোন লোক যোগাড় করিয়া দিতে পারে। ফুলশরিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করবাবু তাহাকে ডাকিয়া কাজের ভার দিতেছেন! জরুর সে 'কোসিস' করিবে। মেথরদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালি বর্ষণ করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল, শঙ্কর আবার মেথরপাড়ায় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া দেখিল, সাহেব তাঁহার 'ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌টিং' শেষ করিয়াছেন।

লোক পেলেন?

ডাকতে পাঠিয়েছি।

সাহেবের চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মিটিমিটি করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, পাওয়া শক্ত। কেউ আসিবে না। এ দেশের লোককে আমি চিনি।

সত্য কথাটা শুনিয়া শঙ্করের লজ্জা হইল। হঠাৎ রাগও হইল। আশ্চর্য স্পর্ধা এই বিদেশীটার! আমাদেরই অর্থে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া, আমাদের দেশের মাটিতেই দাঁড়াইয়া, আমাদেরই নিন্দা করিতেছে! আমাদের উপকার করিবার জন্য কে উহাকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল? উত্তরে একটা রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার অবস্থাও কি অনুরূপ নয়? তাহাকে কে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল এখানে আসিতে? সাহেব কিছু না বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং অবলীলাক্রমে মুমূর্ষু কলেরা রোগীটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

আমি হস্‌পিটালে চলি। আপনি অপেক্ষা করুন। শীঘ্র কেহ আসিবে না। জানোয়ার সব—

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহেব চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ দেখা গেল, শঙ্কর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, স্কুলের স্পোর্টে একবার সে ফার্স্ট হইতে পারে নাই। তাহার অপেক্ষা বলিষ্ঠতর আর একজনের নিকট সে হারিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সেই ছেলেটা যখন 'কাপ' লইয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার যাহা মনে হইয়াছিল, এই সাহেবকে দেখিয়া ঠিক তাহাই

মনে হইল। সাহেবের মহত্ত্বে সে যতটা প্রীত হইয়াছিল, তাহার ওই 'জানোয়ার' কথাটায় ঠিক ততটাই বিরক্ত হইল সে। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল যেন। মনে হইতে লাগিল, এই যে ইহারা আমাদের সকলকে অশিক্ষিত বর্বর মনে করিয়া অনুকম্পাভরে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মূলে কি আছে? নিছক মানব-প্রেম? স্বার্থ নয়? ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পর্যন্ত স্বদেশবাসীকে হীনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। আমাদের কবিও গাহিয়া গিয়াছেন—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। কাহার ভাষা? সত্যই কি আমরা মূঢ়, সত্যই কি আমরা মূক, সত্যই কি আমরা ম্লান? সত্যই কি আমাদের নিজের কোন বুদ্ধি নাই, সৌন্দর্য নাই, ভাষা নাই? যে বিদেশী মানদণ্ডের মাপে এসব কথা বলিতে শিখিয়াছি, সেই মানদণ্ডটাই কি নিখুঁত? উহাদের চোখ দিয়া দেখিলে আমাদের হয়তো ম্লান দেখায়, উহাদের কান দিয়া শুনিলে আমাদের প্রাণের ভাষা হয়তো শোনা যায় না, কিন্তু উহাদের বিচারটাই কি শেষ বিচার? কলেরায় দলে দলে লোক মরিতেছে, দলে দলে লোক পলাইতেছে, ইহা লইয়া ঠাট্টা করিবার কি আছে? উহাদের দেশে পলায় না? নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে কে স্থির হইয়া থাকিতে পারে? পলাইয়াছে তো হইয়াছে কি? উহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায় না? প্রাণের ভয় কাহার নাই? ও-দেশের গরিবদের কথা কে না জানে? ও-দেশের 'স্লাম'বাসীদের তুলনায় আমাদের দেশের গরিব লোকেরা তো দেবতা। উহাদের সাহিত্যে স্লামের যে পাশবিক ছবি আমরা পাই তাহা বীভৎস, এ দেশে ও-ছবি কল্পনাও করা যায় না। আমাদের অনেক দোষ আছে—আমরা রুগ্ন, আমরা অশিক্ষিত, আমরা অসহায়; কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি পরাধীনতা নয়? নিরীহ হরিণ বিরাট একটা পাইথনের কবলে পড়িয়া নানারূপ অশোভন ভঙ্গীতে ছটফট করিতেছে। এই অশোভনতা যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আমরা দুষ্ট। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহার মনের গ্লানি অনেকটা যেন কমিয়া গেল। কিন্তু তাহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইবার অবসর পাইল না। ফুলশরিয়া আসিয়া হাজির হইল, বলিল যে, ভন্টু এবং যোগীয়ার সহিত তাহার দেখা

হইয়াছিল, কয়েকদিন আগে তাহাদের দুইজনেরই ছেলে-বউ মরিয়াছে। এখন তাহারা কালালিতে বসিয়া মদ খাইতেছে। মড়া ফেলিবার কথা বলায় হা-হা করিয়া হাসিয়া অশ্লীল ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিল। বাবু নিজে যদি গিয়া ছোঁড়াপুতাদের কান ধরিয়া টানিয়া আনেন, তবে ঠিক হয়।

শঙ্কর বলিল, দুটো ছোট খাটিয়া যোগাড় করতে পারিস?

হাঁ। উ আর কি ভারী বাত ছে।

তাই আন্ তা হ'লে। তোর আপত্তি আছে ছুঁতে? যদি না থাকে, তা হ'লে তুই আর আমি একে একে এদের নিয়ে যাই, চল্।

ফুলশরিয়া শিহরিয়া উঠিল।

উ বাবু হম নেহি সেকবো।

শঙ্কর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন গভীর রাত্রে শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দুইটা, সমস্ত দেহ মন অবসন্ন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। সে কাহাকেও উঠাইল না। উঠাইবার প্রবৃত্তিও হইল না। বাহিরের ঘরে তাহার এক প্রস্থ বিছানা পাতাই থাকিত, বাহিরের ঘরের চাবিও তাহার কাছে ছিল, বাহিরের ঘরেই সে শুইয়া পড়িল। সাহেবের কথাগুলি তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল—Your country lives in huts, not in palaces—lives like and dies like this। তাহার ঘুম আসিল না। খানিকক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল, আলো জ্বালিয়া লিখিতে শুরু করিয়া দিল।

"যেমন করিয়া হোক ইহাদের আমি উদ্ধার করিব, তাহা করিতে গিয়া যদি আমার ধন প্রাণ সর্বস্ব যায়, তবু আমি নিরস্ত হইব না।..."

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিল, বারান্দায় একটা ছায়ামূর্তির মত কে যেন দাঁড়াইয়া আছে।

কে?

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল।

কি চাই এত রাত্রে?

কম্পিতকণ্ঠে ফুলশরিয়া বলিল, কুছু নেই।

শঙ্কর উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিতেই ফুলশরিয়া হঠাৎ আগাইয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

এ কি!

ফুলশরিয়া কিছুতেই পা ছাড়ে না। কি হইল? কাঁদিতেছে কেন? জোর করিয়া পা সরাইয়া লইতেই ফুলশরিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে চোখ মুছিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। একটি কথাও বলিল না। নিজের অদ্ভুত আচরণে নিজেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু না আসিয়া সে কিছুতেই পারে নাই। কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ হইতেই সে শঙ্করের বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরিতেছিল। মেথরের মড়া বাবু নিজে কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া গেলেন! এ কি মানুষে পারে? এ লোককে প্রণাম না করিয়া থাকা যায়?

শঙ্কর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সকালে খোঁজ করিয়া শুনিল, ফুলশরিয়া বাড়িতে নাই। হাতে কোন্ কাজ ছিল না, মনে হইল, উৎপলের কাছে একবার যাওয়া যাক। তাহার সহিত দেখা না করাটা অশোভন হইতেছে। সুরমা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তবে যাইবে, এ কি তাহার পাগলামি! সেখানেও গিয়া দেখিল, কেহ নাই। দারোয়ান বলিল, বাবু এবং মাইজী একটা জরুরি তার পাইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন বলিয়া যান নাই।

৪৬

পরদিন একজন পাচক সমভিব্যাহারে শিরীষবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং শুধু অমিয়াকে নয়, শঙ্করকেও লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমিয়া বলিল, আমি যাই কি ক'রে, বল? হাসিদি তাঁর ছেলেকে আমার কাছে রেখে গেছেন। কার কাছে রেখে যাই একে?

চিবুকের তলাটা চুলকাইতে চুলকাইতে শিরীষবাবু বলিলেন, রেখে যাবি কেন? ও চলুক আমাদের সঙ্গে।

বাঃ, হাসিদি ফিরে এসে যদি ছেলে খোঁজেন?

শঙ্কর বলিল, তার ফিরতে এখন দেরি আছে। তুমি নিয়ে যেতে পার ওকে।

অমিয়া বলিল, তা ছাড়া বাড়িতে এতগুলি পোষ্য, তাদের দেখে কে?

ইহার জন্য শিরীষবাবু প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন।—সেই জন্যেই তো রাঁধুনি বামুনটাকে সঙ্গে এনেছি, ও স্বচ্ছন্দে সব চালিয়ে দিতে পারবে। শঙ্করও আমাদের সঙ্গে চলুক। চারদিকে কলেরা হচ্ছে, এখন এখানে থাকা ঠিকও নয়।

শঙ্কর বলিল, কলেরা হচ্ছে ব'লেই আরও আমাকে থাকতে হবে।

শিরীষবাবু জামাতার দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া আবার চিবুক চুলকাইতে শুরু করিলেন।

অমিয়া বলিল, যাই, বাবার চা-টা নিয়ে আসি। তুমিও খাবে না কি আর এক কাপ?

আন।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, খাবে বইকি। আন্।

অমিয়া চলিয়া গেল।

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। মুন্নাই আসিয়া ডাকের চিঠি দিয়া গেল।

ডাক এল নাকি?

হ্যাঁ।

শঙ্কর খামটা খুলিয়া দেখিল, উৎপলের চিঠি।

উৎপল লিখিয়াছে—

'ভাই শঙ্কর,

চিঠি পড়বার আগেই একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি। যা করেছি, তার প্রেরণা মানবসুলভ কৌতূহল, অন্য কিছু নয়। লোভটা

সামলাতে পারা গেল না। শুধু তাই নয়, সামলানো উচিত ব'লেও মনে হ'ল না। আগে তোমাদের কাউকে কিছু বলি নি, কারণ বললেই তোমরা বাগড়া দিতে। সুরমা এখনও দেবার চেষ্টা করছে, যদিও এখন আর ফেরবার পথ নেই, সই ক'রে দিয়েছি। অর্থাৎ, ইন ব্রিফ, কিংগস্ কমিশন পেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আগে থাকতেই গোপনে গোপনে চেষ্টা করছিলাম, লেগে গেছে। মানব-মনীষার এই নবতম বহ্ন্যুৎসবটা স্বচক্ষে দেখবার কি যে আগ্রহ হচ্ছে আমার, তা তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করব না; কারণ তোমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক, তোমাদের ধরনধারণ সবই স্বতন্ত্র। যাক সে কথা। এখন যে কোন মুহূর্তেই উড়ব এবং চীন, না, কায়রো কোথায় গিয়ে যে হাজির হব, তা জানি না। যতদিন না ফিরি, সুরমা তার বাবার কাছে বম্বেতে থাকবে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তাই চিঠিতেই গোটাকতক কাজের কথা ব'লে যাচ্ছি, অবধান কর। আগে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই তুমি জমিদারির সর্বময় কর্তা রইলে। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার অবর্তমানে তুমি যা করবে, তাতে আমার অগ্রিম সম্মতি রইল এবং আইনত সেটা পাকা করবার জন্যে আমার উকিলকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু একটা কথা। দেশোদ্ধারের যে এক্সপেরিমেণ্টটা আমরা করেছিলাম, তাতে যে খুব সুবিধে হয় নি, এতদিনে তুমিও সেটা বুঝেছ নিশ্চয়। অন্য একটা লাইন ধরলে কেমন হয়? অবশ্য কি লাইন ধরলে যে ভাল হবে, সেটা তুমিই ভেবে-চিন্তে ঠিক ক'রো।

মণির ব্যাপারে আমি যে বিকট কাণ্ড ক'রে এসেছি, তার ফল কি হ'ল? আমার পদ্ধতি উল্টে দিয়ে নূতন কোন উপায়ে তুমি যদি সমস্যাটার সমাধান করতে পার, ক'রো, আমার কিছু আপত্তি নেই। বিবেকদংশনে ক্ষত-বিক্ষত হবার দরকার কি! যাদের ক্ষতি হয়েছে, যদি ভাল মনে কর, তাদের *ক্ষতি-পূরণও ক'রে দিতে পার।*

তোমার নিপুদার সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল। রিক্রুটিং আপিসে দেখি, তিনি ওআরে নাম লেখাবার জন্যে এসেছেন। নেহাত পেটের দায়েই

এসেছিলেন ব'লে মনে হ'ল, যদিও অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট নানারকম বুকনি ঝাড়লেন। এ কথা মনে হবার কারণ, যেই তাঁকে বললাম—আপনি যদি চান সিভিল লাইনেই ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি আপনার, অমনই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছি তাঁর। তিনি একটি অনুরোধ করেছেন। জমিদারি আমরা যদি বিক্রি করি, মুকুন্দ পোদ্দার বা রাজীব দত্তকে যেন না দিই। এ অনুরোধের অর্থ কিছু বুঝলাম না। জমিদারি আমরা বিক্রি করব, এ গুজব উঠল কি ক'রে? কেনারামও একদিন বলছিল এ কথা। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওই কেনারামটিকে সাবধান। বড় গভীর জলের মাছ উনি। আমাকে জানিয়ে গেছেন, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছেটা এই নিয়ে তোমার সঙ্গে একটা মনোমালিন্য করি। আমি যে গভীরতম জলের জীব, এ খবর উনি জানেন না ব'লেই এ চেষ্টা করেছিলেন। পারতপক্ষে ওঁর সংস্পর্শ পরিহার ক'রো। আমার মতে লোকসান-টোকসান যা হয়েছে, তা 'রাইট অফ' ক'রে দিয়ে ব্যাঙ্কটা তুলে দাও। ধার হিসেবে না দিয়ে বছরে বছরে গরিব প্রজাদের যা পার দানই ক'রো বরং কিছু কিছু। সব দিক থেকে নিরাপদ সেটা, দেখতে শুনতেও ভাল।

আর বিশেষ কিছু লেখবার নাই। চুম্বন গ্রহণ কর।

সুরমা খুব হাসিমুখে থাকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ভেতরটা যে টনটন করছে, তা ঠিক ঢাকতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে একটু একটু। তবে সেটা আমার জন্যে, না, তোমার বিরহে, তা বুঝতে পারছি না ঠিক। ইতি—

উৎপল

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

কার চিঠি?

উৎপলের।

ডাকে আসবার মানে?

ওরা এখানে নেই। উৎপল যুদ্ধে যাচ্ছে।

আর সুরমা ?

সে বঙ্গে যাবে।

বাহির হইতে কে ডাকিল, শঙ্করদা !

শঙ্কর বাহিরে গিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক দাঁড়াইয়া আছে।

কি খবর ?

আমাদের গ্রামেও কলেরা লেগেছে।

চৌধুরী মশাইকে খবর দাও তা হ'লে। আমাকে আজ কলকাতা যেতে হচ্ছে।

ও। কলকাতায় কোথায় উঠবেন ?

সপরিবারে যাচ্ছি যখন, ক্যালকাটা হোটেলেই উঠব। তেমন দরকার যদি বোঝ, খবর দিও।

আচ্ছা।

নিমাই ঘটক চলিয়া গেল।

সুরমা এখানে নাই এবং কিছুদিন এখন থাকিবে না—এই বার্তা শুনিয়া অমিয়া আর বাপের যাইতে আপত্তি করিল না।

শঙ্করও বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত যাই। উৎপলের সঙ্গে দেখা করা দরকার একটু।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, বেশ তো, বেশ তো।

৪৭

অমিয়াকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া শঙ্কর গড়ের মাঠে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। নির্জনে নিজের সঙ্গে সে বোঝা-পড়া করিতে চায়। উৎপল সুরমা কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই। বিমর্ষচিত্তে সে বারম্বার আবৃত্তি করিতেছিল, ভালই হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামে সকলে যখন কলেরায় মরিতেছে, তখন সে তাহাদের ফেলিয়া

কলিকাতায় চলিয়া আসিল কেন? এই না সেদিন উচ্ছ্বাসভরে লিখিতেছিল, "আমি যেমন করিয়া হোক উহাদের উদ্ধার করিব"? এই কি উদ্ধার করিবার নমুনা! কেন আসিল সে? অমিয়ার জন্য আসে নাই, শ্বশুরের অনুরোধেও নয়, এমন কি উৎপলের সহিত দেখা করিবারও একটা বিশেষ আগ্রহ জাগে নাই তাহার, সে আসিয়াছিল সুরমার জন্য। নির্জনে এই রূঢ় সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। ছি ছি, কেন এই হীন লোলুপতা! আত্মসম্বরণ করিবার সামান্য এ শক্তিটুকু যাহার নাই, সে করিবে পতিতোদ্ধার! চরিত্রের কোন্ সম্পদ আছে তাহার! বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সে হাসিকটাকাটা দিয়া নিজের ঋণপরিশোধের কল্পনা করিয়াছিল! অতি সহজেই তো রাজীব দত্তকে স্পষ্ট মিথ্যা কথাটা বলিয়া আসিল, আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না! পরোপকার করিবার ছুতায় সে এতদিন আত্মবিনোদন ছাড়া আর কি করিয়াছে? কেবল কর্তৃত্ব করিয়াছে সকলের উপর। যে তাহার অহংকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছে; যে পারে নাই, তাহাকে নির্যাতন না করিলেও অনুকম্পা করিয়াছে। পরের অর্থে নিজের অহঙ্কারকে পরিতুষ্ট করিতে করিতেই তো জীবন কাটিল। গৌরব করিবার মত তাহার নিজের কি আছে? কিছুই নাই।...নিঃস্ব ভিখারীর মত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। সহসা মনে পড়িল, শাস্ত্রে বলিয়াছে—আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। নিজেকে? অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার গুহায় লুব্ধ পশুটা বসিয়া আছে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবিটা। শিহরিয়া উঠিল। ওই কদাকার পশুটাই আমি? আর কিছু নাই? মিথ্যা কথা। আমার অন্তরে এত স্বপ্ন, পশু কি কখনও স্বপ্ন দেখে? পশুর অন্তরে কি উচ্চাশা জাগে? আমার অহঙ্কার অসংযম অপৌরুষ অসন্তোষ অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার যে কল্পনা আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা কি পশুর কল্পনা? এতদিনের এত শ্রম এত সাধনা সব পশু হইয়া যাইবে, পশুটারই জয় হইবে শেষে? সহসা তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর বেগে বহিতে লাগিল, চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অন্তরের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিছুতেই না, পশুটাকে

আমি জয় করিবই। পরক্ষণেই মনে হইল, কিরূপে? অন্ধকার অন্তরলোকে তাহার ব্যাকুল মন কেবলই প্রশ্ন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিরূপে? কিরূপে? কিরূপে? অন্ধকারের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল, বিলাস বর্জন করিয়া কাজ কর। ভোগের শিখরে বসিয়া এতদিন কাজ করিবার অভিনয় করিয়াছ মাত্র, তোমার অন্ন অপরে উৎপাদন করিয়াছে, তোমার বস্ত্র অপরে বয়ন করিয়াছে, তুমি কেবল সাড়ম্বরে আস্ফালন করিয়াছ, আর কিছুই কর নাই। সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া এইবার কাজে লাগ। কাজ করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। অপরকে ভাল করিবার দায়িত্ব তোমার নহে, কায়মনোবাক্যে নিজে তুমি ভাল হও। নিজে যদি ভাল হইতে পার, তোমার সংস্পর্শে যাহারা আসিবে, তাহারাও ভাল হইবে। মুখের উপদেশ দিয়া নয়, নিজের পবিত্র জীবন দিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ কর। অন্য কোনও পথ নাই। নিজের বিবেকের চক্ষে নিজেকে যদি নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহাই তোমার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

এই কর্তব্যই পালন করিবে সে। এবার ফিরিয়া গিয়া জমিদারির সর্বময় কর্তা আর সে হইবে না। উৎপলের জমিদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসন-পরিষদ্ গড়িবে, নিজেদের হিতাহিতচিন্তা নিজেরাই করিবে। তাহাকে যদি নির্বাচন করে, ভৃত্যের মত সেবা করিবে সে। তাহার বেশি আর কিছু নয়। নিজে সে কৃষকজীবন যাপন করিবে। ফরিদ, কারু, বিষুণদের দলে মিশিয়া ঠিক উহাদেরই মত বাস করিবে। উহাদেরই মত নিজের হাতে চাষ করিয়া স্বোপার্জিত অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবে। বাবু আর সে থাকিবে না। মুশাইয়ের বাড়ির পাশে ছোট একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া··· কল্পনার ডানায় উড়িয়া উড়িয়া মন তাহার স্বপ্ন-রচনা করিতে লাগিল। আচ্ছন্নের মত সে বসিয়া রহিল। কখন যে তাহার চোখ বুজিয়া আসিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল, তাহাও সে জানে না।

অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ খুলিল, তখন মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত একটা প্রেরণায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক তাহার অপেক্ষায় হোটেলের সামনে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে।

নিমাই যে, কি খবর?

বড় দুঃসংবাদ। হরিদা কলেরায় মারা গেছেন, আর কুন্তলাদি সহমৃতা হয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

সে কি!

হ্যাঁ। প্রমথ ডাক্তার চ'লে যাওয়ার পর থেকে গ্রামে তো আর ডাক্তার নেই। আপনি যেদিন আসেন, সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা হরিদার কলেরা হয়, পাড়ার কে যেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল, কিছু হয় নি। কেউ কিছু জানে না। ভোরে ঝকুসু দেখতে পেলে, বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া আর গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাকাডাকি করা হ'ল, কোনও সাড়া নেই। কপাট ভেঙে ঢুকে দেখা গেল, উঠনে চিতা জ্বলছে। তেল আর ঘিয়ের খালি টিন প'ড়ে রয়েছে। বাড়িতে যত কাঠ কাপড়চোপড় ছিল, তাই নিয়ে চৌকির উপর চিতা সাজিয়েছেন কুন্তলাদি, আর তাইতেই পুড়েছেন স্বামীর সঙ্গে, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নি, কেউ জানতে পারে নি।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিস এ নিয়ে গোলমাল করছে আপনার একবার যাওয়া দরকার।

নিশ্চয়। চল।—বলিয়াই স্টেশনের দিকে শুরু করিল।

এখন তো ট্রেন নেই।

এ কথা শঙ্কর শুনিতে পাইল কি না বোঝা গেল না।

সে দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল।

সমাপ্ত

